গল্প সমগ্র

(প্রথম খন্ড)

তারাপদ রায়

www.banglabooks.in
B.B.
www.banglabooks.in

It isn't cover

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

গল্পসমগ্র

ভারাপদ রায়

প্রথম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৫৫

—একশ পঁচিশ টাকা—

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন — পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রণ - রাজা প্রিন্টার্স

GALPA SAMAGRA VOL I
An anthology of short stories by Tarapada Roy Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd 10 Shyama Charan Dey Street Calcutta-700 073

Price Rs 125/-

ISBN 81 7293-287-1

© মিনতি রায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা ৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

কবি মণীন্দ্র রায় করকমলেষু
যিনি একদা প্রায় জোর করে
আমাকে হাসির গল্প লেখার
পাপপথে এনেছিলেন।

২য় মুদ্রণের ভূমিকা

গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশের পাশাপাশি গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত শীঘ্রই হবে।

সারা জীবন ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই সব গল্প লিখেছি। পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লেগেছে অনুমান করে আনন্দে আছি।

আমার প্রতিবেশী শ্রীধীরেন গুপ্ত প্রথম সংস্করণে মুদ্রণ ত্রুটিগুলি মার্জনা করে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ।

এইচ এ ৫৫
সেক্টর ৩, সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৯১

তারাপদ রায়

মুখবন্ধ

প্রথম মুদ্রণ

আমার প্রথম যে গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, বোধহয়, বাণিজ্যিক কারণেই, তরুণ প্রকাশক সেই বইটিব নাম দিয়েছিলেন 'শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প'। বলাবাহুল্য, সেই বইতে শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ, খারাপ ভালো সব মুদ্রিত গল্পই ছিলো, আসলে ঐ বইটির নাম হতে পারতো 'গল্পসমগ্র', কিন্তু তখনো 'গল্পসমগ্র' বার করাব মত শ্রীবৃদ্ধি আমার হয় নি।

এখনো সমগ্রতার যোগ্য হয়েছি এমন বিশ্বাস আমার নেই। কিন্তু যে সময়ের যা রীতি সেটা মানতেই হবে। আমার পাঁচটি গল্পের বই আপাতত এই সঙ্কলনে অন্তর্ভূক্ত হলো। পরবর্তী কালে প্রকাশিত এবং প্রকাশিতব্য পরবর্তী সংস্করণে জুড়ে দেয়া যাবে।

তারাপদ রায়

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অশ্বারোহী	১	গল্পের খোঁজে	১২২
স্বর্গের চাবি	৪	গুরুদাস খাসনবিশের মৃত্যু	১২৯
আরশোলা এবং নিদারুণ বার্তা	১২	প্রণবেশের বিপদ	১৩৫
একটি অখাদ্য গল্প	১৬	সেই ভদ্রলোক	১৩৭
একটি আদ্যোপান্ত দুর্ঘটনা	২১	চন্দ্রাহত	১৪৪
গরুর গল্প	২৫	ভীষণ ভিড়ের মধ্যে	১৪৮
ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের চিঠি	২৯	ভিখারি বিষয়ে আলোচনা	১৫২
আবহাওয়া	৩২	বইমেলা	১৫৭
ঘুঘু কাহিনী	৩৭	পাদুকার বদলে	১৬১
সাক্ষাৎকার	৪২	নগেনবাবুর কীর্তিকলাপ	১৬৫
ভজহরি চাকলাদার	৪৯	নামাবলী	১৬৯
জয়াবতী ও জয়গোপালের কাহিনী	৫৪	পাপি সুইমিং স্কুল	১৭২
চতুরঙ্গ	৫৮	স্কাইস্ক্র্যাপার	১৭৭
নিরুদ্দেশ জানলা	৬১	দুজন জয়ন্ত	১৮১
খদ্দের	৬৬	টমটমপুরের গল্প	১৮৪
ভ্রমণকাহিনী	৭১	বিশু	১৯২
লাথৌষধি	৭৩	পাটনার দাদুর বাক্স	২০২
বাগেশ্বরের রোগমুক্তি	৭৯	চাঁদধরার মন্ত্র	২০৫
জীবনবাবুর পায়রা	৮২	কালুকাক	২০৬
মনোজ সান্যালের গল্প	৮৭	জ্যাকব	২০৯
ভজগোবিন্দ ভোজনালয়	৮৯	সাইকেল	২১৭
নবারুণ সুখে থাকুন	৯১	গর্জন তেল	২২৫
কন্টকাকীর্ণ	৯৬	মাথাফাটা মহাদেব	২২৭
বেঁচে আছি	৯৯	যুদ্ধের গল্প	২৩৬
সঞ্চয়িতা	১০৪	সিঁদুরে মেঘ	২৪০
পুরনো পল্টন	১০৯	অমর, অমর	২৪৩
রেটটা একটু কমান	১১৫	মরা মোষের দাঁত	২৪৭
গেঞ্জি	১১৯	ভিকটোরিয়া ব্রিজ	২৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
বভ্রুবাহন, কয়েকটি গাধার গল্প	২৬২
গগনমামা	২৬৮
কাকতাড়ুয়া	২৭০
দুধরাজ	২৭২
টমাটো সস্	২৭৫
বার লাইব্রেরি, গয়া ১৯২৪	২৮৩
টাইপ-রাইটার	২৮৫
জানালা	২৯৫
ক্ষীরকাঁঠাল	২৯৭
মহাকালের টাইমকিপার	৩০০
দুই মাতালের গল্প	৩০৭
মহামহিম	৩১৭
জয়দেবের জীবনযাত্রা	৩২৩
একদিন রাত্রে	৩২৮
কালোমেঘ	৩৩৭
চশমা	৩৪১
সার্জন সাহেবের বাড়িতে	৩৪৫
কবিতা ও ফুটবল	৩৫১
এন আর আই	৩৬২
গুপ্ত প্রসঙ্গ	৩৭০
দাঁত	৩৭৮
একশো টাকার ভাঙানি	৩৮৪
সান্যাল স্লিমিং	৩৮৭
হাতে খড়ি	৩৯২
অন্য এক মাতালের গল্প	৪০১

গল্পসমগ্র

শেষ অশ্বারোহী

জুলাই মাস নাগাদ একটা বর্ষা ভালো করে পেরোবার আগেই যখন পর পর তেরোটা ওয়াইপার চুরি গেলো, সনাতন সরকাব স্থির কবে ফেললেন, আর গাড়ি নয় এবং সত্যি সত্যিই সাতদিনের মধ্যে জলের দামে গাড়িটা বেচে দিলেন।

গাড়িটা বেচে তাঁর বিপদ কিন্তু আবো বাড়লো। থাকেন হাতিবাগানের কাছে। অপিসের সময় সেখান থেকে ট্রামে-বাসে ওঠা যায় না, মিনিবাস কিংবা ট্যাকসির নাগাল পাওয়া অসম্ভব। পঞ্চাশ বছব বয়স হয়েছে সনাতনবাবুর, সারাজীবন নিজের গাড়িতে অপিসে যাতায়াত করেছেন, এখন এই শেষবয়েসে নাকালের একশেষ।

দু-একদিন হেঁটে যাতায়াত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার ধাক্কায় বোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন পনেবো দিন। রোগশয্যায় নিজের ঘবে চুপ করে শুয়ে বসে অবশেষে চিন্তাটা মাথায় এলো তাঁর, 'একটা ঘোড়া কিনলে কিরকম হয়?' সেই কবে ছোটবেলায় পড়েছেন 'হর্স ইজ এ নোবল অ্যানিম্যাল'—রোগশয্যায় ঘোড়ার কথা চিন্তা করতে করতে তিনি উত্তেজিত হতে লাগলেন। কত সুবিধে, গ্যারেজেব দরকার নেই, প্যাসেজে বেঁধে রাখো, পার্কিং ফি নেই, পেট্রোল-মবিল লাগবে না, একটু ছোলা আর ঘাসজল হলেই হবে, তাও তিনি ঠিক করলেন বিকেলে অপিস থেকে ফিববার পথে ময়দান হয়ে একটু ঘাস খাইয়ে আনাও চলবে, এবং সবচেয়ে বড় কথা ঘোড়ার পার্টস চুরি যাবার কোনো ভয় নেই, চুরি গেলে আস্ত ঘোড়াটা চুবি যেতে পারে, কিন্তু সে প্রায় অসম্ভব, ঘোড়াচোব এখন দেশে আর না থাকাই সম্ভব, অন্তত কলকাতায় তো নেই-ই।

দু একদিনের মধ্যেই অবশ্য অনিবার্যভাবে পরবর্তী চিন্তা মাথায় এলো তাঁর। প্রথম সমস্যা, ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাবে? দ্বিতীয় হলো, ঘোড়ার জন্য লাইসেন্স লাগবে কিনা?

এই দুই সমস্যাব মুখোমুখি হযে সনাতনবাবু অসুখ ভালো হওয়ার পরে আরো তিন সপ্তাহ ছুটি বাড়িয়ে নিলেন। প্রথমটির 'সমাধান' তিনি নিজেই করলেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে শেয়ালদা গিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ানদের কাছে আলাপ-আলোচনা করে জানতে পারলেন, কাটিহারের কাছে এক হাটে ভালো ঘোড়া পাওয়া যাবে। একজন বুড়ো গাড়োয়ান বললো, দার্জিলিং-এ ভালো টাট্টু-ঘোড়া পাওয়া যায়, দামও খুব কম।

কিন্তু দার্জিলিং কিংবা কাটিহাব থেকে কে নিয়ে আসবে ঘোড়া? অবশেষে একজন সৎপরামর্শ দিলো, এই খিদিরপুরের গোহাটাতেই একবার খোঁজ করে দেখুন না, ভালো ঘোড়া পেয়ে যেতে পারেন হঠাৎ। মোটের উপর, শেয়ালদার সহিস-কোচোয়ান যারা আছে সবাই খুবই খাতির করলো সনাতনবাবুকে। বহুদিন তাদের রুজির বাইরের কোনো লোক তাদের কাছে ঘোড়া সম্বন্ধে এত খোঁজখবর করেনি।

সহিসেরা খুব খুশি হলো বটে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীদের নিয়ে খুব বিপদ হলো সনাতন সরকার মশায়ের। বিশেষ করে যখন তিনি ঐ দ্বিতীয় সমস্যা নিয়ে ঘোড়ার লাইসেন্স লাগে কি না...খোঁজখবর শুরু করলেন, সকলের ধারণা হলো তাঁর সম্পূর্ণ মাথা খারাপ

হয়ে গেছে। অনেকেই বললো, 'খুব খারাপ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিলো, আজকাল এরকম খুব হচ্ছে, ব্রেনটা টোটালি ড্যামেজ করে দিয়েছে।' যারা একটু অচেনা, তারা অবাক হয়ে গেলো, কি বললেন, ঘোড়ার লাইসেন্স? ঘোড়ার লাইসেন্স দিয়ে কি করবেন? ঘোড়ার গাড়ি, ভাড়াটে গাড়ি করবেন? নিজে চড়বেন? ঘোড়ায় চড়ে অপিস যাবেন? কোথায় অপিস, এসপ্ল্যানেডে? হাতিবাগান থেকে এসপ্ল্যানেড ঘোড়ায় চড়ে? দৈনিক দুবেলা?

একটা সামান্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রশ্নের ঝড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন সনাতনবাবু। এবং দু-একদিনের মধ্যে সনাতনবাবু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন—ঘোড়ার অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে কলকাতা শহরের রাস্তায় যাতায়াতের জন্যে ঘোড়া কিংবা তার মালিকের লাইসেন্স লাগে কিনা, অথবা ঘোড়ার পিঠে যাতায়াতে এই শহরে কোনো বাধানিষেধ আছে কিনা এই প্রশ্নটি খুব সোজা নয়। এর উত্তর কেউ জানে কিনা তাঁর রীতিমত সন্দেহ হতে লাগলো।

সনাতনবাবু সর্বপ্রথমে লালবাজারে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ডি. সি. ট্রাফিকের অপিসে পাঠালেন। ট্রাফিক অপিসে সবাই ধরে নিয়েছিলো তিনি কোনো পাঁচ আইনভঙ্গের মামলার তদ্বিরে এসেছেন, যখন শুনলো, 'ঘোড়া,' সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁকে কর্পোরেশন দেখিয়ে দিলেন।

সনাতনবাবু কর্পোরেশনে গেলেন। সেই অপিসটি একটু অন্যরকম, কোথায় অনুসন্ধান করতে হবে সেটা জানতেই তাঁর তিন দিন গেলো। অবশেষে লাইসেন্স সেকশনে যেতে বললেন এক ভদ্রলোক। সেখানে গিয়ে একটু খোঁজ করতেই গো-মহিষ এবং সারমেয় শাখার পাশে অশ্ব-অশ্বেতর শাখা খুঁজে পেলেন। সেখানে সবাই বললো, হ্যাঁ, ঘোড়ার লাইসেন্স তাঁরা অনায়াসে দিতে পারেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার লাইসেন্স এ-বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই। এখান থেকে সেরকম কিছু দেওয়া হয় না—এখানেই এক ভদ্রলোক সনাতনবাবুকে পরামর্শ দিলেন, একবার রেসকোর্সে গিয়ে টার্ফ ক্লাবে খোঁজ করে দেখুন। টার্ফ ক্লাবের লোকেরা বললেন, আমাদের ঘেরা মাঠে ঘোড়দৌড়ের লাইসেন্স আছে। তাঁরা ফাইল খুলে সনাতনবাবুকে সব লাইসেন্স-সার্টিফিকেট দেখালেন, তাঁরা কি ভেবেছিলেন কে জানে, বোধহয় তাঁকে কোনো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরেব লোক, কর কিংবা লাইসেন্স ফাঁকির ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করতে এসেছেন বলে ধরে নিয়েছেন। খুব ভদ্রতা করলেন, চা-জলখাবার খাওয়ালেন কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলেন না কলকাতা শহরের রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে যেতে কোনো লাইসেন্স লাগবে কিনা?

সনাতনবাবু নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক, তার ওপরে বে-আইনী কাজ করতে ভয় পান। বিনা লাইসেন্সে রাস্তায় ঘোড়া চড়া আইনসঙ্গত কিনা এটা তাঁকে জানতেই হবে।

এবার তিনি নিজে থেকেই গেলেন মাউন্টেড পুলিশের দপ্তরে। ওরা তো মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করে, ওরা জানতে পারে। মাউন্টেড পুলিশের দপ্তরে একদিন সন্ধ্যার দিকে সনাতনবাবু উপস্থিত হয়ে হাতের কাছে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট পেয়ে সেই সাহেবকে তাঁর হাতিবাগানী ইংরেজিতে সমস্যাটা যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সাহেব চোখ গোল গোল করে সব শুনে কি বুঝলো কে জানে, শুধু একবার 'হাউ ফানি' বলে, পাশেই একটা দশ ফুট উঁচু ওয়েলার ঘোড়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিল, তার পিঠে সনাতনবাবুকে ঠেলে তুলে দিতে গেলো। সনাতনবাবু কোনক্রমে তার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো সমাধান হলো না। একটা সামান্য খবরের জন্য তিনি দিনের পর দিন অপিসে অপিসে দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলেন। সব-কটা দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে প্রশ্নবোধক চিঠি পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা কেউ তাঁর চিঠি ছাপালেন না।

বাধ্য হয়ে সনাতনবাবু মুখ্যমন্ত্রী, লাটসাহেব এবং প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি তাঁর সমস্যার দিকে আকর্ষণ করিয়ে পত্র দিলেন। কিছুদিন পরে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে উত্তর এলো, তাঁর আবেদন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পরিবহন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পরিবহন দপ্তর তাঁকে টুরিজম দপ্তরে পাঠালেন। সেখান থেকে খোঁজ করে জানলেন তাঁকে পশুপালন দপ্তরে যেতে হবে, সেখান থেকে বন-বিভাগ, সেখান থেকে কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগ, সেখান থেকে আবার পশু-বিভাগ, তবে এবার পশুপালন নয়, পশু-চিকিৎসা বিভাগ, সনাতনবাবু ক্রমাগত ঘুরতে লাগলেন, আরো দু'মাস ছুটি বাড়িয়ে নিলেন।

এইরকম অনেক ঘাটে জল খেয়ে সনাতনবাবু একদিন পশুক্লেশ নিবারণী সমিতিতে এসে পৌঁছালেন। তাঁরা সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘোড়াটা কোথায়?' সনাতনবাবু বললেন, 'ঘোড়া এখনো কিনিনি।' তাঁরা তখন বললেন, 'তাহলে এখন আমাদের কিছু করণীয় নেই। আমাদের এটা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি। আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি আপনার খুবই ক্লেশ হয়েছে, কিন্তু আপনার ক্লেশ দূর করার ক্ষমতা আমাদের নেই।' অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে সনাতনবাবু চলে এলেন।

এই শেষ ঘটনার পনেরো দিন পরের কথা। ইতিমধ্যে আশ্বিন মাস এসে গেছে। শরতের নীল আকাশে ঝকঝকে আরবি ঘোড়ার মতো সাদা মেঘগুলো গ্রীবা নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইরকম এক সকালবেলায় হঠাৎ হাতিবাগানের লোকেরা দেখলো এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক টগবগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। ঘোড়া অবশ্য আকাশের মেঘের মত সাদা নয়, বাদামি এবং খুব বড়ও নয়, তবু তো সত্যিকারের ঘোড়া।

শুধু রাস্তার লোকেরাই নয়, জানলা, দরজা, বারান্দায় ছাদে দাঁড়িয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই সবিস্ময়ে এই অভাবিত দৃশ্য দেখতে লাগলো। কলকাতার জটিল রাস্তায় ট্রাম-বাস, ট্যাকসি-রিকসা, পদাতিক ইত্যাদির পাশাপাশি কদম চালে এক অশ্বারোহী প্রফুল্ল বদনে চলে যাচ্ছে। মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ জিনিসটা বে-আইনী হচ্ছে কিনা বুঝতে না পেরে পকেট থেকে নোটবুক বার করে কি একটা লিখতে গিয়ে খেয়াল করলো ঘোড়ার নম্বর নেই। সে হতভম্বের মতো ট্রাফিক কন্ট্রোল বন্ধ করে দিয়ে অশ্ব এবং অশ্বারোহীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার মশায়ই এই অশ্বারোহী। তিনি কি করে ঘোড়া সংগ্রহ করলেন; ঘোড়া এবং তার আরোহী অর্থাৎ নিজের জন্যে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কিনা শেষ পর্যন্ত, ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাবো না। কারণ, সেটা সনাতনবাবুর স্বার্থের বিরোধী হবে।

শুধু এটুকু বলে রাখি, সনাতনবাবু সাহসী লোক। আজ দু-দিন হল মাত্র ঘোড়াটি একটি সাময়িক সহিসসহ সংগ্রহ করে এনেছেন। আজ সকালবেলায় সহিস ঘোড়াকে দানাপানি খাইয়ে লাগাম পরিয়ে দিয়েছে। এখন সেও সঙ্গে আসতে চেয়েছিলো কিন্তু সনাতনবাবু তাকে রেখে একাই ঘোড়ার পিঠে চড়ে অপিসের দিকে রওনা হয়েছেন। কে কি বলেতে চেয়েছিলো, সনাতনবাবু তাতে একবিন্দু কর্ণপাত করেননি।

কর্ণপাত করার মত কোনো কারণও দেখা গেলো না। নির্বিবাদে গ্রে স্ট্রীট হয়ে সোজা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়ে কয়েক সহস্র পথচারী এবং অলিন্দবিহারী জনতার অভিভূত দৃষ্টিব সামনে দিয়ে কলকাতার শেষ অশ্বারোহী এসপ্ল্যানেডে এসে পৌছালেন।

আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন, ধীরে-সুস্থে কার্জন পার্কের পিছন দিক দিয়ে ঘোড়া নিয়ে সনাতনবাবু মেয়ো রোডের এক পাশে একটা ঘাসে-ভরা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে হাতের ব্যাগ থেকে একটা পাটের দড়ি বার করে ঘোড়াটার গলায় বাঁধলেন, তারপর আরেকটা প্রান্ত বেঁধে দিলেন একটা কৃষ্ণচূড়ার গুঁড়ির সঙ্গে। এরপর অত্যন্ত সাবধানে, ভয়ে ভয়ে মুখ থেকে লাগামটা ছাড়িয়ে ব্যাগে ভরে নিলেন, ঘোড়াটা আনন্দে পরপর তিনবার হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো।

সনাতনবাবুও খুশিমনে অপিস চলে গেলেন। এতদিনে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। তার ওপরে পার্কিং ফি লাগছে না।

বিকেলে অপিস থেকে বেরিয়ে মনে একটু শঙ্কা ছিলো, গিয়ে ঘোড়াটা দেখতে পাবেন কিনা। কিন্তু দূর থেকেই দেখতে পেলেন, ঘোড়াটা গ্রীবা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে পরিচিত অপরিচিত মহলে, নানা দিকে সনাতনবাবুর কীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো। সনাতনবাবু ঘোড়ার কাছে পৌছে দেখলেন, ঘোড়ার থেকে একটু নিরাপদ দূরত্বে একটা ছোটখাট জনতা। তারা এতক্ষণ অধীর কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলো, সনাতনবাবু যেতেই একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো।

কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে অত্যন্ত স্মার্টভাবে সনাতনবাবু ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার আগে হাতের ব্যাগ থেকে লাগামটা বার করে নিয়েছেন। কিন্তু লাগাম পরাতে গিয়ে বুঝলেন অসম্ভব, সহিস ছাড়া এ-কাজ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ঘোড়াটা এমনিতে নিরীহ, কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলবে না। আর মুখ না খুললে লাগামও লাগানো যাবে না।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর সনাতনবাবু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কৌতূহলী জনতাও আস্তে আস্তে কেটে পড়লো, শুধু কয়েকজন তখনো দাঁড়িয়ে। সনাতনবাবু খুব মাথা খাটিয়ে অবশেষে ঘোড়াটার মুখের সামনে আস্তে আস্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার সাহায্যে ছোট ছোট তুড়ি দিতে লাগলেন। যে কয়েকজন তখনো উপস্থিত ছিলো তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, সনাতনবাবু সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছেন। তারা কেউ সনাতনবাবুকে বুঝতে পারলো না সে বুদ্ধিই তাদের নেই। এই আশায় সনাতনবাবু তুড়ি দিয়ে চললেন, যে তুড়ির শব্দে ঘোড়াটা যদি একবার হাই তোলে, সঙ্গে সঙ্গে লাগামটা মুখে গলিয়ে দেবেন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ময়দানে ঘন হয়ে এলো। সনাতনবাবুর হাতের বুড়ো আঙুলে ফোস্কা পড়ে গেলো, আশ্বিন মাসের আকাশের নিচে মেয়ো রোডের কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় কলকাতার শেষ অশ্বারোহী বাঁ হাতে লাগাম ধরে ডান হাতে অক্লান্ত, অনবরত ঘোড়ার মুখের সামনে তুড়ি দিয়ে চললেন।

স্বর্গের চাবি

না, কিছুতেই পাওয়া গেল না। সমস্ত ঘর ওলোট-পালোট করে ফেলা হয়েছে। ঘরের চারদিকে যে বিশৃঙ্খলা এখন দেখা যাচ্ছে, কে বিশ্বাস করবে মাত্র আধঘন্টা আগেও এই গৃহ আবাসযোগ্য

ছিলো। সামনের চেয়ারগুলো উল্টে ফেলা হয়েছে, আলনাটা বাঁদিকের জানালার পাশে চিত, একটা আলমারি হাটখোলা, অধিকাংশ বই নিচে নামানো। আর তিনজন ঘর্মাক্ত পুরুষ ও একজন মহিলার বহু পরিশ্রমের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ঘরে ঝড়।

গুরুপদ আর বলাই এসেছে বেলা আটটায়। আর আসার পর থেকেই গুরুপদর যা স্বভাব— এই ঘরের সমস্ত জিনিসগুলো একে একে ঘেঁটেছে। প্রথমে ধীরে-সুস্থে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ্য করেছে। তারপর বইপত্র যা কিছু সব নেড়েচেড়ে দেখেছে। এখন বেলা দেড়টা। গুরুপদ আর বলাই কারোরই স্নানখাওয়া হয়নি, যার বাড়িতে এসেছে সেই বন্ধু অনিল এবং অনিলের স্ত্রী-ও অভুক্ত এখনো। সাড়ে বারোটাতেই গুরুপদ উঠছিলো, 'যাই, বেলা হয়ে গেছে, আর দেরী করার কোনো মানে হয় না।' এবং সেই সময়েই বিপত্তিটা ঘটলো। গুরুপদ পকেট থেকে সিগারেট বার করার জন্যে হাত দিয়ে অচেতনভাবেই খোঁজ করেছিলো ওর ফ্ল্যাটের চাবিটার এবং তার তিন পকেট ঘেঁটে ঘোষণা করলো, 'আমার চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় হারালাম বল তো?'

চাবি হারানো, সবাই ব্যাপারটাকে বেশ লঘু বলে ধরে নিয়েছিলো কিন্তু গুরুপদ যখন জানালো যে চাবি ছাড়া আর বাড়িতে ফেরাই সম্ভব নয়, কেননা তার ফ্ল্যাটের সদরের চাবি ওতেই রয়েছে, ওই রিংয়েই, যে রিংটা সে এইমাত্র এই ঘরে হারিয়েছে, এবং যে চাবি ওই রিংয়ে আর কোথাও নেই। এককথায় অনিলকে একটু দুশ্চিন্তিত দেখা গেলো—কেননা গুরুপদকে সে বিলক্ষণ জানে। গুরুপদ যে কোন মুহূর্তে বলতে পারে, 'আমার ঘরের চাবি তোমার ঘরে হারিয়েছে, যতদিন বা যতক্ষণ এই চাবি না পাওয়া যাচ্ছে আমি তোমার ঘরে থাকবো।' সুতরাং অনিলকে ব্যস্ত হতে হলো, অনিলের স্ত্রী নীরাকেও রান্নাবান্না স্নান ফেলে গাছকোমর শাড়ি বেঁধে স্বামী সুহৃদের নিরুদ্দিষ্ট চাবিটির সন্ধানে ব্যাপৃত হতে হলো।

এবং সমস্ত ঘর তছনছ হলো, ওলোট-পালোট হলো, কিন্তু চাবিটার সন্ধান হলো না। 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আপনি আজ চাবিটি ঘরে না লাগিয়েই বেরিয়ে এসেছেন?' নীরা একবার বিনীতভাবে প্রশ্ন করলো। গুরুপদ জানালো, 'তা হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে এরকম আগে কোনদিন হয়নি।' 'তাহলে তুমি তো বাড়ি থেকে বাসে করে এলে— বাসে কিংবা রাস্তায়— কোথায়ও পড়তে পারে তো?' বলাই-এর এই প্রশ্নে গুরুপদ ঠিক কোন উত্তর দিলো না। একটু মৃদু হেসে বন্ধু-পত্নীর দিকে তাকিয়ে করুণকণ্ঠে বললো, 'দেখুন, আমার চাবি হারানোর আসল দুঃখটা কি জানেন?'

অনিল র‍্যাকের ওপর চাবিটাকেই হাতড়াচ্ছিলো, সে সেখান থেকে গুরুপদর কথায় বাধা দিলো, 'দ্যাখ গুরুপদ, বেলা দেড়টার সময় আমার বৌকে বোকা পেয়ে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবি না। এখন কোন গালগল্প সইবে না। তোর ঘরের চাবি হারিয়ে গেছে, খুঁজছি, বেশ। ঐ চাবির মধ্যে নিশ্চয়ই কোন স্মৃতিচিহ্নের ব্যাপার নেই। চাবি চাবিই, হারিয়ে গেলে তালা ভাঙতে হয়। এ ছাড়া তোর দুঃখের আর কি কারণ হতে পারে?' অনিল গুরুপদর ওপর বিশেষ চটে গেছে বোঝা গেলো।

কিন্তু গুরুপদ থামলো না, পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের ওপর একটু একটু করে ঠুকতে লাগলো, 'দেখুন নীরা দেবী, চাবিটা হারিয়ে গেছে, যেতে পারে। কিন্তু

এটা তো আমার পকেটে থাকার কথা নয়। হারাবেই তো। আমাকে কেন বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে?' গুরুপদর কণ্ঠে স্পষ্ট অভিযোগের সুর শোনা গেলো।

নীরা একটু হেসে সামনের উপুড় করে ফেলা আলমারিটার একধারে বসে জিজ্ঞাসা কবলো, 'কেন, এটা আর কারোর ঘরের চাবি নাকি?'

গুরুপদ ম্লান হাসলো, 'প্রায় ঠিকই বলেছেন। এ চাবি তো আমার কাছে থাকার কথা নয়, এটা থাকার কথা কারোর আঁচলের গিঁটে।' একটা অস্পষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দও যেন শোনা গেলো।

গুরুপদর এই শোকপ্রকাশে অনিল এবং বলাই হো হো করে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো, নীরা একটু কম হাসলো।

নীরাই আবার প্রশ্ন তুললো, 'কেন, সেই নীলবসনা সুন্দরীর কি হলো?'

কথাটার একটা গূঢ় অর্থ আছে। গুরুপদ যে ফ্ল্যাটটায় সম্প্রতি অধিষ্ঠিত হয়েছে, তারই পাশের ফ্ল্যাটে অমলা থাকে। নীরার ধারণা, অমলা সব সময়েই নীল শাড়ি পরে থাকে। অন্তত নীরা যে ক'বার গুরুপদর ফ্ল্যাটে গিয়েছে অমলাকে নীলবসনাই দেখেছে। নীরার আরো ধাবণা এই রকম যে অমলার ব্যাপারে গুরুপদর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা রয়েছে। গুরুপদ অবশ্য কোন সময়েই ব্যাপারটিকে বিশেষ অস্বীকার করেনি।

কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হলো গুরুপদর ভাবগতিক কথাবার্তায় কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে। হয়তো অমলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো গোলযোগ দেখা দিয়েছে। গুরুপদ নীরার প্রশ্নের জবাবও একটু ঘুরিয়ে দিলো।

গুরুপদ বললো,'আপনার অযাচিত সহানুভূতি প্রদর্শনেব জন্য ধন্যবাদ, নীরা দেবী। তবে আপনার অবগতির জন্যে জানাই, নীলবসনা আর নেই।'

'সে কি মরে গেছে?' অনিলের কণ্ঠে কপট উদ্বেগ প্রকাশ পেলো।

গুরুপদ প্রায় কোন বাধাই না দিয়ে বললো, 'বলাই জানে।'

বলাই বললো, 'নীলবসনা আর নীলবসনা নেই। সে এখন নানা ধরনের রঙে মনোনিবেশ করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে অন্য যে কোন রঙই যে তার সমান পছন্দ। আজ সকালে দেখলাম একটা ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি পরনে।'

ব্যাপারটা গুরুপদর পক্ষে মর্মান্তিক। ইতিমধ্যে একাধিক দিন গুরুপদ নীল রঙ এবং তার মূল্য, অর্থ, ব্যঞ্জনা, সেই রঙ যাদের পছন্দ তাদের মানসিকতার উৎকর্ষ ইত্যাদি আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে। অসাধারণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে নীল রঙের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে। সেই অমলা যদি ক্যাটক্যাটে হলুদ বা ফিকে সবুজের অনুরাগিণী হয় তাতে গুরুপদর কি? এই ধরনের একটা শুষ্ক অনুযোগ তুলে গুরুপদ আর বলাই অনিলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। অনিল ও নীরা অবশ্য দেরী যখন হয়েছেই স্নান খাওয়া করে যেতে বললো। কিন্তু ওরা আর বসলো না।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের গনগনে রোদ। বেলা দেড়টা বেজে গেছে, সেও বেশ কিছুক্ষণ হোলো। সবে চৈত্রের শুরু। এর মধ্যে রাস্তাঘাট ভয়ঙ্কর তেতে উঠেছে। শহরতলীর এদিকটায় গাছপালা বিশেষ নেই। দুজনে ঘামতে ঘামতে বাস-স্টপের দিকে এগুলো। বলাই বললো, 'কিন্তু তুই তো চাবিটা বাসেও ফেলতে পারিস। এই ধর, পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে।'

গুরুপদ জানে ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। কিন্তু এখন এই চোঁ-চোঁ পেটে কোন ধাবমান বাসের পশ্চাদনুসরণ করতে হবে সেই হারা- উদ্দেশে—এই আশঙ্কায় সে আর এদিকটায় মাথা ঘামাতে চায়নি। যা হয় হোক।

কিন্তু এখনও বলাইয়ের প্রস্তাবে আবার তার হুঁশ হলো। সত্যিই চাবিটা না পেলে বড় অসুবিধা হবে। নিজের বাড়িতে তালা ভেঙে ঢোকা জিনিসটা খুব পছন্দ নয়। তার ওপরে তালা ভাঙা ব্যাপারটায় গুরুপদর কোন অভিজ্ঞতা নেই। কি করে তালা ভাঙতে হয় সে ভাবতেই পারে না।

বলাইয়ের পরামর্শমতো স্থির করে যে একবার বাস-ডিপোটা ঘুরে যেতে হবে। যদি সেখানে জমা পড়ে থাকে। বলাই রইলো, গুরুপদ একাই বাসে উঠলো। প্রথমে নামলো গিয়ে ডিপোতে। নেমে এদিক-ওদিক কাকে ঠিক প্রশ্নটা করা দরকার স্থির করতেই গেলো কয়েক মিনিট। তারপর ভয়ে ভয়ে একজন নিরীহ গোছের কর্মচারীকে বললো,'আচ্ছা মশায়, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

সেই কর্মচারীটি বললেন, 'কি, বলে ফেলুন!'

গুরুপদ বললো,'দেখুন, আজ এই সকালের দিকে..'

সেই মুহূর্তে কোথায় একটা হুইসল বেজে উঠলো। গুরুপদ যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলো তিনি একটি লাফে সামনের সদ্যচলন্ত বাসটিতে উঠে পড়লেন, 'আমার ট্রিপের সময় হয়ে গেছে।' ঘণ্টা বাজিয়ে বাসটা চলে গেলো।

গুরুপদর নিজের ওপরেই একটু রাগ হলো। এত ভণিতা করার কোন প্রয়োজন নেই, সে তো আর চুরি করতে আসেনি। এবার একটু বেপরোয়া হয়ে টিকিট-ঘরের দিকে অর্থাৎ যে ঘর থেকে কন্ডাক্টররা টিকিট ও ভাঙানি নিয়ে আসছেন সেই ঘরের সামনে গিয়ে বললো, 'ও মশায়, শুনছেন।'

'কে, পার্টনার নাকি?' ভেতর থেকে একটি কোমল কণ্ঠ শোনা গেলো। গুরুপদ একটু আশান্বিত হলো। কিন্তু সেই কণ্ঠটি যখন গরাদের চৌকো দিয়ে একটু বেরিয়ে এসে গুরুপদকে দেখলো, মুহূর্তে স্বরযন্ত্রটি কেমন রুক্ষ হয়ে গেলো, 'কি চাই?'

গুরুপদ বলে, 'আমার একটা চাবি হারিয়েছে।'

'তা আমাকে কি করতে হবে? আমাকে কি তালাচাবিওয়ালা পেয়েছেন?'

'না, ঠিক তা নয়। তবে আপনাদের বাসে হারিয়েছে।' গুরুপদ বিনীতভাবে নিবেদন করলো।

কিন্তু ঐ 'আপনাদের' শব্দটি লোকটিকে যেন ক্ষিপ্ত করে দিলো, হ্যাঁ, আমাদের! সত্তর টাকা মাইনে আর কোম্পানি আমার হয়ে গেলো! এ মশায় সরকারী ব্যাপার, কারুর একার কোম্পানি নয়।'

'কি সব বাজে কথা বলছো।' পাশ থেকে একটি ভারিক্কিমতন লোক এসে গুরুপদকে উদ্ধার করে, 'কি দরকার বলুন তো?'

গুরুপদ এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে বলার সুযোগ পায়। এবং এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে।

ভারিক্কিমতন লোকটি সব মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর গুরুপদকে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা কত নম্বর বাসে হারিয়েছে বলুন তো?'

'ঠিক বাসেই হারিয়েছে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য আমি যথেষ্ট নিশ্চিত নই। তবে বাসের নম্বরটা হোলো...'গুরুপদ যে রুটে এসেছিলো সেই রুট-নম্বরটা বললো।

কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। ভদ্রলোক রুট-নম্বর নয়, যে বাসে গুরুপদ এসেছে সেই বাসের নম্বরটি কি তাই জানতে চাইলো। এর উত্তরে ঘাড় চুলকানো ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। গুরুপদ তাই করলো, কেননা কে বাসের নম্বর টুকে রাখে, কিই বা প্রয়োজন?

সে যা হোক, বাসের নম্বর বলতে পারলেও বিশেষ কোন সুবিধা হতো বলে মনে হলো না। কেননা গুরুপদ তখনই জানতে পারলো যে বাসে যাই হারাক এখানে তা পেলেও ফেবত দেয়া হয় না, তা ফেবত পেতে হলে যেতে হবে ডালহৌসি স্কোয়ারে লস্ট প্রপার্টি অফিসে।

গুরুপদ হাল ছাড়লো না। লস্ট প্রপার্টি অফিসের ঠিকানাটি কোন রকমে সংগ্রহ করে নিয়ে তখনই রওনা হলো সেই অফিসের দিকে।

অফিস পৌঁছাতে ততক্ষণ বেলা তিনটে। এনকোয়ারিতে একজন মহিলা বসে রয়েছেন। গুরুপদ কয়েক মিনিট দাঁড়ানোর পর তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন। একবার গুরুপদব মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হারিয়েছে?'

গুরুপদ বিনীতভাবে জানালো।

'থানায় ডায়েরির কপি কই?' ভদ্রমহিলা সুরঞ্জিত কয়েকটি নখাগ্র কাউন্টার-পথে নিক্ষেপ করলেন।

গুরুপদ জানাতে বাধ্য হলো যে থানায় কোনো ডায়েরি নেই।

'তা হলে তো হবে না। আপনার যে জিনিস হারিয়েছে এবং সেই জিনিসই যে আপনার তার প্রমাণ কি? যে এলাকায় হারিয়েছে সেই এলাকার থানায় একটা ডায়েরি করে নকল নিয়ে আসতে হবে আর এই একটা ফর্ম নিন, এটা পূরণ করে দিন।'

ভদ্রমহিলা একটি ছাপানো ফর্ম এগিয়ে দিলেন।

গুরুপদ জিজ্ঞেস করলো,'আচ্ছা আমি তো বাসে চড়ে গিয়েছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। সে প্রায় তিন চারটে থানার এলাকা দিয়ে বাস গেছে। কোন্ থানায ডায়েরি করতে হবে?'

'আপনি একটু বসুন।' ভদ্রমহিলা দ্রুত পদক্ষেপে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। বসবাব কোন বন্দোবস্ত নেই, বসতে গেলে ভদ্রমহিলার পরিত্যক্ত আসনে গিয়ে বসতে হয়, গুরুপদ তাই দাঁড়িয়েই রইলো।

ভদ্রমহিলা ফিরলেন একটু পরে, 'দেখুন আমি আপনাকে সঠিক বলতে পারছি না, আসলে এটা অনীতাদির কাজ। অনীতাদি আজ ক'দিন আসছেন না, ওঁর ভাইয়ের বিয়ে কিনা। আমাকেই ওঁর কাজ করতে হচ্ছে। আব কেউই কিছু বলতে পারছে না। আপনি এক কাজ করুন, সব থানাতেই একটা করে ডায়েরি করুন না।'

যেন ব্যাপারটা খুবই সহজ এই রকম মুখভাব রেখে গুরুপদ জানতে চাইলো, 'তারপরে চাবি কি নাগাদ পাওয়া যাবে?'

'চোদ্দদিন পরে খোঁজ নেবেন। অবশ্য ততদিনে অনীতাদি ফিরে আসবেন। অনীতাদি এখানেই বসবেন, দেখলেই চিনতে পারবেন। এই আমার চেয়ে আরেকটু কালোমতন...'

ভদ্রমহিলা আরো কি সব বলতে যাচ্ছিলেন, গুরুপদ কোন কিছুতে কান না দিয়ে একটি দ্রুত নমস্কারে কক্ষত্যাগ করে পথে অবতরণ করলো। ভদ্রমহিলা বিশেষ নিরাশই হলেন বলে মনে হোলো, তাঁর যেন আবো কি কি বলার ছিলো।

পথে নেমেই সামনে একটা ঝাল-মুড়ি-ওয়ালা। যেন গুরুপদর জন্যেই দাঁড়িয়েছিলো। 'ঝাল বেশি কবকে, পেঁযাজ বেশি কবকে আর মুড়ি বেশি করকে—'চার আনা কো'। গুরুপদ আদেশ দিয়ে একটা গাছের নিচে মাথাটা সূর্যের আক্রমণ বাঁচিয়ে দাঁড়ায়। এটা কলেরা ঋতু। দোকানের ওমলেট পর্যন্ত গুরুপদ খায় না—কিন্তু কোন কোন সময় মহামাবীও তুচ্ছ মনে হয়। গুরুপদর এখন সেই সময়। চাব আনার ঝালমুড়ি হাতে করে লালদীঘির ভেতরে গিয়ে বসলো গুরুপদ। দাম দেয়ার সময় নোট বের করতে গিয়ে সেই ভদ্রমহিলাব দেযা হারানো-প্রাপ্তির দরখাস্ত ফর্মটা কখন পকেটে রেখে ছিলো, সেটা হাতে এসেছিলো, তাই হাতে করে গুরুপদ পা ছড়িয়ে বসলো। একবার ফর্মটার ওপরে চোখ বুলিয়েই বুঝলো, পৃথিবীর আর দশটা ফর্ম পূরণ করাব মতই এ ফর্ম-ও পূরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

হাবানো জিনিস ফিরিয়া পাইবার আবেদনপত্র

(দ্রব্য প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ১৯৫৮ সালেব XVII নং আইনের গ ধাবা মতে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনকারী নাবালক বা উম্মাদ হইলে অভিভাবক (গার্জিয়ান) বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রাধিকারিক কর্তৃক এই আবেদনের যৌক্তিকতা গ্রাহ্য হইবে)

১। নাম—

পূর্বনাম—আপনাব পূর্বে কি নাম ছিলো? যাহারা নিজেদের পূর্বনাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য।

২। পিতাব নাম—

পিতার পূর্বনাম—যাঁহাদের পিতা পূর্বনাম পরিত্যাগ কবিযাছেন তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য।

পিতা মৃত কি জীবিত ? কেন?

৩। ঠিকানা --

পূর্ব বাসস্থান

বর্তমান বাসস্থান

আপনি কি গত সাত বৎসরের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়াছেন, যদি করিয়া থাকেন সমস্ত ক্ষেত্রে বিশদ ঠিকানা দিতে হইবে।

৪। ভারতীয় উন্মাদ আইন অনুসারে আপনাকে কি কখনো উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল? যদি হইয়া থাকে, কেন? ঘোষণাপত্রের তারিখ ও নম্বব।

৫। আপনি কি কখনো কোন আদালতের বিচারে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন? যদি হইয়া থাকেন, কি অপরাধে, কত দিনের জন্য, কোন্ জেলে ছিলেন?

৬। (ক) যে জিনিস হারাইয়াছে বলিয়া আপনি ভারতীয় হৃত-অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইনের ১৭(ক) ধারামতে এই আবেদন করিতেছেন সেই জিনিসটির বিশেষ বিবরণ ঃ

(এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে যে যাহাতে জিনিসটি দেখামাত্র বোঝা যায় এবং কোন প্রশ্ন না ওঠে।)

(খ) যে জিনিসটি হারাইয়াছে তাহা আপনি ইতিপূর্বে আরো হারাইয়াছেন কি ?

(গ) যদি (খ) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে নিম্নলিখিত ঘরগুলি পূরণ করুন ঃ

(অ) কতবার হারাইয়াছেন?

(আ) প্রত্যেক বারই ফেরত পাইয়াছেন কি?

(ই) ইতিপূর্বে যতবার হারাইয়াছেন ততবারই ফেরত পাইয়াছেন কি ?

(ঈ) পাইয়া থাকিলে কোথায় পাইয়াছেন?

(উ) কিরূপে পাইয়াছেন?

(ঊ) কখন পাইয়াছেন?

৭। যে জিনিস হারাইয়াছেন তাহার মূল্য কত ?

পূর্ব মূল্য কত ছিল?

বর্তমান মূল্য আনুমানিক কত ?

(যদি দশ টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্য হয় তবে ২২ ধারামতে দুই টাকার স্ট্যাম্পসমেত দরখাস্ত করিতে হইবে। প্রকৃত উদ্বাস্তু দরখাস্তকারীদের ক্ষেত্রে রিফিউজি সার্টিফিকেট দৃষ্টে এই স্ট্যাম্প ফি মাফ হইতে পারে। রিফিউজি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়ীকৃত নকল দাখিল করিতে হইবে।

৮।............................

আট, নয়, দশ এই রকম টানা বাইশ ঘর পূরণ করতে হবে। সাত নম্বর ঘর পর্যন্ত পৌঁছেই গুরুপদর মাথা রিমঝিম করতে লাগলো। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো পৃথিবীর আর সমস্ত ফর্মের মতই এ ফর্ম পূরণ করা অসম্ভব। এই ফর্ম যে পূরণ করতে পারে সে হারানো জিনিস ফিরে পায়, নির্ধনের ধন হয়, বেকারের চাকরি হয়, উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হয়। কিন্তু অসম্ভব, আর দু-এক ঘর পড়লেই গুরুপদ অজ্ঞান হয়ে যেতো সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।

সুতরাং আর কোন গত্যন্তর নেই। গুরুপদ একটা ফেরত বাস ধরে বাড়ির দিকে রওনা হয়। কিন্তু বাড়িতে ফিরেই বা কি হবে? যে বাড়ির দরজা বন্ধ আর সেই দরজার চাবি নেই, সে বাড়িতে ফেরাও যা আর পথে পথে পার্কে ময়দানে ঘুরে বেড়ানোও তাই। গুরুপদও তাই করলো। রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরলো। একবার ভাবলো রাত্রে একটা পার্কে শুয়েই কাটাবে। কিন্তু বাড়িতে তো একসময়, আজ হোক কাল হোক ফিরতেই হবে। একটা তালাচাবিওয়ালা ধরতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু এত রাত্রে কোথায় পাওয়া যাবে? সেটা সময়মত খুঁজলে হতো। এখন যারা এত রাত্রে তালা খোলে, যে কোনো দরজার তালা খুলতে পারে, তারা কেউই প্রকাশ্যে খোলে না। আর ব্যর্থ অনুসন্ধানে ব্যস্ত না হয়ে গুরুপদ বাড়ির দিকেই পা চালালো।

গুরুপদর শেষ একটা ক্ষীণ আশা ছিলো যে হয়তো গিয়ে দেখবে দরজা বন্ধ করেই সে আদৌ বেরোয়নি। খোলা দরজায় তালা ঝুলছে দেখতে পাবে। কিন্তু দরজা নিতান্তই বন্ধ আর তার তালা ঝুলছে, বেশ ভালো ভাবেই ঝুলছে।

অমলাদের ফ্ল্যাটটার দিকে তাকায় গুরুপদ। আলো জ্বলছে না। এত সকাল সকাল অমলার ঘরের আলো নেভে না কোনোদিন। হয়ত দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে সিনেমাই দেখতে গেছে রাত্রের শোতে। তাহলে পাশের বাড়িটা থেকেই হাতুড়িটা চাইতে হয়। হাতুড়িটা চেয়ে আনল। কিন্তু পুরোনো আমলের লোহার তালা অত সহজে ভাঙা সম্ভব নয়। লোহার তালাটাকে ঈশ্বরের

মতন, বা প্রায় খোদাতালার মতই সর্বশক্তিমান মনে হল গুরুপদর। দুমদাম, ঠুক্‌ঠাক ক্রমাগত শব্দ হতে লাগল, আশপাশের ফ্ল্যাটবাড়ির লোকেরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফেলল, একটা বাচ্চা ছেলের কান্না শোনা গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে ঘামে স্নান করতে আরম্ভ করল গুরুপদ। হাতটা ক্রমাগত হাতুড়ি সমেত ওঠানামা করতে করতে ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ। শেষ পর্যন্ত ওর মনে হল, হাত আর হাতুড়ির তফাতটা বোধ হয় আর একসময় থাকবেই না। তখন শুধু হাত দিয়েই ঠুকে ঠুকে তালা খোলা যাবে। হাত আর হাতুড়ির মারাত্মক বিয়োগফলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা প্রায় খেঁতলে গেল। অন্ধকারে রক্ত দেখা যায় না, গেলে থেমে যেত গুরুপদ, তালে তালে তালার ওপর হাতুড়ি ঠুকত না আর। গুরুপদ জীবনে এই প্রথম চোরদের জন্যে মমতাবোধ করল এবং একাত্মতাও। চোরেরা কাউকে না জানিয়ে তালা ভাঙে কিন্তু গুরুপদ পাড়াসুদ্ধ লোক জানিয়ে দরজাটাই ভেঙে ফেলল শেষ পর্যন্ত। তালাটা তেমনি ঝুলছে, ডান দিকের দরজার পাল্লা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। ঘরের ভেতরে বড় আয়নাটা, টেবিল-ল্যাম্প সব চুরমার। তবু ভাল, দরজা ভাঙলে ওপরের বাল্‌ব ভাঙে না। সন্তর্পণে আলোটা জ্বালে। আলোটা জ্বালতেই রক্ত দেখল এবং রক্ত দেখেই সটান বিছানায় মাথা ঘুরে শুয়ে পড়ল। খানিক পরেই অমলার গলা শুনল গুরুপদ। কোত্থেকে ফিরল যেন। বুড়ো আঙুলটার জন্যে তুলো আর ন্যাকড়ার প্রয়োজন, অমলার গলা শুনেই যেন অনুভব করে সে। কোন রকমে বুড়ো আঙুলটা চেপে অমলাদের ফ্ল্যাটের দিকে এগুলো গুরুপদ। অমলার ঘরে আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে খেঁতলানো আঙুলের ব্যথাটা ও যেন ভুলে গেল। আবার অমলা নীল শাড়ি পরেছে। খাটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে বাতাসে গাল পেতে চুল খুলছে। পেছন থেকে পায়ের পাতা, কোমর, বাঁকানো গ্রীবা এই সব দেখতে দেখতে কখন দরজার কড়া নেড়ে, অমলার ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে নিজেই টেরই পেল না।

—ও কি, ও কি হয়েছে আপনার আঙুলে? ওর হাতের দিকে তাকিয়ে বিছানা থেকে ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ে অমলা।

—হাতুড়ি ! আর কিছু বেরুল না গুরুপদর গলা দিয়ে। অতি তীব্র একটি দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখও বন্ধ করে ফেলল। নীল শাড়ির খানিকটা ছিঁড়ে ফেলেছে অমলা, তুলো, ডেটল আনিয়েছে চাকরটাকে দিয়ে। কোমল, নরম একটা স্পর্শে গুরুপদ চোখ খুলে দেখল হাল্কা এক টুকরো নীল আকাশকেই যেন ডান হাতে পেয়ে গেছে সে।

—চলুন আপনার ঘরে চলুন। ইস, একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলেছেন!

গুরুপদর ঘরে এসে অমলা অবাক।

—এ কি কাণ্ড দরজা ভাঙা, ঘরময়—

—মানে ঐ চাবিটা পাচ্ছিলাম না কিনা, তাই...কাতর কণ্ঠে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, অমলার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। নীল শাড়ির মধ্যে হঠাৎ অমলার মুখটা কেমন লাল হয়ে উঠল, মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে গুরুপদকে প্রায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়া গলায় বলল অমলা।

—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। সত্যি ভীষণ অন্যায়...মানে আজ সকালে বেরুনোর সময় আপনি দরজায় তালা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, চাবিটা—

গুরুপদ স্পষ্ট দেখতে পেলো, ধীরে ধীরে কাঁধ থেকে নীল শাড়ির ছেঁড়া আঁচলটা টেনে তার চাবিটা খুলে দিচ্ছে অমলা।

গুরুপদর প্রবল ইচ্ছে হল চীৎকার করে বাধা দেয় অমলাকে, কিন্তু অমলাই শেষ পর্যন্ত আর খুললো না।

—থাক আমার কাছেই থাক, আপনি তো আর এক হাতে চাবি দিতে পারবেন না।

ঘুমোতে ঘুমোতে গুরুপদ সেদিন একটা হাজারদুয়ারী বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিল।

আরশোলা এবং নিদারুণ বার্তা

রুদ্রনারায়ণ আচার্য মহাশয় বিভাগপূর্ব বঙ্গদেশের এমন একটি জেলায় বাস করিতেন যেখানে আরশোলাকে তেলাচোরা বলা হইয়া থাকে। আরশোলাই আমাদের বর্তমান গল্পের বিষয়বস্তু। তাই পূর্বাহ্নে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করিয়া লইতে হইতেছে।

প্রথমে আচার্য মহাশয়ের পরিচয় প্রদান আবশ্যক। দেশে আচার্য মহাশয়ের বিরাট নারিকেল এবং সুপারি বাগান ছিলো। নারিকেল এবং সুপারি বাগানের সুবিধা এই যে, এই প্রকার ফসল বৎসর বৎসর চাষ করিতে হয় না। কোনো পরিশ্রম নাই, লবণাক্ত মাটির আর্দ্রসৌজন্যে অপর্যাপ্ত ফলন হয় এবং যথাকালে শুকাইয়া মাটিতে পড়ে। কোনো এক পরিশ্রমী পূর্বপুরুষের কল্যাণে বৎসর বৎসর পায়ের উপর পা তুলিয়া বংশধরদের চলিয়া যায়। যাহা কিছু পরিশ্রম বা অর্থব্যয় এই ফসলগুলি পাড়িয়া নামাইবার।

আচার্য মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। এই নামাইবার জন্যও তিনি কোনোরূপ পরিশ্রম বা লোক নিয়োগ করিতেন না। যতদিন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকরী আছে, শুকাইয়া ঝুনা হইলে নারিকেল-সুপারি আপন আগ্রহেই ভূমিতলে খসিয়া পড়িবে, তাহার জন্য অপব্যয় করা একান্তই নিরর্থক।

এই সময়ে একবার তাঁহাকে আয়কর কমিশনের সঙ্গে দেখা করিতে হয়। আবেদন ছিলো, এবার আয় ভালো হয় নাই, কিছু আয়কর পরবর্তী বৎসরে প্রদানের অনুমতি দেওয়া হউক। আয়কর সাহেব দেখিলেন, লোকটি আয়কর কমাইতে বলিতেছে না, শুধু সময় চাহিতেছে, কি মনে হইল, প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার ফসল কম হলে আয়কর কম হবে, তুমি সময় চাও কেন, আয়কর কমাবার জন্য প্রার্থনা করো।'

আচার্য মহাশয় ঘাড় চুলকাইয়া বলিলেন, 'ফসল ঠিক কম হয়েছে তা নয়, তবে এবার হাওয়া বড় কম।'

সাহেব অবাক, 'হাওয়া কম!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', আচার্য মহাশয় জানাইলেন, 'এই হাওয়া লেগে শুকনো নারকেল-সুপারি মাটিতে পড়ে, এবার সেটা একটু কম পড়ছে।'

ইহার পরে কি হইয়াছিলো তাহা এই কাহিনীর বিষয় নহে, তবে এই একটি প্রাক্তন ঘটনার উল্লেখ এইজন্য করিলাম যে, ইহাতে শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ আচার্যের সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে।

দেশ বিভাগের পরে আচার্য মহাশয় প্রথমেই কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এই সময়েই টালিগঞ্জ থানার অপিসঘরে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

আমরা ছাদে কাপড় মেলিয়া দিলে বিকালে যখন শুকাইয়া যাইত তখন আমাদের পরবর্তী প্রতিবেশী গোপনে সেগুলি একটি হোসপাইপ দিয়া ভিজাইয়া দিতেন। ইহাতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইত। এবং প্রথম প্রথম সবই সহ্য করিতাম, বস্তুত বুঝিতেই পারিতাম না কেন আমাদের বস্ত্রাদি সারাদিনের রৌদ্রেও শুকাইত না। অবশেষে একদিন আমার কনিষ্ঠ ভাগিনেয় মাতুলালয়ে বেড়াইতে আসিয়া নিকট প্রতিবেশীর এরূপ গর্হিত কার্য আবিষ্কার করিয়া ফেলে। আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রতিদিন রাত্রে পাঁচফোড়নের তরকারি খাইতে লাগিলাম। সায়াহ্নবেলায় যখন প্রতিবেশীদের বাড়িতে সঙ্গীতশিক্ষক আসিতেন, সেই সময়ে তিনি যে ঘরে বসিয়া সঙ্গীত শিক্ষাদান করিতেন সেইমুখী আমাদের বারান্দায় যথাসমারোহে পাঁচফোড়নের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইত। ব্যঞ্জনের ঝাঁজে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের নাসারন্ধ্রে এবং কণ্ঠদেশে যে আকৃতি উপস্থিত হইত তাহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও সঙ্গীত ওষ্ঠাগত হইত না। কিন্তু ইহাতেও কিছু হইল না। একদিন আমাদের অসাবধানতার সুযোগে শীতের অপরাহ্ণে তাহারা আমাদের লেপগুলি ভিজাইয়া দিল।

বাধ্য হইয়া থানায় ডায়েরি করিতে আসিয়াছিলাম, দেখিলাম এক প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবল আবেগে ফুঁসিতেছেন। তাঁহার সামনে মোটা ধুতি ও নীল কোট পরিধানে এক ব্যক্তিকে পুলিশ ধরিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির এক হাতে বর্শা এবং অন্য হাতে একটি প্রজ্বলিত পেট্রম্যাক্স। কিছুক্ষণ পরে বুঝিলাম এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রথম ব্যক্তির সঙ্গী বা রক্ষী। প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ আচার্য মহাশয় কিছুতেই সন্ধ্যাবেলায় রাস্তায় পেট্রম্যাক্স এবং আলোবাহক একজনকে অগ্রবর্তী না রাখিয়া বাহির হইতে পারেন না, ইহা তাঁহার বহুকালের অভ্যাস। তদুপরি ইহা দ্বারা, আচার্য মহাশয়ের মতে, কোনোরকম আইনভঙ্গ হয় নাই। বর্শা অস্ত্র আইনে পড়ে না। বর্শার ফলা মাত্র ছয় ইঞ্চি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু যুক্তি তিনি প্রবল রোষে প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে আমাকে সাক্ষী মানিতে লাগিলেন।

থানা অফিসার বিবেচক ছিলেন। সব শুনিয়া তিনি আচার্য মহাশয়কে বলিলেন, 'কলকাতা, শহরে যথেষ্ট আলো। পেট্রম্যাক্স কি কাজ করবে আর এখানে রাস্তায় সাপ, শুয়োর, বুনো শেয়াল কিছুই নেই যে একজন বর্শাবাহী লাগবে। আপনি আজ যান কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম করবেন না।'

কি ভাবিয়া আমিও সেদিন আর থানায় কোনো ডায়েরি না করিয়া চলিয়া আসিলাম, আচার্য মহাশয়, তাঁহার রক্ষী এবং আমি তিনজনেই এক সাথে রাস্তায় নামিলাম।

পথে চলিতে চলিতে আলাপ হইল। আচার্য মহাশয় আর যাহা হউক লোক খারাপ নহে। তাঁহার কথাবার্তায় বুঝিলাম যে, তাঁহার আর কলিকাতায় থাকিবার মোটেই বাসনা নাই। দেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছে, সেখানেও ফেরা সম্ভব নহে, কলিকাতারই কিছু দূরে গঙ্গাতীরে কোথাও বাড়ি করিয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতে চান।

কি কারণে জানি না, আচার্য মহাশয় আমার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, এখনো করেন, নিয়মিত তাঁহার খবর পাই।

আচার্য মহাশয় সম্পর্কে এই পর্যন্ত পাঠ করিয়া যদি কাহারো কোন ভুল ধারণা গঠিত হইয়া থাকে তাঁহাকে এখনই বলিয়া রাখা ভালো, আচার্য মহাশয়ের বুদ্ধির অভাব কখনোই ছিলো না।

বর্ধমানের দিকে গঙ্গার ধার ঘেঁষিয়া বিঘা দেড়েক জমি লইয়া বাড়ি প্রস্তুত করিলেন। বাড়ির

পিছনে গঙ্গা-সংলগ্ন নীচু জমিতে প্রথমে কচুব চাষ করিলেন, প্রচুর কচু ফলিল। কিন্তু একটি কচুও বিক্রয় না করিয়া, না খাইয়া সেইখানে পঞ্চাশটি শূকর কিনিয়া পুষিতে লাগিলেন। শূকরের অত্যাচারে এবং নোংরায বাড়ির এবং পাড়ার লোক অস্থির হইয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শূকরের দুগ্ধের কারবার শুরু করিলেন। প্রচারপত্রে লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইলেন শূকর-দুগ্ধ যে-কোনো দুগ্ধ হইতে বেশি উপকারী। কিন্তু একাধিক কারণে এই ব্যবসা চলিল না। প্রথমত বহু বিজ্ঞাপন দিয়াও শূকবী দুহিবার যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেলো না। অবশ্য আচার্য মহাশয় শেষভাগে নিজেই দুহিতে লাগিলেন কিন্তু ক্রেতার বড অভাব হইল। বিশেষ কেহ শূকরের দুগ্ধপানে উৎসাহী হইল না।

ফলে কচুক্ষেত এবং শূকরপাল অন্তর্হিত হইল। এইবার ঐ নিচু জমিতে তিনি পেঁপে গাছ লাগাইলেন, প্রচুর ফলিল। কাঁচা পেঁপেগুলি কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তারপর চূর্ণ কবিয়া একপ্রকার মশলা প্রস্তুত করা হইল। নাম দেওযা হইল 'হজমি মশলা'। এই দুষ্ট পাকস্থলীর দেশে সেই মশলা কেন যে জনপ্রিয় হইল না তাহা অনুধাবন করিতে একান্তই ব্যর্থ হইয়া আচার্য মহাশয় প্রায় ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন।

শূকর-দুগ্ধ এবং হজমি মশলা উভয় দ্রব্যই আমাকে খাইতে হইয়াছিল। আচার্য মহাশয়ের অনুরোধ এবং আগ্রহে আমি তাঁহার বাড়িতে একাধিকবার গিয়াছি।

সম্প্রতি এক পত্র পাইয়া জানিতে পাবি যে, তিনি এখন একটি বিশেষ গবেষণায় ব্যস্ত আছেন। পত্রের পরে পরেই কয়েকটি এক্সপ্রেস চিঠি এবং দুটি তারবার্তা পাইলাম, আমাকে চলিয়া আসার জন্য বিশেষ অনুরোধ। বিগত কয়েকবারের অভিজ্ঞতা ভালো নহে, তবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

আচার্য মহাশয়ের বাড়ির সদরে তাঁহাব ভ্রাতুষ্পুত্রী করতোয়াব সহিত সাক্ষাৎ হইল। আচার্য মহাশয় চিরকুমার। এই বৃদ্ধ বয়সে এই ভ্রাতৃ-কন্যাটি তাঁহার একচ্ছত্র সঙ্গিনী। আমাকে দেখিয়া করতোয়া স্মিতহাস্য করিল, 'আপনি তাহলে এসে গেলেন!' সে আমাকে কয়েকবারই দেখিয়াছে, তাহার জ্যেঠামহাশয়ের এই অনুগ্রাহকটিকে বিশেষ মমতার সঙ্গে দেখে।

আমি প্রশ্ন করিলাম—'এবার কি?'

মৃদু হাসিয়া করতোয়া জবাব দিল, 'আরশোলা।' ইতিপূর্বে শূকব-দুগ্ধ এবং হজমি মশলা খাইয়া গিয়াছি, আরশোলা শুনিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভাবিলাম তখনই ফিরিয়া যাই। করতোয়া বোধহয় আমার মনোভাব বুঝিতে পাবিল, বলিল, 'ভয় নেই, আসুন। আবশোলা খেতে হবে না।'

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইব, এমন সময় আকস্মিক গুলির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। তাকাইয়া দেখি একতলার চিলেকোঠার ছাদে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া আচার্য মহাশয় বন্দুকের আওয়াজ করিতেছেন। কি লক্ষ্য করিয়া করিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

করতোয়াকে আবার প্রশ্ন করিতে হইল। করতোয়া বলিল, 'জ্যেঠামশায় পাক্ষিক 'নিদারুণ বার্তার' সম্পাদক নিবারণ সামন্তের বাড়ির দিকে ফাঁকা আওয়াজ করছেন। 'নিদারুণ বার্তায়' ওঁর একটা থিসিসের যাচ্ছেতাই সমালোচনা করা হয়েছে। সে যাহোক, ভয়ের কিছু নেই।'

একটু পরেই আচার্য মহাশয় নামিয়া আসিলেন, ভীষণ উত্তেজিত। সেই টালিগঞ্জ থানায় প্রথমদিন যেরকম দেখিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া কিছুটা শান্ত হইলেন। কিছুক্ষণ কুশল-

প্রশ্নাদি করিয়া ভিতরের ঘরে গিয়া একতাড়া কাগজ লইয়া আসিলেন। তাহার পরে করতোয়াকে ডাকিলেন, 'করতোয়া মা, এটা একবার পড়ে শোনা তো!'

পিতৃব্যের আজ্ঞাতে আমার দিকে তাকাইয়া একটু মুচকি হাসিয়া নিয়া করতোয়া পড়িতে লাগিল। প্রবন্ধটিব নাম 'কেশ-চর্চা এবং আরশোলা'। অত দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া লাভ নাই। সারাংশ এইরকম ঃ

'আরশোলাকে কোথাও কোথাও তেলাচুরা বলা হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, ইহা মাথা হইতে নিদ্রাকালে তেল শুষিয়া লয়। অনেক সময় চুলও খাইয়া ফেলে। যে স্থানের চুল খায় সেখানে আর চুল গজাইতে চাহে না। ইহা প্রায় সকলেই জানেন।

'আরশোলার যখন এবম্বিধ প্রকৃতির পরিচয় মানুষ মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, ইহাকে অনায়াসেই মানুষের কাজে নিয়োগ করা যাইতে পাবে। রজক, ক্ষৌরকার ইত্যাদি বাবদ প্রত্যেক গৃহস্থেরই এদেশে যথেষ্ট ব্যয় হয়। কিন্তু বিলাত ইত্যাদি দেশে কাপড় কাচিবার যন্ত্র, এমন কি দাড়ি কামাইবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে।

'আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে এইগুলি খুবই ব্যয়সাধ্য। সকলেব ব্যবহার করিবার আর্থিক যোগ্যতা নাই।

'জীব-জন্তুকে শিক্ষিত করিয়া নানাবিধ কার্য সম্পাদন করা যায়। বানর, হাতি, ঘোড়া, কুকুর, এমন কি পাখিও নানা কাজ করিতে পারে। আবশোলাকেও উপযুক্ত ট্রেনিং দিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোন কার্য অসম্ভব নহে। যথাসময়ে মাথায় ছাড়িয়া দিলে উপযুক্ত পরিমাণ চুল খাইয়া লইলেই চুল কাটার কাজ হইয়া যাইবে। প্রথম দিকে শিশুদের মাথায় ছাড়িয়া এবং গায়ে সুতা বাঁধিয়া মাথায় ঠিকমত চালাইলে পরে ভালো কাজ পাওয়া সম্ভব।

'এক-একটি আবশোলা গড়ে নয়মাস বাঁচে, অর্থাৎ একটি সামান্য আরশোলা নয়বার চুল কাটা এবং দুইশত সত্তর বার (যাঁহাবা দৈনিক দাড়ি কামান) দাড়ি কামানোর খরচ বাঁচাইতে পারিবে। .'

করতোয়া যখন প্রবন্ধটি পাঠ করিতেছিলো, প্রত্যেক অংশ শুনিতে শুনি ত আচার্য মহাশয়ের মুখভাব উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিলো। আমার প্রায় কিছুই বলিবার ছিলো না। শুধু জানিতে চাহিলাম, 'এইরূপ ট্রেনিংপ্রাপ্ত কোনো আরশোল ...'

আচার্য মহাশয় আমাকে বাক্য সম্পূর্ণ করিতে দিলেন না। একটি কাঁচের বাক্স বারান্দা হইতে লইয়া আসিলেন। তাহাতে দশ-পনেরোটি আরশোলা এবং একটি প্লেটে অল্প একটু দুধ রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'প্লেটে কি, দুধ?'

উপরের ছাদে আরেকটি খাঁচা আনিবার জন্য আচার্য মহাশয় উঠিয়া গিয়াছিলেন, করতোয়া ছিলো, সেই জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, দুধ খেলে ওদের বুদ্ধি হবে।' আচার্য মহাশয় ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে করতোয়ার কথা ধরিলেন, দুধ হলো স্নেহ পদার্থ, এতে বুদ্ধি হবে। তবে তেলই ওদের খাদ্য, তবে সেটা দিলে মাথার চুলের তেল আর ওরা খেতে চাইবে না।

সন্দেহ নাই, অকাট্য যুক্তি। কিন্তু স্থানীয় পাক্ষিক 'নিদারুণ বার্তা'র মূর্খ সম্পাদক নিবারণ সামন্ত আচার্য মহাশয়ের এই গবেষণাকে পাগলামি বলিয়া হাসি-তামাসা করিয়াছে। আজ সকালেই 'নিদারুণ বার্তা'র বর্তমান সংখ্যা আচার্য মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। পাঠ করিয়াই ছাদে উঠিয়া নিবারণ সামন্তের বাড়ির দিকে মুখ করিয়া তিনবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ

করিয়াছেন।

আরশোলার বুদ্ধি এবং নিবারণ সামন্তের বুদ্ধির অভাব বিষয়ে আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সেইদিন সারা দুপুর আলোচনা করিয়া বৈকালে করতোয়ার সঙ্গে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিলাম। কথা দিয়া আসিলাম, সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আবার আসিব। আরশোলা দিয়া চুল কাটাইয়া যাইব। ততদিনে আরশোলাগুলি উপযুক্ত শিক্ষিত হইবে এইরূপ আশা করা গেলো।

কিন্তু দুই সপ্তাহ লাগিল না। আচার্য মহাশয় গুরুতর অসুস্থ, করতোয়ার নামে প্রেরিত এক তার পাইয়া সাতদিনের মধ্যে আবেকবার যাইতে হইল।

আচার্য মহাশয়ের বিরূপ সমালোচনা করিবার পর নিবারণ সামন্ত একটু মর্মপীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তাহা ছাড়া 'নিদারুণ বার্তা'র নয়জন ক্রেতার মধ্যে আচার্য মহাশয় একজন। তাই তিনি একদিন আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে একটি আপোস-রফায় আসিবেন ইচ্ছায় একদিন তাঁহার বাড়িতে আসেন। সামন্ত মহাশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় এইবার আরশোলা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিতে থাকেন। সামন্তকে দেখিয়া আচার্য মহাশয় প্রথমে উত্তেজিত হইলেও পরে তাঁহার আচরণের পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। আরশোলাগুলিকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা খাঁচা খুলিযা দেখাইতে যান। কিন্তু ইতিমধ্যে দুধ-ক্ষীর ইত্যাদি স্নেহপদার্থ খাইয়া আরশোলাগুলি যে ভীমরুলের প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে, ইহা সামন্ত বা আচার্য মহাশয় কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। খাঁচা খোলামাত্র পনেরোটি দুর্দান্ত আরশোলা তাঁহাদের দুইজনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। করতোয়া ঝাঁটা লইয়া ছুটিয়া না আসিলে সেইদিনই বোধ হয় এই দুইজনকেই আরশোলার দংশনে প্রাণত্যাগ কবিতে হইত।

বর্তমানে সামন্ত ও আচার্য মহাশয় দুইজনেই স্থানীয় হাসপাতালে পাশাপাশি শয্যায় চিকিৎসিত হইতেছেন। দুজনেরই মুখ এত ফুলিয়া গিয়াছে যে প্রথম দর্শনে কে নিবাবণ সামন্ত আব কে রুদ্রনারায়ণ আচার্য ঠাহর করা কঠিন।

করতোয়াকেও একটি আরশোলা দংশন কবিয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছু হয নাই, শুধু গণ্ডদেশ কিঞ্চিৎ রক্তিম ও স্ফীত হইয়াছে।

একটি অখাদ্য গল্প

আমার এ পথে হাঁটা আবার বন্ধ করতে হবে। মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিলাম। আজ সকালবেলাতেই প্রথম লক্ষ্য করলাম বাণী শাড়ি ধরেছে। প্রথম বয়সের শাড়িতে মেয়েটাকে ভালোই দেখাচ্ছিলো, এর দিদিদের মতোই বলা যায় কিংবা তাদের চেয়েও-রাণী, মণি দুজনের চেয়েই হয়তো একটু বেশীই সুন্দরী, কিন্তু আমাকে এ পথে হাঁটা বন্ধ করতে হবে।

আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সদরে ট্রামরাস্তার এইটাই সোজা পথ, কিন্তু আবার সেই বাড়ির পেছন ঘুরে সেই উল্টোপথ, সেইটাই ধরতে হবে। না, বয়স হয়েছে আর ধাক্কা সামলাতে

পাববো না। মনে মনে প্রথম যৌবনের সেই দুঃসাহসী দিনগুলির কথা ভাবতে একটু বেদনা, একটু দুঃখও যেন হচ্ছিল। তখন কত কি করা যেতো, ওর দিদিদের রাণী-মণিদের আমি থোড়াই তোয়াক্কা করেছি। কিন্তু বয়েস কিছু বাড়লো, একটু সমঝে চলতে হবে।

'খোকনদা, এই খোকনদা..,কখন থেকে ডাকছি, মোটেই সাড়া দিচ্ছ না'! বুকটা আঁতকে উঠলো। পিছনে ফিরে দেখি যাকে এড়ানোর জন্যে এত পরিকল্পনা এত বুদ্ধির মারপ্যাঁচ, ঘোরালো সড়ক, সেই মেয়েই ছুটতে ছুটতে প্রায় পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। গরমের দিনের সকাল বেলা। এইটুকু ছুটে এসে কপালে ঘামের ফোঁটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে কয়েকটা স্বচ্ছ তরল স্বেদবিন্দু। শাড়ির বিব্রত বেসামাল ভঙ্গিটা, সব মিলিয়ে বাণীকে যেন অস্বীকার করা যায় না। আমার বুক কাঁপতে লাগলো। আমি জানি, জানি এখনি অথবা আগামী কাল ও সেই মারাত্মক প্রস্তাব করবে, এই শাড়ি পরার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব সেই আমন্ত্রণের অধিকার ওর জন্মেছে একদিন ওর দিদিদের মতই।

রাণী-মণির হাত থেকে আমি পরিত্রাণ পাইনি, এবারেও হয়েতো পাবো না। কিন্তু আর কতকাল! আর বাণীই যদি শেষ হতো তাহলে হয়তো চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়া যেতো। কিন্তু আরো ছোট, আরো ছোট – অনেক, বাণীব বোনেদের সংখ্যা অর্থাৎ ভুবনবাবুর, আমার প্রতিবেশীর, মেয়েদের সংখ্যা আমি গুনে দেখিনি, হয়তো ভুবনবাবুও গুনে দেখেননি। এরা প্রত্যেকে বড় হবে, প্রত্যেকেই মণি-রাণী-বাণীর মত একদিন পল্লবিনী হবে কিন্তু কতকাল, আর কতকাল আমি তাদের প্রথম অভিজ্ঞতার শিকার হবো। মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছে কিন্তু এইটুকু মেয়ের সামনে সেটা দমন করতে হলো।

'খোকনদা, একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে? তুমি কতদিন আমাদের বাসায় আস না। মা বলছিলো, ছোড়দি সেদিন শ্বশুড়বাড়ি থেকে এসেছিল, তোমার খোঁজ করলে। আমি তোমাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। তুমি বাসায় ছিলে না। বাতদিন বাইরে বাইরে কোথায় এত টো টো করে ঘোরো!' বেশ পাকা গিন্নির মত কথা বলতে লাগলো বাণী। তারপর হঠাৎ কথা ঘুবিয়ে বললো, 'দ্যাখো আমি শাড়ি পরেছি, বেশ ভালো দেখাচ্ছে না!' বলেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়লো, কথাটা একটু ঘুরিয়ে শাড়ির আঁচলটা বাঁ হাতের একটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললো, 'বাবা কিনে দিয়েছে, শাড়িটা বেশ সুন্দর, তাই না!'

এসব কথায় আমার কোন আপত্তি নেই, আমি শুধু মূল প্রস্তাবটির আশঙ্কা করছিলাম, বললাম 'শাড়িটা বেশ সুন্দর, আর তুমিও মন্দ না।'

একটু মুখ ঘুরিয়ে হেসে ফেলে বাণী বললো, 'কিন্তু তুমি কবে আসবে আমাদের বাড়িতে? মুখে বললাম, 'যেদিন আজ্ঞা করবে সেদিনই।' মনে মনে অন্য কুমতলব ভাঁজতে লাগলাম। তখনকার মত বাণী চলে গেলো।

যদিও ধরেই নিয়েছিলাম যে আজ-কালের মধ্যেই বাণী আসবে, আর আসবে সেই সাংঘাতিক মর্মান্তিক প্রস্তাব, কিন্তু সে যে এত তাড়াতাড়ি সেটা আশা করিনি। পরদিন সকালে ঘুম থেকে আমি উঠি সাড়ে নটায়, তখন ছটা--মানে আমার মধ্যরাত্রি, সেই সময়ে হাঁকাহাঁকি দরজায় কড়া নাড়া, প্রায় ভেঙে ফেলবার উপক্রম। উঠে দরজা খুলতে হলো। 'খোকনদা, বড়দি এসেছে। আজ শেষ রাত্রিতেই ফিরেছে।'

দেখি একটু পিছনে রাণী দাঁড়িয়ে। কাটিহার না কোথায় বিহারের দিকে ওর বিয়ে হয়েছে।

'আরে এসো এসো,' বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হয়। বলতে বলতে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি। ওরাও পিছে পিছে আসে। 'তা আজকেই ফিরছো রাণী, কেমন? শ্বশুড়বাড়ির খবর কি?' যে খবরগুলি না জেনেও অন্যান্য দিনের মতো আজকের দিনটাও কেটে যেতে পাবতো, সেইগুলিই জানবার জন্যে আমাকে এই মুহূর্তে ভদ্রতার খাতিরে বিশেষ উৎসাহ দেখাতে হয়। রাণী এতসব প্রশ্নের উত্তরে একটু মুচকি হাসে। 'আজ সকালেই ফিরলে? ফিরেই সাত-তাড়াতাড়ি আমার এখানে ছুটলে, মন কেমন করছিলো?'

এইবার রাণী যেন একটু গম্ভীর হলো, পাশের টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে আলগোছে পাতা ওল্টাতে লাগলো। বাণী কিন্তু এর মধ্যেই একটু ফিক্ করে হেসে ফেললো। রাণী ধমকে উঠলো, 'থাম ফাজিল কোথাকার!' আসলে ধমকটা আমার উদ্দেশেই। সুতরাং আমাকে নিরত হতে হলো। এবং সেই মুহূর্তেই লক্ষ্য করলাম রাণী আর বাণী দুইজনে চোখে চোখে কি একটা কথা আলোচনা করে নিলো। আমার অন্তরাত্মায় আমি অনুভব কবলাম আমি অবিলম্বে সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মুখোমুখি হবো।

এইবার বাণী কথা বললো, 'দিদি আজই ফিরে যাচ্ছে। ওর দেওরের বিয়ে, কিছু কেনাকাটি করতে হবে। তারপর রাত্রেই ফিরে যাবে।'

'সে কি, আজকেই ফিরে যাবে?' আমাকে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হতে হয়।

এইবার রাণী বললো, 'হ্যাঁ, আর সেইজন্যেই— তুমি অনেকদিন আমাদের বাসায় যাও না, আজ দুপুরে আসবে, ওখানেই খাবে।' এবং বাণী যোগ করলো, 'জানো খোকনদা, আমি রান্না করবো। আমি কেমন সুন্দর রান্না করতে শিখেছি।'

আমার মাথায বজ্রাঘাত হয়। যা ভেবেছি ঠিক তাই হলো। রাণী-মণির বেলায় যা হয়েছে, এবারও বাণীর বেলাতে তাই হলো। বাণীর প্রথম রান্না, তার স্বাদ আমাকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করতে হবে। আমিই এদের এই প্রাণহরা অভিজ্ঞতার সবচেয়ে সুলভ শিকার। যা এড়াবো বলে কালকেই মনে-প্রাণে প্রতিজ্ঞা করেছি, এই দুই তরুণী প্রতিবেশিনীর সামনে কিছুতেই সেটা করা যাবে না সেটা আমি এখনই বুঝলাম। না, আমাব পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে আবার সেই একই দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে।

এই তো রাণী আমার সামনে বসে রয়েছে। সাধারণ সুন্দরী, নববিবাহিতা। চেহারায়, আচরণে একটা স্মিত কোমলতার ছাপ রয়েছে। কিন্তু একে দেখলে কে বুঝতে পারবে এর হাত দিয়েই বেরোতে পারে হাত-বোমার চেয়েও মারাত্মক সেই সব খাবার। সেই মানকচুর চপ। শরীর এখনো রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। যাঁরা আমাকে সম্প্রতি চেনেন, তাঁরা জানেন না, চিরকাল আমার কণ্ঠস্বর এমন ছিল না। এককালে আমি আপনাদের মতই, সাধারণ মানুষদের মতই, কোমল কণ্ঠস্বরে কথা বলতে পারতুম। কেউ কি বিশ্বাস করবে, করা কি সম্ভব যে তোমার সেই অমায়িকতা এই একটি কোমল-দর্শনা যুবতীর হাতে নিহত হয়েছে!

তবে রাণীর চেয়ে মণি আরো সাংঘাতিক ছিলো। এই পৃথিবীতে অনেক খাদ্যদ্রব্য নিশ্চয়ই আছে এবং আমরা সকলেই সেরকম খাবার লোভে পড়ে বা বিপদে পড়ে গ্রহণ করে থাকি যার জন্যে যকৃৎ, প্লীহা বা অন্ত্রাশয়ে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন মণির তৈরী এক ধরনের পরটা খেয়ে আমার হাঁটুতে, কাঁধের জোড়াতে এবং দাঁতের

মাড়িতে ভয়ঙ্কর ব্যথা হয়েছিলো, দুহাতের শিরা এক সপ্তাহ ফুলে ছিলো, একুশ দিন অফিস যেতে পারিনি। জোড়াসন হয়ে মেজেতে খেতে বসেছিলাম। এদের বোনেদের এবং মায়ের অনুরোধে উপরোধে, বলা উচিত বলপ্রয়োগে, হাঁটু গেড়ে মেজেতে কাঁধের ও হাতের শিরায় শিরায় এবং দাঁতের মাড়িতে শরীরের সমস্ত শক্তি নিবিষ্ট করে পর পর চারটে খণ্ড গলাধঃকরণ করতে হয়েছিলো এবং খেয়ে আর উঠতে পারিনি, মেজেতেই শুয়ে পড়েছিলাম। এদের ধারণা সেটা ভোজনাধিক্যবশত, আমার ধারণা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য রোগশয্যায় মণি আমাকে বলেছিলো, 'খাবারটা অবশ্য ভালোই হয়েছিলো, কিন্তু খোকনদার অতটা খাওয়াব কি দরকার ছিলো?'

এবং মণির কাছেই তার প্রস্তুত প্রণালী শুনেছিলাম। এখন ঠিক স্পষ্ট মনে নেই, তবে এই ঘটনার প্রতি সন্দেহশীল পাঠকদের (এবং পাঠিকাদের) একটু নমুনা দিচ্ছি। ধৈর্য সহকারে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। প্রথমেই বলা উচিত যে পবটাগুলি গম বা যব, এমন কি কোনো শস্যবীজ থেকেই তৈরী হয়নি, এগুলি ফলজাত। আবেকটু খোলসা করলে হয়তো ভালো হয়। আমের আঁটিব ভেতরের সাদা সার গুঁড়ো করে কাঁঠালেব বিচির সঙ্গে সেটা সেদ্ধ করে রোদ্দুরে শুকানো হয়। তারপব জল দিয়ে চটকে মেখে আবার শুকনো বোদ্দুরে শুকানো হয়। তারপর একে উপাদেয় করবার জন্য কিঞ্চিৎ মশলা এবং খাদ্যপ্রাণযুক্ত করবাব জন্যে পুঁইশাক নিংড়ে তার রস দিয়ে আবার শুকানো হয়। বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং মণির উদ্ভাবনী শক্তি দুই-এ মিলে এই মারাত্মক পবিণতি।

সেই রাণী-মণিব বোন বাণী, তার হাতের রান্না খেতে হবে আমাকে আবার আজ দুপুরে। এবং আমি আবার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলাম, ওদের সেই ছোট ছোট বোনেরা যারা প্রতিদিন বড হচ্ছে এবং কাল হোক, পবশু হোক, শাড়ি পরা শুরু করবে আর আবার সেই সঙ্গে সেই রান্না আর আমি। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। একটা কিছু কোনো একটা প্রতিবিধান, একটা প্রতিকার করতেই হবে। বছরের পর বছর এই অত্যাচার আর নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আমি নিজেকে ঠেলে দিতে পাবি না। আজ আবার আমাব সেই প্রভুভক্ত কুকুরটির কথা মনে পড়লো। রাস্তা থেকে এনেছিলাম বাচ্চা অবস্থায়, তারপরে শত অপমানে, প্রহারেও গৃহত্যাগ করেনি। মণি একবাব এক ধবনের পোলাও তৈরী কবেছিলো। কি দিয়ে তৈরী করেছিলো বলতে পারবে না, কিন্তু তৈরী কবে একটা ঠোঙায় করে রুমালে বেঁধে দিয়ে বলেছিলো, 'খোকনদা, এটা নিয়ে যাও। আজ খেয়ো না। দু-একদিন পরে খাবে। যত বাসি হবে ততই মুখরোচক হবে।' খাবাবটি বাসায় এনে আমার টেবিলের উপর রেখেছিলাম, পরদিন সকালে সেই ঠোঙাটি মুখে করে আমার প্রিয় কুকুরটি হঠাৎ ঘবের বাইরে চলে গেলো, সেই যে গেলো, আর এলো না, চিরদিনের মত নিরুদ্দেশে হয়ে গেলো। পরে একবার পাড়ার বাইরে বহুদূরে একটা বাস্তায় হঠাৎ কুকুরটি দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে দেখেই এত ভীত, আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে গেলো যে বলার নয়।

সুতরাং, আর অত্যাচাব সহ্য করা যায় না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। আমি মরিয়া হয়ে উঠি।

যথাসময়ে মধ্যাহ্নকাল এলো, আমাকে উঠতে হলো, বাণীর ছোট জনাচারেক দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাকে নিয়ে যেতে। ভালো করে স্নান করলাম, মাথাটি এই গুরুতর সঙ্কটে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা থাকা দরকার। তারপর পায়ে পায়ে গুটি-গুটি এগুনো গেলো ওদের বাড়ির দিকে।

গিয়ে দেখি ত্র্যহস্পর্শ যোগ। মণিও এসেছে, বললো, 'দিদি এসেছে খবর পেয়ে চলে এলাম।' আমি বললাম, 'তা বেশ। তুমিও রান্না করলে নাকি? না সবই বাণী? মণি বললে, 'আমি একটা মাত্র তৈরী করেছি, শুধু মশল্লা দিয়ে, শুধুই মশল্লা আর কিছু নয়, একটা মশল্লা চচ্চড়ি।' 'মশল্লার সঙ্গে জিনিসটা কি দিলে, কি দিয়ে চচ্চড়িটা হলো? আমি একটা ছোট প্রশ্ন করি। মণি জানায়, 'আরে বলছি, তো শুধু মশল্লা দিয়ে আর কিছু নেই, ধনে-মৌরি সেদ্ধ করে তার চচ্চড়ি, যেমন ডাঁটা চচ্চড়ি, মাছের চচ্চড়ি, তেমনি ঠিক ধনে-মৌরি চচ্চড়ি।' 'শুধু ধনে-মৌরি ?' তবুও আমার সংশয় দূর না হওয়ায় মণি অসম্ভব ধমকে ওঠে। 'আগে খাও, খেয়ে বলো।' ইতিমধ্যে বাণী এসে উপস্থিত। কপালে কালি, হাতে হলুদের দাগ, শাড়ির আঁচলেও, বিশেষ ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। এসেই প্রশ্ন করলো, 'কাঁচকলার মধ্যে নুন থাকে, জানো খোকনদা?' আমি কাতর-কণ্ঠে জানাই, 'থাকা স্বাভাবিক।' 'সেই কাঁচকলা গরম জলে কুচি কুচি করে সেদ্ধ করে তার থেকে নুন বের কবে নিয়েছি। তারপর সেই জল দিয়ে আর সব রান্না করেছি, আলাদা করে নুন দেওয়ার দরকার কবেনি।' বাণীর কথা শুনে আমি অভিভূত এবং মণি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে, রাণীও এসে যোগ দেয়। ওরা এরকম কোনদিন ভাবতেই পারেনি বাণী এই পনেরোতেই যেটা করে ফেললো। ওরা বোনের জন্যে বিশেষ গর্বিতও হতে থাকে। সবচেয়ে ছোট একটি বাচ্চা ঘরের কোণে বসে পুতুলের রান্নাবান্না করছিলো খুব মন দিয়ে। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে মণি বললো, 'দেখছো, কেমন মনোযোগী। ও বাণীর চেয়েও সবেস হবে।'

ইতিমধ্যে ওদের মা চলে আসেন। এসেই হাঁকডাক শুরু করে দেন। এখনি জায়গা করে দাও, আর দেরী করো না। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সে আর খাবারই থাকে না।

সুতরাং খেতে বসতে হলো। বিচিত্র বর্ণগন্ধ-সমন্বিত অপূর্ব খাদ্যদ্রব্য আমার চতুর্দিকে। তাকালেই চোখে জল আসে জিভ শুকিয়ে যায়। অনুমান কবি, এত প্রযোজন ছিলো না, এব যে কোনো একটিই কালান্তক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মুখেও তাই বলি, 'এত করাব কি ছিলো, অল্প দু-একটা রান্না করতে পাবতে। তোমরা এত পরিশ্রম কবলে।' বলতে বলতে একসঙ্গে সবগুলি তরকারী ধীরে ধীরে অল্প অল্প কবে মেশাতে থাকি। এই নীল রঙেব পটলেব ডালনাটাব সঙ্গে ঐ সাদা ধবধবে দুধ দিয়ে বাঁধা মাংসেব ঝোলটা, তাব সঙ্গে লাল টকটকে মুগেব ডাল মেশাতেই একটা আশ্চর্য নতুন বং দেখা দিলো। যেমন খাবারটায় তেমনি বোনেদের ও মায়ের মুখে। এবার আমি এগুলো সব চটকে মাখি, ভাত মেশাই দলা পাকাই। 'এই দলাটা রাণী খাবে' মণি খাবে,'এই দলাটা। এইভাবে এক এক-জনের নামে এক-একটা দলা পাকিয়ে আলাদা করে রাখতে থাকি। ওরা এক-একজনেব নাম হতেই আঁতকে আঁতকে উঠতে থাকে।

'খোকনদা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি! আমরা রান্না করেছি, আমরা তো খাবোই। তুমি খাও।'

এইবার আমি উঠে দাঁড়াই। 'আজ আর আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।'

'কেন কি হলো?' ওরা সবাই কত হতাশ হয়ে পড়ে, কেমন ক্লান্ত করুণ দেখায় ওদের। আমি অনেকটা থিয়েটারের অভিনেতার মতো উদাত্ত কণ্ঠে বলে যাই, আজ তোমাদের বাণীর এই সব রান্না দেখতে দেখতে আবার আমার মণির রান্নার কথা, রাণীর রান্নার কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো সব কতদিন আগের কথা, সেই কবে ছোটবেলায় পুরী গিয়েছিলাম।'...

2768
Fund
AGARTALA
17.4.10

'পুরীর সঙ্গে, তোমার পুরী যাওয়ার সঙ্গে আমাদের রান্নার সম্পর্ক কি ? মণি প্রশ্ন করে।

এতক্ষণে আমি আমার জুতোজোড়ার মধ্যে পা গলিয়ে দরজার কাছে গিয়ে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াই, 'তোমাদের রান্না, তোমাদের প্রত্যেক বোনের রান্না খেতে খেতে আমার আবার পুরীর সমুদ্রতীরের কথা বারবার মনে পড়ে। আহা, সেই শৈশব, নীল সমুদ্র, বনরাজিনীলা। বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মত আমার কণ্ঠস্বর ওদের মুগ্ধ করে ফেলে, বুঝি আমার প্রাক্তন কণ্ঠের কোমলতা আবার ফিরে আসে আমার স্বরে, আমি বলে যাই তোমাদের প্রত্যেকটি খাবারে সেই পুরীর সমুদ্রতীরের স্বাদ আবার ফিরে পাই। ঠিক তেমনই লবণাক্ত, তেমনই বালুকাকীর্ণ তোমাদের প্রত্যেকটি রান্না যেমন লোনা তেমন বালি কিচকিচে। এর উপরে ভ্রমণ করা যায় কিন্তু গলাধঃকরণ করা যায় না। পুরীর সমুদ্রতীরের সেই ভ্রমণের এত সহজ আনন্দ থেকে কলকাতার লোকদের আমি বঞ্চিত কবতে চাই না।' এই বলতে বলতে সমস্ত খাবাবগুলো আমি দ্রুতবেগে রাস্তার দিকে হাত বাড়িযে ছুঁড়ে দিই, নিজেকেও ছুঁড়ে দিই রাস্তায়। ছুটে যাই সেই খাবারগুলোব উপব দিয়ে— লবণাক্ত বালুকাকীর্ণ রাস্তার উপর দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে পুবীর সমুদ্রতীরের ভ্রমণের আস্বাদ ফিরে পাই।

একটি আদ্যোপান্ত দুর্ঘটনা

এ বাসটায় খুব ভিড়। অবশ্য সব বাসেই খুব ভিড় আজকাল। শনিবার রবিবার, সকাল-বিকেল কিছু নেই, সব সময়েই লোক উপচিযে পড়ছে; বাসে, রাস্তায়, বাজারে, সিনেমায়। এত লোক কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কোথায় যায়, কেন যায়, রাতে কোথায় ঘুমায়?

নির্মলা লেডিস সিটের এক প্রান্তে বসে এই সব ভাবছিলেন, ক্রমশ বাসটা যত ধর্মতলার দিকে এগোচ্ছিল, বাসে ভিড বেড়েই যেতে লাগলো। নির্মলা বসে বসে আরও ভাবছিলেন, এই রবিবাবে সন্ধ্যাবেলায় এত লোক ধর্মতলায় কি করতে যাচ্ছে? এরা সবাই কি ময়দানে বেড়াতে যাচ্ছে, অথবা চৌরঙ্গীতে ফুর্তি করতে চলেছে ? কিন্তু এদের দেখে তো সেরকম মনে হয না, বেড়ানোর বা ফূর্তি করার লোকের চেহারা, সাজ-পোশাক, এমন কি মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায়।

কলকাতার উত্তরে এক মফঃস্বল শহর থেকে এই বাসটা সরাসরি ধর্মতলা পর্যন্ত চলে আসে। এর যাত্রীদের অধিকাংশের চেহারা ও চালচলনে সেই মফঃস্বলী ছাপ। এই সব বহিরাগত প্রাইভেট বাসের যাত্রীদের মোট চেহারা প্রায় একবকম। স্টেট বাসের লোকদের চেহারা একটু আলাদা, তাতে খাস কলকাতার ছাপ। এই পার্থক্য চোখে দেখে যতটা বোঝা যায়, বলে বোঝানো কঠিন। সেই একই রকম লম্বা-ফর্সা, বেঁটে-কালো, নাইলন-টেরিলিন, হ্যাণ্ডব্যাগ-সানগ্লাস— কিন্তু কোথায় একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ রয়ে গেছে যা শুধু চোখের নজরে ধরা পড়ে। নির্মলা এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছেন, ইতিমধ্যে বাস প্রায় বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে; নির্মলা উঠেছেন শ্যামবাজারের মোড় থেকে। ইতিমধ্যে অনেক লোক নেমেছে এবং তার চেয়ে বেশি লোক উঠেছে। ভাগ্যক্রমে প্রায় উঠেই নির্মলা সামনে একটা লেডিস সিট খালি পেয়ে যান, এবং নির্মলা এখন সেখানেই বসে আছেন।

সিটে বসেও অবশ্য নিস্তার নেই। ক্রমবর্ধমান জনমণ্ডলীর প্রচণ্ড চাপ নির্মলার সামনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের হাঁটু বাহিত হয়ে বারে বারে নির্মলার হাঁটুতে এসে লাগছিল। এমন একটা কোণার দিকে নির্মলা বসেছেন যে ইচ্ছে হলেই হাঁটুটা সরিয়ে রক্ষা করতে পারবেন তার কোন উপায় নেই।

নির্মলার হাঁটুর উপর চাপ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিলো, তিনি বিরক্ত হয়ে সামনের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালেন। ঠিক সাদা ভাষায়, কলকাতায় যাদের ভদ্রলোক বলে তেমন নয়, গ্রাম্য গৃহস্থ চেহারা, মোটা ধুতি মোটা শার্টে গলায় আধময়লা সুতির চাদর, বয়স বছর পঞ্চাশ বা কিছু কমের দিকেই হবে। ভদ্রলোকটিকে মৃদু তিরষ্কার করতে গিয়ে নির্মলার একটু বরং মায়াই হলো, এঁর কোনো দোষ নেই, ইনি নিতান্তই অসহায়। আ-দরজা যাত্রিসাধারণের অদম্য চাপ কেন্দ্রীভূত হয়ে এঁর হাঁটুর উপরে পড়ছে, তারই কিছুটা ইনি চালান করে দিচ্ছেন নির্মলার হাঁটুতে, তবু তো নির্মলা বসে, ইনি ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাসটা ইতিমধ্যে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে এসে গেছে, এইখানে আর একটা প্রচণ্ড ভিড়ের ধাক্কা সৃষ্টি হলো, নামলো মাত্র একজন লোক, উঠবার চেষ্টা করছে শতাধিক লোক। নির্মলার সামনে দাঁড়ানো যে ভদ্রলোক এতক্ষণ নির্মলার হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করছিলেন, এবার তিনি সত্যি সত্যি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাস তীব্রগতিতে ছাড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটলো।

প্রাইভেট বাসগুলোর জানলার উপরে ছাদ বরাবর লাল-নীল কাঁচের জাফরি লাগানো থাকে। সেইখানে হাতের চাপ রেখে নির্মলার হাঁটুতে আরেকটু চাপ ফেলতে গিয়ে হঠাৎ উপবের জাফরির কাঁচ ভেঙে একসঙ্গে ভদ্রলোকের বাঁ এবং ডান হাতের দশটা আঙুল সেই জাফরির মধ্যে ঢুকে গেল। জাফরি থেকে ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো ঝরঝর করে ভেঙে নির্মলার মুখের উপর পড়তে লাগলো, সেই কাঁচের টুকরোগুলি সব রক্তে রক্তময়, এর উপরে ভদ্রলোকের আঙুল-কাটা রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় প্লাবিত করে দিলে নির্মলার চোখ, মুখ, মাথার চুল।

সে এক বীভৎস দৃশ্য। ভদ্রলোক একবার আর্ত চীৎকার করেই নির্মলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দ হয়ে গেলেন। বাসের লোকেরা প্রচণ্ড হই হই শুরু করে দিলো, নির্মলার মাথা, শরীর, শাড়ি সমস্ত রক্তে আর কাঁচে মাখামাখি, সবাই 'রোক্‌খে' 'রোক্‌খে' করে বাস থামিয়ে ফেললো।

অন্যের গায়ের রক্ত নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে, ঠোঁট দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর মাথায়, ঘাড়ে কিছু ধারালো কাঁচের টুকরো, নির্মলা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিন্তু বাসের লোকেরা তাঁকে হতভম্ব হওয়ার অবকাশ দিলো না, সামনেই মেডিক্যাল কলেজ, কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই মিলে হই-হই করে মেডিক্যাল কলেজের সদর দরজার ভিতর দিয়ে একেবারে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে এনে পুরো বাসটাকে দাঁড় করালো। কয়েকজন ছুটে ইমার্জেন্সির ভিতরে চলে গেলো, আর কয়েকজন পাঁজাকোলা করে নির্মলাকে সামনের একটা খালি হুইল-চেয়ারে বসিয়ে দিলো। বাকি সবাই নির্মলার ওই রক্তাক্ত মুখশ্রী দেখে, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে' বলে কলরব করতে লাগলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় নির্মলার তখন বিপর্যস্ত অবস্থা, সত্যিই তাঁর কি হয়েছে, কোথাও সত্যি কেটেটেটে গেছে কি না তাও বুঝতে পারছিলেন না। একটু দূরেই সেই গ্রাম্য ভদ্রলোক

দাঁড়িয়ে তাঁর অবস্থা আরো নিদারুণ, তাঁর হাত দিয়ে তখনো দরদর করে রক্ত পড়ছে, কিন্তু কেউই সেটা খেয়াল করছে না, তিনি একা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন, তাঁর হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে, বোধ হয় এতটা রক্তক্ষরণের জন্যেই।

হুইল-চেয়ার ঠেলে নির্মলাকে ইমার্জেন্সির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একজন প্রৌঢ় প্রশাসনের গর্তে পড়ে পা ভাঙা এবং একজন মিনিবাস চাপা পড়া লোকের পর্যবেক্ষণ করছিলেন দুজন তরুণ ডাক্তার। নির্মলার রক্তময় মুখ দেখে তাদের ফেলে তাঁরা ছুটে এলেন। এসেই প্রথমে নার্সকে ডেকে তাড়াতাড়ি ধুয়ে মুছে ড্রেসিং করতে বললেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

ডাক্তারেরা যখন শুনলেন 'বাসে,' স্পষ্টই ধরে নিলেন বাস থেকে পড়ে গিয়ে রাস্তায় মাথা থেঁতলে গিয়েছে; সবাই চুপ করুন, চুপ করুন, বাইরে দাঁড়ান, এটা হাসপাতাল, গোলমাল করবেন না, বলে নার্সের ড্রেসিং শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওই প্রান্তে তখন পা-ভাঙ্গা এবং চাপা-পড়া লোক দুজন ভীষণ কোঁকাচ্ছে এবং বাইরে সিঁড়ির উপরে বসে সেই গ্রাম্য ভদ্রলোক, তার রক্ত পড়া তখনো থামেনি।

এদিকে যে নার্স নির্মলাকে ড্রেসিং করে ধোয়াতে-মোছাতে গিয়েছিলেন, তিনি যত রক্ত মোছেন তারপর আর কিছুই পান না কোথাও, শুধু রক্ত আর রক্ত, দু-একটা কাঁচের টুকরো, কিন্তু কোথাও একটা কাটা নেই, একটু ছড়ে যাওয়া পর্যন্ত নেই।

বিব্রত নার্স ডাক্তারদের ডাকলেন। ডাক্তারেরা এসেও অবাক। তাঁরা ভাবলেন, তা হলে বোধ হয় নাক বা মুখ দিয়ে এত রক্ত বেরিয়েছে, কিন্তু সে রক্ত কপালে, মাথায় চুলে লাগবে কি করে? কিছুক্ষণ বিমূঢ়তার পর একজন ডাক্তার নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রক্ত এলো কোথা থেকে?' নির্মলা বললেন, 'এ রক্ত আমার নয়, অন্য লোকের রক্ত।' উত্তর শুনে ডাক্তারদ্বয় এবং নার্স স্তম্ভিত হয়ে নির্মলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তাঁদের চোখেমুখে প্রচণ্ড সন্দেহের ছায়া। একটু পরে একটু সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি আলোচনা করে একজন এসে কঠিন কণ্ঠে নির্মলাকে বললেন, 'আপনার কিছুই হয়নি। যান, বাড়ি চলে যান।'

হাসপাতাল থেকে ধমক খেয়ে নির্মলা বেরিয়ে এলেন। বউবাজারে চলেছিলেন দিদির বাড়িতে। আর বউবাজারে গিয়ে দরকার নেই, সাতটা বেজে গেছে, রাত্রির শো-য় সিনেমার টিকিট কাটা আছে, গিয়েই তৈরী হতে হবে। বি টি রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে চললেন নির্মলা।

বাসায় ফেরার পর নির্মলার স্বামী মহাদেব সব শুনে তো হই-চই লাগিয়ে দিলেন, 'তুমি যে রকম বোকা।' নির্মলা যত বলেন, 'আমি কি করবো?' মহাদেব আরো ক্ষেপে যান 'কি সাংঘাতিক, এখনো তো কানে, ঘাড়ে রক্ত লেগে রয়েছে, কার না কার রক্ত, ছি ছি ছি।'

নির্মলারও ঘেন্না করছিলো, বাথরুমে গিয়ে ভালো করে সাবান মেখে স্নান করলেন। কিন্তু মহাদেব অত সহজে ছাড়বার লোক নন, 'কার কি ইনফেকশন আছে কে জানে, কার কিরকম রক্ত, হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষা করালে না কেন?' নির্মলা বলেন, 'অন্যের রক্ত আমি কি পরীক্ষা করাবো?' অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হলো পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে নির্মলা সমস্ত মুখ, ঘাড়, পিঠ কোনো লোশন দিয়ে মুছে ফেলবে। কিন্তু ডেটল খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো, শিশিতে একবিন্দু ডেটল নেই। এদিকে সিনেমার সময় হয়ে এসেছে, দোকানে গিয়ে ডেটল

কিনে আনতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। এ ছাড়া বাসায় কোনো অ্যান্টিসেপটিক লোশন নেই। পাশের ফ্ল্যাটে খোঁজ করতে গেলেন নির্মলা, তাদের মলমের ব্যবসা, নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানেও কিছু নেই, তবে তাদের কাছে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল, যাকে 'র অ্যালকোহল' বলে তা কয়েক বোতল আছে, তাই দিয়ে নাকি সব মলম তৈরী হয়। আধ শিশি তাই নিয়ে এলো নির্মলা।

মহাদেব তো অ্যালকোহল দেখে উত্তেজিত, 'দাও অর্ধেক আমি খাই, অর্ধেক তুমি মাখো।' শেষ পর্যন্ত সত্যি অর্ধেক জল মিশিয়ে মহাদেব খেলেন, বাকি অর্ধেক নির্জলা নির্মলা মাখলেন। প্রথমে নির্জলা মাখতে তিনি রাজী হননি, কিন্তু মহাদেব জোর করলেন, 'জল-টল মিশিয়ো না, এইভাবে মাখো, সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে যাবে।'

অ্যালকোহল মাখবার ও পান করার পর মহাদেব-নির্মলা দম্পতি বেরোলেন সিনেমা দেখতে। ওই বিশুদ্ধ তরল পদার্থ মাখবার পর থেকে কিকরম অস্বস্তি বোধ করছিলেন নির্মলা। সিনেমা হলে বসে নিউজ-রিল শেষ হয়ে আসল বই আরম্ভ হওয়ার আগেই নির্মলার মুখে-চোখে কিরকম একটা ব্যথা করতে লাগলো। আলগোছে মুখের উপর হাত বোলাতে বুঝতে পারলেন ফোস্কা উঠছে; ক্রমশ ফোস্কা উঠতে লাগলো; ফোস্কা আরো ফোস্কা, আরো ফোস্কা।

ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলতেই চমকে উঠলেন মহাদেব। নির্মলার মুখমণ্ডল ফোস্কায় ছেয়ে গেছে, যেগুলো সদ্য উঠেছে সেগুলো গোলাপী রঙের, পরের গুলি টকটকে লাল আর কতকগুলি এরই মধ্যে কাল্‌চে রঙ ধরেছে।

সিনেমা আর দেখা হলো না। মহাদেব আঁতকে লাফিয়ে উঠলেন, 'সর্বনাশ, তোমার মুখের কি অবস্থা হয়েছে!' প্যাসেজ দিয়ে দ্রুত বেরোতে বেরোতে লম্বা টানা আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নির্মলা নিজেও অস্থির হয়ে উঠলেন, 'কি সাংঘাতিক !'

হল থেকে বাইরে এসে মহাদেব ট্যাক্সি ডাকলেন, 'এই চলো মেডিক্যাল কলেজ।'

নির্মলা মেডিক্যাল কলেজের কথা শুনে কি একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ব্যথা-যন্ত্রণায় তখন তিনি অস্থির।

মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সির সামনে আবার এসে ট্যাক্সি দাঁড়ালো। আবার সেই একই ওয়ার্ড, ডাক্তার দুজন এবং নার্স এখনো অপরিবর্তিত। নির্মলাকে দেখে এবার তাঁরা চমকে উঠলেন, সন্ধ্যায় যাঁর রক্তাক্ত মুখ দেখে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন, এখন তাঁর মুখে নানা বর্ণের, নানা আকারের ফোস্কা। এবার কিন্তু তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে মনঃস্থির করে ফেলেছেন, একজন এগিয়ে এসে নির্মলাকে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই না সন্ধ্যাবেলায় রক্ত মেখে এসেছিলেন?' নির্মলা ক্ষীণ কণ্ঠে কি উত্তর দিলেন বোঝা গেলো না। 'এবার ফোস্কা লাগিয়ে এসেছেন?' পরের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। নির্মলার জবাবের জোর নেই, মহাদেব নির্বাক। অবশেষে পিছন থেকে নার্সটি কাংস্যকণ্ঠে বললেন, 'এসব চালাকি এখানে চলবে না।'

নির্মলা আর মহাদেব গুটি গুটি বেরিয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে। ব্যথায় যন্ত্রণায় নির্মলা তখন অস্থির, তারই মধ্যে দেখতে পেলেন সেই গ্রাম্য ভদ্রলোকটি বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে পড়ে রয়েছে, তাঁর হাতের তালুতে চাপ চাপ রক্ত জমাট ধরে তখন কালো হয়ে গিয়েছে, তবে নতুন করে আর রক্ত পড়ছে না।

গরুর গল্প

দীনদয়ালবাবুর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে তিনি মানুষ নন গরু। নানা ব্যাপারে ঠকে অনেকে নিজেকেই গরু ভাবে, কেউ কেউ অতিবুদ্ধিমান অন্যদের গরু ভাবে, কিন্তু দীনদয়ালবাবুর ব্যাপারটা এত সামান্য বা সাধারণ নয়। যদিও তাঁর লেজ নেই, তিনি দুধ দিতে পারেন না বা মাঠে হালচাষ করতে পারেন না, দীনদয়ালবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস গরু হিসাবে তাঁর এই সব অযোগ্যতার জন্যে সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর জনক-জননী দায়ী এবং আসলে তিনি দেহে-প্রানে সর্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণই গরু।

প্রথম প্রথম সবাই যখন একটু-আধটু বুঝতে পারলো যে দীনদয়ালবাবু নিজেকে গরু ভাবছেন, কেউ ব্যাপারটাকে তত গুরুত্ব দেয়নি। দীনদয়ালবাবু কাউকে বিরক্ত করতেন না, বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকতেন, অফিসেও যেতেন। কেউ তাকে ঘাঁটাতো না, তিনিও কাউকে ঘাঁটাতেন না। আদালত কাছারিতে এরকম লোক অনেক যায়, সবাই তাদের মেনে নেয়। কেউ নিজেকে সিরাজদৌল্লা ভাবে, বার্ণাড শ ভাবে। এক বড়বাবু ছিলেন, তিনি নিজেকে রানী ভিক্টোরিয়া ভাবতেন। শাসনকর্ত্রীর যোগ্য রাশভারিয়ানা এবং রমণীসুলভ ব্রীড়ার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিলো তাঁর চরিত্রে। আরেক আবগারির দারোগা নিজেকে ধরে নিয়েছিলেন হাওড়া ব্রিজ, কোনো অসুবিধা ছিলো না। সব সময়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে লম্বা হয়ে হাঁটতেন, হাওড়া ব্রিজের মত টানটান, দুদিকে দুটো হাত সমবাহু ত্রিভুজের মত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি প্রসারিত। তবে কোনোদিন বেশি পান-টান করলে ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে যেতো রাত্রির দিকে, তখন গাড়ি-ঘোড়া, লোকজনের চাপে হাওড়া ব্রিজের খুব কষ্ট হতো।

সে যা হোক, দীনদয়ালবাবুকে নিয়ে বিশেষ কোনো অসুবিধা ছিলো না। তাঁকে দেখলে অচেনা লোকের বুঝবার ক্ষমতা ছিলো না যে তিনি একটি আস্ত গরু। কিন্তু ক্রমশ নতুন উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো। একদিন অফিসের কবিডোরে যেতে যেতে হঠাৎ তারস্বরে হাম্বা-হাম্বা করে চিৎকার করে উঠলেন। বড়সাহেবের খাস আর্দালি উমানাথ, তাদের বংশে সকলের হার্টের অসুখ, সে টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ ঘুমের মধ্যে অফিসের বারান্দায় গরুর ডাক শুনে ঘেমে-টেমে শেষ হয় আর কি ! অফিসের লোকেরা এইই চায়—অফিস ছুটি হয়ে গেলো। একদল লোক উমানাথকে স্ট্রেচারে চড়িয়ে অ্যাম্বুলেন্স করে হার্টের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো, বাকিরা জোরজবরদস্তি করে ট্যাকসিতে উঠিয়ে দীনদয়ালবাবুকে নিয়ে গেলো মাথার ডাক্তারের কাছে।

মাথার ডাক্তার হালদার সাহেব অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। বহুদিনের অভিজ্ঞতা তাঁর। অনেক রকম মাথার অসুখ তিনি দেখেছেন। অনেক বাঙালী-অবাঙালী স্ত্রী-পুরুষ, সাহেব-চিনেসাহেব-ছিনেসাহেব অনেকের চিকিৎসা তিনি করেছেন। কলকাতা শহরে তিনিই একমাত্র মানসিক চিকিৎসক যাঁকে একুশবার পাগলে কামড়িয়েছে। শতকরা দশজন পাগল চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে একবার ডাক্তারকে কামড়াতে যায় এবং কামড়াতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। তাই পাগলের ডাক্তারদের প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত হয় কতবার পাগলে কামড়িয়েছে তাই দিয়ে। বলাই

বাহুল্য, আমাদের এই হালদার সাহেব এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্থানে আছেন। হালদার সাহেব আগে চিকিৎসা করতেন সামান্য একটা কড়াই-ধরা সাঁড়াশি দিয়ে। অবশ্য হালদার সাহেব বলতেন, ঐ সাঁড়াশিটা ভিয়েনা থেকে আনানো, তিনশো তিরিশ পাউন্ড দাম ; কেউ তা বিশ্বাস করতো না। সবাই বলতো কালীঘাট বাজার থেকে কেনা। দাম দেড় বড় জোর দু টাকা। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, সাঁড়াশির দামের সঙ্গে হালদার সাহেবের যোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই।

আজকাল হালদার ডাক্তার একটু আধুনিক হয়েছেন। প্রায় ষাট টাকা খরচ করতে হয়েছে তাঁকে এই জন্যে। একটা তক্তাপোশ, একটা তোষক, একটা বালিশ, সাদা চাদর এবং পঁচিশ শক্তির একটা নীল বাল্‌ব। সেই তক্তাপোশের উপরে দীনদয়ালবাবুকে সবাই মিলে জোর করে শুইয়ে দিলো। এতক্ষণ দীনদয়ালবাবু ধস্তাধস্তি করে কাবু হয়ে পড়েছিলেন, শুইয়ে দেওয়ামাত্র একবার নিস্তেজ কণ্ঠে ক্ষীণ 'হাম্ব-হাম্বা' করে নেতিয়ে পড়লেন।

রোগীর অবস্থা দেখে হালদার সাহেব সাহসী বোধ করলেন, তিনি সঙ্গীদেব কাছ থেকে যতটুকু জানা সম্ভব জেনে নিয়ে সবাইকে বললেন, 'আপনারা এবার বাইরে যান, আমি দেখছি কি হয়েছে।'

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি নীল বাল্‌বটি জ্বালিয়ে দিলেন, তারপর রোগীর দিকে এগোলেন। রোগী তখনো দুর্বল অবস্থায় চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। হালদার সাহেব রোগীর মাথার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?'

দীনদয়ালবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'হাম্বা-হাম্বা'।

ডাক্তার সাহেবের এরকম অনেক অভ্যাস আছে, তিনি অদমিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ঠিকানা?'.

দীনদয়ালবাবু আবার হাম্বা-হাম্বা করলেন।

যেন খুব খুশি হয়েছেন এই রকম ভাব দেখিয়ে হালদার ডাক্তার বললেন, 'ও বুঝেছি, বুঝেছি; আপনি কোন্ অফিসে আছেন?'

দীনদয়ালবাবুর কণ্ঠে আরেকবার হাম্বা-হাম্বা ধ্বনিত হলো।

এইবার ডাক্তারসাহেব কায়দা পালটালেন। তিনি বললেন, 'ও, বুঝতে পেরেছি আপনি গরু।'

প্রশ্নটা শুনে দীনদয়ালবাবু স্থির দৃষ্টিতে এক মিনিট নীল আলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর স্পষ্ট মানুষের ভাষায় বললেন, 'আজ্ঞে'। আবার এক মিনিট নীল আলোর দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন এবং এবার বললেন, 'হাম্বা-হাম্বা'।

হালদার সাহেব বুঝলেন ওষুধে কাজ হয়েছে এবং উৎফুল্ল হয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যে গরু এটা কবে থেকে বুঝতে পারলেন?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে দুবার হাম্বা-হাম্বার পর দীনদয়ালবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, 'সেই ছোট বয়সে যখন বাছুর ছিলাম তখন থেকে।'

অভিজ্ঞ ডাক্তার বুঝতে পারলেন ব্যাধি কঠিন এবং অনেক গভীরে। সেদিনের মত বত্রিশ টাকা ফি নিয়ে তিনি দীনদয়ালবাবুকে সামনের সপ্তাহে আবার নিয়ে আসতে বলে সহকর্মীদের

হাতে তুলে দিলেন। সহকর্মীরা আবার হৈ হৈ করে ট্যাকসি ডেকে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।

দীনদয়ালবাবু কিন্তু আর ডাক্তারের কাছে গেলেন না; কাশীতে চলে গেলেন।

গরু বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য দীনদয়ালবাবু প্রায় তিন মাস কাশীতে রইলেন। কাশীর যেখানে যত গলি-কানাগলি আছে, পাড়া-বেপাড়ায়, ঘাটে-মন্দিরে ঘুরে ঘুরে তিনি গরুদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করতে লাগলেন। যত দেখেন ততই অবাক হয়ে যান এবং নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

কাশী যাওয়ার ফলে অবশ্য দীনদয়ালবাবুর একটা বড় উপকার হলো, তিনি হাম্বা-হাম্বা করা একেবারেই প্রায় ছেড়ে দিলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, অধিকাংশ গরুই এবং বিশেষ করে ষাঁড়েরা প্রায় কখনোই ডাকে না। ডাকার ব্যাপারটা মোটামুটি বাছুর এবং বাছুর জননীদের একচেটিয়া। দীনদয়ালবাবু ভালই জানেন, তিনি বাছুর বা বাছুরজননী নন, সুতরাং ডাকাডাকি ছেড়ে দিলেন। এখন শুধু কখনো কালেভদ্রে মনে খুব স্ফূর্তির ভাব এলে নাকটা যথাসাধ্য উলটিয়ে একটু হুঁ-হুঁ করেন।

এ ব্যাপারটা বিশেষ কিছু দোষের নয় এবং আশেপাশের লোকের এতে আপত্তির কোনো কারণ থাকা উচিত নয়। সুতরাং দীনদয়ালবাবু ভালো হয়ে গেছেন।

এর অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিলো। কাশীতে গরুদের সঙ্গে দিনের পর দিন মেলামেশা করে তিনি বুঝতে পেরেছেন শারীরিকভাবে তাঁর পক্ষে গরু হওয়া অসম্ভব। একদিন খড় চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন গলা দিয়ে ঢুকবার আগে জিভ ছড়ে রক্ত বেরিয়ে গেলো। আরেকদিন জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের ওখানে ঘুরে বেড়ালেন, কাশীর লোক এরকম জিনিস অনেক দেখেছে। তারা বিশেষ তাকিয়েও দেখলো না। কিন্তু দীনদয়ালবাবুর হাঁটুতে, কোমরে তারপর তিনদিন প্রচণ্ড ব্যথা। নানাভাবে ঠেকে তিনি বুঝতে পারলেন এ জন্মে দৈহিক অর্থে গরুত্বপ্রাপ্তির ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হবে না।

তাই দীনদয়ালবাবু কাশী থেকে ফিরে এসে মনে প্রাণে গরু হওয়ার সাধনা করতে লাগলেন। আত্মীয়বন্ধুরা কোনো প্রকাশ্য বিকার না দেখে ধরে নিলো তিনি ভালো হয়ে গেছেন।

অবশ্য প্রকাশ্য বিকার একেবারে রইলো না তা মোটেই নয়। কাশীতীর্থের ভুবনবিখ্যাত গরুদের সঙ্গে তিন মাস থেকে তিনি চমৎকার গুঁতোনো শিখে এসেছেন। বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে এক চাঁদকপালে মাথকুটে ষাঁড়ের কাছেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে আচমকা তীব্র বেগে হাঁটুর নিচে গুঁতো দিয়ে প্রতিপক্ষকে ফেলে দেয়া তিনি চমৎকার আয়ত্ত করে এসেছেন। প্রতিদিন গভীর রাতে মন্দিরচত্বরে শিং ওঠেনি এমন বাছুরদের সঙ্গে নিয়মিত গুঁতোগুঁতি অভ্যাস করেছেন তিনি।

কলকাতায় ফিরে দীনদয়ালবাবুর প্রধান অসুবিধা হলো এই গুঁতোগুঁতির অভ্যাসটা রফা করা নিয়ে। মাঝেমধ্যেই কপালের যে দুটো জায়গায় শিং থাকার কথা সে দুটো জায়গা সুড়সুড় করে ওঠে। অবশেষে অফিস থেকে ফেরার পথে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি গড়ের মাঠে যেতে লাগলেন বাছুরদের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করবার জন্যে। গড়ের মাঠে গরু ভেড়া চরাতে নিয়ে আসে অনেক লোক কিন্তু তার মধ্যে বাছুরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। একেকদিন এমন হয় একটা বাছুরের খোঁজে তিনমাইল চারমাইল হাঁটতে হয় দীনদয়ালবাবুকে।

সেদিন হঠাৎ, ভাগ্য ভালো, রেডরোডের পাশেই একদঙ্গল বাছুরের দেখা পেয়ে গেলেন তিনি। প্রাণের আনন্দে সেই বাছুরের ভিড়ে নেমে পড়লেন।

হালদার ডাক্তার গাড়ি করে ময়দান দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন ধুতিপাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক বাছুরদের সঙ্গে প্রচণ্ডরকম মেলামেশা করছেন। মানসিক ডাক্তার তিনি, খুব কৌতূহল হলো, তাছাড়া লোকটাকে কেমন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে দেখেন তারই পুরনো রোগী। ডাক্তারসাহেব একটু এগিয়ে মাঠের দিকে যেতেই দীনদয়ালবাবু তাঁকে চিনতে পেরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। ডাক্তারসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কি করছেন?' দীনদয়ালবাবু নিজের কপালে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখছেন না শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছি।' উত্তর শুনে আশ্বস্ত হলেন হালদার ডাক্তার, রোগলক্ষণ এখনো একই আছে, অনেকের সময়ের সঙ্গে অসুখ বদলিয়ে যায়। তাঁর এক রোগী আগে নিজেকে আরশোলা ভাবতেন এখন জেটপ্লেন হয়েছেন। রোগীর অবস্থা দেখে খুশি হয়ে, 'আসবেন একদিন' বলে হালদার ডাক্তার চলে গেলেন।

গরু-হওয়া নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কারণ নেই দীনদয়ালবাবুর, সেটাই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু শিগগিরই ডাক্তারের কাছে যেতে হলো তাঁকে অন্য কারণে। পূর্ণ গরু হওয়ার পর থেকে তাঁর মনে ভীষণ গণ্ডারের ভয় ঢুকেছে, হঠাৎ কখন তেড়ে এসে আক্রমণ করে, সব সময় শঙ্কিত থাকেন। একটা সমাধান অবশ্য তিনি পেয়ে গেছেন, গণ্ডারের উপস্থিতি অনুমান করলেই পা দুটো মেজেতে দ্রুততালে ঠোকেন, জঙ্গলের গরুরা নাকি গণ্ডারের সামনে ঐরকম করে আর গণ্ডারেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু রাতেই খুব সমস্যা, উনি ঘুমিয়ে পড়লেই খাটের নিচে দলে দলে গণ্ডার ঢুকে যায়, তাদের সমবেত চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, তখন অবশ্য আবার দ্রুত পা ঠোকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পালায়।

ডাক্তার হালদার সব শুনে বললেন, 'পা ঠুকলে গণ্ডার পালিয়ে যায়, একথা আপনাকে কে বললো?'

একবার সশব্দে পা ঠুকে দীনদয়ালবাবু বললেন, 'দেখছেন না এক চিড়িয়াখানার খাঁচার গণ্ডার ক'টা পালাতে পারছে না আর বাকিগুলো কোথায় চলে গেছে কলকাতায় দুশো মাইলের মধ্যে এখন কোনো গণ্ডার নেই।'

ডাক্তারসাহেব বললেন, 'তাহলে রাতে কি করে আসে?'

'রাতে কি করে আসে, কে জানে?'

দীনদয়ালবাবু বলেন, 'আমি ঘুমোলেই সাহস পেয়ে যায়, খাটের নীচে পালে পালে ঢুকে পড়ে।' ডাক্তার হালদার ব্যর্থ হলেন, খাটের নিচ থেকে গণ্ডার তাড়ানোর যোগ্যতা তাঁর নেই।

কয়েকদিন পরে গড়ের মাঠের সেই জায়গায় আবার দীনদয়ালবাবুকে দেখতে পেলেন ডাক্তার সাহেব। কেমন যেন খুশিখুশি ভাব, বাছুরদের সঙ্গে আহ্লাদে ছুটোছুটি করছেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার দীনদয়ালবাবু?'

দীনদয়ালবাবু হেসে বললেন, 'আর ব্যাপার, সব গণ্ডারদের জব্দ করেছি। তারা আর খাটের তলায় ঢুকতে পারে না।'

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন 'কি করে?'

দীনদযালবাবু বললেন, 'ছুতোর ডেকে খাটের পায়া সম্পূর্ণ ছেঁটে দিয়েছি, এখন ব্যাটাবা জব্দ, আর নিচে ঢুকতে পারে না।

ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের চিঠি

প্রিয় সম্পাদক,

প্রথম খবর এই যে ভালোভাবে পৌঁছেছি। পথে যা যা ঘটবার যথা-রীতি ঘটেছে অর্থাৎ আকাশ মেঘলা থাকায়, পেশোযার থেকে প্লেন দেড় ঘন্টা পরে ছেড়েছে। এখানকার এয়ারপোর্টে পাসপোর্ট চেক করে ফেরত দেওয়ার সময় আমারটা ভুল করে জনৈকা বেগম ফজল নাদিরাকে দিয়ে দেয়, আর তারটা আমাকে। পাসপোর্টে বেগমের ঠিকানা দেখে পাল্টাতে গিয়ে সে প্রায় জেল খাটার বন্দোবস্ত আর কি!

সে যা হোক, এসব কথা ফিরে গিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। এখন ফেস্টিভ্যাল সম্বন্ধে কিছু খবর পাঠাই। কেন যে এই জুন মাসে মরুভূমির মধ্যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন কবা হয়েছে, আমার মোটেই মাথায় আসছে না। ব্যাপারটা হয়তো পুরোপুরিই বাজনৈতিক, তাতে অবশ্য কি আসে যায়, আমার তো বিনি ভাড়ায় প্লেন চড়া হয়ে গেলো।

কিন্তু মশা ? কি ভয়ঙ্কর মশা আফ্রিকার এই শহরে! ছোটবেলায় ভূগোল বইতে আফ্রিকার জীবজন্তুর মধ্যে মশার নাম ছিলো কিনা কিছুতেই মনে পড়ছে না। চিত্রতারকা বা যাঁরা এসেছেন, বেশ বহাল তবিযতেই আছেন। তাঁদেব, মুখ চোখ সারা শরীর পেন্ট করা, মশার কামড়ে কিছু কবতে পারছে না। কিন্তু আমরা, হতভাগ্য ফিল্ম সাংবাদিকরা দিনে গরম এবং রাত্রে মশা— অস্থিব, একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠেছি। আমার ক্যামেরার কেশটা বোধ হয় কাঁচা চামড়ার ছিলো, মশায় কামড়ে সেটাকেও ফুটো ফুটো করে দিয়েছে।

গতকাল থেকে ফেস্টিভ্যাল সুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনটা ভালো পড়া নেই। এই ফিল্মগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করতে ভরসা পাচ্ছি নে। যা হোক, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নাম জানাব না।

প্রথম ফিল্মটি মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ থেকে। ভাষা কিছু বোঝা গেলো না। তবে দেশটি খুব পর্দানসীন। এই বইয়ে সমস্ত মহিলা চরিত্রে বোরখা পরিহিতা। একটি সিন আছে, পাঁচটি মেয়ে বোরখা পরে নাচছে। ইংরেজীতে বইয়ের বিজ্ঞপ্তি বাইরে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে 'কুইন অফ ডেসার্ট' এই বইয়ের নায়িকা। শতাধিক বোরখার অন্তরালে সত্যিই কোন্‌টি কুইন, সে রহস্য রয়ে গেলো অবশ্য। পরে শুনলাম বোরখাবিহীনা পাত্রী কিছু কিছু মূল বইয়ে ছিলো, কিন্তু বাইরে দেখানোর আগে সে দেশের সেন্সারবোর্ড সেই জায়গাগুলো কেটে দিয়েছে। হয়তো আপত্তির কিছু নেই, বেআব্রু রমণীদের বাইরে না পাঠানোই ভালো।

কালকের দ্বিতীয় বই এক সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের। দুঃখের বিষয়, সেই রাষ্ট্রের জনৈক চিত্র সাংবদিকের সঙ্গে এখানে আসার সময় আলাপ হয়েছিলো। তাঁর কাছেই প্রথমে তাঁদের দেশের বইয়ের সম্বন্ধে আলোচনা শুনি। সখের থিয়েটারে যেমন মধ্যে মধ্যে প্রম্পটারের গলা শোনা গেলে, আপত্তির কিছু নেই, এঁদের সিনেমাতেও কখনো কখনো ডিরেক্টরের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সে এক বিষম অভিজ্ঞতা।

নির্জন সমুদ্রতীর। নারিকেল কুঞ্জে হাওয়া বইছে। অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে আসছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ। নায়ক নায়িকা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এবং সেই চিরদিনের ডায়ালগ।

নায়ক ঃ এই সমুদ্রতীরে আজ এই বিকালের আলো, আমার কেমন যেন মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

এর প্রতিবাদে নায়িকার যথারীতি করুণ অনুনয় এবং অবশেষে সহমরণের বাসনা। এই রোমান্টিক সিচুয়েশানে সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়ায় অসম্বৃতপদা নায়িকা; নায়কের উড়ু উড়ু চুল, সহসা একটি কাংস্য কণ্ঠ শোনা গেলো, যেন নিয়তি, যেন বুভুক্ষু দর্শকের অন্তরাত্মা কথা বলে উঠলো,—

'বুক থেকে শাড়ির আঁচল আরেকটু ফেলে দিন, আরেকটু ঘেঁষে দাঁড়ান।' পরিচালকের কণ্ঠস্বর, নায়িকার প্রতি নির্দেশ স্পষ্ট শোনা গেলো।

নায়িকার বাবা এইমাত্র মারা গেছেন। 'ও গড্‌' বলে সিনেমার সেই প্রবীণ ডাক্তার মাথার টুপি খুলে ফেলেছেন (সিনেমার ডাক্তারদের মাথায় কেন যে টুপি থাকে!), ঘরে সবাই নিস্তব্ধ, এক নায়িকার চাপা গোঙানি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, হঠাৎ শোনা গেলো ' সাবধান পা নাড়াবেন না, সাবধান। মনে রাখবেন এটা মৃত্যুর দৃশ্য।' মৃতের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি এই নির্দেশ। কলকাতার স্টুডিওতে একবার এক ডিরেক্টর নাকি মৃতের ভূমিকা অভিনেতাকে বলেছিলেন, 'অমন কাঠ হয়ে পড়ে থাকবেন না, একটু লাইফ আনুন'—এ অবশ্য তার চেয়েও মারাত্মক।

এ তবু একরকম। আজ দুপুরে যে সিনেমাটি দেখেছি, সেটা অসাধারণ ফিল্মের সিম্বল। কি অবস্থায় যাচ্ছে বলতে গিয়ে সেদিন আপনি রসিকতা করেছিলেন যে—কে একজন আপনার পরিচিত ফিল্ম তুলছে, তার বইয়ে কোনো মৃত্যুব দৃশ্য নেই। দেখানো হলো একজন লোক রাস্তা পার হচ্ছে উল্টোদিক থেকে, বহুদূরে একটা গাড়ি আসছে, তারপরেই আদিগন্ত সবুজ, সতেজ ফলভারনমিত পটলক্ষেত, একজন পটল তুলছে অর্থাৎ পূর্ব দৃশ্যের পথচারীটি লরি চাপা পড়ে পটল তুললো।

এখানে অন্য একজন সাংবাদিক বললেন যে, কোন একটা ফিল্মে নাকি দেখানো হয়েছে যে ভীষণ ভিড়ের ট্রেনে একটা লোক পকেটে অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছে। তার পরের দৃশ্যে একটা লোক স্টেশনে একটা দোকান থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট কিনলো। সিজার্সের প্যাকেটটা একবার ক্লোজ আপে দেখানো হলো। এর পরেই প্রথম লোকটি হায়-হায় করছে, আর দ্বিতীয় লোকটি দ্রুত হাঁটছে। অর্থাৎ, প্রথম লোকটির পকেট কেটে দ্বিতীয় লোকটি পালাচ্ছে। কাঁচি হলো পকেট কাটার প্রতীক।

ভদ্রলোকের গল্প শুনে আমরা খুব হাসলাম। দুপুরের সিনেমা দেখে কিন্তু খুব ঘাবড়িয়ে গেলাম। জানি না, এটাও সিম্বল কিনা। দেবদারু আর পাইনের গাছ, আকাশে বিশাল পূর্ণিমার চাঁদ, নায়িকা ঘুরে ঘুরে গুনগুন করে গান গাইছেন—আশ্চর্য মোহময় পরিবেশ। এমন সময় কড় কড় কড়াৎ, বিনামেঘে বজ্রপাত। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ থেকে ছিটকে এসে নায়িকার মাথায় লাগলো। তারপরে ডেড আউট। পরের দৃশ্যে নায়িকা হাসপাতালে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ। একেই বোধ হয় বজ্রাহত বলে।

বিশ্বাস করুন, এরপরেও আরেকটা বই দেখেছি। এরকম বিশ্বস্ত সাংবাদিক আর জীবনে পাবেন না। এ বইটি ক্রাইম ড্রামা। অনেকটা আমাদের বোম্বাইয়ের বইগুলোর মত। বোম্বাইয়ের বই জানেন তো, অবশ্য আপনি খুব বেশী দেখেননি, সেই লাস্ট সিন নায়ক আর ভিলেন, জাহাজের মধ্যে রিভলভার হাতে মারামারি। দুজনের হাত থেকে রিভলভার খসে সমুদ্রে পড়ে গেলো, এবার বেরুলো ছোরা। ছোরা হাতে দুই জনে জাপটাজাপটি করতে করতে ঢুকে পড়লো বয়লারের মধ্যে, সেখান থেকে মেসিনের মধ্যে দিয়ে জাহাজের চোঙার ভিতর দিয়ে আগুন আর ধোঁয়ার সঙ্গে দুজনে বেরিয়ে এলো, উঠে গেলো জাহাজের মাস্তুল বেয়ে; তারপর দুই জনেই পড়লো সমুদ্রের জলে। এর মধ্যে একবার সাগরের মধ্যে ক্লোজআপে একটা ক্ষুধার্ত হাঙর দেখানো হয়েছে। পড়া মাত্র হাঙর এসে ভিলেনকে ধরলো, ধরেই তাকে গিলে ফেললো। ভাববেন না যেন, এইখানেই বই শেষ হলো। এর পরেও আছে—দশ মিনিট ধরে সাসপেন্স, নায়কের কি হলো? সমুদ্রের তীর দেখানো হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে কৃষ্ণশাড়ি পরিহিতা ব্যাকুলা নায়িকাকে দূরের জাহাজে করুণ উদাত্তস্বরে গান গাইতে, কিন্তু নায়কের কি হলো? দর্শক সমাজ উৎকণ্ঠিত, ক্ষুধার্ত হাঙর নায়ককে কি ভিলেন ভেবে খেয়ে ফেললো। না তা হয় না কোনোদিন; দেখা গেলো হাঙরের পিঠে নায়ক চেপে বসেছেন আর দুই হাত দিয়ে ধারালো দাঁত সমেত হাঙরের চোয়াল চিরে ফেলেছেন, হাতের মাসলগুলো ফুলে উঠেছে। দর্শক-সাধারণ হাততালি দিলো, নায়িকা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। এখন সম্মুখে নিরুদ্বিগ্ন মধুর জীবন।

আমি একবার একজন পরিচালককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মশায়, ভিলেনকে হাঙর খেয়ে ফেলার পর ঐ দশ মিনিট দর্শকদের ঝুলিয়ে রাখার মানে কি?

তিনি অবাক হয়েছিলেন, 'সে কি বুঝতে পারেননি?'

'আজ্ঞে না।'

'হাঙর আগে ভিলেনকে খেয়ে হজম করুক, তারপর নায়ক তাকে মারবে। না হলে আবার তো ভিলেন বেরিয়ে আসতে পারে, তার মানে আরো দেড় হাজারফুট। আর বলবেন না মশায়, কাঁচা ফিল্মের যা বাজার হয়েছে।'

আজ যে ক্রাইমড্রামা দেখলাম, সেটাও মধ্যপ্রাচ্যের এক দেশের, তবে একটু আল্ট্রামডার্ন; আর সেখানে বোম্বে ফিল্মের খুব কদর। তাদেরও লাস্ট সিন ঐ একই রকম, সেই জাহাজে মারামারি সেই নায়ক আর ভিলেন। কিন্তু একটু অন্যরকম। নীচে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র, নায়ক আর ভিলেন ধস্তাধস্তি করতে করতে জাহাজ থেকে পড়লো, কিন্তু পরের দৃশ্যে দেখা গেলো সমুদ্রের নাম গন্ধ নেই, তৃণাচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তরে দুজনে কুস্তি হচ্ছে, একপাশে নায়িকা দাঁড়িয়ে কখনো হাততালি দিচ্ছে, কখনো চোখ মুছছে।

আজ এই পর্যন্ত। ভয়ঙ্কর দাঁতে ব্যথা করছে। ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য করছি, কেন জানি না, একসঙ্গে অনেক মেয়ে দেখলে আমার দাঁতে কেন যেন খুব ব্যথা হয়। ছোটবেলায় বিয়েবাড়িতে গেলেই পরদিন দাঁতে ব্যথা হতো। বড় হয়ে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি। প্রথম যৌবনে আড়াই বছর মেয়েদের কলেজে মাস্টারি করেছিলাম, চারটে দাঁত তুলে ফেলতে হয়েছিলো। এ বয়সে আর সহ্য হয় না। এত চিত্র তারকার ভিড়, কি ভীষণ ব্যথা করছে যে মাড়ির দাঁতগুলোয়।

সিঙ্গাপুরী নৃত্যপটিয়সী চিত্রতারকা লুনমুন কাল এক সান্ধ্যবাসরে আমাকে বলেছিলেন, বাঙালীদের ঠোঁটের গড়ন তাঁর খুব পছন্দ। আজ এমন সময় তিনি কোথায় থাকতে পারেন তারও একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

কিন্তু দাঁতের ব্যথায় যে গেলাম, এখন এই মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধ মরু নগরে বেরোতে হচ্ছে ডেন্টিস্টের সন্ধানে, ভালোয় ভালোয় ফিরলে কালকের ডাকে পরবর্তী খবর বিস্তারিত জানাবো, শুভরাত্রি। ইতি—

পুঃ—বাসায় বাজার খরচ দিয়ে আসিনি। দয়া করে আপনার বৌদিকে গোটা পনেরো টাকা পাঠিয়ে দেবেন আর দাঁতের ব্যথার কথাটা জানাবেন না।

আবহাওয়া

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পাটনায়েক কটক বেতার কেন্দ্রের একজন সামান্য ঘোষক। তিনি নিউজ বুলেটিনগুলি পাঠ করে শ্রোতাদের শোনান। মূল সংবাদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ খুবই কম, কারণ সে সবই রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে রিলে হয়ে আসে, স্থানীয় সংবাদ প্রচার করার সুযোগ কখনো কখনো পাটনায়েক যে পান না তা নয়, কিন্তু সেও খুবই কম। কারণ ঘোষকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে জুনিয়ার।

নিত্যানন্দবাবু যদিও উড়িষ্যাবাসী, উড়িষ্যাতেই তাঁর জন্ম এবং ওড়িয়াই তাঁব মাতৃভাষা, তবু যৌবনকালে তিনি কলকাতায় কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা ভাষা তাঁর বেশ আয়ত্ত হয়েছিলো এবং এই ভাষার প্রতি তাঁর একটা অনুরক্তিও মনে মনে গড়ে উঠেছিলো।

কটক বেতারকেন্দ্রে কাজ করতেন তিনি, কিন্তু তাঁর কান পড়ে থাকতো আকাশবাণী কলকাতায়। প্রত্যেক মুহূর্তেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে, রেডিও স্টেশনের সেটে কলকাতা কেন্দ্রেব প্রোগ্রামে কান পেতে তিনি মনে মনে তুলনা করে যেতেন কটক কতটা উঠলো কিংবা নামলো; কখনো তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হতো অপার বিরক্তিতে, কখনো বা একটু বঙ্কিম হাসির রেখা দেখা দিতো ঠোঁটের সীমানায়।

আজ কিছুদিন হলো একটা একঘেঁয়ে কাজের ভার পড়েছে নিত্যানন্দ পাটনায়েকের উপর। আবহাওয়া পূর্বাভাসটি তাঁকে পাঠ করতে হয়। প্রতিদিন একই ভাষায় একই রকম কয়েকটি শব্দ, মধ্যে দু-একটি 'হয়তো' 'সম্ভবত' জাতীয় ওড়িয়া অব্যয় ব্যবহার করে দু'মিনিটের নীরস বুলেটিন।

এই আবহাওয়া বুলেটিন শুধুই যে নীরস বা একঘেঁয়ে কেবল তাই নয়, কয়েকদিন ঘোষণার পর নিত্যানন্দবাবু নিজেই ধরতে পেরেছেন ব্যাপারটা নিতান্তই বাজে এবং ফালতু। যে কোনো ভবিষ্যৎ বাণীর মতই এই বাণী পুরোটাই লেগে গেলে গেলো, না লাগলে লাগলো না। কিন্তু অসুবিধা এই যে আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ বার্তার ভবিষ্যৎ নিতান্তই কাজের ব্যাপার, একবারে বর্তমানের ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে সকালে বলতে হয় বিকেলে কি হবে, বিকেলে বলতে হয় রাতে কি হবে।

আজকাল পাবলিক আছে, খবরের কাগজ আছে। তারা ভুল ঘোষণা নিয়ে হাসাহাসি করে,

অম্ল-তিক্ত কটাক্ষ এমনভাবে করে, যেন আকাশবাণীর ঘোষক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পাটনায়েকেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্যাপারটায়, যেন তাঁর বাড়িতেই হাওয়া অপিস, সেখানে বসেই গবেষণা করে ব্যারোমিটারের পারা মেপে আর মুরগীর নাচ দেখে নিজেই আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করে নিরীহ জনসাধারণকে বেকুব ভেবে আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচার করেন শ্রীযুক্ত পাটনায়েক।

ব্যাপারটা তো আর ঠিক তা নয়। হাওয়া অপিস থেকে ইংরেজিতে টাইপ করা বুলেটিন এসে পৌঁছায় রেডিও দপ্তরে, নিত্যানন্দবাবুর কাজ সেটিকে ওড়িয়ায় অনুবাদ করে নির্দিষ্ট সময়ে আকাশবাণীর কটকে প্রচার করা।

কিন্তু অসুবিধা হলো এই যে, নিত্যানন্দবাবুর নিজেরও একেক সময় ভীষণ খটকা লাগে এই বুলেটিন গুলো প্রচার করতে। ঝকঝক করছে রোদ্দুর, কটকের আকাশের একশো মাইলের মধ্যে একবিন্দু মেঘ নেই এমন টনটনে সকালে একবার গলা খাঁকারি দিয়ে যখন তাঁকে ঘোষণা করতে হয়, 'আজ সকালের দিকে প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে সঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনা' তখন যে শ্রোতার দল তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবেই এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না, কিন্তু তাঁর দুঃখ হয় শ্রোতারা কি ঘোষকের কণ্ঠস্বরেও একটু সংশয়, একটু দ্বিধা খুঁজে পান না, তাঁরা কি বুঝতে পারেন না যে এই সামান্য ঘোষক অনুবাদক মাত্র, নিতান্তই রুটিনের চাকরি তা না হলে তিনিও জানেন ঘোষণা করা উচিত ছিলো, দুচার ছয় মাসের মধ্যে বৃষ্টি বা ঝড়ের সম্ভাবনা নেই, অন্তত আজ সকালের রোদ্দুর দেখে এই রকমই মনে হচ্ছে, এ সত্ত্বেও যদি বৃষ্টি হয় তার জন্যে আবহাওয়ার অফিসের কর্তারা দায়ী, কারণ তাঁরা বলেছেন সাংঘাতিক ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে, কেন বলেছেন ঈশ্বর জানেন, শ্রোতারাও তাঁদের কাছে জানতে চাইতে পারেন।

দুঃখের বিষয়, এ ধরনের কোনো ঘোষণা আকাশবাণী একদিনের বেশী বরদাস্ত করবে না। শুধু একদিন মানে ঐ প্রথম দিন, তার পরদিনই কানে ধরে আকাশবাণী থেকে বার করে দেবে, না হয় পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে। এই দুর্দিনে নিজের কাজটিকে যতই উপহাসযোগ্য মনে হোক, নিত্যানন্দ পাটনায়েক কিছুতেই কাজ হারাতে রাজি নন।

নিত্যানন্দবাবুর মনের যখন এই অবস্থা, যখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেহাত প্রাণের দায়ে তাঁকে চাকরি করে যেতে হচ্ছে অর্থাৎ আবহাওয়ার অসম্ভব বুলেটিন পাঠ করে যেতে হচ্ছে সেই সময় একদিন সকালে সাড়ে সাতটার একটু আগে দৈববাণী শুনতে পেলেন।

আগেই বলেছি যে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের প্রোগ্রামগুলির উপরে স্বাভাবিক অনুরাগ এবং কৌতূহলবশত তিনি যথাসম্ভব কান পেতে রাখতেন। কলকাতা বেতারকেন্দ্রেও কটকের মতই আবহাওয়ার বুলেটিন প্রচারের আয়োজন আছে এবং তার জন্যেও একজন সংশয়াচ্ছন্ন, দ্বিধান্বিত ঘোষক আছেন।

তবে কলকাতা কেন্দ্রের আবহাওয়া ঘোষণা কটক কেন্দ্রের কয়েক মিনিট আগে হয়ে যায়। একদিন বুলেটিন পাঠ করার জন্য স্টুডিওতে প্রবেশ করার আগে নিত্যানন্দবাবু অভ্যাসমত নিজের অনুবাদে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। সেদিন সকালবেলা বেশ মেঘলা, মাঝে মধ্যে জোর ঝাপটা বৃষ্টি হচ্ছে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া।

বাইরের যখন এইরকম প্রাকৃতিক অবস্থা তখন যথারীতি নিত্যানন্দবাবুকে পাঠ করতে হবে, 'আজ সকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার এবং সুন্দর আবহাওয়া থাকবে'...ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একবার নিজের অনুবাদ করা ঘোষণাপত্রটির দিকে তাকাচ্ছেন, আরেকবার জানলা দিয়ে

বাইরে যেখানে আকাশবাণীর দেয়াল ঘেঁষে বুড়ো নিমগাছটার ডালে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে আর শোঁ শোঁ হাওয়ার ঝাপটা লাগছে সেইদিকে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছেন পাটনায়েক, এমন সময় তাঁর কানে এলো দৈববাণী। তাঁরই প্রিয় বাংলা ভাষায় কলকাতা বেতারকেন্দ্রের ঘোষক বলছেন, 'প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি হবে, এমন কি শিলাবৃষ্টি, সাইক্লোন হতে পারে।'

কলকাতার ঘোষণা সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে কটকের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে কিন্তু নিত্যানন্দবাবুকে কটকের আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিটিই পাঠ করতে হবে মিলুক বা না মিলুক।

সেইদিন বিজ্ঞপ্তিটি পাঠ করার পরেই ভীষণ শিলাবৃষ্টি হলো কটকে। রেডিও স্টেশনের গেটে খোয়া-বাঁধানো রাস্তা বরফকুচিতে ছেয়ে গেলো তার পর এলো সাইক্লোন। সেই সাইক্লোনে শুধু কটক শহরের কয়েকটি টিনের চালা এবং ছোট-বড় গাছই যে উল্টে গেলো তাই নয় শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পাটনায়েকের মনের মধ্যেও একটা বিরাট আলোড়ন তৈরী হলো। তিনি একনাগাড়ে সাত দিন ছুটির দরখাস্ত করে বাসায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বাসায় শুয়ে শুয়ে চারবেলায় চারবার করে কলকাতা আর কটকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনতে লাগলেন এবং বাইরের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মেলাতে লাগলেন। যতই মেলাতে লাগলেন তত চমৎকৃত হলেন পাটনায়েক। কলকাতার আবহাওয়া দপ্তর যাই বলে সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় কটকের অবস্থার সঙ্গে কিন্তু উড়িষ্যা হাওয়া অপিসের একটি ভবিষ্যৎ-বার্তাও মিলতে চায় না। মনে হয় কে যেন ইচ্ছে করে রসিকতা করছে।

বিছানায় শুয়ে থাকার জন্যেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক এই সাতদিনে নিত্যানন্দ পাটনায়েকের বুদ্ধি খুবই খুলে গেলো। তিনি কলকাতায় তাঁর এক পুরানো কলেজী বন্ধুকে চিঠি লিখলেন— প্রত্যেকদিন সকাল, দুপুর, বিকেল এবং রাত্রিতে কেমন আবহাওয়া থাকে তার বিবরণ যেন অবশ্যই তাঁকে পরের দিনের সকালের ডাকে পাঠানো হয়, সঙ্গে কয়েকটি ঠিকানা লেখা রিপ্লাই কার্ড পাঠিয়ে দিলেন। পুরনো বন্ধুটি নিত্যানন্দকে শান্ত সুস্থির লোক বলেই জানতেন, হঠাৎ এই ধরনের আদেশ পেয়ে তিনি ভাবলেন নিত্যানন্দ বুঝি পাগল হয়ে গেছে। তিনদিনের মধ্যে যখন কোনো উত্তর এলো না, নিত্যানন্দ একটা অর্ডিনারি আর একটা এক্সপ্রেস পর পর দুটি টেলিগ্রাম পাঠালেন। বন্ধুটি তখন ব্যস্ত হয়ে পাগল ক্ষ্যাপানো আর উচিত হবে না এই ভেবে পর পর সাতদিন ধরে যথারীতি বন্ধুকৃত্য পালন করলেন।

বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যে নিত্যানন্দবাবু তাঁর ছুটি আরো পনেরো দিন বাড়িয়ে দিলেন। একটি লম্বা চার্ট তৈরী করে খাতা বাঁধিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। পাঠকদের অনুধাবনের সুবিধার জন্যে একদিন একবেলার চার্টটি নিচে হুবহু মুদ্রিত করা হলো ঃ—

ক) তারিখ — ৩০শে জুন রবিবার

খ) সময় — সকালবেলা ৭টা—১০টা

গ) কটকের — আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি
ভীষণ — ঝড় বৃষ্টি হতে পারে

ঘ) কটকের — প্রকৃত — আবহাওয়া
উজ্জ্বল — রৌদ্র, — নির্মেঘ নীলাকাশ

ঙ) কলকাতার — আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি
উজ্জ্বল রৌদ্র, — নির্মেঘ নীলাকাশ

চ) কলকাতার প্রকৃত আবহাওয়া
ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি

সাতদিন চারবেলা করে এই রকম আটাশটি চার্ট পূর্ণ হলো, অবশ্য চার্টের (চ) অংশটি পূরণ করতে দুদিন বা তিনদিন দেরী হতো, কারণ ওটা পূরণ করা হতো কলকাতার চিঠি পেয়ে।

আটাশটি চার্ট দেখে দেখে নিত্যানন্দ নিশ্চিত হলেন যে কটকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস কলকাতার ক্ষেত্রে এবং কলকাতার পূর্বাভাস কটকের ক্ষেত্রে চমৎকার মিলে যাচ্ছে। যে কোন চার্টের (গ) এর সঙ্গে (চ) এবং (ঙ) এর সঙ্গে (ঘ) মেলালেই জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর এই সদ্য আবিষ্কৃত তথ্য নিয়ে ছুটির পরদিনই নিত্যানন্দবাবু প্রথমে আকাশবাণীব অধিকর্তা এবং পরে হাওয়া ভবনের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। দুঃখের বিষয় এই দুজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীই পাটনায়েক সাহেবকে পাগল ভেবে বসলেন। তবে তাঁরা এ বিষয়ে আর বেশী মাথা ঘামালেন না।

এর মধ্যে পাটনায়েক কাজে যোগদান করেছেন এবং যথারীতি আবার তাঁর ভাগে পড়েছে আবহাওযাব বুলেটিন। সদ্যলব্ধ জ্ঞানে অকুতোভয় এবং দ্বিধাহীন পাটনায়েক হাওয়া অপিসের বুলেটিন আব ছুঁযে দেখেন না। তাঁব ঘোষণার ঠিব পনেরো মিনিট আগে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের ঘোষক বাংলায় যা বলেন তাই হুবহু টুকে নিয়ে ওড়িয়ায় তিনি পুনঃপ্রচার করেন।

ব্যাপারটা ধরা পড়লো দিন দশেকের মধ্যে। হাওয়া অপিসের অধিকর্তা আর আকাশবাণীর অধিকর্তা যুগপৎভাবে কয়েকটি অভিনন্দন পেয়ে বিস্মিত, হতবাক্ হয়ে গেলেন। এমন অভূতপূর্ব সঠিক পূর্বাভাস কটক বেতারকেন্দ্রে তো দূরের কথা পৃথিবীর কোনো বেতারকেন্দ্রে প্রচারিত হয় কিনা এ বিষয়ে অনেকেই অভিমত দিলেন।

দুই অধিকর্তা হতভম্ব। বৃষ্টি বললে বৃষ্টি, ঝড় বললে ঝড়, রোদ বললে রোদ এমন তো হওয়াব কথা নয়। সবই যদি এমন অবিশ্বাস্যভাবে মিলে যায়, লোকে যদি সরকারী ঘোষণা বিশ্বাস করতে আবম্ভ করে তা হলে তো সমূহ বিপদ।

সামান্য খোঁজ হতেই পাটনায়েক ধরা পড়ে গেলেন এবং সাসপেণ্ড হ.· গেলেন।

এখন আর তার জন্যে পাটনায়েকের দুঃখ নেই, কারণ তিনি জ্ঞান ও গবেষণার জন্যে শাস্তি পেয়েছেন, সক্রেটিস, গ্যালিলিও থেকে পরশুদিনের ডঃ খোরানা পর্যন্ত সকলের কথা মনে করে পাটনায়েক সান্ত্বনা দিলেন নিজেকে।

এদিকে কিন্তু তিনি মোটেই থেমে থাকলেন না। তাঁর চার্ট-বইটি সাইক্লোস্টাইল করে ছাপিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতিটি মন্ত্রীকে, প্রতিটি বিরোধী দলের নেতাকে এমন কি লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো পৃথিবীর সব রাজধানীতে এবং ইউনেসকোতে এক কপি করে পাঠিয়ে দিলেন।

মাস তিনেক পরে ইউনেসকো ভারত সরকারের কাছে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রার্থনা করলেন।

তখন খোঁজ পড়লো নিত্যানন্দ পাটনায়কের। কটক বেতার-কেন্দ্রের অধিকর্তা ভাবলেন কিসে আবার কি হয়ে যায়। যেন কিছুই জানেন না এই ভাবে নিত্যানন্দবাবুকে ডেকে বললেন, 'কি মশায়, কাজে আসছেন না কেন আজকাল?' তারপর নিত্যানন্দবাবু উত্তর দেওয়ার আগেই বললেন যে, 'আপনি একবার দিল্লী থেকে ঘুরে আসুন, আপনারা হলেন কৃতবিদ্য লোক।'

অর্থাৎ নিত্যানন্দবাবুর সাসপেনশান রদ হয়ে গেলো, অনেকগুলো টাকা বকেয়া মাইনে একবারে হাতে পেলেন এবং তদুপরি দিল্লী যাওয়া এবং থাকার খরচ।

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত করে বলা যেতে পারে, কারণ যাঁরা খবরের কাগজ পড়েন তাঁরা সবাই মোটামুটি বিষয়টি জানেন। নয়াদিল্লীতে একটি সর্বভারতীয় 'আবহাওয়া পূর্বাভাস তদন্ত ও অনুসন্ধান কমিটি' গঠিত হয়েছে। তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিনজন বৈজ্ঞানিক, একজন আই সি এস সেক্রেটারি এবং শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পাটনায়েককে এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে।

কমিটি এখন পুরাদমে তাঁদের গবেষণা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। আকাশবাণীর সমস্ত কেন্দ্রের ঘোষকদের এই তথ্যানুসন্ধান কমিটির সামনে সাক্ষী ডাকা হয়েছে। হাওয়া অপিসের প্রধান কর্তারাও তাঁদের বিস্তারিত রিপোর্ট ও মতামত পেশ করেছেন।

মোট কথা, 'আবহাওয়া পূর্বাভাস তদন্ত ও অনুসন্ধান কমিটি' পূর্ণোদ্যমে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত বড় বড় খবরের কাগজে এই কমিটি গঠন ও তার কার্যাবলী বিষয়ে একাধিক গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

এদিকে কটক মিউনিসিপ্যালিটি শহরতলীর একটি মোটামুটি পরিমিত রাস্তার নাম পাল্টে নিত্যানন্দ পাটনায়েক স্ট্রীট নামকরণ করেছেন। আগামী বছর নিত্যানন্দবাবু অন্তত পদ্মভূষণ উপাধি পাবেন বলে অনেকেই অনুমান করেছেন। কেউ কেউ বলছেন নিত্যানন্দবাবুর নোবেল বিজ্ঞান পুরস্কার পাওয়াও উচিত। তবে সেটা পদার্থ না রসায়ন না অন্য কোন শাখায় হবে সে বিষয়ে স্যার সি. ভি. রামনের কাছে খোঁজখবর নেয়ার জন্যে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়েছে কটক শহরে।

তবে কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনো প্রকাশিত হয়নি এবং সেই রিপোর্টের জন্যে দেশবাসী অধীর প্রতীক্ষা করছে।

শেষ সংবাদ

ভারত কা রাজপত্রে ঘোষিত একটি প্রেসনোটে এই মাত্র জানা গেলো 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস তদন্ত ও তথ্যানুসন্ধান কমিটি'র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তদন্ত কমিটি আশা করছেন এই রিপোর্টটি কার্যকরী করা হলে ভারতবর্ষে কোথাও আর আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কোনো ভুলত্রুটি থাকবে না। সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।

এখন থেকে কটকের হাওয়া অপিসের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে আকাশবাণী কলকাতায়, পাটনার বিজ্ঞপ্তি মাদ্রাজে, মাদ্রাজের বিজ্ঞপ্তি শিলং-এ এবং কলকাতার বিজ্ঞপ্তি কটকে। আকাশবাণীর সমস্ত কেন্দ্র এবং হাওয়া অপিসগুলির নাম তালিকা করে সাজিয়ে দিয়েছেন কমিটি কোন কেন্দ্র থেকে কোন অপিসের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে।

এর পর থেকে আশা করা যাচ্ছে কেউ আর আকাশবাণীর আবহাওয়া ঘোষণা নিয়ে হাসাহাসি করবে না, সবাই স্পষ্ট মিলিয়ে দেখতে পাবে, বৃষ্টি বললে বৃষ্টি হচ্ছে, রোদ বললে সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে রোদ উঠছে, হোক না শ্রাবণ মাস।

ঘুঘু কাহিনী

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার মোড়ে চলে এলেন সদাব্রতবাবু। অবশ্য 'মানসিক সদন' থেকে এই নাগেরবাজারের মোড় খুব কাছে নয়, কিন্তু কিই বা করা যাবে। আজ আড়াই বছর এই রকম চলছে। কোনো উন্নতিই হচ্ছে না। সেই রিটায়ার করে যখন প্রথম সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে, সি. আই. টি'র নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটাতে এলেন সদাব্রত, তখনই ব্যাপারটার শুরু।

বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকলেই, কারণে অকারণে, দিনেদুপুরে, এমনকি রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত মাথার মধ্যে, নাকি ঘরের মধ্যে, ঘুঘুর ডাক শুনতে পান সদাব্রতবাবু। কলকাতা শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ঘুঘুর ডাক, 'মাথা খারাপ হলো নাকি আমার?' আজ প্রৌঢ় বয়সে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় সদাব্রত রায়ের। ''আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? এও তো আর বলা যায় না কাউকে, যাদের বলা যেতো—'' একটা চাপা নিঃশ্বাস অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়ের বুকের মধ্য থেকে নাক পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে।

নিজের খোঁজেই বন্দোবস্ত করেছেন, প্রত্যেক শনিবার আসতে হয় এখানে, এই মানসিক সদনে, ডাক্তার সান্যালের কাছে চিকিৎসা করান। মাসে একদিন ইলেকট্রিক শক নিচ্ছেন আজ এক বৎসরের বেশি হয়ে গেলো। সামনের শনিবার আবার শকের জ্বালা, ভাবতে গিয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে সদাব্রতর, না, আর পারা যায় না।

কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ট্যাক্সি চাই। এখন অফিসের সময়। দশটা বাজে, বাসে ওঠা অসম্ভব। কিন্তু ট্যাক্সি তার চেয়েও অসম্ভব। শরীর অস্থির করতে থাকে তাঁর, মাথার মধ্যে সব উল্টোপাল্টা ভাবনা ভিড় করে। যদি একদম ক্ষেপে যেতেই হয়, খুন করে ক্ষেপে যাবো, আর তখন ট্যাক্সি চালাবো, দেখি কে ধরতে পারে? 'এই ট্যাক্সি'... ছয়বার দৌড়িয়ে ব্যর্থ হলেন সদাব্রতবাবু।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হয়ে গেলো। ঠিক এই সময় প্রায় একটা দুর্ঘটনা। একটা বাস স্টপে একটুও না থেমে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিলো, একটা হিন্দুস্থানী মুটে-মজুর গোছের লোক হবে সেই বাস থেকে উল্টোদিক মুখ করে ঝাঁপিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, জীবনপণ করে রাস্তায় ছিটকে পড়লো। বাসের ভেতর থেকে এবং রাস্তার চারপাশ থেকে, দোকানঘরগুলো থেকে লোকজন খুব চেঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'এই রোক্‌কে, রোককে.. গেলো, গেলো...।'

বাসটা কিন্তু একটুও থামলো না, ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেলো। পতিত হতভম্ব লোকটা একটা ডিগবাজি খেয়ে প্রথমেই সদাব্রতবাবুর গায়ের ওপর, তারপর হুমড়ি, হুমড়ির পর হুমড়ি খেয়ে পড়লো রাস্তায়, চরকিবাজি কিন্তু থামলো, না, আবার উঠে দাঁড়াতেই রাস্তার উপর পড়ে গেলো। চলন্ত বাস থেকে উল্টোদিক মুখ করে নামলে এই রকমই হয়, লোকটা রাস্তার উপর বেশ কয়েকটা গড়াগড়ি খেলো। ভাগ্যিস বিশেষ কোনো জোরে আঘাত লাগেনি, কোনোদিক থেকে একটা গাড়ি এসেও চাপা দিতে পারতো। সদাব্রতবাবু এতক্ষণ ঠিক লক্ষ করেননি, একটি কালোমতন রোগা লম্বা চেহারার যুবক তাঁর পাশেই বোধ হয় এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। সে-ই ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলো; লোকটা তখন হাঁফাচ্ছে, ঘটনার আকস্মিকতায় সে একটু হতভম্ব হয়ে গেছে। হঠাৎ সেই যুবকটি হিন্দুস্থানীটির ঘাড়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলো 'কি, রাস্তাটা ভাঙতে পারলে না?'

আশেপাশের সমস্ত লোকগুলো হো হো করে হেসে উঠলো, সদাব্রতবাবুও হাসলেন। লোকটা আরো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো।

যুবকটির এই আচরণ এবং কথাবার্তা সবই সদাব্রতবাবুর কেমন যেন চেনাচেনা মনে হলো। সদাব্রত একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

যুবকটি একটু ঘাড় চুলকে বললো, 'আপনি বোধ হয় আমার বড়দাকে দেখেছেন, আপনি কি কখনো ধানবাদে গেছেন?'

সদাব্রতবাবুর এইবার মনে পড়লো এই ছেলেটিকেই মাসখানেক আগে গোলদীঘির কাছে দেখেছিলেন। সেদিনও এই রকম একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনা।

কলেজ স্ট্রীট দিয়ে আসছেন, হঠাৎ দেখলেন সমস্ত লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে, যে যে-রকম পারে ছুটছে, তিনি কিছু বুঝতে না পেরে সকলের সঙ্গেই দৌড়ে গোলদীঘিব মধ্যে ঢুকলেন। এর মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে এই ছেলেটিও ঢুকলো, সার্টের হাতা ছিঁড়ে গিয়েছে, ফুল-প্যাণ্টেব হাঁটুতে কাদা লেগে রয়েছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ার চিহ্ন বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই মাত্র ধ্বস্তাধ্বস্তি গোছের কিছু হয়েছে। ছেলেটি এসে সদাব্রতবাবুকে সামনে পেয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনারা সব এ রকম ছুটে পালালেন কেন, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, আমি দেখতে এগুলাম, আমাকে একটা ক্ষ্যাপামতন ষাঁড় তেড়ে এসে গুঁতো দিয়ে ফেলে দিলো।'

কেন পালিয়েছিলেন ব্যাপারটা এতক্ষণে সদাব্রতবাবুর বোধগম্য হলো। খুব বাঁচা গেছে, এই বুড়ো বয়সে ষাঁড়ের গুঁতো, বাবা, কিন্তু ছেলেটির প্রশ্ন তাঁকে একটু ভাবিয়ে তুললো। পাশে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তারা ফিক করে হেসে ফেললো বোধ হয় প্রশ্নটি শুনেই, তিনি একবার মেয়েদের দিকে তারপর একবার বিধ্বস্ত ছেলেটির দিকে তাকালেন। তখনই তাঁর কেমন চেনা মনে হলো, বেশ চেনা চেনা মনে হলো ছেলেটিকে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি বলুন তো?'

যুবকটি বললো, 'আপনি বোধ হয় আমার বড়দাকে দেখেছেন, আপনি কখনো ধানবাদে গেছেন?'

সদাব্রত ঘাড় নেড়ে না জানিয়েছিলেন।

'তাহলে ভাগলপুর, মুঙ্গের? আমার বড়দা বিহারে স্টেশনমাস্টার, তাকেই দেখেছেন। ছেলেটি পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বললো।

কিন্তু সদাব্রতবাবু দেওঘর ছাড়া বিহারে আর কোথাও কোনোদিনই যাননি। তাঁর এও স্পষ্ট ধারণা এই যে, এই ছেলেটিকেই তিনি বহুবার কোথাও দেখেছেন, মাথাটা ঠিক নেই, না হলে ঠিক মনে করা যেত।

ছেলেটি যখন জানতে পারলো সদাব্রতবাবু তার বড়দাকে কোথাও দেখেনি বরং তাকেই কোথাও দেখেছে বলে মনে করছেন, বললো; 'তা হলে আপনি আমার ছোড়দাকে খুব সম্ভব দেখেছেন! অবশ্য ছোড়দাকে দেখলে আমার ভাই বলে চেনা কঠিন। তার রঙ খুব ফর্সা, স্বাস্থ্য ভালো তার ওপরে বেঁটে, খুবই বেঁটে। আমার সঙ্গে তার চেহারার কোনো মিলই নেই।'

যুবকটির এই ধরনের অর্থহীন, অসংলগ্ন আত্মপরিচয়ে সদাব্রত সেদিন খুবই বিব্রত বোধ করেছিলেন। যথেষ্ট অবাকও হয়েছিলেন, আজো তাই হলেন। এর কথার কোনো মাথামুণ্ডু ধরা যায় না। এর ছোড়দার সঙ্গে যদি এর চেহারার একেবারে কোনো মিলই না থাকে তবে একে দেখে এর ছোড়দার কথা মনে পড়তে পারে কি করে?

এর মধ্যে ছেলেটি দুই হাত ছড়িয়ে রাস্তার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে একটা মিটার ডাউন-ট্যাক্সি ফাঁকা যাচ্ছিলো দেখে সেটা আটকালো, তারপর ড্রাইভারের সঙ্গে একচোট বচসা এবং জোর করেই একরকম ট্যাক্সির মধ্যে উঠে বসলো। উঠে সদাব্রতকে ডাকলো, 'আসুন আপনি তো ঐ দিকেই বোধ হয় যাবেন। আপনাকে শ্যামবাজারে নামিয়ে দিয়ে যাবো।'

সদাব্রত খুব খুশিই হলেন, ছেলেটা ভালোই বলতে হবে। একবার শ্যামবাজার পৌঁছলে সেখান থেকে যা হোক গাড়ি-টাড়ি একটা ধরা যাবে।

ট্যাক্সিতে বসে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কতদূর যাবেন?'

'এই ইণ্টালির কাছে। আপনি?'

'আমিও তো ইণ্টালির দিকেই যাবো। ঠিক আছে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।' সদাব্রত বিশেষ আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন।

ইণ্টালিতে সি আই টি'র মোড়ে এসে সদাব্রত বললেন, 'আমার এখানে নামলে হবে।'

ছেলেটি বললো, 'ঠিক আছে আপনি নামুন, আমিও এখানেই নামতাম। তবে পার্কসার্কাসে একটা কাজ আছে, সেটা সেরে আসি।'

ছেলেটি চলে গেলো। ট্যাক্সির ভাড়াটা দিতে চাইলেন সদাব্রত, কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই নিলো না। সদাব্রত ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলেন, ছেলেটিকে কোথায় দেখেছি?

এর পরেও সদাব্রত ছেলেটিকে একাধিকবার এদিকে ওদিকে এই পাড়াতেই দেখতে পেলেন। সেই সব অসংলগ্ন উত্তরমালার কথা ভেবে বিশেষ ভরসা পেলেন না আলাপ করবার। একটু এড়িয়েই চললেন। কিন্তু ছেলেটির ব্যাপার-স্যাপার কি রকম যেন। এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার দিকে সদাব্রত রাস্তায় একটু পায়চারি করছেন, পার্কের পাশের রাস্তা, পার্কের ধারে রাস্তা ঘেঁষে একটা বড় রাধাচূড়া ফুলের গাছ, সেইখানে ফুটপাথের ওপরে একটা হাঁটু গেড়ে ছেলেটা উবু হয়ে বসে ডান হাতের কব্জি গোলমতন করে কি যেন দেখাচ্ছে। পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসছে। এই সময় সদাব্রত মুখোমুখি পড়ে গেলেন, এড়ানো গেল না; তার উপরে একটু কৌতূহলও ছিল। ছেলেটি সদাব্রতকে দেখে একটু অপ্রস্তুত অবস্থাতেই যেন উঠে দাঁড়ালো। সদাব্রত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, ও মানে মানু বলছিলো,' ছেলেটি মেয়েটার দিকে তাকালো, মানু নামে মেয়েটি তখন মুখ পার্কের দিকে ফিরিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দিয়েছে, ছেলেটি বলে চললো, 'ও বলছিলো, এটা নাগকেশরের ফুল।'

সদাব্রতকে ছেলেটি আঙুল দিয়ে দেখালো, রাধাচূড়া গাছের ডালে একটা পরগাছা, তাতে সাদা ধবধবে একগুচ্ছ ফুল ফুটেছে। সদাব্রত নাগকেশর ফুল চেনেন না, বললেন, 'এটা নাগকেশর নয়?'

'আরে না, না।' ছেলেটি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। ফুটপাথে হাঁটু গেড়ে বসে ডান হাতের কব্জি বেঁকিয়ে দেখাতে লাগলো নাগকেশর ফুল আসলে কি রকম। মানু মেয়েটি তখন পার্কের রেলিঙের উপর লুটিয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মিনিট কয়েক আগের ব্যাপারটা সদাব্রত কিছুটা অনুধাবন করতে পারলেন। কিন্তু ছেলেটির কি মাথা খারাপ, একে কি কোনো পাগলা গারদে দেখেছি, নাগের বাজারে মানসিক সদনে! না, তাও তো ঠিক মনে হয় না। এই সব ভাবতে ভাবতে সদাব্রত ফিরলেন, তখনো ছেলেটি ফুটপাথে উবু বসে রয়েছে।

পরের দিন আবার শনিবার। এই শনিবার ইলেকট্রিক শক নিতে হয়েছে। ভীষণ যন্ত্রণা, সমস্ত শরীরে ব্যথা, মাথা দপ দপ করছে। যে সব দিনে শক নেন, সদাব্রত সারাদিন মানসিক সদনেই থাকেন, সন্ধ্যার দিকে এই ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন। মানসিক সদনে যতক্ষণ ছিলেন বেশ ভালোই ছিলেন। কিন্তু ফ্ল্যাটে এসেই অনুভব করলেন সেই পুরানো গোলমালটা, সেই মাথার মধ্যে, না ঘরের মধ্যে, না কোথায় কাছাকাছি—ও অসহ্য, অসহ্য বোধ হতে লাগলো। দুটো বালিশ দিয়ে মাথা চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

রাত দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ ভয়ঙ্কর হই-চই চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙলো তাঁর। যখন ঘুম ভাঙলো, চমকে উঠলেন, সমস্ত ঘর ভর্তি আলো। তাড়াতাড়ি উঠে জানালার কাছে দাঁড়াতেই ভীষণ হল্কা লাগলো গায়ে।

ফ্ল্যাটের লাগোয়া একটা রঙের ফ্যাক্টরী, সেটা দাউদাউ করে জ্বলছে। বাতাসের ঝাপটায় আগুন ফুঁসে ফুঁসে এই ফ্ল্যাট বাড়িটার গায়ে একটা করে ঝাপটা দিচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম সবাই ছুটে নামছে। সদাব্রত মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন, সামনেই সিঁড়ি— এত বড় ফ্ল্যাট বাড়িটার সমস্ত লোক একসঙ্গে নামার চেষ্টা করছে। তাও খালি হাতে নয়। যে যার মূল্যবান জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নিয়েছে। কারো হাতে পুঁটলি, কারো মাথায় ট্রাঙ্ক। সদাব্রতবাবু একবার ভাবলেন; তারপর আর ঘরের দিকে ফিরলেন না, যা হয় হবে, আগুনে যদি সব পুড়েই যায়, কিছু বাঁচানোর চেষ্টা না করাই ভালো। সকলের সঙ্গে তিনিও সিঁড়ি ধরে নামতে লাগলেন।

নিরাপদ ব্যবধানে সবাই উল্টোদিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালো। এরই মধ্যে কেউ কেউ ভয়ঙ্কর কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য খোঁজ নিয়ে জানা গেলো বাড়ির মধ্যে ঠিক কেউ আটকে যায়নি আর আগুনও এখন পর্যন্ত বাড়িটাকে ধরেনি। রঙের ফ্যাক্টরীটাই জ্বলছে, খুবই দাউদাউ করে জ্বলছে, বহুদূর পর্যন্ত আলো ছড়িয়ে গেছে, চতুর্দিক থেকে ক্রমাগত লোক দৌড়ে এইদিকে আসছে, আশেপাশে বাড়িগুলির জানলায়, বারান্দায় ছাদে ভিড় জমে গেছে। এই সময় ঘণ্টা দিয়ে দমকল এসে পৌঁছালো। ভীষণ ভিড়ের মধ্যে দমকলের গাড়ি ঢুকতে পারছে না। এমন সময় সেই ছেলেটি হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো, এসে ভিড় সরিয়ে দমকলের গাড়ির জায়গা করে দিলো। তারপর সদাব্রতর খুব কাছাকাছি এসে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো, 'মানু, এই মানু।'

সদাব্রত বুঝলেন, সেদিনের সেই মেয়েটিকে ডাকছে। পেছন দিক থেকে চাপা গলা শোনা গেলো, 'কি চেঁচামেচি করছো, এই যে আমি এখানে।'

'আমার খাঁচা এনেছো, আমার খাঁচা?' ছেলেটি ভীষণ ব্যস্ত।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এলো, 'গয়নার বাক্স নিয়েই বেরোতে পারি না, আবার খাঁচা!' গলার স্বরে একটু তিক্ততা।

'আমার খাঁচা। আমার খাঁচা।' ছেলেটি পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে ছুট দিলো।

'এই শোনো, শোনো।' মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে ওকে ডাকতে লাগলো। দু-একজন লোক চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে মশায় পাগল নাকি?'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ঊর্ধ্বশ্বাস ছেলেটির পায়ের দুমদাম শব্দ সিঁড়িতে শোনা গেলো, উঠলো, নামলো, তারপর আবার এক ছুটে রাস্তার এই পাশে, একেবারে সদাব্রতর পাশে। দুহাতে

দুটি খাঁচা, রাত্রিবেলা বলে বোধ হয় পর্দা দিয়ে ঢাকা।

এতক্ষণ সদাব্রত সব লক্ষ করছিলেন। এইবার ছেলেটি খাঁচা দুটি সদাব্রতর পায়ের পাশে মাটিতে রেখে হাঁফাতে লাগলো। এর মধ্যে মানু নামে মেয়েটিও এগিয়ে ওদের পাশের দিকে চলে এসেছে।

খাঁচার ভিতরে পাখির পাখার ঝটপটানি শোনা গেলো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো কি একটা কথা সদাব্রতর মনের মধ্যে খেলে গেল' তাঁর হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, তিনি একবার ছেলেটির দিকে, একবার খাঁচা দুটির দিকে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর হঠাৎই ঝট করে ছেলেটির হাত চেপে ধরলেন। 'এই যে আপনি...'

ঘটনার আকস্মিকতায় ছেলেটি যেন একটু হতভম্বই হয়ে গেছে। সে কি একটা কথা বলার জন্যে হাঁ করলো, শুধু ''আ-আ-আজ্ঞে'' এইটুকু বলার আগেই সদাব্রত তার হাত ধরে একটা জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। এই মুখভঙ্গি, তাঁর ভয়ঙ্কর পরিচিত এবং এর থেকে যে উত্তর বেরিয়ে আসবে তা তাঁর প্রায় মুখস্থ। তিনি প্রায় চিৎকার করেই উঠলেন। 'না, আপনার দাদাকে আমি কোথাও কখনো দেখিনি। আমি ধানবাদ যাইনি। ভাগলপুর যাইনি। মুঙ্গের যাইনি। জীবনে স্টেশনমাস্টার দেখিনি।' উত্তেজনায় সদাব্রতর সারা শরীর কাঁপছে।

ছেলেটি হতচকিত অবস্থায় আবার কি যেন বলার জন্যে হাঁ করলো, কিন্তু এবারও সদাব্রত সুযোগ দিলেন না। 'আপনার ছোড়দা, যার রঙ খুব ফর্সা, স্বাস্থ্য খুব ভালো, তার উপরে বেঁটে, খুবই বেঁটে, যার সঙ্গে আপনার চেহারার একেবারেই মিল নেই, আপনার ভাই বলে মনে হয় না, না— তাকে কোথাও দেখিনি। আপনাকেই দেখেছি। আপনি এই এই ফ্ল্যাট বাড়িতেই থাকেন?'

বিমূঢ় ছেলেটিকে উদ্ধার করতেই মেয়েটি এবার কথা বললো, 'হ্যাঁ, কিন্তু তাই কি হলো?''

'আপনারা দোতলায় পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন?' উকিলের মত জেরা সদাব্রতর।

'হ্যাঁ' খুবই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো মানু। ছেলেটি কোনো কথাই বলছে না।

'হ্যাঁ' প্রায় ভেংচে ওঠেন সদাব্রত, 'আমি থাকি ছয় নম্বর ফ্ল্যাটে, আপনার পাশের ফ্ল্যাটে' বিড়বিড় করতে থাকেন তিনি। তারপরেই আবার বিস্ফোরণ, 'আপনাদের ঐ খাঁচায় পাখি আছে,— কি পাখি ওদুটো ঘুঘু পাখি?'

এই সময় খাঁচার মধ্য থেকে পাখি দুটো ডেকে উঠলো, 'ঘু উ-উ-উ, ঘু-উ-উ-উ, ঘু-উ' এবং সঙ্গে সঙ্গে সদাব্রত অজ্ঞান হয়ে গেলেন। মানু পাশেই দাঁড়িয়েছিলো, মাটিতে পড়তে দিলো না, দুহাত দিয়ে জাপটে ধরলো সদাব্রতকে।

যখন জ্ঞান ফিরলো সদাব্রত দেখলেন তিনি নিজের ফ্ল্যাটে বিছানায় শুয়ে আছেন। ফ্ল্যাট বাড়িটাতে আগুন লাগতে পারেনি, তার আগেই রঙের ফ্যাক্টরিটার আগুন দমকলের লোকেরা নিবিয়ে ফেলেছে। তখন ভোর হয়ে আসছে, জানলা দিয়ে ফিকে আলো, একটু হিম হিম বাতাস আসছে। মাথার কাছে একটা চাদর থাকে সেটা টানতে গিয়ে কার গায়ে হাত লাগলো, তিনি উঠে বসলেন। মাথার বালিশের পাশে খাটের গায়ে হেলান দিয়ে মানু বসে রয়েছে, একটু দূরে ছেলেটি। মানু বোধ হয় সারারাত্রিই তাঁর পাশে বসেছিলো। এখন ঘুমে চোখ জড়ানো ছেলেটি সিগারেট খাচ্ছিলো। তাঁকে উঠতে দেখে সিগরেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলো।

মানু প্রথম কথা বললো, 'এখন কেমন বোধ হচ্ছে?'

'ভালো।' সদাব্রতর এখন ভালোই লাগছিলো।

'আমরা খুব চিন্তায় পড়েছিলাম।' মানু বললো, ছেলেটি চুপ করে আছে।

'আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বুঝি?' সদাব্রত জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, ঘুঘুটা খাঁচায় ডেকে উঠলো আর আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এতবড় আগুন লাগলো, এত দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি তারপর সামান্য ঘুঘুর ডাক শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন?' মানু হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করলো।

সদাব্রত ম্লান হাসলেন, 'রিটায়ার করার পর থেকে একলা এই ফ্ল্যাটে আছি। যখন-তখন ঘরে বসে ঘুঘুর ডাক শুনি। আমি কি আর ভাবতে পেরেছি আমার পাশের ফ্ল্যাটে কেউ ঘুঘু পোষে! আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে আমি মাথার চিকিৎসা করছি, তিন বছর ইলেকট্রিক শক নিচ্ছি, এই ঘুঘুর ডাক মাথার মধ্যে শুনতে পাই বলে।'

মানু অত্যন্ত লজ্জিত মুখে ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর বললো, 'দেখুন কি কাণ্ড। ওঁর যত সব উদ্ভট শখ। ঘুঘু পাখি, নাগকেশর ফুল। আমিও একদিন পাগল হয়ে যাবো।'

সদাব্রত যুবকটির বর্তমান অসহায়, অপ্রস্তুত অবস্থা অনুমান করে কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলেন। এর সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক। মেয়েটির নাম মানু, বেশ নাম, কিন্তু এর নাম কি? ছেলেটিকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনাকে...'

কথা শেষ করতে হলো না। তার আগেই ছেলেটি মুখ খুললো। সেই মুখস্থ উত্তরমালার বহু পরিচিত মুখভঙ্গি। আবার সেই ধানবাদ স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, সেই একেবারে অমিল চেহারার ছোড়দা।

ভাগ্যিস, এই সময়ে দুটো ঘুঘু ডেকে উঠলো, 'ঘু-উ, ঘু-উ, ঘু-উ-উ, ঘু-উঁ' সদাব্রত বেশ জোরে মাথায় একটা ঝাঁকি দিলেন; না, মাথার মধ্যে নয়।

সাক্ষাৎকার

কোনো বৃদ্ধা বাঙালিনী যে এমন সাহেবী কায়দায় চোস্ত হতে পারেন আদিত্যের বাবার রাঙামামিমাকে না দেখলে বিশ্বাস করাই দায়। সধবা অবস্থায় দেখেছিলো আদিত্য লালপাড় গরদের শাড়ি, কপালে ফুল-মুন সাইজের সিঁদুরের ফোঁটা অথচ তাঁর চালচলন যে-কোনো মেমসাহেবকে লজ্জা দিতে পারে। তাঁর ছুরি কাঁটা চালানো দেখলে তাঁকে অনায়াসে মহিলা-সব্যসাচী বলা যায়। বাবার রাঙা-মামা তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এঞ্জিনিয়র, তার সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরতে হতো মাধুরীদিদিমা অর্থাৎ বাবার ঐ রাঙামামিমাকে। একবার এক ডাকবাংলোয় কি ভীষণ আরশোলা, আর আরশোলা মানেই, সব মেয়েদের যা হয়ে থাকে মাধুরীদিদিমারও তাই; ঝাঁকে ঝাঁকে আরশোলা উড়ছে, বসছে আর ঘরের এককোণায় দরজার হুড়কো হাতে দিদিমা শশব্যস্ত। হুড়কোতে তেমন জুত হলো না, রাতে শোবার সময় খাবার টেবিলের ছুরি-কাঁটা নিয়ে শুলেন, তারপর সারারাত চললো নিপুণহাতে ছুরি-কাঁটা, পরদিন সকালে আদিত্যের

বাবার রাঙামামা মানে মাধুরীদিদিমার স্বামী শুনে দেখেছিলেন রাতে ছুরির আঘাতে খণ্ডিত হয়েছে একশো সাতাশটা আর কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছে তিনশো এগারোটা আরশোলা, খাটের নিচে মরে ছড়িয়ে রয়েছে।

সেই মাধুরীদিদিমার ওখানে গিয়ে উঠলো আদিত্য। একেবারে বাক্স-বিছানা নিয়ে। সোনাপিসিমা বলে দিয়েছিলো, 'চাকরি না পেলে বাড়ি ছাড়বি না কিছুতেই, রাঙামামিমা এত লোককে কাজ জুটিয়ে দিলেন আর তোকে দিতে পারবেন না। একেবারে ঘাড়ে চেপে বসবি, কত সাহেবসুবো ওর হাতের মুঠোর মধ্যে, কাজ নিয়ে তবে বাড়ি ছাড়বি।'

আদিত্য তাই করলো, 'চলে এলাম দিদিমা, তোমার এখানে।'

'ভালোই করেছিস', কানের কাছের পাকা চুলগুলোয় কি একটা লালরংয়ের বিলিতি তেল ব্রাশ দিয়ে মাখাতে মাখাতে দিদিমা বললেন, 'টমিটা মরে যাওয়ার পর থেকে কি যে মনমরা হয়ে আছি। তোর বাবা থাকতে তবু এক-আধটু খোঁজ-খবর নিতো, তোরা ভুলেও এদিকে মাড়াস না।'

টমির উল্লেখে আদিত্য একটু আহত হলো, টমি কুকুরের নাম। শুধু সেই জন্যে নয়; ছোটবেলায় সে ; আদিত্য একবার বাবার সঙ্গে বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছিলো, এই কুকুরটা তার হাঁটুর ওপর এমন কামড়ে দিয়েছিলো যে এখনো দুটো দাঁতের ছাপ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। হাঁটুর ওপরে সেই জায়গাটায় হাত বোলাতে বোলাতে আদিত্য তেরো বছর আগে মরে যাওয়া লোম উঠে যাওয়া কানে ঘা-ধরা একটা পাজি খ্যাঁক খ্যাঁক বিলিতি কুকুরের শোকে মুখে যতটা করুণ ভাব আনা উচিত তার চেয়ে কিছু বেশিই ফুটিয়ে তুললো।

মাধুরীদিদিমা বোধহয় খুশিই হলেন, বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'আদিত্যের জিনিসপত্র পশ্চিমমুখো ঘরটাতে রাখবি, অ্যাডেন সাহেব এলে তো ঐ ঘরের জানালা দুটোর মুখোমুখি। তারপরে এতকাল টমি থাকলো, সেবার বর্ষাকালে কি একটা পোকার অত্যাচারে জামগাছ তিনটেই শুকিয়ে মরে গেলো আর টমিটাও বাঁচলো না।'

এবার আদিত্যের মুখে তিনটে জামগাছের শোক যোগ করতে হলো টমিকুকুরের শোকের সঙ্গে। তারপর যেন কোনো শোকযাত্রায় যোগদান করেছে এই রকম ভঙ্গিতে বেয়ারার পিছু পিছু উঠে গেলো দোতলায় তার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরের দিকে।

রাতে খাওয়ার টেবিলে মাধুরীদিদিমাকে কথাটা বললো আদিত্য, একটু আমতা আমতা করেই বললে, 'দিদিমা, আজ পাকা দেড় বছর পাশ করার পর বসে আছি, তোমার তো এতো সাহেব-সুবোর সঙ্গে ভাবসাব, একটা কিছু কাজটাজ জুটবে না আমার?'

'আমার কি আর সেদিন আছে রে? আদিত্যর দাদু যখন বেঁচেছিলো, অ্যাডেন সাহেব প্রত্যেক ইয়ারে এ বাড়িতে আসতো, আমাকে দেখলেই বলতো সুইটি, আর টমিকে বলতো লেজি চ্যাপ্। টমিকে তো ও-ই দেশ থেকে এনে দিয়েছিলো। নটিংহামে ওর দেশের বাড়ির বারান্দায় তোলা টমির মাকে কোলে নিয়ে ওর মায়ের ছবি এখনো আমার গরম কাপড়ের বাক্সে রয়েছে। পোকায় কেটে দিচ্ছে বলে ন্যাপথলিন দিয়ে রেখে দিয়েছি। ভাদ্রমাসে একবার করে রৌদ্রে দিই। তুই দেখবি?' মাধুরীদিদিমা উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন, মিনিট পনেরো পরে একটা কাঁচখোলা ফ্রেমে ফটোটা নিয়ে এলেন। এখন আর ফটো বলা উচিত নয়, পুরোটাই উঠে গেছে। দিদিমা

আঙুল দিয়ে বোঝালেন ? 'এইখানে টমির মায়ের ফটো ছিলো, এই যে অল্প একটু বাঁকানো মতো দেখছো এইটা ওর লেজ আর এই অ্যাডেনের মায়ের কাঁধের বাঁ দিকটা দেখা যাচ্ছে।'

'ও'। তাই তো?' উৎসাহের ভাব নিয়ে আদিত্য খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখলো। কিন্তু চাকরির কথাটা ?

দিন সাতেক এইভাবে চললো। যখনই কাজের কথা ওঠে, টমি কুকুর আর অ্যাডেন সাহেব এসে পড়ে। নিঃসন্তান বিধবার আর কিই বা বলবার থাকতে পারে। আদিত্য যেন অর্ধেক হয়ে পড়লো। বাবার মামাবাড়িতে কতদিন বেকার বসে থাকা যায় ?

একদিন দিদিমা বললেন, 'কাজ পাওয়া কি সোজা ? এলি না অ্যাডেন সাহেবেব আমলে, তোকে খাঁটি বিলিতি কোম্পানিতে ঢুকিয়ে দিতাম। পার্থ, তোর বাবার মাসতুত ভাই, জেনারেল ম্যানেজার হয়ে রিটায়ার করলো গতবার। অ্যাডেন সাহেবকে বলে আমিই তো ঢুকিয়েছিলাম।'

আদিত্য মনে মনে ভাবে, একটা কুকুর কতদিন বাঁচে। তেরো বছর আগে যে কুকুরটা মরে গেছে, সেটাকে যে-সাহেব দিয়েছিলেন, যে-সাহেব তার পার্থকাকাকে গতবাব রিয়াটার হতে দেখলো, সেই সাহেবের আমলে মাধুরী দিদিমার কাছে থাকতে গেলে তাকে সোজা প্যারাম্বুলেটার চড়ে কাজে আসতে হতো।

'আমি নিজের পায়ে দাঁড়ানো শেখবার আগেই অ্যাডেন সাহেব কিন্তু বিদায় নিয়েছেন দিদিমা।' আদিত্য বিনীতভাবে জানায়।

মাধুরীদিদিমা একটু করুণ হেসে বললেন, 'সে সব কি আজকের কথা নাকি। সে বছরই, অ্যাডেন সাহেব যেবার শেষবার হোমে চলে গেলেন, টমিটা ডাক-পিওন ভেবে একটা বিটেব সেপাইকে কামড়ে দিয়ে আমাদের কি গোলমালে ফেলেছিলো! ভাগ্যিস তোব দাদু তখন বেঁচে।'

এর মধ্যে মাধুরীদিদিমা একটা পরামর্শ দিলেন আদিত্যকে, 'আদি, শোন, একটা খাঁকি হাফপ্যান্ট, জামা আর সাদা ক্যানভাসের সু কিনে আন্। আমাদের এই আলিপুর থেকে গড়েব মাঠ কতটুকুই বা দূর, আর্লি মর্নিং এ উঠে চলে যাবি, তারপর ঐ প্যান্ট আর সু পরে ভিকটোরিযা মেমোরিয়ালের সামনে দৌড়োবি।'

'কেন দিদিমা, আমার স্বাস্থ্য তো ভালোই। আর অত ভোরে ঘুম থেকে ওঠা বাবা আমাব কর্ম নয়, এত কষ্ট আমার সইবে না।' আদিত্য আপত্তি জানায়।

'কষ্ট না করলে তো চাকরি হবে না আদি। জানিস্, মরার আগের দিন পর্যন্ত টমি, যত দূরই ছুঁড়ে দিই না কেন, দৌড়ে আমার হাতে বল তুলে এনে দিয়েছে।'

আদিত্য এখন আর টমির প্রসঙ্গ তুলনায় আহত হয় না 'কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দৌড়ালে কি চাকবি হবে?'

'তা হবে না কেন ? কত লোক তো এভাবেই কাজ পেলো, সকালে ওখানে কতো লাট-বেলাট, রাজা, জমিদার মর্নিং ওয়াক করতে যায় তারা দেখবে এডুকেটেড ইয়ং বেঙ্গলী হেল্‌থের ওপর, চাই নজর দিচ্ছে, তাদেরো নজর পড়বে তোর ওপর কি তোর কপাল খুলে যেতে পারে।' দিদিমা খুব বিশ্বাসের সঙ্গেই কথাগুলো বলেন।

'রাজা জমিদার কবে দেশছাড়া হয়ে গেছে, আর লাটবেলাটও নেই, থাকলেও তারা আর গড়ের মাঠে মর্নিং ওয়াক্ করে না। আজকাল ওখানে যত বাজে লোক যায়, তারা আমাকে

বড়জোর ভূষিমালের গো-ডাউন ক্লার্কের চাকরি দিতে পারে', একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আদিত্য বলে, 'তা পেলেও হয়, কিন্তু তাও পাওয়া যাবে না ওদের কাছ থেকে।'

মাধুরীদিদিমা অবুঝ নন, কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, ঠিকই বলেছিস সেদিন কি আর আছে রে আদিত্য, অ্যাডেন সাহেবও চলে গেলেন, আর দেশটা বাজে লোকে ভরে গেলো, টমিটা পর্যন্ত মরে গেলো। আদিত্যের ভাগ্য আজ প্রসন্ন বলতে হবে, মাধুরীদিদিমা কি ভেবে একটু পরে উঠলেন, তারপর ময়লা, মলাট ছেঁড়া একটা পুরানো ডায়েরি এনে আদিত্যকে দিলেন। আদিত্য দেখলো সেটা চুয়াল্লিশ সালের একটা ডায়েরি, অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া কালিতে কিছু কিছু ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা। অর্ধেক রাস্তার নাম এখন পাল্টে গেছে, আর বি বি, পি কে, এসব ফোন নম্বরই বা কোথায়? মাধুরীদিদিমা বলেন, 'ঠিকানাগুলো পড়ে যা তো আদি।'

কষ্ট করে, অনুমান করে কয়েকটা ঠিকানা পড়লো আদিত্য। মাধুরীদিদিমা শোনেন আর বলেন, 'ফুলটন সাহেবও তো মরে গেছে, বাপু! কি বললি, এম কে বসু, ওরা তো বাড়ি পাল্টেছে, এখন আর ভবানীপুরের বাড়িতেই নেই, নতুন ঠিকানা নেই? না? ফ্রেমজিসাহেব, সে তো কানপুর চলে গেছে শুনেছি। কি নাম পড়লি, গোপাল গাঙ্গুলী, চিনতে তো পারছি না, ওটা কি, ও ভরদ্বাজ দত্ত, সোমসাহেবের ভাগ্নে বোধ হয়। কি ঠিকানা? আচ্ছা দাগ দিয়ে রাখ তো।'

এইরকম ভাবে ছয়টা ঠিকানায় দাগ পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে পোস্টকার্ড আনিয়ে প্রত্যেককে চিঠি দিলেন দিদিমা। কি লিখলেন কি জানি। একটা চিঠিরও উত্তর এলো না, ঠিকানাই কি ঠিক আছে, আদিত্য আশা প্রায় ছেড়ে দিলো। সেই সময়ে একদিন এক উর্দিপরা বেয়ারা এসে চিঠি দিয়ে গেলো, কে এক ডাবলু, লালওয়ানি চিঠি দিয়েছে, তার বাবাকে লেখা চিঠি সে পেয়েছে, তার বাবা আজ প্রায় পনেরো বছর গত হয়েছেন, কিন্তু মাধুরীদিদিমাকে সে চেনে, ছোটবেলায় তাঁর কথা অনেক শুনেছে, দেখেওছে দু-একবার। এ বাড়িতে একবার এসেওছিলো মায়ের সঙ্গে। মাধুরীদিদিমার যদি কোনো কাজ তাকে দিয়ে হয় সে খুব খুশি হয়েই করবে।

মাধুরীদিদিমা চিঠিটা পড়ে একটু আনমনা হয়ে বসে রইলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তাহলে ও হলো ঝুমেলার ছেলে। ঝুমেলার তো এই সেদিন বিয়ে হলো, কি সুন্দরী ছিলো ঝুমেলা, সব হীরের গয়না বেনারসী ছাড়া পরতো না, তার ছেলে এত বড় হয়েছে!' আদিত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তুই ওর সঙ্গে গিয়ে একদিন আমার নাম করে দেখা করে আয়।''

আদিত্য বললো, 'তার চেয়ে তুমি ব্যাপারটা লিখে জানাও, তারপরে আমি যাই, প্রথমেই দুট করে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

আবার চিঠি গেলো, এবার খুব তাড়াতাড়ি উত্তর এলো। আশাতীত উত্তর, আমাদের এখানে দু-একদিনের মধ্যেই কিছু নতুন লোক নেয়া হবে, তোমার নাতিকে দরখাস্ত পাঠাতে বলো। সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত; আর প্রিপেড টেলিগ্রামের মতো ইন্টারভিউ লেটার এসে গেলো আদিত্যের।

বেশ বড়ো সাহেবী ফার্মের ঝকঝকে বণ্ড কাগজে সুন্দর করে ছাপানো প্যাডে সাক্ষাৎকারের জন্য বিনীত অনুরোধ। আদিত্য যাকে বলে আহ্লাদিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু বাদ সাধলেন মাধুরীদিদিমা, 'তোর স্যুট আছে তো আদি?'

'স্যুট পাবো কোথায় দিদিমা, দুটো প্যান্ট আছে। দেখছোই তো।'

আদিত্যের কথা শুনে মাধুরীদিদিমা যেন চমকে উঠলেন, 'এই প্যান্ট পরে ইন্টারভিউ হয় নাকি! সাহেবদের কোম্পানী, ঢুকতেই দেবে না খালিগায়ে।'

'খালিগায়ে কেন, সার্ট গায়ে দেবো তো।' আদিত্য বলে।

'কোট না থাকলে ওই খালিগায়ে হলো। তোর তো টাই-ও নেই।' মাধুরীদিদিমা উঠে পাশের ঘরে গেলেন, অনেকক্ষণ ধরে খুটখাট কি সব শব্দ হতে লাগলো। তারপর একটা কোঁচকানো ইস্তিরি ভাঙ্গা কোট-প্যান্ট হয়তো হবে আর একটা পোকায় খাওয়া লাল পদ্ম আঁকা নেকটাই নিয়ে ফিরলেন। 'তোর দাদুর জিনিস, র‍্যাঙ্কেন থেকে তৈরী সব, দ্যাখ তো তোর লাগে নাকি?'

'এগুলো গরমের নাকি?' আদিত্য হাতে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করে।

'তাতে কি? দু ঘন্টার তো মাত্র ব্যাপার, যাবি আর ফিরে এসে ছেড়ে ফেলবি।'

ভাদ্র মাসের দুপুরে গরম স্যুট পরে দেখতে হাঁদা লাগে কিনা। ঠিক লাগলো না, তবে কি আর করা যাবে, দেখাই যাক না, একবার কাচিয়ে নিতে হবে, হাতে আর তিনদিন সময় আছে, আর টাই, টাই তো কখনোই ব্যবহার করেনি আদিত্য, একবার চেষ্টা করেছিলো। কেমন গলা বন্ধ হয়ে আসে। 'টাই-ও পরতে হবে নাকি?'

'স্যুট পরবি, টাই পরবি না, কুকুরে কামড়িয়ে দেবে যে।' যা হোক মাধুরীদিদিমার কথামতো চলতে হবে, স্যুটটা কাচতে দিয়ে এলো, আর্জেন্ট, সাত টাকা লাগবে আর সেই সঙ্গে সস্তা একটা তিন টাকা দামের টাই কিনে নিয়ে এলো চৌরঙ্গীর ফুটপাথ থেকে।

ঝুলটা একটু কম, পিঠের কাছটা একটু বেশি তোলা, হাতা দুটো একটু টানাটানা, পুরানো ডবল ব্রেস্ট ছয় বোতামের কোট আর মাজার কাছে একটু আঁট-সাঁট প্যান্ট, শেষ বর্ষার গরমে ঘেমে নেয়ে উঠলো আদিত্য গরম স্যুট পরে। টাই-বাঁধা ব্যাপারটা যে এতো জটিল, এতো রহস্যকর সেটাও আবিষ্কৃত হতে সময় লাগলো না। মাধুরীদিদিমা সামনে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করে দেখছিলেন, আদিত্যের কাজকারবার দেখে একটু ঠোঁটটিপে হেসে তারপর টাইটা নিজের হাতেই বেঁধে দিলেন। খুব যত্ন নিয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিলেন, 'এবার আয়নায় নিজেকে দ্যাখ।' ঘামতে ঘামতে নিজেকে দেখলো আদিত্য, তা মোটা-মুটি ভালোই দেখাচ্ছে। আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে একটু সলজ্জ হাসলো আদিত্য। মাধুরীদিদিমা চিবুকে একটা আলতো করে চুমু দিয়ে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা।' আদিত্য বেরিয়ে পড়লো।

লিফটে করে ছয়তলার ওপরে একটা ওয়েটিং রুমে আর পাঁচজন বসে। আদিত্যও গিয়ে বসলো। বহু ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি না পেয়ে পেয়ে খুব পাকাপোক্ত হয়ে গেছে আদিত্য। তবু এখনো বুক কাঁপে, তারপরে সাহেবী ফার্মে ইন্টারভিউ এই প্রথম। ওঃ যাঃ, আজকের কাগজ তো দেখে আসা হয় নি এতো গোলমালের মধ্যে। যদি এরা আজকের খবর-টবর কিছু জিজ্ঞাসা করে, আর তাই তো করবে, তাছাড়া কি করতে পারে? আদিত্য ভাবতে ভাবতে ঘামতে ঘামতে ভাবতে থাকে।

হঠাৎ সামনের ভদ্রলোক তার ব্যাগ খুলে একটা খবরের কাগজ বার করে পড়তে লাগলো। চাইবো, চাওয়া কি উচিত হবে। সাহেব কোম্পানির ইন্টারভিউতে নাকি সব সময়েই নজর রাখে, এই ওয়েটিং রুমে-ও রাখছে কিনা, যাকৃগে, ভদ্রলোক যে পাতাটা পড়ছেন তারই উল্টোপাতাটা তার সামনে, সেটা খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলো। কতটুকু বা পড়া গেলো, যেটুকু অংশে চোখ

ফেলতে পারলো সেটুকুই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার পড়ে মুখস্থ হয়ে গেলো। ভদ্রলোক পাতাটা ওল্টাতে যাচ্ছিলেন, আদিত্য পরের পাতাটার জন্যে বুভুক্ষুর মতো অপেক্ষা করছে, এমন সময় ডাক পড়লো প্রথমেই আদিত্যকে ডাকলো। আমাকেই প্রথমে কেন বোধ হয় বর্ণানুক্রমিক সাজিয়েছে, ভাবতে ভাবতে আদিত্য উঠলো।

এখানে আবার ইংরেজিতে বাক্যালাপ করতে হবে কতক্ষণ, কে জানে? মনে মনে কয়েকটা ইংরেজি বাক্য রচনা করতে করতে ধীর পদক্ষেপে আদিত্য বেয়ারার পিছুপিছু এগিয়ে গেলো। কি প্রশ্ন করবে, ইংরেজি ব্যাপারটা এতো খটমটে, তা ছাড়া এই গরম স্যুট, এই ভাদ্রমাস, এই দম বন্ধ হয়ে আসা টাইয়ের নট, আদিত্য জীবনে কোনোদিন, সারাজীবনে একসঙ্গে এত ঘেমেছে কিনা সন্দেহ।

বিরাট গোলটেবিলের ওপাশে চারজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক। একজন খুব অল্প বয়েসী, আদিত্যেরই সমবয়েসী হবে, বেশ সুন্দর দেখতে হবে, ওই বোধহয় লালওয়ানি হবে, রুমাল দিয়ে কপাল মোছা ভব্যতা হবে কিনা স্থির করতে না পেরে কোটের হাতা দিয়ে কপাল, গলা মুছতে মুছতে আদিত্য বসলো। প্রাথমিক বাক্যালাপ, নাম ঠিকানা, একটু জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তরগুলো দিলো।

কিন্তু দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসছে, টাইয়ের বাঁধনটা মাধুরীদিদিমা বড় শক্ত করে দিয়েছে, নাকি এই রকমই হয়, তারই অনভ্যাস, আর গরম স্যুট আর ইংরেজি বাক্যালাপ, কি কি কারণে গায়ে ফোস্কা পড়ে, কবে শীতের রাত্রিতে শুধু একটা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সে হি হি করে কেঁপেছিলো, আবোল তাবোল ভাবনা জুটতে লাগলো, ইন্টারভিউ দিতে এসে এতো অন্যমনস্ক আদিত্য আগে কখনোই হয়নি।

হঠাৎ আদিত্য শুনতে পেলো সেই অমোঘ জিজ্ঞাসা, 'আজকের খবরের কাগজটা পড়েছেন?'

একটু ইতস্ততঃ করে তারপর প্রায় তোতলাতে তোতলাতে আদিত্য জানালো, 'হাঁ, এই পড়া হয়েছে আর কি।'

'আজকের ইম্পর্টান্ট নিউজ কি?' আদিত্যের দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাঁ কনুইয়ে একটা ফোসকা বোধহয় এই মাত্র পড়লো, সোজা হয়ে বসে মরীয়ার মতো তাকালো, তারপর একটু থেমে স্থির গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো, 'পুরুলিয়ার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পরিত্যক্ত একটা কুয়োর মধ্যে একটা গরু পড়ে গিয়েছিলো। বারো ঘন্টা পরে দমকলের লোকেরা গরুটাকে তুলেছে।'

ইন্টারভিউ বোর্ডের একজন আরেকজনের কানে ফিসফিস করে কি বললো। যিনি ভারিক্কি গোছের মুখ করে মাঝামাঝি বসেছিলেন, তিনি বোধহয় চেয়ারম্যান কিংবা ঐ রকম কিছু, তিনি হাতের পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'ইন্টারেস্টিং!' শুধু অল্পবয়সী যুবকটি, নিশ্চয়ই লালওয়ানি, গম্ভীর মুখে বললো, 'দ্যাটস্ রাইট। এনিথিং মোর?'

'উত্তর তেহরানে বন্যার জল পাঁচ সেন্টিমিটার নেমে গেছে। এখন আর বিশেষ কোনো আশঙ্কার কারণ নেই।' আদিত্য যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গে জানালো।

আবার দুজন সদস্য কানাকানি করলো, চেয়ারম্যান বললেন 'ফানি।' লালওয়ানি বললো, চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়েই বললো, 'আমি সকালবেলা উঠে সব কাগজ প্রথম পাতার দিন

তারিখ থেকে শেষ পাতার সম্পাদকের নাম পর্যন্ত পড়ি। এসব সংবাদ আজকের কাগজে অবশ্য বেরিয়েছে।' তারপর আদিত্যের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এসব খবর আপনি ইম্পর্টান্ট মনে করছেন কেন? অর্থনৈতিক ব্যাপারে আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর নেই?'

আদিত্য যেন হাতে চাঁদ পেলো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছে। বোম্বের শেয়ার বাজারে 'বরাকর কোলস্'এর প্রেফারেন্স শেয়ারের দাম ছাব্বিশ পয়সা পড়ে গেছে। ইউ. পি. সরকার বারো বছর মেয়াদী লগ্নিশেয়ার ছিয়ানব্বই টাকা তেইশ পয়সা করে বাজারে ছাড়বেন সামনের সোমবার।' সংবাদটা জানিয়ে আদিত্য একবার নেকটাইয়ের ওখানটায় হাত বোলালো; গলা দিয়ে ভালো স্বর বেরোচ্ছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, ফাঁস আটকে মারা পড়বে নাকি শেষে, তা ছাড়া পিঠে বোধ হয় ফোসকার একটা একজিবিশান বসলো, কিন্তু একবার জানানো দরকার ঐ সাতের পাতা মানে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাতা আর তারই আশে-পাশের দুএকটা খুচরো খবর, খবরের কাগজের শুধু এইটুকু পড়ে আসবার সুযোগ পেয়েছে সে।

বোর্ডের মেম্বাররা যেন সবাই একটু অবাক হয়ে গেছেন, এমনকি লালওয়ানি পর্যন্ত। লালওয়ানিকে একবার আলাদা পেলে কথাটা বোঝানো যেতো, অন্তত টাইয়ের গিঁটটা খুলিয়ে নেয়া যেতো, উঃ, এ যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কোটটা খুলে ফেললে কি হয়, নেকটাইয়ের নটটা, নেকটাইয়ের নট কি করে খোলে!

আদিত্য বোর্ডের মেম্বারদের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলো তার আর কোনো আশা নেই। কিন্তু টাইয়ের নটটা খুলতে পারলে, দম আটকে না গেলে, সে হয়তো এদের ব্যাপার বোঝাতে পারতো। নট্‌টার নিচের দিকে হাত দিয়ে আদিত্য একটা টান দিলো। আরো একটু বসে গেলো যেন, তাহলে কি চাকরি জোটাতে এসে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবো? জোরে টাইটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলো আদিত্য, আর এবার সত্যিই ফাঁস আটকালো, একেবারে মরণফাঁস, চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে লাল টকটকে, ঘাড়ের পিছনটা টন্-টন্ করে উঠলো, আদিত্য লাফিয়ে উঠে পড়লো চেয়ার থেকে। কোটটা খুলে ফেললো একটানে কিন্তু টাই, যত টানে আরো আটকে যায়। এতে বিহ্বল ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যেরা ঘাবড়ে গিয়ে ক্রিং ক্রিং করে কলিং বেল বাজালেন। দুজন বেয়ারা ছুটে এলো।

আদিত্য গোঙাতে গোঙাতে বললো, এবার আর ইংরেজি নয়, সোজা বাংলায় মাতৃভাষায়,'পাগল টাগল কিছু নই স্যার, নেকটাই স্যার, গরম সুট স্যার, ভাদ্রমাস স্যার,' বেয়ারাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'কেয়া দেখতা হায়, গলামে ফাঁস লাগ গিয়া, টাই খুলনে জানতা?' বেয়ারারা হতবাক, আদিত্য এবার বোর্ডের মেম্বারদের বললো, 'আপনাদের নিশ্চয়ই মাধুরীদিদিমা টাই বেঁধে দেয়নি, এর মধ্যে কেউ যদি বাঙালী থাকেন, কেউ যদি আমার কথা এক বর্ণও বুঝে থাকেন দয়া করে প্রাণ রক্ষা করুন!'

কেউ বাঙালী ছিলো কিনা বলা কঠিন তবে একজন ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি উঠে এসে প্রায় জাদুকরের মতো টাইটা সামান্য চেষ্টায় খুলে ফেললেন, আদিত্য প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার'— এইবার ইংরেজিটা অল্প অল্প ফিরে এসেছে, 'লাইফ্ আগে, এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ্।'

এক গ্লাস জল এলো, কিন্তু তার আগেই পাশের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকে আঁজলাভরে প্রাণের সাধে দুই মগ জল খেয়ে নিয়েছে আদিত্য। এইবার ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমাকে কি আর কোনো প্রশ্ন করবেন?'

না, আর কোনো প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন করলেও উত্তর নয়, টাই পরে চাকরি করা হবে না। অসম্ভব।

এক সপ্তাহ পরে মাধুরীদিদিমা পার্শেলে একটা গরম সুট ফেরৎ পেলেন আর আদিত্যের জামাকাপড় সব রয়ে গেলো তাঁর ওখানে। তা থাকুক, অ্যাডেন সাহেব চলে গেলো, তিনটে জাপানী পাম গাছ মরে গেলো, টমি কুকুর মরে গেলো আর দু'চারটে পাজামা পাঞ্জাবি, জীবনে কত কিই তো জুটলো না।

কিন্তু দোতলার পশ্চিমমুখে ঐ ঘবটা বড় ভালো ছিলো, বড় খোলামেলা। আর চিবুকে আলতো চুমো, মাধুরীদিদিমা!

ভজহরি চাকলাদার

কি করিয়া কি হইল এখন গুছাইয়া লেখা সম্ভব নহে। তবে যাঁহারা আমাকে মহালয়ার দিন বিকালে গড়িয়াহাট মোড় হইতে ডবলডেকারে উঠাইয়া দিয়া নিশ্চিত ধরিয়া আছেন যে, আমি এখন রাঁচীতে মাতুলালয়ে মনোরম পরিবেশে শারদীয় অবকাশ অতিবাহিত করিতেছি তাঁহাদের অবগতির জন্যে জানাই রাঁচী পৌছাইতে পারি নাই, এমন কি কলকাতা ত্যাগ করিতেও পারি নাই। নারিকেলের দড়িতে বাঁধা বিছানা এবং পদ্মফুল-আঁকা উৎপলের বাড়ির চাকরের স্যুটকেস হারাইয়া এই শহরেরই একটি হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে শুইয়া শুইয়া যাহারা ক্রাচ্ ব্যবহার করে তাহাদেব পদধূলি কেহ পায় না, না এইরূপ বিষয়াদি ভাবিয়া সান্ত্বনা খুঁজিতেছি।

শ্যামল এবং ভাস্কর আমাকে যখন বাসে উঠাইয়া দিল তখন বিকাল পাঁচটা সতেরো, সাড়ে সাতটায় ট্রেন। সময় যথেষ্টই ছিল, কিন্তু রাস্তায় ভয়ঙ্কর ভিড় এবং তদুপরি আমাব ডবল্ ডেকারটির ড্রাইভার বোধহয় পূর্বে ট্রামের ড্রাইভারি করিতেন, তাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল একই লাইনে ট্রামকে ওভারটেক্ করা সম্ভব নহে। তিনি একটি মন্দগতি ট্রামের পশ্চাদানুসরণ করিতেছিলেন। অবশ্য হলফ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সেই ট্রামের জানালায় ঠিক আর কোনো আকর্ষণ ছিল না। শিয়ালদহের মোড়ে পৌনে সাতটা বাজিতে আমি সিট ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া ড্রাইভারের তারের জালের ভিতর দিয়া নাক গলাইয়া কহিলাম, 'দাদা, একটু দ্রুত করা কি সম্ভব? একটা গরুকে পেট্রল খাওয়াইলে ইহা অপেক্ষা দ্রুত যাইত।' দাদা একটু হাসিলেন, তাহার পর খাকি সার্টের আস্তিনে হাসিটুকু মুছিয়া নির্লিপ্তভাবে বলিলেন, 'কিন্তু আমি তো পেট্রল খাই নাই।'

শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম; কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মিনিট পনেরো-কুড়ি অতিবাহিত হইল, তখন বাস বড়বাজার পর্যন্ত আসে নাই। হাতে আর সময় নাই,

হাঁটিয়া গেলে তবু ট্রেন ধরা যাইতে পারে কিন্তু এই বাসে অসম্ভব। অবশ্য বাস হইতে অবতরণ সে আরো অসম্ভব; কেন যে ট্রান্সপোর্ট-কর্তৃপক্ষ বাসগুলির প্রত্যেক জানালায় ফায়ার ব্রিগেডের দড়ির সিঁড়ির বন্দোবস্ত করেন না!

আমি বিছানা এবং স্যুটকেস লইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলাম। করুণ কণ্ঠে 'একটু পথ' 'একটু পথ' প্রার্থনা করিলাম। সর্বত্রই রসিক যাত্রী থাকেন, তাঁহাদেরই কেহ ভিড়ের মধ্য হইতে প্রশ্ন করিলেন, 'এই ভিড়ে পথ আবার কি ? আপনাকে গার্ড অফ অনার দিতে হইবে নাকি ?' সম্মুখে প্যাঁটরাদি হাতে আমারই মত আরেকজন নামিবার চেষ্টায় ছিলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। পিছনে হইতে ভীষণ চাপ পড়ায় আমি ক্রমশ সম্মুখে হেলিয়া পড়িতেছিলাম। লেডিস সিটের প্রান্তবর্তী হইবামাত্র একটি জোর ধাক্কায় হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলাম। লোকের শরীরে যাহাতে গুঁতা বা ধাক্কা না লাগে, সেই জন্য স্যুটকেস এবং বিছানা এতক্ষণ দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া আসিতেছিলাম, এইবার ঐ দুইটি ছিটকাইয়া গেলো। সম্মুখবর্তিনী দণ্ডায়মানা একটি যুবতীর পৃষ্ঠদেশ বিছানার সহিত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কর্কশ নারিকেল দড়ি লাঞ্ছিত হইয়া রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অতখানি উন্মুক্ত না থাকিলে যে পরিধেয় বস্ত্রের উপর দিয়াই ঘটনাটি ঘটিয়া যাইত, তাহার দেহে আঁচড়মাত্র পড়িত না, ইহা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু সেই স্বল্পবাদিনী যদি স্বল্পভাষিণীও হইতেন, তবে আমার চর্তুদশপুরুষ সেইদিন কিঞ্চিৎ অন্যায় অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইতেন, এইটুকু বলিতে পারি। স্যুটকেসটি কি হইয়াছিল বলিতে পারি না। যদি ধ্বনি দ্বারা অনুমান সঠিক হয় তবে উহা কোনো হ্রস্ব ব্যক্তির শিরোপরি অধঃপতিত হইয়াছিল। সেই ব্যক্তিটি কিন্তু টুঁ শব্দটি করেন নাই; হয় বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল কিংবা জন্ম হইতেই বোবা। অবশ্য এমনও হইতে পারে উক্ত যুবতীর রোমহর্ষক বাক্যাদি শ্রবণ করিয়া তিনি আর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

ইতিমধ্যে কি এক অজ্ঞাত কারণে (আমার উৎক্ষিপ্ত মালপত্রাদিও অবশ্য ইহার কারণ হইতে পারে) সমস্ত বাসের মধ্যে দারুণ গৃহবিপ্লব দেখা দিল। যাঁহারা ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহারা বাসের ভিতর দিকে চাপ দিতে লাগলেন এবং ভিতরে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা প্রত্যুত্তরে অধিকতর চাপ দিতে লাগিলেন। যাঁহারা কলিকাতার বাসে যাতায়াতে অভ্যস্ত তাঁহাদের অবশ্য এই ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে কিছু ধারণা রহিয়াছে। এইরূপ নিঃশব্দ বিপ্লব পৃথিবীতে সচরাচর দেখা যায়। পরস্পর পরস্পরকে কনুইয়ের ধাক্কা দিতেছে এবং সহ্য করিতেছে। কিন্তু কাহারো মুখে কোনো শব্দ নাই। অবশেষে একটি প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে চলন্ত বাস হইতে আরো জন পনেরো লোকের সহিত আমারও পতন হইল। ভাগ্য ভাল, বাসটি দ্রুত সঞ্চরমান ছিল না, ফলে পরস্পর পরস্পরের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িলে যতটুকু আঘাত লাগে তাহার অপেক্ষা কেহই বেশি আহত হইল না। উপরন্তু এই আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে বাস হইতে নামিবার সুবিধা হওয়ায় সকলেই অল্প-বিস্তর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন, অন্তত তাহাই মনে হইল।

কিন্তু ততক্ষণে বিপরীত ফুটপাথে একটি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হইয়াছে। প্রথমে কিছু বোঝা গেল না, একটি তাঁতের শাড়ির দোকানের সামনে হুলুস্থুল কাণ্ড। মনুষ্যমাত্রেই গোলমাল পাকাইতে এবং জমাইতে ভালবাসে। আমিও স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসায় অগ্রসর হইলাম। বহু পরিশ্রমে নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, দুইটি অসম আকৃতির ব্যক্তি প্রবলভাবে নড়িতেছে। একজন অতি শীর্ণ, বেঁটে, অপরজন গাট্টাগোট্টা, লম্বা-চওড়া ধরনের। প্রথম ব্যক্তির তেজ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির বিক্রম বেশি বলিয়া মনে হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম জনকে দুই পায়ের ফাঁকে ফেলিয়া পিষিয়া ধরিয়াছে এবং শীর্ণ ব্যক্তিটি এই অবস্থায় তড়িৎ গতিতে হস্ত, পদ এবং মুখ চালনা করিতেছে।

বেশিক্ষণ এই দৃশ্য দেখিতে হইল না। শীর্ণ ব্যক্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল; এই সময় একজন বলশালী দর্শক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আগাইয়া গিয়া প্রথমোক্ত গাট্টাগোট্টা ব্যক্তিটিকে ধরিয়া এক ঝাপটা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ২নং ব্যক্তি পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া রাস্তার উপর দুম্ করিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু পদচ্যুত হইবামাত্র ২নং ব্যক্তির তেজ যেন আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ১নং ব্যক্তিকে পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আস্ফালন করিতে লাগিল। আমি এই ২নং ব্যক্তিটির নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলাম এবং অন্যান্য দর্শকের মতই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ২নং ব্যক্তিটি বেশি লাফালাফি করিলে আবার প্রচণ্ড মার খাইবে। আমি কর্তব্যবোধবশত তাহাকে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিলাম। আমি যদিও খুব সবল নহি কিন্তু ২নং ব্যক্তি এতই দুর্বল যে, যে কোন বালকও তাহাকে আটকাইতে সক্ষম।

১নং ব্যক্তিটি বলশালী ব্যক্তির বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া এতক্ষণ ফুঁসিয়া চলিয়াছে। আমি যে ব্যক্তিকে ধরিয়াছি সে দুর্দান্ত চিৎকার শুরু করিল। 'আমাকে এই মুহূর্তে ছাড়িয়া দিন, আমি উহাকে, ঐ কৃষ্ণ কুকুরশাবকটিকে শেষ না করিয়া ছাড়িব না, ছাড়িয়া দিন বলিতেছি....'

শীর্ণ ব্যক্তির গর্জনে আমার কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। এই সময় লক্ষ করিলাম যে নিঃশ্বাস লইবার অবসরে লোকটি চাপাস্বরে আমাকে কি যেন বলিতেছে, সে আরেকবার চিৎকার করিয়া তারপরে আমার পেটে কনুইয়ের খোঁচা দিয়া আবার ফিসফিস্ করিল। এইবার শুনিতে পাইলাম, 'অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না স্যার। ছাড়িয়া দিলে ঐ ষণ্ড আমাকে মারিয়া ফেলিবে।'

এইটুকু অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াই, শীর্ণ ব্যক্তি আবার প্রচণ্ড গর্জন করিতে লাগিল।

এই রকম মিনিট পাঁচেক চলিল, মধ্যে মধ্যে ভীষণ চীৎকার আস্ফালন এবং নিঃশ্বাস লইবার ছলে ক্ষীণ কণ্ঠে ছাড়িয়া না দিবার জন্য করুণ আকৃতি। এই শীর্ণ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিটির এইরূপ তেজ ও আত্মসম্মানবোধ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। রাজপথে অনুরূপ অবস্থায় সকলেই হয়তো এইরূপ করিয়া থাকে, কি জানি আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। চতুর্দিকে জনতা, বিশেষত পথিক-ললনাদের দৃষ্টির সম্মুখে কে আর কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতে চায়!

ইতিমধ্যে ১নং ব্যক্তিটি যে কি কৌশলে বলশালী রক্ষকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুহূর্তের মধ্যে এক ঝাপটায় আমার বাহুপাশ হইতে এই ২নং ব্যক্তিটিকে ছিনাইয়া লইয়া গেল সে রহস্য ঈশ্বর জানেন তবে আমি রাস্তায় গড়াইয়া পড়িলাম।

কে একজন আমাকে টানিয়া তুলিলেন, দেখিলাম ১নং ব্যক্তিকে যিনি ধরিয়াছিলেন তিনিই আমাকে তুলিয়াছেন। তুলিয়াই প্রশ্ন করিলেন, 'মহাশয়ের বুঝি পথ-কলহ নিবারণের অভ্যাস নাই?'

নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

তিনি বলিলেন, 'ইহারা মারামারি করিবে সে তো ভালো কথা, তাহাতে আমাদের কি; আমরা শুধু দেখিব যাহারা মারামারি দেখিতে ভিড় করিয়াছে তাহারা যেন নিরাশ না হয়। সুতরাং আমাদের কি করিতে হইবে?'

এমতাবস্থায় কি করিতে হয় জানা না থাকায় চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন, 'লক্ষ্য রাখিতে হইবে মারামারি বন্ধ না হইয়া যায়। যখন মারামারি চলিতে থাকিবে ধরিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজেরও আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যেইমাত্র থামিয়া আসিবে তখন দুইজনকেই ধরিতে হইবে, কিছুক্ষণ এইভাবে ছাড়াইয়া তাহাদের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া রাখুন, আবার আস্ফালন, গালিগালাজ হইতে হইতে যেই প্রবল উত্তেজিত হইল ছাড়িয়া দিন, আবার এক রাউণ্ড, আবার আটকান, আবার সামনাসামনি দাঁড় করাইয়া রাখুন, আবার লাগ্-লাগ্-লাগ্ আরেক রাউণ্ড। টাইমিং ঠিক করিতে পারিলে উপযুক্ত আম্পায়ার ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শক-সাধারণকে নির্দোষ আনন্দ দান করিতে পারেন।'

তাঁহার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। তিনি হঠাৎ 'গাড়ি', 'গাড়ি', 'অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি' করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং আমি কিছু বুঝিবার পূর্বেই তিনি এক ধাক্কায় আমাকে ফেলিয়া দিলেন, আমি অ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়িলাম।

যখন জ্ঞান হইল বুঝিলাম স্টেচারে শুইয়া আছি, সম্ভবত অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই। চারিদিক অন্ধকার, হাঁটুর নিচে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। ইহারই মধ্যে কে যেন নিচের স্ট্রেচার হইতে আমাকে অল্প অল্প খোঁচাইতে শুরু করিয়াছে। আমি 'উঃ, উঃ' করিতে লাগিলাম। নীচ হইতে কে বলিল, 'স্যার, আমিও আছি।'

'আমি, আমি কে?' আমি প্রশ্ন করিলাম, যদিও অনুরূপ বাক্যালাপোচিত শরীরের অবস্থা তখন নয়।

'আমি ভজহরি চাকলাদার।' উত্তর আসিল।

'কে ভজহরি চাকলাদার?' এই নামে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ব পরিচয় আছে বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।

'স্যার, সেই রাস্তায়!'

এইবার কণ্ঠস্বর যেন কিঞ্চিৎ পরিচিত মনে হইল। পথিমধ্যে আর দুইজনে কোনো কথা হইল না। হাসপাতালে পৌঁছিয়া ভজহরি চাকলাদারকে দেখিলাম, সেই কলহপরায়ণ, শীর্ণ ২নং ব্যক্তি।

হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে শুইয়া চাকলাদার মহাশয়ের সহিত আলাপ হইল। তিনি অমিতভাষী ব্যক্তি। তাঁহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত যেমন বিচিত্র তেমনই জটিল।

জানা গেল তাঁহারা পূর্বে চাকলাদার ছিলেন না। পুরাপুরি মনসাদার ছিলেন, শতাব্দী দেড়েক পূর্বে গ্রাম-প্রতিনিধিদের কি এক চক্রান্তে তাঁহারা তাঁহাদের উত্তরাধিকারগত উপাধি হইতে বিচ্যুত হন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, এখনো ধমনীতে প্রবলপরাক্রান্ত মনসাদার বংশের

রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহাদের এক পূর্বপুরুষ; কি নাম, বোধহয় বজ্রগর্জন মনসাদার দুইটি হাতির লেজে এমন গিঁট বাঁধিয়া দেন যে গিঁট কাটিয়া অপারেশন করিয়া (ষাট বৎসর পরে) তাঁহাদের জেলার প্রথম ভেটার্ণারি সার্জেন সাহেব হস্তী দুইটিকে আলাদা করিয়া দেন। সেই গিঁট-বাঁধা লেজ দুইটি এতকাল তাঁহাদের ঘরে গৌরবের সঙ্গে বিরাজ করিত, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে যেদিন রাত্রিতে গ্রামের মনসাঠাকুরটি বারোয়ারীতলা হইতে চুরি যায় সেই রাত্রি হইতে গিঁটবদ্ধ লেজ দুইটি পাওয়া যাইতেছে না। বিলাতে নাকি এইসব জিনিস আজকাল বহুমূল্যে বিক্রয় হয়, অবশ্য এই প্রসঙ্গে তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা হাবুল চাকলাদারকেই যে তাঁহার সন্দেহ তাহাও জানাইলেন।

কলিকাতা হইতে বত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হুগলি জেলার কলাগ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান। কলাগ্রাম যে আসলে চাকলাগ্রামেরই অপভ্রংশ তিনি তাহাও জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিলেন।

অতদূর হইতে আসিয়া কি করিয়া কলিকাতায় বড়বাজারে মারামারিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাও বলিলেন। বহু ধবাধরি করিয়া এতদিনে জমিদারি কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়াছেন। স্ত্রীর বহুদিনের শখ একটি তাঁতের ভালো শাড়ি। সেই শখ পূরণ করিতে আসিয়াই বিপত্তি। গ্রামস্থ এক বিষয়ী ব্যক্তি পরামর্শ দিয়াছিলেন, বড়বাজারে গিয়া দেবেন্দ্রমঙ্গল বসাক এণ্ড কোং-তে ক্রয় করিতে। বহু খুঁজিয়া, সারাদিন ভিড়ে ঘুরিয়া ক্লান্ত ঘর্মাক্ত অবস্থায় দেবেন্দ্রমঙ্গলের দোকান আবিষ্কার করিলেন। যখন ভিতরে ঢুকিতে যাইবেন দেখিলেন সামনে সাইনবোর্ডে দোকানের নামের নিচে লেখা 'এই বাড়ির দোতলায় আমাদের কোন ব্রাঞ্চ বা শাখা নাই'।

ভজহবি চাকলাদাব মহাশয়েব খটকা লাগিল। তিনি দোতলাতেই আগে যাইবেন স্থির কবিলেন। তিনি উপরে তাকাইয়া দেখিলেন দোতলাতেও একই রকম সাইনবোর্ড, তবে তাহাতে লেখা, 'এই বাড়ির একতলায় আমাদের কোনো ব্রাঞ্চ বা শাখা নাই'। কিছু স্থির করিবার পূর্বেই দুইদিক হইতে দুইটি লোক আসিযা তাঁহার দুই হাতে দুইটি হ্যাণ্ডবিল গুঁজিয়া দিল। দুইটিরই ভাষা মারাত্মক; সারাংশ এইরকম ঃ

'ভদ্রমহোদয়গণ, সাবধান! দালালদের দ্বারা প্রতারিত হইবেন না। এই বাড়ির একতলায় (ভিন্ন হ্যাণ্ডবিলে দোতলায়) যাহারা তাঁতের শাড়ি বিক্রয় করিতেছে তাহা বৈধ নহে। পূজায় আনন্দেব জন্য শাড়ি কিনিয়া জেল খাটিবেন না।'

ততক্ষণে হ্যাণ্ডবিলদাতাদ্বয় হাতাহাতি শুরু করিয়া দিয়াছে। একতলা এবং দোতলা হইতে ক্রমাগত লোক নামিয়া আসিয়া যে যাহার পক্ষে সম্ভব যোগ দিয়াছে। ভজহরিবাবুকে লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। এই এক পক্ষ টানিয়া তিন-সিঁড়ি উপরে লইয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষের আর এক হ্যাঁচকায় রাস্তায় ছিটকাইয়া পড়েন। জামার আস্তিন এবং কলার ছিঁড়িয়া গেল। জুতা হারাইয়া ফেলিলেন, টানাটানিতে হাত কিঞ্চিৎ লম্বা হইয়াছে বলিয়া তিনি এখন মনে করেন।

'তাহার পর কি হইল?' আমি প্রশ্ন করিলাম।

প্রশ্নের উত্তরে ভজহরিবাবু ম্লান হাসিলেন. 'কি হইল, আমিও জানি না। একটু পরে দেখিলাম দেবেন্দ্রমঙ্গলের দোকানের সামনে আমি একটি অপরিচিত ব্যক্তির দুই পায়ের ফাঁকে আটকাইয়া আছি। তাহার পরের ঘটনা সবই আপনি জানেন।'

আমিও ম্লান হাসিলাম।

আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজবাঁধা ভজহরিবাবু এবং আজানুমস্তক (পাঠক ভুল ধরিবেন না, এখন আমি পদচ্যুত) ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আমি দুইজনে এখন কড়িকাঠ গুনিতেছি।

ইনস্টলমেণ্টে কোথায় ক্রাচ্ পাওয়া যায় কেহ কি খবর দিতে পারেন?

জয়াবতী ও জয়গোপালের কাহিনী

(এক)

এই সামান্য কাহিনীর নায়ক-নায়িকা শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দাশগুপ্ত এবং শ্রীমতী জয়াবতী বসু পরস্পর নিতান্তই অপরিচিত। এই কাহিনীর বাইরে বা ভিতরে তাদের দুজনের মধ্যে কোনো সংশ্রব, আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত নেই।

শ্রীমতী জয়াবতী বসু আবহাওয়া অফিসের করণিক, বয়স চব্বিশ, চেহারা তেমন নয় বটে তবে জয়াবতী সুকেশী।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দাশগুপ্ত মধ্য কলকাতার একটা বয়স্ক শিক্ষণ নৈশ বিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের শিক্ষক, বয়স পঁচিশ, চেহারা প্রয়োজন নেই (এই কাহিনীতে)।

(দুই)

জয়াবতী সব বিষয়েই যে কোনো সাধারণ বাঙালী যুবতীর মতো। কিন্তু তার একটি প্রধান ত্রুটি হলো যে বড়ই ভুলো মন তার। কোনো সফল বা ব্যর্থ প্রেমই এই জন্যে দায়ী কিনা তা বলা কঠিন এবং এই কাহিনীতে তা আমাদের না জানলেও চলবে।

জয়াবতী প্রথম যখন কলেজে ভর্তি হয়, তখন প্রথম দু-তিন মাস তার মনেই থাকতো না কোথায় ক্লাস, এমন কি বিষয় আর্টস না সায়েন্স, সেটা খেয়াল রাখতেও তাকে বিশেষ কষ্ট করতে হতো।

পুরানো দু টাকার নোট বা নতুন দশ টাকার যে নোট হয়েছে সেটাকে এক টাকার নোট হিসেবে ভুল করে হয়তো অনেকেই খরচ করে ফেলে কিন্তু জয়াবতীই বোধহয় একমাত্র যে সিকি ভেবে বহু আধুলি দিয়েছে।

চটি, ব্যাগ, ছাতা, চশমা এই সব অস্থাবর জিনিস জয়াবতী এই সামান্য বয়সে কত যে হারিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

জয়াবতী প্রতিদিন স্নান করে ভেজা চুল এলোখোঁপা করে কাঁটা দিয়ে গেঁথে আবহাওয়া অফিসে এসে সেখানে চুল শুকোয়। যদিও অফিস, তবুও চুল মেলে দিয়ে শুকিয়ে নিতে জয়াবতীর কোনো অসুবিধা হয় না।

অফিস ঘরের মধ্যে জায়গার খুব অভাব। জয়াবতী কাজে নতুন এসেছে, তাই অফিস ঘরে চেয়ার টেবিল তার জোটেনি। তাতে তার ভালোই হয়েছে। বারান্দার এক দিকে একটা ছোট ঘরে কিছু আবহাওয়া সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। সেই ঘরেই একটা ছোট টেবিল আর

চেয়ার ফেলে সাময়িক স্থান হয়েছে জয়াবতীর।

অফিসে এসেই চুল খুলে ফেলে জয়াবতী। তারপর জানলার পাশে চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার বাইরের আধা-হাওয়া আধা-রোদে চুল শুকিয়ে নেয়। কিন্তু চুল শুকানোর পর আবার যখন খোঁপা বাঁধতে যায়, কিছুতেই আর চুলের কাঁটাগুলো খুঁজে পায় না সে।

যাতে চুলের কাঁটাগুলো হারিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি নেই জয়াবতীর। প্রত্যেক দিনই চুল খোলার পরে খুব যত্ন করে গুছিয়ে রাখে কাঁটাগুলো এমন জায়গায়, যাতে কিছুতেই হারিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু কোথায় যে এত যত্ন করে রাখে, চুল শুকানোর পরে অধিকাংশ দিন আর মনেই থাকে না।

জয়াবতীর একেবারে কিশোরী বয়স থেকে অভ্যাস কাঁটা গেঁথে খোঁপা শক্ত করে রাখা, ঢিলে বা এলোমেলো খোঁপা হলে তার ভীষণরকম অস্বস্তি হয়। সুতরাং যেসব দিন জয়াবতী তার চুলের কাঁটা কয়টা খুঁজে বের করতে পারে না, তার খুবই অসুবিধা হয়।

এর মধ্যে একদিন চুলের কাঁটা খুঁজতে গিয়েই জয়াবতী একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেললো।

আগেই বলেছি যে জয়াবতী যে ঘরটায় বসতো সেই ঘরের মধ্যে কিছু যন্ত্রপাতি রাখা ছিলো। এর অধিকাংশই নতুন এবং বহুমূল্য যন্ত্র, কিন্তু ব্যবহার কি করে করতে হয় সেটা কারোর জানা না থাকায় এই ঘরে ফেলে রাখা আছে।

এরই মধ্যে একটি যন্ত্র সদ্য চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে এসেছে। এটি হলো ঝড়-নিরূপক যন্ত্র। কোথায় কখন কি ভাবে ঝড় আসছে অথবা আসবে সবই এই যন্ত্রটায় জানা যাবে।

যন্ত্রটা দেশে এসে গেছে কিন্তু যন্ত্রটা চালানো শেখবার জন্যে যে বৈজ্ঞানিকটিকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাঠানো হয়েছিলো তিনি কাজ শিখে দেশে ফেরার পথে লণ্ডনে হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা মদের দোকানে বয়ের কাজ পেয়ে যাওয়ায় আর ফিরলেন না। সরকার এই ঘটনার পর আর কোনো দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিককে পাঠানোর সাহস পাননি, বরং আয়োজন করা হলো যে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে একজন যন্ত্রবিদ্ এসে এখানেই কয়েকজনকে ঐ যন্ত্র পরিচালনা শিখিয়ে যাবেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সেই যন্ত্রবিদ্ এখনো এসে পৌঁছননি, তাই যন্ত্রটা জয়াবতীর ঘরে পড়ে রয়েছে।

চুলের কাঁটা খুঁজতে খুঁজতে একদিন জয়াবতী ঐ ঝড় নিরূপক-যন্ত্রের মধ্যে হাত গলিয়ে দিলো। যন্ত্রটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা সবুজ এবং একটা নীল রঙের ছোট বাল্‌বের মধ্যে একটা ড্রয়ারের মত ছিলো, জয়াবতী একদিন ওখানে কাঁটা রেখেছিলো। তাই আজো কাঁটা খুঁজতে গিয়ে ভাবলো ঐখানে থাকতে পারে কিন্তু হাত দিয়ে পেলো না। আরেকটু আরেকটু করে হাত গলিয়ে দিতে শেষে হাতে যেন চুলের কাঁটাগুলো ঠেকলো। এতটা ভিতরে চলে গেছে ভাবেনি জয়াবতী, সে হাত দিয়ে টেনে বার করে আনতেই দেখলো চার-পাঁচটা কাঁটা স্টেনলেস স্টিল বা ঐ জাতীয় কোনো ধাতু দিয়ে তৈরী। চুলের কাঁটা নয়, ঐ যন্ত্রেরই কোনো অংশ হবে, কিন্তু চুলের কাঁটার কাজ অনায়াসেই চালানো যায়।

বলা বাহুল্য এই আকস্মিক আবিষ্কারে জয়াবতীর অশেষ উপকার হলো। কয়েকদিনের

মধ্যেই সে বাড়ি থেকে চুলে কাঁটা গেঁথে আনা ছেড়ে দিলো, কেননা সে দেখলো এই যন্ত্রের মধ্যে যেখানেই হাত গলাচ্ছে, ছোট বড় নানা আকারের সুদৃশ্য কাঁটা বেরিয়ে আসছে। সে ক্রমশ এখান থেকে কাঁটা নিয়ে আত্মীয়, বান্ধবী এবং প্রতিবেশিনীদের মধ্যে, চুলের আয়তন দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার অনুসারে ছোট বড় মাঝারি কাঁটা বিলিয়ে রীতিমত জনপ্রিয়া হয়ে উঠলো।

সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে সেই নীল আর সবুজ রঙের বাল্‌ব দুটি ছাড়া সেই ঝড়-নিরূপক যন্ত্রটির আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না ।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, জয়াবতী কখনোই জানতো না বা কখনো ভাবেওনি যে তার ঐ কণ্টকপ্রসূ যন্ত্রটি আসলে কি? আর যে কোনো মেয়ের মতই এতটা ভাবার মত ক্ষমতা তার ছিল না।

ইতিমধ্যে অফিস ঘরের মধ্যে একটা চেয়ার খালি হয়ে যাওয়ায় জয়াবতী সেখানে চলে গেলো এবং এই যন্ত্রের ঘরে তালা পড়লো।

তারপর একদিন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে যন্ত্রবিদ এসে পৌঁছলেন। সেই বিদেশী তাঁর শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রথমে সেই ঘর এবং তারপর সারা আবহাওয়া অফিস তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু তখন কোথায় সেই ঝড়-নিরূপক যন্ত্র?

এই নিয়ে সারা দেশে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। বিধানসভা থেকে একদিন এবং লোকসভা থেকে পরপর দুদিন বিরোধী সদস্যেরা একজোটে বেরিয়ে গেলেন। বহুলক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে যে দুর্লভ যন্ত্রটি আনা হয়েছিলো সেটি এইভাবে অন্তর্হিত হওয়ায় এটাকে অনেকে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের অন্তর্গত বলে মনে করতে লাগলেন। একটি সংবাদপত্র ধাবাবাহিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন এই ঘটনার উপরে, 'ঝড়ের পূর্বাভাস' নামে সেই নিবন্ধ পড়ে এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অশ্রুসম্বরণ করতে পারেননি। শুধু আবহাওয়া দপ্তরের ভার ঠিক কোন মন্ত্রীর, সেটা ধরতে না পেরে সংবাদপত্রটি সেই মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি কবতে পারলেন না। তাই খুব গোলমাল হলো। জোর পুলিশী তদন্ত চলতে লাগলো।

(তিন)

আজ কিছুদিন হলো জয়গোপালের মনের মধ্যে একটা ধাবণা ঢুকেছে যে তাকে পুলিশ খুঁজছে।

ধারণাটা তার মনের মধ্যে যাকে বলে বেশ বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। কেন যে পুলিশ তাকে খুঁজছে, এ বিষয়ে জয়গোপালের নিশ্চিত কোনো ধারণা নেই। তবে জয়গোপাল একটু লোভী স্বভাবের যুবক। প্রায় বছর খানেক আগে জয়গোপাল রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া একটা দশটাকার নোট চালানোর চেষ্টা করেছিলো। পর পর কয়েকজন দোকানদার নোটটা 'জালি' বলে ফিরিয়ে দেয়। তাদেরই কেউ সন্দেহ করে পুলিশে কোনো খবর দিয়ে রাখতে পারে, অথবা সেবার যখন কলেজ স্ট্রীটে গোলমাল হয় সে একটা স্টেট বাসের গদি তুলে নিয়ে বাড়ি চলে আসে।

এগুলো যে পুলিশ পিছনে লাগবার মতো কারণ নয় সেটা জয়গোপাল বোঝে। কিন্তু তার মন থেকে সন্দেহ দূর হওয়ার নয়।

শেষে ভয়ে ভয়ে একদিন জয়গোপাল ঘরের দরজা বন্ধ করে, হাতের কাছে কেরোসিন তেল না থাকায় নারকেল তেল ঢেলে ঐ দশ টাকার নোটটায় আর বাসের গদিটায় আগুন

লাগিয়ে দিলো। দশ টাকার নোটটা অচিরেই ভস্মীভূত হয়ে গেলো, কিন্তু বড় কষ্ট দিলো ঐ বাসের গদিটা। এটা কিছুতেই জ্বলতে চায় না, আবার পরমুহূর্তেই ছাদের সিলিং পর্যন্ত দাউ দাউ করে আগুন লাফিয়ে ওঠে। আর পোড়া গদির সে কি দুর্গন্ধ, মড়া পোড়ার গন্ধের চেয়েও বিকট। এবং শব্দ— কেন যে এত শব্দ, এইটুকু গদির মধ্য থেকে কি করে এত শব্দ ধুপ-ধাপ, ধুম-ধাম, ফট-ফটাস! জয়গোপাল কানে আঙুল দিয়েও রক্ষা পায় না, আবার ঘর থেকে বেরোতেও সাহস পায় না, পাছে ঘরের অন্য জিনিসেও আগুন লেগে যায়। সে যে কী কঠিন সমস্যা, এই রকম অবস্থায় যিনি কখনো পড়েছেন তিনিই শুধু হয়তো বুঝতে পারবেন।

একটা পুরানো তিনপায়া টেবিল, লোহার আলমারির মাথায় বসানো শীতকালে ব্যবহারের জন্য লেপ, ঘরের কোণায় গাদা করা পুরনো খবরের কাগজ এবং ডান হাতের কনুই থেকে ষোল স্কোয়াব ইঞ্চি জায়গা কিছুতেই আগুনে পোড়ার থেকে রক্ষা করতে পারলো না জয়গোপাল।

দগ্ধ কনুই, জয়গোপাল তবুও দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পেলো না। কারণ সেই বাসেব সিটের দগ্ধাবশেষ।

কোথায় ফেলবে? সিটের ফ্রেমের লোহার শিকগুলো আগুনের তাপে গলে বাঁকা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবুও দেখলে কি একেবারেই অনুমান করা যায় না যে এগুলো দিয়েই একটা বাসের সীট তৈরি হয়েছিল, যে বাসের সিটটি কিনা ছিলো লুটের মাল।

কেন যে মরতে জয়গোপাল ঐ সিটটা তুলে আনতে গিয়েছিলো, আজ তাই ভাবে। ঐ সিটটা তাব কোনো কাজে লাগেনি। একদিনের জন্যও আরাম করে বসার মতো মনোবল সংগ্রহ করতে পারেনি। তার জীবনে কালগ্রহের মতো দেখা দিয়েছে ঐ বাসের গদি।

এই তো গতকাল বিকেলে দুটো মোটামত লোক মোড়ের পাশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন বাঁকা বাঁকা চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। নিশ্চয় পুলিশের লোক। এই বকম ঘটনা জয়গোপাল প্রতিদিনই লক্ষ্য করছে। সবই ঐ সিটটার জন্যে— দশটাকার নোটটার জন্যেও হতে পারে। কিন্তু জাল নোটটা নিয়ে আব ভয় নেই, তার সমস্ত চিহ্ন ভস্ম হয়ে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এইবার বাসের সিটের পোড়া কঙ্কালটুকু কোথাও ফেলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত চিত্তে জয়গোপাল আবার রাত্রে শান্তিতে ঘুমোতে পারে।

বাজার থেকে চট কিনে আনলো। সঙ্গে সুঁচ আর সুতো। সুঁচ-সুতো দিয়ে ভালো করে মুড়িয়ে রাতের অন্ধকারে এটাকে নিয়ে কোথাও ফেলে আসতে হবে।

কিন্তু কিসে করে নিয়ে যাবে এই বস্তুটা। জয়গোপালের নিজের কোনো যানবাহন নেই। রিক্সাই হোক আর ট্যাক্সিই হোক, তার চালক তো নিশ্চয় সন্দেহ করবে।

অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে জয়গোপাল স্থির করলো, বাড়ি থেকে সন্ধ্যার দিকে একটা রিক্সায় করে জিনিসটা নিয়ে বেরোবে, তার পরে মোড়ে গিয়ে রিক্সা ছেড়ে ট্যাক্সিতে উঠবে। তারপরে ট্যাক্সি থেকে আবার রিক্সা আবার ট্যাক্সি এই ভাবে চলে অবশেষে যখন নিরাপদ বোধ করবে, মালসুদ্ধ রাস্তায় নেমে, মালটা যেন ভুল করে ফেলে যাচ্ছে এই রকম ভাবে যে কোনো বাসে উঠে চলে আসবে।

যত দুশ্চিন্তা করেছিলো, তা দেখা গেলো নিরর্থক। অতি অনায়াসেই জিনিসটাকে ফুটপাথে ফেলে চলে আসতে পারলো জয়গোপাল।

শুধু পরের দিন প্রতিটি সংবাদপত্রে একটা খবর দেখে সে আবার হতাশ হলো এবং আরো দুশ্চিন্তায় পড়লো। সংবাদটি এই— 'আবহাওয়া অফিসের ঝড়-নিরূপক যে যন্ত্রটি কিছুকাল আগে চুরি গিয়াছিলো, তাহা গতকল্য দগ্ধ অবস্থায় চটে মোড়ানো প্যাকেটে পাওয়া গিয়াছে। বোধহয় দুষ্কৃতকারীরা উহা কাজে লাগাইতে না পারিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের অনুসন্ধান করিতেছে।'

খবরটা আরো বড় ছিলো। জয়গোপাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লো। সে যেখানে ফেলে এসেছিলো ঠিক সেই বাসস্টপের পাশের ফুটপাথেই পাওয়া গিয়েছে। এটা যে সেই দগ্ধ বাসের গদি এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, শুধু দুশ্চিন্তা আরো বাড়লো এই ভেবে যে এবার তাকে ঝড় নিরূপক-যন্ত্রের চোর হিসেবে হয়তো জেল খাটতে হবে।

চতুরঙ্গ

আমার জীবনে ভীষণ সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি একটা লোকের হাত কিছুতেই এড়াতে পারছি না।

অথচ লোকটা আমার কেউ নয়। আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, কখনো কিছু ছিলো না। এই লোকটার কাছে আমার কোনো ধারদেনা নেই, লোকটারও নেই আমার কাছে। ধারের কথায় বলি, একবার এক কাবুলী ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম কিন্তু তিনিও আমার পিছনে এমন করে লাগেননি।

উত্তমর্ণ ছাড়া এমনভাবে পিছনে লেগে থাকতে পারে ইন্সিওরেন্সের দালাল, বিয়ের ঘটক কিংবা পুলিসের ফেউ।

কিন্তু এই লোকটা আমার সম্মুখে একেক সময় একেক ছদ্মবেশে দেখা দিচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোনো ইন্সিওরেন্সের দালাল ছদ্মবেশে আক্রমণ করেছে শুনিনি। অনেকে আত্মীয় কিংবা বন্ধুর বেশে আসে বটে। একেবারে ছদ্মবেশী দালাল, যতদূর মনে হয় অসম্ভব।

বিয়ের ঘটক? কিন্তু বিয়ের ঘটক আমার কি করবে? গৃহে আমার নবীনা স্ত্রী, দুর্দান্ত পুত্র। হিন্দু কোড্ বিল পাশ হওয়ার পরে কি আর বিয়ের ঘটকেরা বিবাহিত ব্যক্তির অনুসরণ করে?

তা হলে বাকি থাকে পুলিসের স্পাই। পুলিস কি জন্যে? আমি অতি নিরীহ সাদাসিধে মানুষ। সজনের ডাঁটা চুষে, বউয়ের শাড়ি ইস্ত্রি করে সস্তা সিগারেট খেয়ে, গলা ব্যথা হলে নুন জল দিয়ে গার্গল করে নেহাত গোবেচারার মত বেঁচে আছি। কোনো বেআইনি কিছু করি এমন সাহস নেই। একবার একটা অন্ধ ভিখিরির থালায় একটা অচল সিকি দিয়ে বিশ পয়সা তুলে নিয়েছিলাম, জ্ঞানত এই হলো সবচেয়ে বড় পাপ কাজ। কিন্তু সেই জন্যে পুলিস আমাকে ওয়াচ করতে যাবে কেন?

কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এ বড়ই বিপদ হয়েছে আমার।

লোকটাকে প্রথম দেখি হাজরা পার্কের সামনে।

একটু আগে বলেছি আমার একটি পুত্রসন্তান আছে। সে সদ্য কথা বলতে শিখছে। প্রথমেই

যে পাঁচ-সাতটি শব্দ সে উচ্চারণ করতে শেখে তার মধ্যে একটি হলো 'বাবা' এবং অন্য একটি 'ট্যাক্সি'। এই শব্দ দুটি সে অধিকাংশ সময়েই একত্রে উচ্চারণ করে।

'বাবা, ট্যাক্সি', তার এই শব্দ দুটির একত্রে মানে হলো, 'বাবা, ট্যাক্সি ডেকে এনে চড়াও', অথবা 'বাবা, ট্যাক্সি হও।'

আমি গরীব মানুষ, সদাসর্বদা ছেলেকে ট্যাক্সি চড়াতে পারি না, তাই নিজেকেই ট্যাক্সি হতে হয়। ট্যাক্সি হওয়া মানে ছেলেকে কাঁধে নিয়ে রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, দিন-দুপুর বা মধ্যরজনী হোক, মাইল দেড়েক ঘুরে আসা। কোলে বা কাঁধে নিলে চলবে না, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

সেদিন বাড়ি থেকে ট্যাক্সি হয়ে বেরিয়ে ছেলেকে কাঁধে নিয়ে মাইল খানেক হেঁটে হাজরা পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। আমার পাশেই লোকটা চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে একটা ঝুড়িতে করে বেচছে। তারস্বরে চেঁচিয়ে খদ্দের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে 'চানাচুর, এ বাবু চানাচুর, চানামোহনকা চানাচুর।'

চানাচুরওয়ালার নাম চানামোহন। নাম শুনে একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম লোকটাকে। নিতান্ত সাধারণ হিন্দুস্থানী চেহারা, গলায় মাদুলি, কাঁধে গামছা, গোয়ালাদের মত গোঁফ।

খাবো মনে করে এক প্যাকেট চানাচুরও কিনে ফেললাম। কিন্তু ছেলেটা খেতে দিলো না, কখন কাঁধের উপর থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই কুড়মুড় করে খেতে লাগলো।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরছি, মোড়ের মাথায় বাস থেকে নামতেই নামলো তুমুল বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি একটা গাড়িবারান্দার নিচে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

বৃষ্টির জন্যে গাড়িবারান্দাটার নিচে খুব ভিড় হয়ে গেলো। একটু পরে দেখি সেই ভিড়ের মধ্যে হাজরা পার্কের সামনের সেই চানামোহন ঘুগনি বেচছে। দুদিন আগে এই লোকটা চানাচুর বেচছিলো, এখন ঘুগনি বেচছে। সে যা হোক, আমিও দশ পয়সার ঘুগনি কিনে খেলাম।

এই পর্যন্ত ভালোই ছিলো। চানাচুরওয়ালার ঘুগনিওয়ালা হতে আপত্তি নেই। যদিও আমার মনে খটকা লেগেছিলো ব্যাপারটায়। কেননা এমন তো খুব বেশি দেখি না।

পরের দিনই রবিবার। সকালবেলায় বাসায় বসে আছি।

আমার স্ত্রী এসে বললেন, 'রাস্তা দিয়ে রঙ-মিস্ত্রি যাচ্ছে। ডাকবো?'

বাড়িতে কয়েকটা জানলা দরজা বহুদিন হলো ফেটে, চটে আছে, রঙ করানো দরকার, বললাম, 'ডাকো।'

রঙ-মিস্ত্রি আসতে দেখি চানামোহন। সেই গোফ, সেই মাদুলি, সেই কাঁধে গামছা। তাকে দেখে অবাক হলাম। কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারলো কিনা কে জানে?

সন্দেহ নিরসন করার জন্যে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নাম তোমার?'

লোকটা গোঁফের ফাঁকে মৃদু হেসে বললো, 'ফাগুলাল।'

এ যে চানামোহন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন বলছে ফাগুলাল। তার উপরে প্রথমে চানাচুরওয়ালা, তারপরে ঘুগনিওয়ালা এবং একেবারে রঙ-মিস্ত্রি— পুরো ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।

তবু যতই সন্দেহ বা দুশ্চিন্তা হোক না কেন, রঙ-মিস্ত্রিকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে এত

কথা ভাববার অবসর নেই। সুতরাং দাম-দর ঠিক করে ফাগুলালকে জানলা রঙ করতে বলা হলো।

রঙ লাগানোর জন্যে ফাগুলাল পুরানো কাপড় চাইলো। আমার স্ত্রী একটা পুরানো ধুতি থেকে প্রায় অর্ধেক ছিঁড়ে তাকে দিলো।

রঙ লাগাতে লাগলো ফাগুলাল। একটা টিনের ছোট থালায় করে রঙ নিয়ে এসেছে, একেবারে তৈরি রঙ, সেই রঙ ছেঁড়া ধুতির টুকরো দিয়ে ঘষে ঘষে জানলায় লাগালো। আমি এক মুহূর্তও তাকে চোখের আড়াল করলাম না, ঠায় সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেননা এর কি মতলব, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না।

ভালোই রঙ করলো কিন্তু ফাগুলাল। রঙ করে টাকা পয়সা নিয়ে সেলাম করে চলে গেলো।

এর-ও কয়েকদিন পরে।

আবার একদিন আমি ট্যাক্সি হয়ে বেরিয়েছি, কাঁধে পুত্র, তবে সঙ্গে সেদিন স্ত্রীও আছেন।

যেতে যেতে হঠাৎ আমার স্ত্রী থমকে দাঁড়ালেন, 'এই দ্যাখো আমাদের সেই রঙ-মিস্ত্রি এখানে কি সুন্দর বাটিকের ব্লাউজ পিস বেচছে!'

সত্যিই সেই লোকটা। গলায় মাদুলি, কাঁধে গামছা, গোয়ালাদের মত গোঁফ, সহাস্য বদনে কয়েকটা বাটিকের ছাপা ব্লাউজ পিস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটার গোঁফের ফাঁকের ঐ হাসি আমার আরো রহস্যময় মনে হলো। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যেন একটা বিরাট চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছুর আভাস রয়েছে।

আমার পক্ষে আর নিজেকে দমন করা সম্ভব হলো না। আমি স্পষ্টই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমিই এই দুদিন আগে আমাদের বাড়িতে জানলা রঙ করতে গিয়েছিলে না?'

লোকটা নির্বিকার ভাবে বললো, 'তা হবে।'

আমি আরো উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'তোমার নাম কি?'

লোকটা এবারো নির্বিকার ভাবে জানালো, 'বেনারসীপ্রসাদ।'

সর্বনাশ, ফাগুলাল থেকে আবার বেনারসীপ্রসাদ হয়ে গেলো! এই রহস্যের সমাধান আমাকে করতেই হবে। আমার কেমন যেন রোখ্ চেপে গেলো।

ইতিমধ্যে লোকটার হাতে যে দু-তিনটি বাটিকের ব্লাউজ ছিল, একটি বাদে সবই বিক্রি হয়ে গেছে। শেষ ব্লাউজ পিসটিকে আমার স্ত্রী ছাড়লেন না, নিজেই কিনে নিলেন।

এইবার লোকটা ফাঁকা। আমি সুযোগ ছাড়লাম না। ছেলে কাঁধে নিয়ে লোকটার পিছে পিছে হাঁটতে লাগলাম। একটু পরে হাঁটা থামিয়ে লোকটা একটু বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি ব্যাপার, বাবু?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন তো বাটিকের ব্লাউজ পিস বেচলে, এরপর কি করবে?'

লোকটা বললো, 'আর নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। আবার যদি করতে হয় তবে চানাচুর থেকে আরম্ভ করতে হবে।'

'মানে?' আমার ভ্রূকুঞ্চনের জটিলতা দেখে লোকটা একটু প্রাঞ্জল হলো।

আমাকে আর কষ্ট করে প্রশ্ন করতে হলো না। লোকটাই বুঝিয়ে বললো, 'প্রথমে চানাচুর

বেচছিলাম, এমন সময়ে জোর বৃষ্টি এসে সব ভিজিয়ে দিলো। তখন কি আর করবো, সব ঘুগনি হিসেবে বেচে দিলাম।'

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলাম, বললাম, 'তারপর!'

'তারপর আর কি', লোকটা বলে চললো, 'ঘুগনি বেচবার পর যেটুকু লেগে রইলো থালায়, ঐ তেল, মসলা, ডালের গুঁড়ো মতো কাদা-কাদা, সেটা আব নষ্ট কবে লাভ কি. একটা কৌটায় ভরে পরের দিন ঐগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রঙ-মিস্ত্রি হয়ে। আপনার বাড়িতেই তো রঙ করে দিয়ে এলাম।'

'অ্যাঁ' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো আমার চোখ। কিন্তু বেশি বিস্মিত হবার আর সময় নেই। কাঁধের উপর ছেলে এতক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তদুপরি স্ত্রী-কেও কাছাকাছি দেখছি না। তিনি যে ইতিমধ্যে কোথায় গেলেন?

যাই হোক, আমার আর একটি প্রশ্নই বাকি ছিলো। এইবাব জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ বাটিকের ছাপা কাপড কোথায় পেলে?'

লোকটা হাসলো, 'কোথায় আর পাবো? আপনারাই তো দিলেন। সেই যে ছেঁড়া ধুতি দিলেন জানলায় রঙ লাগানোব জন্য।'

'ছেঁড়া ধুতি?' আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'হ্যাঁ, সেটাই রঙ লাগানো হয়ে গেলে বোদে শুকিয়ে তিন— টুকরো কবে বেচে দিলাম।' তাড়াতাড়ি জবাব শেষ করে লোকটা আবার হাঁটা শুরু করলো।

আমাকেও ফিবতে হবে। কিন্তু কি একটা খটকা যেন রয়ে গেলো কোথায়? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ইতস্তত করতে লাগলাম।

এমন সময লোকটা নিজেই কেন যেন ফিরে এলো। এসে আমাকে বললো, 'দেখুন বাবু, আমাব নাম বেনাবসীপ্রসাদ নয়, আসলে আমার নাম ভজুয়া।'

এই স্বীকারোক্তিতে আমি অবাক হলাম, বললাম, 'তা হলে বেনারসীপ্রসাদ বললে কেন?'

লোকটা হেসে বললো, 'তখন কাপড বেচছিলাম কিনা।'

এইবাব সব আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। যখন কাপড় বেচে তখন বেনারসীপ্রসাদ, যখন রঙ লাগায় তখন ফাগুলাল, যখন চানাচুর বেচে তখন চানামোহন, যখন ঘুগনি বেচে তখন? কি জানি?

না জানলাম। আমার আর জানবার প্রয়োজন নেই।

দূরে ভজুয়া হেঁটে যাচ্ছে। ভজুয়া মানে বেনারসীপ্রসাদ, মানে ফাগুলাল, মানে চানামোহন।

আমি আবিষ্টের মতো, অভিভূতের মতো তার চলার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নিরুদ্দেশ জানলা

নটবর মামা একদিন এসে বললেন, 'কুকুর পুষেছিস কখনো?' তখন আমার একটা কাজের খুব দরকার। আত্মীয়-বন্ধু, জানা-চেনা সবাইকে অনুরোধ করে ক্লান্ত হয়ে গেছি। চ্যারিটেবল

ডিসপেন্সারির কম্পাউণ্ডার থেকে রেলের টিকেট কালেক্টর—প্রত্যেক দিন ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি।

এমন সময় নটবর মামাই আনলেন এই কাজের খবরটা। একটা কুকুরের দেখাশোনা করতে হবে, পুকুরপাঁতিয়ার মহারাজকুমারী বিরাটেশ্বরী দেবী নাকি এমন একজন লোকের অনুসন্ধান করছেন, যে কুকুরের তত্ত্বাবধান, পরিচর্যা ইত্যাদিতে মোটামুটি অভ্যস্ত।

অল্প বয়সে দু-একটা নেড়ি কুকুরকে পাতের ভাত খাইয়েছি, একবার সপ্তাহ দুয়েক রাস্তা থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা কুড়িয়ে এনে ইজের বাঁধবার দড়ি গলায় বেঁধে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে নেড়ি কুকুর হলে কথা ছিলো, এইসব রাজা-মহারাজাদের কুকুর দশাসই বুলডগ কিংবা অ্যালসেসিয়ান-ই হয়তো হবে। চাকরির আমার খুবই দরকার, কিন্তু...

আমার দোনামনা ভাব দেখে নটবর মামা বললেন, 'তুই একটা সামান্য কাজও যদি না করতে পারিস, এই দুর্দিনে কাজ দেবে কে তোকে? তোদের বয়েসে রঙ-মিস্ত্রিদের সঙ্গে কাজ করেছি, মনুমেণ্ট-হাওড়া ব্রিজের মাথায় উঠে রঙ মাখিয়েছি।'

আমি বললাম, 'রাজা-মহারাজার কুকুর, কি জাতের কে জানে, শেষে কামড়ে-টামড়ে মেরে ফেলবে নাকি!'

নটবর মামা বললেন, 'তবু চল, দেখাই যাক না।' তাঁর কথায় কি যেন এক আশ্বাসের আভাস রয়েছে।

পরের রবিবার সকালে নটবর মামা আমাকে নিয়ে গেলেন পুকুরপাঁতিয়ার মহারাজকুমারীর কাছে। পুকুরপাঁতিয়ার ম্যানেজারের এক শালা নটবর মামার কি করে যেন পরিচিত, সেই সূত্র। বরানগরে এক বিরাট বাড়ি; পুকুরপাঁতিয়ার মহারাজার ঐ হলো কলকাতার বাসা। মহারাজা দীর্ঘদিন পরলোকগত, একমাত্র সন্তান মহারাজকুমারী, এখন প্রায় চল্লিশ বছর বয়েস হলো, নটবর মামা যত দূর জানেন, বোধহয় অবিবাহিতা।

রাজবাড়িতে গিয়ে প্রথম ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, 'আপনি এ কাজ আগে কখনো করেছেন?'

আমার হয়ে নটবর মামা বললেন, 'না, এর আগে এরকম সুযোগ পায় নি।'

আমি উশখুশ করছিলাম, ম্যানেজারকে আর বিশেষ কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, আপনাদের কুকুরটা কি জাতের বলতে পারেন?'

ম্যানেজার আমার দিকে একটু বক্রদৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর বললেন, 'পুলিস ডগ্', গোয়েন্দা পুলিসেরা যে কুকুর পোষে এ হলো গিয়ে সেই কুকুর।'

ইতিমধ্যে মহারাজকুমারীর তলব এলো। ম্যানেজার আমাকে আর নটবর মামাকে নিয়ে উপস্থিত করলেন। আমার তখন কাজ করার ইচ্ছা একেবারে চলে গেছে। পুলিসের কুকুর মানে বিরাট জাতের কোনো অ্যালসেসিয়ানই হবে, তার আদর যত্ন তদ্বির করা আমার সাধ্য নয়।

মহারাজকুমারী ভিতরের বারান্দায় গলা উঁচু গেঞ্জির কাপড়ের কামিজ আর থ্রি-কোয়ার্টার খাকি কাপড়ের প্যাণ্ট পরে একটা রিভলভারের নল পায়রার পালক দিয়ে পরিষ্কার করছিলেন সামনে কয়েকটা গুলি একটা চিনেমাটির প্লেটে সাজানো, দেখে মনে হয় যেন আচার রৌদ্রে দেওয়া হয়েছে।

আমার বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব্ করছিলো। মহারাজকুমারী কিন্তু কোনো প্রশ্নই করলেন না, শুধু আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'বয়েস?'

বয়েস বললাম। সামনে একটা স্লেট পেন্সিল ছিলো, সেটা হাতে নিয়ে আমার বয়েসটা লিখে দশমিক তেরো দিয়ে ভাগ দিলেন, ম্যানেজারবাবুকে বললেন, 'দেখুন তো ভাগটা।'

ম্যানেজারবাবু দেখেশুনে বললেন, 'ঠিক আছে।'

এবার মহারাজকুমারী আমাকে বললেন, 'না, তুমি বিশেষ অপয়া নও, তোমাকে দিয়ে চলবে।'

এর আগে কখনো কুকুর পুষেছি কিনা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো প্রশ্নই হলো না, আমার চাকরি হয়ে গেলো। ষাট টাকা মাইনে, খাওয়াদাওয়া, পরের দিনই যোগ দিতে হবে। বিহারের এক স্বাস্থ্যকর শহরে মহারাজকুমারী দু মাসের জন্য যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে কুকুর নিয়ে আমাকে যেতে হবে।

জীবনের প্রথম চাকরি কিন্তু কুকুরের ভয়ে প্রাণে এক বিন্দু আনন্দ বা উত্তেজনার সঞ্চার হলো না। মহারাজকুমারীর কথা শুনছি আর পরে পরে নটবর মামার মুখের দিকে তাকাচ্ছি। এতটা দূর হওয়ার পর চাকরিটা আমার পক্ষে না নেওয়া চলে না তবু এই এক মারাত্মক সংশয়।

অচিরেই অবশ্য সংশয় ভঞ্জন হলো। মহারাজকুমারীর কথা শেষ হলে ম্যানেজার বললেন, 'তা হলে সব ঠিক হলো, এবারে আপনার ডিউটি বুঝে যান, কুকুরটাকে একবার...'

ম্যানেজার বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারলেন না, মহারাজকুমারী একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কুকুরটা কুকুরটা করছেন কেন, ওর একটা নাম নেই নাকি?' ম্যানেজার একটু অপদস্থ এবং বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। যা হোক, মহারাজকুমারীর সামনে থেকে গুটি গুটি আমরা তিনজন সরে বেরিয়ে এলাম।

ম্যানেজার বারান্দায় বেরিয়ে বললেন, 'কুকুরটার নাম হলো জানলা।'

'জানলা?' আমি বিস্মিত বোধ করলাম।

'হ্যাঁ', ম্যানেজার জানালেন, 'মনে করুন এমন একজন কেউ মহারাজকুমারীর কাছে এসেছে, যাঁকে মহারাজকুমারী সহ্য করতে পারেন না আবার বলতেও পারেন না চলে যান! সেক্ষেত্রে তিনি কি করবেন?' নিজের প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন ম্যানেজারবাবু, 'মহারাজকুমারী কাউকে চেঁচিয়ে বলবেন— এই, জানলা খুলে দে—' অতিথি কিছু বুঝতে পারবেন না কিন্তু এদিকে কুকুরটা শেকল থেকে ছাড়া পেয়ে মহারাজকুমারীর কাছে ছুটে আসবে। আর ঐ রকম একটা বিশ্রী নেড়ি কুকুরকে সহ্য করবে এমন অতিথি রাজবাড়িতে আসে না।'

আমি বিচলিত ভাবে বললাম, 'নেড়ি কুকুর বলছেন কি মশায়? এই বললেন পুলিস ডগ, গোয়েন্দা কুকুর?'

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আমি তো দেখেছি স্পষ্ট নেড়ি কুকুর। আপনার মামা এই নটবরবাবু আর আমার শালা দুজনে মহারাজকুমারীর কাছে গোয়েন্দা কুকুর বলে বেচে গেছেন দেড় হাজার টাকায়।'

ইতিমধ্যে একটা মেটে রঙের বিশ্রী নেড়ি কুকুর আমাদের সামনে এসে লেজ নাড়তে শুরু করেছে। ম্যানেজারবাবু বললেন, 'এই হলো আপনার জানলা।'

'এটা পুলিস ডগ?' আমি অবাক হয়ে নটবর মামার মুখের দিকে তাকালাম। নটবর মামা

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ, বলছি না গোয়েন্দা কুকুর। এটাকে দেখলে যদি বোঝা যায় পুলিস ডগ, তা হলে কাজ হবে নাকি! প্লেন ড্রেসে মানে সাদা পোশাকে ছদ্মবেশ, গোয়েন্দাদের কিছুই জানিস না কি?'

যা হোক, আমার কি আসে যায়। আমার বরং নেড়ি কুকুর না হলেই অসুবিধে ছিলো।

পরের দিন মহারাজকুমারী আর জানলার সঙ্গে হাওড়া স্টেশন থেকে রাতের গাড়িতে রওনা হয়ে গেলাম মহারাজকুমারীর স্বাস্থ্যনিবাসে। সাঁওতাল পরগনা আর কয়লাখনির মধ্যবর্তী অঞ্চলের ছোটোখাটো জেলা শহর। বিরাট কম্পাউণ্ডওয়ালা মহারাজকুমারীর নিজের বাড়ি 'পুকুরপাঁতিয়া নিবাস'।

এক দিনেই জানলার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেলো। এমনি কোনো অসুবিধা ছিলো না, শুধু নেড়ি কুকুর বোধ হয় ডগ সোপের গন্ধটা মোটেই সহ্য করতে পারে না। আর একটা চার্টে ছয় ঘণ্টা অন্তর ওর টেম্পারেচার রিপোর্ট করতে হয় মহারাজকুমারীকে, এই থার্মোমিটার লাগানোটা ভীষণ কঠিন। নাড়ির গতিও রিপোর্টে থাকার কথা, কিন্তু কুকুরের নাড়ি শরীরের ঠিক কোথায় বুঝতে না পেরে ঘড়ি দেখে মিলিয়ে আমার নিজের নাড়ির গতি যা হতো সেটা রিপোর্ট করতাম।

দু-চার দিন গেলো। সপ্তাহে এক দিন জানলার নখ কাটাবার কথা। কিন্তু সারা বেলা খুঁজেও পুরো জেলা শহরে একটাও নাপিত কুকুরের নখ কাটতে রাজি হলো না। আমি আর মহারাজকুমারী দুজনে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু না, অসম্ভব। জানলা ভীষণ লাফাতে লাগলো। শেষে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে নখ কাটালাম।

বিপর্যয়টা ঘটলো এর পরেই। বিকেলে জ্ঞান ফেরার পর জানলা পা উল্টিয়ে ঘাড় চুলকোতে গিয়ে ভীষণ অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলো। নখ কাটা গেছে, লোমের নিচের চামড়ায় কিছুতেই ধার লাগছে না। কি যে হলো, ঘর বারন্দাময় ছুটোছুটি করতে লাগলো। মহারাজকুমারী সব দেখেশুনে আদেশ দিলেন, 'ওকে আজ রাতে আর বেঁধো না।'

এবং ঐ রাত্রিতেই জানলা নিরুদ্দেশ হলো। পরদিন সকালে যখন আবিষ্কার করলাম জানলা পলাতক, মহারাজকুমারী ভীষণ হইচই বাধিয়ে দিলেন, যেন সমস্ত দোষটা আমার। আমি সকাল থেকে সারা বেলা ধরে সমস্ত তল্লাট চষে ফেললাম কিন্তু কোথাও জানলার কোনো পাত্তা পেলাম না।

ম্লান মুখে পুকুরপাঁতিয়া নিবাসে ফিরে দেখি সেই প্রথম দিনের মত মহারাজকুমারী চিনেমাটির প্লেটে রিভলবারের গুলি কয়টা রোদে দিচ্ছেন। মহারাজকুমারী আমাকে দেখে একবার চোখ না তুলে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যেভাবে হোক জানলাকে আমার ফিরে চাই।' তারপর এক চোখ বুজে আর এক চোখে রিভলভারের নলটা লাগিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আরো ঠাণ্ডা গলায় আদেশ করলেন, 'যাও, থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে এসো, কুকুর ফিরে পেলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, আর এখানে একটা 'পরগণা বার্তা' না কি কাগজ বের হয় সেখানেও একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে এসো।'

আবার বেরিয়ে গেলাম। সারা দিন স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি। তবু চাকরি করতে গেলে কত কি করতে হয়।

থানায় কিছুতেই কুকুর হারানোর ডায়েরি নেবে না। তারপর যখন বললাম পাঁচ হাজার

টাকা পুরস্কার, জমাদার কেমন অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগলো, তারপর তিন গেলাস জল খেলো, কুকুরের বর্ণনা শুনে আরো তিন গেলাস। ডায়েরি লিখে নিয়ে বললো, 'ঠিক হ্যায়, কাল সুবাহমে মিল যায়গা।'

জমাদার সাহেবের কথায় যে খুব ভরসা পেলাম তা নয়, খুঁজে খুঁজে এর পরে 'সাপ্তাহিক পরগণা বার্তা'র অফিসে গেলাম। 'পরগণা বার্তা' তখন ছাপা হচ্ছে, পরের দিন রবিবার সকালে বেরোবে। বিজ্ঞাপন আছে শুনে তাড়াতাড়ি ম্যানেজার প্রেস থেকে ম্যাটার নামিয়ে সম্পাদককে ডেকে আনলেন। সম্পাদক একটা বিজ্ঞাপন এসেছে শুনে তিন গেলাস জল খেলেন, তারপর বিজ্ঞাপনটা পড়ে আরো তিন গেলাস জল খেলেন। অনেকক্ষণ পরে দম নিয়ে আমাকে ভালো করে দেখলেন, বললেন 'আঁ, পাঁচ হাজার?'

যা হোক, আমি ফিরে এলাম। ডায়েরি করে এসেছি আর বিজ্ঞাপন দিয়েছি মহারাজকুমারীকে জানালাম। মহারাজকুমারীর কোনো ভাবান্তর নেই।

একটা ক্ষীণ আশা ছিলো যে, রাতের মধ্যে জানলা ফিরে আসতে পারে। কিন্তু ফিরলো না।

পরদিন সকালে উঠে প্রথমেই গেলাম 'পরগণা বার্তা'র কার্যালয়ে। ভাবলাম বিজ্ঞাপনটা এনে মহারাজকুমারীকে দেখালে যদি একটু কাজ হয়। আর জানলা যখন নেই, আমার চাকরিও শেষ। আমি মানে মানে কেটে পড়বো।

'পরগণা বার্তা'র অফিসের পথে একটা পত্রিকার স্টল। সেখানে খোঁজ করলাম, না, 'পরগণা বার্তা' বেরোয়নি। পরগণা বার্তা অফিসে গিয়ে দেখি দরজা হাটখোলা, মেশিনে আধ-ছাপা পত্রিকা, আশে-পাশে ঘরে-বাইরে কেউ কোথাও নেই।

অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করে তারপরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তাজ্জব কাণ্ড, লোকগুলো সব উধাও হয়ে গেলো কোথায়? হঠাৎ পাশের একটা ছোট টিলার নিচে ঝোপের ভিতর থেকে সম্পাদক বেরিয়ে এলেন, উস্কোখুস্কো চুল, চোখ লাল দেখে মনে হয় সারারাত ঘুমোন নি, সম্পাদক আমাকে চিনতেই পারলেন না, আমি কিছু বলার আগেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'মশায়, একটা মেটে রঙের নেড়ি কুকুর দেখেছেন কোথাও? জানলা বলে ডাকলে সাড়া দেয়!'

আমি আর কিছু না বলে এগিয়ে গেলাম। বাজারের পথে প্রেসের ম্যানেজারকে দেখলাম একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গোটাকয়েক নেড়ি কুকুরকে জিলিপি খাইয়ে নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করছে। পথে এদিকে ওদিকে আরো দু-একজনকে দেখলুম, কেউ একটা কুকুর কাছে নেওয়ার চেষ্টা করছে, কেউ চেন বক্লস নিয়ে ঘুরছে, মনে হলো এদের কাউকে কাউকে-যেন কাল ঐ প্রেসে দেখেছি।

থানায় গেলাম। লক্-আপ্ মালখানা পর্যন্ত হাটখোলা, সেপাই জমাদার দারোগা কয়েদী বা আসামী পর্যন্ত নেই। বারান্দায় একটা বেল, ঘণ্টা পেটা হয় তাতে। একটা বাচ্চা ছেলে একটা টুলের ওপর উঠে ছুটির ঘণ্টা ইস্কুলে যেভাবে পেটায় সেইভাবে ঢং ঢং করে বাজাচ্ছে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

সে বললো, 'ছুটি। আজ কুকুর হারানোয় ছুটি হয়ে গেছে। বাবা কুকুর খুঁজতে 'গেছে।' বলে আরো ঢং ঢং করে ঘণ্টা পেটাতে লাগলো।

আমি ক্লান্ত অবস্থায় পুকুরপাঁতিয়া নিবাসের দিকে ফিরলাম। একটা মোড় ঘুরলে প্রায় শ

তিনেক গজ দূরে বাড়িটা, সেই মোড় পর্যন্ত পৌঁছে ভীষণ হট্টগোল হইচই, শ দেড়েক কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পেলাম। এগিয়ে দেখি সাংঘাতিক ব্যাপার। সেপাই, জমাদার, দারোগা, কম্পোজিটার, মেসিনম্যান, প্রেস ম্যানেজার— কারোর কোলে, কারোর কাঁধে, কারোর হাতে নারকেলের দড়িতে বাঁধা চেন বক্‌লসে লটকানো অসংখ্য নেড়ি কুকুরের একটা হাট জমে গেছে নিবাসের সামনে। আর সমস্ত কুকুর পরস্পরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে, কোথাও বা রীতিমত মারামারি চলছে।

দূর থেকে পুকুরপাঁতিয়া নিবাসের ভিতরের দিকে তাকালাম। দেখলাম চিনেমাটির প্লেট থেকে রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া কার্টিজগুলো মহারাজকুমারী স্থির হাতে একটা একটা করে রিভলভারের মধ্যে ভরছেন।

আমার আর পুকুরপাঁতিয়া নিবাসে ফেরা সম্ভব হয়নি। প্রায় দিন তিনেক পরে কলকাতায় খবরের কাগজে একটা সংবাদ পড়েছিলাম, মফঃস্বল বার্তায় 'কুকুরের উৎপাত' এই হেড্ লাইনের নিচে—

'কি এক অজ্ঞাত কারণে শতাধিক কুকুর অদ্য মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে পুকুরপাঁতিয়া নিবাস সমবেতভাবে আক্রমণ করে। এইরূপ ঘটনা এখানে আব কখনো ঘটে নাই। ফলে এতদঞ্চলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পুকুরপাঁতিয়ার মহারাজকুমারী বিরাটেশ্বরী দেবীকে অবশেষে আত্মরক্ষার্থে রিভলবার পর্যন্ত চালাইতে হয়। সৌভাগ্যবশত ঘটনার সময়ে সেপাই জমাদাব সহ স্থানীয় থানার দারোগা অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই অবস্থা আয়ত্তে আনেন। সংবাদপত্র 'পরগণা-বার্তার' প্রতিনিধিরাও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং অবস্থা আযত্তাধীনে আনিতে থানার দারোগাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।...'

খদ্দের

ঐ বসে রয়েছে রমেশ। একটা ভাঙা সুটকেস, সেটা নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা, তার মধ্যে দুটো ছেঁড়া পুরনো জামা প্যান্ট। পরনে একটা হাফপ্যান্ট, দু সাইজ বড়ো ময়লা হাওয়াই শার্ট। পায়ের হাওয়াই চটিজোড়া অবশ্য নতুন, শেষ সম্বল মাইনের টাকা থেকে আজকে সকালেই কিনেছে।

রমেশের হাতে একটা টিকিট ধরা রয়েছে, এখনই কিনেছে টিকিটের কাউন্টার থেকে, টিকিটটা হাওড়া থেকে খড়্গপুর। রমেশ বসে আছে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপরে, সে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। কলকাতায় তার পোষালো না, সে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না। সে হাওড়া থেকে যাবে খড়্গপুরে, সেখান থেকে বাসে দু ঘণ্টা, তারপর হেঁটে দেড়ঘণ্টা— সেখানে তাদের গ্রাম, সেখানে তার গরীব বিধবা মা, ছোট ছোট ভাইবোনেরা রয়েছে। রমেশ গাঁয়ের একজন লোকের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলো উপার্জন করতে। কিছুই বিশেষ চায়নি সে, সামান্য চাকরের কাজ নিয়েই সে সন্তুষ্ট ছিলো অথবা সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলো। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না।

রমেশ বাসন মাজতে পারে, ঘর মুছতে পারে, কাপড় কাচতে পারে। বাজার করে হিসেব

দিতে পারে। গাঁয়ের স্কুলে সে পাঁচ ক্লাস পড়েছিলো।

রমেশ শেষরাতে ভোর চারটের সময় উঠে কয়লা ভাঙতে পারে। দরকার পড়লে উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাতে পারে। কলকাতা শহরে তার চাহিদা কিছু কম নয় কিন্তু সে এখানে কাজ করতে পারলো না।

কলকাতায় আসার আগে রমেশ কাঁথিতে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে অল্প কিছুদিন কাজ করেছিলো। সেই ভদ্রলোক ছিলেন উকিল। রমেশদের গ্রামের বাড়িতে বাইরের লোকজন বিশেষ কেউ আসে না। কেই বা আসবে কিসের দরকারে? পাড়া- প্রতিবেশী যারা আসে সবাই চেনাজানা। কিন্তু কাঁথির উকিলবাবুর বাড়িতে রমেশ দেখলো সকাল, সন্ধ্যা, রবিবারে, ছুটির দিনে অনেক লোকজন আসে। বাইরের ঘরটা গমগম করে লোকের ভিড়ে আর কথাবার্তায়।

অল্পদিনের মধ্যে রমেশ জানতে পারে, এই যারা দুবেলা উকিলবাবুর বাড়িতে আসে, উকিলবাবুর সঙ্গে আদালতে ছোটাছুটি করে, তাদের বলে মক্কেল। কিছুকালের মধ্যেই সে বাইরের ঘর খুলে দিয়ে লোকজন বসিয়ে বাড়িব মধ্যে থেকে উকিলবাবুকে ডেকে আনা শিখে গেলো, 'কর্তামশায়, মক্কেল এসেছে।' উকিলবাবু হেঁকে বলতেন, 'ওদের বসাও। আমি যাচ্ছি।' একটা ঝাড়ন দিয়ে চেয়ারগুলো ঝেড়ে মক্কেলদের বসিয়ে রমেশ এসে উকিলবাবুকে জানাতো, 'মক্কেলবাবুদের ভালো করে বসিয়ে এসেছি।'

কিন্তু কাঁথির এই উকিলবাবুর বাড়িতে রমেশের বেশিদিন কাজ করা সম্ভব হয়নি। উকিলবাবুর এক মক্কেলের মামলায় হেরে গিয়ে ছয় মাস জেল হয়, কি একটা মারামারির মামলা ছিলো সেটা। মক্কেলটাও ছিলো খুব মারকুটে। ছয়মাস কারাবাসের পর জেল থেকে বেরিয়েই সে উকিলবাবুর খোঁজে আসে। উকিলবাবুর ভাগ্য ভালো যে ঠিক সেই সময় বাসায় ছিলেন না। কিন্তু জেলখাটা মক্কেলটির কোপ গিয়ে পড়ে রমেশের উপর। রমেশ যথারীতি যখন ঝাড়ন দিয়ে চেয়ার পরিষ্কার করে মক্কেলটিকে বসাতে গেছে এবং ঘোষণা করেছে যে 'উকিলবাবু বাড়ি নেই, একটু অপেক্ষা করতে হবে'—সেই মুহূর্তে লোকটি রমেশের হাত থেকে কাপড়ের ঝাড়নটি কেড়ে নিয়ে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে এবং জুনপুটে বা দিঘায় নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে বলে ক্রুদ্ধ ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। রমেশের হাত বাঁধা ছিলো কিন্তু মুখ বাঁধা ছিলো না, সে প্রাণভয়ে যথাসাধ্য চেঁচাতে থাকে।

রমেশের চিৎকারে রাস্তা থেকে লোকজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী ছুটে এসে বিপজ্জনক মক্কেলটিকে ধরে ফেলে, তারপর পুলিশ এসে তাকে হাজতে চালান দেয়। তারপর আবার ফৌজদারি মামলা।

কি এক অজ্ঞাত, অবোধ্য কারণে এবারেও এই মারকুট্রে অর্ধোন্মাদ লোকটি রমেশের উকিলবাবুকে তার মামলায় নিযুক্ত করে। ফলে যদিও রমেশই ভুক্তভোগী, উকিলবাবুর প্ররোচনায় রমেশ মামলার দিন আদালতে সাক্ষ্য দিতে যায় না। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশী ও রাস্তার লোকজনের সাক্ষ্যে এবং বিশেষ করে এই কারণে যে লোকটি জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আবার গোলমাল করেছে সেই দিনেই, এই সব বিবেচনা করে মহামান্য আদালত এই দাগী আসামীকে আবার ছয় মাসের জেল দেন। রমেশের উকিলবাবু বহু ধরাধরি, অনুনয়, বিনয়, যুক্তিতর্ক দিয়েও লোকটির জেলখাটা আটকাতে পারলেন না। রোষ কষায়িত লোচনে লোকটি উকিলবাবুর দিকে তাকাতে তাকাতে পুলিশের সঙ্গে আবার জেলে চলে গেলো।

লোকটির আবার জেল হয়েছে এই খবর শোনার পরে রমেশ খুবই আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলো এবং ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার সপ্তাহখানেক আগেই উকিলবাবুর গৃহ তথা কাঁথি থেকে পালালো।

গাঁয়ে গিয়ে দু-এক মাস থাকার পর সে অন্য এক গ্রামবাসীর সঙ্গে অতঃপর কলকাতায় এলো। সেই ব্যক্তি কলকাতায় এক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে রান্নার কাজ করে, সেই বাড়িতেই রমেশের জন্য একটা ফাইফরমাস খাটার কাজ জুটলো।

চাকরের কাজে যে হতভাগ্য বালকের জীবন শুরু তার যে ভাগ্য ভালো নয় সে কথা বলার অবকাশ রাখে না। তারই মধ্যে কারো কারো ভাগ্য একটু কম খারাপ হয়। রমেশের ভাগ্য কিন্তু খুবই খারাপ।

রমেশ যে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসেছে সেই ডাক্তারবাবু মনস্তত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ দুই কথায় পাগলের ডাক্তার। ঠিক রাস্তার ন্যাংটো পাগল বা উন্মাদ, বদ্ধ পাগল নয়, রোগীদের প্রত্যেকেরই মাথায় অল্পবিস্তর গোলমাল। প্রায় প্রত্যেকেই সুবেশ ও মার্জিত রুচির। কিন্তু এদের সকলের চোখের মধ্যে একটা ঘোলাটে ভাব আছে যে ভাবটা কাঁথির সেই উকিলবাবুর মক্কেলের চোখে মার খাওয়ার মুহূর্তে রমেশ দেখতে পেয়েছিলো।

প্রথমে কিন্তু গোলমালটা বাধলো অন্যভাবে। রমেশ কাঁথির কাজ থেকে শিখে এসেছে বাইরের লোক যারা আসে তারা হলো মক্কেল। তার কাজ পড়েছিলো সকাল-সন্ধ্যায় বাইরের ঘরের চেম্বারে রোগী এলে বসিয়ে ডাক্তারবাবুকে ভিতরে খবর দেয়া। সে এখানেও চেয়ার ঝেড়েঝুড়ে রোগীকে বসাতো, বলতো, 'বসুন মক্কেলবাবু।' তারপর ভিতরে গিয়ে খবর দিতো, 'একজন মক্কেল এসেছে।'

দু-একদিনের মধ্যে খটকা লাগলো ডাক্তাবাবুর, রোগী আবার মক্কেল হলো কি করে? ছোকরা চাকরটা ইয়ার্কি করছে না তো? এক আধপাগল উকিল এসেছিলেন ডাক্তারকে দেখাতে, তার মাথার মধ্যে অহরহ টং টং করে কি একটা বাজে, বেজেই যায়। তিনি রমেশের মুখে মক্কেলবাবু সম্বোধন শুনে হেসে কুটিপাটি। তার মাথার টং টং ভুলে তিনি ডাক্তারবাবুকে না দেখিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন হাসতে হাসতে। সেদিন সন্ধ্যায় একমাত্র পাগল বেপাত্তা হয়ে যাওয়ায় ডাক্তারবাবু রমেশের উপরে খেপে গেলেন। পরে অনেক কষ্ট করে রমেশকে শেখালেন, 'আমার কাছে যারা আসে তারা মক্কেল নয়, পেশেণ্ট।'

রমেশের বঙ্গোপসাগরীয় জিহ্বায় যত সহজে মক্কেল কথাটা আসে পেশেণ্ট তত সোজা নয়। অনেক কসরত করে সে শেষ পর্যন্ত 'পিসেণ্ট' বলা শিখে উঠতে পারলো। পিসেণ্টদের চেয়ার ঝেড়ে বসিয়ে সে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে যেতো, 'বাবু, পিসেণ্ট এসেছে।'

মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছিলো রমেশ। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলো ডাক্তারবাবুকে নিয়ে। ডাক্তারবাবুর একটা মারাত্মক খারাপ ব্যাপার ছিলো, সন্ধ্যার পর সেজেগুজে রোগী দেখার নাম করে বেরোতেন আর সহজে গৃহমুখী হতে চাইতেন না। এক্কেকদিন গভীর রাতে পা টিপে টিপে চোরের মতন ঘরে ঢুকতেন। চেম্বারের বাইরের দরজায় খুব আস্তে দুটো টোকা দিলে, রমেশ রাতে চেম্বারের মেঝেতে শুতো, সে দরজাটা আলগোছে খুলে দিতো। এই রাতে বাড়ি ফেরা নিয়ে ডাক্তার-গিন্নির সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কোনো কোনো সময় তুলকালাম কাণ্ড হতো।

বিপদ হয়েছিলো রমেশের। তাকেই সাক্ষী মানতেন ডাক্তারগিন্নি, 'তুই বল তো, ঠিক কটায়

বাড়ি ফিরেছে?' চেম্বারে একটা দেয়ালঘড়ি আছে, ভদ্রমহিলা রমেশকে ঘড়ি দেখানো ভালো করে শিখিয়ে নিয়েছিলেন স্বামীর ফেরার হিসেব রাখতে। কারণ তিনি নিজে কদাচিত কষ্ট করে ঘুম থেকে উঠে স্বামীর ফেরার তদারকি করতেন। যা চেঁচামেচি, তাণ্ডব সেটা করতেন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে, নিজের সুবিধাজনক সময়ে। ফুটন্ত কড়া ও উনুনের মধ্যে অর্থাৎ ডাক্তারবাবুর আর ডাক্তার-গিন্নির মধ্যে কোনোটাই রমেশের পক্ষে কম বিপজ্জনক নয়। সে যদি সঠিক সময় বলতো, ডাক্তারবাবু খেপে যেতেন আর বানিয়ে সময় বললে ডাক্তার-গিন্নির হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নেই। ভদ্রমহিলা বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে কি করে যে আসল সময়টা ধরে ফেলতেন সেটা রমেশ এবং রমেশের ডাক্তারবাবুর উভয়েরই সমস্যা ছিলো।

কিছুটা বুদ্ধি খরচ করে মোটামুটি জোড়াতালি দিয়ে রমেশ চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু শেষে আর পারলো না। একদিন একেবারে রাত কাবার করে দিয়ে ডাক্তারবাবু বাড়ি ফিরছেন, ফিরেই চাপা গলায় রমেশকে শাসিয়েছেন, 'এই সাবধান! যদি বলবি তো রাত কাবার করে ফিরেছি, একদম ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবো।' ডাক্তারবাবু তো বাড়িতে ঢুকেই নিজের বিছানায় গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। পাশের খাটে গৃহিণী তখনো ঘুম থেকে ওঠেননি। মহিলা সময়মত ধীরেসুস্থে ঘুম থেকে উঠে পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করে গভীর নিদ্রায় মগ্ন স্বামীকে বিছানা থেকে চুলের মুঠি ধরে তুললেন, 'তোমার এতো বাড় বেড়েছে. রাতে বাড়িতেই ফিরছো না! দাঁড়াও আজ পাগলের ইলেকট্রিক শক তোমাকেই দেবো!' সদ্য কাঁচা ঘুম ভাঙা রাত্রির অত্যাচারে ক্লান্ত ডাক্তারবাবু শেষ পর্যন্ত রমেশের শরণাপন্ন হলেন। স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন, 'রমেশ তো দেখেছে কখন ফিরেছি, ওকে জিজ্ঞাসা করো।'

রমেশকে ডাকতে তিনি এলেন। ডাক্তারগিন্নি গর্জন করে উঠলেন, 'এই কি রে! এই লোকটা কখন বাড়ি ফিরেছে?' ঠিক সময় বললে বিপদ, ডাক্তারাবু মারবে, তাড়াবে। আবার বেঠিক সময় বলে গিন্নির হাতে ধরা পড়লে সে তো আরো মারকুটে, আরো দজ্জাল। দুপক্ষের হাত থেকে বাঁচতে সে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে বললো, 'ডাক্তারবাবু যখন ফিরলেন তখন তো আমি ঘড়ি দেখতে পারিনি, তাই বলতে পারছি না সময়টা।' গিন্নি গর্জে উঠলেন, 'কেন ঘড়ি দ্যাখোনি? তোমাকে বলিনি আমি?' রমেশ বললো, 'কি করে দেখবো, তখন যে আমি ঘুম থেকে উঠে কলতলায় মুখ ধুচ্ছিলাম।'

বলাবাহুল্য, অতঃপর রমেশের অন্ন ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে উঠলো। কিন্তু কলকাতা শহরে চাকরের কাজের অভাব হয় না। গলির মোড়েই থাকেন এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, কাপড়ের পাইকারি বিক্রেতা, বাড়িতেই একতলায় তাঁর গদি। যাতায়াতের পথে রমেশকে তিনি দেখেছেন, তার প্রতি দৃষ্টিও ছিলো। তাঁর গদিঘরের একজন বয় দরকার! রমেশ বেকার হওয়া মাত্র উক্ত ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, নকুলবাবু, তাকে লুফে নিলেন।

নকুলবাবুর গদিতে গিয়ে রমেশ আরেকবার বোকা বনলো। ঐ ডাক্তারবাবুর বাড়ির কায়দায় যারা গদিতে আসে রমেশ তাদের সরল চিত্তে 'পিসেন্ট' বলে। গদি পরিষ্কার করে ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে তাদের বসতে বলে, দোতলায় নকুলবাবুকে গিয়ে বলে, 'চারজন পিসেন্ট এসেছে।'

নকুলবাবু প্রথমে ধরতে পারেন নি। পরে রমেশকে বললেন, 'আরে গাধা, আমি কি ডাক্তার নাকি যে ওরা পেশেন্ট হবে?' রমেশ বোকা নয়, সে প্রাক্তন অভিজ্ঞতা থেকে বললো, 'ও বুঝতে

পেরেছি, ওরা মক্কেল।' নকুলবাবু স্থিতধী ব্যবসায়ী, খুব শান্ত মাথায় রমেশকে বোঝালেন, যারা এসেছে, যারা গদিতে আছে, আসবে তারা পেশেন্ট নয়, মক্কেল নয়, তারা খদ্দের।

রমেশ এ ব্যাপারটা বুঝলো। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে নকুলবাবুর ওখানে রমেশের পোষালো না। রমেশকে আগে ডাক্তারবাবুর ওখানে নকুলবাবু দেখেছেন, কিন্তু তার নামটা জানতেন না। যখন জানলেন নতুন চাকরের নাম রমেশ, তিনি একটু বেকায়দায় পড়লেন, কারণ তাঁর শ্বশুরের নামও রমেশ। তিনি রমেশকে বললেন, 'তোকে আমরা রমেশ না বলে গদাই বলে ডাকবো।'

কিন্তু রমেশ গরিব হলে কি হবে, তার আত্মাভিমান অতি প্রখর। সে প্রতিবাদ করলো, 'না, আমাকে রমেশ নামেই ডাকবেন। গদাই আবার একটা নাম নাকি!'

ব্যাপারটা ঝুলে রইলো। কিন্তু নকুলবাবুর সাহস নেই পূজনীয় শ্বশুরমশায়ের নামে চাকরকে ডাকেন। তিনি ওরে, হাঁরে করে চালাতে গেলেন।

এ ব্যাপারটাও রমেশের অপছন্দ। এমন চমৎকার তার একটা নাম, এর আবার ওরে, হাঁরে কি?

ইতিমধ্যে অন্য একটা ব্যাপার ঘটেছে। রাস্তার ওপরেই থাকেন এক নবীনা চিত্রতারকা ও তাঁর তৃতীয় স্বামী। মহিলা অতি নাবালিকা বয়েস থেকেই সাতিশয় পক্ক এবং একাধিক স্বামী ও স্বামীস্থানীয়ের কণ্ঠলগ্না হয়েছেন। তাঁর বাড়িতে অনিবার্য নানা কারণে কাজের লোক থাকে না। সুন্দরীর বর্তমান স্বামী একটি উপযুক্ত কাজের লোকের সন্ধানে আকাশ-পাতাল খুঁজছিলেন। নিজের নামের প্রশ্নে দ্বিধা ও সংশয়ে আচ্ছন্ন রমেশকে ভাঙিয়ে নিতে তাঁর এক মুহূর্ত সময়ও লাগলো না। এর চেয়ে তাঁর অনেক বেশি সময় এবং পরিশ্রম ব্যয় হয়েছিলো সুন্দরীকে তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর হাত থেকে ভুলিয়ে আনতে।

সে যা হোক, রমেশ এই চিত্রতারকার বাড়ি থেকে প্রথম দিনেই, বলা উচিত সন্ধ্যাবেলাতেই, বিতাড়িত হলো। সন্ধ্যাবেলা তারকা শয়নঘরে সাজগোজ করছেন। এমন সময় বাইরের দরজায় বেল বাজলো। রমেশ গিয়ে দরজা খুলে তিনজন সুসজ্জিত ভদ্রলোককে ড্রইংরুমের সোফায় বসালো। তারপর ভিতরের ঘরে গিয়ে সুন্দরীকে খবর দিলো। সুন্দরী এতক্ষণ এঁদের প্রতীক্ষা করছিলেন, এঁরা তাঁর আগামী ছবির প্রযোজক এবং প্রযোজকের বন্ধুরা। নকুলবাবুর বাড়িতে সদ্য রপ্ত করা বুলিতে রমেশ সুন্দরীকে জানালো, 'বাইরের ঘরে তিনজন খদ্দের এসেছে।' সুন্দরীর হাত থেকে পাউডারের পাফ পড়ে গেলো। সুন্দরীর স্বামী বিছানায় শুয়ে চিৎ হয়ে সিগারেট টানছিলেন।

খদ্দের এসেছে শুনে তাঁর মাথায় কেন যেন রক্ত উঠে গেল, রমেশকে কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে 'হারামজাদা, রাস্কেল' ইত্যাদি অবর্ণনীয়, অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে ভাঙা সুটকেস সমেত পিছনের দরজা দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন।

ঐ বসে রয়েছে রমেশ। সে তার দুঃখিনী মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও সে শহরে এসে বুঝতে পারেনি, বাবুদের বাড়িতে যারা আসে তারা মক্কেল, না পেশেন্ট, না খদ্দের? নাকি আরো কিছু আছে?

নিতান্ত বুদ্ধিহীন কিংবা পাগল না হলে কি কেউ পুজোর সময় কলকাতার বাইরে যেতে চায়, অন্তত এই হাওড়া স্টেশন দিয়ে কারোর পক্ষে বেরোনো কি সম্ভব?

কাউকে যদি সত্যি সত্যিই কলকাতার বাইরে পুজোর সময়ে থাকতে হয়, তাহলে তাকে আষাঢ় মাসেই রওনা হতে হবে। আর তাছাড়া অবশ্য পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। কিন্তু যোগেশবাবুর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আর যোগেশবাবুর স্থিরই ছিলো না যে কোথায় কবে যাবেন। ছোটো শ্যালিকার বিশেষ অনুরোধে তাঁকে এই মহালয়ার দুঃসময়ে কলকাতা-পরিত্যাগ করতে হচ্ছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোডের কাছাকাছি থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যোগেশবাবু, পাকা সোয়া দুই ঘণ্টা লাগলো স্টেশনে পৌঁছাতে, ট্যাক্সিওয়ালা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'অন্যদিনের তুলনায় আজ খুবই তাড়াতাড়ি হলো।'

মেল ট্রেন কথাটার মানে এতকাল ভালো জানতেন না যোগেশবাবু। তাঁর ধারণা ছিলো এই সব গাড়িতে ডাক যায় বলে এগুলিকে মেল ট্রেন বলে। এবার বুঝলেন মেল ট্রেন মানে এই গাড়িগুলো ফিমেল ট্রেন নয়, সত্যিকাবেব খাঁটি মেল যাকে বলে ইংরেজিতে, সেই জোয়ান-মরদ ছাড়া আর কারোর সাধ্যি নেই যে এব কোনোটায় উঠতে পারে।

সমস্ত ট্রেনগুলো আগের থেকেই কোন জায়গা থেকে যেন সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে আসছে। একচল্লিশ ঘণ্টা লাইন দিয়ে সাড়ে তিন টাকার ঝালমুড়ি খেয়ে, জুতো হারিয়ে, ছাতা ভেঙে একটা টিকিট সংগ্রহ কবেছেন যোগেশবাবু, সুতরাং এত সহজে নিরুদ্যম হয়ে ফিরে যাবেন তিনি ভাবতে পারেন না।

যোগেশবাবু খোঁজ করতে লাগলেন কোথায় এই ট্রেনগুলো দাঁড়ায় যেখানে এত লোক ওঠে। কিন্তু এই প্রশ্নের সদুত্তব কে দিতে পারে? কেউ বললো বর্ধমান, কেউ বললো দুর্গাপুর, একজন বললো মোগলসরাই। বর্ধমান বা দুর্গাপুর কিংবা মোগলসরাই গিয়েও উঠতে রাজি আছেন যোগেশবাবু। কিন্তু তাঁর সমস্যা ঐ সব জায়গাতেই বা এই লোকগুলো কোন্ ট্রেনে গেলো?

উত্তর পাওয়া গেলো সঙ্গে সঙ্গে। পাশে একটি কুলি দাঁড়িয়ে ছিলো, সেই আধা বাঙলা আধা হিন্দি জবানিতে বললো, 'এরা সেখানে যাবে কেন, এরা তো সেখান থেকেই এলো।'

যোগেশবাবু অবাক হলেন, 'তাহলে এরা ট্রেন থেকে নামছে না কেন? এ ট্রেনটা তো আর হাওড়া স্টেশন পেরিয়ে কলকাতার মধ্যে ঢুকে যাবে না, এখানেই তো শেষ!'

কুলিও অবাক হলো, 'বা, এরা ফিরবে না?'

'ফিরবে, তাহলে এলো কেন?' যোগেশবাবুর এই জিজ্ঞাসায় কুলি একটু বিরক্ত বোধ করলো, বোধহয় সেও কারণটা জানে না, সে সোজাসুজি অন্য প্রশ্ন করলো, 'আপনি যাবেন কিনা বলুন?'

যোগেশবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'যেতে তো চাই কিন্তু উঠবো কি করে?'

প্রশ্ন শুনে কুলি যা বললো তার মর্মার্থ এই যে যোগেশবাবুর সুটকেস, বেডিং, বেতের ঝুড়ি, জলের বোতল নিয়ে কুলি যেভাবেই হোক গাড়ির ভিতরে আগেভাগে উঠে যাবে। উঠে যোগেশবাবুর জন্যে একপায়ে দাঁড়াবার জায়গা করবে। তারপর যোগেশবাবু উঠে নিজের স্থান বুঝে নেবেন।

কুলি নিজের হাত থেকে পিতলের চাকতি খুলে যোগেশবাবুর হাতে দিলো, 'এই চাকতিটা রাখুন, আমাকে না পেলে কাজে লাগবে।'

কুলির প্রস্তাবে যোগেশবাবুর রাজি না হয়ে আর কিই বা উপায়? পিতলের চাকতির বিনিময়ে মালপত্র সব কুলির কাঁধে, পিঠে তুলে দিয়ে যোগেশবাবু অসহায়ের মতো প্ল্যাটফর্মে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

দূরে হৈ-হৈ রব উঠলো একটু পরেই। ছাদ-জানলা-দরজা আগাগোড়া লোকে ছাওয়া একটা গাড়ি গুটি গুটি প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে আসছে। জনতার উত্তাল সমুদ্রে যোগেশবাবুর কুলি ঝাঁপিয়ে পড়লো। যোগেশবাবু পড়ে রইলেন ভিড়ের ধাক্কায়। একটা ট্রাঙ্ক না কিসের কোণায় ব্রহ্মতালুতে একটা চোট খেয়ে ভিরমি খেয়ে সামনে পড়ে যাচ্ছিলেন, সামনের দুহাজার লোক তাঁকে পিছনে ঠেলে দিলো। এরপরে পিছনের ধাক্কা সামনে এবং সামনের ধাক্কা পিছনে সামলিয়ে কয়েক মিনিট পরে যখন তিনি ধাতস্থ হলেন, আবিষ্কার করলেন তাঁর নিজের পায়ে এখন আর কোনো জুতো নেই, তবে হাতে একটা মেয়েদের স্লিপার কি করে এসে গেছে এবং মাথায় একটা বিছানা।

বিছানা এবং স্লিপারটা জনসমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট গাড়ির দিকে ধাবিত হলেন, অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন যোগেশবাবু। বহু কষ্টে বহু জায়গায় ঘুরে এক জায়গায় এক ভদ্রমহিলার কনুই এবং আরেক ভদ্রলোকের কাঁধের মধ্যবর্তী এক স্কোয়ার ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক দিয়ে মনে হলো যেন তাঁর কুলিকে তিনি দেখতে পেয়েছেন।

কুলিও বোধহয় দেখতে পেয়েছে তাঁকে। চেঁচিয়ে, তারপরে হাতমুখের ইশারা করে সে কি বোঝালো যেন, যোগেশবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলেও উপায় ছিলো না। মালপত্র নিয়ে কুলি ভিতরে রইলো, কিন্তু যোগেশবাবু উঠবেন কি করে?

দরজায় যারা ঝুলছে তারা আসলে প্রত্যেকে বসে আছে দুজন কিংবা তিনজন করে লোকের পিঠে। এরা বসে রয়েছে পাদানিতে আর সেই পাদানির লোকগুলোর পা ধরে ঝুলে রয়েছে, একেক পায়ে দুজন করে চারজন লোক। এইভাবে সিঁড়ি ভাঙার অঙ্কের মতো ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে জনতার ডালপালা।

জানলায় কনুই এবং কাঁধের ফাঁকে এক স্কোয়ার ইঞ্চি জায়গা দিয়ে কুলিকে দেখেছিলেন, দরজার কোথাও সেটুকু ফাঁক পেলে যোগেশবাবু ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করতে কসুর করতেন না। কিন্তু তাও তো নেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দের মতো তীক্ষ্ণ সিটি দিয়ে মেল ট্রেন ছেড়ে দিলো। একটু ছুটলেন যোগেশবাবু ট্রেনের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের সীমা পর্যন্ত, তারপর মালপত্রশুদ্ধ তাঁর কুলিকে নিয়ে তাঁর ট্রেন তাঁকে ফেলে ধীরেসুস্থে গড়িয়ে গেলো।

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে যোগেশবাবু এবার স্টেশনের অফিসের দিকে ছুট দিলেন একটা তদ্বির তদারক কিছু করা যায় কিনা এই আশায়।

এবার আরেকটা কুলি তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালো, 'কেয়া হুয়া?'

যোগেশবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন, 'হামারা মালপত্র লেকে কুলি চলা গিয়া।'

এই কুলির মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো, 'কৌন কুলি? চাকতি হ্যায়?'

যোগেশবাবু চাকতিটা দেখালেন। চাকতিটা দেখে এবার আর গোলমেলে হিন্দি বললো না, স্পষ্ট বাংলায় কুলি বললো, 'দুশো আশি নম্বর, তা হলে বিরজাবাবু এতদিনে যেতে পারলেন।

প্রথমত স্পষ্ট বাংলা, তারপর এইরকম অর্থহীন উক্তি—যোগেশবাবু রীতিমত অবাক হলেন, 'কে বিরজাবাবু?'

কুলি বললো, 'ঐ যিনি চলে গেলেন, এই দুশো আশি নম্বর।'

যোগেশবাবু থতমত খেলেন, 'কুলি মানে, বিরজাবাবু মানে?'

কুলি যোগেশবাবুর প্রশ্নের পাশ এড়িয়ে বললো, 'আপনি তো চাকতি পেয়ে গেছেন, আপনি লেগে যান, আপনিও একদিন যেতে পারবেন।'

যোগেশবাবু অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কুলি বললো, 'এই এখানে দেখছেন আমরা এখানে কেউই আসলে কুলি নই। এখানে আটকে গিয়ে কুলি হয়েছি। এই আমি, আমি তো সরকারি কাজ করি, বদলি হয়ে যেতে গিয়ে এখানে আটকে গেছি। আমার মালপত্র নিয়ে নবনীবাবু চলে গেছেন।'

'কিন্তু বিরজাবাবু?' যোগেশবাবুর তবুও বিমূঢ় ভাব একেবারে কাটেনি।

'বিরজাবাবু তো এই এতদিনে যেতে পারলেন, আড়াই মাস লাগলো ওঁর বেরোতে, আমার তো চার সপ্তাহ হয়ে গেলো-দেখি এবার যেতে পারি কিনা।' কুলির মুখে আশা-নিরাশার আলোছায়া।

'কিন্তু আমি?' যোগেশবাবুর সংশয় তবু যায় না।

'আগে হোক পরে হোক আপনিও যেতে পারবেন। বিরজাবাবুর মতই আরেক জনের মাল নিয়ে ট্রেনে উঠবেন যেদিন পারেন, সে আর উঠতে পারবে না। কুলি ছাড়া আর কে উঠতে পারে?' বলতে বলতে যোগেশবাবুর হাত থেকে পিতলের চাকতিটা নিয়ে কুলি যোগেশবাবুর বাহুতে শক্ত করে বেঁধে দিলো, তারপর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, 'কিছু ভাববেন না, এখন কাজে লেগে যান, এইভাবেই সবাই যায়। কেউ কি আর সারাজীবন স্টেশনে পড়ে থাকে? আমি যাবো, আপনিও যেতে পারবেন। দুমাস হোক, চারমাস হোক একদিন নিশ্চয় যাবেন। এই বিরজাবাবুর মতই আরেকজনের মালপত্র নিয়ে নিশ্চয়ই একদিন চলে যেতে পারবেন।'

লাথ্যৌষধি

ভদ্রলোককে ভোরবেলায় ময়দানে বেড়ানোর সময় কখনো কখনো দূর থেকে দেখেছি। দেখার মত, সমীহ করার মত চেহারা। সাড়ে ছ'ফুটের চেয়ে কম নয় লম্বায় এবং তদনুপাতিক ছড়ানো-বাড়ানো দশাসই কলেবর।

অনেককেই সকালে ময়দানে দেখি। কেউই ঠিক সাধারণ পর্যায়ের লোক বোধহয় নয়। তা

না হলে চমৎকার সুন্দর ভোরবেলায় বিছানার আরাম ছেড়ে মাঠে দৌড়াতে আসবে কেন? এদের মধ্যে একেকজন বেশ বিপজ্জনক। আমি যখন প্রথম প্রথম ময়দানে হাঁটা শুরু করি, কাউকে কাউকে দেখে রীতিমত ভয় হতো। একজন আছেন দু পায়ের জুতো দু হাতে নিয়ে, ধুতি মালকোঁচা বেঁধে, দুপাশে দুটো হাত পাখির মত ছড়িয়ে দিয়ে বিকট গগনভেদী 'আ-আ আ' চিৎকার করতে করতে মাঠের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যান। উনি নাকি কোন্ সাবানের কারখানার মালিক, কোটিপতি। এইভাবে 'আ-আ-আ' করে ছুটে প্রতিদিন তিনি শরীর ও মনের গ্লানি দূর করেন। অন্য এক বৃদ্ধ আছেন, আজ চল্লিশবছর নাকি ময়দানে আসছেন, ছত্রিশ বছর হলো আবগারির বড় দারোগা পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। ভদ্রলোকের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা, কাঁধের দু পাশের দুটো হাতকে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের মতো বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে পাবেন, সত্যিই বোঁ বোঁ শব্দ হয়, আমি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে শব্দ স্বকর্ণে শুনেছি।

হাফপ্যান্ট পরিহিতা এক তাড়কাকায়া ভদ্রমহিলা আসেন। কোনো একজন দরজির পক্ষে যে তাঁর হাফপ্যান্টের মাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি, একজন ফিতে ধরে ছিলো এবং অন্যজন চারপাশ ঘুরে এসেছিলো, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, ইনি অবশ্য বিশেষ দৌড়ঝাঁপ করেন না। করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। মাঠের পাশের একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে শরীরের ভার ফেলে সেই বেঞ্চিটা ভাঙার চেষ্টা করেন আর সেই বেঞ্চি থেকে উঠতে কি কঠোর পরিশ্রম হয় তাঁর, বহু কষ্টে দম নিয়ে যেন কোন খাড়া পাহাড়ে উঠছেন এইভাবে দেহ উত্তোলন করেন।

এ সব যা হোক, আমি প্রথমে যে দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকের কথা বলেছি, যাঁর জন্যে আমাদেব এই গল্প, তাঁর কাছে ফিরে আসি। ভদ্রলোক কাছাকাছি কোনো বহুতল অট্টালিকার বাসিন্দা, কোনো কোম্পানি বা কারখানার সম্ভবত ম্যানেজার হবেন। কোনো কোনো পবিচিত বায়ুসেবনকারী তাঁকে ঐ নামেই সম্বোধন করেন শুনেছি এবং তিনিও সাড়া দেন। এই গল্পে আমরাও তাঁকে আপাতত ম্যানেজার সাহেব (ম্যা. সা.) বলবো।

ম্যা. সা. একদিন আমাকে চাপা দিতে যাচ্ছিলেন। কোনো গাড়ি দিয়ে নয়, তাঁর বিশাল বপু দিয়ে। আর আমি যদি ক্ষিপ্র না হতাম, এড়াতে না পারতাম তাহলে ঐ চারমনি শরীরের চাপা পড়া গাড়ি চাপা পড়ার চেয়ে কম মারাত্মক হতো না।

ম্যা.সা. সকালবেলা ময়দানে উল্টোদিকে দৌড়ান। আগে কখনো এ জিনিস দেখিনি, ময়দানে উল্টোদৌড়ের কারিগর অনেক। মুখটা সামনের দিকে রয়েছে অথচ পা দুটো পিছন দিকে চরম গতিতে ছুটছে। এতে নাকি শিরদাঁড়া সোজা থাকে। তা নিয়ে আপত্তি নেই কিন্তু অসুবিধা হলো এই মাথার পিছনে চোখ না থাকায় যিনি দৌড় দিচ্ছেন তিনি ধরতে পারছেন না কোথায় পৌঁছাচ্ছেন। একজনকে দেখেছিলাম পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে শেষে একটি ঘোড়ার উপরে গিয়ে পড়েন। ঘোড়াটিও পিছন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, ফলে সে কিংবা তার আরোহী কেউই উল্টো দৌড়বীরকে দেখতে পায়নি। ময়দানের মাউন্ট পুলিশের শিক্ষিত ঘোড়া, মুহূর্তের মধ্যে একটা ব্যাকভলি করে দৌড়শীল ভদ্রলোককে ভূপাতিত করলো। ভদ্রলোক অতঃপর তিনমাস ময়দানে আসেননি। আজকাল আসেন। সামনে, পিছনে কোনোদিকে দৌড়ান না। মাঠের উল্টোদিকে বটতলায় যোগ-ব্যায়াম করেন কোমর সোজা করার জন্যে।

এ ঘটনার ঢের আগে বিপদে পড়েছিলাম আমি। তখন ময়দানে আমি প্রথম প্রথম যাচ্ছি। আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত ভদ্রলোকের অনুরূপ ভঙ্গিতে ঘটনার দিন ম্যা. সা. পিছনপানে

ছুটছিলেন। আমি খালি পায়ে ভেজা ঘাসের ওপর খুব আলতো ভাবে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পর্বতের মত বিশাল কি একটা বস্তু আমার ওপরে এসে পড়লো, বস্তুটি ঐ ম্যা. সা.। তিনিও আমাকে দেখতে পাননি, পেছন দিকে কি করে দেখবেন ?

ভগবান আমাকে একটি অসামান্য ক্ষমতা দিয়েছেন। কোনো বিপদে পড়লেই আমি 'বাঁচাও, বাঁচাও করে, চেঁচাই,' এর জন্যে আমাকে কোনো চিন্তা করতে হয় না। বিপদের আভাস পাওয়া মাত্র একা একাই আমার কর্কশ কণ্ঠ দিয়ে এই অন্তিম আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। আমার এই আর্তনাদ শুনে ইতিপূর্বে খ্যাপা কুকুর কামড়াতে এসে থমকে থেমে গেছে, উদ্যত শৃঙ্গ ষণ্ড হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে অন্যদিকে ছুটে গেছে, এমনকি বস্তির মাস্তানরা চাঁদার খাতা রাস্তায় ফেলে দৌড়ে পাশের গলিতে ঢুকে গেছে। এবারেও তাই হলো, যখন ম্যা. সা. এবং আমার মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক সেন্টিমিটার, আমার গলা থেকে আমার প্রায় অজান্তেই বেরিয়ে এলো সেই বহু পরিচিত বুকের রক্ত হিম করা, কর্কশ আকূতি, 'বাঁচাও বাঁচাও'।

আচমকা শরীরের ব্রেক কষতে গিয়ে ম্যা সা. সামনের দিকে মুখথুবড়ে পড়ে গেলেন। আর এ কি আর যা-তা পড়া, পড়তে গেলে এভাবেই পড়তে হয়, মহীরূহ পতন কাকে বলে স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। এই মহীরূহ যদি আমার উপরে পতিত হতো, বাঁচতাম কি মরতাম বলতে পারি না তবে চিতল মাছের মত চ্যাপটা হয়ে যেতাম।

ম্যা. সা. পড়ে গিয়ে আর ওঠেন না। যদিও তাঁর পতনের ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই কিন্তু আমিই তার কারণ, মনে মনে দুশ্চিন্তা বোধ করতে লাগলাম। ময়দানের চারপাশে ম্যা সা র শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই, চারদিক থেকে তাঁরা ছুটে এলেন, এসে আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন।

বেশ ভিড় হয়ে গেলো। আমি রীতিমত শঙ্কিত বোধ করতে লাগলাম। যখন ম্যা. সা-র পতনের ঘটনাটি ঘটে, তখন দুঃখের বিষয় আমাদের দুজনের কাছাকাছি কোনো লোক ছিল না। আসলে ম্যা. সা সম্ভবত তাঁর নিরুপদ্রব পশ্চাদ্দৌড়ের প্রয়োজনে একটু ফাঁকা জায়গাই বেছে নিয়েছিলেন। আমি ভুলক্রমে তাঁর মানসিক সীমানায় ট্রেসপাস করেছিলাম। সেটুকু অবশ্যই আমার দোষ, ম্যা. সা কিন্তু পড়েছেন নিজ গুরুত্বে এবং নিজ দায়িত্বে। তাঁকে আমি কোনো মুহূর্তেই বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিনি।

যা হোক, এর মধ্যে বেশ ভিড় জমে গেছে। দু-একজন বুঝদার লোকও এঁদের মধ্যে আছেন সেটাই ভরসা। বুঝদার মানে, আমার মতো সামান্য শক্তির কোনো লোক যে ম্যা. সা-র মতো অতিকায় প্রাণীকে ধরাশায়ী করতে পারে না সেটা তাঁরা অনায়াসেই উপলব্ধি করেছেন।

বিপদ হলো-দু একজন অত্যুৎসাহী লোক নিয়ে। তারা কিন্তু আমার বিপদের লোক নয়, বরং প্রশংসিত দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে আপাদমস্তক অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ-করছিলো কি করে তাদের মনে ধারণা হয়েছে যে আমি ক্যারাটে কিংবা ঐজাতীয় কোনো গুপ্ত বা গুহ্য শরীরবিদ্যা জানি এবং সেই মারাত্মক ক্ষমতায় আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই বিপুল বপুকে সামান্য অঙ্গুলিহেলনে কাটা কলাগাছের মতো ধরাশায়ী করা।

আমি আর কি বলবো? কাকেই বা বোঝাবো? এমন কি আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হচ্ছে কিনা, নাকি মুহূর্তের মধ্যে স্থানত্যাগ করা উচিত, কোনটা আমার পক্ষে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক আমি কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না।

এদিকে ম্যা. সা সেই যে পড়েছেন একবার গড়িয়ে চিৎ হয়ে গিয়ে আর ওঠেন, না। নড়াচড়া পর্যন্ত বন্ধ। আশঙ্কা হলো মারা, গেলো নাকি? তাহলে রীতিমত কেলেঙ্কারি; তখন পুলিশ আর আদালতের কাছে বোঝাতে হবে আমার কোনো দোষ নেই, নিতান্ত পৈতৃক প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমি আর্তনাদ করে উঠেছিলাম এবং প্রয়োজনে আর্তনাদ নিশ্চয়ই ফৌজদারি আইনের আওতায় আসে না, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে নির্দিষ্ট কারণে আর্তনাদ করাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হতে পারে না। আর তাছাড়া ম্যা. সাকে ঠিকমত পোস্টমর্টেম্ করলেই ধরা পড়বে তাকে আমি কিংবা কেউই কোনো রকম আঘাত করনি।

অবশ্য কৌতূহলী জনতার মধ্যে আমার চেয়ে বেশি তৎপর একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ইতিমধ্যে ম্যা. সা-র পাশে বসে পড়েছেন। এঁরা অন্তত এঁদের মধ্যে কেউ কেউ , বোঝা যাচ্ছে, ম্যা. সা-র পূর্ব পরিচিত। একজন তো রীতিমত ম্যা. সা-র নাম পর্যন্ত জানেন তিনি ম্যা. সা-র কানের কাছে মুখ নিয়ে 'হ্যালো মিস্টার ত্রিবেদী, হ্যালো ঘনশ্যামজী' বলে ডাকতে লাগলেন। অন্য এক উদ্যোগী ব্যক্তি ঘাসের নিচ থেকে এক টুকরো শুকনো মাটির ডেলা নিয়ে খৈনি ডলার মত করে বামহাতের তালুতে রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চিপে চিপে গুঁড়ো করে ফেলছেন, এবার সেই গুঁড়ো মিস্টার ত্রিবেদী ওরফে ম্যা. সা-র নাসিকারন্ধ্রের সামনে আস্তে আস্তে ফেলা হলো। পতনোন্মুখ ধূলিকণার মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোড়ন দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেলো যে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর প্রাণবায়ু এখনো বইছে, সেটা অন্তর্হিত হয়ে যায়নি।

ইতিমধ্যে ঘনশ্যাম ত্রিবেদী একবার ঘোরের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর কানের কাছে 'মিস্টার ত্রিবেদী, মিস্টার ত্রিবেদী' বলে ডাকছিলেন তাঁকে বিশাল বাহুর এক ধাক্কায় প্রায় চার হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিলেন। পরোপকারী ভদ্রলোক এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি ঐ চার হাত দূরে ছিটকে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। আমারই কেমন মায়া হলো। আমি পতিত ভদ্রলোককে নিচু হয়ে তুলতে গেলাম এবং তখনই বুঝতে পারলাম ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর অজ্ঞান অবস্থাতেও অতর্কিত আক্রমণের কারণ। ভদ্রলোকটির মাথায় মধ্যমনারায়ণ অথবা ঐ জাতীয় কোনো আয়ুর্বেদীয় তেলের বিকট গন্ধ। এই ভোরবেলাতেই লোকটি জবজবে করে একবাটি মধ্যমনারায়ণ তেল মাথায় মেখে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। এই রকম গন্ধের যে কোন তেলই পাগলের আইডেনটিটি কার্ড, অজ্ঞান অবস্থাতেও মাথার কাছে পাগলের আগমনে ত্রিবেদী সাহেবের যথেষ্ট আপত্তি আছে, অন্তত তাই বোঝা যাচ্ছে।

এবং আরেকটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, ত্রিবেদী সাহেব মারা যাননি। জ্ঞান-অজ্ঞানের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আছেন। তবে অজ্ঞানের চেয়ে জ্ঞান বেশি টনটনে। তার প্রমাণ পাওয়া গেলো এক সরল প্রকৃতির ব্যক্তি ত্রিবেদী সাহেবের হৃৎপিন্ড এখনো ধুক্‌ধুক্ করছে কিনা সেটা অনুধাবন করার জন্যে এবং সম্ভবত অনুসন্ধানের সুবিধের জন্যে ত্রিবেদী সাহেবের জামার নিচে বুকের ওপর হাত দিয়েছিলো। ত্রিবেদী সাহেবের গলায় মোটা বিছে হার, আগেকার দিনে সচ্ছল সংসারে ঠাকুমারা যেমন গলায় দিতেন। হৃৎপিণ্ড-সন্ধানী ভদ্রলোক ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় জামার নিচের সেই বিছে হারটি যে মুহূর্তে স্পর্শ করেছেন ত্রিবেদী সাহেব চমকে উঠে উপুড় হয়ে গেলেন।

ত্রিবেদী সাহেব এতক্ষণ চিৎ হয়ে অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। এবার আবার উপুড় হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সেটা যতটা গুরুতর তার অধিকতর গুরুতর সেই হৃৎপিণ্ড অনুসন্ধানী স্বর্ণহার স্পর্শক ব্যক্তিটি মহামতি ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর অকস্মাৎ উপুড় হয়ে যাওয়া বিরাট দেহের নিচে

বিনা বাক্যব্যয়ে চাপা পড়ে গেলেন। ক্ষীণতনু উক্ত ভদ্রলোক পিষ্ট হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ত্রিবেদী সাহেবের নিচ থেকে নির্গত হতে পারলেন না, শুধু মাঝে মাঝে তাঁর মুখ থেকে উঃ, আঃ, বাবা, মা ইত্যাদি অক্ষর ও শব্দ নির্গত হতে লাগলো।

অপেক্ষমাণ জনতার, এমন কি আমার নিজেরও এবার প্রধান সমস্যা হলো ঘনশ্যাম ত্রিবেদী নয়, ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর পিষ্ট পরোপকারী ব্যক্তিটি। এতক্ষণে সবাই বুঝে গেছেন, ঘনশ্যাম মারা যাননি, মারা যাবার ব্যক্তি নন। কিন্তু এই নতুন লোকটি যিনি ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর নিচে পড়েছেন, তার তো সাংঘাতিক অবস্থা।

দু-একজন অসম সাহসী ব্যক্তি ঘনশ্যামজীকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু যতদূর বোঝা গেলো উপুড় হয়ে পড়েই তিনি আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি সংজ্ঞা হারালেও যে ব্যক্তিটি অধঃপতিত রয়েছেন তাঁর কিন্তু জ্ঞান রয়েছে, তিনি প্রাণান্তকর 'কোঁ-কোঁ-কোঁ' করে চলেছেন।

ঘটনাবলীর আকস্মিক মোচড়ে আমার ভূমিকা ইতিমধ্যে লোকচক্ষে গৌণ হয়ে এসেছে। কৌতূহলী জনতার সংখ্যা বেশ বেড়েও গেছে, তারা প্রথম থেকে ব্যাপারটা জানে না। এই নবাগতদের ধারণা মারামারি বা কুস্তি কিছু হচ্ছে, সেরকম সৌজন্যমূলক প্যাঁচের লড়াই। আধুনিক সিনেমার তুঙ্গমুহূর্তে যেমন ফ্রিজ শট্ দেওয়া থাকে, সেই রকম নট নড়নচড়ন অবস্থা দেখে নবাগত জনতা কিঞ্চিৎ অভিভূত।

আমি এই সুযোগে গুটিগুটি কেটে পড়ার কথা ভাবছিলাম। কারণ সত্যি আমার কিছু করার নেই। আর তাছাড়া বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেরই প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফেরার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ, আছে, সেটা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে চিন্তার ব্যাপার ঘটে।

এদিকে নতুন একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঘনশ্যামজীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ দু-চারজন লোক যাঁরা ময়দানের অপর প্রান্তে এতক্ষণ হাওয়া খাচ্ছিলেন তাঁরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের মুখেই শোনা গেল রাস্তার ওপারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উদ্যানের ভিতরে ঘনশ্যামজীর স্ত্রী নাকি ভ্রমণ করছেন। তবে তাঁকে খবর দিতে এঁরা একটু ইতস্তত করতে লাগলেন।

এঁদের চাপা কথাবার্তা এবং টুকরো টুকরো আলোচনা শুনে বোঝা গেলো শ্রীমতী ঘনশ্যাম ত্রিবেদী—যার নাম হলো রোমিলা ত্রিবেদী, যাঁকে এরা মিসেসজী বলে থাকেন, তিনি একটি মারাত্মক বিপজ্জনক মহিলা! আজ বেশ কিছুদিন হলো তাঁর সঙ্গে তাঁর পতিদেবতার বাদবিসম্বাদ, হস্তাহস্তি এবং অবশেষে ছাড়াছাড়ি চলছে। মিসেসজী বর্তমানে পিত্রালয়বাসিনী। তাঁকে ঘনশ্যাম ত্রিবেদী বাঘিনীর মত ভয় করেন। তিনি প্রভাতে ভিক্টোরিয়া উদ্যানে চড়েন বলেই নিরাপদ ব্যবধানে এই ব্রিগেড প্যারেডের ময়দানে মাউন্ট পুলিশের নিরাপত্তার আড়ালে ঘনশ্যাম সকালে দৌড়াতে আসেন।

ছাড়াছাড়ি হলেও আসলে স্ত্রী তো, সাতজন্মের সাত পাকের বন্ধন, ডিভোর্স টিভোর্স হয়নি। আজ ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর এই দুঃসময়ে তাঁকে একটু খবর জানানো দরকার, তা ছাড়া মিসেসজী যখন হাতের কাছেই রয়েছেন।

দ্রুত শলাপরামর্শ করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে তিনজন ছুটলেন মিসেসজীকে আনতে। আমি চলে আসছিলাম, শুধু রয়ে গেলাম-কৌতূহলবশত মিসেসজীকে চাক্ষুষ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

একটু পরেই সংবাদদাতাদের ভিক্টোরিয়ার প্রান্ত থেকে ফিরতে দেখা, গেলো তাঁদের মধ্যমণি হয়ে আসছেন এক মহিলা, স্পষ্টতই তিনি মিসেস রোমিলা ত্রিবেদী।

কাছে আসতে মিসেস ত্রিবেদীকে দেখে বুঝলাম ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর জীবনসঙ্গিনী হবার ইনি যোগ্য নন।'যদিও কোমরে ফের দিয়ে শাড়ি পরা, পায়ে কাপড়ের ফিতেওলা জুতো, তবু এই মহিলা আরো দশজন প্রাতঃভ্রমণের দশাসই কলেবরধারিণীদের মত নন। ঘনশ্যামজীব সঙ্গে রীতিমত বেমানান।

মিসেসজী দ্রুতগতিতে অকুস্থলে এগিয়ে এলেন। তখনো তাঁর স্বামী উপুড় হযে সেই উদ্ধারকর্তাকে ভূমিতে নিষ্পিষ্ট করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন। নিচের ব্যক্তিটি প্রথম দিকে আর্তনাদের সঙ্গে শরীরেব মুক্ত অংশ হাত পা ইত্যাদি ছোঁড়াছুঁড়ির চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এখন তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তবে জ্ঞান রয়েছে, সেটা অসহায় চিঁ চিঁ ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়েছে।

মিসেস ত্রিবেদীর উচ্চতা পাঁচ ফুটেব বেশি নাও হতে পারে। স্বাস্থ্যও অতি সাধাবণ, রোগা বলা চলে! তবে কাছ থেকে দেখলাম, তাঁর মুখ অতি চোয়াড়ে, চোখের ভাষা অতি তীব্র। হাত-টাত ইত্যাদিও বেশ শক্ত মনে হলো- সব মিলে যাকে সাদা বাংলায পাকানো চেহারা বলা যায, একেবারে ঠিক তাই।

মিসেস ত্রিবেদী এসে যেতে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠলো। ইতিমধ্যে অন্য একটা ঘটনা ঘটে গেছে। যে ভদ্রলোক ঘনশ্যামজীর নিচে চাপা পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে যে একটা কুকুব ছিলো বেশ বড়সড় বিলিতি কুকুর, সেটা এতক্ষণ কেউ খেয়াল কবেনি। কুকুবটা এতক্ষণ কাছাকাছি কোথায় দাঁড়িয়ে প্রভুর জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। এইবার মিসেসজীব আগমনে চারদিকেব ভিড একটু চঞ্চল এবং এলোমেলো হতেই সে ভিড়েব মধ্যে ঢুকে গন্ধ শুঁকে প্রভুর সন্ধান পেযে গেছে এবং তার প্রভুর এই শোচনীয় পরিণতি তার মোটেই পছন্দ নয়। সে উত্তেজিত হযে গর্জন শুরু করে দিয়েছে। আশঙ্কা হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর উপরে কুকুরটি ঝাঁপিযে পডতে পারে।

এত বড় একটা হিংস্র কুকুরকে কে ঠেকাবে? তার লকলকে জিব, কম্বু কণ্ঠ এবং ধারালো, বিকশিত দন্তরাজি কৌতুক উপভোগী জনতাকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কবে দিয়েছে। এই শোচনীয পরিস্থিতিতে দু-একজন দর্শক মাউন্ট পুলিশকে ডেকে আনাব কথা বলছে, ঘোডসোযার পুলিশ মাঠের ওপ্রান্তেই টগবগ করে ছুটছে, ডাকলেই হয়তো আসবে।

কিন্তু পুলিশ ডাকার প্রয়োজন হলো না। তার পূর্বেই মিসেস ত্রিবেদী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। আর সে কি প্রবেশ! যে ভাবে মেঘ আসে ঝড়ের আগে ঈশান কোণে, যে ভাবে পাগলা হাতি ঢোকে ডুয়ার্সের গ্রামে, যে ভাবে মিনিবাস ওঠে ফুটপাথে—নাকি এসব উপমাও তুচ্ছ। প্রায় একশো মাইল বেগে ছুটে এসে, তারপব ঘটনাস্থলের দশফুট আগে স্থিবভাবে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটি অনুধাবন করলেন তিনি, তারপরে ধাঁই করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর পিঠের পাশে। এরই মধ্যে বাঁপায়ে একটি কিক্ চালিয়েছেন কুকুরটির মুখে এবং ডানপায়ে একটি কিক্ স্বামীর পৃষ্ঠদেশে।

কুকুরটি আচমকা আহত হয়ে কয়েক হাত পিছিয়ে গিয়ে আরো জোরে চেঁচাতে লাগলো। আর মিসেস ত্রিবেদী মুষলধারে দু পায়ে কিক্ চালাতে লাগলেন স্বামীর পিঠে এবং পিঠের নিচে কোনো কোনো বিশেষ খারাপ জায়গায়।

আমরা ভুল বুঝেছিলাম। লাথিতে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ হলো। দেখা গেলো এই লাথ্যৌষধির সঙ্গে ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর পরিচয় আছে। দু চারটে লাথির পরেই একটা শক্ত জোড়া লাথির মাথাতে তার গলা থেকে অস্ফুট স্বর বেরোতে লাগলো, তারপর স্পষ্ট শোনা গেল, 'কে রোমিলা?'

অজ্ঞান অবস্থায় চোখ বুঁজে উপুড় হয়ে শুধু লাথি খেয়ে জ্ঞান ফিরে এসেছে আর জ্ঞান আসামাত্র ধরতে পেরেছেন এটা পরিচিত লাথি, এটা তাঁর স্ত্রীর লাথি, ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর এই আশ্চর্য যোগ্যতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমরা বাইরের লোক, কিছুই জানি না এদের দাম্পত্য আহ্লাদের, কিন্তু লাথির ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

নিচের ব্যক্তিটিকে ছেড়ে দিয়ে এবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন ঘনশ্যাম ত্রিবেদী. চিৎ হওয়ার মুখে রোমিলার একটা লাথিময় পা দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অনুনয় জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আঃ রোমিলা, কতদিন তোমার লাথি খাইনি!'

মুহূর্তের অবকাশে নিচে পড়া চিড়ে চ্যাপটানো-ব্যক্তিটি, এখনো তার ধড়ে প্রাণ ছিলো, এক লাফে উঠে কুকুরটিকে সংগ্রহ করে সামনের দিকে দৌড় দিলেন। অন্যদিকে ঘনশ্যাম ত্রিবেদীর সবল বাহুর আকর্ষণে রোমিলা ত্রিবেদী পা হড়কিয়ে ঘনশ্যামের বুকের ওপর পড়ে গেছেন, আর ঘনশ্যাম বলে যাচ্ছেন, 'রোমিলা, আমাকে তুমি লাথি মারো, আমাকে তুমি একশো লাথি মারো।'

উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে সবুজ ঘাসের গালিচায় দাম্পত্য পুনর্মিলন নাটক দেখতে যেটুকু চক্ষুলজ্জাহীনতার প্রয়োজন তার অভাব থাকায় আমি গুটি গুটি বাড়ির দিকে ফিরে এলাম। দেরি হয়ে গেছে, বাড়িতে যথেষ্ট রাগারাগি করবে কিন্তু আমাদের গৃহে লাথ্যৌষধির প্রচলন নেই, সেটাই ভরসা।

বাণেশ্বরের রোগমুক্তি

বাণেশ্বর সরকার একসময়ে খুব সিগারেট খেতেন। প্রতিদিন প্রায় তিরিশ-চল্লিশটা। একবার তাঁর খুব গলা ফুলে যায়, ডাক্তারকে দেখান। ডাক্তারবাবু বলেন, 'আপনাকে সিগারেট খাওয়া ছাড়তে হবে। আপনার গলার মধ্যে চাকা চাকা, লাল হলুদ দাগ দেখা যাচ্ছে। সিগারেট খাওয়া বন্ধ করলে এগুলো মিলিয়ে যাওয়ার আশা আছে।' 'আর সিগারেট খাওয়া যদি না ছাড়তে পারি' বাণেশ্বরের এই সংলগ্ন প্রশ্নে নির্বিকার কণ্ঠে ডাক্তারবাবু মোক্ষম জবাব দিয়েছিলেন, 'ক্যান্সার হয়ে মারা পড়বেন।'

এ ধরনের মর্মান্তিক কথা ডাক্তারবাবুরা সাধারণত বলেন না। বাণেশ্বরের দুর্বল চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান থাকায় ডাক্তারবাবু তাঁকে ভয় দেখিয়েছিলেন।

ভয়ে কিন্তু কাজও হয়েছে। বাণেশ্বর সিগারেট খাওয়া কমিয়েছেন, যদিও কেনা কমাননি। এখনো দৈনিক কুড়িটা সিগারেটের প্যাকেট দুটো কেনেন। খুব বেশি বিলি বিতরণ করেন তা নয়। তবে কোনো সিগারেটেই ধরানোর পর একেবারের বেশি দুবার টান দেন না। একটান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মেঝেতে বা রাস্তায় যখন যা পায়ের নিচে থাকে সেখানে ফেলে

দেন সিগারেটের টুকরোটা, তারপর নির্মমভাবে পায়ের জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেন জ্বলন্ত সিগারেটটি।

এইভাবে যাচ্ছিল। সারাদিনে চল্লিশটা সিগারেটে চল্লিশ টান, মোটমাট দুটো পুরো সিগারেটের সমান। বাণেশ্বরের গলা আর তাঁকে ভোগাচ্ছে না। কিন্তু সিগারেট খাওয়া দুম করে ছেড়ে দেওয়ার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, গলা সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাণেশ্বর সরকারের কেমন যেন মাথার গোলমাল দেখা দিল।

প্রথম গোলমাল দেখা দিল তাঁর জুতো নিয়ে। দৈনিক চল্লিশটি জ্বলন্ত সিগারেট হজম করতে গিয়ে তাঁর জুতোব নাকি ক্যান্সার হয়েছে—এই রকম একটা সমস্যা দেখা দিল বাণেশ্বরের। একজন নামজাদা ডাক্তারকে তিনি যোগাযোগ করে দেখা করতেও গেলেন। এমনিতে তাঁর কথাবার্তা শুনে কিছু বোঝা যায় না, ফলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী বাণেশ্বরের যথাসময়ে ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছাতে বিশেষ কোনো অসুবিধে হলো না। কিন্তু জুতো পরীক্ষা করতে, জুতো দেখতে ডাক্তারবাবুর রাজি হওয়া অসম্ভব।

বাণেশ্বরবাবুর যে মতিবিভ্রম হয়েছে একথা বুঝতে ডাক্তারবাবুর কোনো কষ্টই হলো না। বহু রোগীই বহু কাল্পনিক অসুখ নিয়ে আসে ডাক্তারখানায়। কিন্তু ডান পায়ের থেকে জুতো খুলে টেবিলের উপরে উল্টে করে রেখে বাণেশ্বর যখন অগ্নিদগ্ধ, ক্ষতবিক্ষত রবারের সোলটায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন, 'অতিরিক্ত সিগারেট খেয়ে এ জুতোটার কর্কট রোগ হয়েছে। অথচ বাঁ পায়ের জুতোটা,' বাণেশ্বরবাবু এবার সেটাও পা থেকে টেবিলের উপরে রাখলেন, 'এটার কিছুছু হয়নি, এটা তো সিগারেট খায় না' ততক্ষণে বিহ্বল ও হতভম্ব ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পড়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাণেশ্বরের তীব্র প্রতিবাদ এবং উচ্চ ভিজিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ডাক্তারবাবুর দুজন সহকারী, তারা সবল ও বয়েসে তরুণ, বাণেশ্বরবাবুকে চ্যাংদোলা করে ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে বার করে দিল। তখনো বাণেশ্বরবাবুর দুহাতে ধরা রয়েছে একটি ক্যান্সারগ্রস্ত এবং অন্য একটি ক্যান্সারমুক্ত পাদুকা।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানে মিটল না। তাঁর প্রিয় পাদুকার ক্যান্সারমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বাণেশ্বর বিরত হওয়ার পাত্র নন। অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার প্রথিতযশা চিকিৎসকেরা প্রায় প্রত্যেকেই বাণেশ্বর অথবা বাণেশ্বরের পাদুকার সম্মুখীন হলেন। রীতিমত কেলেঙ্কারি বেধে গেল চিকিৎসক মহলে। কারো চেম্বারে কোনো রোগী নিজের জুতোর দিকে দুবার তাকালেই সকলের সন্দেহ হতো এই বোধ হয় বাণেশ্বর সরকার।

কিন্তু চিকিৎসকদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পাদুকার জন্যে কোনো চিকিৎসা এমন কি সামান্য সহানুভূতিও পেলেন না তিনি। অতঃপর হাসপাতালমুখী হলেন বাণেশ্বরবাবু।

কলকাতার এস-এস-কে-এম, মেডিক্যাল কলেজ, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার শুধু নয়, শোনা যায়, তিনি ভেলোরে, বোম্বাইয়ের যশলোক এমন কি দিল্লীর ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথে পর্যন্ত দৌড়াদোড়ি করেছেন ক্যান্সারাক্রান্ত জুতো নিয়ে।

বহু দূর-দূর, বড় বড় জায়গা, অনেক পয়সা খরচ। সর্বভারতীয় উন্মাদ হিসেবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে উঠলেন কলকাতার বাণেশ্বর সরকার, যাকে পাড়ার ডাক্তার সিগারেট খাওয়া ছাড়তে বলেছিল।

অবশেষে এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, বেরসিক এবং সহানুভূতিহীন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বাণেশ্বর সরকার মশায়কে জোর করে নিয়ে গেলেন এক মনোচিকিৎসক অর্থাৎ পাগলের ডাক্তারের কাছে।

সবাই ধরে নিয়েছিল পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ায় বাণেশ্বর যথেষ্ট উত্তেজিত বোধ করবে, কিন্তু তা হলো না। বরং তিনি মোটামুটি খুশিই হলেন, কারণ মনোচিকিৎসক, বলতে গেলে ইনিই প্রথম ডাক্তার, যিনি বাণেশ্বরবাবুর জুতো জোড়াকে গুরুত্ব দিলেন। হাতে দস্তানা পরে জুতো তুলে উল্টেপাল্টে দেখলেন। টর্চের আলো ফেলে যেভাবে গলার ভিতর পরীক্ষা করে সেই ভাবে জুতোর ভিতরে তন্নতন্ন করে দেখলেন, অনেক প্রশ্ন করলেন জুতো এবং বাণেশ্বরবাবুকে জড়িয়ে।

যেন কোনো নিকট আত্মীয়ের দুরারোগ্য অসুখে ডাক্তার তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করছেন এই ভাবে অত্যন্ত ধৈর্য এবং নিষ্ঠা সহকারে ডাক্তারবাবুর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন বাণেশ্বর।

পরপর সাতদিন এরকম সিটিং দেয়ার পর রায় জানা গেল মনোচিকিৎসকেব, অতি পরিষ্কার। সংক্ষিপ্ত ব্যাপার, চিরকুমার, অকৃতদার মধ্যবয়সী বাণেশ্বরবাবু তাঁর পায়ের জুতোর প্রেমে পড়েছেন। এ কোনো হালকা, খেলো প্রেম নয়, রোমিয়ে-জুলিয়েট, লায়লা-মজনু এমন কি পার্বতী-দেবদাসের প্রেম যে ঘরাণার এও ঠিক তাই-এক জাতের।

অকৃতদার বাণেশ্বরবাবু একান্নবর্তী পরিবারের লোক। তাঁর নিজের ভাই নেই, খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে থাকেন। তাঁবই প্রায় সমবযসী এক খুডতুতো ভাই রামেশ্বব, ডাক্তারের কাছ থেকে সব শুনে এসে তাঁকে জানালেন, 'বানেশ, ডাক্তার বলেছে তোমার জুতোর কিছুই হয়নি, সামান্য ফোসকা, তাও শুকিয়ে এসেছে, সিগাবেট খাওয়া বন্ধ করলেই সেটা সেরে যাবে।' তারপর ছোট একটা হেঁচকি তুলে বামেশ্বর বললেন, 'তবে একটু গোলমাল হয়েছে তোমার দিক থেকে, ডাক্তাববাবু বললেন, মনোসমীক্ষণ করে ধরা পডেছে তুমি নাকি তোমার জুতোর গভীর প্রেমে আচ্ছন্ন তার প্রতি আসক্ত।'

জুতোর ক্যান্সার হয়নি জেনে বাণেশ্বর যতটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, প্রেমের প্রসঙ্গটা শুনে বাণেশ্বর বীতিমত হকচকিয়ে গেলেন। এই বিগত যৌবনেও তাঁর কর্ণমূল রাঙা হয়ে উঠল, কেমন যেন আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'দ্যাখো রামেশ্বর, ডাক্তার ঐ পরেব কথাটা মোটেই ঠিক বলেননি। হ্যাঁ আমার জুতো, আমার নিজের জুতো, আমি তাকে পছন্দ করি, তাকে আমার ভালো লাগে, কিছুটা শ্রদ্ধাও করি, একটু স্নেহও আছে তার প্রতি আমার, কিন্তু তাই বলে আমি তার প্রেমে পড়েছি, তার প্রতি আসক্ত, ছি ছি, এতবড় কথা তোমরা বলছো, বলতে পারছো!' খুব তাড়াতাড়ি এতগুলি কথা বলে নিজের সঙ্কোচ ও লজ্জা এড়াতেই বুঝি উঠে গেলেন বাণেশ্বর।

খুড়তুতো ভাই রামেশ্বর সরকার আমদানি রপ্তানির ব্যবসা করেন, সাহেব-সুবোদের চরিয়ে খান। তাঁর বাস্তববুদ্ধি অতি প্রখর। তিনি দেখলেন মনোচিকিৎসক ঠিকই ধরেছে, বাণেশ্বরের যথেষ্ট প্রেম ও আসক্তি রয়েছে জুতোর প্রতি। তিনি এক মতলব করলেন, বেশ সোজা মতলব।

বাড়িতে একটা নতুন কাজের লোক এসেছে। তাকে দেখলেই বাণেশ্বরের মাথা গরম হয়ে যায়। গায়ে গোলাপী গেঞ্জি, মাথায় টেরি কাটা, কেমন বাবু-বাবু ভাব। লোকটা কাজ খারাপ করে না, কিন্তু লোকটাকে বাণেশ্বরের মোটেই পছন্দ নয়। একদিন সকালবেলায় বিছানায় শুয়ে বাণেশ্বর খবরের কাগজ পড়ছিলেন, নতুন চাকরটা ঘর মুছছিল, হঠাৎ বাণেশ্বর দেখেন খাটের

নিচে রাখা জুতোজোড়া লোকটা নিজের পায়ে গলিয়ে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে দূর-দূর করে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন। তারপর রামেশ্বরকে ডেকে বলেছিলেন, 'বৌমাদের বলে দিয়ো, এই লোকটা যেন কখনো আমার ঘরে না ঢোকে। কত বড় সাহস ব্যাটার, আমার জুতোয় পা গলাচ্ছে।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রামেশ্বর তাঁর মতলব হাসিল করলেন। একদিন দুপুরবেলা বাণেশ্বর তাঁর ঘরে দিবানিদ্রায় মগ্ন, সেই সময় রামেশ্বর চুপি চুপি বাণেশ্বরের ঘরে ঢুকে খাটের নিচ থেকে বিখ্যাত জুতোজোড়া বার করে বারান্দায় এসে নতুন ভৃত্যটিকে ডাকলেন, 'এই জুতোজোড়া তোর পছন্দ?' লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে, কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, জুতোজোড়া ভালো।' সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বরবাবু জুতোজোড়া তাকে দিয়ে আর বকেয়া মাইনে চুকিয়ে, সঙ্গে দশ টাকা বখশিশ দান করে লোকটিকে বললেন, 'যা এ বাড়ি থেকে বিদায় হ্। আর কোনোদিন এ মুলুকে আসবি না।' লোকটি এই অভাবিত সৌভাগ্যে বিগলিত হয়ে দাঁত বার করে হেসে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে জুতোজোডা হাতে করে দ্রুত প্রস্থান করল।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে জুতোজোড়া না দেখতে পেয়ে বাণেশ্বর রীতিমত মুষড়ে পড়লেন, বলা উচিত একেবারে ভেঙে পড়লেন। যখন তাঁকে জানানো হলো যে নতুন বাবু-বাবু চাকরটাই জুতো নিয়ে পালিয়েছে, তিনি একদম ম্লান হয়ে গেলেন। কেবল ছি-ছি করতে লাগলেন আর স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, 'আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম, ধরেও ফেলেছিলাম। ছি ছি সাধে কি আর জুতো বলে, কত কষ্ট করে কত ডাক্তার দেখিয়ে কঠিন অসুখ থেকে বাঁচালাম—ছি ছি শেষে একটা চাকরের সঙ্গে—ছি ছি ছি।'

সর্বশেষ খবর, বাণেশ্বরবাবু ভালো হয়ে গেছেন। একজোড়া নতুন জুতো কিনেছেন, তবে তার প্রতি তাঁর তেমন আসক্তি নেই, প্রয়োজনমত পায়ে দেন। আব সিগারেট খাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন। আসুন আমবা সবাই তাঁর নীরোগ, দীর্ঘজীবন কামনা করি।

জীবনবাবুর পায়রা

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হিটারটা জ্বালিয়ে দু কাপ চা করতে বসলাম। চা হয়ে গেলো, দাদা পাশের ঘর থেকে প্রতিদিন এর আগেই বেরিয়ে আসে, কোনো কোনো দিন একটু দেরি হয় অবশ্য, তবে এই সময়টা আমি দাদার ঘরে যাই না। দাদা মাথাটা নিচের দিকে পা দুটো উপরদিকে দিয়ে আসন করে, কোনো কারণে গেলে ঐ উল্টো মাথা রেখেই কথা বলে। এইরকম ভাবে কোনো কথাবার্তা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা, ব্যাপারটা আমার মোটেই সুবিধার মনে হয় না। তাই পারতপক্ষে এই সকালের দিকে আসনের সময়টায় আমি দাদা না উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

কিন্তু দাদা আজ কিছুতেই আসছে না। বড় বেশি দেরি করছে, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। বাধ্য হয়ে সেই অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি, ঠিক মুখোমুখি নয় মুখোপায়ে—আমার মুখ আর দাদার পা সামনাসামনি—দাদার ঘরে ঢুকলাম। এ কি, ঘর ফাঁকা। আলনায় জামাকাপড় নেই।

দাদাও নেই। এরকম আগেও কয়েকবার হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বালিশের নিচে হাত দিলাম, হ্যাঁ একটা চিঠি রয়েছে।

'খোকন,

বাড়ির ভাড়াটিয়াদের সহিত জল, আলো এবং দোতলার দুমদাম শব্দ লইয়া তুমি যে গোলমাল করিতেছো আমি তাহা বাড়াইতে চাহি না। জীবনবাবুর অত্যাচারে গৃহত্যাগ করিলাম। ইতিপূর্বে আমি জীবনবাবুকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন কখনো বাদামী রঙের পায়রা না কেনেন। কাল বিকালে দেখিলাম জীবনবাবু একটি নহে একজোড়া বাদামী রঙের পায়রা খরিদ করিয়া আনিয়াছেন।

তোমার হয়তো মনে আছে, ক্লাস সেভেনে পড়িবার সময় বলরামদের একটি বাদামী রঙের পায়রা আমার ডান গালের আঁচিলটি ঠুকরাইয়া দিয়াছিল, এখনো পূর্ণিমা অমাবস্যায় আঁচিলটি টনটন করে। জীবনবাবুর অন্যান্য পায়রাগুলিকে তবু সহিয়াছিলাম, কিন্তু একই বাড়িতে দুইটি ঐরূপ কুৎসিত রঙের পায়রার সঙ্গে বসবাস আমার পক্ষে সম্ভব নহে— বুঝিতেই পারিতেছো।

আমি চলিলাম। খুঁজিবার চেষ্টা করিয়ো না, অন্যান্যবারের মতই জব্দ হইবে। ভালোভাবে থাকিও। আমার লাল মাফলারটি শালকরের নিকট রহিয়াছে, শীতকালে ব্যবহার করিয়ো।

ইতি—

১৭ই বৈশাখ, বুধবার

আঃ দাদা'

এ রকম বছরে এক-আধবার ঘটেই। খুব ঘাবড়াবার কিছু নেই, প্রায় অভ্যাস হয়ে গেছে। কোনো না কোনো কারণে দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপরে একদিন একা একাই ফিরে আসে। 'ফুটপাথে থাকা যায় না, দিনের বেলায় জুতো পালিশ করে সেখানে, রাত্তিরে ঘুমোলে মনে হয় সারা শরীরটা কে যেন ব্রাউন রঙের জুতোর কালি দিয়ে পালিশ করছে। ভীষণ অসুবিধে, ফুটপাতে কি থাকা যায়, ভিখিরিরা ঘুম থেকে ধাক্কা দিয়ে তুলে ভিক্ষা চায়।' ফিরে এসে এই সব উল্টোপাল্টা কথা বলে— যেন আমরাই তাকে ফুটপাথে বসবাস করতে পাঠিয়েছিলাম।

তবু একটা চিন্তা হয়,—কোথায় গেলো, কি করবে? চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এতক্ষণে নিশ্চয় জুড়িয়ে বরফ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে আসি। এসে যা চোখে পড়লো—গা জ্বলে যায়। সেই বাদামী রঙের পায়রা দুটো চায়ের পেয়ালা থেকে চুকচুক করে চা খাচ্ছে। মাথা গরম হয়ে গেলো। দেয়াল থেকে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটা তুলে ছুঁড়ে মারলাম। দিদিমার দেওয়া জাপানী পাম গাছের নিচে নদীতে নৌকো, পাখি এইসব আঁকা আমাদের বড় শখের কাঁচের পেয়ালা দুটো চুরমার হয়ে গেলো। এতদিন যত্ন করে রাখা শিয়ালকোটের র‍্যাকেটটা দুখানা হয়ে গেলো। রাঙা কাকা এনে দিয়েছিলো, এখন আর এসব র‍্যাকেট পাওয়া যায় না। কিন্তু পায়রা দুটোর কিছুই হয়নি। তারা নিশ্চিন্তে উড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির কার্নিশে বসে বকম বকম করতে লাগলো।

ভয়ঙ্কর রাগ হলো জীবনবাবুর ওপর। এই কালীঘাটের পুরানো বাড়িটা আমরা কেনার অনেক আগে থেকে এই বাড়ির একতলার ভাড়াটে জীবনবাবু। আমরা খালি বাড়িই চেয়েছিলাম, কিন্তু জীবনবাবু উঠলেন না। এক কথায় আমরা ভাড়াটে সুদ্ধ বাড়ি কিনলাম। এই কথাটা দাদা মাঝেমধ্যেই জীবনবাবুকে বলতো, 'দেখুন, আপনাকে সুদ্ধ আমরা এই বাড়ি কিনেছি। আপনি

আমাদের কেনা, আমাদের কথামত চলবেন।' জীবনবাবু লোক খারাপ নন, কিন্তু ভীষণ খুঁতখুঁতে কলে জল কম আসছে, ইলেকট্রিকের তার পুরানো হয়ে গেছে, ছাদে দুমদাম শব্দ হচ্ছে এইসব নানা আপত্তি। আর তার ওপরে এই পায়রা পোষা। এই বাদামী দুটো নিয়ে বোধ হয় সতেরো আঠারোটা পায়রা হলো তাঁর। কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলবার জো নেই। দাদা একবার শায়েস্তা করার জন্যে একটা বিড়াল ধরে এনেছিলো, কিন্তু একটা গোদা পায়রা বিড়ালটাকে এমন ঠুকরে দিলো যে সেইদিন রাত্রে বিড়ালটা আমাদের কামড়ে-খামচে একাকার, রক্তা-রক্তি কাণ্ড।

সাতদিন, পনেরো দিন, একমাস গেলো, দাদার কোনো পাত্তা নেই। এতদিনে ফিরে আসা উচিত ছিলো। খুব চিন্তায় পড়লাম। কোথায় কি করছে, কি খাচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দাদার ঘরে উঁকি দেই, দাদা এলো নাকি? রাস্তায় কতবার যে মনে হয় দাদা পেছন থেকে ডাকছে 'খোকন'! খবরের কাগজে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃত্যুসংবাদ দেখলে বুকটা কাঁপে। তবু দাদা ফিরলো না।

এর মধ্যে একদিন সকালে একটা শুঁটকো মতন লোক, চোখ দুটো ঝকঝক করছে, মাথার চুল ন্যাড়া করা, আমার কাছে এলো। এসে বললো, 'হামার নাম চুনুলাল আছে।'

লোকটাকে চিনতে পারলাম না। বললাম, 'তোমার কি চাই, কি করো তুমি?'

'হামি টেরেনে মালপত্তর সরাই।'

'ট্রেনে মালপত্র সরাও। কুলির কাজ করো নাকি? আমি কুলি দিয়ে কি করবো?'

'আরে নেহি নেহি বাবু, কুলি নেহি।' লোকটা আমার অজ্ঞতাতেই বোধ হয় একটু হাসলো, তারপর বললো, 'হামি এই বাবুলোক টেরেনে ঘুমিয়ে-উমিয়ে পোড়লে উসকো টেরাঙ্ক, সুটকেস এহি সব নিয়ে চোলে যাই। এই চোট্টা আছি।' চুনুলালকে একটু লজ্জিত দেখালো।

'চোট্টা! সে কি, এখানে কি?' আমি পুলিশকে প্রায় ফোন করতে যাই আর কি।

চুনুলাল বললো, 'বড়বাবু হামাকে ভেজলেন।'

'বড়বাবু, কোন্ বড়বাবু?' আমি অবাক হই।

'এই চিঠ্‌ঠি লিজিয়ে। কাপড়ের ময়লা গিঁট থেকে চুনুলাল একটা দুমড়ানো কাগজ বের করে দিলো : 'হামি আর বড়বাবু একসাথ রাণাঘাট জেইলমে ছিলাম। হামার খালাস হয়ে গেলো। বড়বাবু বোললেন-এই চিঠিটা হামারা ছোটা ভাইকা দে না।'

দাদার চিঠি। রাণাঘাট জেল থেকে।

খোকন,

ভালোই ছিলাম। জেলখানায় কেহ পায়রা প্রতিপালন করে না। চোরবাটপাড়ের ভয়ও নাই, কেননা সবাই এখানে।

অবশ্য নানা জনে নানা কথা বলে। আমাকে আড়ংঘাটা স্টেশন হইতে সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য পুলিশ ধরিয়া রাণাঘাট চালান দিয়াছে। কেহ বলিতেছে আমি গুপ্তচর , কেহ বলিতেছে খুন করিয়া পাগলা সাজিয়াছি, কেহ বা অনুমান করিতেছে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া আকস্মিক আঘাতে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যে সত্যিই পাগল, ধরা না পড়িলেও মাথার গোলমাল থাকিত, ইহা ইহাদের কিছুতেই বোঝানো যায় না। সে যাহা হউক, ভাবিয়াছিলাম সমস্ত জীবন এইখানেই কাটাইয়া দিব, কিন্তু সম্প্রতি এক অসুবিধা হইয়াছে।

এতদিন পশ্চিমদিকের সেলে ছিলাম। এক অতি দুর্দান্ত কয়েদী আসায় তাহাকে সেখানে

রাখিয়া আমাকে পূর্বদিকের সাধারণ কয়েদীদের সেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহাতে আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু অসুবিধা এই যে, এইদিকে পাঁচিলের পাশে একটি তেঁতুল গাছ রহিয়াছে। তুমি নিশ্চয় জান, তেঁতুল গাছের ছায়ায় আমার ভীষণ অম্বল হয়, চোঁয়া-ঢেকুর। লাপসি খাইতে কি রকম তাহা লিখিয়া লাভ নাই কিন্তু লাপসির চোঁয়া-ঢেকুর, খোকন, কি লিখিব? তুমি জানো, জানালা দিয়া তেঁতুল গাছের ছায়া পড়িত বলিয়া আমি জ্যাঠামহাশয়কে বলিয়া শিবনাথ স্কুলে পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, এখন রাণাঘাট জেলও ছাড়িতে হইবে।

এই পত্র টেলিগ্রাম মনে করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আইসো।

২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—

ইতি

আঃ দাদা

পুনশ্চ ঃ পবম স্নেহাস্পদ চুনুলালকে পাঠাইলাম। তাহাকে মিষ্টি খাওয়াইয়ো।

চুনুলালকে জলটল খাইয়ে আমি তখনই ঊর্ধ্বশ্বাসে রাণাঘাটের দিকে ছুটলাম। প্রথমে দাদার সঙ্গে জেলে দেখা করলাম। দাদার এতবড় দাড়ি হয়েছে!

'দাদা, এতবড় দাড়ি হয়েছে?' আমি অবাক হয়ে দাদাকে দেখতে লাগলাম।

দাদা একটু হাসলো, 'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলি বুঝি, দাড়ির কথা লিখিসনি। একমাস বাইরে বাইরে, আরে বোকা, দাড়ি হবে না! শুধু শুধু পয়সাগুলো জলে দিয়েছিস্।'

সুখের কথা, দাদা জীবনবাবু বা পায়রাগুলোর কথা বিন্দুমাত্র জিজ্ঞাসা করলো না।

ছুটলাম আদালতের দিকে। পেস্কারের সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। তিনি বললেন, 'সবই বুঝলাম, কিন্তু আদালত শুনবে কেন? পাগল প্রমাণ করতে হবে!'

'কি করে পাগল প্রমাণ করতে হয়?' এই প্রশ্নে পেস্কার যা বললেন তার সারমর্ম এই যে একটি পাগল প্রমাণ করতে গেলে অন্তত আরো পাঁচটি প্রয়োজন। আমাদের কালীঘাট হলে আমি শতাধিক পাগল যোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু এই অচেনা রাণাঘাটে পাগলই বা পাবো কোথায়, আর তারাই বা আমার অনুরোধ রাখবে কেন?

তখন আমাকে পেস্কার বললেন, 'কিছু খরচ করলে অবশ্য জিনিসটা সেরে ফেলে দেয়া যায়।'

'ঠিক আছে, যা নায্য দেবো'। আমি স্বীকৃত হলাম।

দেড়টা নাগাদ দাদা খালাস হয়ে গেলো। পেস্কারের কথা ভুলেই গেছি। দেখি পেছনে পেছনে-পেস্কার আসছেন।

'কি চাই?' দাদা ধমকে উঠলো।

'আজ্ঞে, মামলার খরচটা!' পেস্কার আমাকে বললেন।

'খালাস হলাম আমি, আর খরচ দেবে ও আমি দেবো চলুন আমার সঙ্গে জেলখানায়! সেখানে আমার জিনিসপত্র টাকা-পয়সা রয়েছে। আমি দিয়ে দেবো।' দাদার রক্তবর্ণ চোখ দেখে পেস্কার আর কিছু বললেন না। আস্তে আস্তে পিছু পিছু হাঁটতে লাগলেন। জেলখানা বেশ দূর, জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর, পিচ গলছে রাস্তায়। দাদা বললো, 'খোকন, তিনটে আইসক্রিম নেতো।'

পেস্কার বললেন, 'আমার জন্যে নেবেন না, আমার দাঁতে ব্যথা।'

দাদা বললো, 'ঠিক আছে, আমি দুটো খাবো।' তারপরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পেস্কারকে বললো, 'আইসক্রিম খেলে না।, টাকাও পাবে না।'

'টাকা পাবো না মানে এত খেটে খালাস করলাম ' পেস্কার মৃদু আপত্তি জানালেন।

'খালাস তো করলো হাকিম। আপনার কি?' দাদা গর্জে উঠলো।

'হাকিমকে তো আমিই বলে দিলাম' পেস্কার বিনীতভাবে জানালো।

'বলার কিছু ছিলো না। ভাগুন। জানেন হাকিম আমার মেসোমশায়।' দাদা একটা মিথ্যে কথা বলে।

পেস্কার গজগজ করতে করতে চলে যায়, 'আমি তো জানলুম। কিন্তু হাকিম কি সেটা জানেন?'

জেলখানা থেকে দাদার মালপত্র ছাড়িয়ে বেরোলাম। বেরোবার সময় দাদা জেলারকে বললো, 'চললাম। সকলেরই খালাস হয়, তোমার আর খালাস নেই। উন্নতি হলে বড় জেল, না হলে এই ছোট জেল। থাকো সারাজীবন।'

কলকাতায় দাদাকে নিয়ে এসে পৌঁছলাম। আশ্চর্য, দাদা জীবনবাবু বা তার পায়রাগুলোর ব্যাপারে কোনো কথাই বললো না। শুধু মধ্যে মধ্যে বাঁকাচোখে পায়বাগুলোকে দেখতে লাগলো।

পরদিন রবিবার। জীবনবাবু সকালের দিকে স্নানটান করে প্রত্যেক রবিবার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান। জীবনবাবু যেই বেরিয়ে গেলেন দাদা মোড়ের মাথার মডার্ন স্টেশনার্সে গিয়ে এক কৌটা লাল আর এক কৌটো কালো রঙের জুতোর কালি কিনে আনলো। বুঝতে পারলাম, একটা কিছু মতলব মাথায় আছে। তারপর বারান্দায় বসে এক মুঠো চাল ছিটিয়ে দিলো। চাল দেখে আস্তে আস্তে পায়রাগুলো নেমে এলো। দাদাও একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে এক একটা পায়রা ধরে আর বুরুশে কালি মাখিয়ে সাদা পায়রাগুলোকে কালো রং আর কালো পায়রাগুলোকে লাল রং করে দিলো। বাদামী রঙের পায়রাদুটোকে খুব যত্ন করে কোথাও কালো কালি, কোথাও লাল কালি পালিশ করা হলো। বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই, আমি কিছু বললাম না।

গোটাদশেক নাগাদ জীবনবাবু কপালে সিঁদুর-টিদুঁর দিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে হুলুস্থুলি কাণ্ড। আঠারোটা পায়রা পাগলের মত পরস্পর মারামারি আরম্ভ করেছে।

'আমার পায়রাগুলো গেলো কোথায়, এই বিশ্রি রঙের পায়রাগুলো এলো কোত্থেকে?' জীবনবাবুর কণ্ঠস্বরে কি ছিলো কে জানে, হঠাৎ সেই আঠারোটা হিংস্র পায়রা সমবেতভাবে জীবনবাবুকে আক্রমণ করলো। জীবনবাবু প্রথমে ছাতার নিচে গিয়ে বসে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো সুবিধা হলো না, ঠুকরে ঠুকরে পায়রাগুলো মাংস তুলে নিলো। তখন লেপ। লেপের নিচে আশ্রয় নিলেন জীবনবাবু। সন্ধ্যার দিকে পায়রাগুলো কোথায় চলে গেলো।

জীবনবাবু উচ্চবাচ্য না করে একটা ঠেলাগাড়ি ডেকে এনে মালপত্র তুলতে লাগলেন। একটি কথাও বললেন না। দাদা তখন নেমে গিয়ে বললো, 'কি খবর জীবনবাবু, কোথায় যাচ্ছেন?'

'জাহান্নামে!' জীবনবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন।

'সেটা আমরা না পাঠালে আপনি যেতে পারেন না। আপনাকে সুদ্ধ আমরা এই বাড়ি কিনেছি। আপনাকে ছাড়লে তো যাবেন।' দাদা বললো, তারপর যোগ করলো, 'আচ্ছা ঠিক আছে! যাও বীর, তুমি মুক্ত।'

পরদিন সকালে খবরের কাগজ কিনতে গিয়ে হাজরার মোড়ের দক্ষিণ কোণের ল্যাম্পপোস্টে একটি বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো—

বিজ্ঞাপন

নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের জন্য ঘরভাড়া চাই—দেয়াল বা ছাদ না থাকিলেও চলিবে। যদি কোনো পরোপকারী ভদ্রলোক ঘরের সন্ধান দিতে পারেন চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। এই ল্যাম্পপোস্টের নিচে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আটটা হইতে নয়টা নীল জামা গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব, দয়া করিয়া যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
জীবনলাল দাস।
ঠিকানা—নাই।

মনোজ সান্যালের গল্প

মনোজ সান্যালের সঙ্গে আর কোনোকালে দেখা হবে এমন মনে হয় না, তাই ভরসা করে এই গল্প লেখা সম্ভব হলো। এই গল্পের মা নেই, বাবা নেই, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, সহপাঠী-সহযাত্রী-সহকর্মী কেউ নেই—শুধু মনোজ সান্যাল আছেন এবং বলাই বাহুল্য এই গল্পটি মনোজ সান্যালের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক নয়।

প্রথমেই বলা উচিত মনোজ সান্যালের চেহারা ভালো ছিল না। অবশ্য যাঁরা মনোজবাবুকে কখনো দেখেছেন তাঁরা বলবেন চেহারা ভালো ছিলো না এরকম বললে মনোজবাবু সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। আসলে তাঁর চেহারা ছিলো ভয়ঙ্কর অথবা বলা যায় সাংঘাতিক। নবীনা জননীরা অনেক সময় মনোজ সান্যালের ভয় দেখিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াতেন, বহু শিশু ঘুমের মধ্যে 'মনোজ মনোজ' করে কেঁদে উঠতো।

একটু বর্ণনা করা এরপর অবশ্যই প্রয়োজন। অনেকের মাথার চুল কোঁকড়া থাকে, মনোজবাবুরও তাই ছিলো, একটু বেশি কোঁকড়া, সেই সঙ্গে দুই পাশে দুটো কানও কোঁকড়ানো। ঐরকম গোলাপ ফুলের মতো কান কখনো দেখা যায় না। সেই সঙ্গে শিমুলের মতো নাক আছে কি নেই বোঝা যায় না, কারণ সেটা ঢাকা পড়ে গেছে দুই সদাসর্বদা রক্তাক্ত বিশাল চোখের নিচে। পুরু ঠোঁট অথচ সব মিলে অতিকায় ছোট একটি মাথা, অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় মাথা এবং তার নিচেই একটি বিশাল ধড়। তার মধ্যে বিশালতম ডান পা—একটি মারাত্মক জাতের ফাইলেরিয়া আক্রমণের পর থেকে।

মনোজ সান্যাল একটি সওদাগরি ফার্মে ক্যাশিয়ারের কাজ করতেন। প্রথম দিন চাকরিতে যোগদান করার পর তিনি যখন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁকে দেখে আঁৎকে ওঠেন, তাঁর সুন্দরী লিপি—লেখিকা হাফ মেমসায়েব সত্যি সত্যিই স্ক্রীম-খাঁটি ইংরেজিতে স্ক্রীম করে ওঠেন।

মনোজবাবু দেখা করে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তের মধ্যে বড়সাহেব মানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাহাদুর ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে পাঠালেন।

ম্যানেজার সাহেব ছুটে এলেন, 'হুজুর!'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?'

ম্যানেজার সাহেব আবার বললেন, 'হুজুর!'

'এই দুর্দান্ত লোকটাকে কোন্ জেলখানা থেকে যোগাড় করলে? এই রকম সাংঘাতিক চেহারার লোককে কেউ ক্যাশিয়ার রাখে নাকি? যাও এখনই তাড়িয়ে দাও। দেখে তো মনে হচ্ছে এই বেলাই তহবিল নিয়ে ভেগে পড়বে।' এক নিঃশ্বাসে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাহাদুর তাঁর নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

ম্যানেজার সাহেব তখনো হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন, আবার বললেন, 'হুজুর!'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবার খেপে গেলেন, 'কি দাঁড়িয়ে হুজুর-হুজুর করছেন যান! তাড়াতাড়ি বদমাইশটাকে তাড়িয়ে দিন।'

এবার ম্যানেজার বললেন, 'স্যার, আমার কথাটা শুনুন। অনেক বিবেচনা করেই আমি ঐ কুৎসিত লোকটাকে ক্যাশিয়ার করেছি।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর গর্জে উঠলেন, 'কিসের বিবেচনা?'

ম্যানেজার বললেন, 'স্যার, একবার ভেবে দেখুন ক্যাশিয়ার এই রকম চেহারার নেওয়াই ভালো। তহবিল তছরূপ করে ও পালাতে পারবে না।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের এই বক্তব্য বোধগম্য হলো না। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন পালাতে পারবে না, খোঁড়া নাকি?'

সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে না গিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'ও কি করে পালাবে, ঐ চেহারা নিয়ে কোথায় আত্মগোপন করবে? ঐ দোমড়ানো কান, ঐ মোটা ঠোঁট, ফোলা পা, ভাঁটার মতো চোখ—ওকে পাঁচমিনিটের মধ্যে পুলিশে ধরে ফেলবে।'

ম্যানেজারের বুদ্ধি দেখে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিভূত। সেই দিন মনোজ সান্যাল বহাল হলেন।

তারপর ত্রিশ বছর ক্যাশিয়ারি করছেন সান্যাল মশায়। অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে। শুধু চেহারার ব্যাপারেই প্রতারণা করেননি ঈশ্বর তাঁকে, তিনি অসামান্য কৃপণতা দিয়েছিলেন তাঁর চরিত্রে। একটি পয়সা তিনি কখনো এদিক-ওদিক হতে দেননি। একটা সইয়ের ব্যাপার থাকলে তিনি চারপাশে চারটা সই করিয়ে নিয়েছেন। পারিবারিক জীবনেও তাঁর কৃপণতা বিপজ্জনক হয়েছিলো। ম্যানেজারসাহেব মধ্যে মধ্যে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেমন আছেন, মনোজবাবু?'

সান্যাল মশায় বলতেন, 'আপনার অফিসে সারাদিন খালি কাজ আর কাজ, আর ক্লান্ত হয়ে যেই বাড়ি ফিরি বাড়িতে বৌ খালি টাকা আর টাকা। এই বলে একটাকা দাও, এই পাঁচ টাকা চায়—এই সাড়ে তিন টাকা।'

ম্যানেজার অবাক হয়ে যান, এত টাকা দিয়ে আপনার স্ত্রী কি করে?'

সান্যাল মশায় বলেন, 'কি করবে, ভগবান জানে। আমি জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই, আমি কখনো তাকে একটা টাকাও দিই নি।'

মনোজ সান্যাল সম্পর্কিত এই কাহিনী আরো দীর্ঘ, আরো বিস্তারিত করা সম্ভব। কুৎসিত চেহারার কৃপণ লোকের অভাব নেই সংসারে, তাঁদের সম্পর্কে গল্পেরও অভাব নেই।

কিন্তু মনোজ সান্যাল সম্পর্কে শেষ গল্পটি নির্ভরযোগ্য এবং অভাবিত।

সসম্মানে কাজ থেকে রিটায়ার করেছিলেন সান্যাল মশায়। বিদায়সভায় তাঁর গলায় একটি মালা দেওয়া হয়েছিলো। সেই মালাটিকে ফেরার পথে নিউ মার্কেটে সিকি দামে বেচে বাড়ি ফিরে দায়মুক্ত হলেন মনোজ সান্যাল। এরপর দুর্মূল্যের বাজারে আর কলকাতায় থাকা নয়। অফিসেই যখন যেতে হচ্ছে না, কলকাতায় থাকার আর মানে হয় না।

আগে থেকেই সম্পূর্ণ প্ল্যান করা ছিলো, টিকেট কাটাও ছিলো। বৃন্দাবনে খরচা কম, জিনিস-পত্রের দাম সস্তা, মাছমাংস নিষিদ্ধ। রিটায়ার করার দিন রাত্রেই তিনি সপরিবারে বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

ভালোভাবেই গেলেন প্রায় পুরোটা পথ। মথুরা পর্যন্ত টিকিট কাটা ছিলো সান্যাল মশায়েব, কিন্তু মথুরা পৌছানোর কিছু আগে ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন সান্যাল মশায়ের স্ত্রী, চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে যখন তাঁকে পাওয়া গেলো তখন তিনি মৃতা।

এই ব্যাপারে কতটা শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন সান্যাল মশাই তা জানা নেই, কিন্তু তিনি এখনো মথুরাতেই আছেন। তাঁর স্ত্রীর মথুরা পর্যন্ত টিকিট কাটা ছিলো, মথুরা পৌছানোর আগেই তিনি মারা গেছেন। সুতরাং যেটুকু পথ তিনি যাননি, তার ভাড়া ফেরত পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। বহুদিন ক্যাশিয়ারি করেছেন মনোজ সান্যাল এসব ব্যাপার বেশ ভাল বোঝেন।

মথুরাতেই আছেন। মথুরাতেই টাকা ফেরানোর তদ্বির করছেন। আশা করি সুদূর মথুরাতে এ গল্প তাঁর নজব পড়বে না, সেই ভরসাতেই এই গল্প।

ভজগোবিন্দ ভোজনালয়

ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের আমি একজন বাঁধা খদ্দের। অবশ্য এতে আমার আপত্তি বা অসম্মানের কিছুই নেই। এই ভোজনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ˚ভজগোবিন্দ জীবিত থাকলে যে কোনো উৎসাহী তাঁর কাছ থেকে এই হোটেলেব প্রাক্তন গ্রাহকদের একটি বিস্তৃত তালিকা শুনতে পারতেন। যাঁদের মধ্যে অনেকেই রীতিমত খ্যাতনামা এখন। একসঙ্গে বাজভবনের কোনো ভোজসভাতেই বোধহয় এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তির দর্শন অসম্ভব। ˚ভজগোবিন্দবাবুর তালিকায় পূর্ণ আস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যেতো অন্তত দুজন পদ্মশ্রী, একডজন এম-এল-এ, এম-পি এবং ততোধিক সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং চিত্রতারকা জীবনের কোনো না-কোনো সময়ে এখানে বসে কিছু না কিছু গলাধঃকরণ করেছেন। ভজগোবিন্দবাবু মধ্যে মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখাতেন, 'ঐ চেয়ারটায় বসতেন ভূতোবাবু—আহা, চিংড়ি মাছ দিয়ে নটেচচ্চড়ি তিনি কি যে ভালোবাসতেন!' অনুসন্ধান করলেই জানা! যেতো ভূতোবাবু কোনো কেউকেটো নন, বর্তমানে যাঁর ছবি ঘরে-ঘরে পর্দায়-পর্দায়, সেই বিখ্যাত চিত্রতারকার পরিত্যক্ত নাম ওটা।

যা হোক, ভজগোবিন্দ ভোজনালয় আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন। হাজরার মোড়ে সেই বিস্তৃত সাইন-বোর্ড—হলুদ পটভূমিকায় নীল কালিতে লেখা গোটা গোটা বাংলা হরফে হোটেলের নাম। নামের দুপাশে দুটি ছবি—একদিকে ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত ত্রিশূল হাতে মহাদেব এবং অপরদিকে চেয়ারে আসীন খালিগায়ে হোটেলের মালিক ভজগোবিন্দবাবুর আনুমানিক প্রতিকৃতি। অবশ্য এসবই বছর পনেরো আগের কথা। যখন সাইনবোর্ডটি প্রথম আঁকা হয়েছিলো সেই সময়কার। সাইন-বোর্ডটির একটি ইতিহাস আছে, জনশ্রুতি কোনো এক সাইনবোর্ড লিখিয়েকে দিয়ে

একমাস বিনা মূল্যে খেতে দেওয়ার চুক্তিতে এই সাইন-বোর্ডটি আঁকানো হয়। কিন্তু ভজগোবিন্দবাবু দিন পনেরো পরে অনুভব করেন যে, হিসেবের তৌলে তিনি কিছু ঠকেছেন এবং ফলত আর্টিস্টের ডালে ভাতের ফ্যান এবং ঝোলের মাছটি ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু ভজগোবিন্দবাবু হিসাবে ভুল করেছিলেন, কেননা তাঁর দুর্ভাগ্যবশত সেই সময়ে শুধুমাত্র তাঁর প্রতিকৃতিটি ব্যতীত আর সবই আঁকা প্রায় শেষ হয়েছিলো। সুতরাং খাদ্যাভাবে শিল্পীর স্নায়বিক এবং শারীরিক দৌর্বল্যের প্রকোপ ভজগোবিন্দবাবুর প্রতিকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছিলো। তদুপরি পরবর্তীকালে রৌদ্র-বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে সাইনবোর্ডের লাল রঙটুকু সর্বাগ্রে মুছে যাওয়ায় (ভজগোবিন্দবাবুর চেয়ার লালরঙে আঁকা ছিলো) একটি বিচিত্র দৈহিক ভঙ্গি উক্ত প্রতিকৃতিকে জনসাধারণের অবশ্যদ্রষ্টব্যে পরিণত করেছিলো। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই একদা উক্ত প্রতিকৃতিই আমাকে ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ে আকৃষ্ট করে এনেছিল। তদবধি এর বন্ধনে আমি বদ্ধ, বিপরীত ফুটপাথের নিউ গ্র্যাণ্ড হোটেলের তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে এটি চিরস্থায়ী গ্রাহক ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের আওতায় রয়েছে আমি তাদের অন্যতম।

ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের সেই সাইনবোর্ড আজ আর নেই। নয়া পয়সা হওয়ার পরে ভজগোবিন্দবাবু ভেবেছিলেন যে সাইনবোর্ডের নিচে যেখানে 'পাইস হোটেল' লেখা আছে সেখানে 'নয়া পয়সা হোটেল' লিখে দেবেন, এই ভেবে সাইনবোর্ডটা নামিয়ে আনেন। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে অবশেষে তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং নয়া পয়সার মতো তুচ্ছ ব্যাপারে পাইস হোটেলের ঐতিহ্য নষ্ট না করাই স্থির করেন।

মধ্যে কয়েকদিন আমি কলকাতায় ছিলাম না। অনেক রাত্রিতে বাসার ফিরে এসেছি। এমন সময় দরজায় ধাক্কাধাক্কি এবং কান্নার চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে দরজা খুলে বেরোলাম। বাইরে দেখি ভজগোবিন্দবাবুর বড়ছেলে নবলাল দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আর দু'একজন। আমি বেরুনোমাত্র নবলাল বললে, 'বাবু, সর্বনাশ হয়েছে। বাবা, আমার বাবা আজ তিনদিন...' এই বলে ফোঁপাতে লাগলো। আমি কিছুটা অনুমান করলাম!

ভজগোবিন্দবাবুর বয়স হয়েছিলো! আমি সঙ্গের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হোলো?' লোকটি যা জানালো তার সারাংশ ভজগোবিন্দবাবু আজ তিনদিন হলো মরে গেছেন। আমি বেশ অবাক হলাম। আমি ভজগোবিন্দবাবুর হোটেলের গ্রাহক, কিন্তু শুধুমাত্র সেই সূত্রেই ভজগোবিন্দবাবুর মৃত্যুর তিনদিন পরে তাঁর ছেলে মধ্যরাত্রিতে আমার উপর হামলা করে শোকপ্রকাশ করবে, এটা বিশেষ সুবিধে মনে হলো না। তবে ভদ্রতার খাতিরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি, 'তা বাবার বয়স হয়েছিলো, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে?' ইত্যাদি নানা ধরনের কথা বলতে লাগলাম।

নবলালবাবুর কান্না থামলো না, 'কিন্তু বাবা তো আরো একমাস আগেও মরতে পারতেন, এখন আমরা একেবারে ডুবে গেলাম। আর, আর ঐ শয়তান, ঐ বলাই দাস.....।'

বলাই দাস—ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের সনাতন প্রতিদ্বন্দ্বী নিউ গ্র্যান্ডের মালিকের নাম। ভজগোবিন্দবাবু একমাস আগে মারা গেলেই বা কি সুবিধা আর বলাই দাসই বা এই শোকের মধ্যে আসে কেন, সমস্ত বিষয়টি বিশেষ জটিল হয়ে উঠলো আমার কাছে। সারাদিন ক্লান্তির পর বর্ষণমুখর এক শ্রাবণের মধ্যরজনীতে হোটেল-মালিকের তিনদিন পূর্বে মৃত্যুর জন্যে যেটুকু

দুঃখিত হওয়া উচিত, যেটুকু শোকান্বিত হওয়া উচিত—তার চেয়ে অনেক বেশী শোক এবং দুঃখ পেতে হলো। অনেক পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে নির্বিকার থেকেছি, এটাকে তার প্রায়শ্চিত্ত বলে ধরে নিলাম।

এইবার নবলাল আমাকে পায়ে জড়িয়ে ধরলো, 'বাবু বাঁচান।' আমি প্রায় পড়ে যেতে আচমকা এই ধাক্কা সামলে নিলাম। নবলাল তখন বলছে, 'আমাদের হোটেলে আপনাকে খেতে হবে।' তা তো খাই , সে তো নবলাল না বললেও খাই, কিন্তু ব্যাপারটা কি? শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে নাকি—তিনদিনে শ্রাদ্ধ, কি জানি আর এভাবে নিমন্ত্রণ আমার জ্ঞাতসারে কোথাও কখনো দেখিনি।

খটকাটা লেগেই রয়েছে। অবশেষে যা বোঝা গেলো, এখন চারিদিকে ভীষণ কলেরা—কর্পোরেশন বলছে মহামারী, এর মধ্যে ভজগোবিন্দবাবু মারা গেছেন। বলাই দাস চারদিকে রটিয়ে দিয়েছে যে ভজগোবিন্দবাবুর কলেরায় মৃত্যু হয়েছে। হোটেলের মালিক যে সবচেয়ে ভালো খাদ্যদ্রব্যগুলি নিজে খায়, সেই যদি কলেরায় মরে, তাহলে অন্য লোক আসবে কোন্ ভরসায়। বাঁধা খদ্দের আজ দুদিন একজনও আসছে না, উটকো ছুটকো এক আধটা আসে, আর সব সময় হোটেল ফাঁকা।

নবলাল আবার আমার পা জড়িয়ে ধরলো, 'বাবু, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, বাবা এমনি এমনি মরে গেছে, তার কিছু হয়নি', ফোঁপাতে লাগলো, 'আপনি আমাদের হোটেলে খাবেন, এক পয়সা দিতে লাগবে না। যা খেতে চান তাই রান্না করবো। শুধু দুবেলা রাস্তার ধারের ঐ জানালার পাশের সিটটায় বসে খাবেন।' এ পাড়ায় আমি পুরানো লোক। সুতরাং আমি যদি ভোজনালয়ে নিয়মিত খেতে থাকি, তাহলে আস্তে আস্তে অনেকেই আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে, নবলাল কেঁদে কেটে জানালো।

জানি না, ভজগোবিন্দ সত্যই কলেরায় মরেছেন কিনা, সেটা তো বলাই দাসের অপপ্রচার নাও হতে পারে, হয়তো সত্যিই তাই—কিছু আশ্চর্য নয়।

কিন্তু তাতে আমার কি? জীবনে এই প্রথমবার মরাল কারেজ, সৎসাহসের অভাব হলো না আমার। কোনো ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই এই অভূতপূর্ব আত্মবিসর্জনের কাহিনীর কোনো স্থান নেই, কোনো তুলনাও নেই—একথা জেনেও আমি নবলালকে কথা দিলাম। সেই কথা এখনো রেখেছি। আর সৎসাহস থাকলে যে কোনো কাজেই কোনো ক্ষতি হয় না তার প্রমাণ আমি এখনো জীবিত। ভজগোবিন্দ ভোজনালয়ের কোনো আসনই কোনো মুহূর্তে ফাঁকা যাচ্ছে না। হাজরার মোড়ে নতুন সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে, তাতে কব্জিতে ঘড়ি-আঁকা একটি হাতের তর্জনী নির্দেশ রয়েছে, 'আসুন. পাইস হোটেল ভিতরে।'

নবারুণবাবু সুখে থাকুন

আজ কিছুদিন হলো নবারুণবাবু কিছুটা মোটা হয়ে পড়েছেন। নবারুণবাবুর বয়েস এই আগামী পয়লা অগ্রহায়ণে পঁয়তাল্লিশ পূর্ণ হবে। এক স্ত্রী, এক কন্যা। খুব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই তাঁর জীবনে। চিরকাল মাঝারি চাকরি করেছেন, মাঝারি ধরনের উচ্চাশা তাঁর। খুব টানাটানিও নেই তাঁর, আবার খুব সচ্ছলতাও নেই।

ভালোভাবেই চলে যাচ্ছিলো নবারুণবাবুর দিন। কিন্তু এইসব মাঝারি মানুষদের মধ্যে জীবনে একটা ধাক্কা আসে, মোটা হওয়ার ধাক্কা। মেদবৃদ্ধির প্রাবল্যে শরীরের মধ্যদেশ ফুলে ওঠে। বিনা কারণে শুয়ে-বসে সারীজীবন ধরে যে রকম চলা-ফেরা খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তার কোনো পরিবর্তন না হলেও শরীরে অগাধ প্রাচুর্য কোথা থেকে চলে আসে কেউ জানে না।

নবারুণবাবুরও ঠিক তাই হয়েছে। তবে তিনি সুরসিক লোক, তিনি এই বয়েসে এই মোটা হওয়ার নাম দিয়েছেন ঃ মাঝারি মানুষের মাঝারি বয়েসের মাঝারি অসুখ। নবারুণবাবু নিজে এই অসুখ বাধাননি। তিনি যে খুব অলস বা খুব বেশি খাওয়া-দাওয়া করেন তাও নয়। তিনি যে খুব অলস, বা খুব বেশি খাওয়া দাওয়া করেন তাও নয়। আসলে এই মোটা হওয়ার অসুখটা নবারুণবাবুদের বংশানুক্রমিক। তঁঅর পূর্বপুরুষেরা অনেকেই তাঁদের বিস্তৃতির জন্যে বিখ্যাল ছিলেন। তবে সেকালে মোটা হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে লোকরা এতো মাথা ঘামাতে না, ববং সেটা ছিলো সামাজিক মর্যাদার একটি বিশেষ প্রতীক। মা-ঠাকুমারা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন ঘি, মাখন, দই, মিষ্টি খাইয়ে তাঁদের স্নেহভাজনদের মোটা, আরো মোটা, আরো আরো মোটা করতে। তখনও শুরু হয়নি রক্তপরীক্ষা। হার্টের অসুখ এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু একালে মোটা হওয়া বিপজ্জনক। পথে-ঘাটে, অফিসে-বাজারে, চেনা-আধোচেনা যাঁর সঙ্গেই দেখা হোক, তিনি একটু ভুরু কুঁচকিয়ে নবারুণবাবুকে জিজ্ঞসা করেন, 'আরে নবারুণবাবু , যে একদম চিনতেই পারিনি। সাংঘাতিক মোটা হয়ে গেছেন দেখছি!' তারপর একটু থেমে কিছুটা অভিভাবকত্বের ভঙ্গিতে পরামর্শদান, 'এতো মোটা হওয়া ভালো নয়। সাবধানে থাকবেন। মনে আছে তো নগেনবাবুর ঘটনাটা। আর কিছুই নয়, উভয়েরই পরিচিত নগেনবাবু নামে এক ভদ্রলোককে বছরখানেক আগে রাস্তায় কুকুরে কামড়েছিলো। শুভানুধ্যায়ীর বক্তব্যেব সাবমর্ম হলো, নগেনবাবু অতটা মোটা না হলে দৌড়ে পালাতে পারতেন, পাগলা কুকুরের কামড় খেতে হতো না, পেটে বড় বড় আঠারোটা ইনজেকসন নিতে হতো না।

মোট কথা এই যে, নবরুণবাবু নিজে মোটা হয়ে যাওয়ার জন্যে যতটা চিন্তিত। ফলে তাঁকে স্থূলতা কমানোর জন্যে বাধ্য হয়ে চেষ্টাশীল হতে হলো।

ছাত্রজীবনের এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাজারে দেখা হলে সে পরামর্শে, বিশেষ করে ওষুধ-ফষুধ খেতে হবে না, তাছাড়া ঘরের মধ্যেই স্কিপিং করা যাবে, এই সুবিধার কথা ভেবে নবারুণবাবু সেদিনের বাজারে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে সেই পয়সা দিয়ে একটা ভালো স্কিপিং-রোপ কিনে ফেললেন। বাড়িতে এসে কাউকে কিছু বললেন না।

কিন্তু স্কিপিং করার এতো ঝামেলা একথা আগে কে জানতো! নগেনবাবু থাকেন একটা পুরনো তেতলা বাড়ির দোতলায়। তাঁর ভারি শরীর নিয়ে তিনি পরদিন সকালে শোয়ার ঘরে লাফাতে গেছেনষ প্রথম লাফের শব্দে তাঁর স্ত্রী চোখ খুলে আধো ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ দেখলেনষ মালকোঁচা দিয়ে লুঙ্গি পরা নবারুণবাবু হাতে কি একটা লম্ব দয়ি মত নিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শূন্যে, হাত তুলে। আগের দিন সন্ধ্যায় বাজার থেকে মাছ না আনায় নবারুণবাবুর সঙ্গে মালতীর, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর, খুবই কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। এখন স্বামীকে শূন্যে হাত তুলে ঘরের মধ্যে আধো অন্ধকারে দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুহূর্তের মধে মালতী বুঝতে পারলেন নবারুণ মনের দুঃখে ও প্রচন্ড অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুকের রক্ত হিম করা একটি সুতীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকার করে উঠলেন।

এরপরে ঘটনার গতি অতি দ্রুত। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এলো। রাস্তায়

দু'জন খবরের কাগজের হকার কাগজ বিলি করছিলো বাড়িতে বাড়িতে, তারা ছুটে এলো, তাদের সঙ্গে মাদার ডেয়ারির দুধের ছেলে এবং সঙ্গে একজন ভিখিরি, যে শেষ রাত থেকে করুণকণ্ঠে জানালায় রুটি ভিক্ষা করে, তারাও এলো।

তা ছাড়া তিনতলা থেকে বাড়িওলা স্বয়ং নেমে এলেন। বাড়িওলার সঙ্গে আজ চার বছর মামলা চলছে নবারুণবাবুদের। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

সবাইকে নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে বিদায় করা হলো। কিন্তু বাড়িওলা চালাক লোক, তিনি স্কিপিং রোপ ঘ.. র মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে মুহূর্তের সব টের পেলেন, একবার ট্যারা চোখে পেটমোটা নবারুণবাবুর দিকে এবং আরেকবার রজ্জুটির দিকে তাকিয়ে সোজা থানায় ডায়েরি করতে গেলেন, 'স্যার আমার মোটা ভাড়াটে লাফিয়ে লাফিয়ে আমার পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলছে। বাড়ি ভেঙে পড়লে বহুলোক একসঙ্গে মারা পড়বে। মার্ডার কেস স্যার।'

নবারুণবাবুর বাড়িওলা এর আগে আরো আটবার নবারুণবাবুর নামে থানায় ডায়েরি করেছেন, সুতরাং তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তার চেয়ে আমরা নবারুণবাবুর রোগা হওয়ার গল্প বলি।

স্কিপিং রোপেব পয়সাটা জলে গেলো। এই বয়সে রাস্তায় বা পার্কে স্কিপিং করা সম্ভব নয় অথচ বাডিতে লাফালে বিপদ আছে, থানায় ডায়েরি করে রেখেছেন বাডিওলা।

এ দিকে আরো মোটা হয়ে চলেছেন নবারুণবাবু। কিছু একটা করা দরকার। রোগা হওয়ার বিষয়ে তিনটে ইংরেজি পেপার-ব্যাক বই তিনি পড়ে ফেলেছেন, অবশেষে মনস্থির করেছেন খাওযা কমিয়ে শরীরের মেদ এবং ভুডি কমাবেন। অনেক পড়াশোনা কবে নবারুণবাবু বুঝলেন শশাই একমাত্র খাদ্য; যাতে মোটা করার মত কিছু নেই। সুতরাং শুধু শশা খেতে শুরু করলেন তিনি। দৈনিক দু কেজি করে শশা কিনতে লাগলেন।

সকালে দুধ চিনি ছাড়া এক পেয়ালা চা আর একটা শশা। দশটার সময় অফিস যাওয়ার মুখে একটা শশা সেদ্ধ, দুটো শশার সুপ। দুপুরে টিফিনের সময় আরেকটা শশা, এবার সামান্য একটু নুন দিয়ে। এর পরেও বিকেলে যদি খিদে লাগে তবে আরেকটা শশা। তারপরে। রাতে শশার ডিনার। আবার শশা সেদ্ধ, শশার সরষে বাটা চচ্চড়ি, শশার ডানলা, অল্প একটু তেঁতুল দিয়ে শশার টক এবং সেই সঙ্গে লেবু লঙ্কা দিয়ে শশার স্যালাড।

দিন দশেক এই রকম সশঙ্কভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর নবারুণবাবু আর মানুষ রইলেন না। দু পায়ে হাঁটতে তাঁর অসুবিধা হতে লাগলো, হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে পারলে ভালো হয়। যখন দাঁর এই রকম অবস্থা, মালতী বাধ্য হয়ে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার এসে সব দেখে শুনে বললেন, 'সর্বনাশ! এ বয়েসে এসব চলবে না। ভালো করে দুধ-মাছ-ডিম না খেলে কাজ করার শক্তি আসবে কি করে?'

সুতরাং মালতী নবারুণবাবুর জন্যে কাজ করার শক্তি সরবরাহ করতে লাগলেন। অপর্যাপ্ত স্নেহপদার্থের সৌজন্যে এবং মালতীব রান্নার মাধুর্যে নবারুণেব শরীর আরো উথলিয়ে উঠলো। শশা খেয়ে যেটুকু অবনতি হয়েছিলো, তার চারগুণ পুষিয়ে গেলো।

এরপরে যা হবার তাই হলো। রাস্তায় নবারুণকে দেখে পরিচিত ভদ্রজন চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। দশ বছর আগের সেই পাতলা দোহারা মানুষটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো মেদের সমুদ্রে। পুরনো রসিকতা আছে যে ওজনের যন্ত্রে একজন অতি স্থূলাঙ্গ দাঁড়িয়েছে, কার্ড বের হলো, 'এক

সঙ্গে দুজন নয়, ডয়া করে একজন একজন কবে উঠুন।' নবারুণবাবুর অবস্থা ঠিক তা না হলেও, পর পর কয়েকবার তাঁর ওজনেব কার্ডে, ওজনের সঙ্গে কার্ডে যে ভবিষ্যদ্বাণী থাকে তাতে লেখা বেরোলো, 'আপনার উন্নতি অনেকেরই চক্ষুশূলের কারণ হয়েছে।'

এই ওজনের যন্ত্র বিষয়টিও খুবই রহস্যময়। মধ্যে শশা খাওযার সময় নবারণবাবু প্রায় প্রতিদিনই এমনকি কোনো কোনো দিন প্রায় একাধিকবার ওজন দেখতে শুরু করেন। প্রায় নেশা হয়ে যায়। স্টেশনে, ডাক্তাবখানায়, সিনেমা হলে যেখানেই ওজনের যন্ত্র দেখতে পান সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত চলে যায় একটা খুচরো দশপয়সা আছে কিনা? এই অভ্যাস এখন প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে। এর ফলে নবারুণবাবুর অভিজ্ঞতা হয়েছে বিস্তর। কোনো দুটো ওজনের যন্ত্রই কোনো সময় এক কথা বলে না। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বসুশ্রী সিনেমায় ওজন উঠলো সাতাশি কেজি, পনেরো মিনিটের মধ্যে লেক মার্কেটের সামনের এক দোকানের মেশিনে সেটা কমে গিযে উঠলো বিরাশি কেজি। তা ছাড়া সব মেশিনের গায়ে লেখা আছে, 'চাকা না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' কোনো কোনো মেশিনে সেই চাকা আর থামে না। ঘুরছে তো ঘুরছেই। অতি দ্রুত বেগে তারপর ক্রমশঃ আস্তে, আস্তে আস্তে। নবারুণবাবু একবার একটা মেশিনের উপর একটা আধঘণ্টা দাঁড়িযেছিলেন তবুও চাকা ঘুবছে তো ঘুরছেই। শেষে আর ওজন নেওয়ার ধৈর্য রইলো না, আর ঐ চাকা ঘোরাকালীন ওজন নেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

সে যাই হোক নবারণবাবু ইতিমধ্যে আরো মোটা, আরো গোলগাল হয়ে গেছেন। তাঁর নিজের মাথাতেই এবার দুশ্চিন্তা ধরেছে, কি করে সত্যি সত্যি হাল্কা হওয়া যায়। সত্যিই বেশ কষ্ট হচ্ছে আজকাল। একটু হাঁটাহাঁটি করলেই হাঁফিয়ে পড়ছেন, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে গেলে জিব বেরিয়ে যায়। কোথাও গেলে তারা একটু সচেতন ভাবে শক্ত চেয়ারটা এগিয়ে দেয। রিক্সাওলারা নবারুণবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয় সসওয়ারি রিক্সায় তুলতে চায় না।

সুতরাং নবারুণবাবুকে আবার রোগা হওয়ার চেষ্টায় অবতীর্ণ হতে হলো। কেউ কেউ বললেন, সকালবেলা ঘণ্টাখানেক জোরে জোরে লেকে হাঁটাহাঁটি করো, দেখবে শরীর থেকে মেদ ঝরে যাবে। নবারুণবাবু বহুকষ্টে শেষ রাতে উঠে সেটা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু একজন বন্ধুর কথায় একদিন তাঁর ভুল ভেঙে গেলো। সে বোঝালো, হাঁটতে হাঁটো। কিন্তু তাতে রোগা হওয়ার আশা কবো না। বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে সে দেখালো লেকে গিয়ে দেখবে গত তিরিশ বছর এঁরা বাঁই বাঁই করে হাঁটছেন। অথচ এঁরাই কলকাতার সেরা মোটা লোক। তিরিশ বছর হেঁটেও এক ছটাক ওজন তো কমেইনি, সময় মত যথাসম্ভব বেড়ে গেছে।

সুতরাং হেঁটে লাভ নেই। সকালে একঘণ্টা হাঁটা এবং তারপরে একঘণ্টা বিশ্রাম, শুধু শুধু দিনারম্ভেই দুটি অমূল্য ঘণ্টা নষ্ট। তার চেয়ে ওষুধ খাওয়া ভালো। অফিসে এক সহকর্মী একটা টোটকার কথা বললেন। লুই ফিশারের বইতে নাকি লেখা আছে, গান্ধীজী খেতেন সকালে ঘুম থেকে খালি পেটে এক চামচে লেবুর রস আর এক চামচে মধু। এই দুটি নির্দোষ পানীয় একত্রিত হলে তার যে কি বিচিত্র, অবর্ণনীয় স্বাদ হয়, কি করে যে মহাত্মাজী দিনের পর দিন এই অভক্ষ্য গ্রহণ করতেন, ঈশ্বর জানেন। কিন্তু নবারুণবাবু সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। এক চামচে লেবুর রস এক চামচে মধু একসঙ্গে খেয়ে প্রথমদিন নবারুণবাবুর হাত পা ঝিমঝিম করতে লাগলো। মাথা ঘুরতে লাগলো। তারপর মিনিট দশেকের মধ্যে বমি হতে লাগলো। আর খালি পেটের

বমি করা যে কি ভীষণ কষ্ট তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কলেজে পড়ার সময় নবারুণবাবু একবার বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গার ধারে বসে লুকিয়ে ব্র্যাণ্ডি খেয়েছিলেন, তাতেও সেই বয়েসে এতটা মাথা ঘোরেনি, এরকম বমি হয়নি।

অতএব অন্য পন্থা নিতে হলো। তবে তাতে একটু খরচের ধাক্কা আছে। ঘনশ্যামবাবু বলে এক ভদ্রলোক বৌবাজারে থাকেন। তিনি শক্তহাতে ম্যাসাজ করে ভুঁড়ি ও শরীরের জমানো মেদ ধোঁয়া করে দেন। যিনি ঘনশ্যামবাবু মুচড়িয়ে টিপে দেওয়ার সময় ভুঁড়ি থেকে নীলচে আভা প্রায় ধোঁয়ার মত, শীতের দিনে মুখ থেকে যেমন বেরোয়, প্রায় সেই রকম বেরোচ্ছে।

ঘনশ্যামবাবুর খাঁই একটু বেশি। সপ্তাহে একদিন আধ ঘণ্টার জন্যে মাসমাইনে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। সেটা হলো যদি তাঁর বাড়িতে গিয়ে ম্যাসাজ করানো হয়। আর নিজের বাড়িতে ঘনশ্যামবাবুকে নিয়ে আসতে গেলে মাসে দেড়শো টাকা লাগবে।

দেড়শো টাকা অনেক টাকা। সুতরাং নবারুণবাবু ঘনশ্যামবাবুর বাসায় যাওয়াই মনস্থ করলেন। বৌবাজারের গলির মধ্যে একটা একতলা বাড়ির উঠোনে টিনের চালার মধ্যে 'রাধেশ্যাম মেদনিধন ব্যায়ামাগার'। রাধেশ্যাম হলো ঘনশ্যামবাবুর বাবার নাম, তিনিই এই মেদনিধন প্রক্রিয়াটির আবিষ্কর্তা। রাধেশ্যামবাবু এখন স্বর্গত হয়েছেন, তবে জীবিত অবস্থায় এ অঞ্চলের অসংখ্য চীনে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং বৌবাজারের স্বর্ণকারদের ভুঁড়ি তাঁর হাতের গুণে সমতল হয়েছিলো।

ঘনশ্যামবাবুর হাতযশ নাকি আরো বেশি। ঘনশ্যামবাবুর নাম ও পেশা শুনলেই বেঁটেখাটো, কালো মোটা, গোলগাল যেরকম চেহারার কথা মনে ভেসে ওঠে তিনি সত্যিই সেইরকম দেখতে। তবে তিনি ন্যাটা, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে তাঁর অসম্ভব জোর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিখিলবঙ্গ বাৎসরিক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে তাঁর বাঁধা প্রোগ্রাম ছিল—বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে একটা নতুন ক্রিকেট বল নিয়ে সেটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলা।

মেদনিধন ব্যায়ামগারে পৌঁছানোর পরে ভর্তি ফি পঞ্চাশ টাকা আর মাসমাইনে পঞ্চাশ টাকা মোট একশো টাকা দিয়ে শয্যাশায়ী হলেন নবারুণবাবু। শয্যা মানে কাঠের তক্তপোষের উপর কিঞ্চিৎ পুরোনো ও ছেঁড়া পাটি। জামাটামা খুলতে হলো না, জামা আর গেঞ্জি পেটের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন ঘনশ্যামবাবু, তারপর ভুঁড়ির অর্ধবৃত্ত আস্তে আস্তে টিপে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বললেন, 'না, এখনো নরম আছে, অসুবিধে হবে না। একেকজনের এমন শক্ত হয়ে যায়, অথচ তেল চুকচকে পিছলে চামড়া, কিছুতেই ধরা যায় না—তখন অবশ্য আমরা ভুঁড়ির উপরে আঠালো মাটি মাখিয়ে নিই।'

সুখের বিষয় নবারুণবাবুর ভুঁড়ির জন্যে আঠালো মাটি লাগলো না। অল্প একটু আস্তে আস্তে টেপার পর ঘনশ্যামবাবু নবারুণের ভুঁড়ির নিচের দিকে বুড়ো আঙুল চেপে ধরে সামনের চার আঙুল দিয়ে ভুঁড়ির যতটা পারলেন গোল করে প্যাঁচ দিয়েছিলেন, তারপর শুরু করলেন ঝাঁকি ও টান—আর সে কি ঝাঁকি, সে কি টান ! ভুঁড়ির থেকে ধোঁয়া উঠলো কিনা, কে জানে, কিন্তু চোখে ধোঁয়া দেখতে লাগলেন নবারুণবাবু এবং কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান হারালেন।

ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরে আসতে ঘনশ্যাম একগাল হেসে নবারুণকে বললেন, 'প্রথমবার ওরকম হয়, তাও তো আপনার তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরলো। শ্যামচাঁদ আগরওয়ালা তো দু'দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।'

সমস্ত ঘটনা তখন নবারুণের সহ্য ও বুদ্ধির বাইরে। কোনো রকমে মিনমিন করে বললেন, 'দয়া করে আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিন।'

ট্যাক্সি করে নবারুণ যখন বাড়িতে পৌছালেন তখন তাঁর মুখ চোখের এবং শরীরের অবস্থা দেখে বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল। মালতী কপাল চাপড়াতে লাগলেন, মেয়ে ডুকরে কাঁদতে লাগলো। পাড়ার দুজন শক্তসমর্থ লোক এসে নবারুণকে কোলে করে দোতলার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এলো। সবার প্রশ্ন, 'কি করে কি হলো?' নবারুণবাবু পেটে হাত দিয়ে দেখালেন, 'পেট-ব্যথা'। সকলেই খুব অবাক হয়ে গেল, 'বাবা, কি সাংঘাতিক পেটব্যথা।' সকলেই খুব অবাক হয়ে গেল, 'বাবা, কি সাংঘাতিক পেট-ব্যথা, হাত-পা পর্যন্ত নাড়তে পারছে না।'

অবশেষে ডাক্তারও এলো। এইরকম ভীষণ পেট ব্যাথা দেখে ডাক্তার যখন অতীব চমকিত হলেন, নবারুণকে বহু কষ্ট করে ডাক্তারকে বোঝাতে হলো, 'পেট-ব্যাথা ঠিকই, তবে পেটের ভেতর নয়, পেটের বাইরে ব্যথা।'

এ কাহিনী আর বিস্তারিত করে লাভ নেই। দু'চারদিনের মধ্যে নবারুণবাবুর পেট-ব্যথার উপশম হবে। আবার রাস্তাঘাটে, অফিসে তিনি বেরোবেন। তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে। দয়া করে তাঁকে আর রোগা হওয়ার পরাবর্শ, উপদেশ দেবেন না। আহা মোটা মানুষ, মনের সুখে আছেন। ওঁর বাপ-ঠাকুর্দাও মোটা ছিলেন, সুখী ছিলেন। ওঁকে ছেড়ে দিন, আসুন আমরা কামনা করি, নবারুণকে রোগা হতে হবে না—নবারুণবাবু মোটা থাকুন, সুখে থাকুন।

কণ্টকাকীর্ণ

যথা সময়েই পৌছানো গেলো। আমার বন্ধু সমীরের কাকাব শ্রাদ্ধবাসর। আশা করেছিলাম বন্ধু-বান্ধব অন্যান্য অনেকেই হয়তো আসবেন। কিন্তু গিয়ে দেখলাম আমি একা, আর সবই সমীরদেব আত্মীয়স্বজন এবং পারিবারিক বন্ধুবান্ধব। একা-একাই চুপচাপ বসেছিলাম, এমন সময় সমীর এসে আমার পাশে বসলো।

বাইরের ঘরের পাশে একটা প্যাসেজের মধ্যে বসে আছি। একে একে অতিথি-অভ্যাগত সব প্রবেশ করছেন। সমীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে—'ইনি আমার মেজো মেসোমশাই, ইনি আমার রাঙাদির দেওর'। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও সময়োচিত গাম্ভীর্যসহকারে ভদ্রতা বিনিময় করছি। এর মধ্যে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, সুসজ্জিত অবয়ব। কিন্তু সমীর তাঁর পরিচয় দিতেই আঁতকে প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম, 'ইনি আমার যে কাকা মারা গেছেন, আজ যাঁর শ্রাদ্ধ...' ইতিমধ্যে ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসেছেন। আমি ইতস্তত করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা হ'বে আশা করিনি।'

ভদ্রলোক বিগলিত হাস্যে জানালেন, 'হ্যাঁ, আমি একটু দূরে থাকি আজকাল, তার উপবে, আসা-যাওযারও অসুবিধা।'

ভদ্রলোক ভেতরের দিকে চলে গেলেন। আমি সমীরকে বললাম, 'আমি চলি ভাই। যাঁর শ্রাদ্ধে এসেছি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এ রকম আশা করতে পারা যায় না।' এইবার সমীর বললো, 'আরে, না না শুনুন, ইনি হচ্ছেন আমার যে কাকা মারা গেছেন...'

আমি বাধা দিয়ে বলি, 'আমিও সেই জন্যেই বলছিলাম।'

এইবার সমীর বাক্য সম্পূর্ণ করে, 'আরে ইনি হচ্ছেন যে কাকা মারা গেছেন, যাঁর শ্রাদ্ধ তাঁর বন্ধু।'

অতঃপর আশ্বস্ত হওয়া গেলো। সমীর ইতিমধ্যে আমাকে খুব নিচু চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে জানালো যে, এই ভদ্রলোক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—কোনো এক বিখ্যাত গন্ধতৈল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একমাত্র স্বত্বাধিকারী, থিয়েটার রোডে বিশাল বাড়ি এবং তাঁর অন্যান্য ঐহিক গৌরব সম্বন্ধে বহু বিষয়ও আমাকে অবগত হতে হলো।

খাওয়ার ডাক পড়লো। এবং সৌভাগ্যবশতঃ আমি ঠিক সেই ভদ্রলোকের পাশেই বসলাম। খেতে খেতে একটা জিনিস দেখে ক্রমশই বিচলিত হচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, ভদ্রলোক বড় বেশি গলাধঃকরণ করছিলেন। একে ঠিক খাওয়া বলবো সম্ভব নয়, কোনো ধনবান ব্যক্তি যে এরকম গোগ্রাসে খেতে পারেন আমার ধারণায় ছিল না। এবং শেষে সেই সর্বনাশ ঘটলো। আমি শুনে যাচ্ছিলাম, ষোড়শ অথবা সপ্তদশ মৎস্য খরডটি গিলতে গিয়ে ভদ্রলোকের গলায় কাঁটা ফুটলো। এতক্ষণ কাঁটা যে কেন ফোটেনি সেটাই আশ্চর্য। গলায় না ফুটলেও তাঁর পাকস্থলিতে অন্ততঃ শতাধিক কাঁটা ইতিমধ্যে সমবেত হয়েছিলো সে বিষয়ে আমি এবং হয়তো আরো অনেকেই নিঃসন্দেহ ছিলো। সুতরাং যখন তিনি ঘোষণা করলেন যে তাঁর গলায় একটা কাঁটা ফুটেছে, তখন আমরা কেউই বিশেষ আশ্চর্য হলাম না, বরং কেউ কেউ যেন এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, এইবার খাওয়ার বহর একটু কমবে।

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেলো, ফলাফল অন্য আকার ধারণ করেছে। ভদ্রলোক—ইতিমধ্যে জানা গিয়েছিলো যে, ভদ্রলোকের নাম শচীবিলাসবাবু, ভয়ঙ্কর হাঁস-ফাঁস শুরু করে দিলেন। তখন আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'দেখুন, আমি খুব তাড়াতাড়ি খাই, আমার মধ্যে মধ্যেই গলায় কাঁটা ফোটে—ওতে কিছু হয় না।'

শচীবিলাসবাবু একবার গম্ভীর হয়ে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তারপর কঠিন কণ্ঠে বললেন 'সকলের জীবনের দাম সমান নয়।' সত্যিই এর পরে আমার আর কিছু বলার থাকে না।

একজন পরামর্শ দিলেন শুকনো সাদা ভাত গিলে খেলে কাঁটা নেমে যেতে পারে। সাদা ভাত আনতে বলা হলো। শচীবিলাসবাবু পর পর বড় লোহার হাতাব চার হাতা সাদা ভাত গিলে ফেললেন। কিন্তু তাঁর মুখে-চোখে স্পষ্টই দেখা গেলা তাঁর কাঁটা তখনো রয়েছে। এবার একজন পরামর্শ দিলেন আস্ত কলা গিলে খেলে হয়তো একটা সুবাহা হতে পারে। বাড়ির অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সুলভ হলেও কলা নেই। নিকটবর্তী বাজার তখন প্রায় বন্ধ, তবুও অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে একটা ফলের দোকান খোলানো গেলো, কিন্তু দোকানদার কিছুতেই দু'ডজনের কম এতরাত্রে কলা বেচতে নারাজ। যে কিনতে গিয়েছিলো সে বাধ্য হয়ে তাই-ই কিনে আনলো। সবগুলি কলাই শচীবিলাসবাবুর কাজে লাগলো, কিন্তু ফল হলো না, ন যযৌ ন তস্থৌ, কাঁটা স্থির। রসগোল্লাব রস ফেলে শুকনো শুকনো ছিবড়ে খেলে বোধহয় উপশম হতে পারে—এবার শচীবিলাসবাবু নিজেই বাতলালেন। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় রসগোল্লা গ্রহণ করা চললো, না গুনিনি—গোনা সম্ভব ছিলো না, প্রয়োজনও ছিলো না। কেননা আমাদের বাকী অন্যান্যদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না, কিন্তু কাঁটাটি শচীবিলাসবাবুর গলায় তখনো বিঁধে রয়েছে। 'না, না এখনো খচ্ খচ্ করছে।' তাঁর কাতরোক্তি অনবরত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

সকলেই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। নমো নমো করে কোনোরকমে খাওয়া শেষ করা গেলো। ভাবলাম, যাক এযাত্রা কোনোক্রমে রক্ষা পাওয়া গেলো। কিন্তু শচীবিলাসবাবুব মুখচোখ দেখে চিন্তান্বিত হতে হলো। শীতের রাত্রি, ডিসেম্বরের শেষাশেষি প্রবল ঠাণ্ডা পড়েছে। আমি খেয়ে উঠে ঠাণ্ডা জলে হাত ধুয়ে শীতে কাঁপছিলাম অথচ শচীবিলাসবাবুর চোখ দেখলাম গোল হয়ে গেছে, তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামও দেখলাম। আমি তখন বাধ্য হয়েই বললাম, 'একজন ডাক্তারের কাছে গেলে হয় না?'

'গেলে হয় কি, চলো।' শচীবিলাসবাবু ককিয়ে ককিয়ে আদেশ করলেন। আমি সমীরকে বললাম, 'চলো, দেখা যাক।'

শচীবিলাসবাবুর গাড়িতে উঠতে উঠতে শচীবিলাসবাবু বললেন, 'হ্যারিসের কাছে গেলে হতো।' হ্যারিস কাছে গেলে হতো।' হ্যারিস পার্ক স্ট্রীটে বিখ্যাত কর্ণ-কণ্ঠ-নাসিকা বিশেষজ্ঞ। হ্যারিসকে আমিও অল্প অল্প জানি। রাত এগারোটা বেজে গেছে। রাত নটার পব তাঁর কাছে কেউ ভীষণ বিপদে পড়লেও যায় না, পাঁড়মাতাল, বিশেষ করে এই এগারোটা নাগাদ নেশাটা চরমে ওঠে, এখন গলার কাঁটা বার করতে গলা কেটেও ফেলতে পারে। আমি বিশেষ ভরসা পেলাম না। আমি ব্যাপারটা শচীবিলাসবাবুকে একটু সংক্ষেপে বললাম।

শচীবিলাসবাবু বললেন, 'তা হলে?'

'তা হলে একটা হাসপাতালে গেলে হয়।' সমীর বিনীতভাবে জানালো।

'হাসপাতালে...'—ভীষণ রকম আঁতকে উঠলেন শচীবিলাসবাবু। যেন তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত গত্যন্তর না দেখে তিনি হাসপাতালে যেতেই রাজী হলেন।

গাড়ি চলেছে। শীতের কন্‌কনে হাওয়া। শচীবিলাসবাবু আমাদেব দুজনেব মধ্যে বসে। একপাশে সমীর, আর একপাশে আমি। গলায় ব্যথায় অল্প অল্প কাতরাচ্ছেন। কিন্তু এরই মধেয দেখলাম তাঁব বৈষয়িক বুদ্ধি যথেষ্টই প্রখর। আমার সৌভাগ্যবশত আমি শচীবিলাসবাবু যে তৈলব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক সেই তেলটি ব্যবহার করে থাকি। শচীবিলাসবাবু এর মধ্যে একবার আমার মাথা, একবাব সমীবেব মাথা শুঁকে বললেন, 'এ ছেলেটি তো বেশ ভালো, আমাদের তেল মাখে। সমীর, তুমি আমাদের তেল মাখো না কেন?'

সমীর আমতা আমতা করতে করতে বললো। 'মাখি, মাখি, কিন্তু আমার মাথা এ রকম যে... আমাব মাথায় গন্ধ বেরোয় না।' শচীবিলাসবাবু এই দুর্দশার মধ্যেও বিচলিত করলেন এই উক্তিতে। আমি সমীরের এ ধরনের উক্তির সঙ্গে পরিচিত, তবুও হেসে ফেললাম।

গাড়ি হাসপাতালের সামনে এসে গেলো। তিনজনে নামলাম। হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। একজন লোক বসে ঝিমুচ্ছিলো, আমাদের দেখেই উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, কার গলায় কাঁটা ফুটেছে? প্রায় হক্‌চকিয়ে গেলাম লোকটির এই গোয়েন্দাদর্শিতা দেখে। অবশ্য পরে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এত রাত্রে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে জনকয়েক লোক এসে উপস্থিত হলে এদের পুরানো অভিজ্ঞতা থেকেই এরা বুঝতে পারে আসল ঘটনা, কোনো নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে সোজা এতরাত্রে চলে এসেছে। হামেশা এ রকম ঘটছে, রোজ রাত্তিরেই এত বড় শহরে কোনো-না-কোনো নিমন্ত্রণ বাড়িতে কারো-না-কারো গলায় কাঁটা ফুটেছে।

যা হোক, লোকটি ভেতরে গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিলো। একেবারেই তরুণ ডাক্তার। শীতের

রাত্রিতে লাল সোয়েটার গায়ে দিয়ে পিছনের একটা কম্পাউণ্ডে ব্যাডমিণ্টন খেলছিলেন। এত সামান্য ব্যাপারে খেলায় বাধা পড়ায় বেশ একটু রাগতভাবেই প্রবেশ করলেন বলে বোধ হলো। অল্প একটু কথা বলে শচীবিলাসবাবুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।' ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন আর আমাদের পর্দার বাইরে দাঁড়াতে বললেন।

আমি আর সমীর দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথোপকথন অনুসরণ করতে লাগলাম। শচীবিলাসবাবুর কণ্ঠ কিঞ্চিৎই ক্ষীণ, সব সময় শোনা যাচ্ছিলো না, আর ডাক্তারের প্রশ্ন উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছিলো—'কটা মাছ খেয়েছিলেন? চল্লিশ, ত্রিশ? কম? কলা? কলা ক'ডজন? লেডিকেনি— লেডিকেনি খাননি? রসগোল্লা? দই খাননি কেন, দই খেলে কাঁটা নামতে পারে। ও, তা জানতেন না। দেখি, হ্যাঁ, হাঁ করুন, আরো, আর একটু। না কাঁটা নেই। কি বললেন! আছে খচ্‌খচ্‌ করছে—নেই! এখন আর নেই, তাহলে গলা কেটে দেখতে হয়। কেন, কাল সকালে আবার আসবেন কেন? এখন দেখছি নেই, আবার গিয়ে মাছ খেতে চান নাকি? তাহলে কাল সকালে আবার কাঁটা আসবে কোথা থেকে?'

এতক্ষণে শচীবিলাসের কণ্ঠ শোনা গেলো—

'না, এই দিনের বেলায় ভালো করে দেখবেন আর কি।'

'দিনের বেলায়, দিনের বেলায় কি আপনার গলার মধ্যে সূর্য উঠবে? দেখলাম টর্চ দিয়ে, এর আবার দিন-রাত্রি কি?' ডাক্তার রীতিমত উত্তেজিত।

একটু পরেই শচীবিলাসকে প্রায় নিবাশ হয়েই বেরিয়ে আসতে দেখা গেলা। তিনজনে আবার গাড়িতে উঠলাম। একটা ঢেঁকুর তুলে শচীবিলাস বললেন, 'এই এখনো একটু খচ্‌খচ্‌ করছে, ডাক্তারটা কোনো কাজের নয়।' গাড়ি থিয়েটার রোড পর্যন্ত প্রায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় আবার শচীবিলাস চীৎকার করে উঠলেন, 'এই ভীষণ সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। আবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এই গাড়ি ঘোরাও।' গাড়ি ঘোরাতে হলো, আমি আর সমীর বিস্মিত।

ভয়ানক ঠাণ্ডা চারদিকে। রাত একটা বোধহয় বেজে গেছে। ঘড়ির দিকে আর তাকাচ্ছি না। আবার হাসপাতালে পৌঁছলাম। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডাক্তারকে ঘুম ভেঙে তোলা হলো। তিনিও বিস্মিত। চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হোলো আবার?'

শচীবিলাস বললেন, 'একটা কথা জানা হয়নি স্যার, রাত্রে কি খাব?'

বেঁচে আছি

আজ কিছুদিন হলো যাকে বলে শরীরটা ঠিক ভালো যাচ্ছে না। ঠিক কি অসুবিধে কিংবা কি কতটা খারাপ এঞ্জিনের কোন অংশটা গড়বড় করছে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কিন্তু এই সেদিন পর্যন্তও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পথের পাশের তেলেভাজা বিপণির তপ্ত মধুর গন্ধে মন কি রকম উদাসীন হয়ে উঠতো। এই তো গত বছর সাড়ে বারো ইঞ্চি (একত্রিশ সেন্টিমিটার)

বারিবর্ষণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পরমানন্দে ছত্রহীন খালি মাথায় ছয় ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে ময়দানে ফুটবলের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দেখেছি, তারপর বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কটুবাক্য সহযোগে আদা-চা খেয়ে চমৎকার চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।

দুঃখের বিষয় এসবই গত বছরের গত যুগের গত জন্মের ঘটনা। সবাই বলছে অর্থাৎ যাদেরই কাছে দুঃখ করছি আগের মত অনাচারে আর উৎসাহ পাচ্ছি না তারা সবাই বলছে 'বয়েস তো চল্লিশ হয়ে গেলো এবার একটু বুঝেসুঝে চলো। সাবধানে থাকবে। ছেলে-বৌ নিয়ে কষ্টের সংসার, গোঁয়ার্তুমি একদম করবে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস চিরতার জল খাবে। পাতে কাঁচা নুন খাবে না। রাতে শোয়ার সময় মাথার কাছের জানলা বন্ধ করে শোবে।'

সকলের সব উপদেশ মেনে চলছি অন্তত চলার চেষ্টা করছি। কিন্তু চিরতা কোথায় পাওয়া যাবে? একজন বললেন—'তরকারির বাজারের পিছন দিকে যেখানে গৃহস্থ বালিকা এবং বিধবারা কাঁচা আনাজ বেচে তাদের কাছে পাওয়া যাবে। গেলাম সেখানে কিন্তু চিরতা কোথায়। মধ্য থেকে এক সরল-দর্শনা গ্রাম্য কিশোরী আমাকে অপর্যাপ্ত মূর্খ ধরে নিয়ে একটি বল্লমের মত সুতীক্ষ্ণ এবং সুদীর্ঘ চিচিঙ্গা গছানোর চেষ্টা করলো। চিচিঙ্গা কিনলাম না কিন্তু চিরতাও পেলাম না। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম।

সব শুনে পরদিন অফিসে একজন বললেন—'তুমি চিরতা জানো না, তুমি তো একেবারে বুরবক হে! চিরতা কি শাক যে কাঁচা তরকারির বাজারে খুঁজতে গিয়েছিলে? বড় দেখে মুদির দোকানে খোঁজ করো, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে।'

গেলাম মুদির দোকানে। সবসুদ্ধ সতেরোটি দোকানে গিয়েছিলাম। সাতজন দোকানদার কোনো উত্তর দিলেন না 'চিরতা আছে কিনা?' আমার এই স্পষ্ট ও অতি সরল প্রশ্নটির উত্তরে তাঁরা যা করছিলেন, অর্থাৎ তেল কিংবা পেঁয়াজ, ওজন কিংবা মুখে মুখে একটি বাইশপদী জটিল যোগ অঙ্ক, তাই করে যেতে লাগলেন, আমাকে হাবেভাবে বুঝে নিতে হলো চিরতা নেই।

একজন দোকানদার কেন যেন ধরে নিলেন চিরতা কোনো একটা নতুন বেরোনো সাবান বা বেলেডের নাম। প্রথমে একটি তাকের সমস্ত সাবানগুলির নাম পাঠ করে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং প্রত্যেকবার আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'কি নাম বললেন, চিরতা?' এবং আমার উত্তর বা ব্যাখ্যার জন্যে অপেক্ষা না করেই পনেরো মিনিট গবেষণা করলেন। সাবান শেষ হয়ে গেলে বেলেড নিয়ে অনুরূপ ভাবে আরো দশ মিনিট ব্যয় করলেন। তারপর দুঃখের সঙ্গে ব্যক্ত করলেন, 'চিরতা নামটা খুব চেনাচেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই জিনিসটাকে লোকেট করতে পারছি না!'

সে যা হোক আর চারজন মুদিওলা আমার চাহিদা-বাক্য প্রায় না শুনেই বললেন—'এখন হবে না।' আমার অসুস্থ মুখমণ্ডলে কতটা দীনতার ভাব ছিলো ঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু এঁরা বোধহয় আমাকে ভিখারি-টিখারি কিংবা সাহায্যপ্রার্থী বেকার গ্র্যাজুয়েট সদ্বংশজাত ভদ্রলোক ঠাউরে নিয়েছিলেন। সময়, শরীর বা মনের অবস্থা ঠিক কোনোটাই ভালো নয়, তাই আর ঝগড়ার মধ্যে, অযথা বাদবিতণ্ডার মধ্যে এগোলাম না।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো অন্য একটা দোকানে। দোকানটা বেশ বড়। দুজন দোকানদার, দুজনই প্রায় একই রকম দেখতে। বোধহয় যমজ ভাই। আমি চিরতার কথা বলতেই দুজনে খুব খুশি হয়ে কি আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনার ছোট ছোট অংশ অল্প অল্প কানে এলো।

তাতে বুঝতে পারলাম এঁদের মামার বাড়ি ময়ূরভঞ্জ না মজঃফরপুর কোথায় যেন, সেখানে সুজিকে বলে চিরতা। অনেকদিন পরে মামার বাড়ির দেশের একটা পুরোনো শব্দ শুনে দুজনেই খুব পুলকিত এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন আমি ওঁদের মামার বাড়ির দেশের লোক কিনা? তদুপরি তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যতটা চাই সুজি সংগ্রহ করে দেবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

বহু কষ্টে এই মাতুলালয়বিলাসী ভ্রাতৃযুগলের হাত ছাড়িয়া বেরিয়ে এলাম। কিন্তু এর পরেও কোনো মুদির দোকানেই চিরতা পেলাম না, সবাই শুষ্ক কণ্ঠে কিংবা মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, 'না, নেই।' সুখের কথা সত্তেরোতম মুদি মহোদয় অতি মহানুভব, তিনি বললেন, 'চিরতা মুদিরা দোকানে পাবেন না। দশকর্মা ভাণ্ডারে খোঁজ করুন।'

অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্তে দশকর্মা ভাণ্ডারে গেলাম। চিরকাল জানি এই সব ভাণ্ডারে বিয়ে, অন্নপ্রাশন বা পুজোর সামগ্রী পাওয়া যায়, চিরতার মত তিক্ত জিনিস ঐসব মধুর অনুষ্ঠানের সামগ্রীর সঙ্গে কেন বিক্রি হবে এইসব কঠিন প্রশ্ন ভালো করে ভাবার আগেই প্রথম দশকর্মা ভাণ্ডারেই চিরতা পেয়ে গেলাম।

প্রয়োজনীয় কোনো বস্তু পেলে তা যদি তিতাও হয় তবু মানুষ যে কত খুশি হতে পারে আমার চোখ-মুখ দেখলে সেটা তখন বোঝা যেতো। একবারে অনেকটা চিরতা কিনে ফেললাম দোকানদারদের পরামর্শ নিয়ে, পুরো ছয় মাসের খোরাক।

কিন্তু বাড়ি ফিরে বিপত্তি হলো। আমাদের প্রাচীনা পরিচারিকা ভূয়োদর্শিনী মহিলা, তিনি চিরতার ঠোঙ্গা খুলে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে রায় দিলেন, 'এটা চিরতাই বটে কিন্তু আসল চিরতা নয়, রামচিরতা। এতে ঝাঁঝ তেজ অনেক কম। বাবুকে সরল প্রকৃতির মানুষ দেখে দোকানদাররা ঠকিয়ে দিয়েছে।'

তা ঠকাক, ঝাঁঝ-তেজে আমার দরকার নেই, চিরতা হলেই হলো। সকালবেলা ভিজিয়ে খেতে পারলেই হলো। প্রথমদিন এক গেলাস চিরতার জল খেয়ে ভোরবেলায় লম্বালম্বি কাটা কলাগাছের মতো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। এই যদি কম তেজ হয়, রামচিরতাই যদি এরকম ঝাঁঝালো হয়, কে জানে প্রকৃত চিরতা কি রকম! প্রকৃত চিরতা যে রকমই হোক আমার এই রামচিরতার জল এক গেলাস খাওয়ার পরে এক গেলাস নিমের পাতার রস সরবতের মত মনে হবে। প্রথমদিন জ্ঞান ফিরে আসার পর জিবের অসহ্য তিতা ভাব কাটানোর জন্যে একটা কাঁচা উচ্ছে চিবিয়ে খেলাম, মনে হলো বাতাসা খাচ্ছি।

এইভাবে সপ্তাহ তিনেক চলে গেলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে এই সাংঘাতিক পানীয় এক গেলাস খেয়ে গুম মেরে পড়ে থাকি। শুভানুধ্যায়ীরা যে যা পরামর্শ দিয়েছিলো সব মেনে চলি। পাতে কাঁচা নুন খাই না, রাতে শোয়ার সময় বহুকালের অভ্যাস পালটিয়ে মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ করে শুই। কিন্তু শরীর ও মনে সেই পালিশ করা জুতোর মত ঝকঝকে ভাবটা কিছুতেই ফিরে আসছে কি না।

এর মধ্যে আমাদের দেশের এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সকালবেলা দেখা করতে এলেন। তিনি আমাদের পরিবারকে তিন পুরুষ ধরে চেনেন। তিনি যখন এলেন তখন তরল চিরতা পান করে যথারীতি বুঁদ হয়ে বসে আছি। আমি বহু কষ্টে তাঁর সম্মুখীন হলাম। সেই স্বদেশী ভদ্রলোক আমার অবস্থা দেখে 'হায়-হায়' করে উঠলেন। প্রথমে তাঁর অহেতুক সন্দেহ হলো, আমি বোধহয়

গতরাতে খুব নেশা করেছি, এই ভরসকালে এখনো সেই ঘোরে আছি। কিন্তু কিছু পরে আমাকে ভালোভাবে অবলোকন করে পারিবারিক মাদকবিরোধী ঐতিহ্য স্মরণ করে এবং সর্বোপরি আমার কথা শুনে তিনি বুঝলেন কোনো মাদক নয়, ওষুধ পান করেই আমার এ অবস্থা। তার উপরে তিনি যখন শুনলেন আমি খালি পেটে চিরতার জল খাচ্ছি, রীতিমত আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন। আমাকে জানালেন আমাদের পরিবারে এ ঘটনা আগেও ঘটেছে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। আশি বছর বয়সে আমার ঠাকুর্দা যে হার্টফেল করে লোকান্তরিত হয়েছিলেন সেও ঐ খালি পেটে চিরতার জল খাওয়ার জন্যে। পরামর্শ দিলেন চিরতার জলে তত আপত্তি নেই, তবে খালি পেটে নয়, সঙ্গে দু ছটাক মিছরি খেতে হবে।

এখন আর দু ছটাক কোনো জিনিস পাওয়া যায় না। দৈনিক একশো গ্রাম করে মিছরি খেতে লাগলাম। মানে ষাট পয়সা দিনে, মাসে আঠারো টাকা খবচ বেড়ে গেলো।

কিন্তু তেমন কোনো উপকার হলো না। সেই চনমনে ঝকঝকে ভাবটা কিছুতেই ফিরে আসছে না। বাল্যকালে পরশুরামের চিকিৎসা সঙ্কট গল্পটি পড়েছিলাম সেটা মনে করে খুব বেশি ডাক্তার বৈদ্যের কাছে যেতে ভরসা হলো না।

কিন্তু একদিন একটা বোকামি করে বসলাম। কথায় কথায় পুরনো এক বন্ধুর কাছে খবর পেলাম, ভিয়েনা থেকে এক সদ্য-প্রত্যাগত ডাক্তার শারীরিক ও মানসিক দুর্দশার চমৎকার আধুনিক চিকিৎসা করেন। পার্ক স্ট্রীটের একটা বড় বাড়িতে ঠিকানা, ফি মাত্র কুড়ি টাকা।

পরের দিন সন্ধ্যায় ঠিকানা খুঁজে খুঁজে পার্ক স্ট্রীটের সেই বাড়িতে পৌঁছলাম। প্রাগৈতিহাসিক বাড়ি, বিশাল অন্ধকার অট্টালিকা। সাততলা বাড়ির ছয়তলায় ডাক্তার সাহেব বসেন, সিঁড়িতে আলো নেই। একটি মোগল আমলের লিফটে কাগজেব নোটিশ লাগানো, লিফট আউট অফ অর্ডার। এই নোটিশটিও বহুদিনের পুরনো, কাগজ মলিন হয়ে গেছে, সিপাহী যুদ্ধের বা তাবো আগের কালের বলে মনে হয়।

বহু কষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে ছয়তলায় উঠলাম। উঠেই সামনে ডাক্তার সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে, পর্দা তুলে ভিতরে ঢুকে গেলাম, দেখে ঠিক ডাক্তারের ঘর মনে হয় না। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক চশমা চোখে বসে রয়েছেন। আমি ঢুকতেই বললেন—'বলুন আপনার কি অসুবিধে?'

আমি আমার অসুখের আদ্যোপান্ত বলে গেলাম গড়গড় করে। ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কেমন গম্ভীর হয়ে সব শুনলেন। আমার বলা শেষ করে আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার কি হয়েছে মনে হয় আপনাব?

ভদ্রলোক তাঁর টেবিলের উপর চশমাটা পর পর তিনবার ঠুকলেন, তারপর বললেন,—'আপনি অত্যন্ত মোটা, কুৎসিত ভুঁড়ি হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে কুকুরের মত জিব বার করে হাঁফাচ্ছেন, তাছাড়া আপনার গলার স্বর অতি বদখৎ, গাঁজা না খেলে মানুষের এত হেঁড়ে গলার স্বর হয় না।'

তিনি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি হতভম্ব হয়ে প্রতিবাদ করলাম, আপনি কি রকম ডাক্তার, আমি অনেক উন্মাদ, রাগী দুর্দান্ত ডাক্তারের কথা শুনেছি, কিন্তু এ কি?

আমার অভিযোগ শেষ হওয়ার আগেই ভদ্রলোক বললেন 'গেট আউট। অন্ধ কানা চোখে দেখতে পাও না, আমি হলাম ইনকাম ট্যাকসের উকিল, বোকা বাইরে নেমপ্লেট না দেখে ঢুকে

পড়েছো! যাও বেরোও, তোমার ডাক্তার ঐ সিঁড়ির শেষ মাথায়, এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বের করতে করতে গজগজ করতে লাগলেন! কত কষ্ট করে দুবেলা ছতলায় উঠে বসে থাকি, তা মক্কেলের পাত্তা নেই, রোগীর পর রোগী, এ এক আচ্ছা ঝামেলা বেধেছে!

অকারণে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এসে একটু এগিয়েই ডাক্তারের ঘর পেলাম। বাইরে স্পষ্ট নেমপ্লেট লাগানো রয়েছে, আমারই ভুল হয়েছে। প্রথমেই দেখে ঢোকা উচিত ছিল।

যা হোক, ডাক্তারের ঘরে গেলাম। দেখি বেশ কয়েকজন রোগী-রোগিণী বসে। ঘণ্টা দেড়েক পরে আমার ডাক এলো। ডাক্তারসাহেব আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন, নাড়ি দেখলেন, পেট টিপলেন, গলাখাঁকারি দিতে বললেন, অনেক গোপন কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বললেন, 'আপনার কিছু হয় নি, রাতে ঘুম একটু হাল্কা হচ্ছে তাই সারাদিন ক্লান্ত লাগছে। রাতে শোয়ার আগে এক গেলাস গরম দুধ আর দুটো বিস্কুট খেয়ে শোবেন। ওষুধ-টষুধ লাগবে বলে মনে হয় না।'

খুব খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

এ সব প্রায় চার মাস আগেকার কথা। ডাক্তারসাহেবের পরামর্শ অনুসরণ করে মোটামুটি ভালই ছিলাম। কিন্তু আজ কিছুদিন হলো আবার ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করছি। একদিন হাঁটতে হাঁটতে অফিস ফেরত আবার চলে গেলাম পার্ক স্ট্রীটের সেই ডাক্তারসাহেবের চেম্বারে। আবার সেই লিফট আউট অফ অর্ডার, আবার পায়ে হেঁটে হাঁফাতে হাঁফাতে ছয়তলা। তবে এবার আর আয়করের উকিলেব কাছে গিয়ে অপমানিত হলাম না, ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না, কারণ দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে।

সোজা চলে গেলাম ডাক্তারের ঘরে। গিয়ে দেখি সেই ঘর, সেই পরিবেশ, রোগী-রোগিণীও রয়েছে যেমন আগে দেখেছিলাম। আগের বারের মতই ঠিক দেড় ঘণ্টা পরে আমার ডাক পড়লো। কিন্তু চেম্বারের ভিতবে গিয়ে দেখলাম ডাক্তারের আসনে যিনি বসে আছেন, তিনি আগের ব্যক্তি নন। আমি দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললাম, 'আমি তো আপনাব রোগী নই, যাঁকে দেখিযেছিলাম তিনি কোথায়?'

নতুন ডাক্তারসাহেব জানালেন আগের জন আবার ভিয়েনায় গিয়েছেন আর উনি সদ্য ভিয়েনা থেকে এসেছেন। উনি যখন যান ইনি আসেন, ইনি যখন যান তখন উনি আসেন। তিন মাস পর পর এই বাঁধাধরা রুটিন। কোনো অসুবিধে নেই, উনির মত ইনিও সদ্য ভিয়েনা ফেরৎ আধুনিক চিকিৎসক, ওঁকে দেখানো আর এঁকে দেখানো আসলে একই কথা।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে এঁকেও আমার বৃত্তান্ত বললাম। ইনিও সব কথা মন দিয়ে শুনলেন, নাড়ি দেখলেন, পেট টিপলেন, গলাখাঁকারি দিতে বললেন, অনেক গোপন কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর বললেন, 'আপনার কিছু হয় নি, রাতে ঘুম একটু কম হচ্ছে তাই সারাদিন ক্লান্ত লাগছে। রাতে শোয়ার আগে দু গেলাস জল খেয়ে শোবেন, ওষুধ-টষুধ লাগবে মনে হয় না।'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ঠিক চার মাস আগে আপনার পূর্বসূরী, আগের ডাক্তারসাহেব এক গেলাস গরম দুধ আর দুটো বিস্কুট খেয়ে শুতে বলেছিলেন। আর আপনি বলছেন শুধু দু গেলাস জল খেতে।'

আমার কথা শুনে নতুন ডাক্তারসাহেব একবিন্দুও বিচলিত হলেন না। বললেন, 'জানেন তো আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রতিদিন এগোচ্ছে, এই চার মাসে আগাগোড়া বদলে গেছে', বলে

একটু মুচকিয়ে হেসে যেন খুব গোপন কথা বলছেন এইভাবে গলা নামিয়ে বললেন, 'এই জন্যেই তো প্রতি তিন মাস অন্তর আমরা বিদেশে গিয়ে নতুন খবর নিয়ে আসি, সেইভাবে চিকিৎসা করি।'

আমি বিশ টাকা ভিজিট দিয়ে আস্তে আস্তে ছয়তলা ভেঙ্গে নিচে এলাম।

সঞ্চয়িতা

জয়গোপালের সঙ্গে আমার পরিচয় সে প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল। এই পাঁচ বছরে অনেক দেখেছি এবং জয়গোপাল সম্পর্কে আমার ভীতি ক্রমশঃ বেড়ে গেছে। আসলে জয়গোপাল ভারি অমায়িক, নিরীহ ছেলে, কোন দোষ নেই, বিনয়ী, বিদ্বান, মিতব্যয়ী।

কিন্তু জয়গোপালের এই শেষ গুণটি, এই মিতব্যয়িতাই আমার পক্ষে মর্মান্তিক। তখন প্রথম আলাপ, একদিন শীতের দুপুরবেলায় জয়গোপালের সঙ্গে দেখা। জয়গোপাল মৃদু হেসে এগিয়ে এলো, 'এই যে, কি খবর? এসো এই পার্কে বসে একটু গল্প করা যাক। ভাল কথা, ফ্রুট খাবে, শীতের দিনে ফ্রুট খাওয়া ভাল।'

জয়গোপাল দুই পয়সার টোপাকুল কিনে নিয়ে এলো।

দুজনে পার্কে ঘাসের উপর বসে আছি। কথাবার্তা বলছি, এমন সময় এদিক-ওদিক তাকিয়ে জয়গোপাল পকেট থেকে একটা ডায়েরি বার করে খুটখুট করে লিখে আবার ভাঁজ করে রাখলো। আমার কেমন কৌতূহল হল, প্রশ্ন করলাম 'কি ব্যাপার?'

মৃদু হেসে জয়গোপাল জানাল, 'না, কিছু না।'

অনেক দিন পরে জয়গোপালের বাড়িতে একটা অন্যায় কাজ করেছিলাম। টেবিলের ওপর ডায়েরিটা রয়েছে, সে স্নান করতে গেছে। ডায়েরিটা খুলে দেখলাম ঐ তারিখে লেখা রয়েছে, দুপুরবেলা—চ্যারিটি—দু পয়সা। টোপাকুল সাতাশটা। আমি আঠারোটা, অমুক নটা।

এই রকম ছোট-বড় খরচের খতিয়ান পাতায় পাতায়। সকালবেলা জিলিপি দু আনা, আমি তিন, বলরাম এক। এমন কি দৈনিক কটা করে কাঁচালঙ্কা খরচ হচ্ছে তার হিসেব, গুনে দেখলাম পাঁচ-ছয় দিন যোগ করে যেই পঁচিশটা হচ্ছে, তার পাশে লেখা আনুমানিক এক ছটাক, এক আনা।

আর বেশি দেখার সুযোগ পেলাম না, জয়গোপাল স্নান সেরে ফিরে এলো। খালি গায়ে। গলায় পৈতে, তাতে অনেকগুলো বিরাট বিরাট চাবি ঝুলছে। আমি বললুম, 'তোমরা বামুন তা তো জানতাম না। বসু কি বামুন হয়?'

'না, না, সেজন্যে পৈতে নয়। এই চাবি ঝোলানোর খুব সুবিধে হয় কিনা তাই আমি পৈতে ব্যবহার করি, আসলে আমার পৈতেটৈতে কিছুই হয়নি। জয়গোপাল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো আমাকে।

জয়গোপাল চাকরকে ডেকে চা করতে বললো। চাকর চায়ের জল চাপিয়ে এসে আবার দাঁড়ালো।

'কি চাই?' জয়গোপাল জিজ্ঞেস করলো।

'চা।' চাকরটা জানালো।

'হ্যাঁ।' বলে জয়গোপাল ওদের পুরানো আমলের ভারি লোহার সিন্দুকটা খুলে ফেললো। তারপর আমাকে ডাকলো, 'এই ডালাটা একটু তুলে ধর তো।'

ডালাটা তুলে ধরলাম, সিন্দুকের মধ্যে শুধু কৌটো ছোট-বড় নানা আকারের। সবগুলোর গায়ে লেবেল মারা,— 'চা,' 'হলুদ', 'ছোলার ডাল'! যাবতীয় জিনিস সিন্দুকের মধ্যে। জয়গোপাল চায়ের কৌটো বার করে মেপে দু চামচ চা দিল চাকরের হাতে। তারপর আবার খুব যত্নে সিন্দুক বন্ধ করল।

আমি ঘরে ঘন্টা-দেড়েক ছিলাম। এর মধ্যে আমাকে বার সাতেক সিন্দুকের ডালা ওঠানো-নামানোয় সাহায্য করতে হল। কনুইয়ের থেকে কব্জি পর্যন্ত আর ঘাড়ের দু'পাশে পিট দিয়ে ঘুরে বুক পর্যন্ত রীতিমত ফুলে গেল।

পরে শুনেছিলাম জয়গোপালের মত নিরীহ, অমায়িক ছেলে বহুবার প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে শুধু এই একই কারণে। একবার মল্লিকমশায় দুহাতে প্লাস্টার-করা একটি মেয়েকে রাস্তায় দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'জয়গোপালের সদ্য প্রাক্তন প্রেমিকা। কাল চার ঘন্টা জয়গোপালের বাড়িতে গল্প করেছে।' আমি কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারিনি।

আমি মল্লিকমশায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'জয়গোপালকে চিনলেন কি করে?'

'জয়গোপালকে চিনবো না!' মল্লিকমশায় বললেন, 'আমার পিসেমশায়ের বাবাকে ওর ছোট ঠাকুরদা খুব ভালোবাসতেন। মরার সময় বলে গিয়েছিলেন, তোকে এমন জিনিস দিয়ে গেলাম তিন পুরুষ বসে খাবি।' উইলে দেখা গেল পিসেমশায়ের বাবার নামে একটা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি।

সব কৃপণ ব্যক্তিকে নিয়েই এ ধরনের গল্প থাকে। মল্লিকমশায়ের গল্পও হয়তো তাই। কিন্তু জয়গোপাল সম্পর্কে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল, এ গল্প শোনারও অনেক পরে।

ভীষণ বৃষ্টি নেমেছে। রাত দশটা বাজে প্রায়। জয়গোপালদের বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছি, একটা থামের আড়ালে, এমন সময় 'আরে নক্ষত্রবাবু না! আরে এসো ভেতরে এসো! বাইরে কি করছো?' জয়গোপাল আমাকে জোর করে বাড়ির মধ্যে ঢোকালো, বৃষ্টি তো ছাড়বে না, তুমি এখানেই ডিনার করে যাও।'

দিন কয়েক আগে আমার কনুইয়ে একটা ফোড়া উঠেছিল, আশঙ্কায় ছিলাম, সিন্দুকের ডালা তুলতে না হয় আবার, তার বদলে ডিনার। ভাবাই যায় না। একসঙ্গে খেতে বসলাম। দু'প্লেটে দুটো আটার রুটি, একটা আমার, একটা জয়গোপালের।

'তারপরে, খাবে কি দিয়ে? কি দিয়ে খেতে ভালবাসো? গুড় না কাঁচালঙ্কা?' জয়গোপালের প্রশ্ন সেই সঙ্গে চাকরের প্রবেশ একটা প্লেটে আধ চামচে পরিমাণ গুড় আর একটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

জয়গোপাল আমার মনে সঞ্চয়ের কামনা ঢুকিয়েছিলো। যখন-তখন দেখা হলেই বলতো, কিছু জমছে তো হাতে-নাতে? এখন জমাবার মতো অবস্থা আমার নয়। কিন্তু জয়গোপাল নিজের উদাহরণ দেখাতো, ভিখিরিদের উদাহরণ দেখাতো। বলতো, সবাই কিছু কিছু জমিয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো জয়গোপাল আমাকে দু'একজন অমিতব্যয়ী লোকের জীবনের করুণ কাহিনী শোনাতো। মানিকগঞ্জের গোপাল চৌধুরীর আপন ভাগ্নেকে সে পায়ের জুতো বেচতে দেখেছে। ভেড়ামারার কোন এক জমিদারী সেরেস্তার নায়েব ছিলো জয়গোপালের কোন এক

বন্ধুর বাবা, তাঁর প্রসঙ্গও মধ্যে মধ্যে আসতো। প্রচুর উপার্জন করতেন ভদ্রলোক কিন্তু নিমপাতা সেদ্ধ আর ডাল ভাত ছাড়া কিছুই খেতেন না। আর সেই নিমপাতাও কিনতে হতো না। তাঁর সেই কাছারিঘরের সামনেই ছিলো বিরাট একজোড়া নিমগাছ। জয়গোপাল এই কাহিনী বলাকালে একাধিকবার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতো।

মল্লিকমশায় এসব কথা শুনে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে যেতেন, আমাকে আলাদা পেলেই বলতেন, 'ডুববেন মশায়, জয়গোপাল আপনাকে পথে বসিয়ে ছাড়বে। ঐ একটা থার্ড ক্লাস কৃপণের সঙ্গে মেলামেশা করতে আপনার ঘেন্না হওয়া উচিত মশায়।'

কৃপণের এই শ্রেণী-বিভাগ বিষয়ে মল্লিকমশায়ের একটা থিয়োরি ছিলো। সব কৃপণই যাতায়াতের পয়সা বাঁচানোর জন্যে গাড়িতে না উঠে গাড়ির পিছনে পিছনে দৌড়ে যায়। যারা ট্যাকসির পিছনে দৌড়ায় তারা ফার্স্ট ক্লাস। এরই মধ্যে বড় ট্যাকসি ছাড়া আর কিছুর পিছেই দৌড়ায় না এই ধরণের অভিজাত প্রথম শ্রেণীও একটা আছে। (প্রসঙ্গত সেই সময়ে কলকাতায় বড়-ছোট দুই রকম ট্যাকসি ছিলো দুই রকম ভাড়ার।) কিছু কিছু আয়েসী কৃপণ ফিটন, রিকসা এই সব শ্লথগতি-যানের পিছনে দৌড়ায়, তাদের পয়সা বাঁচানো খুব ইচ্ছে—কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যের অভাব। এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। তৃতীয় শ্রেণীর কৃপণেরা ট্রাম-বাসের পিছনে দৌড়ায়। ট্যাকসি কিংবা ফিটনের পিছনে দৌড়ে বেশি টাকা বাঁচানোর মতো মনের প্রসারতা বা উদারতা এদের নেই। ট্রামের কিংবা বাসের পিছনে দৌড়ে দু'চার পয়সা বাঁচাতেই এদের যা আনন্দ। জয়গোপাল এই শ্রেণীর। তা'ও নিকৃষ্ট পর্যায়ের। এর মানসিকতা দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের পিছে দৌড়ানোর। ফার্স্ট ক্লাস ভাবতেও ওর বুক কেঁপে ওঠে।

মল্লিকমশায় আমাকে গালাগাল করতেন, 'আরে দৌড়াবেনই যখন বড় ট্যাকসির পিছনে দৌড়ে পাঁচ টাকা বাঁচবে, আমার পিছনে দৌড়ান, তা নয়, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম, ঐ জয়গোপালের পিছনে দৌড়চ্ছেন! এই সব বলে তারপর আমাকে বলতেন, 'নিন্ এবার এক প্যাকেট সিগারেট কিনুন। সঞ্চয়ের বিষয়টা একবার পার্কে বসে স্থিরমস্তিষ্কে ভাবতে হচ্ছে।'

একদিকে জয়গোপাল অন্যদিকে মল্লিকমশায়, সঞ্চয়ের বাসনা আমার প্রবল হয়ে উঠলো। কাউকে কিছু না জানিয়েই গোপনে গোপনে একদিন ব্যাঙ্কে একটা এ্যাকাউণ্ট খুলতে গেলাম। এ্যাকাউণ্ট খোলা খুবই সোজা, শুধু যদি আপনার এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় থাকে যার ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট আছে। আমি অনেক ভাবলাম কিন্তু এমন একজনের কথা ভাবতে পারলাম না আমার চেনালোকের মধ্যে যার ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট আছে, বাধ্য হয়ে আবার জয়গোপালের শরণাপন্ন হতে হলো। কিন্তু আশ্চর্য, জয়গোপালেরও কোনো এ্যাকাউন্ট নেই। সে দেখলাম একটা সঞ্চয়িতার মলাটের মধ্যে টাকা রাখে। 'সঞ্চয় করার জন্যেই তো সঞ্চয়িতা, এর মধ্যে বাবা টাকা জমাতেন, আমিও জমাই, এই কাপড়ের মলাট একটু ব্লেড দিয়ে চিরে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখবে, একেক দিকের মলাটে পঞ্চাশটা করে দশ টাকার নোট, দু দিকের মলাট ভরে গেলে পুরো হাজার টাকা।' জয়গোপাল নিশ্চয় আমাকে খুব বিশ্বাসী বলে ধরে নিয়েছিলো। মাথার কাছে কালো শক্ত কাঠের আলমারি খুলে দেখালো, প্রায় তিন-চারশো সঞ্চয়িতা তাকে তাকে যত্ন করে সাজানো।

জয়গোপালের ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম মল্লিকমশায়ের বাড়িতে। মজুমদারসাহেবও

রয়েছেন। মল্লিকমশায় খুব হাসলেন, 'ও, ব্যাঙ্কে টাকা রাখবেন বুঝি! পরে তুলতে চান তো, বিপদ আপদে পড়লে টাকাটা আপনি তুলতে চাইবেন তো।'

মল্লিকমশায়ের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, সে কে না চাইবে। আমার টাকা আমার প্রয়োজনে আমি তুলবো।

একটুকরো সাদা কাগজ এগিয়ে দিয়ে মল্লিকমশায় বললেন, 'আপনার নাম লিখুন তো এখানে।'

নাম লেখা হলো। কিন্তু মল্লিকমশায় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অন্য এক সরসতর আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন। ঘণ্টাখানেক পরে আমি অধৈয হয়ে বললাম, 'তা আপনারও কি ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট নেই?'

'আমার আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয়। আপনার থাকবে কিনা সেটাই বড় কথা। নিন্ নিজের নাম লিখুন।' মল্লিকমশায় তখন হাকিমি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। কণ্ঠস্বরে আদেশের ভাব দেখলাম।

তবু আমি বললাম, 'একবার তো সই করলাম! আবার কেন?'

'আরে মশায় যা বলছি করুন।' এইবার আবার সই করার পরে মল্লিকমশায় আমার সই দুটো মজুমদারসাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো, এ দুটো একই হাতে লেখা কিনা?'

মজুমদারসাহেব বললেন, 'অসম্ভব মশায়! একই চেহারাব যেমন দুজন লোক হয় না, তেমনই একই রকম সই একই লোক দুবার করতে পারে না। যতই চেষ্টা করুন কিছুতেই মিলবে না।'

এবার আমি নিজের সইদুটোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। একেবারে দুরকম। কোনো মিল নেই। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, টাকা জমা দিলে আর রক্ষা নেই। সই মিলবে না, টাকাও উঠানো যাবে না।

কিন্তু অনেক লোকে তো ওঠায়?

এর পরেও আমি কি করে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলতে সক্ষম হয়েছিলাম সে রহস্য আমি নিজেও এখন পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারিনি, সে বিষয়ে কোনো আলোচনায় প্রবেশ করা আমার পক্ষে খুব সম্মানজনক হবে না।

মল্লিকমশায় যা বলেছিলেন, তা কিন্তু মিললো না। ব্যাঙ্ক আমার চেক অনেক সময়েই ফেরত দিয়ে দিতো বটে কিন্তু আমার সই মিলছে না বলে নয়, একেবারে অন্য এক সামান্য কারণে, এ্যাকাউণ্টে টাকা নেই বলে। এত কম টাকা তুলতুম এককেবারে যে সই মেলানোর প্রশ্নই বোধহয় উঠতো না।

এইভাবে কিছুদিন চললো। তারপর একদিন ধীরে ধীরে কি করে আমার ব্যাঙ্ক-উৎসাহে ভাঁটা লাগলো, টাকা জমা দেওয়া বহুদিন বন্ধ। একাধিকবার টাকা তুলতে গিয়ে জানলাম আর টাকা তোলা যাবে না, তুলতে গেলে এ্যাকাউণ্ট বন্ধ করে তুলতে হবে। ইচ্ছার অভাবে এবং বিশেষত এ্যাকাউণ্ট বন্ধ করার নানা কাল্পনিক হাঙ্গামার কথা ভেবে কিছু আর করলাম না। ব্যাঙ্কে আমারও একটা এ্যাকাউণ্ট আছে, আমার নিজের নামে পাশ-বই, চেক-বই আছে, আমার কুৎসিত স্বাক্ষর কোনো এক লাল চামড়া দিয়ে বাঁধানো মোটা দামী লেজার-খাতায় অসংখ্য ধনী লোকদের স্বাক্ষরের সঙ্গে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে, আমার জীবনের এই গৌরবময় দিকটা পর্যন্ত কি অনায়াসে

অবহেলা করলাম।

ভুলেই গিয়েছিলাম বলা উচিত। হঠাৎ ছয় বছর পরে সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে একটা চিঠি এসে উপস্থিত, পঙ্গু তর্জমায় চিঠিটা এইরকম দাঁড়াতে পারে—

প্রিয় মহাশয়,

আমাদের ব্যাঙ্কে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাস হইতে আপনার এ্যাকাউন্টে আর কোনো কাজ-কারবার হয় নাই। শেষ কারবারের তারিখে আপনার জমা টাকার পরিমাণ ছিলো একুশ টাকা বাষট্টি নয়া পয়সা।

আমাদের ব্যাঙ্ক আইনের ১৭(২) (খ) সূত্রের পঞ্চম উপসূত্র অনুযায়ী এ্যাকাউন্টে পঁচিশ টাকার কম জমা থাকিলে প্রতি অর্ধ বৎসরে দেড় টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। তদুপরি উক্ত আইনের ২৯(৩) (চ) সূত্রের বিশেষ উপসূত্র অনুযায়ী যেহেতু আপনাকে চেক-বই দেওয়া হইয়াছিল এবং উক্ত আইনের ২৯ (৩) (ঝ) সূত্রের দণ্ডাদেশ অনুযায়ী যেহেতু আপনার গচ্ছিত অর্থ একশত টাকার কম ছিলো, প্রতি মাসে পঁচিশ নয়া পয়সা হিসাবে আপনার হিসাব হইতে কাটিতব্য।

এমতাবস্থায় আপনার একুশ টাকা বাষট্টি নয়া পয়সা কাটিয়া আপনার এ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হইল বলিয়া আপনাক নিবেদন করা যাইতেছে।

ইতি ২২।৫।৬৩
আপনার বিশ্বস্ত
অস্পষ্ট স্বাক্ষর

এমন নিদারুণ নির্মম চিঠি জীবনে আমি খুব বেশী পাইনি। সারাদিন ধরে মাথা ঘুরতে লাগলো। একুশ টাকা —একুশ—বাষট্টি—টাকা—নয়া পয়সা, রাতে ভালো করে ঘুম হলো না। শেষরাতে ভালো করে স্নান করলুম, তারপর এক কাপ চা খেয়ে ব্যাঙ্কের এজেন্টকে চিঠি লিখলাম—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার অমুক তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আমার এ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হইয়াছে তাহা আমাকে জানাইয়া সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য আছে।

১৯৫৭ সালের নভেম্বর হইতে এ পর্যন্ত চৌদ্দটি অর্থ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, প্রতি ছয় মাসে যদি দেড় টাকা হয় তবে তাহাতে একুশ টাকা কাটা যাইবে। তদুপরি এই উনআশি মাসে পঁচিশ নয়া পয়সা করিয়া (চেক-বই রাখা বাবদ) উনিশ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা আমার নিকট আপনাদের প্রাপ্য। অর্থাৎ মোট চল্লিশ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা আপনারা এখন পর্যন্ত আমার কাছে পাইবেন। ইহার পরিবর্তে আমার একুশ টাকা বাষট্টি নয়া পয়সা আপনারা কাটিয়াছেন।

আমি সৎ ব্যক্তি, এইরূপ হিসাবে উনিশ টাকা তের নয়া পয়সা আপনাদের ক্ষতি হইতেছে। আমি ইহা হইতে দিতে চাহি না।

আমি আপনাদের ব্যাঙ্ককে আমার নিকটে একটি এ্যাকাউন্ট খুলিতে বলি। আপনাদের কোনো টাকা পয়সা জমা দিতে হইবে না, এই উনিশ টাকা তের নয়া পয়সা জমা থাকিলেই চলিবে, তবে চেক-বই দিতে পারিব না। আর যেহেতু আপনাদের জমা পঁচিশ টাকার কম, আপনাদেরই আইন অনুযায়ী প্রতি ছয় মাসে দেড় টাকা করিয়া কাটিব। এইরূপে আগামী চৌদ্দ বৎসরে আপনাদের

বেয়াল্লিশ টাকা কাটা যাইবে, অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে আপনাদের নিকট হইতে আমি আমার প্রাপ্য অর্থ লইয়া আসিব।

আশা করি, এই আইনসম্মত ব্যবস্থায় আপনাদের কোনোই অসুবিধা হইবে না।

ইতি—

ভবদীয়

পুরনো পল্টন

পল্টনকে নিয়ে আমি এখনো কিছু লিখিনি। কিন্তু না লিখলেই নয়। যাদের নিয়ে ইতিমধ্যে লেখা হয়ে গেছে, তারা রীতিমত গোলমাল শুরু করে দিয়েছে, কেন পল্টন থাকতে আমি তাদের হাস্যাস্পদ করছি।

পল্টনকে নিয়ে যে কিছু লিখিনি তার কারণ একমাত্র এই নয় যে পল্টন খুব শক্তিশালী, তার চেয়েও বড় কারণ পল্টনকে নিয়ে লেখা আরম্ভ করা আর আমার দিদিমার সঙ্গে কথা বলা এক ব্যাপার। বলে কিংবা লিখে শেষ করা যাবে না।

দশ বছর আগের পল্টনের রুটিন বলি। ভোর সাড়ে চারটায় ঘুম থেকে উঠলো পল্টন। তারপর আদাগুড় দিয়ে দেড়পোয়া ছোলা খেলো। খালি গায়ে জাঙ্গিয়া পরে প্রায়ান্ধকার হাজরা রোড ধরে জগন্নাথ ব্যায়ামাগারে প্রবেশ, মিনিট-পনেরো বারবেল ভেঁজে ফার্স্ট ট্রাম ধরে, ঐ পোশাকেই, টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোতে গমন। সেখানে ট্রামের লোকদের সঙ্গে—এই ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর, চেকার এদের সঙ্গে গায়ে পোয়াখানেক তেল মেখে (প্রসঙ্গত ঐ ভোরে বেরুনোর সময় পল্টন তেলের শিশি হাতে নিয়ে বেরুতো) কুস্তি। এই ট্রাম-ডিপোতে কুস্তির ব্যাপারে পল্টনের আশ্চর্য একটা যুক্তি ছিলো, এইভাবে ট্রামের লোকদের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়ে যায় আর ট্রামভাড়া লাগে না। শেষরাত্রে গায়ে তেলমাটি মেখে যার সঙ্গে কুস্তি করেছি, সে কি আর সারাদিন ট্রামভাড়া চাইতে পারে? তখন আমার উদ্দাম বেকার অবস্থা। স্বীকার করি, আমিও প্রলোভিত হয়েছিলাম। কিন্তু হর্বচন সিং নামে এক ভোজপুরী ড্রাইভার প্রথম দিনেই আমার পিঠে হাঁটু দিয়ে এমন ভীষণ জাঁতা দিয়ে ধরেছিলো যে, বিনা ভাড়ায় ট্রাম চড়ার লোভ পরিত্যাগ করতে হলো, জীবনে আর কোনোদিন ইজিচেয়ারে শুয়ে সুখ পেলাম না, এমন কি বিছানায়ও চিৎ হয়ে শুলে সমস্ত শিরদাঁড়া প্রতিবাদ করে ওঠে, খচ্‌খচ্‌ করে শব্দ হয়।

সে যাহোক, পল্টনের কুস্তি শেষ হলে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরতো। কেননা ততক্ষণে বেলা হয়ে গেছে। বিশেষ করে ঐ সময়ে আমাদের পাড়ার মেয়েরা সকালবেলার কলেজে যায়, তার মধ্যে নাকি অনেকেই পল্টনের অনুরাগিণী ছিলো, তাই ব্যায়ামের পোশাকে তাদের সম্মুখীন হতে পল্টনের দ্বিধা ছিলো। কিন্তু তবুও ফেরার জন্যে একটা বাড়তি পোশাক, অন্ততঃ একটা লুঙ্গি কেন পল্টন নিয়ে যেত না, সে বিষয়ে কোনোদিন কিছুই জানা যায়নি পল্টনের কাছ থেকে। কিছু প্রশ্ন করলে স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসেছে। পল্টন-চরিত্রের আরো বহু রহস্যের এই একটি।

ট্যাক্সিতে করে বাড়ি ফিরে, হাতে ধুতি আর গামছা নিয়ে হেঁটে বাবুঘাট, গঙ্গাস্নান। শুনেছি, সেখানে নাকি মিনিট-পনেরো সন্ধ্যা-আহ্নিকও করতো; তারপর আবার পায়ে হেঁটে বাড়ি। এবার

নতুন অধ্যায়। বাড়িতে ফিরে আবার স্নান। চন্দন সাবান দিয়ে স্নান, মাথায় গন্ধ-তেল, বাক্স থেকে ধোপাবাড়ির কাচা তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, সব পাট-পাট নিখুঁত। এক কাপ চা আর দুটো মুচমুচে বিস্কুট খেয়ে পল্টন যেত গানেব ইস্কুলে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান, কমলমুকুলদল খুলিল আর পল্টনের খুব প্রিয় গান ছিলো নানা রঙের দিনগুলি। মিহিগলায় ঝকঝকে পোশাকে গান শিখে, তারপর সকালবেলার আড্ডা দশটা নাগাদ। এই সময়ে প্রতিদিনই পল্টনের সঙ্গে আমার দেখা হতো। আমরা দুজনে প্রতিবেশী এক সম্পাদকের বাড়িতে যেতাম। সেখানে গিয়ে সনেটের রূপ-বৈচিত্র্য এবং আধুনিক কবিতার ক্রমশ পতন বিষয়ে উষ্ণ আলোচনা হতো।

সময়মতো বলে বাখি, পল্টন অনেক খবব রাখতো। একদিন মৃদু-মৃদু হাসছিলো, বললাম, 'হাসছিস কেন?'

বললো, 'জানিস্ বলারামবাবুর ডাকনাম গদাই! ওর মেজোমামা ওকে গদাই বলে ডাকে।' বলরামবাবু তখন এক বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। তার সম্বন্ধে পল্টন এত জানে, এই তথ্য আমাকে খুবই বিচলিত করেছিলো।

আরেক দিন পল্টন বলেছিলো, 'জানিস্ মহেন্দ্রবাবুর ভাইঝি ফেল কবেছে!' মহেন্দ্রবাবুও আরেকজন সম্পাদক। আমি এসব কিছুই জানতুম না, আব ভাবতুম আমার কিছুই হবে না।

সংগীত শিক্ষা এবং কবিতা আলোচনার পর্ব শেষ হলে পল্টন চলে যেতো সায়েন্স কলেজে। ফলিত পদার্থবিদ্যায় কি একটা জটিল গবেষণা, যার উপরে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, বিশেষ করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নাকি নির্ভরশীল ছিলো, তারই দায়িত্ব ছিলো পল্টনের। সেখান থেকে বেলা তিনটে নাগাদ সোজা রেডক্রশ, ফার্স্ট-এডে খুব ভালো ট্রেনিং নিয়েছিলো পল্টন। পরবর্তী জীবনে অবশ্য এই শিক্ষা তার খুব নিজের কাজে লেগেছে। বহুবার নিজেকে ফার্স্ট-এড দিতে হয়েছে পল্টনের।

অবশ্য এর মধ্যে সময় পেলে একবার স্টুডিওপাড়া থেকে ঘুরে আসতে হতো তাকে। কি একটা ফিল্মে কখনো সহকারী পরিচালক, কখনো টেকনিশিয়ান, কখনো পার্শ্বচবিত্রে অভিনয়—কি যেন করার কথা ছিলো তাব, সে নিজেও ভালো করে জানতো না।

তারপর অপরাহ্ণে প্রেম।

প্রেম করতে বড় ভালোবাসতো পল্টন। ষোলো বছর বযস থেকে। মল্লিকমশায বলতেন, সোলো (solo) পারফরমান্স। সেই শুরু, তারপর একযুগ অতিক্রান্ত, হাজরা মোড়ের বুড়ো ভিখারী মরে গেলো, তার ছেলেরা এখন ভিক্ষা করছে, রাজেনবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেলো, মল্লিকমশায় হাকিম হয়ে গেলেন, আমি মাইনে-করা হাস্যরসিক হয়ে গেলাম—আরো কত কি হলো, এমন কি পল্টন পর্যন্ত পাড়া ছেড়ে চলে গেলো কিন্তু প্রেম তাকে ছাড়লো না।

জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। পল্টন নামলো, সাঁতার শিখলো, সাড়ে তিনশো টাকা খরচ করে মিলান থেকে নীল ডোরাকাটা সুইমিং কস্টুম আনালো, দেড় মাস অনবরত চিড়িয়াখানায় গেলো, ছয় মাস পার্ক স্ট্রীটে ফরাসী ভাষা অধ্যয়ন করলো, একদিন হাজরা পার্কে বক্তৃতা করলো, ভুখা-মিছিলের সামনে কালো ফ্ল্যাগ নিয়ে চৌদ্দ মাইল রাস্তা হেঁটে অজ্ঞান হয়ে গেলো—কত কি করলো পল্টন, সবই সেই মীনকেতনের অলক্ষ্য নির্দেশে।

ষোলো বছরের পল্টনের প্রথম প্রেমের অরুণরাগরঞ্জিতা দুলালীকে নিয়ে রসিকতা এককালে অনেক করেছি। এখন আর সাহস নেই। দুলালীর তৃতীয় মেয়েকে সেদিন দেখলাম, সবে

কয়েকটা দুধ-দাঁত উঠেছে, হঠাৎ অতর্কিতে আমার হাঁটু কামড়ে দিয়েছিলো, তার ওপরে দুলালীর স্বামী রাইফেল ফ্যাক্টরীতে কাজ করে—কোনো রসিকতা এখানে এখন আর চলবে না।

বরং মাধুরীকে নিয়ে চলতে পারে। পল্টনকে বড় কষ্ট দিয়েছিলো মাধুরী।

শিখ সর্দারজীদের মত পল্টন একদিন একটা পাগড়ি মাথায় দিয়ে চলে এলো, বললো, 'আজ থেকে দাড়ি রাখছি।'

'কি ব্যাপার?' আমাদের সকৌতূহল প্রশ্নের উত্তরে পল্টন জানালো, 'মাত্র পৌনে চার টাকা, জগুবাবুর বাজারে, ভীষণ চীপ্।'

মল্লিকমশায় বললেন, 'দাড়ি রাখতে পৌনে চার টাকা খরচ, কি সাংঘাতিক! এ দামে দাড়িসুদ্ধ ছাগল পোষা যায় মশায়।'

পল্টন মল্লিকমশায়ের কথা শুনেই খেপে যায়, 'দাড়ির কথা কে বলেছে মশায়, পাগড়ির কথা বলছি।'

মল্লিকমশায় কিন্তু থামলেন না, 'ও পাগড়ি—আপনি পুলিশে চাকরির চেষ্টা করছেন, বলেননি তো।'

একটা হাতাহাতি হয়ে যেতো, যদি আমরা না থাকতাম; তাছাড়া পাগড়ির ব্যাপারটা কি তাও আমাদের জানা দরকার। জিজ্ঞেস করতে পল্টন মৃদু হাসলো, আবার প্রশ্ন আবার মৃদু হাসি। কিঞ্চিৎ লাজনম্রতাও যেন জড়িত ছিল সে হাসির সঙ্গে! সন্দেহ হলো ব্যাপারটা প্রেমঘটিত। মল্লিকমশায় টোপ ফেললেন, 'বাঙালী মেয়েদের আজকাল বড় পাগড়ি, তলোয়ার দাড়ি, এইসব সর্দারজীদের প্রতি খুব ঝোঁক হয়েছে।

পল্টন মৃদু হাসতে লাগলো, তারপর মুখ খুলে একটা শব্দ উচ্চারণ করলো, 'মাধুরী'!

মজুমদারসাহেব তখন অবিবাহিত, শ্রীমতী মজুমদার তখনো নেপথ্যে, প্রেমট্রেম ব্যাপারে তখন আমরা তাঁকে অথরিটি বলে মান্যগণ্য করি। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে!' তারপর পল্টনকে কি একটা গোপন ইঙ্গিত করলেন, পল্টন আর মুখ খুললো না।

অনুমান করি, এর পরে পল্টনকে তিনি কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। পল্টন দিন-সাতেকের পরে একদিন এসে বললো, 'ট্যাক্সির ব্যবসা করবো, আমার একটা ট্যাক্সির পারমিট চাই।'

মল্লিকমশায় বললেন, 'ট্যাকসির পারমিট পেতে খুব অসুবিধে। তার চেয়ে আপনি কিছুদিন বাস কন্ডাক্টারি করুন।'

পল্টন আবার মারমুখী। অদমিত মল্লিকমশায় বললেন, নিশ্চয় মজুমদারসাহেবের পরামর্শ। আপনি পুরোপুরি সর্দার হয়ে যেতে চাইছেন। প্রেমের জন্যে, ঐ বোকা মাধুরীর জন্যে বাঙালিত্ব বিসর্জন দিতে আপনার দ্বিধা হচ্ছে না!'

'বোকা মাধুরী?' এই রকম কি একটা প্রশ্নবোধক চীৎকার করে পল্টন এমন সময় লাফিয়ে উঠলো যে মল্লিকমশায় না হয়ে অন্য কেউ হলে অজ্ঞান হয়ে যেতো। কিন্তু ঐ লাফে পরেই পল্টন ঘরের থেকে বেরিয়ে গেলো। বোঝা গেলো আর সহজে আসছে না। অন্ততঃ মল্লিকমশায়ের সামনে তো নয়ই।

দিন যেতে লাগলো। পল্টনের পাগড়ির রং ঘন ঘন পাল্টাতে লাগলো। দাড়ি ঘন থেকে ঘনতর হলো, হাতে লোহার বালা উঠলো। আহাঁটু-লম্বিত কোর্তা আর সংক্ষিপ্ততম নিম্নাঙ্গের

পোশাক। রাস্তায় দেখা হলে পল্টন আর আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। আমরাও বাঁচোয়া। কে একজন এসে খবর দিলো, পরেশনাথের মিছিলে সকলের আগে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে পল্টন, শোনা গেলো নিয়মিত গুরুদ্বারে যাচ্ছে। অথচ কোনো সূত্রেই এমন কিছু দেখা বা শোনা গেলো না যাতে জানা যায় যে মাধুরী পল্টনের নিকটবর্তিনী হয়েছে।

মাসখানেক পরে খবর পাওয়া গেলো মজুমদারসাহেবের কাছে। মজুমদারসাহেব বললেন, 'আরে মশাই, মেয়েটা ভয়ঙ্কর দুষ্টু। ওর বাপ টাকা ধার করেছে কোন্ এক কাবুলির কাছে। ওর ধারণা কাবুলিরা শিখদেব ভয় পায়। আর তাই শিখ সাজিয়ে পল্টনকে বাড়ির চারপাশে ঘোরাচ্ছে, যাতে ওর বাবাকে ধারটার শোধ করতে না হয়।'

অবশেষে নিদারুণতম ঘটনাটি ঘটলো। ধর্মের অঙ্গ হিসেবে আঠারো ইঞ্চি লম্বা ভোজালি কিনতে গিয়ে অস্ত্র-আইনে পল্টন পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। মাধুরী নাকি বলেছিলো, 'ওটাও চাই।' মল্লিকমশায় থানায় গিয়ে জামিন হয়ে পল্টনকে ছাড়িয়ে আনলেন।

পল্টন কিন্তু মাধুরীকে ছাড়ল না।

উচিত শিক্ষা হয়েছিলো মাধুরীর। মাথার উপরে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর আছেন, আর আমাদের হাজরার চৌমাথায় ছিলো জনার্দন।

জনার্দন আর নেই, জনার্দন সাম্রাজ্যের কেউই প্রায় নেই আর আজ। এখন এতদিনে পল্টন-মাধুরী প্রণয়কাহিনীর সুযোগে একটু জনার্দনলীলা বর্ণনা করা যেতে পারে। জনার্দন-স্মৃতিচারণ যেমন মধুর তেমনই রোমাঞ্চকর।

কলকাতার রাস্তায় সততসঞ্চারমান জনার্দন এবং তার সঙ্গীদের, ধর্মের ষাঁড়গুলিকে, আজ অনেকদিন লালবাবার আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরীহ নাগরিকেরা হয়তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন, কিন্তু আমরা যারা শক্তির পূজারী, আমাদের এতে বিশেষ মনোবেদনা হয়েছে।

দক্ষিণে মনোহরপুকুর, উত্তরে আশুতোষ কলেজ, পশ্চিমে কাটা গঙ্গা আর পুবে ল্যান্সডাউন এই ছিলো জনার্দনের সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক সীমা। অবশ্য একাধিকবার তাকে এই এলাকার বাইরেও দেখেছি। হিন্দী সিনেমার পোস্টার খেতে খুব ভালোবাসতো জনার্দন। একবার চেতলা হাটে সস্তায় গামছা কিনতে গিয়ে দেখেছিলুম, নিচু নিচু চালা দোকানঘরের বেড়া থেকে স্বল্পবসনা সুললিতা নায়িকার ছবি আপাদমস্তক চিবিয়ে খাচ্ছে। গড়িয়াহাট ফাঁড়ির কাছে এক সন্ধ্যায় অপর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করে দেড় ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যাম রাখবার কৃতিত্বের অংশীদারও জনার্দন। তবু একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যেই রাজত্ব করতে ভালোবাসতো সে।

জনার্দন নাম কে দিয়েছিলো, বলতে পারবো না। আমরা যতদিন কালীঘাট পাড়ায় আছি এই নামে এই ষাঁড়টিকে দেখে এসেছি। আমাদের পাড়ার সমস্ত সামাজিক ব্যাপারেই জনার্দনের কিঞ্চিৎ দায়িত্ব ছিল। ভজগোপালের ছোড়দির বিয়ে, বেপাড়ার বরযাত্রীরা ভীষণ হৈ-হল্লো করছে, কেউ কিছু বলতেও পারছে না, হঠাৎ একটা পানের দোকানের সামনে থেকে তিনজন বরযাত্রীকে তাড়া করে সোজা আশুতোষ কলেজের দোতলায় উঠিয়ে দিয়ে সারারাত জনার্দন গেটে বসে রইল। অভুক্ত, বিনিদ্র সেই বরযাত্রীদের অপর সঙ্গীরা সেদিন রাত্রে পরে বড় চুপচাপ ছিল, কোনো হৈ-চৈ নেই, রাস্তায় ছুঁচোবাজি নেই। ভোর চারটায় জনার্দন গেট ছেড়ে যখন মোড়ের দিকে এলো তখনই শুধু সুযোগ পেয়ে সেই বরযাত্রীরা দোতলা থেকে নেমে, বিয়েবাড়ি নয়, সোজা ট্যাকসি করে কোথায় চলে গেলো।

জনার্দনের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ছিল, (হিন্দী সিনেমার পোস্টার বাদে অবশ্য) আতরমাখানো রুমাল আর কাটা ঘুড়ি।

আমাদের পাড়ায় রুমালে সেন্টমাখা উঠেই গিয়েছিল জনার্দনের আমলে। কিন্তু অন্য পাড়ার লোকেরা জানবে কি করে? ট্রাম থেকে নামলেন শৌখিন ভদ্রলোক, পকেটের কোণায় বেরিয়ে রয়েছে সিল্কের রুমালের কোণকাটা ফুল। ইভনিং ইন প্যারীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আলস্যমন্থর গতিতে জনার্দন এগুলো ভদ্রলোকের পাশে। কিছু বুঝবার আগে কিংবা বুঝতে বুঝতেই জনার্দন জিভ বাঁকিয়ে পকেট থেকে তুলে রুমালটা চিবোতে লাগলো। দু-একবার দেখেছি রুমালের সঙ্গে মানিব্যাগও উঠে এসেছে, কিন্তু জনার্দন মানিব্যাগ খেতো না, একটু চিবিয়েই ফেলে দিতো।

দোকানে দোকানে বিক্রির জন্যে ঘুড়ি টাঙ্গানো থেকেছে, কিন্তু জনার্দন সেদিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। তার অপরিসীম উৎসাহ ছিল কাটাঘুড়ি খাওয়ায়। বিশ্বকর্মা পুজোর সময় দেখেছি, কঞ্চি হাতে, বাঁশ হাতে ছেলেরা ছুটোছুটি করছে এদিক থেকে ওদিক। ভো-কাটা-ভো, এই একটা ঘুড়ি কাটলো—জনার্দন আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে কাটা ঘুড়িটা দেখলো, তারপর কখনো হেলতে দুলতে কখনো ছুটে চললো ছেলেদের সঙ্গে। অত্যন্ত কায়দা করে গা বাঁচিয়ে যাতে কারোর বিশেষ কোনো চোট না লাগে, শিং দিয়ে একে একটা আলতো গুঁতো দিয়ে ওকে ছোট একটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সর্বশেষ সে এক অত্যাশ্চর্য শারীরিক কৌশলে সামনের পা দুটো আকাশের দিকে তুলে গলা বাড়িয়ে ঘুড়িটাকে জিভ দিয়ে ধরে ফেলতো। এই প্রতিযোগিতায় হেরে হেরে শেষে আমাদের পাড়ার ছেলেরা ঘুড়ি ধরা ছেড়েই দিয়েছিল। দীর্ঘকাল আমাদেব পাড়া থেকে খবরের কাগজে ঘটনা দুর্ঘটনায় 'ঘুড়ি ধরিতে গিয়া বালকের মৃত্যু' এই রকম কোনো সংবাদ বেরোয়নি আর।

জনার্দনের এসব ব্যাপারের তবু ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু তার কতকগুলি আচরণ আমাদের বুদ্ধিরও অগম্য ছিল। ট্রাফিক সিগন্যাল আশ্চর্য বুঝতো, পুলিশের হাত দেখলেই মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়তো, হাত নামালে তবে রাস্তা পার হতো। যখন ট্রাফিক লাইটিং-এর ব্যবস্থা হলো, একদিন দেখলাম জনার্দন খুব গম্ভীর হয়ে লালসবুজ আলোগুলো লক্ষ্য করছে, তারপর থেকে সবুজ আলো না দেখে রাস্তা পেরুতো না।

রামপ্রসন্নবাবুর ভাগিনেয়ী যে সন্ধ্যাবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতো আমরা কোনোদিনই টের পেতুম না, যদি-না একদিন অন্ধকাবে তিনতলার চিলেকোঠায় জনার্দন উঠে যেতো। সেদিন রুষ্ট ষন্ডের আক্রমণ থেকে গোপন প্রেমিকের আত্মরক্ষা অসম্ভব ছিল, যদি সে (পরে জানতে পেরেছিলাম) সে-বছর লং ডিস্ট্যান্স জাম্পের বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন না হতো। এক লাফে প্রেমিকের বাহুপাশ থেকে পাশের বাড়ির ছাদে, তারপর হৈ-চৈ, চোর-চোর, জনার্দন, রামপ্রসন্নবাবুর ভাগিনেয়ীর ফোঁপানি ইত্যাদি সে এক কেলেঙ্কারি।

পল্টনকেও জনার্দনই রক্ষা করেছিলো। আমাদের সাধারণতঃ জনার্দন কিছু বলতো না, শুধু আমাদের পাড়ার মতির একটু পানদোষ ছিলো, একবার প্রথমদিকে যখন সে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতো সেই সময় একদিন তাড়া করে জনার্দন তাকে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো, নেশা না কাটা পর্যন্ত ছাড়ে নি, ডাস্টবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে ফোঁসফোঁস করেছে। শেষে মতির বাড়ির লোকেরা এবং আমরা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, জনার্দনও আর মতিকে কিছু বলতো না, তবে বেপাড়ার মাতালদের সঙ্গে নিয়ে এলে তাদের গুঁতিয়ে একাকার করে দিতো।

পল্টন যখন দাড়ি রাখলো, পাগড়ি চাপালো তখন একদিন পল্টনের দিকেও তেড়ে গিয়েছিলো জনার্দন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলেনি। তবে চোখে একটা ওয়ার্নিং ছিলো, যাকে বলা যেতে পারে অনুক্ত সাবধানবাণী। জনার্দনের সেই রোষ-কষায়িত লোচন যে দেখেনি সে জানে না ব্যাপারটা কি। কিন্তু সামান্য একটা ষাঁড়ের চোখরাঙানিতে প্রেমে ইস্তফা দেবে পল্টনের গোঁয়ার্তুমি এত কম ছিল না।

ইতিমধ্যে জনার্দন খুব দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলো, একটু বেপরোয়াই বলা যেতে পারে। একটা ঠেলাগাড়িওয়ালা পথ আটকিয়ে রাখার জন্যে তাকে কি সব কটূক্তি করেছিলো, জনার্দন ঠেলাওয়ালাকে কিছু বললো না, তাড়া করে তাকে অন্য ফুটপাথে তুলে দিয়ে ফিরে এসে নৃশংসভাবে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ঠেলাটাকে একেবারে চুরমার করে ফেললো। সেইদিন রাত্রেই জনাপাঁচেক ঠেলাওলা একত্র হয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জনার্দনকে খুব মোটা দড়ি দিয়ে জড়িয়ে ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে বেঁধে ওর শিং দুটো একেবারে নির্মূল করে কেটে দিলো। এর পরে দিন-কয়েক জনার্দনকে বড় নির্জীব, অসহায় বলে মনে হলো আমাদের। কোনোদিন তেল মাখানো হয়নি, কিন্তু ওরকম তৈলমসৃণ শৃঙ্গ বিশেষ দেখা যায় না। শিং কাটার পর জনার্দনকে মুকুটহীন সম্রাটের মতো মনে হতো।

পল্টন-মাধুরী পর্ব তখন প্রায় জমে এসেছে। মজুমদারসাহেব সাড়ে বারো গজ কাপড় দিয়ে বিশাল ঘের দেয়া এক পাজামা করিয়ে দিয়েছে হাওড়া হাটের পাশের এক খাঁটি পাঞ্জাবী দরজির দোকান থেকে পল্টনকে। সেই পাজামা, গোলাপি কোর্তা, দাড়ি, জরির ঝিলিক-লাগানো পাগড়ি— পল্টনকে আমরা বেশ এড়িয়ে এড়িয়েই চলতুম। কিন্তু মাধুরী বেশ ঘন হয়ে এলো।

মধ্যে মধ্যে মাধুরীকে দেখা যেতে লাগলো পল্টনের সঙ্গে। সেই সময়ের একদিনের ঘটনা।

আমরা মোড়ের মাথায় রেলিংয়ের উপর বসে সিগারেট খাচ্ছি, আর মাঝে মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে উদাস মন্তব্য করছি। এমন সময় মজুমদারসাহেব বললেন, 'ঐ যে পল্টন!'

তাকিয়ে দেখে আমি বললুম, 'আসুন চ্যাঁচাই।'

মজুমদারসাহেব আপত্তি জানালেন, 'না, দেখছেন না সঙ্গে মেয়েটি রয়েছে।'

সত্যিই মাধুরী রয়েছে, গদগদভাবে কিসব বলছে, আর পল্টন খুব গর্বিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। চ্যাঁচাতে হলে এই তো সময়।

আমি বললুম, 'চ্যাঁচানোর সুবর্ণ সময়!'

মজুমদারসাহেব উত্তেজিত, 'আপনার কোনো সেন্স অফ এটিকেট নেই মাথায়। একটি মেয়ের প্রেমকে মর্যাদা দিতে শিখুন।'

মর্যাদা দিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এই বিচিত্র নাটকীয় প্রেমের মর্যাদা কিন্তু জনার্দন দিলো না। হঠাৎ পল্টনের গলার স্বর বেশ ভীত এবং উত্তেজিত, 'এই মাধুরী, চট করে এই দোকানটার ভিতরে চলে এসো।'

ওপাশের ফুটপাথে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটতে কাটতে এতক্ষণ জনার্দন নির্বিকারভাবে পল্টন-মাধুরীকে দেখছিলো, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে। জনার্দনের মেজাজের সঙ্গে পল্টন আমাদের মতই সুপরিচিত, সুতরাং সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মাধুরী প্রতিবাদ জানালো,'হঠাৎ দোকানে ঢুকবো কেন, কি ব্যাপার? এই মোড়ের মাথাতেই একটু দাঁড়াই না?'

'আরে, ঐ ষাঁড়টা আসছে যে!' পল্টনের কথা শুনে মাধুরী যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন রাস্তা

পার হচ্ছে জনার্দন ধীব মন্দ গতিতে, দেখলে কিছু অনুমান করাই কঠিন।

মাধুরী যেন একটু চটেই গেলো, 'মাথা খারাপ হলো নাকি? ষাঁড়টা কি করবে?'

'কি আর করবে, গুঁতো দেবে! যা বলছি শোনো, এই দোকানের ভিতরে চলে এসো।' পল্টন চাচা-বাঁচা থিয়োরী অনুসরণ করে একাই দোকানে ঢুকে পড়লো।

'একটা নিরীহ শিং-কাটা ষাঁড়কে এত ভয়...

'কথাটা শেষ করতে পারলো না মাধুরী— করুণ আর্তনাদে আমরা ছুটে গেলাম বিশেষ কিছু না পর পর দুটো গুঁতো—কাটা শিংয়ে এর বেশি প্রয়োজন ছিলো না। শাড়ির চার জায়গা থেকে চারটে ছেঁড়া টুকরো, তিনটে চুলের কাঁটা, সামান্য রক্ত, কয়েকটি দ্রুত দীর্ঘশ্বাস আর গোটা দশেক ভাঙা লাল কাঁচের চুড়ি হাজরার মোড়ের ফুটপাথে একটি অসম্পূর্ণ প্রেম-কাহিনীর উপর যবনিকা টেনে দিলো।

রেটটা একটু কমান

শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্তী একজন ছাপোষা মানুষ। কলকাতায় একটি সরকারী চাকরি করে কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালান।

হরিমোহনবাবু নিজেকে খুব বুদ্ধিমান লোক বলে কখনোই মনে করেন না। এবং সত্যিই তিনি হয়তো বাজার-চালু চৌকশ লোক যেমন সচরাচর দেখা যায় তার মধ্যে পড়েন না। মোটামুটি ধুতি পাঞ্জাবি পরা উত্তর কলকাতার দু'ঘরের ফ্ল্যাট বাড়িতে বসবাস করা নিজের হাতে প্রতিদিন শাক-কাঁচালঙ্কা তরকারি ছোট মাছ বাজার করা নিতান্ত আটপৌরে মানুষ হরিমোহনবাবু।

এই ক্ষুদ্র কথিকায় আমরা হরিমোহনবাবুর দেশকাল, অফিস-পরিবার, ভূত-ভবিষ্যৎ ইত্যাদির মধ্যে মাথা গলাবো না। সেটুকু কাল্পনিক দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকার উপরে ন্যস্ত করলাম। তবে আসল গল্পে প্রবেশ করবার আগে খুব বেশি চালাক বা বুদ্ধিমান না হওয়ার জন্যে হরিমোহনবাবুর যে কোনো ক্ষতি হয়নি তার একটা উদাহরণ দেবো।

জুন মাসের পর থেকে কলকাতার ময়দানের ফুটবল দর্শকদের ভিড়ে ও অত্যাচারে অফিস ছুটির পর নিয়মিত অফিস যাত্রীদের ট্রামে-বাসে চড়ে ঘরে ফেরা অসম্ভব হয়ে ওঠে। হরিমোহনবাবু মোটেই ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন না। এদিকে ছুটির পর অফিসে বসে থাকাও তাঁর মোটে পছন্দ নয়। তিনি একটা বুদ্ধি বার করেছেন—রেড রোড আর মেয়ো রোডের মোড়ে যেখানে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিটা বর্তমানে আছে, সেই মূর্তির পাদদেশে একটা রেলিংয়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করেন, কখনো পঞ্চাশ পয়সার বাদাম বা ঝালমুড়ি কিনে খান।

সেদিনও ঐ রেলিংয়ে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। দুপুরে অফিসে খুব ঝকমারি গেছে, খুব ক্লান্ত ছিলেন, ময়দানের স্নিগ্ধ বাতাসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ঘুম ভাঙল হঠাৎ একটা লোকের ঝাঁকুনিতে।

ধড়মড় করে উঠে হরিমোহনবাবু দেখেন যে তাঁর সামনে উঁচু হয়ে বসে একটা লোক। লোকটার পরণে লাল প্যান্ট, সবুজ গেঞ্জি, গলায় হলুদ রুমাল গিট দিয়ে বাঁধা, হাতে একটা পিস্তল, মুখে হিন্দি না উর্দু কি একটা ভাষা।

ভাষার দরকার ছিলো না। অন্য যে কোনো ব্যক্তি এক মুহূর্তে ধরতে পারবে এই পিস্তলধারী একজন ডাকাত, চলতি ভাষায় ছিনতাইকারী। সে হরিমোহনবাবুকে ঘড়ি আংটি পকেটের মানিব্যাগ ইত্যাদি দিয়ে দেবার জন্যে ভয় দেখাচ্ছে।

বলা বাহুল্য, হরিমোহনবাবু ভিন্ন অন্য যে কোনো ব্যক্তি হলে প্রাণভয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি আংটি, টাকা লোকটির হাতে তুলে দিয়ে বড় রাস্তার দিকে চোঁ চোঁ দৌড় দিতো।

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, হরিমোহনবাবু তেমন বুদ্ধিমান লোক নন। ঘুম-চোখে তাঁব মনে হলো, লোকটির চেষ্টা বোধহয় তাঁর কাছে রিভলভারটি বিক্রি করার, তাই চোখের সামনে ঐ অস্ত্রটা নাচাচ্ছে। হরিমোহনবাবুর ঘুণাক্ষরেও মনে এলো না যে, লোকটা ভয় দেখিয়ে ছিনতাই করার জন্যে রিভলভারটা তাক করেছে।

ছিনতাইকারী যত রিভলভার নাচায় হরিমোহনবাবু তত বলেন, 'হাম গভরমেণ্ট সারভেণ্ট হ্যায়। বে-আইনি আগ্নেয়াস্ত্র হামকো নেহি লাগে গা।'

পিস্তলধারী রিভলভার নাচাতে নাচাতে হাতে ব্যথা হয়ে গেলো, কিন্তু হরিমোহনবাবু যে ভাবে তাঁর হরি ঘোষ স্ট্রীটের একতলার ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে হাত নেড়ে দৈনিক অসংখ্য ফেরিওলাকে বিদায় করেন 'নেহি লাগে গা, নেহি লাগে গা' বলে, ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে উদ্যত পিস্তলের ছয় ইঞ্চি দূরে হাত তুলে মানা করতে লাগলেন, 'নেহি লাগে গা' বলে। মিনিট দশেক পরে হতভম্ব, ক্লান্ত পিস্তলধারী দূর শালা' বলে রণে ভঙ্গ দিলো, 'হরিমোহনবাবু ধীরেসুস্থে উঠে শ্যামবাজারের ট্রামের দিকে এগোলেন, একবার শুধু ভাবলেন, কি দিনকাল পড়েছে রে বাবা। জিনিস না কিনলে 'শালা' বলে গালাগাল দিচ্ছে!

হরিমোহন চক্রবর্তী মশায়কে নিয়ে আমাদের গল্প, সে কিন্তু এখানে নয়, এর থেকে আরেকটু পরে—ঠিকঠাক বলা উচিত চার মাস পরে।

চক্রবর্তী মশায়ের ছোট বোন থাকেন রাঁচীতে। পাগলা গারদে নয়, সেখানে তাঁর বিয়ে হযেছে কয়লা কোম্পানির এক এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। হরিমোহনবাবুই বোনটির বিয়ে দিয়েছেন, তার ছেলের অন্নপ্রাশনে। মামা হিসেবে হরিমোহনবাবুর উপস্থিতি আবশ্যক, কারণ মুখেভাত তাঁকেই করাতে হবে।

কলকাতা-রাঁচীর দূরপাল্লার সরকারী বাসে একটা টিকিট কেটে হরিমোহনবাবু অন্নপ্রাশনের ঠিক দুদিন আগে উঠে বসলেন। চমৎকার যাচ্ছিলো বাসটা। হরিমোহনবাবু সামনের দিকে সিট পেয়েছিলেন, বিশেষ ঝাঁকুনি লাগছিলো না। সিটে গা এলিয়ে দিয়ে চমৎকার আরামেই যাচ্ছিলেন তিনি।

তখন অনেক রাত। বাংলা-বিহার সীমান্ত এলাকা প্রায় আধ ঘণ্টা আগে পেরিয়ে গেছে বাস। আধা জংলি এলাকা দিয়ে দ্রুতগতি ছুটে চলেছে সরকারী দূরপাল্লা। আধো-জাগরণ, আধো তন্দ্রার মধ্যে কিছুটা চেনা স্বপ্নের মতো কি যেন মনে হলো হরিমোহনবাবুর।

সেই লাল প্যাণ্ট, সবুজ গেঞ্জি, হলুদ রুমাল, হাতে পিস্তল—চার মাস আগে ময়দানে দেখা লোকটি বাসের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর এদিকে-ওদিকে সিটে পাঁচ-সাতজন ব্যক্তি উঠে এসেছে, তাদের হাতেও পিস্তল অথবা ছোরা। এতক্ষণ এরা যাত্রী সেজে সকলের সঙ্গে বসেছিলো।

এবার অবশ্য অন্য সকলের সঙ্গে হরিমোহনবাবুও বুঝতে পারলেন, এরা সব ডাকাত। তবু তিনি একটু ভরসা পেলেন ময়দানের সেই চেনা ছিনতাইকারীকে দেখে।

ইতিমধ্যে বাসের ভিতরে পুরোদস্তুর ছিনতাই শুরু হয়ে গেছে। সবুজ গেঞ্জি, লাল প্যান্ট ময়দানী গুণ্ডা, সেই দলের নেতা, সে সামনাসামনি হরিমোহনবাবুর সিটের পাশে এসে দাঁড়ালো। সেই এখন নির্দেশ দিচ্ছে।

একজন ডাকাত পিছনের সিট থেকে শুরু করেছে, আরেকজন সামনের সিট থেকে। তদের লক্ষ্য হলো শুধু ঘড়ি টাকা আর সোনা। এ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভার বাড়াতে কে চায়?

কিন্তু দূরপাল্লার বাসে সোনা অতি মহার্ঘ। কেউ, এমন কি নতুন বৌ পর্যন্ত সোনা গায়ে এসব ডাকাতির বাসে ওঠে না।

হরিমোহনবাবুর স্ত্রীও আসার সময়ে বুদ্ধি করে বাঁ হাতের মধ্যমা থেকে বিয়ের আংটি খুলে বেখেছেন। হরিমোহনবাবুর সঙ্গে একটি পুরনো ঘড়ি, পকেটে সাতাশি টাকা আর ভাগ্নের জন্যে কেনা রুপোর থালা-চামচ। সব বাসের ছাদে সুটকেসের মধ্যে রয়েছে।

ইতিমধ্যে যে ঘটনাবলী বাসের মধ্যে শুরু হয়েছে সে শুধু রোমহর্ষক নয়, চিন্তা উদ্দীপক। সামনের এবং পিছনের সিটের দিক থেকে দুই ডাকাত ছিনতাই করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সেই ময়দানী পিস্তলধারী, যে দলের সর্দার, সে প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দুই ভাবে। এক, ঘড়ির দিক দিয়ে দুই টাকার দিক দিয়ে।

টাকা আর ঘড়ির কথাটা একসঙ্গেই বলি। সিট নম্বর ধরে ধরে সামনের এবং পিছনের দিক থেকে ছিনতাইকারীরা একেকজন যাত্রীর কাছে যাচ্ছে এবং যাত্রীদের হাতে ঘড়ি থাকলে সময় কত জানতে চাইছে। সময়টা মোটা দাগে বললে চলবে না, দুটো কিংবা সোয়া দুটো এরকম বললে সঙ্গে সঙ্গে ছোবাব বাঁট দিয়ে মাথায় ঠুকে দিচ্ছে হতভাগ্য যাত্রীর, চাপা গলায় হিস হিস করে উঠছে, 'কি টাইম বলো!' ঠিক টাইম মানে দুটো তেরো মিনিট বারো সেকেণ্ড অথবা দুটো সাত মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ড—সে যাই হোক, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় বলতে হবে।

সময় জানাব সঙ্গে সঙ্গে ছিনতাইকারীটি বিলে করে দিচ্ছে ঠিক সময়টা সেই ময়দানী সর্দারের কাছে, যে খাতা পেন্সিল নিয়ে হরিমোহনবাবুর সিটের পাশে বাসের রডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরে কত টাকা পাওয়া গেলো যাত্রীটির কাছ থেকে সেটাও জানানো হচ্ছে তাকে।

ব্যাপারটা এই রকম, 'সাত নম্বর সিট, দুটো বেজে চৌদ্দ মিনিট তিরিশ সেকেণ্ড, সাতাশ টাকা, সোনা নেই।' সিটের পাশের ডাকাত চেঁচিয়ে জানালো, সর্দার নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা প্রথমে দেখলো। তারপর বললো, 'ঘড়ি নেহি লাগেগা। কিন্তু টাকার ব্যাপারে কিছু না বলে টাকার অঙ্কটা সিট নম্বরের পাশে নোট করে নিলো।

হরিমোহনবাবু একটু অবাক হয়ে গেলেন ঘড়ির ব্যাপারটা দেখে! টাইম দেখে সর্দার কোনো কোনো ঘড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, আবার কোনো ঘড়ি নিয়ে নিতে বলছে।

সরল প্রকৃতির হরিমোহনবাবু স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে নিতান্ত কৌতূহলবশত ছিনতাই সর্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সব ঘড়ি আপ কেন নেহি লেগা?'

লাল প্যান্ট সবুজ গেঞ্জি হলুদ রুমাল সর্দার একবার হিমশীতল দৃষ্টিতে হরিমোহনবাবুর দিকে তাকালো, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে বুঝিয়ে বললো যে পুরনো ঘড়ি ভালো না হলে আজকাল কেউ কিনতে চায় না। নতুন ইলেকট্রনিক ঘড়ি পঁচিশ-ত্রিশ টাকাতেই পাওয়া

যাচ্ছে। তাই খুব ভালো না হলে পুরনো ঘড়ি নিয়ে বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই, এর খদ্দের পাওয়া যাবে না। টাইম মিলিয়ে যো ঘড়ি রাইট টাইম দেতা হ্যায় শুধু সেই ঘড়িগুলিই কেড়ে নেয়া হচ্ছে।

হরিমোহনবাবু দ্রুত সর্দারের হাতের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে দেখলেন, প্রায় কাঁটায় কাঁটায় মিল রয়েছে। সর্বনাশ! কিন্তু ঘড়িটা তো একটু সাহস করলেই রক্ষা করা যায়। একটু সাহস করলেন হরিমোহনবাবু। সর্দারটি যেই অন্য এক যাত্রীর অর্থের পরিমাণ নোট করছে, হরিমোহনবাবু ঘড়ির চাবি তুলে ঘড়িটাকে আধ ঘণ্টা ফাস্ট করে দিলেন। বুকটা একটু দুরু দুরু করেছিলো, কিন্তু সর্দার কিংবা অন্য ডাকাতেরা কেউ দেখতে পায়নি।

ফলে সামনের দিকের লুট আহরণকারীটি যখন হরিমোহনবাবুর সিটে এসে পৌঁছলো তখন শুধু সাতাশি টাকার উপর দিয়ে গেলো। রাঁচীতে বোনের কাছ থেকে ফেরার ভাড়াটা নিতে হবে এই একটু অস্বস্তি হলেও, তিনি অল্পের উপর দিয়ে হলো এই ভেবে মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন।

কিন্তু এর পরে আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হরিমোহনবাবু এবং বাসের অন্যান্য যাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

টাকাপয়সা ঘড়ি সব সংগ্রহ হয়ে গেলে সর্দার খুব অভিনিবেশ সহকারে একটি লম্বা যোগ করলো, সাতাশশো তেত্রিশ টাকা আর সঠিক টাইমওলা ঘড়ি মিলেছে মাত্র দুটি।

হরিমোহনবাবু দেখলেন সেই ঘড়ি দুটির পাশে টু-ইনটু ফিফটি অর্থাৎ একশো টাকা হিসেব ধরা হলো। একেবারে পাকা হিসেব 2×50=100 এইভাবে লেখা। সুতরাং যোগ দিয়ে মোট আটাশশো তেত্রিশ। টাকার পরিমাণ দেখে প্রচুর ভ্রূকুঞ্চন এবং জিব দিয়ে চুক চুক করলো সর্দার এবং তাঁর সাকরেদরা। তারপর কিছুক্ষণ থম মেরে থেকে সর্দার তার সাকবেদদের বললো, টাকা, ঘড়ি যার যার তাদের ফেরৎ দিয়ে দাও।

ঘটনার এই বিবর্তনে হরিমোহনবাবু সমেত সবাই অবাক। সর্দার চেঁচিয়ে বললো, 'সামনের পুলিশ ফাঁড়িতে বাসে দারোগা উঠবে। তাকে সাঁচ বাত (সত্যি কথা) বলবেন, বলবেন ডাকাতি হয়নি।'

একটু দূরে রাস্তার পাশে একটা ছোট শহরের রাস্তায় আলো জ্বলছে, পাশেই পুলিশ ফাঁড়ি। ডাকাতেরা ফাঁড়ি আসার অল্প আগে বাস থামিয়ে নেমে গেলো।

নামার আগে হরিমোহনবাবু সেই লাল প্যাণ্ট সর্দারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চেয়েছিলেন তাদের এতো বদান্যতার বা উদারতার কারণ কি।

লাল প্যাণ্ট, সবুজ গেঞ্জি, হলুদ রুমাল ডাকাত সর্দার বাস থেকে নামতে নামতে যা বললো তার সারমর্ম হলো এই যে, প্রত্যেক বাস ডাকাতিতে দারোগাবাবুকে দিতে হয় তিন হাজার টাকা। সুতরাং আটাশশো তেত্রিশ টাকা নিয়ে তিন হাজার টাকা দিলে একশো সাতষট্টি টাকা ক্ষতি। লস্ করার চেয়ে ডাকাতি ক্যানসেল করলে লাভ, তাই এ ডাকাতিটা ক্যানসেল করে দিলো।

ঠিক ফাঁড়ির সামনে বাসটা দাঁড়ালো। স্থূলোদর, শ্লথগতি দারোগাবাবু বাসে উঠলেন, তিনি কিছু প্রশ্ন করার আগেই তাঁকে হরিমোহনবাবু জানিয়ে দিলেন, 'হ্যাঁ ডাকাত পড়েছিলো বাসে, ডাকাতি হয়েছিলো কিন্তু আপনার বরাদ্দ তিন হাজার টাকা যোগাড় হয়নি—ফলে ডাকাতেরা ডাকাতি ক্যানসেল করে সবার টাকা ফেরত দিয়ে নেমে গেছে।

এই সংবাদ শুনে বিরস বদনে দারোগা সাহেব নেমে গেলেন। কখনো ততো-বুদ্ধিমান-নন

শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্তী সদ্য চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে পরামর্শ দিলেন, 'দিনকাল ভালো যাচ্ছে না, রেটটা একটু কমান!'

গেঞ্জি

ভূমিকা

আমার ছেলে কিছুতেই বাচামাছ খেতে চায় না। যাঁরা খান, জানেন বাচামাছ জাবদা বা ট্যাংরার মতই কিংবা তার চেয়েও সুস্বাদু জাতের মাছ। এবার কয়েকদিন পরপর বাজারে বাচামাছ উঠলো, দামও খুব চড়া নয়।

আমি নিজেই বাজার করি, ইচ্ছে করে এবং ছেলেকে জোর করে বাচামাছের স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্যে পরপর তিনদিন বাচামাছ কিনে আনলাম বাজার থেকে। হয়তো এর পরেও আরো কয়েকদিন আনতাম যদি না আমার স্ত্রী মারমুখী হতেন।

সে যাহোক, বাড়িতে বাচামাছের প্লাবনেও আমার ছেলে কিন্তু বাচামাছ স্পর্শ করলো না, বাচামাছের একটি টুকরোও খাওয়ার পাতে ছুঁলো না। তৃতীয় দিনে তার এই মৎস সত্যাগ্রহের পর যখন তাকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি?' সে বিনীতভাবে জানালো, 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই।'

ভূমিকাতেই বলে রাখা ভালো আমার এই সামান্য গল্পটি মাছ বা মাছ খাওয়া নিয়ে নয়, তার চেয়ে অনেক গুরুতর বিষয়ে, একালের ঐ স্লোগান 'বাঁচার লড়াই' নিয়ে।

সম্ভবত এই গল্পটির নাম পাঠ করে কোনো কোনো কৃতবিদ্য পণ্ডিত তৎসহ সাহিত্যের পাঠকের এই নামে একটি বিখ্যাত উপন্যাসের কথা মনে পড়তে পারে। আমার স্বীকার করা উচিত, ঐ কালজয়ী গেঞ্জি উপন্যাসটির কাহিনীর সঙ্গে মিল না থাকলেও এবং এটি একটি ক্ষুদ্র গল্প হলেও, ঐ একই জাতের জীবনসংগ্রাম, যাকে অধুনা বাঁচার লড়াই বলে, আমার অক্ষম লেখনীতে এক্ষণে আমি ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি।

কাহিনী

পৈলান বাস স্ট্যাণ্ডে নেমে একটু এগিয়ে মোড় ঘুরে হাঁটাপথে মাত্র সাড়ে তিন মাইল। জীবনে এই আমার দীর্ঘতম পদযাত্রা। কোনো উপায় নেই, প্রাণের দায়ে হাঁটতেই হলো। পথে রেলিংহীন একটি পঞ্চাশ হাত বাঁশের সাঁকো, যার শেষ প্রান্ত এবং খালধারের মধ্যের দূরত্ব দীর্ঘ লম্ফে অতিক্রম করতে হয়, সেও প্রায় ছয়-সাত হাত। প্রাণের দায়ে সেটুকুও লাফাতে হলো। কাদামাটিতে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে একটা গড়াগড়ি দিতেই হলো। সকালবেলা ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে বেরিয়েছিলাম। এখন যা চেহারা হলো বলার নয়।

লাফের পর মিনিট দশেক দম নিয়ে আবার হাঁটতে হলো। এমনিই সারাক্ষণ আমার দমবন্ধ ভাব, তার উপরে এই হুজ্জোত।

কিন্তু এই দমবন্ধ ভাবটা কাটানোর জন্যে এ হুজ্জোত আমাকে পোহাতেই হচ্ছে।

ব্যাপারটা আরেকটু আগের থেকেই খুলে বলা উচিত। বছর দুয়েক হলো আমার কেমন

একটা গলাচাপা, দমবন্ধ ভাব। বাসায় বা বিছানায় ভালোই থাকি। সকালবেলা খোলামেলা খালি গায়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে বেশ আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চা খাই, খবরের কাগজ পড়ি। বিকেলে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে স্নানটান করে স্বস্তি ফিরে পাই। কিন্তু যখনই রাস্তায় বেরোই বা কাজে যাই, কেমন যেন কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করে, নাকের ডগা লাল হয়ে ওঠে, চোখ টনটন করে, মাথা ঘুরতে থাকে, রীতিমত দমবন্ধ অবস্থা দাঁড়িয়ে যায়।

একদিনে এ রকম হয়নি। আস্তে আস্তে হয়েছে। যখন কষ্ট বাড়লো অফিসের এক বন্ধুকে বললাম। তিনি একবাক্যে রায় দিলেন, 'তোমার প্রেশার হয়েছে'।

প্রেশার হয়েছে কথাটা এমনিতে নিরর্থক। নিচু হোক, উঁচু হোক প্রেশার তো জীবিত মানুষের থাকবেই। শুধু যখন সে মরে যাবে তখন প্রেশার থাকবে না।

প্রেশারের ব্যাপারটা আমি অবশ্য ভালো বুঝি না। আমার দাদাকে একবার ডাক্তার বলেছিলেন, 'আপনার হাই-লো-প্রেশার।' দাদা ধরে নিয়েছিলেন হাই এবং লো যখন একসঙ্গে, সুতরাং মাঝারি, সুতরাং নর্মাল; তাই কোনো চিকিৎসা করাননি। শেষে এক গোধূলি লগ্নে আমাদের এক আত্মীয়কন্যার বিবাহমণ্ডপে কনের পিঁড়ি ধরে সাতপাক ঘোরানোর সময় প্রথম পাকের মাথায় দাদা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। এবং মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সেই ভূপতিত মস্তকে প্রথমে পড়লো শতাব্দীপ্রাচীন আধমণি কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি এবং তারপরে পড়লো সিকিশতাব্দীপ্রাচীন দেড়মণি নাদুসীনুদুসী কনেটি।

পরে জানা গিয়েছিলো ঐ হাই-লো প্রেশারের ব্যাপারটা। হাই-লো অর্থাৎ উচ্চনিচ রক্তচাপ অর্থাৎ খুব বেশি নিচু। ব্যাপারটা না বোঝার জন্যে আমার অগ্রজের সমূহ ক্ষতি হয়েছিলো, ঐ ঘটনার পরে জ্ঞান ফিরে আসার থেকে তাঁর বিবাহ, রমণী এবং কাঠের উপরে সম্পূর্ণ অনীহা জন্মায়।

আমার অশ্রুগ্রন্থি দুর্বল। অগ্রজের কথা লিখতে গেলে আমার চোখে জল আসে। তার চেয়ে নিজের কথা লিখি।

আমার রক্তচাপ বার বার বহু ডাক্তারের কাছে মাপিয়ে দেখেছি, মোটামুটি স্বাভাবিক। নানা রকম ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়েও দেখলাম, আমার তেমন খারাপ কিছু ধরা পড়লো না। ঘুম, খিদে হজম ইত্যাদিও চমৎকার। কিন্তু বাড়ির মধ্যেও কেমন একটা দমবন্ধ ভাব, কানের মধ্যে ভোঁভোঁ করে, গলা শুকিয়ে যায়, মাথা ঘোরে।

কোনো ডাক্তারই যখন চিকিৎসা করে সুরাহা করতে পারলেন না, তখন কোবরেজি, হোমিওপ্যাথি সবই চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হলো না, সেই পরশুরামের চিকিৎসা সঙ্কটের মত অবস্থা প্রায়। তবু অবেশেষে মুষ্টিযোগ, তারপরে যোগ ব্যায়ামের পথে এগোলাম। বিশেষ সুবিধে হলো না। মধ্য থেকে সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা হলো। শীর্ষাসন করার সময় হঠাৎ বাড়ির বহু পুরনো বুড়ো হুলো বেড়ালটা কেমন চমকে গিয়ে আমার নাকটা আঁচড়ে দিলো। নাকের মাংস বড় নরম, দরদর করে কপাল বেয়ে রক্ত পড়ে মাথার চুল আঠা হয়ে গেলো।

সবচেয়ে বেকায়দা হয়েছিলো জল চিকিৎসা করতে গিয়ে। কাঁচা মাটির হাঁড়িতে শায়িত অবস্থায় চুমুক দিয়ে সাত সকালে পর পর সাত হাঁড়ি জল শুয়ে শুয়ে খেতে হবে বিছানা পরিত্যাগ না করে। যে সময়ে জলত্যাগ করার জন্যে মানুষ বিছানা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় ঠিক সেই সময়ে সাত হাঁড়ি জলপান করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। এদিকে সেই মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ, দমবন্ধ ভাব সেটা কিন্তু লেগেই রয়েছে।

অগত্যা পৈলান, পৈলানের পথে আসি। অবশ্য ঠিক পৈলান নয়। পৈলান থেকে তিন মাইল অর্থাৎ পাঁচ কিলোমিটার দূরে বড় মহাদেবপুর। বড় মহাদেবপুরের শেষ সীমানায় গ্রামের কুমোরপাড়া, সেখানে খোকা পালের বাড়িতে সাদা আমড়া, ভগবানের এক আশ্চর্য দান, পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই সাদা আমড়া রোদ্দুরে শুকিয়ে যখন ঝরঝরে হয়ে যাবে, হামানদিস্তায় ছেঁচে একরকম হালকা তেল বেরোবে, সেই তেল নাকে দিয়ে রাতে ঘুমোতে হবে। এই রকম সাত রাত চালাতে পারলেই চোখ টনটন, কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ ডাক, নাকের ডগা লাল হওয়া সব সেরে যাবে।

পরামর্শটা দিয়েছিলেন আমার এক সহকর্মী মহেশবাবু। মহেশবাবুর মামাশ্বশুর এই সাদা আমড়ার তেল নাকে দিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। মহেশবাবু আরো বলেছিলেন, কলকাতার যত বড় বড় ডাক্তার তাঁরা রোগীকে যতসব উল্টোপাল্টা ওষুধ খাওয়ান কিন্তু নিজেরা গোপনে এই সাদা অমড়ার তেল নাকে দেন, কোনো ওষুধ স্পর্শ করেন না।

আজ বড় মহাদেবপুরে বড় আশা নিয়ে এসেছি। কিন্তু আশা পূর্ণ হলো না। কুমোরপাড়ার খোকা পালের বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধেই হলো না। সারা অঞ্চলে ঐ সাদা আমড়ার দৌলতে খোকা পালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সম্প্রতি বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমড়া গাছে আর সাদা আমড়া হচ্ছে না, অন্য সব গাছে যেমন হয় তেমনিই স্বাভাবিক সবুজ রঙের আমড়া হচ্ছে।

খোকা পাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। যদিও সে আমাকে কখনো দেখেনি, আমি তাদের উঠোনে পা দিতেই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। বোঝা গেল সাদা আমড়াব ব্যবসায় তার বিলক্ষণ দু পয়সা হচ্ছিলো, এখন আমড়ার শুভ্রতা চলে যাওয়ায় সে পথে বসে পড়েছে। সাদা আমড়ার উপর নির্ভর করে সে তার জাতব্যবসার সম্বল কুমোরের চাকটা পর্যন্ত বেচে দিয়েছে।

আমি আর কি করবো, নিজের ভাগ্যকে মনে মনে বলিহারি দিয়ে দমবন্ধ, কান ভোঁ ভোঁ, নাক লাল, চোখ টনটন অবস্থা চিরস্থায়ী ধরে নিয়ে পৈলানের হাঁটাপথে কলকাতার মুখে রওনা হলাম।

এখন বোদ আরো চড়া। তবে এবার আর সেই খালধার থেকে বাঁশের সাঁকোয় লাফিয়ে উঠতে গেলাম না। খালের মধ্য দিয়ে হেঁটে পার হলাম। জামাকাপড় তো আগের বারেই কাদা মাখামাখি হয়ে গেছে। আরো একটু কাদাজল লাগলো।

বাসস্ট্যাণ্ডে যখন এসেছি, রোদ্দুরে শুকিয়ে সারা গায়ে কাদা চটচট করছে। শরীরের অস্বস্তির জন্যে কষ্ট হচ্ছে, এমন সময় চোখে পড়লো পাশে একটা হোসিয়ারির দোকান। মনে মনে ভাবলাম, এখান থেকে গেঞ্জি কিনে নিই। তারপর গায়ের কাদামাখা জামা আর গেঞ্জি ছেড়ে নতুনটা পরে নেবো, একটু আরাম হবে।

দোকানটার ভেতরে গেলাম। অল্পবয়েসী একটি ছেলে, বড় জোর কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস হবে, কাউন্টারে বসে রয়েছে। আমি তাকে গিয়ে বললাম, 'ভাই, একটা চৌত্রিশ সাইজ হাতাওলা গেঞ্জি হবে?'

ছেলেটি এতক্ষণ আমার কর্দমাক্ত পোশাক পর্যবেক্ষণ করছিলো। আমার কথা শুনে আমার মুখের দিকে তাকালো, তারপর প্রশ্ন করলো, 'কত সাইজ? চৌত্রিশ? কার জন্যে?'

আমি বললাম, 'আমার জন্যে। আমার চৌত্রিশই লাগে।'

ছেলেটি বললো, 'আপনি আগে নিশ্চয় রোগা ছিলেন তখন চৌত্রিশ লাগতো।'

আমি ভেবে দেখলাম, ছেলেটি ঠিকই বলেছে। বহুকাল ধরে চৌত্রিশ, নম্বর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আসছি, এর মধ্যে আমার ওজন অন্তত সোয়াগুণ বেড়েছে।

ছেলেটি এরপরে বললো, আর তাছাড়া আজকাল গেঞ্জির সাইজগুলোও ঠিক নয়। চৌত্রিশ সাইজের গেঞ্জি দ রকার হলে কিনতে হবে ছত্রিশ। আর আপনার এখন দরকার ছত্রিশ, আপনাকে কিনতে হবে আটত্রিশ।

আমি অবাক হয়ে ছেলেটির কথা শুনছি, এবার ছেলেটি মোক্ষম কথা বললো, 'আটত্রিশের জায়গায় এখন যদি আপনি চৌত্রিশ গেঞ্জি গায়ে দেন তাহলে আপনার কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করবে, নাকের ডগা লাল হয়ে উঠবে, চোখ টনটন করবে, মাথা ঘুরবে, দম বন্ধ হয়ে আসবে।'

আমি অবাক হয়ে দোকানী ছেলেটির কথা শুনছি। সমস্ত লক্ষণ মিলে যাচ্ছে, কান ভোঁ ভোঁ, নাক লাল, চোখ টনটন, দম বন্ধ, আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে আমি আমার কর্দমাক্ত জামাসুদ্ধ চৌত্রিশ নম্বর গেঞ্জি থেকে মুক্ত হলাম।

আঃ কি আরাম! সঙ্গে সঙ্গে সব উপসর্গ দূর হয়েছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে না, চোখ টনটন করছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে না, নাক-মাথা সব ঠিক। আমি ছেলেটির কাছ থেকে একটা আটত্রিশ নম্বর গেঞ্জি গায়ে দিলাম।

এরপর থেকে আটত্রিশ নম্বর গেঞ্জি গায়ে দিচ্ছি আর ডাক্তার-বৈদ্য, ওষুধ-টোটকা লাগে না। আর কান ভোঁ ভোঁ করে না, নাক লাল হয় না, চোখ টনটন করে না, মাথা ঘোরে না, আর দম বন্ধ হয়ে আসে না।

গল্পের খোঁজে

শ্রীযুক্ত বনবিহারী রায়চৌধুরীর নাম আজ কে না জানে? মাত্র তিন বছর হল তিনি লেখা শুরু করেছেন, তাও শুধুমাত্র ছোটগল্প। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর নাম লোকের ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে।

যে কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকা খুললেই তাঁর গল্প চোখে পড়বে, প্রত্যেক সংখ্যায় না হলেও প্রায় নিয়মিত, দৈনিকের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠাতেও তাই। রেডিওতে তাঁর গল্প প্রচারিত হচ্ছে, দূরদর্শনে সিরিয়াল করে তাঁর কাহিনী প্রদর্শিত হচ্ছে। হইহই, রমরমা ব্যাপার। শোনা যাচ্ছে, দু-একটা দামী পুরস্কারও বনবিহারীবাবু শিগগির পেয়ে যাবেন। প্রকাশক-সম্পাদকেরা বনবিহারীর পিছে লেগে রয়েছেন রাতদিন। তাঁর নতুন কোনও বই বেরনোমাত্র কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় বইয়ের দোকানে কেরোসিন তেলের লাইনের চেয়েও বড় লাইন পড়ে যায়। তিনিই একমাত্র লেখক যাঁর যে-কোনও বই বেরনোর চোদ্দদিনের মধ্যে সংস্করণ হয়ে যায়।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল খুবই সামান্যভাবে।

বনবিহারী একটা ছাপাখানায় প্রুফ-রিডারের কাজ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিজের

পাড়ায় শারদীয়া পুজোর সুভেনির তিনি এই ছাপাখানাতেই কিছুটা কম খরচে ছাপিয়ে আনতেন। ছাপাখানার সূত্রে দু-চারজন কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে বনবিহারীবাবুর পরিচয় ছিল। তাঁদের কাছ থেকে লেখা যোগাড় করেও তিনিই আনতেন। পাড়ার ছেলেরা শুধু বিজ্ঞাপন আর আয়-ব্যয়ের হিসেব আর সেইসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তাদের নামের তালিকা তাঁকে দিয়ে দিত। তিনিই প্রুফ দেখে ছাপিয়ে, বাঁধিয়ে সপ্তমীর দিন সকালে একটা রিকশ করে এক হাজার কপি সুভেনির তাঁদের লিচুতলা পাড়ার পুজোমণ্ডপে পৌঁছে দিতেন।

বনবিহারীবাবু সেবছর অন্যান্যবারের মতোই পরিচিত কবি ও লেখকদের যথারীতি অনুরোধ করেছিলেন লেখার জন্যে। বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত নবলাল পণ্ডিতকেও তিনি বিশেষ করে বলেছিলেন লেখার জন্যে। নবলালবাবু প্রত্যেকবার পূজোর সময় গোটা-ষাটেক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায়। অক্লান্ত লেখক তিনি, অর্থের লোভ নেই, কাগজের বাছবিচার নেই, তাঁর কাছে লেখা চাইলেই পাওয়া যায়, আর কী সব বিচিত্র বিষয় তাঁর। একই সঙ্গে দু'জন সম্পাদক হয়তো নবলালবাবুর কাছে লেখা নিতে এসেছেন, একজনকে নবলাল পণ্ডিত প্রবন্ধ দিলেন, 'চাঁদে মানুষের বসবাস করা উচিত হবে কিনা' এই বিষয়ে, আর সেই সঙ্গে অন্যজনকে দিলেন যে রচনা তার নাম, 'কুকুরের মাংস যদি খেতেই হয় তবে সেটা কীভাবে খেতে হবে'।

দুঃখের বিষয়ে ওই বছরেই পূজোর মাত্র কয়েকদিন আগে সেই শারদীয়ায় আটচল্লিশতম প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে নবলাল পণ্ডিতের মাথাখারাপ হয়ে যায়, একেবারে যাকে বলে ধুমপাগল। খেপে যাওয়ার পরে বইপাতা, কাগজপত্র যা কিছু তিনি হাতের কাছে পেয়েছিলেন সব নিয়ে ছাদে উঠে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে কীর্তনের সুরে 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' এই পঙ্‌ক্তিটি নেচে নেচে ভাদ্র মাসের রোদে সারাদুপুর ধরে গেয়েছিলেন। পাড়ার লোকেরা পুলিশে খবর দেয়, কিন্তু পুলিশ ছাদে উঠতে পারে না, কারণ নবলাল চিলেকোঠার দরজা ছিটকিনি টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশেষে বিকেলের দিকে দমকলের লোকেরা এসে বাইরে থেকে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে তাঁকে উদ্ধার করে।

প্রবন্ধকার নবলাল পণ্ডিতের এর পরের ঘটনাবলী আরও রোমাঞ্চকর। সে-কাহিনী বিস্তারিতভাবে অন্য সময় বলা যাবে। আমাদের এ কাহিনী গল্পকার বনবিহারী রায়চৌধুরীকে নিয়ে, প্রবন্ধকার নবলাল পণ্ডিত আপাতত দূরে থাকুন।

সেবার লিচুতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সুভেনিরে নবলাল পণ্ডিতের লেখা পাওয়া গেল না। ওই আটচল্লিশতম প্রবন্ধটিই তিনি এই সুভেনিরের জন্যে লিখছিলেন। আগের দিন সন্ধেবেলাতেই বনবিহারী নবলালবাবুর বাসায় প্রবন্ধের তাগিদে গিয়েছিলেন, তখন নবলালবাবু তাঁকে দেখালেন যে, তাদের প্রবন্ধটা তিনি আরম্ভ করছেন, প্রবন্ধটার নাম, 'পাগল হওয়ার সুবিধে এবং অসুবিধে'।

বনবিহারীবাবুর ধারণা যে, এই প্রবন্ধটা লিখতে গিয়েই নবলাল উন্মাদ হয়ে যান। সে যাই হোক, সে বছরে লিচুতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সুভেনিরে নবলালবাবুর প্রবন্ধের জন্যে পুরো তিন পাতা জায়গা রাখা ছিল, বনবিহারীবাবুর সমস্যা দাঁড়াল এই তিন পাতা কীভাবে ভরানো যায় তাই নিয়ে।

এদিকে-ওদিকে নানা জায়গায় চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু পুজোর বাজারে সামান্য নামকরা

লেখকের লেখাও সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। দিন দুয়েক ঘোরাঘুরি করার পরেই বনবিহারীবাবু বুঝলেন এটা এক অবাস্তব প্রয়াস। এদিকে নবলালবাবুর অলিখিত প্রবন্ধের বিষয়, পাগল হওয়ার সুবিধে এবং অসুবিধে, বারে বারেই তাঁর মনে মধ্যে হানা দিচ্ছিল।

অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে বনবিহারী সুভেনিরের প্রথম তিন পাতা সম্পূর্ণ করার জন্যে নিজেই লিখতে বসলেন, তাঁর লেখারও একই নাম, পাগল হওয়ার সুবিধে এবং অসুবিধে।

তবে বনবিহারীবাবু তেমন পণ্ডিত লোক নন, তাঁর লেখাটা প্রবন্ধ না হয়ে গল্প হয়ে গেল। তিন পাতার মধ্যে একটা গল্প গুছিয়ে লেখা সোজা কাজ নয়, আর তা ছাড়া গল্প লেখার বিষয়ে বনবিহারীবাবুর কোনও অভিজ্ঞতাও নেই কিন্তু তাই বলে পাড়ার পুজোর সুভেনিরের প্রথম তিন পাতা তো আর ফাঁকা রাখা যায় না।

বাধ্য হয়েই গল্প লেখায় হাত দিতে হল বনবিহারীবাবুকে। একটা সুবিধের ব্যাপার হল যে, গল্পের বিষয় আগেই স্থির করা আছে সুতরাং লিখলেই হল এখন। বনবিহারী জানেন যে, তাঁর কল্পনাশক্তি খুব প্রখর নয়, সুতরাং গল্পের বিষয়বস্তু সামনে রেখে গল্পের খোঁজে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হল।

খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার পড়েনি। বনবিহারীবাবুদের পাড়ার লিচুতলা কোনও একদিন নিশ্চয় ছিল, কিন্তু এখন আর একটিও লিচুগাছ নেই। তবে পাড়ার মুখে একটা বুড়ো কাঁঠাল গাছ আছে। সেই কাঁঠাল গাছের নীচেই বছর বছর পুজোমণ্ডপ বাঁধা হয়। পুজোমণ্ডপের উলটো দিকেই একটা চুলকাটার সেলুন, সাইনবোর্ড অনুসারে দোকানটির নাম'ইমপিরিয়াল হেয়ার ক্যাটিং অ্যাণ্ড হেয়ার ড্রেসিং সেলুন', কিন্তু পাড়ার লোকেরা মুখে-মুখে বলে, 'হরিপাগলাব সেলুন'।

এই সেলুনের মালিক ও কর্ণধার শ্রীযুক্ত হরিনাথ প্রামাণিক প্রতি বছর চৈত্র মাসে সংক্রান্তিব আগে পাগল হয়ে যান। সেই সময়ে তাঁর ছেলেরা তাঁকে বাড়িতে একটা ঘরে শিকল দিয়ে আটকিয়ে রাখে, কারণ এইসময় হরিনাথ হঠাৎ হঠাৎ খুব হিংস্র হয়ে ওঠেন। রাস্তাঘাটে যে-কোনও লোকের মাথায় বাবরি চুল বা গালভর্তি দাড়ি দেখলে ছুটে তাড়া করে যান। একবার তো খোলা ক্ষুর হাতে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দাড়িওলা হেডমাস্টারমশাইকে হরিনাথ আক্রমণ করেন। সুখের বিষয় সাবান এবং জল হাতের কাছে না থাকায় এবং ওই দুটি জিনিস ছাড়া হরিনাথ ক্ষুর ব্যবহার করতে ইতস্তত করায় হেডমাস্টারমশাই দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এরপর থেকে হরিনাথ প্রামাণিকের ছেলেরা চৈত্র মাসের শেষ থেকে তাদের বাবাকে ঘরে আটকিয়ে রাখে পুরো গ্রীষ্মকালটা, তারপর যখন বর্ষা নামে, বৃষ্টির জলে পৃথিবী একটু শীতল হয় হরিনাথের মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে আসে, তাঁকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়, তিনি দুবেলা সেলুনে যাতায়াত শুরু করেন।

গল্প লিখতে গিয়ে বনবিহারী রায়চৌধুরীর প্রথমেই মনে পড়ল নিজের পাড়ার হরিনাথ প্রামাণিকের কথা। কোনও কোনও বছর ভাল বৃষ্টি না হলে হরিনাথের মাথা বিশেষ ঠাণ্ডা হয় না। তবে এ-বছর খুবই ভাল বৃষ্টি হয়েছে, শ্রাবণের মধ্য থেকে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত প্রায় সর্বদাই আকাশ কালো করে মেঘ আর সেইসঙ্গে টানা অঝোর বৃষ্টি। হরিনাথের মাথা এবার বেশ ঠাণ্ডা, হাসিমুখ।

যদিও বনবিহারীবাবু নিজেই বাড়িতে দাড়ি কামান, একদিন সকালে যখন দেখলেন ইমপিরিয়াল সেলুনে খদ্দের বা কর্মচারী কেউ নেই, শুধু হরিনাথ প্রামাণিক একা দেওয়ালের বড় আয়নাটায় নিজের হাসিমুখের ছায়া দেখছেন, সঙ্গে সঙ্গে বনবিহারীবাবু সেলুনের মধ্যে দাড়ি কামাতে ঢুকে গেলেন।

দাড়ি কামাতে কামাতে এবং দাড়ি কামানোর পরেও, যতক্ষণ পর্যন্ত দোকানে ভিড় না হল, বনবিহারীবাবুর সঙ্গে হরিনাথের অনেক কথা হল।

পাগল হওয়ার বিষয়ে হরিনাথ যা বললেন তা অতিশয় চমকপ্রদ। পাগল হলে কোনও কষ্ট নেই, ভালই লাগে। পাগল হওয়ার আগের দিকে একটু কান ভোঁ ভোঁ করে, মাথার মধ্যে চিনচিন করে, তারপরে ঘাড়ের পিছনে ঠিক শিরদাঁড়ার উপরে খট করে একটা শব্দ হয় প্রকৃত পাগল হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে। তারপরে আর কোনও কষ্ট নেই, তখন হাসলেও আনন্দ, কাঁদলেও আনন্দ, মেরেও আনন্দ, মার খেয়েও আনন্দ, শুধু আনন্দ আর আনন্দ। ঘরে শিকলবন্দী হয়ে থাকলেও আনন্দ, আবার খোলা ক্ষুর হাতে রাস্তায় ছুটে গেলেও আনন্দ। অনাহার, অনিদ্রা, অস্নান কিছুতেই কোনও কষ্ট নেই। সব তাতেই আনন্দ।

হরিনাথ বললেন, "পরে এই আনন্দ একটু একটু করে কমতে থাকে। একটু একটু করে সব কিছু খারাপ লাগে। আবার কান ভোঁ-ভোঁ, মাথা চিন-চিন, তারপর একদিন ঘাড়ে একটা খট করে শব্দ হয়, মাথা ভাল হয়ে যায়। মাথা ভাল হয়ে যাওয়ারও আনন্দ আছে, সে আনন্দ আবার অন্যরকম। তখন ফরসা বিছানায় শুতে ভাল লাগে, ভাল খাবার খেতে ভাল লাগে।"

বনবিহারী ভেবেছিলেন গল্পের খোঁজে আরও দু-চার জন পাগলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করতে হতে পারে, কিন্তু শুধু হরিনাথ প্রামাণিকের সঙ্গে কথা বলেই তাঁর কাজ হয়ে গেল। খুব যত্ন করে, খুব ভালবেসে, পাগল হওয়ার সুবিধে এবং অসুবিধে গল্পে হরিনাথের পাগল হওয়ার আনন্দের কথা এবং পাগলামি ছেড়ে যাওয়ার আনন্দের কথা লিখলেন বনবিহারী। তবে হরিনাথ প্রামাণিকের নামটা বদলে হরিনাথ সূত্রধর করে দিলেন।

যথাসময়ে সে বছরে পাড়ার পুজোর সুভেনির যথারীতি বেরোল, ব্যতিক্রম শুধু নবলাল পণ্ডিতের প্রবন্ধের জায়গায় বনবিহারী রায়চৌধুরীর গল্প।

পুজোর সুভেনিরের সামান্য গল্প নিয়ে কেই বা মাথা ঘামায়। কিন্তু একজন ঘামালেন, তিনি তাঁর ভায়রাভাইয়ের বাড়িতে মহাষ্টমীর দিন দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিলেন। খেতে দিতে দেরি হচ্ছে দেখে বাইরের ঘরের সোফায় বসে সুভেনিরের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। গল্পের নাম দেখে, প্রথম আখ্যানেই চোখ আটকে গেল তাঁর। তারপর পড়ে দেখলেন একেবারে তরতাজা। নতুন রকমের লেখা। লেখকের নামও সম্পূর্ণ অপরিচিত।

বনবিহারীবাবুর গল্পটি এই যিনি পড়লেন, তিনি একটি ইংরেজি দৈনিক কাগজের সাহিত্য বিষয়ক দফতরে কাজ করেন। ভদ্রলোকের নাম সুধাময়বাবু।

সুধাময়বাবু কয়েকদিন পরে বিভিন্ন শারদীয় সংখ্যার গল্প-কবিতা নিয়ে ইংরেজিতে একটি নিবন্ধ লিখলেন তাঁর কাগজে, সেখানে একটি বারোয়ারি পুজোর সুভেনিরে প্রকাশিত বনবিহারী রায়চৌধুরীর লেখা 'পাগল হওয়ার সুবিধে এবং অসুবিধে' গল্পটির উচ্চ প্রশংসা করলেন। শুধু তাই নয়, পরের সপ্তাহে ওই গল্পটির একটি অনুবাদও ছাপা হল ওই কাগজে।

এর পরে একদিন একটি মাঝারি পত্রিকার সম্পাদক, যাঁর পত্রিকা বনবিহারীবাবু যে প্রেসে

কাজ করেন, সেখানে ছাপা হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ওই প্রবন্ধে যাঁর কথা বলা হয়েছে তিনিই সেই ব্যক্তি কি না। বনবিহারীবাবু সে কথা স্বীকাব করায় সম্পাদক ভদ্রলোক বনবিহারীবাবুর কাছে একটি গল্প চেয়ে বসলেন।

একটু ভেবে নিয়ে বনবিহাবী বললেন, "গল্প আমি লিখতে পারব, কিন্তু গল্পের নামটা আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে।"

সম্পাদক একটু অবাক হলেন, তারপর কী ভেবে বললেন, "ব্যাপারটা একটু প্রবন্ধেব মতো হয়ে যাচ্ছে, তা হোক, আপনি একটা গল্প লিখুন নিউ মার্কেটের আগুন লাগার ব্যাপাবে।"

এর কয়েকদিন আগেই কলকাতার নিউ মার্কেটের একটা দিক আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে চারদিকে হইচই হচ্ছিল। বিষয়টি খুব পছন্দ হল বনবিহারীর। তিনি পোড়া নিউমার্কেটে একদিন খুব সকালের দিকে বাসে করে গেলেন। সেখানে অনেকরকম কথা শুনলেন, অনেক গুজব, তার মধ্যে একটা কথা শুনলেন বাত্রে ভেতরের একটা দোকানের সামনে একটা কুকুর শুয়ে থাকত, এই আগুনে পুড়ে কুকুরটিও মারা গেছে।

খোঁজখবর নিয়ে যে দোকানের সামনে কুকুরটি শুয়ে থাকত সেই দোকানেব মালিকের সঙ্গে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করলেন। দোকানদার বললেন, "কুকুরটা নিউমার্কেটেই জন্মেছিল। ছোটবেলা থেকে আমার দোকানেব সামনে ঘুরত। প্রতিদিন রাতে দোকান বন্ধ করে চলে আসাব সময়ে আমি ওকে একটা করে কোয়ার্টার পাউণ্ড পাঁউরুটি খেতে দিয়ে আসতাম। পাঁউরুটিটা খেয়ে ও আমার দোকানের সামনে শুয়ে পড়ত, পরদিন আমি না আসা পর্যন্ত দোকান আগলাত। আমার আশেপাশে কত দোকানে ছোটখাটো চুরি হয়েছে কিন্তু ওর জন্যে আমার দোকানে কখনও চুরি হয়নি।

বনবিহারীবাবু এবার প্রশ্ন করলেন, "কুকুবটাকে কী নামে ডাকতেন?"

দোকানদার বললেন, 'আমি ওকে আতু আতু বলে ডাকতাম।"

একদিন রাত জেগে গল্পটা লিখে ফেললেন বনবিহারীবাবু। নিউমার্কেটের আগুন ও আতু আতু, নামে সেই আশ্চর্য গল্প পড়ে শুধু সেই সম্পাদকই নন, আরও অনেকেই বিস্মিত হযে গেলেন। লেলিহান আগুনে দোকানঘর দাউদাউ করে পুড়ছে, ছাদ ভেঙে পড়ছে আর সেই আগুনের ধ্বংসস্তূপে অতি সাধারণ একটি রাস্তার কুকুর স্থির হয়ে প্রভুর দোকান আগলাচ্ছে, সমস্ত গল্পের মধ্যে আগুনের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছিল আর সেই সঙ্গে একটি প্রভুভক্ত জীবের আত্মত্যাগের করুণ কাহিনী।

এরকম গল্প একালে আর কেউ লেখে না। বনবিহারীবাবুর খ্যাতি ক্রমশ চারদিকে ছড়াতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সম্পাদকেরা বনবিহারীবাবুর কাছে গল্প চাইতে লাগলেন।

বনবিহারীবাবুর কোন আপত্তি নেই। গল্প লেখায় তাঁর কোনওরকম ক্লান্তি নেই। শুধু একটিই কথা, তাঁকে গল্পের বিষয়টি ঠিক করে দিতে হবে, তারপর তিনি সে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে চিন্তাভাবনা করে গল্পটি লিখবেন।

ফলে বনবিহারীবাবুর লেখার যত চাহিদা বাড়তে লাগল, ততই উদ্ভট প্রস্তাব আসতে লাগল তাঁর কাছে। এতে তাঁর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

'চার দিগন্ত' পত্রিকার সম্পাদক বনবিহারীকে অনুরোধ করলেন 'কাঁসার থালা ও স্টিলের গেলাস' নামে একটি গল্প লিখতে। সেদিন গভীর রাতে বালিশে উপুড় হয়ে শুয়ে গল্পটা লিখতে

লিখতে কলমের নিবে স্বচ্ছ হাসির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে দিলেন বনবিহারী রায়চৌধুরী।

আজকাল ভাল হাসির গল্প খুব কম লেখা হয়। কিন্তু বনবিহারীবাবুর গল্পটা পড়ে অনেকদিন পরে সবাই খুব হাসল। একটি পুরনো আমলের ভারী কাঁসার থালার সঙ্গে একটি আধুনিক ঝকঝকে স্টিলের গেলাসের কাল্পনিক বাদ-বিসম্বাদ এবং অবশেষে বন্ধুত্ব, বনবিহারীবাবুর এই গল্পটি নিতান্ত হাসির গল্প হয়নি, তার চেয়েও যেন একটু বেশি হয়েছিল। হাসিব গল্প এখানে একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল।

এরপর ক্রমাগত গল্প আর গল্প, আর তারপরে সেইসব গল্পের সঙ্কলন, কী চমৎকার সব নাম সেইসব বইয়ের, 'সকালবেলার গল্প', 'গল্পে গল্পে দিন যায়' প্রকাশিত হতে লাগল একের পর এক।

বনবিহারীবাবু প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। সাতটি গল্পের সঙ্কলন তাঁর। সর্বশেষ গ্রন্থ 'সাত ভাই গল্প জাগো রে' এখন দোলের আগের দিন আবিব যেরকম বিক্রি হয় সেইভাবে বিক্রি হচ্ছে।

কিন্তু বনবিহারীবাবুর মনে সুখ নেই। এত খ্যাতি, এত অর্থ এত জনপ্রিয়তা, কিন্তু তিনি বুঝতে পাবছেন, তাঁর গল্পেব বিষয় শেষ হয়ে আসছে। লোকেরা এখন তাঁকে যেসব গল্পেব ফরমায়েস দিচ্ছে সবই একঘেয়ে, বোকা-বোকা। আগে একবার তিনি লিখেছিলেন রেসকোর্সে একটি ঘোড়ার মৃত্যুর সম্পর্কে। এবার একজন সম্পাদক বলছেন, চিড়িয়াখানায় জিরাফের মৃত্যুর উপবে গল্প লিখে দিতে। একদিন চিড়িয়াখানায় ঘুবে এসে রাতে গল্পটা মনযোগ দিয়ে লিখতেও বসেছিলেন বনবিহাবী। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলেন, এ সেই ঘোড়াব গল্পটাই হয়ে যাচ্ছে। দেড় পাতা লিখে ফেলেছিলেন, রাগ কবে পাতা দুটো ছিঁড়ে ফেললেন। মাথা শুধু শুধু কেমন গবম হয়ে গেল, দু'বার মাথায় জল দিয়ে এলেন কলতলায় গিয়ে। কিন্তু সেদিন রাতে তাঁর আর ঘুম এল না চোখে।

শেষ বাতের দিকে হালকামতো একটু তন্দ্রা এসেছিল, তারই মধ্যে একটা পরিষ্কার ঝকঝকে স্বপ্ন দেখলেন বনবিহারী, নবলাল পণ্ডিত তাঁকে "আয়, আয়" বলে ডাকছেন।

নবলাল পণ্ডিতের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। তিন বছর আগে সেই নবলালবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেল, তারপর আর খোঁজ নেওয়া হয়নি তাঁর। তাবপর আর তাঁর কোনও লেখাও অবশ্য চোখে পড়েনি। এখন কেমন আছেন তিনি, তাঁর মাথার অবস্থা এখন কেমন কে জানে ?

স্বপ্নটা সারা সকাল বনবিহারীব পিছনে লেগে রইল, একটু খটকাও ছিল স্বপ্নটার মধ্যে। নবলালবাবু তাঁকে চিরদিন আপনি করে কথা বলতেন। অথচ স্বপ্নের মধ্যে বললেন, "আয়, আয়।"

বিকেলের দিকে বনবিহারীবাবু তাঁর নতুন-পুরনো কয়েকটা বই হাতে করে বেরোলেন বাড়ি থেকে, উদ্দেশ্য হল নবলাল পণ্ডিতের কাছে যাওয়া। নবলালবাবুর বাড়িটা চেনা ছিল তাঁর, সেখানে গিয়েই একবার দেখবেন, হয়তো এখনও সেখানেই আছেন।

সুখের বিষয় পুরনো বাড়িতেই নবলালবাবুকে পাওয়া গেল। মাথা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। তবে এখন আর প্রবন্ধটবন্ধ লেখেন না। লেখা একদম ছেড়ে দিয়েছেন। বনবিহারীবাবুকে দেখে নবলাল বেশ খুশি হলেন। অল্পবিস্তর দু'চার কথা হল। বনবিহারীর বইগুলো তিনি উলটে পালটে

দেখে আবার বনবিহারীকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

বনবিহারী বললেন, "এগুলো আপনার জন্যেই এনেছি।"

হাত নেড়ে না করে নবলাল বললেন, 'আমি আজকাল শুধু লেখা নয়, পড়াও ছেড়ে দিয়েছি। ও গুলো ফেরত নিয়ে যান। তবে আপনার বইয়ের নামগুলো—জমকালো —আপনার হবে।"

বনবিহারী নবলালকে আর বোঝাতে গেলেন না যে, হবে নয় তাঁর হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু না বলায় নবলাল ধীরে ধীরে উঠে বাইরের ঘর থেকে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

আর বসে থাকা অনুচিত ভেবে বনবিহারীবাবু নিজের বইগুলো হাতে নিয়ে নবলালবাবুর বাইরের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই শুনলেন পিছনে নবলাল ডাকছেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বনবিহারী দেখলেন নবলালবাবুর হাতে এক তাড়া কাগজ।

এগিয়ে যেতে নবলালবাবু সেই কাগজের তাড়া তাঁর হাতে দিয়ে বললেন "এগুলো আমার পুরনো লেখার কাটিং। নিয়ে যান, আপনার কাজে লাগবে।" একবার লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেই বনবিহারীবাবু বুঝলেন সত্যিই এগুলো তাঁর কাজে লাগবে।

আর চিন্তা নেই।

সাহিত্যিক বনবিহারী রায়চৌধুরীর নবজন্ম হয়েছে। নবলাল পণ্ডিতের বিচিত্র প্রবন্ধগুলি নতুন গল্প রচনায় তাঁকে প্রেরণা যোগাচ্ছে, যেমন যুগিয়েছিল 'সেই পাগল হওয়ার সুবিধে এবং অসুবিধে' নামের প্রথম গল্পের সময়।

এখন থেকে বনবিহারী রায়চৌধুরী আর সম্পাদকদের কাছে গল্পের বিষয় বা নাম জানতে চান না। গল্পের ভাণ্ডার তাঁর টেবিলের উপরেই রয়েছে, নবলাল পণ্ডিতের প্রবন্ধাবলী। গল্পেব খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে না, যে-কোনও একটা প্রবন্ধের কাটিং নিয়ে বসে গেলেই হল। প্রয়োজনমতো একটু খবরটবর নিয়ে চমৎকার গল্প হয়ে যাবে এক-একটা প্রবন্ধ।

আপাতত বনবিহারী রায়চৌধুরী নবলাল পণ্ডিতের দুটো প্রবন্ধে হাত দিয়েছেন। একটির নাম 'বরফ যদি রঙিন হয়', আর একটি 'হেমন্তে শারদোৎসব'।

আজ সকালেই বনবিহারীবাবু নারকেলডাঙায় একটা বরফের কারখানায় গিয়েছিলেন বরফ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। আর দ্বিতীয় গল্পটা তো তাঁর হাতের মুঠোয়। তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাগনে ইথিওপিয়ায় চাকরি করে। প্রায় পনেরো বছর পরে সে এ বছর অক্টোবরের প্রথমে আসছে দু'সপ্তাহের জন্যে কলকাতায় পুজো কাটাবার জন্যে। কলকাতায় তার নিকটজন এখন আর কেউ নেই, সে বনবিহারীবাবুকে চিঠি লিখেছে, তাঁর কাছেই উঠবে। বনবিহারী তাঁকে জানিয়েছেন, "নিশ্চয়"। কিন্তু এ-কথা জানাননি যে, এবারের পুজো তাঁর ফিরে যাওয়ার পরে অক্টোববের তৃতীয় সপ্তাহে। এতদিন পরে আসতে চাইছে, এ খবর পেয়ে সে হয়তো নাও আসতে পারে। তাঁর দোয়াতের করুণতম কালিতে কলম ভরে নিয়ে দ্বিতীয় গল্পটাই প্রথমে শুরু করলেন বনবিহারীবাবু।

যেখানেই প্রকাশিত হোক সবাইকে অতি অবশ্য খুঁজে বার করে পড়তে হবে শ্রীবনবিহারী রায়চৌধুরীর সেই অতুলনীয় কাহিনী 'হেমন্তে শারদোৎসব'।

গুরুদাস খাসনবিশের মৃত্যু

শেষ রাত্তিরে খুন হলেন গুরুদাস খাসনবিশ। গুরুদাস খাসনবিশের খুন হওয়ার কোন কারণ বা হেতু খুঁজে পাওয়া গেল না।

গুরুদাস সরকারী চাকরি করতেন। বছর বারো আগে অবসর নিয়েছেন। একশো সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা করে পেনসন পেতেন। আয় বলতে শুধু এই ছিল। দু একটা যা ছোটখাটো ইন্সিওর ছিল, সেও কোন্ কালে ম্যাচিওর করে গেছে, সেসব টাকা-পয়সা কবে হজম হয়ে গিয়েছে। সম্পত্তি বলতে কিছু জামা-কাপড়, একটা পুরোনো ছাতা, একজোড়া ছেঁড়া পাম্পসু এবং বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে রূপো দিয়ে বাঁধানো একটা সাড়ে চার রতি প্রবালের আংটি।

নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক গুরুদাস বন্ধুবান্ধবের বিশেষ ধার ধাবতেন না, প্রায় কেউই ছিল না তেমন। কারোর সঙ্গে শত্রুতা বা বিবাদ নয়, সরকারী চাকরিও করেছেন সাধারণ কেরানীর কাজ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নিরামিষ চাকরি—সে সূত্রেও যে কোন শত্রুতা তৈরি হয়ে থাকতে পাবে সেটা অসম্ভব, আর যত বদমায়েস কর্মচারীই হোক না কেন, বিটায়ার করার বারো বছর পরে কার আর কি আক্রোশ থাকতে পারে তাঁর ওপর।

গুরুদাস খাসনবিশ আমার বাড়ির পিছনের দিকে একতলার একটা ঘরের ভাড়াটে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার অতি অল্পই পরিচয় ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, পবিচয় হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। মাত্র বছর দেড়েক আগে তিনি আমাদের এখানে ভাড়াটে হয়ে আসেন। ঘবটা তখন আমার খালিই পড়ে ছিল। এক হোটেল থেকে দু-বেলা আমার ভাত দিয়ে যেত, অনেক সময় সেই হোটেলের কোন কোন খদ্দের থাকার জায়গা খুঁজলে হোটেলের মালিক আমার বাড়িতে ঘর আছে কিনা খোঁজ করতেন। হোটেলের মালিক নিত্যানন্দবাবু আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গুরুদাসবাবুকে।

গুরুদাসবাবুকে দেখে আমি একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। সারা মুখে তুলোব্যাণ্ডেজ, একটা হাত প্লাস্টার করা, লাঠি ভর করে খুঁড়িযে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। আমাকে বললেন, রিটায়ার করার পর প্রত্যেক বছব শীতেব শেষে একটু তীর্থ করতে—মানে এই বেড়াতে-টেড়াতে বেরোই, এবারো বেরিয়েছিলুম।' এইটুকু বলে, ডান হাতটা প্লাস্টার করা বলে তুলে উঠতে পারলেন না, বাঁ হাতটা কপালে তুলে নমস্কার করে, 'একটু দ্বারিকানাথের কাছে যাব বলে বেরিযেছিলুম। আমার ভাগ্যে নেই। সর্টকাট হবে শুনে একটা একটু বাঁকা পথে গিয়ে, একটা পাহাড়ী খাদ পেরোতে গিয়ে সোজা পুল থেকে পড়ে যাই প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে। বাঁচবাবই আশা ছিল না, কোন রকমে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছি।' বলে, ক্ষীণ করুণ হাসি হাসলেন গুরুদাসবাবু। সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ, শুধু চোখের কোণায় একটু হাসির রেখা দেখলাম।

সেই থেকে গুরুদাসবাবু আমাদের বাড়ির নিচেতলার ভাড়াটে। একটা ঠিকে ঝি এসে দু-বেলা জল তুলে, ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়। দুপুরে আর রাতে আমার মতই হোটেল থেকে ভাত আসে। ঘর থেকে কদাচিৎ বেরোতেন তিনি। সন্ধ্যার পরে একটা লাঠি ভর দিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে ফিরে আসতেন, আর মাসে একবার বেরোতেন পেনসন আনতে। তাঁর সঙ্গে

আমার কথাবার্তা হত, মাসে একবার মিনিট কয়েকের জন্যে আসতেন ভাড়াটা দিতে। তাঁর কাছে কোন লোকজন বা চিঠিপত্র এসেছে বলেও মনে পড়ে না। গুরুদাস খাসনবিশের একটা দোষ ছিল, গাঁজা খেতেন। ওঁর ঘর থেকে প্রায়ই গাঁজার গন্ধ আসত। কিন্তু বাড়িওলা হিসেবে তাতে আমার আপত্তির কি থাকতে পারে!

সেই গুরুদাস খাসনবিশ খুন হলেন। কেন, কি করে নিরীহ, অবসরপ্রাপ্ত কেরানী গুরুদাস, কার কি শত্রুতা করেছিলেন যে তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সে জীবন দিতে হল—এই সব সমস্যার চেয়েও যে সমস্যা আমার কাছে আরো বড় হয়ে দেখা দিল, সেটা হচ্ছে পুলিশের হাঙ্গামা। আমি নিত্যানন্দবাবুকে দেখিয়ে দিলাম। বললাম, হোটেলের মালিক নিত্যানন্দবাবু আমার কাছে গুরুদাস খাসনবিশকে পাঠিয়েছিলেন।' কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা খুনের মামলা, পুলিশ কি অত সহজে ছাড়ে ? এর আগে কটা খুন হয়েছে এ বাড়িতে, জানাশোনা আর কেউ কখনো খুন হয়েছে কিনা, ইত্যাদি যত সব প্রশ্ন। এক-একটা প্রশ্ন শুনি আর আঁতকে আঁতকে উঠি; যেন আমার বাড়িটা খুনেরই আখড়া, যেন খুনী মাত্রেই আমার বিশেষ পরিচিত। শুধু একটা মাত্র প্রশ্ন পুলিশের বাকি রয়ে গেল—যেটা করলেই পারত, 'আপনার খুন করতে কেমন লাগে ?'

নিত্যানন্দবাবুর ঘাড়ে খাসনবিশের বোঝা চাপিয়ে বিশেষ যে রক্ষা পাওয়া গেল তা নয়, পুলিশেব অত্যাচার চলতেই লাগল।

সুতরাং একদিন চলে গেলাম গর্জনের কাছে তার দাঁতের চেম্বারে। রোমাঞ্চের পাঠকদেব নিশ্চয় গর্জন গোয়েন্দাকে মনে আছে ? সেই দন্তচিকিৎসক কাম গোয়েন্দা এবং তাব সাকরেদ শশক। শশক আমাকে দেখামাত্র বলল, 'আসুন মাস্টারমশায়।'

কবে কোন্ কালে শশকের এক পিসতুতো ভাইকে প্রাইভেট পড়িয়েছিলাম, সেই সুবাদে শশক এখনো আমাকে মাস্টারমশায় বলে। গর্জন তখন চেম্বারের ভেতরে একটা বাচ্চা ছেলের দুধদাঁত পড়ে নি, তাই সেটা তুলে ফেলছে। বাচ্চা ছেলেটো কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে, তার মা আব ঠাকুমাই বোধ হয় দুজনে তাকে দু দিকে ধরে রয়েছে।

এ পাট শেষ হতে প্রায় পনেরো মিনিট লাগল। আমি ওয়েটিং রুমে বসে একটা হাফডোবের ফাঁকে ফাঁকে এসব দেখছিলাম। গর্জন বেরিয়ে এলো। বলল, 'কি খবর ?'

বিশেষ ভণিতা না করে সমস্ত খবর সবিস্তারে বললাম। পুরো সময়টা গর্জন টেবিলে তাল ঠুকে ঠুকে রবীন্দ্রনাথের গানের সুবে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য গেয়ে গেল গুনগুন করে। মন দিয়ে শুনল বলে বোধ হল না।

সব শোনা হয়ে গেলে বলল, 'তাহলে চলো, একবার থানায় যাই। ওঁরা কি বলেন শোনা যাক।'

আমি বললাম, 'আবার থানায় ?'

গর্জন বলল, 'ভয় কি, তুমি তো খুন করো নি ?' প্রশ্নটা করে কি রকম একটা ফাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমার তো আরো ভয় হল, কি জানি, শেষে গর্জনও সন্দেহ করতে লাগল নাকি!

আমি, গর্জন আর শশক—এই তিনজনে মিলে থানায় গেলুম। শশক থানার বাইরে রাস্তায় দাঁড়াল, গর্জন আর আমি ভেতরে গেলাম।

গর্জন নানা কারণে পুলিশের কাছে অপ্রিয় ব্যক্তি এবং আমি বিনা কারণে সন্দেহভাজন। কিন্তু কেন জানি না, থানায় কিন্তু আমাদের অভ্যর্থনাব ত্রুটি হল না : 'কি খবর, একেবারে মিঃ গর্জন

বোসকে সঙ্গে করে ? এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য।' হেঁ হেঁ করে হাসতে হাসতে বড় দারোগা শঙ্করবাবু দুটো চেয়ার এগিয়ে দিলেন। এই আপ্যায়নে কিছুটা ব্যঙ্গ ছিল কিনা কি জানি! আমরা তো বসলাম।

গর্জন খুব বিনীত ভাবে বলল, 'আপনাদের কাছে দু-একটা কথা জানতে এলাম।'

শঙ্করবাবু বললেন, 'বলুন। তার আগে দু-কাপ চা দিই?'

চা এলো। থানার আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ। গর্জন কথা চালাতে লাগল, 'আচ্ছা, মৃতের ঘরটা নিশ্চয় আপনারা ভালো করে দেখেছেন?'

শঙ্করবাবু বললেন, 'তা দেখেছি, কিছুই তো পেলাম না। বিছানাপত্র, দু-একটা বই, এই কিছু জামাকাপড়, একটা লাঠি—এই সব কিছুই সন্দেহজনক নয়।' একটু থেমে দারোগাবাবু বললেন, 'শুধু একটা জিনিস বাদে—'

আমি অনুমান করে বললাম, 'কি. একটা গাঁজার কল্কি ?'

দারোগাবাবু যেন অবাক হলেন, 'সেকি, গুরুদাস খাসনবিশ গাঁজা খেতো নাকি?'

আমি বললাম, 'সেই রকমই গন্ধ আসত ওর ঘর থেকে।'

শঙ্করবাবু যেন একটু বিব্রত হলেনঃ ' না, গাঁজার কল্কি বা ওসব কিছু তো পাই নি, তবে একটা অন্য জিনিস পেয়েছি—যেটা গুরুদাস খাসনবিশের ঘরে কেন ছিল তা বুঝতে পারছি না।'

গর্জন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'জিনিসটা কি ?'

শঙ্কববাবু হঠাৎ মেঝেতে বুট ঠুকে বললেন 'কোই হ্যায়।' একটা সেপাই এসে সেলাম জানাল। শঙ্করবাবু তাকে বললেন, 'মালখানা—'

একটু পরে মালখানাব জমাদারবাবু এলো। তাকে শঙ্করবাবু একটা ছোট শ্লিপ লিখে দিলেন। একটু পরে সে একটা রবার স্ট্যাম্প নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল। সামনে একটা কালির প্যাড ছিল, তাতে একটা ছাপ দিয়ে কাগজে ছাপ দিলেন শঙ্করবাবু। বারাসতের এক সাব-রেজিস্ট্রারের নামে একটা রবারস্ট্যাম্প। সরকারী অফিসারেরা নাম সই করে নিচে যে ধর'নর স্ট্যাম্প দিয়ে থাকেন, এটাও ঠিক তাই।

গর্জন একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, সাব রেজিস্ট্রাররা তো গেজেটেড অফিসার ?'

আমি সরকারী ব্যাপার একটু-আধটু জানি। তাই বললাম, 'হ্যাঁ।'

গর্জন কি একটু ভাবল, রবারস্ট্যাম্পটা একটু নাড়াচাড়া করল। তারপর বলল, 'খুব সম্ভব এ নামে কোন সাব-রেজিস্ট্রার নেই। দেখবেন তো একটু খোঁজ নিয়ে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'আমরা খোঁজ নিয়েছি, এ রকম কেউ বারাসতে নেই। এই স্ট্যাম্পে যে নাম আছে সিভিল লিস্টে সেই নামে কোন লোকই নেই।'

গর্জন বলল, 'তাহলে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, পরে দেখা হবে, এখন আমরা উঠি।'

আমরা বেরিয়ে আসতে দেখি শশক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিপরীত ফুটপাথে সালোয়ার কামিজ পরা তরলা একটি মেয়েকে অপাঙ্গে দেখছে। গর্জন আর আমাকে দেখতেই পায় নি। গর্জন আস্তে এগিয়ে গিয়ে শশকের পিঠে হাত রাখলঃ 'কি ব্যাপার, ওয়াচ করছ নাকি?'

শশক লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, না। আপনাদের কি হল ?'

'আমাদের কিছু হয় নি; তোমার কিছু হল ?' একটু হেসে প্রায় প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে গর্জন প্রশ্ন করল।

শশক আরো লজ্জা পেয়ে গেল। গর্জন এ বিষয়ে আর কথা বাড়াল না। বলল, শোন কাল দুপুরে তোমার দুটো কাজ আছে। একবার যেতে হবে গুরুদাস খাসনবিশের পুরনো অফিসে। সেখানে যারা পুরোনো কর্মচারী আছে, তারা নিশ্চয় গুরুদাসকে চিনবে। তাদের কারো কাছ থেকে গুরুদাস দেখতে কেমন ছিলেন, আচার-আচরণ কেমন ছিল, তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু খবর পাও, সংগ্রহ করবে। আর একবার যাবে পেনসন অফিসে। গুরুদাস খাসনবিশের পেনসেন তিনি নিজে গিয়ে নিতেন, না আর কেউ নিতো, তাহলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট, গেজেটেড অফিসারের সই—এগুলো লাগে অথরিটি দিয়ে পেনসন নিতে—ও গুলোও দেখে এসো। দুপুরে এসব খোঁজ-খবর নিয়ে সোজা আমার বাসায় চলে আসবে।'

শশককে নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেলে গর্জন তাকে ছুটি দিয়ে দিল। আমি একটু বোকা বোধ করছিলুম নিজেকে। জিজ্ঞাসা করলাম গর্জনকে, 'এসব খবরের দরকার কি ?'

গর্জন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সেসব কাল জানা যাবে। কাল দুপুরে আমার ওখানে যাবে, তখন আলোচনা করা যাবে। চলো, এখন একটা সিনেমা দেখে আসি—'

বিখ্যাত বিদেশী সিনেমা চলছিল চৌরঙ্গীর একটা হলে। হাউস ফুল। যথারীতি বাইরে থেকে ব্ল্যাকে দুটো টিকিট কেটে ঢুকলাম। সেন্সরবোর্ড কেটে আর কিছু অবশিষ্ট রাখে নি, ইন্টারভ্যাল পর্যন্ত দেখে বিরক্তি ধরে গেল। দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। গর্জন বলল, ' ধরে নেওয়া যাক এখানেই বই শেষ। সেন্সর ইচ্ছে করলে শেষেবটুকু সব কেটে দিতে পাবত—ধরো তাই করেছে।'

রাস্তায় বেরিয়ে গর্জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, 'তোমাকে একটা টাস্ক দিচ্ছি, আজ সারারাত আর কাল সকালে ভেবে রাখবে, দুপুরে আমাকে বলা চাই।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

গর্জন বলল, 'ভালো করে ভেবে রাখবে। যে লোক গাঁজা খায় না, তার ঘর থেকে গাঁজাব গন্ধ কেন বেরোয় ?'

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম ; গর্জন হাত দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন নয়, কাল চাই উত্তর।'

পরের দিন দুপুরে গর্জনের ওখানে আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ—শুধু এইটুকু মনে ছিল, তাব ধাঁধাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আর মনে থাকলেও কিছু করার ছিল না। যে লোক গাঁজা খায় না, তার ঘর থেকে গাঁজার গন্ধ বেরোয় কেন—এ প্রশ্নের জবাব দেবার সাধ্য আমার নেই। আর এটাও জানি যে আমার কাছে জবাবের জন্যে গর্জন বসে নেই ; উত্তর সে নিজেই খুঁজে বের করবে কিংবা ইতিমধ্যে করে ফেলেছে।

গর্জনের বাড়িতে যথাসময়ে পৌঁছে দেখি শশক ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। তিনজনে খেতে খেতে কথা হল। গর্জন শশককে বলল, 'গুরুদাস খাসনবিশের অফিসে গিয়েছিলে ?'

শশক বলল, 'গুরুদাসবাবু যদিও অনেকদিন রিটায়ার করেছিলেন, তবু অফিসে অনেকেই তাঁকে চেনে। অনেকদিন কাজ করেছিলেন কিনা, পুরোনো লোকেরা সবাই তাঁকে ভালভাবে জানে। তবে

গত দেড় বছর তাঁকে দেখে নি। ওই বদরিনাথ না লছমন ঝোলা, কোথায় গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে হাত-পা ভেঙে ফিরে এসেছিলেন। তারপর আব অফিসে যান নি।'

আমি বললাম, 'সেকি, আমি যতদূব জানি, গুরুদাসবাবু মাসে অন্তত একবার অফিসে যেতেন ওই পেনসন আনতে। তাছাড়া তাঁর পেনসন কে এনে দিত ?'

গর্জন হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিযে শশককে প্রশ্ন করল, 'তাহলে পেনসনের লেটার অফ অথরিটি কার নামে দেখলে ?' বলে নিজেই প্রশ্নের সুরে উত্তর দিল, 'হরিদাস খাসনবিশ ?'

শশক এবং আমি দুজনেই অবাক হলাম। শশক গর্জনকে বলল,' আপনিও গিয়েছিলেন নাকি গুরুদাসেব অফিসে ?'

'আরে না, এই দেখ বলে একটা কাগজের টুকবো এগিয়ে দিল।' তাতে লেখা রয়েছে হরিদাস খাসনবিশ।

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা কি হল ?'

গর্জন বলল, দাঁড়াও, খাওয়া সেরে নিই ; তারপর ব্যাপারটা কি হল দেখা যাবে।'

খাওয়া শেষ হল। আমার অতি প্রিয় বেনারসী সুপুরি আর দানা জর্দা দেওয়া মিঠে পান আনতেও গর্জন ভোলে নি।

মিঠে পান চিবোতে চিবোতে গর্জনের শোবার ঘরে গিয়ে দুজনে দুটো পাশবালিশে হেলান দিয়ে বসলাম। শশক একটা মোড়া টেনে নিয়ে একটু ওপাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল।

একটা হাই তুলে গর্জন একবার বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য বিড়বিড় করে গাইল বলে মনে হল, তারপরে আর একটা হাই তুলে চোখ বুজে এলিয়ে পড়ল।

আমি বাধ্য হযে ওকে একটা ছোট ধাক্কা দিলাম। গর্জন একটা চোখ, তাও অর্ধেক খুলে, কামরাজ নাদাবের স্টাইলে একটা হাত তুলে বলল, 'পারকালাম।'

একটু পরে গর্জনের নাসিকাগর্জন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আমি আর শশক অধৈর্য হযে উঠলাম। এবং তারপরে ক্রমশ দুপুব কেটে গিয়ে বিকেল হল। গর্জন ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুলো। আমরা সবাই চা খেলাম।

চা খাওয়া শেষ করে গর্জন বলল, 'যা হোক, আর সাসপেন্স বাড়িয়ে লাভ নেই।' তারপর আমার দিকে সোজা হয়ে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ঘরে যে লোকটা মারা গেছে, তার নাম গুরুদাস খাসনবিশ নয়।' এইটুকু বলেই গর্জন একেবারে চুপ।

'মানে ?'

আমার বিমূঢ়তা দেখে গর্জন কিছুটা সদয় হল ঃ 'মানে তোমার ঘরে যে খুন হয়েছে সে হরিদাস খাসনবিশ, গুরুদাসের ভাই। ছোট ভাই কি বড় ভাই, সেটা আজ বলতে পাবব না। আর গুরুদাস খাসনবিশের মত সাধারণ.ভেতো মাছিমারা লোকটি কেন খুন হতে যাবে ? খুন বিনা কারণে হয় না, গুরুদাস নামে এই সামান্য লোকটিই বা কেন বিনা কারণে খুন হবেন ?'

আমরা আর কিছু বলার আগেই গর্জন প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করতে বসল, 'আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল এই ফলস রবারস্ট্যাম্পটা দেখে। আর তাছাড়া তোমার বর্ণনা ব্যাণ্ডেজ, প্লাস্টার ইত্যাদি লেপটানো গুরুদাসের কথা শুনে। আমার ধারণা, বছর দেড়েক আগেই গুরুদাস ভ্রমণ করতে গিয়ে গায়েব হয়ে যায়। হয় মরে গেছে, না হয় খুন হয়েছে ; কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে যেতেও

পারে—সংসারবন্ধনহীন ব্যক্তির পক্ষে বুড়ো বয়সে সন্ন্যাসী হওয়া বিচিত্র নয়।

'গুরুদাস হারিয়ে গেল। কিন্তু তার স্থানে গুরুদাস সেজে আরেকজন এলো। কি কারণে সে আসতে পারে ? এক : গুরুদাসের সম্পত্তি বা আয়ের লোভে। সম্পত্তি গুরুদাসের যতদুর মনে হয় কিছুই নেই, আয় ওই পেনসনের টাকাটা। ওটার লোভ তেমন কিছু বড় লোভ নয়। ওই সামান্য ক'টা টাকার জন্য মাসে মাসে মিথ্যে ডাক্তারের সই আর গেজেটেড অফিসারের জাল সার্টিফিকেটের ঝামেলা কিছু নয়।

'তবু গুরুদাস বেঁচে আছে, এটা প্রমাণ করার জন্যই গুরুদাসের পেনসন নেওয়া প্রয়োজন। কেননা এমন একজন কেউ আছে, যার আত্মগোপন করা প্রয়োজন—সেটা গুরুদাস খাসনবিশের ছদ্মবেশেই তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ।

'এরকম একটা অবস্থা দাঁড়িয়ে গেলে মনে হয়, একই রকম দেখতে দুজন লোক, যেমন যমজ ভাই—এদের একজনের পক্ষে আরেকজনের ছদ্মবেশে কিছু হাসিল করা খুব অসুবিধে নয়।

'যা হোক, ইতিমধ্যে তুমি ওই গাঁজার গন্ধের ব্যাপারটা বললে। গাঁজা খায় না, অথচ গাঁজার গন্ধ—খুব সহজ সমাধান, নিশ্চয় গাঁজার গন্ধ দিয়ে অন্য কোন গন্ধ ঢাকতে চায়। কিন্তু সেটা কিসের গন্ধ হতে পারে ? আসলে এক্ষেত্রে শাক দিয়ে মাছ না ঢেকে, শাক দিয়ে শাকই ঢাকা হল। মানে গাঁজা দিয়ে গাঁজা, খুব সম্ভব ওই ঘরে কাঁচা গাঁজার কিছু কিছু স্টক থাকত। কাঁচা গাঁজারও একটা মাদক গন্ধ আছে, সেটা ঢাকা দেবার জন্যে একটা গাঁজার ধোঁয়া দেওয়া হত।

'আমার যেই সন্দেহ হল, আমার পেসেন্ট আছেন মল্লিকসাহেব, আবগারির সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাঁকে কাল রাতে টেলিফোন করে বললাম গুরুদাস খাসনবিশ বলে গাঁজার চোরাই ব্যবসায় কোন ব্যক্তি জড়িত আছে কিনা। তিনি আজ দুপুরে অফিস থেকে, তোমাদের যে চিরকুটটা দেখালাম, সেটা পাঠিয়ে জানালেন গুরুদাস নয়, হরিদাস খাসনবিশ নামে একজন দু-বছর ফেরার। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে মল্লিকসাহেবের বিশ্বাস, সে এখনো কলকাতাতেই ওয়েট করছে।

'সমস্যাটা সঙ্গে সঙ্গে জলের মত সহজ হয়ে গেল। তোমার ঘরের মৃত ব্যক্তিটি হরিদাস খাসনবিশ—খুব সম্ভব গুরুদাসের মায়ের পেটের ভাই। যেভাবেই হোক ফেরারী আসামী হরিদাস ভাইকে সরিয়ে প্ল্যাস্টার ব্যাণ্ডেজের ছদ্মবেশে তোমার ঘরে এসে বসেছে। ওখানে বসেই গাঁজার কারবার চালায়, খুব সম্ভব হোটেলের যে ছেলেটা ভাত নিয়ে আসে, তার মারফৎ। গাঁজা খুবই বহুমূল্য জিনিস। যে টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত এলো, সেই ক্যারিয়ারেই গাঁজা এলো কিংবা গেল—একবারে একটা টিফিন ক্যারিয়ারে দু চার হাজার টাকা দামের গাঁজা চালান কিছুই নয়।

'হরিদাস এক-আধবার ঘর থেকে বেরুতো। পেনসন আনতে যেতো। সেখানে কিন্তু হরিদাস খাসনবিশ নামই ব্যবহার করত গুরুদাসের অথরিটি লেটারে। পেনসন অফিসে আর আবগারি মামলার ফেরারী আসামীকে কে চিনবে ? গুরুদাসের পুরনো অফিস তাই সেখানে আর নিজেকে গুরুদাস বলে দাবি করে নি, কারণ সেখানে অনেকেই গুরুদাসকে দীর্ঘকাল ধরে চেনে।'

গর্জন কথা বলা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপাতত এ কাহিনী শেষ। আমাকে এবার চেম্বারে যেতে হবে।'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, 'তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ?'

গর্জন বিরক্ত হয়েই যেন বললে, 'বুঝতে পারলে না! গুরুদাস নয়, হরিদাস মরেছে তোমার ঘরে—'

আমি তবুও হাল ছাড়লাম না : 'কিন্তু তাতে তো কিছু হেরফের হচ্ছে না। একজন তো নিশ্চয় খুন হয়েছে! হরিদাস কেন খুন হল, কে খুন করল ?'

গর্জন তাকাল : 'সে রহস্যের সমাধান কি আজকেই করতে হবে?'

আমি অসহায়ের মত বললাম, 'তাহলে?'

গর্জন হাসল। একবার ঠোঁটটা বিড়বিড় করে বুদ্ধির্যস্য গাইল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে।'

প্রণবেশের বিপদ

প্রণবেশ ছেলেটি ভাল। কোন খারাপ বুদ্ধি নেই। মোটামুটি লেখাপড়া করে। এ বছর সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এই মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়েই সে একটা ভাবি বিপদে পড়েছিল।

প্রণবেশ যে স্কুলে পড়ে সেটা বেশ নামকরা স্কুল, সেই স্কুলের ছেলেরা কড়া শাসনের মধ্যে লেখাপড়া শিখেছে তাদের কিছুটা শৃঙ্খলাবোধ আছে। কিন্তু প্রণবেশদের যে সেন্টারে সিট পড়েছে সেখানে আরেকটা খুব বদ্দি স্কুলের সিট পড়েছে। বেশি বয়েস, কেমন চোয়াড়ে গুণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার পরীক্ষার্থী সব। প্রথম দিন হলে পৌঁছাতে এসে প্রণবেশের মা তাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন, এসব ছেলের থেকে দুরে থাকবে, একদম কথাবার্তা বলবে না।'

কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো দূরে থাকা যায় না। একই ঘরে, একই বেঞ্চিতে এই রকম ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

প্রথম দুদিন কোন রকমে কাটল। অন্য স্কুলের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে, খাতা চালাচালি করে। এমন কি পকেট থেকে ছোট ছোট কাটা কাগজ বার করে তার টাকাটুকি চালাল। দুদিনই এক বুড়ো ভদ্রলোক গার্ড দিচ্ছিলেন, তাঁকে তারা পাত্তাই দিল না, বরং ওমকে বলল, 'যান দাদু বাইরে যান।'

এরই মধ্যে প্রণবেশরা কোনরকমে মাথা নিচু করে কোন কিছুতে কান না দিয়ে নিজেদের সাধ্যমত পরীক্ষা দিয়ে গেল। বিপদ ঘটল তৃতীয় পরীক্ষার দিনে ফার্স্ট হাফে। আজ সেই বুড়ো ভদ্রলোক গার্ড দিতে আসেন নি তাঁর বদলে এসেছেন মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা কদমছাঁট চুল, মারকুটে চেহারার এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক; ভাল রেফারি যেমন শক্ত হাতে গোলমেলে খেলার রাশ টেনে ধরেন তেমনিই এই মারকুটে ভদ্রলোক প্রথম থেকে স্কুলের পরীক্ষার্থীদের তাদের অন্যায় কাজে বাধা দিতে লাগলেন। প্রথম পনের মিনিট ব্যাপারটা তাঁর খুব আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তারপরে আস্তে আস্তে তিনি অবশিষ্ট ছেলেদের বাগ মা..য়ে ফেললেন।

তবে সব ছেলে নয়, দু' একটি ছেলে এরই মধ্যে যতটুকু পারছে টোকাটুকির চেষ্টা করে যাচ্ছে। এদেরই একজন ধরা পড়ল দুই ঘণ্টার মাথায়। কদমছাঁট গার্ড ছেলেটির খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে তার খাতার নিচে থেকে বার করলেন নোটবই থেকে ব্রেডদিয়ে কেটে আনা উত্তরের অংশ। জোর করে খাতা কেড়ে নিয়ে তাকে হিঁচড়িয়ে টেনে বের করে দিলেন গার্ড। ছেলেটি কিন্তু

অনমনীয়, দরজা থেকে বেরোনোর মুখে হাতের প্রশ্নপত্রটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল, হাতের কালির দোয়াতটা সিঁড়ির উপরে ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলল। কাঁচের টুকরো আর কালি ছিটিয়ে পড়ল সারা সিঁড়িতে, তারপর ছেলেটি একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে 'ধুত্তোরি, লেখাপড়ার নিকুচি করেছে,' বলে হন হন করে সেন্টার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গেল। পরীক্ষার খাতা লিখতে লিখতে প্রণবেশ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল ছেলেটা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে গেটের পাশের একটা পাতাবাহারের ঝোপে নিজের পকেট থেকে কলমটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পরীক্ষার ব্যস্ততার মধ্যেও প্রণবেশ এটা দেখে ভাবল, বাবাঃ এত রাগ!

টিফিনের সময় এ সব কথা ভুলেই গিয়েছিল প্রণবেশ। বিকেলে ইতিহাস পরীক্ষা। গেটের পাশে পাতাবাহারের ঝোপের ওখানটায় একটু ছায়া আছে। সেইখানে গিয়ে প্রণবেশ বসল শেষ মুহূর্তে ইতিহাস বইটায় একটু চোখ বুলিয়ে নেবার জন্যে। ঘাসের ওপরে বসতেই প্রণবেশ দেখল একটা কলম সামনেই পড়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই সেই ছেলেটার কলম।

ঘাসের উপর কলমটা পড়ে রয়েছে, প্রণবেশ ইতিহাস বইটার পৃষ্ঠায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কি ভেবে প্রণবেশ পায়ের কাছ থেকে কলমটা তুলে নিল। এর পরেই প্রণবেশ ইতিহাস বইটা বন্ধ করে দিল। তার মনে হল আর পড়ে লাভ নেই। যা হয়েছে, হয়েছে। আস্তে আস্তে উঠে একটু ইস্কুলের মাঠের মধ্যে ঘুরেফিরে প্রণবেশ সিটে গিয়ে বসল। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পনের মিনিট আগের ঘণ্টা পড়তে আগের দিনগুলোর সেই নরম বুড়ো ভদ্রলোক খাতা হাতে এলেন। তা হলে ওবেলার সেই কদমছাঁট, মারকুট্টে গার্ড আসছেন না!

পাঁচ মিনিট আগের ঘণ্টা বাজল। আরেকটু পরেই প্রশ্নপত্র বিলি হবে। অন্যদিন এই সময় আর সকলের মত প্রণবেশ উঠে গিয়ে সামনের টেবিলটার উপরে বইটই রেখে আসে। আজ কিন্তু তার কেমন মনে হল, থাকুক না বইটা কাছে। যদি হঠাৎ দরকার পড়ে খুলে দেখলেই হবে। বুড়ো গার্ড একটু একপাশে যেতেই প্রণবেশ ডেস্ক থেকে বইটা নামিয়ে বেঞ্চির উপরে নিজের কোলের কাছে রাখল।

প্রশ্নপত্র পেয়ে প্রণবেশ প্রথম দুটো প্রশ্নে চোখ বুলোতেই তার মনের মধ্যে অদম্য একটা ইচ্ছা এল বইটা খুলে লিখতে। কিন্তু ব্যাপারটা সন্তর্পণে করতে হবে। বুড়ো গার্ড হয়ত ধরতে পারবে না, কিন্তু নিজের ইস্কুলের বন্ধুরা রয়েছে, তারা কি ভাববে, কি ধারণা করবে?

প্রণবেশের মনের মধ্যে সুমতির আর কুমতির যুদ্ধ চলতে লাগল। তারপর কুমতি জিতল, প্রণবেশ সিদ্ধান্ত নিল যে যা ভাবে ভাবুক, সে বই দেখেই লিখবে। লেখার জন্যে পকেট থেকে কলম বার করতে গিয়ে সেই ছেলেটার কলমটা তার হাতে উঠে এল। এই ছেলেটার স্কুলের বন্ধুরা এখানে আছে, তাদের কারো কাছে কলমটা দিয়ে দেবে, এই ভেবে প্রণবেশ কলমটা ডেস্কের একপাশে রাখল।

এবং কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ঐ ছেলেটার কলমটা দূরে রেখে দেওয়া মাত্র প্রণবেশের মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। সে ভাবল, ছি ছি, এ আমি কি করতে যাচ্ছিলাম! বই দেখে লিখতে যাচ্ছিলাম, যদি ধরা পড়ে যেতাম কি হত? প্রণবেশ ঠিক করল, 'ভুল হয়ে গেছে', এই বলে বুড়ো গার্ডকে ডেকে বইটা হাতে তুলে দেয়। এখনও তো উত্তর লেখা আরম্ভ করেনি, সুতরাং দোষ কিছু হয় নি।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল। সেই কুড়িয়ে পাওয়া কলমটা কোন কারণে ডেস্কের উপর থেকে গড়িয়ে প্রণবেশের পায়ের কাছে পড়ে গেল। প্রণবেশ মাথা নিচু করে কলমটা হাত দিয়ে ধরল। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রণবেশের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেন ফেরত দেব ? দেখে লিখব, যা হয় হবে। ডেস্কের নিচ থেকে তখনও মাথা তুলে আনে নি সে, এই সামান্য সময়েই তার মনটা এরকম বদলে গেল।

এই পরিবর্তনের জন্যেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, একটু অন্যমনস্ক ভাবে মাথা তুলতে গিয়ে প্রণবেশের মাথাটা ডেস্কের নিচের দিকে ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল কলমটা।

কি ভেবে প্রণবেশ আর কলমটা মেঝে থেকে কুড়াল না। সেই মুহূর্তে আবার তার মনের মধ্যে সুমতির জয় হয়। দু' চার নম্বর কম হয় হোক, সে কিছুতেই বই টুকে লিখবে না। প্রণবেশ বেঞ্চির উপর থেকে ইতিহাস বইটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর গার্ড ভদ্রলোককে ডেকে বলল, 'স্যার, আমার এই বইটা।' গার্ড ভদ্রলোক কিছুই ভাবলেন না, বইটা হাতে নিয়ে সামনের টেবিলে রেখে দিলেন।

খাতা খুলে প্রশ্নের উত্তর লিখবার আগে একবার আড়চোখে সেই বিষধর কলমটা দেখে নিল প্রণবেশ। কি সাংঘাতিক কলম, যতবার ছুঁয়েছে মন বিষিয়ে উঠেছে। আর যাতে ছুঁতে না হয় এই ভেবে প্রণবেশ অনেকটা সরে বসল। তারপর লেখা আরম্ভ করতে করতে ভাবল, কি বিপদ হযেছিল, রাস্তা পেয়ে গেলাম। সেই সঙ্গে একথাও তার মনে হল এই খারাপ কলমটা যে ছেলেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেও হয়ত ভাল হয়ে গিয়েছে এর সংস্পর্শ থেকে সরে গিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কাছে দেখা গেল দ্রুত ছুটে আসছে সেই ছেলেটি, 'স্যার, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।' বুড়ো ভদ্রলোক তাকে তাড়াতাড়ি খাতা, প্রশ্ন এগিয়ে দিল। সে গিয়ে নিজের সিটে বসল। তার পায়ের কাছেই পড়ে ছিল তার পুরানো কলমটা, সে সেদিকে না তাকিয়ে পকেট থেকে অন্য একটা কলম বার করে লিখতে বসল। তার মুখ এখন অনেক নরম দেখাচ্ছে।

সেই ভদ্রলোক

সুরমা কদাচিত টেলিফোন করে। তার বাড়িতে কিংবা যে ইস্কুলে সে কাজ করে তার কোথাও টেলিফোন নেই। তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে সে টেলিফোন করে না। আর তা ছাড়া দু'জনের মধ্যে দেখা যখন নিয়মিতই হয়, ফোনের আর দরকার পড়ে না।

সুতরাং এই অবেলায়, বিকেল চারটের সময় অফিসে বসে ফাইল দেখতে দেখতে টেলিফোন ধরে হঠাৎ সুরমার গলা শুনতে পেয়ে রাখাল বুঝলো গুরুতর কিছু হয়েছে।

'হ্যালো' শুনেই রাখাল বললো, 'কে সুরমা, আমি রাখাল বলছি, কি ব্যাপার ?'

সুরমার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট উদ্বিগ্নতা, 'শোনো, এইমাত্র খবর এসেছে বড় জামাইবাবুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেছে, তুমি একটু আসতে পারবে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি যাচ্ছি। এই পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবো।' টেলিফোন নামিয়ে হাতের অর্ধ-সমাপ্ত ফাইলটা মুলতুবি রেখে রাখাল উঠে পড়লো।

সুরমাদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে রাখালের যে খুব ভালো আলাপ আছে তা নয়। এই বড় জামাইবাবুকে সে চেনে না, তবে সুরমার কাছে এর কথা কখনো কখনো শুনেছে।

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সিঁড়ির গোড়াতেই সুরমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সুরমা চাপা গলায় বলল, 'উনি বোধ হয় বাঁচবেন না। যাই হোক, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও।'

সুরমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালো হল। না হলে এই রকম পরিবেশে সুরমার আত্মীয়স্বজনের সামনে রাখাল একটু বিব্রতই হতো। সুরমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা তো পাকাপাকি এখনো কিছু হয়নি, আর ওদের আত্মীয়স্বজনেরা অনেকেই তাকে চেনে না।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলো রাখাল। সুরমার এক দাদা, আর একজন বোধ হয় অন্য এক জামাইবাবু, ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন। সকলের মুখ দেখে মনে হচ্ছে—যা হবার হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের আর বোধ হয় বেঁচে থাকবার কোনো সম্ভাবনা নেই, শুধু যেটুকু শেষ চেষ্টা করা উচিত তাই করা হচ্ছে।

কি হয়েছিলো ভদ্রলোকের, পথে কোন দুর্ঘটনা না বাড়িতে, কেমন করে কি ঘটলো, কিছুই জানে না রাখাল। সে উল্টোপাল্টা কথা ভাবছিলো সব। একটা দুর্ঘটনা আর দশটা দুর্ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়, খুব কাছাকাছির ঘটনা হলে দু'চার দিনের জন্য মানুষকে একটু ভীরু করে তোলে। রাখালের মনে আছে, তাদের ছোট বয়সে যখন গ্রামে থাকতো তখন কেউ হঠাৎ গ্রামে সাপের কামড়ে মারা গেলে বেশ কিছুদিন সবাই রাতে রাস্তায় লণ্ঠন, টর্চ ইত্যাদি ব্যবহার করা শুরু করে দিতো। তারপরে আবার যে কে সেই।

এই সব ভাবছে রাখাল, এই সময় তার পাশে এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, একটু শৌখিন স্বভাবের মনে হয়, পাতলা পাঞ্জাবি, তাঁতের ধুতি, পায়ের জুতোর পালিসও ঝকঝকে। রাখাল তাঁর দিকে তাকাতে তিনি মৃদু, করুণ, সমবেদনার হাসি হাসলেন। রাখালের মনে হলো ইনি সুরমাদের কোনো আত্মীয়, মামা বা কাকা কেউ হবেন। কিংবা এমন হতে পারে, ইনি বোধহয় ঐ বড় জামাইবাবুর কোনো বন্ধু কিংবা সহকর্মী।

এই দ্বিতীয় ধারণাটাই সত্য বলে মনে হলো। কারণ সুরমার আত্মীয়রা যাঁরা ঘন ঘন ছুটোছুটি করছিলেন তাঁরা কেউ এঁকে চেনেন বলে মনে হলো না। সুরমাও দু'একবার রাখালের কাছে এসে দাঁড়ালো, সেও এই ভদ্রলোককে চেনে এ রকম বোঝা গেলো না।

অথচ রাখাল দেখলো যে, এই ভদ্রলোক উদ্বিগ্নভাবে মধ্যে মধ্যে খোঁজখবর নিচ্ছেন , কেমন আছে, বাঁচার আশা আছে কিনা, কি করে হলো এইরকম সব খুচরো প্রশ্ন। কখনো নার্সকে, কখনো দারোয়ানকে, কখনো সুরমার আত্মীয়-স্বজনদের কাউকে ছোট ছোট প্রশ্ন করছেন, উত্তর হয়তো পাচ্ছেন বা পাচ্ছেন না।

মিনিট পনেরো পরে সুরমা যখন আরেকবার এলো, তিনি সুরমাকেও জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেঁচে যাবেন বলে মনে হচ্ছে ?' সুরমা হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে জানালো, 'না।'

ইতিমধ্যে ইমার্জেন্সির ডাক্তারেরা 'মৃত' ঘোষণা জারি করে দিয়েছেন কিন্তু জানা গেলো যে, এখান থেকে সরাসরি মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রথমে করোনারের আদালত থেকে ময়না তদন্ত হবে, তারপর লাশ খালাশ পাবে।

কেউ কেউ ভাবলো ময়না তদন্ত মকুব করানো সম্ভব কিনা কিন্তু দেখা গেলো তা করতে যেটুকু হাঙ্গামা হবে, তার চেয়ে ময়না তদন্ত করতে দেওয়াই ভালো।

রাখালের এ সব বিষয়ে বিশেষ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, আর তাছাড়া প্রেমিকার কুটুম্ব বাড়ির পারিবারিক ব্যাপারে জড়িত হওয়ার ইচ্ছেও খুব নেই তার। সে যথাসাধ্য গা বাঁচিয়ে নির্বিকার থাকতে চাইলো।

দেখা গেলো, সেই ভদ্রলোকও একটু গা বাঁচিয়ে মূল ঘটনার থেকে একটু দূরে রাখালের পাশেই সহানুভূতিময় দর্শকের ভূমিকায় অবস্থান করলেন।

কিন্তু একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসলেন ভদ্রলোক, যখন মৃতদেহটিকে করোনারের ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চাকা লাগানো মর্গের স্ট্রেচার গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো, তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহটির আবরণ তুলে একবার দেখলেন, তারপর সুরমাদের বাড়িরই কাউকে বললেন, 'ওখানকার মেথরেরা সব কাপড় জামা খুলে নিয়ে নেবে, তার আগে আপনারা নিয়ে নিন।' তাঁর এই প্রস্তাবে কেউ কেউ যেন একটু চঞ্চল হলো, কিন্তু এইরকম মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে এই তুচ্ছ কৃপণতায় কেউ যেন শেষ পর্যন্ত প্রশ্রয় দিতে চাইলো না।

ভদ্রলোক যখন মুহূর্তের জন্য মৃতদেহটির ওপর থেকে সাদা চাদরটি সরিয়ে দেন তখন রাখালের চোখে পড়েছিলো—দোমড়ানো হাত, পিষে যাওয়া বুক, রক্তে মাখামাখি জামা। বীভৎস দৃশ্য, রাখালের সারা শরীর শিউরে উঠেছিলো।

অথচ ঐ ভদ্রলোক কেমন অবলীলায় মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রাখাল বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো। আরো বিস্মিত হলো যখন সে দেখলো যে ভদ্রলোক ওঁর পরামর্শ কেউ নিলো না দেখে আরেকটি বিচিত্র কাজ করে বসলেন।

যারা সেই স্ট্রেচাব গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলো তাদের হঠাৎ হাত দিয়ে থামিয়ে আরেকবার সেই সাদা চাদরটি তুলে ফেললেন ভদ্রলোক। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে মৃতদেহের রক্তাক্ত জামার পকেটে হাত দিয়ে একটা রুমাল বের করে নিলেন। কাজ সাবা হযে গেলে তিনি স্ট্রেচার-বাহকদের অঙ্গুলিহেলনে ইশারা করলেন আবার ঠেলে নিয়ে যেতে।

ভদ্রলোকের আচবণেব আকস্মিকতায় সবাই একটু হকচকিয়ে গেলো। উপস্থিত কেউ ভদ্রলোককে চেনে বলে মনে হলো না বা বোঝা গেলো না।

সুরমার মেজদা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি কিছুটা বিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই একটা স্মৃতিচিহ্ন রেখে দিলাম।' বলে ঐ রুমালটা উঁচু করে একবার দেখিয়ে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

সুরমা রাখালের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মেজদাকে উদ্দেশ্য করেই বোধহয় একবার ফিসফিস্ করে বললো, 'বড় জামাইবাবুর কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বোধহয় উনি।'

রাখালেবও তাই মনে হচ্ছিলো। কিন্তু দুর্ঘটনায় মৃত সুহৃদের স্মৃতিচিহ্ন এই উপায়ে সংগ্রহ করার মধ্যে যে পাগলামি বা অস্বাভাবিকতা রয়েছে সেটাও তার কাছে একটা খটকা বলে মনে হলো।

এর প্রায় মাস দেড়েক পরের কথা। আকস্মিক মৃত্যুর ধাক্কা এবং শোক প্রায় কাটিয়ে উঠেছে সুরমা এবং তার পরিবারের লোকেরা। এমন সময় একদিন কথায় কথায় সুরমা রাখালকে বললো , দ্যাখো, বড় জামাইবাবুর সেই বন্ধুর সঙ্গে আমার এখন মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। তিনি দেখলাম আমাদের বাড়ির কাছেই থাকেন।'

'কোন্ বন্ধু ?' রাখাল সেই হাসপাতালের ঘটনাটা এর মধ্যেই প্রায় ভুলে ফেলেছিল। সুরমা একটু বলতে তার মনে পড়লো। একটু থেমে থেকে তারপর সে বললো, 'কিন্তু সেদিনের সে ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য মনে হয়নি তোমার ?'

সুরমা বললো, 'হ্যাঁ, ভদ্রলোকের এমনি সবই ঠিক আছে কিন্তু আচার-আচরণে কোথায় যেন গোলমেলে ব্যাপার আছে। একেক সময় আমার দিকে এমন করে তাকান, বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।'

রাখাল বললো, 'ভদ্রলোক কি তোমার বড় জামাইবাবুর সহকর্মী ছিলেন, নাকি অন্যরকম কোনো বন্ধু ?'

সুরমা বললো, 'সে আমি ঠিক জানি না। ওঁকে কিংবা আর কাউকে জিজ্ঞাসা করাও হয়নি। আসলে ঐ ভদ্রলোককে ঐ দিনের আগে কখনো দেখিনি এবং তারপরে এই যা রাস্তায় দেখা হয়েছে। এমন কি শ্রাদ্ধের দিনও বড় জামাইবাবুর বাড়িতে ওঁকে দেখি নি।'

রাখাল কি ভাবছিল, সুরমা বললো, 'উনি একদিন ওঁর বাড়িতে আমাদের যেতে বলছেন!'

'আমাদের ?' রাখালের ভুরু একটু কোঁচকালো।

'হ্যাঁ। সুরমার কণ্ঠস্বর বেশ তরল হলো, 'উনি সেদিন ঐ পনেরো মিনিট দেখেই আমাদের সম্পর্কটা বেশ আঁচ করে নিয়েছেন। সুতরাং ভদ্রতার খাতিরে শুধু আমাকে একা নিমন্ত্রণ করতে চান নি।'

এর ঠিক পরের সপ্তাহে রবিবার দিন সকালবেলা সুরমাদের বাড়ির থেকে একটু দূরে চৌমাথায় সুরমার জন্যে রাখাল অপেক্ষা করছে, এমন সময় সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি মুখোমুখি হতেই স্মিত মুখে রাখালকে বললেন, 'এই যে, এখানে একা একা! ও, অপেক্ষা করছেন বুঝি ?'

ভদ্রলোকের সঙ্গে রাখালের একেবারেই পরিচয় নেই বলা চলে, তার উপরে এই গায়ে-পড়া ভাব, রাখালের একটু অস্বস্তিই বোধ হচ্ছিলো। এর মধ্যে সুরমা এসে গেলো। ভদ্রলোক সুরমাকেও মৃদু হাসিতে অভ্যর্থনা জানালেন, যেন তাঁর বাড়িতেই একটু ঘুরে যেতে, এই কাছেই তাঁর বাড়ি। ভদ্রলোক কেমন যেন নাছোড়বান্দা ধরনের।

রাখালের হাতে সময় ছিলো, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা নয় ঐ ভদ্রলোকের ওখানে যায়। সে বানিয়ে বললো, 'আমার এই দেশপ্রিয় পার্কের সামনে এখনই একবার যেতে হবে, ওখানে একজন আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। বরং, সুরমা, তুমি ওঁর বাড়ি ঘুরে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে চলে এসো এই আধ ঘণ্টার মধ্যে।'

রাখালের ক্ষীণ আশা ছিলো এবার ভদ্রলোক হয়তো বলবেন, 'ঠিক আছে, আপনাদের যখন অসুবিধা হচ্ছে আজ থাক, পরে অন্য একদিন আসবেন।'

কিন্তু দেখা গেলো, রাখালের এ প্রস্তাবে কার্যত তিনি খুশীই হয়েছেন। সুরমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে আপনিই চলুন, এখুনি চলে আসবেন।' তারপর ঘুরে রাখালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিও অবশ্যই একদিন আসুন, আমার বাড়িতে এমন একটি সংগ্রহশালা আছে যা এই পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাবেন না।'

ভদ্রলোকটিকে এতদিন রাখালের অমায়িক ও বোকা বলে মনে হয়েছে, এই কথার পর

কেমন অকারণ দাম্ভিক বলেও মনে হলো। কি এমন সংগ্রহশালা থাকতে পারে সাধারণ মধ্যবিত্ত এক বাঙালীর, যার তুলনা পৃথিবীতে নেই ?

আধ ঘণ্টা পরে রাখাল দেশপ্রিয় পার্কের সামনে অপেক্ষা করছে সুরমার জন্যে। যেমন হয় প্রায় তিন-চার মিনিট ধরে কোনো বাস নেই, তারপরে একসঙ্গে পর পর সামনে পিছে তিনটে ডবল ডেকার। মধ্যের ডবল ডেকারটা হঠাৎ সামনেরটার পাশ কাটিয়ে স্টপে এসে দাঁড়ালো। রাখাল দেখলো এই বাসটা থেকেই সুরমা নামছে। রাখালের কিঞ্চিৎ আশঙ্কা ছিলো যে, ঐ ভদ্রলোক আবার সঙ্গে না আসেন, সে আশ্বস্ত হল এই দেখে যে, না, সুরমা একাই নামছে।

কিন্তু সুরমার আর নামা হলো না। যে বাসটাকে কাটিয়ে এই বাসটা এসে দাঁড়িয়েছিলো সেই বাসটা আর পিছনের একটা বাস প্রতিযোগিতা করে হুড়মুড়িয়ে একই সঙ্গে এই স্টপে দাঁড়াতে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে, রাখাল বা অন্য কেউ কিছু বুঝবার আগে সুরমা একটা বাসের তলায় বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

হৈ-চৈ চীৎকাব ভিড় ইত্যাদির মধ্যে যখন শেষে গাড়ির চাকার নীচে পিষ্ট দলিত সুরমার শবীব উদ্ধাব করা হলো, সেটা দেখে বাখালের মনে হলো এর চেয়ে চিরকালের মত এই শরীর গাড়ির চাকাব নীচে থাকলেই হতো।

মাস দুয়েক পরে একদিন বিকালবেলা অফিস থেকে বেবিয়ে রাখাল তার পিসেমশায়কে পি জি হাসপাতালে দেখতে গেছে। হার্ট অ্যাটাক হয়েছিলো, তবে এযাত্রা বোধ হয় বেঁচে গেলেন—এক পিসতুত ভাইয়ের সঙ্গে এই সব আলোচনা কবতে করতে বেরিয়ে আসছে আচমকা সেই ভদ্রলোকের সাথে আবার দেখা।

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডেব সামনে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডেব সামনে প্রথম যেদিন রাখাল তাঁকে দেখেছিলো একেবারে সেই ভঙ্গি। সেই ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি, পালিশ করা চকচকে জুতো।

ভদ্রলোক রাখালকে দেখে এগিয়ে এলেন। রাখালই প্রথম কথা বললো,'এই যে. এখানে কি খবব?' এই প্রশ্ন করতে রাখালের মনে পড়লো সুরমার সেই মৃত্যুর দিনের কথা। মনে পড়লো এর বাড়ি থেকেই ফিরতে গিয়ে সুরমা বাসে চাপা পড়লো।

সুরমার জামাইবাবুর মৃত্যুর দিনের সেই কথাও মনে পড়লো. সেই পাশেব পকেট থেকে রুমাল বের করে নেওয়া থেকে শুরু করে আজ আবার নির্বিকার হাসিমুখে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সব কিছু জড়িয়ে রাখালের কেমন যেন অশুভ গোলমেলে মনে হলো এই ভদ্রলোকের সমস্ত ব্যাপারটা।

রাখাল ভদ্রলোককে যে প্রশ্ন করেছিলো তিনি তার জবাব না দিয়ে বরং রাখালকেই চাপ দিলেন, 'কি, আপনি তো এলেন না.একদিন আমার ওখানে?'

রাখালের কি মনে হলো, যেন ঝোঁক চেপে গেলো, বললো, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবো। কবে যাবো বলুন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এই তো, পরশু দিন জন্মাষ্টমীর ছুটি আছে, ঐ দিন সকালে আসুন। আমার ঠিকানা তো আবার আপনি জানেন না।' এই বলে পকেট থেকে একটা ছাপানো কার্ড বের করে দিলেন।

কার্ড নিতে নিতে রাখাল প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, আপনার বাড়িতে সেই সংগ্রহশালা না কি আছে বলছিলেন না ?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইটা দেখানোর জন্যেই তো আপনাকে আসতে বলছি।'

কার্ড দেখে ঠিকানা মিলিয়ে ভদ্রলোকের বাড়িটা খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ভদ্রলোক বাইরের ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন, রাখালকে দেখে উচ্চকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালেন।

রাখাল গিয়ে বসলো। দুজন অপরিচিত লোকের মধ্যে যেমন ছেঁড়া-ছেঁড়া আলাপ চলতে পারে তাই চললো। রাখাল কথার মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, সুরমার জামাইবাবু বুঝি আপনার খুব নিকট বন্ধু ছিলেন?'

ভদ্রলোক প্রশ্নসূচক মুখে তাকালেন, 'সুরমার জামাইবাবু মানে সেই ভদ্রলোক কি, ঐ যাঁর পকেট থেকে আমি একটা রুমাল এনেছিলাম সেই যেদিন প্রথম দেখা হলো আপনার সঙ্গে আমার।

রাখাল একটু বিস্মিত হয়ে বললো, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি ভদ্রলোককে চিনতেন না?'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে এবং সেই সঙ্গে মুখে বললেন, 'না।'

রাখাল জিজ্ঞাসা করলো, 'তা হলে?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'সবই বলবো। তার আগে চলুন আমার সংগ্রহশালাটা দেখবেন।'

রাখাল ভদ্রলোকের সঙ্গে উঠে পিছে পিছে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো। বাড়িতে কি আর কোন লোকজন নেই? একেবারে ফাঁকা মনে হচ্ছে। দোতলার অর্ধেক জুড়ে একটা ছাদ আর বাকিটা একটা বড় ঘর। দরজায় ভারি তালা লাগানো। ভদ্রলোক অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুললেন। ঘরে জানলা বলতে কিছু নেই। অনেক উপরে ছোটমত গোটা দুই ঘুলঘুলি, তাই দিয়ে সামান্য আলো আসছে আর একটা ত্রিশ পাওয়ারের মিটমিটে বাল্ব ভদ্রলোক জ্বালিয়ে দিলেন তাতে আলো বাড়লো না, কিন্তু আবছায়া বাড়লো।

এই সেই অতুলনীয় সংগ্রহশালা। এর বিশেষত্ব কি? রাখাল বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলো।

ঘরের দেয়ালে সারি সারি তাক লাগানো। তাতে বিচিত্র, অদ্ভুত সব জিনিস। কোথাও এক পাটি জুতো, একটা ভাঙা লাঠি, একটা আধপোড়া চুরুট, একটা কাঁচের জারের মধ্যে। এদিকে একটা নোংরা দা, কি যেন চটচটে লেগে আছে তাতে।

রাখাল ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলেন, 'এগুলো কি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়ান, ধীরে সুস্থে বলি।'

একটু পরে যেভাবে যাদুঘরের গাইডেরা জিনিস দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে প্রায় সেইভাবে আঙুল দিয়ে প্রথমে ভাঙা লাঠিটা দেখালেন, 'এই যে ভাঙা লাঠিটা দেখছেন, এটা আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোকের। একটা কেউটে সাপ সামনে পড়ায় সেটাকে এই লাঠি দিয়ে মারতে যান। লাঠি ভাঙলো, কিন্তু সাপ মরলো না, বরং সাপের কামড়ে তিনিই মারা গেলেন।'

ভদ্রলোক রাখালের মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে কথাগুলো বলে যেতে লাগলেন, রাখাল আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভদ্রলোক এইবার অর্ধদগ্ধ চুরুটটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, 'সুবোধ পাঠকের ঘটনা মনে আছে আপনার? সেই যে রাতে খাওয়ার পরে আরামকেদারায় বসে চুরুট খাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁর ভাগ্নে তাঁকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে, কি সব পারিবারিক গোলমাল

ছিলো, এই চুরুটটাই তাঁর শেষ চুরুট, ঐ হত্যার সময়েই খাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোক বর্ণনা করে চলেছেন, অপঘাত বা দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কিত সব বীভৎস, বিচিত্র জিনিস এই অন্ধকার ঘরে জড়ো করা রয়েছে। একেবারে দিনের আলোয়, কলকাতা শহরের একটা বাড়িতে—এখান থেকে বড় রাস্তায় ট্রামের শব্দ শোনা যাচ্ছে, পাশের একটা বাড়িতে কে একজন আরেকজনকে 'যতীন যতীন' বলে ডাকছে, এমন কি কাছেই কোথায় যেন কে খুব মশলা দিয়ে একটা তরকারি রাঁধছে তার ঝাঁজ ও গন্ধ নাকে পাচ্ছে রাখাল। কিন্তু এই ঘরের গল্প সবই কেমন অবাস্তব, কেমন অপ্রাকৃত রহস্যময়।

এই সামনের দোমড়ানো কুঁচকে যাওয়া জুতোজোড়া এক মারোয়াড়ী যুবকের, যে এই জুতোসুদ্ধ গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো। ঐ নোংরা দা, ওটার গায়ে যা লেগে রয়েছে তা আসলে শুকনো রক্ত, এক নেপালী তার বৌকে ঐ দা দিয়ে কুপিয়ে কেটেছিলো। এমন কি সুরমার বড় জামাইবাবুর রক্তমাখা রুমালটাও এক কোণায় দেখতে পেলো রাখাল।

পা দুটো স্থির থাকছে না, কপাল দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে, ঘাড়ের কাছটা দপ্‌দপ্ করে উঠছে। রাখাল কি রকম খাঁচায় আটকানো ইঁদুরের মত ছটফট করতে লাগলো এই ঘরের মধ্যে। ভদ্রলোক বলেই চলেছেন, রাখাল ভদ্রলোকের মুখের দিকে পর্যন্ত তাকানোর সাহস পাচ্ছে না।

হঠাৎ তার ডান দিকের তাকটার দিকে চোখ ফেরাতেই রাখাল এই কাঁপুনির মধ্যেও চমকে উঠলো। কিছুই না, সামান্য একটা লেডিস সান-গ্লাস। কালোর মধ্যে সাদা বর্ডার টানা, যেমন অধিকাংশ কলকাতার মেয়েরা আজকাল ব্যবহার করে থাকে। রাখালের কেমন একটা ভীষণ সন্দেহ হলো, কিন্তু গলা দিয়ে প্রশ্ন করার মত কোনো শব্দ বেরুলো না, শুধু কোনো রকমে আঙুল দিয়ে চশমাটা দেখিয়ে চাপা গলায় বললো,'এটা?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এটা আপনার সেই বান্ধবীর।'

রাখাল স্তম্ভিত, বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ব্যাখ্যা করার জন্যেই ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন এ ঘরের যা জিনিস সবই দুর্ঘটনায় বা অপঘাতে মৃত্যুর পরেই যে আমি সংগ্রহ করেছি তা নয়। অনেক সময় আগেও পেয়ে গেছি, আমাকে অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়নি, যার জিনিস তিনিই রেখে গেছেন। আপনার বান্ধবীও ঐ মৃত্যুর দিন ঐ চশমাটা ভুল করে এখানে রেখে গেলেন।' একটু থেমে শুকনো হেসে রাখালকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভুল করেই কি রেখে গেলেন?'

রাখালের তখন দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই অসম্ভব ঘরে আর এক মুহূর্তও নয়, এই মুহূর্তে ছুটে পালাতে হবে। কিন্তু তার চশমাটা? সেও তো একটা সান-গ্লাস চোখে দিয়েই এসেছিলো, সেটা খুলে এই সাংঘাতিক ঘরের কোথায় রাখলো? এই মুহূর্তেই সেটা চাই। আর দেরী করা নয়।

রাখালের হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে। উত্তেজনায় দুটো চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। রাখাল পাগলের মতো চারদিকে তাকাতে লাগলো, কোথায় গেল তার সান-গ্লাসটা, এই মরণশালায় কোথায় রাখলো সে সেটা?

ভদ্রলোক রাখালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি আপনার কিছু ফেলেছেন এই ঘরে ভাবছেন? আপনার সান-গ্লাসটা কি খুঁজছেন? ঐ তো আপনার বাঁ হাতে ধরে রয়েছেন।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভদ্রলোক বললেন কথাগুলো এবং সেই মুহূর্তে রাখাল একলাফে ঘর

থেকে বেরিয়ে পড়লো। উত্তেজনায় তার হাতের মুঠোর মধ্যে সান-গ্লাসটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।

চন্দ্রাহত

প্রাণকৃষ্ণ নাগের সঙ্গে আরেকবার দেখা হলে ভালো হতো। আমার বিশ্বাস এই কলকাতা শহরের কোথাও তিনি এখানে আছেন এবং এখনো কোনো কোনো কৃষ্ণা একাদশীর মধ্যরাত্রিতে কোন নিঃসঙ্গ পথচারীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে তাকে চমকিত করেন।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এলগিন রোড থেকে হেঁটে দক্ষিণ দিকে ফিরছি, কালীঘাটে বাসায় পৌঁছতে হবে। রাত বারোটার কাছাকাছি, শেষ ট্রাম একটু আগে চোখের সামনে ঘণ্টা বাজিয়ে বেরিয়ে গেছে, দু'একটা বাস এখনো আসবে, কিন্তু এতো গভীর রাত্রির বাসে সিনেমা এবং নিমন্ত্রণ ফেরৎ যাত্রীদের কি ভীষণ ভিড় হয়, ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন; হেঁটে আসতে ভালোই লাগছিল।

ট্রাম কোম্পানি কলকাতা কর্পোরেশনের কৃপায় মধ্যরজনীর কলকাতা শহর একটি বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগার বলে ভ্রম হয়। ট্রাম রাস্তার উপর ছোট বড় অসংখ্য তাঁবু পড়েছে, লাল লণ্ঠন জ্বালিয়ে কুলিরা কাজ করছে, শোলার টুপি ও খাকি হাফপ্যাণ্ট-পরা ওভারশিয়ার সাহেব নতুন খোঁড়া গর্তগুলির মধ্যে টর্চ ফেলে কি যেন অনুসন্ধান করছেন।

আমি যদুবাবুর বাজারের সামনে পার হয়ে গেলাম। এর পরে রাস্তা অনেকটা ফাঁকা। শুধু কিছু দূরে ল্যাম্পপোস্টের গা ঘেঁষে একটি ক্লান্ত বারবনিতা এত রাতে কোথায় যাবে যেন কিছু স্থির করতে পারছিল না। আমাকে দেখে একটু থমকে সে একাধিকবার লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর রাস্তা পার হয়ে বিপরীত ফুটপাথে চলে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক বুঝতে পারলাম না, বাঁ দিকের গলি থেকে না-কি মাটি ফুঁড়ে প্রাণকৃষ্ণবাবু ; অবশ্য তখনো আমি তাঁর নাম জানিনি, বেরিয়ে এলেন।

প্রথমে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পথের পাশের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতার রাস্তা অন্ধকার হয়ে যায়; কর্পোরেশন পরিবেশিত আলোয় অন্ধকার এবং তার সঙ্গে চারদিকের দালানগুলির ছায়া বিশেষ দূর হয় না, ল্যাম্পপোস্টের অস্পষ্ট আলোয় আমি ভদ্রলোককে ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম। অন্ধকারে তাঁর চোখ দুটি বিড়ালের চোখের মত ঝকঝক করছিল। এরকম অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আর কালো চোখে কখনো দেখিনি। ভদ্রলোকের গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে ধুতি এবং একটি ময়লা হাফশার্ট। আমার কেমন যেন তাঁকে উন্মাদ বলে মনে হল।

মাঝরাত্রিতে ফাঁকা রাস্তায় উন্মাদের সম্মুখীন হওয়ার ভরসা ছিল না, আমি ইতিউতি তাকাতে লাগলাম। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু অতি সহজ কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি মিনিট পনেরো সময় হবে?'

প্রশ্নের মধ্যে যে মূঢ়তা ছিল, প্রশ্নকর্তার কণ্ঠস্বরে তা ছিল না। রাত বারোটায় অপরিচিত ব্যক্তিকে এই ধরনের অনুরোধ কেউ এই কণ্ঠস্বরে করে না। মাতাল বা উন্মাদের কণ্ঠস্বর নয়,

অত্যন্ত স্বাভাবিক, যেন এই ভাবে প্রাণকৃষ্ণবাবু সেই একই অনুরোধ আরেকবার করলেন।

অন্যের অনুরোধ রক্ষা না করাই আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে কোথাও আগ্রহাতিশয্য দেখলে তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে আসাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত—অনেক ঘা খেয়ে আমার এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সম্মতির জন্যে কোনো রকম অপেক্ষা না করেই প্রায় পাঁচ হাত সামনে এগিয়ে প্রাণকৃষ্ণবাবু আমাকে একবার আপাদমস্তক তাকালেন। বিনীতের সঙ্গে আদেশের সুরেই যেন বললেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

আমার কি হল ঠিক বোঝানো যাবে না, কেমন সম্মোহিতের মতো বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। রাস্তা পেরিয়ে অন্য ফুটপাথ ধরে একটু এগিয়ে আমরা একটা পশ্চিমমুখী গলি ধরে হরিশ মুখার্জি রোডের দিকে এগুতে লাগলাম। একতরফা কথা চলতে লাগল। প্রাণকৃষ্ণবাবু বক্তা, আমি নীরব শ্রোতা। কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ জ্বলতে লাগল; সমস্ত কথা লেখা সম্ভব নয়; তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই রকম হবে :

"আমার নাম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ নাগ। আমি এক মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী। আমি জীবনে একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছি। প্রথম যেবার লক্ষ্য করি, তখন আমার বয়স দশ এগারো হবে। এক আত্মীয়ের বিয়েতে বহু দূরে এক গ্রামে গিয়েছি। বিয়ের দিন রাত্রিতে খোলা ছাদে অনেক লোকের সঙ্গে শুয়েছিলাম। সে দিন একাদশী। তিথিটা আমার মনে ছিল, কেননা, আমার মা বিধবা, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, সেদিন নিমন্ত্রণ খেতে খেতে বার বার মনে হচ্ছিল, মা উপোস করে আছেন। সে যা হোক, তখন রাত অর্ধেক শেষ হয়ে গিয়েছে, বাসর ঘরের গোলমাল, একতলার ঘর থেকে তাও আর আসছিল না, বিয়ে বাড়ির সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আমার চারপাশে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ, কারো কারোর নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিল, কিছুতেই ঘুম পাচ্ছিল না। সন্ধ্যারাত্রে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেই জন্যেই হয়ত। ছাদের নীচে একটা বুনোঝোপ থেকে কয়েকটা জংলী ফুলের সোঁদা গন্ধ, চারদিকে অন্ধকার খোলা মাঠ, পূবের দিকে দূরে খেজুরের ঝোপের মধ্যে হলুদ মত একটুকরো চাঁদ উঠে আসছে। কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর চাঁদ, বৈশাখ মাস, আকাশ একেবারে তারায় তারায় নিশ্ছিদ্র। মাঝে মাঝে দারুণ হাওয়া দিচ্ছে, সে হাওয়া কলকাতায় ভাবা যায় না—মনে হয় ন্যাড়া ছাদ গড়িয়ে ফেলে দেবে। আমি গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় সেই প্রথম, সেই দেখলাম অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, সেই অল্প বয়সেও ও রকম অবাক কখনো আর হই নি।

ঘটনাটা ভুলেই প্রায় গিয়েছিলাম। তখন বয়েস হয়েছে। আর একবার দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় ফিরব, নৌকায় করে রেল স্টেশনে এসেছি। এসে দেখলাম ট্রেন আধ ঘণ্টা আগে ছেড়ে গিয়েছে। সেই ছোট স্টেশনে কোনো ওয়েটিং রুম নেই, দরকারও ছিল না; স্টেশনের পাশে রেল-ব্রিজের গা ছুঁয়ে একটা জামগাছের সঙ্গে নৌকো বেঁধে ছইয়ের উপরে বসে আছি। রাত্রিতেও ঘুম আসছে না। নীচে পাটাতনের উপরে মাল্লারা সব ঘুমিয়ে। কাছে দূরে শেয়ালগুলো ভয়ঙ্কর ডাকাডাকি করছে, হঠাৎ ডাক থেমে গেল, কয়েকটা ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছিল, তাও নিঃশব্দে হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সহসা আমার যেন কি মনে হলো, কি যেন বুঝতে পেরে কিংবা অনুমান করে আমি পূবের দিকে নদীর ওপারে যেখানে অস্পষ্ট গাছপালার সীমানা দেখা যাচ্ছে—তাকালাম, আবার সেই টুকরো চাঁদ আর সেই আশ্চর্য অবিশ্বাস্য বিস্ময়, দেখি দ্বিতীয়বার।'

অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণবাবু কথাগুলো বলছিলেন। আমরা হাঁটছিলামও খুব তাড়াতাড়ি, বিশেষ করে প্রাণকৃষ্ণবাবু প্রায় দৌড়িয়েই চলেন, এর মধ্যে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে আমরা প্রায় গড়ের মাঠের কাছে এসে গিয়েছি।

'চলুন একটা ফাঁকা জায়গায় না গেলে ব্যাপারটা আপনাকে দেখানো যাবে না। এই এত বাড়ির ভিড়ে কিছুই চোখে পড়বে না। তিনি গড়ের মাঠের দিকে এগুতে লাগলেন।

সত্যি কি দেখে এত বিস্মিত হয়েছিলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু সে বিষয়ে কোনো আভাস তাঁর এতক্ষণের কথার মধ্যে ছিল না। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে অলীকতার স্পর্শমাত্র ছিল না। তাঁকে অবিশ্বাস করাও সম্ভব হলো না, এমন কি একবার এ কথাও জিজ্ঞাসা করলাম না যে, তিনি কি দেখেছিলেন আর আমাকে কি আজ এই রাত্রিতে তাই দেখাতে চাচ্ছেন!

রেড রোডের পাশে এক জায়গায় কিছু রাবিশ স্তূপাকার করে রাখা। তার ওপরে উঠে প্রাণকৃষ্ণবাবু আমাকে হাত দিয়ে ইসারা করে ডাকলেন। স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি এগিয়ে গেলাম এবড়ো-খেবড়ো স্টোন চিপস, ইঁটের টুকরো। সেখানে উঠে প্রাণকৃষ্ণবাবু যেন খুশি হননি বলে মনে হল। তিনি একবার নামলেন পাশের আরেকটি স্তূপের ওপর, উঠে ভ্রূকুঞ্চিত করে পূবদিকের আকাশে কি পর্যবেক্ষণ করলেন কিন্তু এবারও সন্তুষ্ট হলেন না। সম্মুখে একাডেমির বাড়ি প্রায় পঞ্চাশ গজ আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে, এটাই যেন তাঁর বিরক্তির কারণ বলে আমার মনে হল।

হঠাৎই প্রাণকৃষ্ণবাবু আরেকটি অদ্ভুত কাজ করলেন। "গাছে উঠতে পারেন" বলে আমার জন্যে কোনরকম অপেক্ষা করা প্রয়োজন না মনে করে, সামনের একটি রাধাচূড়া গাছে তরতর করে উঠে গেলেন। এতক্ষণে আমার ভীষণ ভয় হল, নানা ভৌতিক, বীভৎস ঘটনা মনে পড়তে লাগল কিন্তু তিনি আমাকে সংশয় বা ভয়ের কোনো সুযোগ না দিয়ে নীচের দিকের একটি ডালে এসে আমার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন, 'আর সময় নষ্ট করবেন না, শিগগির উঠে আসুন।'

গাছে চড়া বহুদিন অভ্যাস নেই, এ বয়সে কারো বিশেষ থাকে না। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু প্রায় জোর টানাটানি করে তুললেন, বুকের মাঝখানে আর হাঁটুতে দু'এক জায়গায় ছড়ে গেল। উপরের একটা ডাল ধরে নীচের একটা ডালের উপর দাঁড়িয়ে প্রাণকৃষ্ণবাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করে পূব দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু দূরে একটা পুলিশের ঘেরাটোপ কালো গাড়ি চক্কর দিয়ে গেল, আমি একটু আঁৎকে উঠেছিলাম, এখানে এ অবস্থায় পুলিশ বা আদালতে এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে! কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। চৌরঙ্গী রোডে নির্মীয়মান বিশাল একটি বাড়ির লোহার খাঁচার মধ্যে একটুকরো ফালি হলুদ চাঁদ সেটাই দ্রষ্টব্য বলে মনে হল। চাঁদটির একটু ওপরে দুটি শীর্ণ নক্ষত্র খুব কাছাকাছি।

হঠাৎ প্রাণকৃষ্ণবাবুর শরীর ভীষণ জ্বরের রোগীর মত কাঁপতে লাগল। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে, 'দেখুন, দেখুন কেউ বিশ্বাস করে না।'

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। সেই ম্লান তারা দুটির খুব কাছে চাঁদ পৌছেছে, এবং কি এক অনিবার্য আকর্ষণে থর থর করে কাঁপছে। ভীষণ হাওয়ায় ঘুড়ি যে রকম টাল-মাটাল খেতে থাকে, চাঁদটিও সেই রকম ভয়ঙ্কর ভাবে দুলছে, যেন অবিলম্বে ছিটকিয়ে মহাশূন্যে পড়ে যাবে, তারপরে একটা কাটা ঘুড়ির মত অনির্দেশে ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। অধীর

উত্তেজনায় প্রাণকৃষ্ণবাবু অস্থির হয়ে পড়েছেন, ভয় হল গাছ থেকে পড়ে না যান, তাঁকে এক হাত দিয়ে জাপটে ধরে রাখলাম। আমার উত্তেজনা কিছু কম হয়নি, আমি লক্ষ্য করে দেখলাম পা দুটো কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না, ঠকঠক করে প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হচ্ছে দুজনে স্তব্ধ এই নীচে পড়ে যাব।

প্রায় মিনিট তিনেক পরে সব স্থির হয়ে গেল, চাঁদটি যেন একলাফে দশ ফুট উঁচুতে উঠে এসেছে, কিছু নীচে সেই নক্ষত্র দুটি স্থির, স্তিমিতপ্রায়।

আমি বিস্ময়ে হতবাক এবং অভিভূত। গাছ থেকে দুজনে ধীরে ধীরে নেমে বাড়ির দিকে ফিরলাম। বেশী সময় নয়, মাত্র ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার, আলিপুরের জেল থেকে একটা ঘণ্টার আওয়াজ এলো—রাত একটা কিংবা দেড়টা হবে। ফিরবার পথে প্রাণকৃষ্ণবাবুকে যেন বিশেষ কুণ্ঠিত মনে হল। তাঁর দুই চোখে একটু আগের সেই উগ্র উজ্জ্বলতা অনুপস্থিত, তাঁকে এখন আর মোটেই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। ধীর পায়ে হাঁটছেন. মনে পড়ল, আসার সময় তিনি প্রায় দৌড়ে এসেছিলেন। এখন মাথা নিচু করে হাঁটছেন যেন দশজনের একজন, অতি সাধারণ মার্চেন্ট অফিসের কেরানী, কোনো বিনা কারণে অন্যের সময় নষ্ট করে দিয়ে এখন কিঞ্চিৎ লজ্জিত। আমি তাঁকে কোনো প্রশ্ন করাবই সময় পেলাম না, হঠাৎ বাঁয়ের একটা গলি ধরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে কোনো কথা না বলে চলে গেলেন। সেই মুহূর্তে চোখ ফেরাতে গিয়ে তাঁর চোখে চোখ পড়ল, এইবার তাব স্তিমিত চোখ, চোখের চাহনি আমার কেমন যেন বেশ পরিচিত মনে হল, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলাম না।

প্রাণকৃষ্ণবাবু অদৃশ্য হওয়া মাত্র বিদ্যুতের মত আমার মাথায় খেলে গেল এই চোখদুটি আমি এইমাত্র দেখেছি। সেই তারা দুটি, যেখানে পৌঁছে একটু আগে চাঁদকে থর থর করে কাঁপতে দেখেছি, তার সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণবাবুর চোখেব তাবা দুটির আশ্চর্য সাদৃশ্য, অস্বাভাবিক মিল রয়েছে। একই স্তিমিত বিষণ্ণতা প্রাণকৃষ্ণবাবুর চোখের তারায়। বাসায় ফিরে তাড়াতাড়ি করে করে ছাদে উঠে পূব দিকের আকাশে তাকিয়ে সেই তারা দুটির খোঁজ করলাম। কিন্তু আকাশের হাজার হাজার তারার মধ্যে সেই বিশিষ্ট তারা দুটি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে খুঁজে পলাম না।

এর পরেও এই কাহিনীর কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রয়েছে। পরদিন সকালে কি একটা চিঠি লিখতে বসে তারিখের জন্য দেয়ালে বাংলা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাতেই দেখলাম গতকাল কৃষ্ণা একাদশী গেছে, এক ফালি কালো চাঁদের গায়ে ছোট ছোট হরফে একাদশী লেখা, গতকালের তারিখের জায়গায়। মনে পড়ল, প্রাণকৃষ্ণ নাগ যে প্রথম রাত্রির বর্ণনা আমাকে দিয়েছিলেন সেটিও এই একই তিথির একই পক্ষের রাত্রি, দ্বিতীয় রাত্রির তিথি পক্ষের কথা তিনি অবশ্য আমাকে কিছু উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে বাড়ির ছাদে একা একা বসে পূবদিকের আকাশে চাঁদ ওঠার সময় বিশেষ যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখেছি, সেরকম কিছুই ঘটেনি। স্থির, নিঃশব্দ, অচঞ্চল গতিতে চাঁদ আকাশে উঠেছে, সেই অস্বাভাবিক ।ঙমিত তারা দুটিও আর চোখে পড়ে নি।

পরে একদিন অধ্যাপক উৎপল সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সমস্ত কথা বলেছিলাম। আমার ছোট ভাই তাঁর প্রিয় ছাত্র, আমাকে তিনি অবিশ্বাস করেন নি। জীবনের আধাআধি সময় তিনি চোখে টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখে দেখে চোখে ছানি পড়িয়েছেন। সব

শুনে তিনি মৃদু হেসে, যদি আমার সঙ্গে আর কোনো দিন কোথাও প্রাণকৃষ্ণবাবুর দেখা হয়, তাঁর কাছে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন। আমি যখন উঠছি তিনি একটি অপরিচিত ইংরেজি শব্দ স্বগতোক্তি করলেন, পরে বাড়ি ফিরে কৌতূহলবশত অভিধান খুলে দেখেছি, শব্দটার অর্থ চন্দ্রাহত, অর্থাৎ উন্মাদ। উন্মাদের নাড়ির সঙ্গে চাঁদের নাকি কোথাও এক সম্পর্ক রয়েছে!

প্রাণকৃষ্ণ নাগের কথা সঠিক বলতে পারি না, কিন্তু আমি নিজেকে জানি, আমি উন্মাদ নই। হয়তো সব কৃষ্ণা একাদশীর তিথিতে নয়, হয়ত বহুদিন পরে পরে কোনো এক রাত্রিতে আকাশের চাঁদ কোনো এক অজ্ঞাত আকর্ষণে মহাশূন্যে দুটি ম্লান নক্ষত্রের পাশে কিছুক্ষণ ধরে অস্থির দুলতে থাকে, কোনোকালে কারো নজরে পড়ে না। বুদ্ধির অতীত কোনো কারণে, সেই সব নিশীথে এই পৃথিবীর মাত্র একজন মানুষ সেই রহস্যের আন্দোলন তার রক্তে অনুভব করে অস্থির জেগে থাকে। আমি ছাড়া হয়তো এই রাজ্যের আর কোনো সাক্ষী নেই। আর কারোর সঙ্গে কি কোনো রাত্রিতে প্রাণকৃষ্ণ নাগের সঙ্গে দেখা হয় না?

আর তাঁর চোখের তারার সেই রহস্য তারও কি কোনো সমাধান নেই?

ভীষণ ভিড়ের মধ্যে

এ জন্মের মত কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আবার কবে ফিরবো, ফিরলেও জোড়াতালি দেয়া ছুটিছাটায়। অনেক বিরক্তি অনেক ভালোবাসা, সেই চৌদ্দ বছর বয়সে ফরিদপুরের থেকে, তারপর একটানা এই গত পনেরো বছর। আজই শেষ দিন, জয়ন্তী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল।

এখনই উঠতে হবে। কত কিছু গোছানো বাকি আছে। কত টুকিটাকি, এক জায়গা থেকে সংসার বদল করে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া। ভাঙা কড়াই থেকে, বছরের তিন মাস বাকি, দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডার কি ফেলে যাওয়া যায়, অথচ সব টেনে নেওয়াও সম্ভব নয়।

সকাল সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে। পাশে সুকোমল এখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। এই মুহূর্তে সুকোমলের উপর একটু রাগ হলো জয়ন্তীর, বেশ ছিলাম, কি দরকার ছিলো রৌরকেল্লায় ভালো চাকরির। কলকাতার আড়াইশো টাকাতেই যেভাবেই হোক চলে যাচ্ছিল, কি হবে অতদূরে কিছু বেশী টাকায়? জয়ন্তীর উনত্রিশ বছরের জীবনের অর্ধেক কলকাতায় কেটেছে, সেই ভিক্টোরিয়া স্কুল, কলেজ, বেলগাছিয়ার সেই এবড়ো-খেবড়ো গলির মধ্যে তার বাপের বাড়ির পাড়ার বান্ধবীরা, আর কোনোদিন কি তাদের সঙ্গে দেখা হবে? বড় বেশী মমতা বোধ হতে লাগল জয়ন্তীর।

'এই ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো, কত কাজ বাকি রয়েছে'। উঠবে না জেনেও সুকোমলকে একটা ধাক্কা দিয়ে জয়ন্তী বিছানা ছেড়ে চলে গেল। সুকোমল পাশ ফিরতে গিয়ে চোখ বুজেই একটা হাত বাড়ালো কিন্তু ততক্ষণে জয়ন্তী নাগালের বাইরে।

সন্ধ্যার দিকে ট্রেন ছাড়বে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে হাওড়া অবশ্য খুব দূর নয়, তবু আজ শনিবার, বিকেলের দিকে ট্যাক্সি পাওয়া খুব ঝকমারি হবে। আজ কয়দিন ধরেই যথাসম্ভব গোছগাছ করা হচ্ছে। দুজনের সংসারে আছেই বা কি?

সুকোমল যতক্ষণ ইচ্ছে শুয়ে থাকুক, জয়ন্তী প্রথমে টুকিটাকি জিনিসগুলি গুছিয়ে নিতে লাগল। রান্নার বাসনকোসন সব কাল লোক দিয়ে ধুয়ে মেজে রেখেছে, আজ দুপুরে ওরা একটা হোটেলে খেয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু জয়ন্তীর বাবা কাল এসেছিলেন, আজ যাওয়ার দিন বেলগাছিয়া থেকেই দুপুরে খেয়ে নিতে হবে, একটু দৌড়াদৌড়ি হবে শেষ মুহূর্তে তবু সুকোমল আপত্তি করতে পারেনি।

কাল একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ কিনে এনেছে সুকোমল। তাতেই ঘটি, বাটি, শিল, নোড়া খুচরো জিনিসগুলো এক এক করে তুলে ফেলল জয়ন্তী। এবার বড় ট্রাঙ্কটা গোছাতে হবে। ট্রাঙ্কটায় অনেকদিন হাত দেওয়া হয়নি। বিয়ের ট্রাঙ্ক, বিয়ের পরে একবার গুছিয়েছিল তারপর এরকমই চলে আসছে। সব জিনিসপত্রগুলো একে একে নামিয়ে ফেলল। বিয়ের সময় পাওয়া কিছু কিছু উপহার এখনো এই বাক্সটায় রয়ে গেছে। বছর তিনেক হল মাঝ নিশীথের মধুর স্মৃতি। সেই রাত্রির হিমের হাওয়াও যেন এই বাক্সে কোথায় ছিল, জয়ন্তী তার শরীরে সেই শিহরণ অনুভব করল।

বাক্সটার সবচেয়ে নীচে একটা খবরের কাগজ পাতা, সেই সময়কার কাগজ, তিন বছরে একটু হলুদ হয়ে গেছে, বাক্সের রঙের সঙ্গে চটচটে হয়ে আঠার মত কিছুটা আটকে গেছে। টেনে তুলতে গিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে বাক্সটার গায়ে লেগে রইল। এক টুকরো কাপড় জল দিয়ে ভিজিয়ে ঘষে তুলে ফেলতে হবে।

এখন সুকোমল বিছানা থেকে উঠল। চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে জয়ন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি এখনো সব হলো না? তুমি কোনো কাজের না।' এই অহেতুক মন্তব্য করে সুকোমল বাথরুমের দিকে চলে গেল।

জয়ন্তীর খুব রাগ হলো, কোনো কাজ করবে না, বেলা নটায় ঘুম থেকে উঠে এই মাতব্বরি; ঠিক আছে দেখাই যাক। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ক্লান্তভাবে জয়ন্তী মাথা হেলিয়ে দিলে। সকাল থেকে বড় বেশী পরিশ্রম গেছে, আর এতই বা তাড়া কি আমার! যার গরজ সেই তাড়াতাড়ি করুক। জয়ন্তী একা ভাবতে লাগল।

সামনে থেকে কয়েক বছর আগের পুরানো ছেঁড়া খবরের কাগজের পাতাটা তুলে নিল জয়ন্তী। ৭ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৭৭ সালের পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠার ছোটখাটো সংবাদ। এই সময়ে পৃথিবীটা একটুও পাল্টায়নি, সেই একই সব সংবাদ, 'মসজিদ হইতে পতনের ফলে বালকের মৃত্যু', 'বিধবা মারাত্মকভাবে আহত—দুইজন আততায়ীর কারাদণ্ড', 'কারামন্ত্রী কর্তৃক শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের উদ্বোধন' ইত্যাদি।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে জয়ন্তীর চোখটা আটকে গেল। সামান্য সংবাদ, চোখে পড়ার মত নয়। তিন বছর আগে চোখে পড়েনি, পড়লেও অন্তত মনে রাখেনি। কিন্তু এখন খবরটায় চোখ পড়তেই এই স্পষ্ট দিনের বেলায় তার ঘরে বসে জয়ন্তীর শরীর কেমন ছমছম করে উঠল, বুকটা হাঁপরের মতো ওঠানামা করতে লাগলো, কয়েক বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে।

ঘটনাটা তাহলে বেরিয়েছিল। কাগজে জয়ন্তীর চোখের সামনেই ঘটেছিল, সব মিলে যাচ্ছে। সেই শনিবার রাত্রি নয়টা হাতীবাগান বাজারের সামনে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে তাহলে সেদিন ট্রামে এই লোকটাই চাপা পড়েছিল! সব কেমন গোলমাল বোধ হচ্ছে জয়ন্তীর, মাথাটা একটু ঘুরছে, দেয়ালগুলো গোল হয়ে যাচ্ছে এ-কি এত গুলো ইলেকট্রিক বালব তো তাদের ঘরে ছিল না, কটা

ইলেকট্রিক বাল্‌ব দুলছে—একটা, দুটো, পাঁচটা, সাতটা...।

বিয়ের পর নিয়মিত প্রত্যেক শনিবার বিকালে জয়ন্তী বেলগাছিয়ায় তার বাপের বাড়িতে গেছে। কিন্তু প্রথম প্রথম কয়েক সপ্তাহ সুকোমলও তার সঙ্গেই গেছে। কিন্তু তার পর আর বিশেষ কোনো ব্যাপার না হলে যায়নি। তার চেয়ে ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলাতেই বেশী আগ্রহ তার। আর কতটুকুই বা পথ বেলগাছিয়া থেকে ওয়েলিংটন, সোজা এক ট্রামে জয়ন্তী চলে আসতে পারে।

সেই প্রথমদিকে, সে বছরই ফাল্গুন মাসে ঐ ফাল্গুনের গোড়াতেই হবে, হাতিবাগান বাজারের সামনে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, জয়ন্তী এখনো মনে করতে পারে। বেলগাছিয়া থেকে ট্রামে উঠে ওরা দুজনে মিলে সবচেয়ে সামনে ডাইনের দিকের সিটটায় বসেছিলো। জয়ন্তী লেডিস সিটে বসেনি, কখন সিট ছাড়তে হয় সুকোমল এই ভয়ে কখনোই জয়ন্তীর পাশে লেডিস সিটে বসে না। মাঘ শেষ হয়ে গেলেও তখনো হিমভাবটা রয়ে গেছে। বিশেষ করে সেদিন যেন একটু বেশী ঠাণ্ডাই, উত্তরের হাওয়া দিচ্ছিল। সন্ধ্যার শো সবে ভেঙেছে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দুই পাশের সিনেমা হলগুলো থেকে ক্রমাগত লোক বেরিয়ে আসছে। রাস্তায় বেশ ভিড় দোকানপাট আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাত্রির শো'তেও কয়েকটা হল হাউস ফুল যাচ্ছে, জানলার পাশে বসে জয়ন্তী সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ট্রামটা, ঢিমে তেতালায় চলেছে, স্কার্ফের কোণাটা জয়ন্তী একটু গলার কাছে টেনে নিলো, একটু শীত-শীত করছে।

এই সময় জয়ন্তী লোকটাকে দেখল, অল্প আলোয় লোকটা গ্রে স্ট্রীটের দিক থেকে হাতীবাগান বাজারের দিকে আসছে, রাস্তা পার হওয়ার জন্যে একটু থমকে দাঁড়াল। জয়ন্তীদের ট্রামটা তখন ঐ স্টপে দাঁড়িয়েছে। ট্রামটা ছাড়বে কিনা, সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাবে কিনা লোকটা বোধহয় একটু ভাবল। হঠাৎ জয়ন্তীর চোখে চোখ পড়ল লোকটার। যুবকই বলা উচিত, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বেশী হবে না, জয়ন্তীর সমবয়সীই হবে। গায়ে একটা নীল রঙের বুশসার্ট হাতা আটকানো, ফুলপ্যান্টটা সাদা। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে জয়ন্তীর দিকে একদৃষ্টিতো তাকালো। কেমন যেন চেনা, চেনা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি, না কি বেলগাছিয়ায় সেই গলির মোড়ের হলুদ বাড়িটার দোতলায় থাকতো, না কি সেই ফরিদপুরের আমলাপাড়ার ছোটবেলার কোনো সঙ্গী? জয়ন্তী ঠিক করতে পারল না, লোকটাও কেমন বিমূঢ়ের মত অর্থহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্তীর ট্রামটা ছেড়ে দিল। এমন সময় 'গেলো, গেলো, এই, এই রোককে ট্রাম বেঁধে' রাস্তা সুদ্ধু লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। লোকটার পিছন দিক দিয়ে গ্রে স্ট্রীটের একটা ট্রাম খুব দ্রুতগতিতে বাঁক নিয়ে এসেছে—জয়ন্তী মাথা ঘুরিয়ে শুধু এইটুকু দেখতে পেল। জয়ন্তীদের ট্রামটা তখন এক স্টপ চলে এসেছে, পিছনের হৈ-চৈও আর শোনা যাচ্ছে না। সুকোমল বলল, 'আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। দৈনিক কত লোক যে ট্রাম বাস চাপা পড়ে মরছে।'

ট্রামসুদ্ধু লোক একসঙ্গে দুর্ঘটনা, তার কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। একাধিক ভয়াবহ দুর্ঘটনার অত্যুৎসাহী প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ, তারাও সঙ্গে ছিলেন।

চোখের সামনে দুর্ঘটনা ঘটা ঘটতে দেখা কলকাতা শহরে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, দেখে ভুলে যায়। তারপর আবার ঘটে, আবার ভুলে যায়। জয়ন্তীও ভুলে যেতো এবং যে কোনো কারণেই হোক, পরের দিন সাতই ফাল্গুন, রবিবাব, এই ছোট সংবাদটা জয়ন্তীর চোখে পড়েনি।

তা হলে কি হতো বলা যায় না, কিন্তু পরের শনিবাব দিন রাত্রিতে ফিরবার সময় ট্রামে লোকটাকে আবার দেখেছিল জয়ন্তী। সেই নীল বুশ শার্ট, সাদা প্যাণ্ট, সেই লোকটাই হাতীবাগানের সেই স্টপটায় এসে তাদের ট্রামেই উঠল। জয়ন্তী তাকে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল। যাক, তাহলে লোকটা কাটা পড়েনি! লোকটা কিন্তু সেদিনও একদৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে ছিল। জয়ন্তীর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, সেদিনও সুকোমল সঙ্গে ছিল। লোকটা সুকোমলের পাশে এসে দাঁড়াল। জয়ন্তী বাইরের রাস্তায় দিকে তাকিয়ে রইলো, একবারও মাথা ঘোরালো না। কলেজ স্ট্রীটের কাছে এসে একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, লোকটা নেই, কখন নেমে গেছে।

এরপরে প্রায় প্রত্যেক শনিবারই একই সময়ে, একই জায়গা থেকে লোকটাকে ট্রামে উঠতে দেখেছে জয়ন্তী। কখনো জয়ন্তী একা ফিরেছে, কখনো সুকোমলের কিংবা আর কারো সঙ্গে। দু'এক শনিবার হয়তো দেখতেও পায়নি, কিন্তু সেও হয়তো জয়ন্তী নিজেই লক্ষ্য করেনি বলে। সেই একই পোশাক নীল শার্ট, সাদা প্যাণ্ট, সেই একই দৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

কখনো জয়ন্তী বিরক্ত, খুব বিরক্তি বোধ করেছে, কখনো কৌতূহল। কে লোকটা? হয়তে এখানেই কোথাও থাকে, প্রত্যেকদিন এই সময় বাড়ি যেতো, হয়তো আগে চিনতো। একদিন জয়ন্তী ঠিক করেছিল, লোকটা কি চায় প্রশ্ন করে জানতে হবে। কিন্তু করা হয়নি। কতরকমের পেশা আছে, লোকটা গোয়েন্দা বিভাগের কেউ হতে পারে, এইটুকু পথ ট্রামেই ডিউটি। পকেটমার হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কত ভদ্র চেহারার লোক পকেট মারে। না কি লম্পট? ধীরে ধীরে সে এসব কথা ভাবা ছেড়ে দেয় সে প্রত্যেক শনিবার রাত ন'টার ট্রামে লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়া নৈমিত্তিক হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তীর কাছে।

গত শনিবারই একটা ঘটনা ঘটল। জয়ন্তীর পাশে লেডিস সিটটা খালি ছিল, ট্রামে খুব ভিড়, পুজোর বাজার সিনেমা ফেরত অসংখ্য লোক গিজ্‌গিজ্ করছে। জয়ন্তী হঠাৎ দেখল তার পাশের সিটে সেই লোকটা বসে। জয়ন্তী জানালার কাছ ঘেঁষে একটু সরে বসলো। এমন সময় কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চাইতে জয়ন্তী নিজের টিকিট কাটল। লোকটাকে টিকিটের কথা বলতে ঘাড়টা একটু নাড়ল। কণ্ডাক্টরের বোধহয় তার দিকে তাকিয়ে কি একটা সন্দেহ হলো, বলল 'দেখি টিকিট।'

লোকটা খুব আলগোছে পকেট থেকে একটা মান্থলি বার করল।

কণ্ডাক্টর এবারেও বলল, 'দেখি,' এই সময় আর একজন মহিলা চলে আসায় লোকটাকে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হলো। ট্রামে ভিড় আরো বেড়েছে।

জয়ন্তী শুনতে পেলো কণ্ডাক্টর বলছে, 'আপনার নাম অমর চক্রবর্তী?'

লোকটা কি বলল, জয়ন্তী শুনতে পেলো না, কণ্ডাক্টরের কর্কশ গলা শুনতে পেল, 'একষট্টি সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মান্থলি নিয়ে ঘুরছেন—দাঁড়ান, ও মশায় শুনুন, এই ধরুন, ধরুন মশায়, জোচ্চোর!'

'কি ব্যাপার, কি ব্যাপার?' সবাই মিলে কৌতূহলী হয়ে উঠল। ট্রামটা একটা স্টপে দাঁড়িয়েছিল, ভিড়ের মধ্যে সকলের হাত ছাড়িয়ে কি করে লোকটা কখন কোথায় উবে গেল।

জয়ন্তী চোখ খুলতে দেখল, সামনে সুকোমল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরানো খবরের কাগজটা তখনো হাতে ধরা, দু বছর আট মাস আগের বাসি খবরটা চোখের সামনে কাঁপছে।

'গত শনিবার রাত্রি নয়টায় গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে অমর চক্রবর্তী নামক জনেক ব্যক্তি ট্রামে চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে। ট্রামের ড্রাইভার...'

সুকোমলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তার সম্বিৎ ফিরল।

'কি, খুব টায়ার্ড? এক কাপ চা দাও, আমি সব গোছগাছ করে দেবো।'

সুকোমলকে কিছু বললে, সুকোমল শুনলে নিশ্চয় হাসবে, ভাবতে ভাবতে চা করতে গেলো জয়ন্তী।

বাংলা দেশ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন উড়িষ্যার জমি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, চারদিকে অন্ধকার কেটে উর্ধ্বশ্বাসে এক্সপ্রেস ট্রেন চলেছে, দূরে দূরে ছায়াচ্ছন্ন গ্রামসীমায় কখনো দু'একটা স্তিমিত প্রদীপশিখা। কামরার বিদ্যুৎবাতিটাও কেমন অনুজ্জ্বল, পাশে বসে সুকোমল একটা ইংরেজি ডিটেক্টিভ বই পড়ছে। জয়ন্তী বাইরের দিকে তাকিয়ে। কলকাতার বাইরে রাত এত তাড়াতাড়ি ঘন হয়। জয়ন্তী কব্জিটা উল্টিয়ে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালো, নটা প্রায় বাজে।

সহসা জয়ন্তীর কি মনে হলো, কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে শরীর শিউরে উঠল। হাতীবাগান বাজারের সামনে ভীষণ ভিড়ের মধ্যে ট্রাম স্টপে সেই নীল বুশ সার্ট, সাদা ফুল প্যান্ট সেই লোকটা, অমর চক্রবর্তী এখন কি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার অপেক্ষায় এক দৃষ্টিতে ট্রামগুলো একের পর এক খানাতল্লাসী করছে? তারপর জয়ন্তী ভাবতে পারে না। কে অমর চক্রবর্তী, জীবিত হোক, মৃত হোক, তার সঙ্গে কি প্রয়োজন?

সামনে বোধহয় একটা বড় স্টেশন আছে, গাড়ির গতিটা ধীর হয়ে এলো। প্লাটফর্ম ভর্তি, সে কি চেঁচামেচি, কুলি হাঁকাহাঁকি, ভেণ্ডারের ব্যস্ততা। হঠাৎ জানালা দিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই জয়ন্তীর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। প্লাটফর্মের একটা থামেব পাশে অনেক লোকেব সঙ্গে আবছা আলোয় একটা নীল জামা, দুটো স্থির চোখের দৃষ্টি এই দিকে।

জয়ন্তী চোখ বুজে একটা অস্ফুট কাতর চীৎকার করে উঠল।

'কি হলো?' সুকোমল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'একটা নীল জামা পরা লোক এইদিকে' জয়ন্তী আঙুল দিয়ে দেখাল। সুকোমল একটু তাকাল, তারপর বলল, 'তাই কি হলো, ভূত দেখলে নাকি? নীল জামা, দেখছো না রেলের পোশাক, লোকটা রেলের কোনো ফায়ারম্যান টায়ারম্যান হবে বোধহয়।'

ভিখারি বিষয়ে আলোচনা

কার্তিক সবে শেষ হতে চলেছে। কলকাতায় শীত আসতে এখনও ঢেব দেরি। তবে সকালে-সন্ধ্যায় বাতাসে একটু হিম-হিম ভাব। রাতে গায়ে একটা চাদর দিলে আরাম লাগে। ভোরবেলায় গাছের পাতা, মাঠের ঘাস শিশিরে ভিজে থাকে। সন্ধ্যার দিকে একটা নীল কুয়াশাব হালকা পর্দা ল্যাম্পপোস্টের নিচে নেমে আসে কোন কোন দিন।

মাসের দ্বিতীয় শনিবার। দুপুরে খেয়ে উঠে শারদীয় সংখ্যার একটা উপন্যাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে মাসকাবার বাজার করেছি। তারপর বিক্রিওয়ালা ডেকে পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করেছি। অবশেষে স্নানের সময় পোষা কুকুরটাকে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়েছি। ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে, এর পরে আর অনেকদিন স্নান করানো যাবে না। একটা বুড়ো এবং বেয়াদপ কুকুরকে স্নান করানো খুব কষ্টসাধ্য কাজ। বাজার করা, কাগজ বেচাও খুব সোজা কাজ নয়।

ফলে যথেষ্টই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি এবং যখন ঘুম ভাঙল তখন রীতিমত অন্ধকার। শেষবারের মত দিন ফুরানোর মুখে কয়েকটা কাক ডাকাডাকি সেরে নিচ্ছে শ্রান্ত কণ্ঠে।

অবহেলায় ঘুম থেকে উঠে মন খারাপ হয়ে গেল। কত কি করার ছিল, কত কি করার আছে, কিছুই হল না।

ছুটির দিনের বিকেল। বাড়ির সবাই বাইরে বেরিয়েছে। বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বেলে মুখ ধুয়ে খাওয়ার টেবিলের ওপরে চায়ের ফ্লাস্ক থেকে পেয়ালায় চা ঢেলে খেলাম।

শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। বার বার হাই উঠছে। জামা কাপড় পরে বাইরে বেরুলাম। সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবির বন্দোবস্ত আছে। খালি বাড়ি বন্ধ করে যেতে কোনোও অসুবিধে নেই। তাছাড়া কুকুরটা আছে। আমরা এখনও যেখানটায় থাকি সেখান থেকে ময়দানের দক্ষিণ প্রান্ত বেশ কাছে। হাঁটতে হাঁটতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত গেলাম।

শনিবারে সন্ধ্যা বলেই গেটের কাছে খুব ভিড়, রীতিমত মেলা জমে গেছে। বেলুনওলা, পুলিসের ভয়ে ত্রস্ত ফুচকা ও আলুকাবলিওয়ালা এবং সেই সঙ্গে এক দঙ্গল ভিখারি। ভ্রমণকারী বায়ুসেবীরা অধিকাংশই অবাঙালী, কালোয়ার বা গুজরাটী। আজকাল আবার কিছু চীনেও জুটেছে। হংকং হস্তান্তর হয়ে যাবে কয়েক বছরের মধ্যে, সেখানকার চীনেরা নাকি কলকাতার দিকে আসছে। কথাটা হয়ত সত্যি; থিয়েটার রোডে, ময়দানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আজ বছর দুয়েক হল চীনেদের সংখ্যা কেবলই বাড়ছে। আগে এসব অঞ্চলে চীনে দর্শন অকল্পনীয় ছিল।

তা যা হোক, কালোয়ার, গুজরাটী আর চীনে এই তিন সম্প্রদায়েরই ভিক্ষে দেওয়ার দিকে ঝোঁক। হয় এদের হাতে কাঁচা পয়সা খুব বেশি অথবা অন্য কোন পাপপুণ্যজনিত গর্হিত কারণ আছে কিংবা দুটোই। এরা ভিখারি খুঁজে, ভিখারি ডেকে ভিক্ষা দেয়।

ভিক্টোরিয়ার প্রধান গেটের উল্টো দিকে একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে একটা ইট বাঁধানো বেদী আছে। ময়দানে এলে অনেক সময় এই বেদীটার ওপর বসি। জায়গাটা এমনিতে সুন্দর। সামনে বিশাল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, তার ওপারে আলোঝলমল এসপ্ল্যানেড। ডাইনে চৌরঙ্গীর উঁচু উঁচু বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। কাঁচের জানালা দিয়ে সেই আলোর রেশ শহরকে মোহময়ী করে তুলেছে।

বেদীটার ওপর বসতে গিয়ে দেখি এক পাশে একটা লোক আগাগোড়া র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে। সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সদর গেটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। লোকটার বসার ভঙ্গি, ঘাড় বাঁকানোর ভঙ্গি কেমন যেন খুব চেনা-চেনা মনে হল।

বুঝলাম লোকটাও আমাকে চিনতে পেরেছে। হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বসে বলল, 'কিরে, সন্ধ্যাবেলা ময়দানে কি করছিস?'

গলার স্বর শুনে স্পষ্টই চিনতে পারলাম। আমার পুরনো বন্ধু সিদ্ধেশ্বর। সে আমাকে যে প্রশ্ন করেছে সেই একই প্রশ্ন আমিও তাকে করতে পারতাম, তা না করে র‍্যাপার-আবৃত অবয়বের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'খুব শীত পড়েছে।'

সিদ্ধেশ্বর উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল, 'যা, ইয়ার্কি করিস না! জানিস না ঠাণ্ডায় আমি কষ্ট পাই! আর এই নতুন ঠাণ্ডাতেই সবচেয়ে বেশি বেকায়দা হয়।'

আমি বললাম, 'তা হলে ঠাণ্ডায় ময়দানে বসে আছিস কেন?'

সিদ্ধেশ্বর জবাব দিল, 'উপায় নেই। পেটের দায়ে এই কাজ করতে হচ্ছে। ব্যাপারটা সেজন্যেও দরকার।'

পেটের দায়ে ময়দানে গাছের নিচে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে শুনে আমি একটু চিন্তিত হলাম। এ আবার কি ধরনের পেটের দায়? সিদ্ধেশ্বর কি গোয়েন্দাগিরি কিংবা স্পাইং শুরু করেছে নাকি? কাউকে অনুসরণ করছে, কারও দিকে নজর রাখছে? সিদ্ধেশ্বরের পেটের দায়ের আগের ধান্দাগুলো কিছু কিছু জানি। সেজন্যে আরও চিন্তায় পড়লাম।

এবারে সে কুকুরের বাচ্চার ব্যবসা করেছিল। এমন যে আমি ওর এত পুরনো বন্ধু আমার কাছেও ও একটা বাচ্চা বিক্রি করেছিল। আমাদের বাড়িতে এখন যে বুড়ো পাজি কুকুরটা রয়েছে, যেটাকে স্নান করাতে গিয়ে আজই গলদঘর্ম হয়েছি, সেটাই সিদ্ধেশ্বর আমাকে গছিয়ে দিয়েছিল।

কুকুর বেচে লাভ করার একটা সহজ এবং চমৎকার পন্থা আবিষ্কার করেছিল সিদ্ধেশ্বর। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, ফোর্টের সামনে গঙ্গার ধারে শীতের মরসুমে বেদেরা আসে পাহাড়ী কুকুর নিয়ে। সেই সব কুকুরের ছানা তারা যার কাছে যেরকম পারে সেইরকম দামে বিক্রি করে।

সিদ্ধেশ্বর করেছিল কি, সেখান থেকে সস্তায় কুকুরছানা নিয়ে এসে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে উচ্চবংশের কুকুর বলে চড়া দামে বেচত।

শেষরক্ষা করতে পারেনি। কারণ তার লোভ বেড়ে যায়। রাস্তা থেকে নেড়ি কুকুরের ছানা কুড়িয়ে বা চুরি করে এনে বেশি দামে বেচতে থাকে। খুব ছোট কুকুরছানার জাতগোত্র বিচার করা কঠিন। সব ছানারই কান ঝোলা, ঝকমকে লোম। এক পুলিস সাহেবের মেয়ের বয়ফ্রেন্ডের কাছে এরকম একটা কুকুরছানা বিক্রি করে গুরুতর বিপদে পড়েছিল সিদ্ধেশ্বর। তারপর ও লাইন ছেড়ে দেয়।

সিদ্ধেশ্বরের পরের লাইন ছিল আরও গোলমেলে। সাব রেজিস্ট্রারের অফিসে যেসব দলিল রেজিস্ট্রি করা হয় তার মধ্যে গোলমেলে দলিল থাকে কিছু। সেসব দলিলের সাক্ষী কেউ হতে চায় না। বেশ কিছুকাল সিদ্ধেশ্বর ঐরকম সব দলিলের পেশাদার সাক্ষী হয়ে রুজিরোজগার করেছে। তারপর বহুদিন কোথায় বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। জেলেটেলেও গিয়ে থাকতে পারে, কিছুই আশ্চর্য নয়।

আজ আবার অনেকদিন পরে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে ময়দানে এইখানে দেখা হয়ে গেল। তবে আজকে সিদ্ধেশ্বরের সমস্যাটা কি সেটা ভাল বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য বেশিক্ষণ মৌন থাকার পাত্র সিদ্ধেশ্বর নয়। সে নিজে থেকেই মুখ খুলল। সহসা খেদোক্তি করল, 'ভিখারিরা যে এত জোচ্চোর হয় একথা কি আগে কোনদিন বুঝতে পেরেছিলাম।'

তার কথা শুনে একটু বিচলিত হলাম। ভিখারিরা জোচ্চুরি করবে তার সুযোগ কোথায়? তারা তো কিছু দেয়া-নেয়া, কেনা-বেচা করে না। তাদের সঙ্গে আমাদের শুধু প্রদানের সম্পর্ক, আদানপ্রদানের নয়। এক্ষেত্রে প্রতারণা বা জোচ্চুরির সুযোগ কোথায়?

আমার বিমূঢ় এবং চিন্তাশীল ভাব দেখে সিদ্ধেশ্বর বলল, 'তুই বিশ্বাস করছিস না? কী করে বিশ্বাস করবি বল? তোর তো আর নিজের অভিজ্ঞতা নেই?'

এরপর একটু থেমে থেকে, একটু দম নিয়ে, একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সিদ্ধেশ্বর বলল, 'আমার

কথা শোন। এই দেড় মাসে আমার ঢের অভিজ্ঞতা হয়েছে। জানিস আমার এখন এগারটা ভিখারি।'

দেড় মাস এবং এগারটা ভিখারি এই দুটো জিনিস আমার মোটেই হৃদয়ঙ্গম হল না। আমি আরও হতবাক হয়ে গেলাম।

সিদ্ধেশ্বর নিজের মনে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'আমার এগারটা ভিখারি, এগারটাই ডিসঅনেস্ট। সবকয়টা পুরো জোচ্চোর। চাবকিয়ে সিধে করে দিলে মনে শান্তি হয়।'

অসাধু ভিখাবিদের শিক্ষা দেওযার বিষয়ে সিদ্ধেশ্বরের খুব উত্তেজনা ও আগ্রহ দেখে আমি আরও চিন্তিত হলাম, কী জানি ব্যাপারটা কী। সিদ্ধেশ্বর বোকা নয়, কখনই বোকা ছিল না। সে আমার বোঝবার অসুবিধেটা বোধহয় আন্দাজ করেছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আয়, আমার সঙ্গে আয়' আমি কিছুটা কৌতূহলবশত এবং বাকিটা কোনও কিছু এই মুহূর্তে করার না থাকায় বিনা বাক্যব্যয়ে সিদ্ধেশ্বরকে অনুসরণ করলাম। রাস্তা পার হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের ভেতরে ঢুকে গিয়ে পাঁচিলের ওপারে আড়াল থেকে আঙুল দিয়ে দুজন ভিখারিকে দেখিয়ে সিদ্ধেশ্বর আমাকে বলল, 'এ দুটো আমার ভিখারি।'

আমি কিছুই না বুঝে সিদ্ধেশ্ববের মুখেব দিকে তাকিয়ে রইলাম। নির্বিকার সিদ্ধেশ্বর বলে চলল, 'আমার আর দুটো ভিখারি আছে ঐ দিকে উত্তরের গেটে আর ওপাশে সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রালের সামনের গেটে দুজন। এই হল মোট ছজন।'

সিদ্ধেশ্বর আমার দিকে গর্বিত ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল। এ অবস্থায় বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা মানায় না। আমি আর কি বলব, গম্ভীর হয়ে বললাম, 'হিসেব ঠিক আছে?'

সিদ্ধেশ্বরও গম্ভীর হল, বলল, 'ইয়ার্কি নয়। পুরো হিসেবটা এখনও হয়নি। এগারটার মধ্যে গেল ছযটা। আরও হাতে রইল পাঁচটা। এই পাঁচটার মধ্যে দুটোকে রেখেছি রবীন্দ্রসদনেব সামনে। আরও তিনটে কালীঘাটে।'

কথাব পিঠে কথা যোগানোর জন্যেই আমি বললাম, 'কালীঘাটে?'

সিদ্ধেশ্বর বলল, 'আরে সেটাই তো হযেছে সমস্যা। শনিবার বিকেলে কালীঘাটে ভিক্ষের মার্কেট যেবকম, ভিক্টোরিয়ার এদিকটাতেও তাই। দুদিক সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়।'

এতক্ষণে আমি অল্প অল্প বুঝতে পারছিলাম সিদ্ধেশ্বরের সমস্যাটা। তখনো সিদ্ধেশ্বর আমাকে বোঝাচ্ছে, 'অথচ শুক্রবারের দুপুরে কোনও ঝামেলা নেই। দুপুরবেলা বড নামাজের সময় দুটো ট্যাক্সি করে সবকটাকে নাখোদা মসজিদের সামনে নামিয়ে দিই। রোববারের সকালেও তাই, চারটে গির্জা আর দুটো কবরখানায় একজন করে যায়। বাকি পাঁচজনের ছুটি। প্রত্যেককে সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি দিতে হয়।'

আমি পোঁ ধরে বললাম, 'সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি?'

গর্জন করে উঠল সিদ্ধেশ্বর, 'শুধু দেড় দিন ছুটি নয়। দৈনিক দশ ঘণ্টা ডিউটি। মিনিমাম ওয়েজ আইন মেনে প্রতেককে আঠারো টাকা সত্তর পয়সা করে দিতে হবে। এছাড়া স্পেশাল মজুরি।'

এতক্ষণে আমি একটা আসল প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওদের তুই টাকা দিতে যাবি কেন? ওরা তো যে যার মত ভিক্ষেই পাচ্ছে!'

সিদ্ধেশ্বর অনেকদিন পরে আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, 'তোর কবে বুদ্ধি হবে?

ঐ ভিক্ষের পয়সাগুলো তো আমার! ওদের তো আমি মাইনে করে রেখেছি। এগারটা লোকের দৈনিক দুশ টাকার ওপর মাইনে দিতে হয়। তাব ওপরে গাড়িভাড়া, বাস হোক, ট্যাক্সি হোক।'

সাতটা বাজতে খুব বেশি বাকী নেই। আর একটু পরেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইবের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। সিদ্ধেশ্বর আমাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে দক্ষিণ দিকের গেটের অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে সিদ্ধেশ্বর আমাকে বোঝাচ্ছে, 'সবচেয়ে শয়তান হল ঐ খোঁড়া ভিখারিগুলো। খোঁড়া কি খোঁড়া নয় কে জানে, বলে ট্যাক্সি ছাড়া চলব না।'

এরপর কিছু একটা ভেবে সিদ্ধেশ্বর আমাকে বলল, 'তুই খোঁড়া ভিখারিদের নিয়ে কি যেন লিখেছিলি?' আমার লেখা নিয়ে উৎসাহ দেখানোর লোক বিরল। সুতরাং ভিখারির প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উঠতেই আমি সায় দিলাম। সিদ্ধেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'কি যেন গল্পটা?

আমি গল্পটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'আসলে ব্যাপারটা কিছু নয়। একটা খোঁড়া ভিখারি অন্ধ সেজেছে আর অন্ধ ভিখারি গেছে সিনেমা দেখতে। কথা হল খোঁড়াও প্রকৃত খোঁড়া নয়, অন্ধও অন্ধ নয়।'

আমার কথা শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল সিদ্ধেশ্বর, পিঠ চাপড়িয়ে বলল, 'তুই প্রবলেমটা ঠিক ধরেছিলি। জানিস কানা খোঁড়া এদের রেট ডেইলি পঁচিশ টাকা। কিন্তু টাকাটা দিতে হয়, কারণ রিটার্ণ বেশি আসে।'

আমার কিছু বলার নেই। আমি নিঃশব্দে তার কথা শুনে যেতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর কথা বলে যাচ্ছে, 'জানিস, ভাল একটা মেয়েছেলে ভিখারির রেট তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা।

আমি বললাম, 'তা জানি না। তবে মেয়েছেলে ভিখারির একটা গল্প জানি।' মেয়েছেলে ভিখারি বিষয়ে সিদ্ধেশ্বরের খুব উৎসাহ দেখা গেল। আমি গল্পটা ছোট করে বললাম।

'গৃহস্থের বাড়িতে ভিখারি ভিক্ষা চাইতে গেছে। গৃহস্থ বলছে, এখন ভিক্ষা হবে না। এখন বাড়িতে মেয়েছেলে নেই। ভিখারি বলল, কর্তা আমি তো মেয়েছেলে চাইছি না। দু পয়সা ভিক্ষা চাইছি।'

এত ভাল গল্পটা শুনে কিন্তু সিদ্ধেশ্বর মোটেই খুশি হল না। ততক্ষণে দক্ষিণ দিকের গেটে পৌছে গেছি। হঠাৎ র‍্যাপারে আগাগোড়া মাথাসুদ্ধ শরীর ঢেকে সিদ্ধেশ্বর এগিয়ে গিয়ে একটু আড়াল থেকে তার নিয়োজিত ভিখারিদের পর্যবেক্ষণ করল। তারপর ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'এ দুটোই একদম আলসে। একটু চেঁচাতে হবে, বাটিতে পয়সা বাজাতে হবে। নাকিসুরে কাঁদতে হবে, তবে না লোক পয়সা দেবে। দুটোকেই কাল ছাড়িয়ে দেব।' একটু থেমে পরামর্শ চাওয়ার ভঙ্গিতে সিদ্ধেশ্বর আমাকে বলল, 'ভাবছি এবার একট লেপার ব্যান্ড করব!

আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবু ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লেপার ব্যান্ড আবার কি?'

'লেপার ব্যাণ্ড জানিস না?' খুবই অবাক হয়ে গেল সিদ্ধেশ্বর। 'ঐ যে চৌরঙ্গী পাড়ায় ব্যাণ্ড বাজিয়ে টুপি মাথায়, পায়ে কেডস্ জুতো, নাক থ্যাবড়া কালো কুষ্ঠ রোগীরা নেচে পয়সা তোলে!'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেই লেপার ব্যাণ্ড তুই কি করে করবি?'

আমার অজ্ঞতা ব্যথিত করল সিদ্ধেশ্বরকে। সে বলল, 'ও তো সোজা ব্যাপার। যাত্রা পার্টির

মত। আমাদের লাইনে ওর নাম হল কুষ্ঠ অপেরা।'

আমি বিস্ময়োক্তি করতে বাধ্য হলাম, 'কুষ্ঠ অপেরা!'

সিদ্ধেশ্বর বলল, কিন্তু খুব খরচ। লাভ আছে বটে তবে ওরকম একটা দল বানাতে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লেগে যায়। তারপরে থানা পুলিশ আছে।'

আমার এবার বাড়ি ফেরার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া জ্ঞানলাভও যথেষ্ট হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরকে বললাম, 'আমি এখন যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুই আর কতক্ষণ?'

সিদ্ধেশ্বর বলল, 'আমার যেতে রাত দশটা। আজ শনিবার, অনেক মাতাল আসবে এদিকে। মাতালেরা খুব ভাল ভিক্ষে দেয়। দশ টাকা, একশ টাকার নোট পর্যন্ত দেয়। এই ভিখারিগুলো যা চোর-চোখের আড়াল হলেই লুকিয়ে রাখবে। ইটের নিচে চাপা দেবে, গাছের ফোঁকরে গুঁজে রাখবে। ওদের শরীরের মধ্যেও অনেক লুকোনোর জায়গা। কি আর বলব, হাজার সার্চ করেও বার করা যাবে না!'

এত দুঃখ ও সমস্যার কথা শুনে লাভ নেই। আমি বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আমার সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত এল। এখানে ওর আরও দুটো ভিখারি আছে। তারা শো ভাঙা পর্যন্ত ডিউটি দেবে। সিদ্ধেশ্বর দুঃখ করে জানাল, 'আটটার পর ঘণ্টা ধরে ওভারটাইম দিতে হয়।'

একেবারে শেষ মুহূর্তে একটা প্রশ্ন করল সিদ্ধেশ্বর, 'তুই এখন কি করছিস?'

সত্যি কথা বললাম, 'তেমন কিছু নয়।'

এইবার আসল প্রস্তাবটা দিল সিদ্ধেশ্বর, 'আয় দুজনে মিলে একটা লেপার ব্যাণ্ড করি। ফিফটি ফিফটি শেয়ার। দুজনেই নামব। আট-দশটা লোক। গায়ে একটু মবিল আর আলকাতরা, দু-একটা কালো ব্যাণ্ডেজ। আমি আর তুই ড্রাম বাজাব, বাকিরা নাচবে। দুপুরে সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীতে। ভাল লাগবে। লাভও খুব।'

প্রস্তাবটা লোভনীয়। সিদ্ধেশ্বরকে সরাসরি না করতে পারলাম না। বললাম, 'বিবেচনা করে দেখব।'

বাড়ি ফেরার পথে বুঝলাম ঠাণ্ডা শুরু হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরের মত র‍্যাপার না হোক, আমার অন্তত একটা মাফলার দরকার।

বইমেলা

নরোত্তমবাবু সমস্ত জীবন ধরে বই লিখেছেন, শুধু বই আর বই।

তবে বই লেখার জন্যে নরোত্তম দত্তগুপ্ত যে রকম পরিশ্রম করেছেন সেই পরিমাণ খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। তার একটা কারণ অবশ্য যে নরোত্তমবাবুর অধিকাংশ বইই পাণ্ডুলিপির পর্যায়ে আছে, মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নি।

নরোত্তম দত্তগুপ্ত রচিত বইগুলির প্রকাশকের বড়ই অভাব। নরোত্তমবাবু যে ধরণের বিষয়ে লেখেন সেই সব বিষয়ে, এদেশে এমন কি বিদেশেও খুব বেশি লোক লেখেননি। কিন্তু প্রকাশকেরা ভরসা পান না এই রকম বই ছাপতে। তাঁরা বলেন, 'যত ইচ্ছে নভেল দিন, বাচ্চাদের বই দিন'— ছাপবো। কিন্তু ছেলে বৌ নিয়ে সংসার-চালাই, ব্যবসায় লস্ দিতে পারবো না।'

সত্যিই লস্‌ মানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নরোত্তমবাবুর বইতে রয়েছে। একথা নরোত্তমবাবুর অতিবড়ো বন্ধুও স্বীকার করতে বাধ্য। যদিও নরোত্তম দত্তগুপ্ত নিজে এ কথা মানেন না।

গত সাড়ে তিন মাস প্রাণপণ পরিশ্রম করে নরোত্তমবাবু একটিগ্রন্থ রচনা সদ্য সমাপ্ত করেছেন। বইটির বিষযবস্তু যেমন অভিনব, তেমনিই অতি প্রয়োজনীয়, বইটির নামও খুব সরাসরি, নাম পড়ে আর কারো মনে সংশয় থাকে না বইটি কি নিয়ে লেখা, কিনে ঠকবার সম্ভাবনা নেই। সত্যিই 'নিজের চুল নিজে কাটুন' বইটি একটি অসামান্য চিন্তার ফসল।

'নিজের চুল নিজে কাটুন' বইটিতে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে নরোত্তমবাবু দেখিয়েছেন যে সামান্য যোগব্যায়াম জানলে, মানুষ যেভাবে নিজের দাড়ি নিজে কামায় কিংবা মহিলারা যেভাবে নিজের চুল নিজে বাঁধে ঠিক সে-ভাবেই নিজের কেশকর্তন করতে পারবে। মাথার সামনের দিকের চুল কাটা কোনো সমস্যাই নয়। শুধু পিছনের অর্থাৎ ঘাড়ের দিকের চুল কাটার জন্যে মিনিট পাঁচেক কুম্ভাসনে ঘাড়টাকে হাতের কাছে আনতে হবে আর দুদিকে দুটো আয়না লাগবে।

এই বইটির জন্যে কোন প্রকাশকই পাওয়া যায়নি এ কথা বলা অনুচিত হবে। একজন প্রকাশক 'পতিতুণ্ডি ইণ্টারন্যাশনাল' রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা বললেন, 'আমরা আন্তর্জাতিক প্রকাশক, ইংরেজি করে-দিন ছাপবো।'

নরোত্তমবাবু এ প্রস্তাবে যথেষ্টই রাজী হয়েছিলেন এবং পরিশ্রম করে স্বরচিত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন কিন্তু তখন পতিতুণ্ডিরা বললেন, অনুবাদ তাঁরাই করাবেন, আর তাঁর জন্যে নরোত্তমবাবুকে চারহাজার টাকা অগ্রিম দিতে হবে।

টাকা দিয়ে বই ছাপানোর অভিজ্ঞতা নরোত্তমবাবুর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে এই প্রথম নয় এবং প্রত্যেকবারই এ রকম ব্যাপারে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা একই সঙ্গে মর্মান্তিক ও নিদারুণ।

এ ছাড়াও 'নিজের চুল নিজে কাটুন' বইটির জন্যে আরো একজন প্রকাশক পাওয়া গিয়েছিলো। তিনি অনেক দূর এগিয়েছিলেন, তিনি এর আগে এজাতীয় বই কিছু কিছু প্রকাশ করেছেন, যেমন 'চন্দ্রমল্লিকা চাষের প্রণালী' কিংবা 'বাংলাব পিঠেপুলি'। কিন্তু বাদ সাধলেন ঐ প্রকাশকের বড়মামা! সেই ভদ্রলোক অতি সাবধানী। তিনি বললেন, আগের বইগুলি ছিল মোটামুটি নিরীহ জাতের কিন্তু এ বই ছাপলে সেলুন-ওলা আর রাস্তার ক্ষৌরকারদের বিক্ষোভ হবে, তাদের জীবিকায় টান পড়বে এমন কি 'নিখিল কলকাতা কেশশিল্পী সমিতি' মিছিল প্রশেসনও বার করতে পারেন।

সুতরাং নরোত্তম দত্তগুপ্তের শেষতম গ্রন্থটি রচিত হয়ে পড়ে আছে, এখনও ছাপা হয়নি। কোনোদিন হবে কিনা তাই বা কে জানে!

নরোত্তমবাবুর বইয়ের এইরকম ভাগ্য নতুন নয়। সেই যে তিরিশ বছর আগে প্রথম বই তিনি রচনা করেছিলেন তখন থেকেই সরস্বতী ঠাকরুণ না কি ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে পরিহাস করে যাচ্ছেন।

নরোত্তমবাবুর প্রথম বইটির নাম ছিলো, 'ইঁদুর-বিড়াল'। বইটা দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিলো।

১ম খণ্ড : ইঁদুর, আমাদের শত্রু না বন্ধু?

২য় খণ্ড : বিড়াল আমাদের শত্রু না বন্ধু?

দুটি খণ্ডই ছিলো চল্লিশ পৃষ্ঠা করে, এরপরে প্রায় একশো পৃষ্ঠার একটি পরিশিষ্ট ছিলো, যাতে ইঁদুর ও বিড়ালের তুলনামূলক উপকারিতা এবং অপকারিতা প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করা হয়েছিলো। এই অসামান্য পরিশিষ্টটির নাম দেওয়া হয়েছিলো,

ইঁদুর ঃ বিড়াল ঃ

কাকে ফেলে কাকে চাই

দোষগুণ ভাই ভাই।

সেই সময় নরোত্তমবাবুর ধারণা হয়েছিলো, যেহেতু এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ সেইজন্য প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে না। দু' একটি বই প্রকাশিত হলেই যখন পাঠক সমাজে তাঁর নাম সুপরিচিত হয়ে যাবে তখন আর তাঁকে প্রকাশকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে না, তাঁরাই যেচে এসে তাঁর বাড়িতে ধর্ণা দেবেন।

ভবিষ্যতে এই উজ্জ্বল স্বপ্নে বিভোর হয়ে নরোত্তমবাবু দেশের বাড়ির একটা আটচালা টিনের ঘর এগারোশো টাকায় বিক্রি করে দিয়ে 'ইঁদুর-বিড়াল' বইটি নিজের খরচায় প্রকাশ করেন।

বইটি নিজের হাতে বহু বিখ্যাত লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়িতে নরোত্তম দত্তগুপ্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন। সবাই বলেন, 'ঠিক আছে রেখে যান, পড়ে দেখবো।'

পরে নরোত্তমবাবু বহু বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে এই জ্ঞান অর্জন করেন যে এই জাতীয় নামকরা লোকেরা প্রায় কোনো বই-ই পড়েন না, বিশেষ করে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল লেখকের প্রথম গ্রন্থ তো নয়ই। দুএকজন যাঁরা মলাট অবধি দেখেছিলেন তাঁদের কথাবার্তাতেই নরোত্তম দত্তগুপ্ত খুব মর্মাহত হয়েছিলেন।

একজন বলেছিলেন, 'হাসির গল্পে আপনার হাত আছে। আপনি চেষ্টা করে যান, আপনার হবে।' এই রকম একটা গম্ভীর বিষয়ের বইকে কি করে ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি হাসির বই ভেবেছিলেন সেটা নরোত্তমবাবু কখনোই অনুধাবন করতে পারেন নি।

কিন্তু এর চেয়েও ভুল করেছিলেন অন্য একজন। তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি, তিনি ভেবেছিলেন এটাও কোনো একটা আধুনিক কবিতার বই, খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন তি' বলেছিলেন, 'শুধু নামকরণে আধুনিক হলেই চলবে না, লেখার মধ্যে, জীবনের মধ্যেও আধুনিকতা আনতে হবে।'

এরপর থেকে নরোত্তম দত্তগুপ্ত খ্যাতনামা লোকেদের আর বই দিতে যেতেন না। যদি খুব ইচ্ছা হতো রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু স্বশরীরে কখনোই খোঁজখবর নিতে যান নি।

অবহেলায় বা অনাদরে নরোত্তম লেখা ছেড়ে দেন নি। তিনি তো আর সাধারণ কবি, গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকের মতো নন, তাঁর লেখা সৌখিন বা কাল্পনিক নয়, নেহাতই বাস্তব জীবনের প্রতিদিনের প্রয়োজন ও সমস্যা নিয়ে তাঁর চুলচেরা বিশ্লেষণ। সমাজ ও জাতির কল্যাণের কথা ভেবেই তিনি কলম চালানো বন্ধ করে দিলেন না, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে সমঝদার পাঠক বেশি জুটলো না।

অবশ্য দু'একবার যে তাঁর লেখা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নি তা নয়। বিভিন্ন বিষয়ে বই লিখতে লিখতে অবশেষে উনিশসো সাতষট্টি সাল নাগাদ তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম দিয়েছিলেন—'বাঙালীরা পারে, সাহেবরা পারে না।'

প্রায় দশ বারোটি বই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় অমুদ্রিত থাকার পরে নরোত্তম দত্তগুপ্তের এই বইটি

প্রকাশিত হয়েছিলো। বিলাতফেরত এক দেশপ্রেমিক চিকিৎসক যিনি আবার নরোত্তমবাবুর একটু দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়ি জামাতা তিনি বইটির নাম শুনেই মুগ্ধ হয়ে যান। আসলে প্রবাসে দীর্ঘদিন থেকে তাঁর মনে প্রচণ্ড গ্লানি জন্মেছে, সাহেব মেমদের ব্যবহারে তাঁর বিতৃষ্ণা এসে গেছে, তিনি নরোত্তমবাবুকে বলেন, 'মামা, আমি আপনাকে একশো পাউণ্ড দিচ্ছি, আপনি বইটি বার করুন।'

একশো পাউণ্ড কম টাকা নয়, তখন প্রায় দুহাজার টাকা। নরোত্তম দত্তগুপ্ত অসাধু লোক নন। তিনি ভাগিনেয়ি জামাতার কাছে ঋণ রাখতে চাননি সাহায্যও নিতে পাননি। ঐ টাকা দিয়ে যুগ্মভাবে একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। প্রকাশক প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয় 'দত্তগুপ্ত এ্যাণ্ড নেফিউ ইন ল পাবলিশিং কোম্পানী'।

'বাঙালীরা পারে, সাহেবরা পারে না' সত্যিই কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো। নরোত্তমবাবু দেখিয়েছিলেন শতকরা নব্বই জন বাঙালী সাঁতার জানে, অথচ সাহেবদের মধ্যে মাত্র শতকরা পনেরো জন। কতকগুলো জিনিস বাঙালীদের সহজাত যেমন একহাতে ছাতা ধরে অন্যহাতে সাইকেল চালানো কিংবা এক রিক্সায় একসঙ্গে তিনজন চারজন বসে যাওয়া। নরোত্তমবাবু দেখালেন এ সব ব্যাপারে সাহেবেরা বাঙালীদের ধারে কাছে ঘেঁষার যোগ্যতা রাখে না।

বই পড়ে কিছু কিছু লোক বাহবা দিয়েছিলো, দু-একটা ছোটবড় কাগজে অল্পবিস্তর প্রশংসাও বেরিয়েছিল কিন্তু বিক্রি বিশেষ কিছু হয় নি। ফলে 'বাঙালীরা পারে, সাহেবরা পারে না' 'বইটি দত্তগুপ্ত এ্যাণ্ড নেটিভ ইন ল পাবলিশিং কোম্পানীর' প্রথম ও একমাত্র বই হয়ে রইল।

কিন্তু নরোত্তম দত্তগুপ্ত অদমিত। কোনো ঠাণ্ডা অভ্যর্থনা বা অনুদার সমালোচনা তাঁকে আটকিয়ে বা থামিয়ে রাখতে সমর্থ হয় নি।

সেই অদমিত প্রয়াসের শেষ ফসল তাঁর নবতম গ্রন্থ 'নিজের চুল নিজে কাটুন'। বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হবে কিনা তা এখনও জানা যায় নি। কিন্তু সম্প্রতি নরোত্তমবাবুর মাথায় একটা নতুন আইডিয়া বা পরিকল্পনা এসেছে। ময়দান এবং এদিক ওদিকে কয়েকটা বুক ফেয়ার বা বইমেলায় ঘুরে ঘুরে তাঁর মাথায় এক অভিনব বুদ্ধি এসেছে।

বহু লেখকের বহু প্রকাশকের অনেক রকম বই দিয়ে যদি বই মেলা হতে পারে তবে একজন লেখকের নিজস্ব বই মেলাই বা হতে পারবে না কেন?

নরোত্তম দাত্তগুপ্ত মনস্থির করে ফেলেছেন। ঐসব প্যাণ্ডেল, গেট, স্টল এসবেব ঝামেলার মধ্যে তিনি যাবেন না। তাঁর সর্বসমেত তিনটি মুদ্রিত গ্রন্থ এবং ছাব্বিশটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি একক ভ্রাম্যমাণ বইমেলা করবেন।

খবর পাওয়া গেছে এরই মধ্যে কোথাও নরোত্তমবাবু ময়দানের আশেপাশে কোনো গাছের ছায়ায় কিংবা গাড়িবারান্দার নীচে মুদ্রিত গ্রন্থত্রয় এবং অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিগুলি নিয়ে একক বইমেলা শুরু করে দিয়েছেন। সেখানে সকলেরই নিমন্ত্রণ, তবে নরোত্তমবাবুর টাকাপয়সা নেই। বিজ্ঞাপন করতে পাবেন নি, মেলাটা কোথায় সেটা একটু কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হবে।

পাদুকার বদলে

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে বেরোনোর অভ্যেস আমার অনেক দিনের। কাছাকাছি রাস্তায় কিংবা পার্কে হাঁটতে চলে যাই, ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে ফিরে আসি। যত রাতেই ঘুমোই না কেন, প্রথম পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তারপর তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে একটা জামা গায়ে দিয়ে পায়ের কাছে চটি বা জুতো যা পাই পরে নিয়ে চটাস চটাস করে বেরিয়ে পড়ি। অধিকাংশ দিনই আমার কুকুরটা আমার সঙ্গে থাকে। আমার সঙ্গে সকালে বেড়াতে সে খুব ভালবাসে। আমি ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধোয়া মাত্র সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, ঘন ঘন লেজ নাড়তে থাকে এবং মাঝে মধ্যে আমার উপর লাফিয়ে পড়ে। দুজনে এরপর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে যাই।

আজ কিছুদিন হলো আমি একটা নতুন পাড়ায় এসেছি, এটা একদম সাহেবপাড়া। আমরা যে বাড়িটায় থাকি সে বাড়িটাও বিরাট।

আমরা আগে যে বাড়িটায় ছিলাম সেটা ছিলো বেশ ছোটো। সেখানে আমাদের জিনিষপত্র খাট-আলমারি বিশেষ কিছু ছিলো না। আমাদের এখনকার এই বিরাট বাড়িটার পক্ষে সেই জিনিষগুলি খুবই অল্প, সেগুলো দিয়ে এ বাড়ির একটা কোণাও ভরলো না। অথচ আমাদের অবস্থা এমন নয় যে এত বড় বাড়ি নতুন ফার্ণিচার দিয়ে ভরে ফেলি। ফলে আমাদের এই নতুন তলায় আমরা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, আলগা-আলগা হয়ে বাস করছি। কেবলই মনে হয় আরো কিছু জিনিষ দরকার ছিলো।

এ ছাড়া আরো কয়েকটা ছোটখাট অসুবিধা হয়েছে নতুন পাড়ায় এসে। যেমন কাছাকাছি কোনো বাজার নেই, বন্ধুবান্ধবের যাতায়াত কম। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধা হলো সকালে বেড়ানো নিয়ে। কাছেই ময়দান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। সেখানে হাজার হাজার লোক বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম আমাদের পুরনো পাড়ার মত এ পাড়ায় ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, পায়ে ছেঁড়া চটি দিয়ে বেড়ানোর নিয়ম নেই। হাফপ্যান্ট, ভি কাট সাদা বা রঙীন গেঞ্জি, পায়ে কাপড়ের জুতো-এই হলো এ পাড়ায় প্রাতঃভ্রমণের পোশাক।

এমন কি প্রাতঃভ্রমণের সহচর ময়দানে বেড়াতে নিয়ে আসা কুকুরগুলি পর্যন্ত চমৎকার ধোপদুরস্ত। তাদের গলায় সুন্দর ঝকমকে চামড়ার বকলস, রুপোলি শিকল।

বাধ্য হয়ে পাড়ার মেজাজ ঠাণ্ডা করতে গিয়ে পনেরো বিশ টাকা খরচ করে কুকুরের সাজ সরঞ্জাম কেনা হলো। এদিকে হয়েছে, আমার পক্ষে হাফপ্যান্ট পরা অসম্ভব। শুধু পাড়া দেখলেই তো চলবে না, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব আছে, তারা দেখলে হাসাহাসি করতে পারে।

একটা কলারওলা জামার মত গেঞ্জি কিনলাম। অফিস যাওয়ার ফুল প্যান্টের সঙ্গে সেই গেঞ্জি জুড়ে সকালে বেড়ানোর চমৎকার পোশাক হয়ে গেলো।

এরপর জুতো। চামড়ার একজোড়া ফিতেওলা সু আছে আমার। তিন বছরের পুরনো, সেটা পায়ে দিয়ে অফিস যাই। এখন সকালবেলা সেটা পরে হাঁটাহাঁটি করলে ছিঁড়ে যাবে, অফিস যাওয়ার জুতো আর থাকবে না। আর তাছাড়া ঐ ভারি জুতো পরে সকালে বেড়ানো পছন্দসই

কাজ নয়। ঘুম থেকে উঠে ফিতে লাগানো জুতো পরা সে'ও বেশ কষ্ট।

সুতরাং একজোড়া প্রাতঃভ্রমণের জুতো অবশ্যই কিনতে হবে। হালকা, কাপড়ের কিন্তু সাদা নয়, কোনো ঘন রঙের, সাদা হলে ময়লা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, বার বার কালি করে রোদে শুকোতে হবে। আর ফিতে লাগানো জুতোও চলবে না। ভোরবেলা উঠে ফিতে ঢিলে করে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে তারপর ফসকা গেরো দিয়ে ফিতে শক্ত করে বাঁধো, তারপর হাঁটতে গিয়ে সে ফিতে দু'একবার খুলবেই, তারপর ফিরে এসে আবার ফিতে খুলে জুতো থেকে পা বার করো। এর মধ্যে যদি আবার ফিতের গিঁটে জট বেঁধে যায় তাহলে সে আরো ঝকমারি।

সুতরাং আমার একজোড়া রঙিন কাপড়ের জুতো চাই, পাম্পসু বা নিউকাট অন্তত মোকাসিন জাতীয়, যার মধ্যে অনায়াসেই পা গলিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। কিন্তু এই কলকাতা শহরে কাপড়ের মোকাসিন বা নিউকাট পাওয়া অসম্ভব, সে সব জুতো যারা পায় দিতো তারা বহুকাল এই শহর থেকে বিদায় নিয়েছে। হয়তো পাড়াগাঁয়ের হাটে-বাজারে গেলে সে রকম জুতো চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে, কিন্তু কলকাতায় বড় জুতোর দোকানে গিয়ে কাপড়ের পাম্পসু খোঁজ করা মাত্র দোকানদাররা এমন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকান যেন পঞ্চাশ বছর আগের কবর থেকে এইমাত্র হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছি।

তাই বলে দোকানে মর্নিং ওয়াকের জুতো নেই তা নয়। বিচিত্র পাঁচমিসেলি রঙের অত্যন্ত জটিল সে সমস্ত পাদুকা এবং খুবই মূল্যবান। শক্ত টান-টান, ফিতে বাঁধা; একজন দোকানদার আমাকে বোঝালেন, 'এ জুতো পায়ে দিলেই মনে হবে ছুটি।'

কিন্তু আমি তো ছোটাছুটি করতে চাই না, আর কেউ হঠাৎ আমাকে তাড়াও করছে না। আমার চাই স্বচ্ছন্দে আরাম করে বেড়ানোর উপযুক্ত একজোড়া নরম জুতো।

শেষ পর্যন্ত একদিন আমি আমার স্বপ্নের জুতোর সাক্ষাৎ পেলাম। তা'ও এক-আধ জোড়া নয়, হাজার হাজার জোড়া, কাপড়ের মোকাসিন, ঘন নীল রঙের, সব প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটে ভরা একটা বড় ট্রাকে উঠছে। লালবাজারের পিছনে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে একটা কাজে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়লো এই জুতোভর্তি ট্রাক। কোন্ দোকানে যাচ্ছে জানতে পারলে সেই দোকান থেকে কিনবো, এই ভেবে ট্রাকওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ড্রাইভার সাব, ইয়ে এতনা জুতা কাঁহা যাতা হ্যায়?'

ড্রাইভার গম্ভীর হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসাম, গৌহাটি।' বলে দুবার কর্ণভেদী হর্ণ বাজালেন।

আমার পক্ষে জুতো কিনতে আসাম যাওয়া সম্ভব নয়। আর সেখানে আজকাল যা গোলমাল, জুতো কিনতে গিয়ে প্রাণ হারাবো নাকি?

বাধ্য হয়ে আমাকে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করতে হলো, 'ইয়ে এতনা জুতা কাঁহাসে আতা হ্যায়?'

ড্রাইভার সাহেব এবার উত্তর দেবার আগেই দুবার প্রবল শব্দে হর্ণ বাজালেন, তারপর নিজের হর্ণ বাজানো শুনে নিজেই খুশি হয়ে আমাকে হাতের আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বাঁ দিকের একটা গলি দেখিয়ে বললেন, 'নিউ বোম্বাই সু কোম্পানি, টেরিটিবাজার, ক্যালকাটা।'

বুঝতে পারলাম, পাশের গলিটিই বাজার এবং ওখানেই নিউ বোম্বাই সু কোম্পানির অফিস।

গলিতে ঢুকে কিন্তু জুতোর দোকান দেখতে পেলাম না, তবে অনেক অনুসন্ধানের পর একটা জরাজীর্ণ বাড়ির দরজায় দেখলাম পুরনো টিনের পাতে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে আসা ইংরিজি অক্ষরে

কোম্পানিটার নাম লেখা রয়েছে। ফার্স্ট ফ্লোর। ভাঙা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলায় শুধু জুতো আর জুতো। বারান্দায়, ঘরে, সিঁড়ির উপরে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ জুতো। দিনের বেলায়ও রীতিমত অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে একদল লোক জোড়া মিলিয়ে জুতোগুলো প্ল্যাস্টিকের মোড়কে ভরছে।

আমি যখন দোতলায় উঠে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারা আমাকে তাকিয়েও দেখলো না। অবশেষে আমাকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বলতে হলো, 'আমি জুতো কিনতে এসেছি।' তারা আমাকে নিঃশব্দে ভিতরের একটা ঘরের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে দেখালো। সেই ঘরে একটি মাত্র ছোট টেবিলে দুজন লোক লম্বা লম্বা কাগজে কঠিন সব যোগবিয়োগ করছেন। আমাকে দেখামাত্র তারা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি গৌহাটি থেকে আসছি কিনা, তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই জানালেন মাল রওনা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে আমার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলেন যে আমি গৌহাটি কিংবা অন্য কোথাও থেকে আসিনি, আমি কলকাতার একজন সামান্য খদ্দের এবং আমার চাই মাত্র একজোড়া জুতো। শুনে তাঁরা একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, গত তিরিশ বছরে এদের কাছে কেউ একজোড়া জুতো কিনতে আসে নি। তাঁদের বিখ্যাত নিউ বোম্বাই সু কোম্পানি পাইকারি কারবার করে। একজোড়া জুতো তাঁরা কখনো বেচেন নি, বেচবেন না।

অনেক সাধ্য-সাধনা অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর তাঁরা বললেন, 'ঠিক আছে, যে জোড়া ইচ্ছে নিয়ে যান, দাম লাগবে না।'

যদিও খুব অপমানিত বোধ করছিলাম, তবু লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। একজোড়া গাঢ় নীল রঙের কাপড়ের মোকাসিন বেছে নিয়ে চলে এলাম। আসার সময় তাঁদের যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম কিন্তু তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

পরদিন সকালে আমার সেই বহু অপমানের, বহু সাধের জুতো পায়ে দিয়ে ভিক্টোরিয়া তিন চক্কর দিলাম। প্রতিদিন আমার কুকুরটা আমার আগে আগে যায়, আমি পিছে পিছে আসি। আজ নতুন জুতো পরে আমিই আগে আগে গেলাম, সে হাঁফাতে হাঁফাতে পিছে পিছে আসতে লাগলো।

অবশেষে আমিও হাঁফিয়ে গেলাম। ভিক্টোরিয়ার উল্টোদিকে ময়দানের সামনের একটা বেঞ্চিতে বিশ্রাম নিতে বসলাম। পাশে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছিলেন। আমি পাশে বসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নজর গেলো আমার জুতোজোড়ার উপর এবং তখনই তাঁর হাঁ বন্ধ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ আমার জুতোজোড়ার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,'এ জুতোজোড়া কোথা থেকে কিনলেন?'

আমি সত্যি কথা সংক্ষেপে বললাম, 'কিনি নি।'

তিনি বললেন 'তা হলে'

আমি বললাম, 'টেরিটি বাজারে এক পাদুকা ব্যবসায়ী এই জুতোজোড়া আমাকে দান করেছেন।'

ভদ্রলোক একবার আমার কথা শোনেন, একবার আমার পায়ের দিকে তাকান, তারপর একবার নিজের পায়ের দিকে তাকান আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, 'এ রকম এক জোড়া জুতা যে আমি কত খুঁজেছি।' আমার জুতোজোড়ার দিকে আবার তাকান, তাঁর চোখ দুটো লোভে লালসায় চকচক করে জ্বলতে থাকে।

আমার ভয় হলো, কি জানি ভদ্রলোক পা থেকে জুতোজোড়া কেড়ে নেবেন নাকি? তাঁর

পায়ে অবশ্য চমৎকার একজোড়া জুতো রয়েছে তবে সেটা নিতান্তই ভালো পাম্পসু, আমার মতো এ রকম জাহাজি নীল ওয়াকিং সু নয়।

ভদ্রলোককে অন্যমনস্ক করবার জন্যে আমি সবিস্তারে জুতো-জোড়া কি ভাবে পেয়েছি এবং এরকম একজোড়া জুতো যে কলকাতায় পয়সা দিলেও পাওয়া যাবে না সেটা ব্যাখ্যা করে বললাম।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আরো অস্থির হয়ে উঠলেন। এমন সময় একটা সাদা রঙের নতুন এ্যামবাসাডর গাড়ি আমাদের কাছে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে উর্দিপরা ড্রাইভার নেমে আমার পাশের পাদুকালোভী ভদ্রলোককে সেলাম করলো।

বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এই গাড়ি ও ড্রাইভার ভদ্রলোকেরই। তিনি সকালবেলা হাঁটতে হাঁটতে ময়দান চলে আসেন, পরে ড্রাইভার এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়।

সেলাম শেষ করে ড্রাইভার গাড়ি খুলে গাড়ির ভিতর থেকে আটটা ফোলডিং চেয়ার বার করে ফুটপাথের উপর পেতে দিলো। সুন্দর ঝকঝকে সাদা এ্যালুমিনিয়াম রঙের চেয়ার, পিঠে এবং বসার জায়গায় উজ্জ্বল ক্যানভাস লাগানো। ভদ্রলোক প্রতিদিন সকালে নিশ্চয় এই ফুটপাথে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের সামনে ময়দানের খোলা হাওয়ায় এই চেয়ারগুলোতে বসে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করেন।

কিন্তু ভদ্রলোকের আজ গল্প করার অবস্থা নেই, তাঁর বন্ধুবান্ধবেরাও এখনো এসে পৌছায় নি। ভদ্রলোক আমার জুতোজোড়ার দিকে যত তাকাচ্ছেন ততই অস্থির হয়ে পড়ছেন। অবশেষে লোভ সামলাতে না পেরে বলেই ফেললেন, 'আপনার জুতোজোড়াটা দিন না, একবার পায়ে দিয়ে দেখি। কতকাল কাপড়ের এমন সুন্দর জুতো পায়ে দিই নি!'

এ রকম অসম্ভব অনুরোধ জীবনে আমি খুব বেশি পাইনি। কিন্তু ভদ্রলোকের আগ্রহাতিশয্যে জুতোজোড়া খুলতে হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেলো এক অসম্ভব ঘটনা, নিজের পাম্পসু জোড়া ফুটপাথের উপর খুলে ফেলে আমার সাধের জুতোজোড়া চকিতে পায়ে গলিয়ে তিনি ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললেন, 'এই ড্রাইভার, জলদি চলো।' বিশ্বস্ত, আজ্ঞাবাহী চালক তাঁকে নিয়ে দ্রুতগতিতে রেড রোডের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ফুটপাথে পড়ে রইলো ভদ্রলোকের আটটি শৌখীন চেয়ার, যাকে বলে বাগানকেদারা এবং একজোড়া পাম্পসু।

আমি ভদ্রলোকের অপেক্ষায় তাঁরই একটি বাগানকেদারায় বসে রইলাম। মাঝে মধ্যে দু একজন ভ্রমণকারী আমাকে চেয়ারে বসা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চৌধুরী সাহেব আসেন নি।' চৌধুরী সাহেব অর্থাৎ সেই পাদুকালোভী ভদ্রলোক এসেছিলেন এবং চলে গেলেন এবং আসবেন কিনা বলতে পারি না এবং তিনি আমার জুতোজোড়া নিয়ে গেলেন এবং আশা করছি তিনি ফিরবেন। এই কথা আট-দশ জন ভদ্রলোককে বোঝাতে হলো। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চেয়ারে বসে আধঘণ্টা একঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর চলে গেলেন।

বেলা বাড়তে লাগলো। নটা, সাড়ে নটা, দশটা। আমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার কুকুরটা অস্থির হয়ে পড়েছে। ময়দানের প্রাতঃভ্রমণকারী একজনও নেই। কিন্তু চৌধুরী সাহেব আর এলেন না।

গত্যন্তর না দেখে চৌধুরী সাহেবের জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে একটা ঠেলা ডেকে এনে আটটা

এ্যালুমিনিয়ামের চেয়ার তুলে নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম, এতো মূল্যবান জিনিষ রাস্তায় তো আর ফেলে যেতে পারি না।

এখন আমাদের নতুন বাসায় ফার্নিচারের দুঃখ কিছুটা ঘুচেছে। বাইরের ঘরে এ্যালুমিনিয়ামের চেয়ারগুলি রুপোর মত ঝকঝক করছে। যে দেখে সেই জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় পেলে?' আমি প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাই। তবে ময়দানে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল সকালে চৌধুরী সাহেবের পাম্পস্ জোড়া পায়ে দিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ির ছাদের উপরে পায়চারি করি। বেশ বড় ছাদ, খোলামেলা; কোনো অসুবিধা হয় না।

নগেনবাবুর কীর্তিকলাপ

নগেন মজুমদারের চিরকালই দু'নম্বরি কারবার। জালজোচ্চুরি যে কোনো উপায়ে দু পয়সা উপার্জন করাই তাঁর জীবনের পরমার্থ। তবে ঐ দু পয়সাই, তার বিশেষ বেশি নয়।

পাকা পেঁপের বিচি রোদ্দুরে শুকিয়ে তাতে সজনে গাছের শুকনো ছালের ঝাঁঝ মিলিয়ে যারা গোলমরিচ বেচে যারা ফালি সুপুরির মধ্যে বাঁশের শিকড়ের কুচি চালিয়ে দেয়, যারা বাড়ি তৈরির সিমেন্টের মধ্যে গঙ্গামাটি মেশায় সেই তারা সব শিশু, নগেন মজুমদারের তুলনায় তারা নিতান্ত নাবালক। এমন কি যারা ঘিয়ের মধ্যে সাপ কিংবা গরুর চর্বি চালিয়ে দেয় কিংবা সরষের তেলে মেশায় পোড়া মবিল অয়েল, সেই সব নীতিজ্ঞানহীন জোচ্চোরেরা পর্যন্ত নগেনবাবুর কাছে নীতিহীনতার এবং জুয়াচুরির শিক্ষা নিতে পারে।

এত বেশি বিশেষণে নগেন মজুমদারকে ভূষিত করার আগে বরং তিনি ইতিপূর্বে কৃতিত্বের সঙ্গে কি কি কার্য সমাধা করেছেন এবং এখনো করছেন, তার দু'একটা সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া ভালো।

মনে করা যাক, এই লোডশেডিংয়ের ব্যাপারটা। এই যে শহরে-বাজারে, বাড়িতে-কারখানায়, প্রেসে হাসপাতালে দুমদাম আলো নিভে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার থাকে, লোকে ইলেকট্রিক বোর্ড আর সরকারকে গালাগাল দেয়, খবরের কাগজে খারাপ-খারাপ কথা লেখে, এই ঘোরতর বিদ্যুৎ বিপর্যয় কার জন্যে?

কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ মহলে অনেকেই জানেন এসব ব্যাপারে নগেন মজুমদারের হাত আছে। বিদ্যুৎ তৈরীর নানা জায়গায় নগেনবাবুর নানা ধরনের লোক আছে। সেই সব লোকেরা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা নগেনবাবুর কাছ থেকে কখনো কখনো পেয়ে থাকে। তারা কখনো লাইনের তার কেটে দেয়, কখনো বিদ্যুতের কারখানার মধ্যে একপাটি ছেঁড়া জুতো অথবা এক ফুট লোহার ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দেয়। যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, কারখানার চাকা থেমে যায়, লাইনের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রাম-ট্রেন, ইস্কুলে পাখাবন্ধ, পরীক্ষার হলে ঘামতে ঘামতে খাতায়, লেখার চেষ্টা করে ছেলেমেয়েরা, ছাপাখানা আটকে যায়, খবরের কাগজ-বই বেরোয় না, অন্ধকারের কালো ছায়া নেমে আসে ঝলমলে বাজারে।

এত লোকের এত অসুবিধে এত কষ্ট, কিন্তু কোন স্বার্থে নগেনবাবু দেশ ও দশের এত বড়

ক্ষতি করেন! কেউ কেউ বলতে পারেন নগেনবাবু রাজনীতি করেন এবং তাই বিপক্ষ দলকে ডোবানোর জন্যে, অসুবিধেয় ফেলার জন্যে এ রকম করেন। কিন্তু এ কথা ধোপে টিকবে না। যখন যে দলই ক্ষমতায় থাকুক নগেনবাবুর কার্যকলাপ একই রকম থাকে। তা হলে তিনি কার শত্রু, তিনি কার বন্ধু।

আসলে নগেন মজুমদার হলেন অন্ধকারের বন্ধু, আলোর শত্রু। কেউ কেউ ভাবতে পারে, বোধহয় তাঁর লণ্ঠনের কিংবা বিদ্যুতের জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। লোডশেডিং বেশি হলে এ সবের ফলাও কারবার হবে, তাই তিনি পয়সা খরচ করে লোক লাগিয়ে এসব করান। এই অনুমানটার মধ্যে অবশ্য সামান্য সত্যতা আছে। কিন্তু অন্ধকারের ব্যবসায় নগেনবাবুর লাভ এত সামান্য যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করো বড়ো কঠিন। সারা মাস ধরে দৈনিক আঠারো ঘণ্টা করে টানা লোডশেডিং হলে নগেনবাবুর অতিরিক্ত লাভ হয় মাত্র দেড়শো কি দুশো টাকা।

লোডশেডিংয়ের সময় মোমবাতির চাহিদা বেড়ে যায়। বড় মোমবাতির এই মোটা সুতো সরবরাহের ব্যবসা যে সব কোম্পানির তাদের একটা নগেনবাবুকে লোডশেডিংয়ে সুতো বিক্রি বেড়ে গেলে সেই বাড়তি লাভের উপরে শতকরা দশটাকা কমিশন দেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সামান্য লাভের জন্যে নগেন মজুমদার মানুষ হয়ে এতবড় অন্যায় করেন এত মানুষকে কষ্ট দেন? আর তিনি নিজেও তো কষ্ট পান।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তাই। অন্যকে অসম্ভব কষ্ট দিয়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ লাভের জন্য যা ইচ্ছে করতে পারেন নগেনবাবু। আসলে লাভ ব্যাপারটা কোনো ব্যাপারই নয়, সেটা খুবই গৌন । কারণ অন্ধকারের কারবারেই তার আনন্দ। সেই আনন্দের জন্যে, লাভের জন্যে নয়, নগেনবাবু চারদিকে লোডশেডিং করিয়ে বেড়ান।

তাছাড়া নগেনবাবু লাভের জন্য সব সময় সব কিছু করেন না। হয়তো পরোক্ষ সামান্য লাভ হলেও হতে পারে, অনেক কাজই করেন তিনি নিছক নির্মল আনন্দের জন্যে। হরিণঘাটার দুধের ব্যাপারটাই ধরা যাক।

হরিণঘাটার দুধ না এলে, সেটা টকে গেলে, নষ্ট হয়ে গেলে অথবা তার মধ্যে ইঁদুর পড়ে পচে গেলে লোকেরা খেতে পায় না। হাজার হাজার শিশু বৃদ্ধ রোগীর হাহাকার পড়ে যায়। নগেনবাবু আনন্দে গুনগুন করে ওঠেন, জানলা দিয়ে যখন দেখেন, রাস্তা দিয়ে লোকেরা শুকনো মুখে খালি বোতল নিয়ে যাচ্ছে তিনি আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে যান, খালি ঘরে এই সাতচল্লিশ বছর বয়েসে বিছানায় ডিগবাজি দিতে থাকেন।

কি লাভ হয় নগেনবাবুর? কিছুই না। তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নের মিল্ক পাউডারের দোকান আছে। বাজারে এই রকম সব দুধবন্ধ দিনে সেখানে গেলে সেই ছোকরা তাঁকে সেদিন বিক্রিবাটা বেশি হয়েছে বলে চায়ের সঙ্গে দুখানা নাইস বিস্কুট দেয়। নগেনবাবু আবার ডায়াবিটিসের রোগী, নাইস বিস্কুট দুটোয় চিনির দানাগুলো যতটা পারেন নখ দিয়ে খুঁটে ফেলে দিয়ে তারপর খান।

অথচ কম কষ্ট করতে হয়েছে! হরিণঘাটার অতবড় দুধের ভাণ্ডার। একটা দুটো ইঁদুরে সেখানে কিছু হবে না। গত পনেরো দিন ধরে ইঁদুরমারা কলে বাইশটা ইঁদুর ধরে মাণ্ডনি সিংকে দশটা টাকা দিয়ে হরিণঘাটায় পাঠিয়েছিলেন কাল সন্ধ্যাবেলা। সকলের চোখের আড়ালে দুধের

ট্যাঙ্কের মধ্যে ইঁদুরগুলো ছেড়ে দিয়ে এসেছিলো মাগুনি সিং। তারপরে আজ শেষরাতে যখন ইঁদুরগুলো দুধের মধ্যে আবিষ্কার হয়েছে, কত না হৈ হট্টগোল হয়েছে দুধের কারখানায়। মন্ত্রী-বড়সাহেব সব ঘুম থেকে উঠে ছুটে গেলেন। কত চীৎকার চেঁচামচি গোলমাল হয়েছে, কল্পনা করতে করতে নগেনবাবুর মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। পা নাচাতে নাচাতে হাতে ধরা ক্ষতবিক্ষত নাইস বিস্কুটটা চিবোতে থাকেন।

তারপর এই দুদিন আগের জলের গোলমালটা। নেহাৎই লোককে কষ্ট দেওয়ার আনন্দে লোক লাগিয়ে টালা ট্যাঙ্কের মেসিনটা ভেঙে দিলেন নগেনবাবু। সারা কলকাতায় সে কি জলের হাহাকার, পাড়ায় পাড়ায় আর্তনাদ শুরু হয়ে গেলো।

হঠাৎ লোকজন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে কোথাও এক বিন্দু জল নেই। নগেনবাবু তো নিজে জলের সর্বনাশ করেছেন, সব আগে থেকে বন্দোবস্ত রেখেছিলেন। হাঁড়িতে, কলসীতে ড্রামে জল ভরে রেখেছিলেন। যখন শহরের লোকেরা রাস্তার মোড় থেকে মোড়ে, টিউবওয়েলে ছুটোছুটি করছে তখন নগেনবাবুর বাড়িতে অঢেল জল। তাঁর নগদ লাভ নেই কিছুই, কিন্তু অন্যদের জল নেই, জলের জন্যে সকলেই মাথা কুটছে অথচ তাঁর নিজের জলের অভাব নেই এই স্বাচ্ছন্দ্যে পুলকিত হয়েই তিনি সন্তুষ্ট। মনের আনন্দে ভাগ্নের দোকানে না গিয়ে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে দোকান থেকে তাঁর প্রিয় নাইস বিস্কুট কিনে খেলেন।

আস্তে আস্তে নগেনবাবুর সাহস খুব বেড়ে গেছে। সম্প্রতি তিনি যে কাজে হাত দিয়েছেন তা যেমনই দুঃসাহসিক তেমনিই ন্যায়নীতিহীন। শুধু ন্যায়নীতিহীন না বলে সরাসরি বলা উচিত নগেন মজুমদারের বর্তমান কাজটি রীতিমত দেশদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে।

পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ মজুমদারকে সাধারণ একজন ছাপোষা সাদামাটা গৃহস্থ ভদ্রলোক বলেই জানে। তাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন তাদের পরিচিত এই ভদ্রলোক, যাঁকে তারা নগেনবাবু বা মজুমদারমশায় বলে জানেন তিনি একজন আস্ত পাষণ্ড এবং দেশদ্রোহী।

ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ অবশ্য জানেন যে নগেনবাবু খুব সুবিধের চরিত্রের লোক নন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত গতিবিধি, কাজকর্ম সম্পর্কে সকলের সম্যক ধারণা নেই। তবে কেউ কেউ জানেন যে নগেনবাবু প্রথম যৌবনে একাধিকবার নানা দোষে কারাবাস করে এসেছেন।

নগেনবাবু ইদানীং বেশ চালাকচতুর হয়ে গেছেন। গর্হিত কাজকর্ম নিজের হাতে বড় করেন না, খুব সাবধানে পাকা লোক দিয়ে করান। আর তাছাড়া এমন সব ব্যাপারে তিনি জড়িত যাতে তাঁর ব্যক্তিগত লাভালাভের সুযোগ সংকীর্ণ। সুতরাং ধরা পড়া দূরে থাক তাঁকে আজকাল সন্দেহ করাই কঠিন।

কিন্তু প্রকৃতই নগেন মজুমদার অল্প বয়সে দুবার জেল খেটেছিলেন। একবার জাল নোট ছাপতে গিয়ে, আরেকবার গুঁড়ো চায়ের মধ্যে লোহার গুঁড়ো মিশিয়ে। দুটো কাজেই তিনি ধরা পড়েন শেষের দিকে। প্রথম দিকে রমরমা অবস্থায় বহু টাকা জমিয়ে তারপর ধরা পড়ে দু'চার বছর জেল খেটে এসেও গচ্ছিত টাকায় তাঁর অভাব হয় নি। সেই গচ্ছিত টাকাতেই এখনো তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন, টাকার বিশেষ টানাটানি নেই তাঁর, খুব প্রয়োজন আছে তাও নয়, বিশেষ কোনো খারাপ অভ্যেস নেই তাঁর। আজকাল নগেন মজুমদার যে কুকর্মাদি করেন তা নেহাতই মনের আনন্দে, প্রাণের তাগিদে-ঠিক অর্থলোভে নয়।

সে যা হোক, জেল খাটার সময় কারাগারের ভেতরে নগেনবাবুর সঙ্গে অনেক লোকের আলাপ পরিচয় হয়েছিলো। জেলের মধ্যে কত রকমের লোক, খুনে-ডাকাত-চোর-পকেটমার। একেকটা আবার একেক রকম। চোরই যে কত জাতের আছে— ছিঁচকে চোর, গাঁটকাটা সিঁদেল চোর, তালাভাঙা চোর, গরু চোর। একেক রকম চুরির ব্যবসাযে একেক রকম দক্ষতা থাকে। ছিঁচকে চোর গরু চুরি করতে পাববে না, গাঁটকাটার পক্ষে সম্ভব নয় সিঁদেল চোরের কাজ করা।

জেলের ভিতরে একজন গরুচোরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো নগেনবাবুর। জেল থেকে বেরিয়ে আসার কিছুদিন পরে তিনি লোকটিকে আবার আবিষ্কার করেন, তখন সেও জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাড়ির পাশেই একটা খাটালে লোকটা গোয়ালা, নগেনবাবুদের পাড়াতেই বাড়িতে বাড়িতে সে দুধ দেয়।

নগেনবাবু যেমন গোয়ালাকে দেখে চিনতে পেরেছেন, তেমনিই গোয়ালাও তাঁকে চিনতে পেরেছে। দুজনেই পাকা লোক। গোয়ালাও অন্য লোকের কাছে নগেনবাবুর জেল খাটার কথা বলেনি, নগেনবাবুও তাই। দু'জনেই দুজনকে বুঝে চলে। রামখিলান নামে ঐ গরুচোর গোয়ালা নগেনবাবুকে রাস্তায় দেখলেই নমস্কার করে। নগেনবাবুও হাসিমুখে প্রত্যুত্তবে রামখিলান গোয়ালাকে বলেন, 'রাম রাম।'

সম্প্রতি রামখিলানের সঙ্গে নগেনবাবুর ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়েছে। মাঝে মাঝেই দেখা যায় যখন দুধ দোয়ানো বা দুধ বেচা থাকে না রামখিলান এসে নগেনবাবুর বারান্দায় বসে কি বলছে আর নগেনবাবু একটা খাতায় লিখে যাচ্ছেন।

পাড়ার লোকেরা ভাবে নগেনবাবুর দুধের হিসেবে নিশ্চয় খুব গোলমাল আছে তাই রামখিলানের সঙ্গে বসে মেটাচ্ছেন। কিন্তু ব্যাপার আরো গোলমেলে। নগেনবাবু একটি বই লিখছেন, 'গরু চুরির একশো উপায়', সেই বই লেখায় নগেনবাবুর সমস্ত তথ্য ও বুদ্ধি সরবরাহ করছে রামখিলান।

জিনিসটা একটু পরিষ্কার করে বলা উচিত। মাঝে মধ্যেই খবরের কাগজে দেখা যায়, 'সীমান্তে গরু চুরি, তিনজন ডাকাত গ্রেপ্তার' অথবা 'সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গুলিতে গরুচোব নিহত'। এই সব খবরগুলি দিনের পর দিন দেখে নগেনবাবু বুঝতে পারেন ভিনদেশী গরুচোরেরা সীমান্ত পার হয়ে আমাদের দেশে ঢুকে পড়ে কিন্তু তারা গরুচুরির কায়দা ভালো জানে না বলে প্রায়শই ধরা পড়ে যায় অথবা প্রাণে মারা পড়ে।

রামখিলানকে পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বললেন নগেনবাব। বললেন সে যদি সাহায্য করে বইটা লিখতে তবে তাকে পঞ্চাশ টাকা দেবেন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এতে পৃথিবীর সমস্ত সম্ভাব্য গরুচোরের ভীষণ উপকার হবে।

কিন্তু এইখানেই হলো গোলমাল। রামখিলান গোয়ালা গরু চুরি করে, দুধে জল মেশায় কিন্তু সে দেশদ্রোহী নয়। নগেনবাবুর বই লিখতে সে সাহায্য করেছিলো ঠিকই কিন্তু সে যখন বুঝতে পেরেছিলো যে অন্যদেশের গরু চোরেরা আমাদের গরু নিয়ে যাবে তখন যা-তা উল্টোপাল্টা সব বলেছিলো নগেনবাবুকে।

রামখিলান যা বলেছিলো তা শুধু উল্টোপাল্টা নয়, যে কোনো গরুচোরের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক।

ফলে যখন নগেনবাবুর ক্যানভাসাররা সীমান্তের সর্বত্র সেই 'গরুচুরির একশো উপায়' বইটি

মাত্র পঁচিশ পয়সা দামে বেচতে শুরু করলো, ভিনদেশী গরুচোরেরা সেই বইটি কিনে মন দিয়ে পাঠ করতে লাগলো।

কিন্তু ফল হলো বিপরীত আগে দুজন গরুচোর মারা পড়তো, তিরিশজন ধরা পড়তো কিন্তু অন্তত সত্তর আশিটা গরু চুরি করে পালাতো চোরের দলের বাকি লোকেরা। এই বইয়ের একশো উপায়ের নির্দেশ অনুসরণ করে বিদেশী গরুচোরদের সর্বনাশ হয়ে গেলো। সীমান্ত অতিক্রম করে একটি চুরি করা গরু নিয়ে একজন চোরও দেশে পৌঁছাতে সক্ষম হলো না।

ভিনদেশী চোরেরা এরপর ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গেলো বইটির লেখক নগেনবাবুর উপরে। তারা তো আর জানে না যে নগেনবাবুর কোনো দোষ নেই, সব দোষ এই দেশপ্রেমিক গরুচোর গোয়ালা রামখিলানের, যার কথা শুনে নগেনবাবু বইটি লিখেছেন।

পরপর তিনটে গরু চোরের দল সাবাড় হয়ে যাবার পরে চতুর্থ দলটি নগেন মজুমদারের 'গরু চুরির একশো উপায়' বইটির ক্যানভাসারকে ধরলো। তাকে বিশেষ মারধোর করতে হলো না, প্রাণের ভয়ে গরীব বেচারা নগেনবাবুর ঠিকানা দিয়ে দিলো।

অবশেষে একদিন গরুচোরেরা শেয়ালদা স্টেশনে নামে। তারপর কলকাতা শহর খুঁজে নগেনবাবুর বাড়ির কাছে পৌঁছালো। বাড়ির উপর দু'একদিন নজর রেখেই তারা বুঝলো নগেনবাবু দৈনিক সকালে কাছেই এক পার্কে পায়চারি করেন। গরুচোরেরা মাঠ থেকে গরু ধরায় এক্সপার্ট, সুতরাং পার্ক থেকে নগেনবাবুকে ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে তারা চলে গেলো এক ভোরবেলায়।

এরপর থেকে নগেন মজুমদারের সংবাদ আর জানা যায়নি। অনেক খোঁজখবর করেও পুলিস তাঁর পাত্তা পায়নি। তবে তাঁর বাড়িতে একগাদা 'গরু চুরির একশো উপায়' বইটি পাওয়া গেছে। পুলিসের লোকজন তাই বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছে।

সে যাহোক, নগেনবাবু প্রাণে বেঁচে ঐ কুখ্যাত গরুচোরদের হাত থেকে কোনো কালে ফিরে আসতে পারবেন কিনা কে জানে? কিন্তু ইতিমধ্যে নগেনবাবুর অন্তর্ধানের সুফল দেখা যাচ্ছে। লোডশেডিং, দুধে ইঁদুর, জলের হাহাকার সবই একটু একটু করে কমে আসছে।

নামাবলী

প্রথমে নাম ছিল কালাচাঁদ হুই। সবাই কালাচাঁদ নামেই ডাকত। কাছাকাছি নিকটজন, পাড়া-প্রতিবেশী অবশ্য বলত কালু, কেউ কেউ আদর করে কেলো।

গুছাইতগঞ্জের নয়নচাঁদ হুইয়ের একমাত্র ছেলে কালাচাঁদ। সাত মেয়ের মধ্যে একমাত্র ছেলে। সাত ভাই চম্পার ঠিক উল্টো আর কি! সাত ভাই চম্পা এক বোন পারুল না হয়ে এক ভাই চম্পা সাত বোন পারুল।

পারুল বোনেদের যথাসময়ে যথাস্থানে বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে আমাদের কোন চিন্তার কারণ নেই।

আমাদের এই গল্পে সমস্ত সমস্যা ঐ এক ভাই চম্পা কালাচাঁদ হুইকে নিয়ে।

নয়নচাঁদের উপযুক্ত সন্তান কালাচাঁদ। গুছাইতগঞ্জের হুইবংশের নয়নমণি, শিবরাত্রির

সলতে কালাচাঁদ হুই তার এই সাদা-মাটা নাম নিয়ে জীবনের প্রথম সতেরো আঠারোটা বছর বেশ নির্বিবাদেই অতিবাহিত করেছিল।

নামের মধ্যে যে কোন রকম নতুন-পুরোনো, খারাপ-ভাল থাকতে পারে এ ধারণা কালাচাঁদের মাথায় ঢোকেনি ঐ আঠারো বছর বয়েস পর্যন্ত।

মুস্কিল হল কলেজে ভর্তি হয়ে। গুছাইতগঞ্জ হাইস্কুলে কেই বা মাথা ঘামিয়েছে কালাচাঁদের নাম নিয়ে, আর যারা মাথা ঘামাবে তাদের নামেরই বা কি ছিরি। যজ্ঞলাল অথবা গজেশ্বর কি করে বুঝতে পারবে কালাচাঁদ নামটা তাদের থেকে খারাপ, না ভাল।

গুছাইতগঞ্জের লোকেদের নাম প্রায় সকলেরই এই রকম। হেডমাস্টারমশায় ধনুকনাথ কাঞ্জিলাল আর পঞ্চায়েত সভাপতি ভাবল পাল মশায়ের নামদুটো শুনলেই বাকি আপামর গুছায়েতগঞ্জবাসীর নাম সম্পর্কে মনে কোন সংশয় থাকে না।

মাধ্যমিক পরীক্ষার বছর প্রিটেস্টের আগে শ্রাবণ মাসে কালাচাঁদ কলকাতায় মামার বাড়ি এসেছিল মামাতো বোনের বিয়েতে। সেখানে কালাচাঁদ হুই নামটা নিয়ে তাকে খুব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নব জামাতা অর্থাৎ মামাতো জামাইবাবুর সঙ্গে বাসরঘরে পবিচয় হতেই ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'এটা নিশ্চয় তোমার নাম নয়, তোমার নামের ওরফে। এরকম নাম তো ছদ্মনাম না হয়ে যায় না।'

নতুন জামাইবাবুর এই মন্তব্য শুনে বাসরঘর-ভর্তি ফাজিল মেয়েরা হৈ হৈ করে হেসে উঠেছিল। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কালাচাঁদ।

নতুন জামাই লোকটি খারাপ নয়। তার ঐ মন্তব্যে এই গ্রাম্য, সরল ছেলেটি একটু আহত হয়েছে এটা ভেবে সে পরদিন বাসিবিয়ের সকালে কালাচাঁদের সঙ্গে যেচে আলাপ কবে। তারপর পরামর্শ দেয়, তুমি তো এখনো মাধ্যমিক পরীক্ষাই দাওনি। এখন তো নাম পাকাপাকি হয়নি। টেস্টের পরে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করাব সময় নিজের পছন্দমত নাম বেছে বসিয়ে দিলেই হবে।

কথাটা খুবই ভাল লেগেছিল কালাচাঁদের। তবে সে বুদ্ধিমান ছেলে বলে গুছাইতগঞ্জে গিয়ে নাম বদলানোর ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে কোন আলোচনায় যায়নি।

যথাসময়ে টেস্টে এলাউ হল কালাচাঁদ। কালাচাঁদ খারাপ ছাত্র নয়, ভালভাবেই এলাউ হয়েছে। তারপরে এল সেই মোক্ষম দিন, পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার দিন।

এই কয়েক মাস ধরে অনবরত ভেবেছে কালাচাঁদ। একা একাই ভেবেছে, কারও সঙ্গে পরামর্শ করার সাহস হয়নি। মাঝে মধ্যে অভিধানের পাতা খুলে উল্টোপাল্টা নাম খুঁজেছে। স্কুলের অফিস ঘরে একটা পুরনো টেলিফোন ডিরেক্টরি আছে তার মধ্যে চোখ বুলিয়েছে। খবরের কাগজের আর ঢাউস শারদীয়া সংখ্যার সূচীপত্রে, তাছাড়া যাত্রা-থিয়েটার আর সিনেমার রকমারি বিজ্ঞাপনে সে চোখ রেখেছে মনোমত নামের জন্য।

কালাচাঁদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা, শুধু নামটাই পাল্টাবে না কি সেই সঙ্গে পদবীটাও। এখানে তার সংস্কারে বাঁধছে, চৌদ্দ পুরুষের পদবী, গুছাইতগঞ্জের বিখ্যাত হুইবংশের সে আপাতত শেষ বংশধর, হুই পদবীটার প্রতি তার দুর্বলতা অপরিসীম, রক্তের কণায় কণায়।

কিন্তু হুই-ফুই যে আজকের দিনে চলবে না সেটাও বোঝার মত বুদ্ধি আছে কালাচাঁদের।

অনেক রকম ভেবেচিন্তে অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নিল— হয় এসপার নয় ওসপার, নাম পদবী দুইই বদল করবে।

এইবার শুরু হল আসল বিপদ। শুধু নাম নয়, নাম আর পদবী একসঙ্গে। মিলেমিশে কত রকম সুন্দর নাম আছে।

প্রথমে দেখতে হবে ছোট নাম চাই, না বড় নাম। নাকি মোটামুটি মাঝারি সাইজের হলে ভাল হবে।

কত ভাল ভাল ছোট নাম হতে পারে—রবি দে, শক্তি দাঁ, ইন্দু ঝা, বেনু সী। এগুলো যেন রেলগাড়ির জানালা দিয়ে দেখা টুকরো টুকরো ছবির মত।

অন্যদিকে বড় নামগুলি—রজতরঙ্গন বসু বায় চৌধুরী, গোপিজনবল্লভ পদরেণু উপাধ্যায় অথবা কৃষ্ণচন্দ্র হুই মজুমদার, কি অপূর্ব জমজমাট।

বলা বাহুল্য ঐ শেষ নামটি কালাচাঁদের স্বকপোলকল্পিত, নিজের যোজনা। কালাচাঁদ থেকে সাধুভাষায় কৃষ্ণচন্দ্র আর হুইয়ের সঙ্গে মজুমদার দ্বন্দ্ব, সমাস করে হুই মজুমদার।

এরপর বহুবিধ ভেবেচিন্তে কালাচাঁদ শেষ নামটির হুই অংশটি বাদ দিয়ে নিজের নাম কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার করার সিদ্ধান্ত মনে মনে গ্রহণ করল।

বিপদ হল ফর্ম জমা দেয়ার পরে। হেডমাস্টারমশাই ধনুকনাথবাবু নিজের হাতে একটার পর একটা ফর্ম মিলিয়ে নিচ্ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার নামে এ ছেলেটি কোথা থেকে এল। গুছাইত হাই স্কুলে মাত্র সাড়ে তিনশো ছাত্র, শুধু তাদের প্রত্যেকের নাম নয় তাদের বাপ ঠাকুরদা চৌদ্দপুরুষের নাম ধনুকনাথবাবুর জানা। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার দেখেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এই কৃষ্ণচন্দ্র, আবার কে এল?

ভয়ে ভয়ে কালাচাঁদ হেডমাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল। হেডমাস্টারমশায় অবাক হয়ে কালাচাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কেউ যে স্বেচ্ছায় পিতৃদত্ত নাম পাল্টাতে পারে এ রকম তিনি ভাবতেই পারেন না।

ধনুকনাথবাবুর বিস্ময়ের ভাবটা কাটতেই একটা ধমক দিলেন, 'তুমি কালাচাঁদ আবার কৃষ্ণচন্দ্র হলে কবে? আর সাতপুরুষের হুই উপাধিটা পাল্টে মজুমদার হয়ে গেল? ছিঃ ছিঃ তোমাদের এত নামকরা হুইবংশ! তুমি এত বড় কুলাঙ্গার হয়েছ তলে তলে ! ছিঃ ছিঃ! তোমার বাবা কি জানেন?'

এরপর হেডমাস্টারমশায় ফর্মের নিচে এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন', এখানে যে গার্জিয়ানের স্বাক্ষর লাগবে, তোমার বাবা দেবেন সই এতে? আর মাধ্যমিক বোর্ড রাজি হবে কেন, হুইয়ের ছেলে মজুমদার, তারা তোমাকে পরীক্ষাই দিতে দেবে না। এ্যাডমিট কার্ড পাবে না।'

ঘটনার আকস্মিকতায় এবং হেডমাস্টারমশায়ের ঝোড়ো বাক্যবাণে বিপর্যস্ত হয়ে কালাচাঁদ বিমর্ষচিত্তে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পরিত্যাগ করে পুনরায় কালচাঁদ হুইয়ে ফিরে গেল।

এর কিছুদিন পরে পরীক্ষায় পাশ করে কালাচাঁদ জেলা সদরে এল গ্রাম থেকে। সেখানে বোর্ডিংয়ে থেকে কলেজে পড়াশুনা করবে।

কলেজে ভর্তি হয়ে কালাচাঁদ হুই নামটা তার পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াল। প্রথমদিন বাংলার অধ্যাপক রোল কল করার পর সবাইকে কোন স্কুল থেকে এসেছে এবং কার কি নাম বলতে

বলল। যে মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে বলল, কালাচাঁদ হুই, গুছাইতগঞ্জ নকুলেশ্বর পাল মেমোরিয়াল হাই স্কুল—সমস্ত ক্লাসে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হাসির সোরগোল পড়ে গেল।

এ রকম বিপদ কালাচাঁদের জীবনে বহুবার ঘটেছে। এর জন্যে সে মোটামুটি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এরপর সব সময় প্রায়ই ছোটখাট উৎপাত লেগে রইল।

বোর্ডিংয়ে কালাচাঁদের ঘরের দরজায় কে যেন চকখড়ি দিয়ে লিখে রাখল,

কালাচাঁদ হুই
গুছাইতগঞ্জে ভুঁই
এই ঘরে শুই।

মনের দুঃখে কালাচাঁদ মাঝে মধ্যে বোর্ডিংবাড়ির দোতলার ছাদে উঠে একা একা পায়চারি করত। একদিন ছাদে উঠে ঘুরছে, শুনল, হেঁড়ে গলায় কে যেন সিঁড়ির ওপর থেকে গান গাইছে,

চল যাই ছাদ
হুই কালাচাঁদ।

মনের দুঃখে কালাচাঁদ কলেজ ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবে কিনা ঠিক করতে যাচ্ছে এমন সময়ে তার সঙ্গে গোপাল দাস নামে এক সুবোধ যুবকের আলাপ হল। মামার বাড়িতে থেকে সেও কালাচাঁদের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে।

গোপালের মামা স্থানীয় আদালতের পেশকার। তিনি গোপালের মুখে কালাচাঁদের নির্যাতনের ঘটনা শুনে বললেন, 'এতে কি হয়েছে, আদালতে এফিডেবিট করে নাম বদলে নিলেই হয়। এই তো আমাদের নন্দ দলুই, সেদিন নাম পালটে সুনন্দ রায় হয়ে গেল। হামেশাই হচ্ছে।'

গোপাল এসে কালাচাঁদকে এসব তথ্য জানাতে সে যেন সত্যিই হাতে চাঁদ পেল।

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত এবং সাদামাটা।

বাড়িতে কিংবা গ্রামের কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপাল এবং গোপালের মামার সহযোগিতায় সে জেলা আদালতে এফিডেবিট করে নিজের নাম কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারে রূপান্তরিত করেছে।

গ্রামের লোকেরা কিছু জানে না। ছুটিছাটায় দেশের বাড়িতে গেলে এখনো তাকে গ্রামের লোকেরা কালাচাঁদ, কালু বা কেলে বলে ডাকে।

কখনো কখনো কালাচাঁদের সঙ্গে তাদের গ্রামে হিরণ্ময় চৌধুরী নামে এক স্মার্ট, হাসিখুশি বন্ধুও যায়। গ্রামের লোকেরা তাকে হিরন্ময়বাবু বলে সম্বোধন করে।

তবে তার নাম কেউ না জানুক, আমরা জানি, এই হিরণ্ময়বাবুই কালাচাঁদের ভাল বন্ধু গোপাল দাস। মামার সাহায্যে কালাচাঁদের সঙ্গে সেও এফিডেবিট করে নিজের নাম বদলে ফেলেছে।

পাপি সুইমিং স্কুল

আজ কয়েকদিন হল কাঞ্চনেরা একটা খুব বড় বাড়িতে এসেছে। কাঞ্চনের বাবা যেখানে কাজ করেন, সেই কোম্পানিরই সাবেক আমলের কোয়ার্টার এটা। এত বড় যে, আজকাল কেউই তাতে থাকতে চায় না। চারদিকে বাগান, সেগুলো এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। চওড়া বারান্দা ধুলোয় ছেয়ে আছে, দেয়ালে অতিকায় মাকড়শার জাল। পুরনো মরচে-ধরা লোহার গেট খুললে এক

কিলোমিটার দূর থেকে তার আর্তনাদ শোনা যায়। শহর কলকাতার ঠিক মাঝখানে এরকম একটা বাড়ি, তেঁতুল ও বাদাম গাছের ছায়ার নীচে প্রাচীন একটা আধা-প্রাসাদ থাকতে পারে, সেটা সত্যিই ভাবা কঠিন।

তবু বাড়িটি আছে, এবং গত কয়েক মাস এখানে কেউ আসেনি। আগের বাসিন্দা যিনি ছিলেন, কাঞ্চনের বাবার উপরতলা, তিনি সাত মাস আগে রিটায়ার করার পর এই বাড়ি ফাঁকাই পড়ে ছিল। কাঞ্চনরা থাকত খুব ছোট একটা বাড়িতে। কাঞ্চনের বাবার অফিসের কর্তৃপক্ষ একদিন কার্তিকবাবুকে, মানে কাঞ্চনের বাবাকে বললেন, "তুমি তো অনেকদিন বাড়ি-বাড়ি করছ, এই কোয়ার্টারটায় যাও না। খুবই লম্বা-চওড়া, বেশ হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবে।"

কার্তিকবাবু এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। এতদিন বড় অসুবিধার মধ্যে ছিলেন। যদিও প্রায় পোড়ো বাড়ি, তবু খোলামেলা আর খুবই বিশাল, একটু ভাঙাচোরা, তাতে কিছু আসে যায় না। তিন দিনের মধ্যে দুটো ট্রাক ভর্তি করে মালপত্র নিয়ে, সঙ্গে ট্যাক্সিতে কাঞ্চনের মা, কাঞ্চনের বাবা আর কাঞ্চন, কার্তিকবাবু নতুন কোয়ার্টারে চলে এলেন।

আসবার পরের দিনই কাঞ্চনের মা কার্তিকবাবুকে বললেন, "দ্যাখো, তুমি আর ঠাকুরপো অফিস চলে গেলে এই শুনশান বাড়িতে এটুকু কাঞ্চনকে নিয়ে কেমন ভয়-ভয় করবে। একটা কুকুর এনে দাও, পুষি।"

কার্তিকবাবু বললেন, "কেন, এটা তো প্রায় অফিস পাড়া। সামনের রাস্তায় সারা দুপুর হুই-হুই করে গাড়িঘোড়া যাচ্ছে।"

কাঞ্চনের মা একটু রেগে গিয়ে বললেন, "সে তো রাস্তায়, এত বড় নিঝুম পুরীর মধ্যে রাস্তার কোনো শব্দই আসে না। কেউ এসে আমাদের গলা টিপে মেরে গেলেও কেউ জানতে পারবে না।"

এরপরে আর আলোচনায় না গিয়ে কার্তিকবাবু বললেন, "ঠিক আছে, কুকুর এনে দিচ্ছি। কিন্তু বড় কুকুর তো আনা যাবে না, একটা কুকুরছানা নিয়ে আসছি, দুমাস ভালো করে পোষ, দেখবে বিরাট হয়ে যাবে।"

কলকাতার গঙ্গার ধারে বিদেশী জাহাজ, শীতল বাতাস এবং মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু এ সবের চেয়েও অনেক জীবন্ত একটি চিত্র গঙ্গার ঘাটে প্রায়ই দেখা যায়। সে হল অজস্র কুকুরছানা, ছাগলের মতো দড়ি দিয়ে সেগুলি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা তাদের কারো রঙ বাদামি, কেউ সাদা, কেউ কুচকুচে কালো, কিন্তু প্রত্যেকের লেজ ফোলা, ঝোলা কান, নরম ঠাণ্ডা কালো নাক আর ভোররাতের আকাশের মতো ফিকে নীল চোখ। তারা কেউ লাফাচ্ছে, কেউ আপন মনে খেলছে, কেউ বা পাশের সঙ্গীর সঙ্গে ছদ্ম লড়াই করছে। দু-একজন ঘুমোচ্ছে, একটু কুঁ কুঁ করে কাঁদছে এক আধ জন। এর বাইরে এপাশে ওপাশে একটি কি দুটি আছে যারা নরম কিশোর কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করে নিজেদের বীরত্ব জাহির করছে।

একদিন সকালবেলা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এই রকমই ঘেউ ঘেউকারী একটি বীর কুকুরছানাকে কার্তিকবাবু বেছে নিলেন। কালো রঙের কুকুরছানাটি তার গলা ও পেটের নীচে ঝকঝকে সাদা, কার্তিকবাবু কাছে যেতেই সে পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে চিত হয়ে আম-আঁঠির ভিতরের কুষির মতো সাদা ও নরম জিব বার করে, জিবের ডগা দিয়ে বার বার জুতোর ফিতে ছুঁতে লাগল। কাঞ্চন সঙ্গে ছিল। সে বলল, "বাবা, ও অমন করছে কেন?"

কার্তিকবাবু বললেন, "ও বলছে, আমাকে নিয়ে চলো, আমি তোমাদের।"

এরা সবাই হল পাহাড়ী কুকুরের ছানা। একদল যাযাবর শ্রেণীর লোক বাচ্চাগুলো কলকাতায় নিয়ে আসে বেচার জন্যে। এই সাদাকালো কুকুরছানা, যার নাম ইতিমধ্যে কার্তিকবাবু মনে মনে রেখেছিলেন দাবা, তার মালিক একটু দূরেই একটা মেহগনি গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে অর্ধেক চোখ বুজে একটা বিরাট লম্বা বিড়ি খাচ্ছিল। সে হঠাৎ জোড়াসন হয়ে বসে বলল, "বাবু, কুকুরটাকে নিয়ে যাও।"

কার্তিকবাবু পাকা লোক। প্রথমে দামদর না করে কিছুতেই দুর্বলতা দেখাবেন না। ইতিমধ্যে কাঞ্চন কিন্তু কুকুরছানাকে কোলে তুলে নিয়েছে, তবুও কার্তিকবাবু যথাসাধ্য নির্লিপ্তমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দাম দিতে হবে?"

তারপর শুরু হল এক অবিশ্বাস্য প্রতিযোগিতা। কুকুরওলা বলল, "আটশো। হাজার টাকাই দাম, তোমার জন্যে দুশো টাকা কমিয়ে দিচ্ছি। কুকুরটাও তোমাকে পছন্দ করেছে।"

কার্তিকবাবুও একইরকম, তিনি বললেন, "এই রকম জংলি কুকুরছানার দাম পঁচিশ টাকার বেশি হতেই পারে না।"

"ঠিক আছে, পাঁচশো টাকা দাও।" কুকুরওলা বলল।

"তিরিশের বেশি এক পয়সাও নয়।" কার্তিকবাবু কাঞ্চনের হাত ধরে টানলেন।

তারপর আধঘণ্টা ধরে ঃ

"সাড়ে চারশো।"

"বত্রিশ।"

"তিনশো।"

"চল্লিশ।"

"দুশো।"

"পঞ্চাশ।"

এইভাবে যখন সাড়ে সাতান্ন টাকায় রফা হল, তখন সদ্য দাবা-নামপ্রাপ্ত কুকুবছানাটি কাঞ্চনের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কুকুরছানা বাসায় এল। কাঞ্চনের মা, কাঞ্চনের বাবা সবাই তাকে দেখে মুগ্ধ। প্রথম দু'একদিন একটু কাঁদাকাটি করেছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে দাবার আচার, আচরণ, বুদ্ধি ইত্যাদি দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। বিশেষ করে 'নিজের লেজ নিজে ধরে' যে নামে নতুন খেলাটি দাবার জন্যে কাঞ্চন আবিষ্কার করেছে, যে খেলায় দাবা নিজেরই চারদিকে চক্রাকারে মিনিটের পর মিনিট মুখ দিয়ে লেজ ধরার জন্যে ঘুরতে থাকে, সেরকম কাঞ্চনের বাড়ির লোকেরা কখনো কোথাও দেখেনি।

তবু কুকুর পোষার বিস্তর ঝামেলা। শিকল চাই, বকলস চাই, ডগসোপ চাই, জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা অবশ্যই চাই। আর সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার হল ঃ যেখানে শিকল পাওয়া যায় সেখানে শিকল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এক এক জিনিস এক এক জায়গায়। আর ইঞ্জেকশান দেওয়ানো, সে কি সোজা কথা! অনেক ঘুরে ঘুরে শিকল-বকলস, এমন কী কুকুরের সাবান, দুধ খাওয়ার বাটি, শোবার কম্বল সব কিনে আনলেন কাঞ্চনের বাবা, একটা কথা জানা গেল—ছমাস না হলে কুকুরছানার ইঞ্জেকশান লাগে না।

কাঞ্চনদের এই নতুন বাড়িটার সবচেয়ে মজা হল ঃ প্রত্যেকটা ঘরের সঙ্গে একটা করে অতিকায় বাথরুম। আর সেই বাথরুমগুলিতে একটি করে চমৎকার পুরনো আমলের বাথটব। বাইরের ঘরের বাথরুমটা বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। ঠিক হল দাবাকে ওখানেই স্নান করানো হবে। দাবা থাকবে শোবার ঘরের মধ্যে, হয়তো বিছানায়-টিছানায়ও উঠবে। সুতরাং কুকুরছানাকে যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

কুকুরের ডাক্তারবাবুকে ফোন করে কাঞ্চনের বাবা জেনে নিয়েছিলেন, ছোট কুকুরছানাকে সপ্তাহে একদিনের বেশি স্নান করানো ঠিক হবে না। তাই স্থির করা হল প্রত্যেক রবিবার ছানাকে দুপুরবেলায় ডগ-সোপ মাখিয়ে খুব ভাল করে স্নান করানো হবে।

প্রথম রবিবারেই হৈ চৈ কাণ্ড। লোডশেডিংয়ের জন্যে কলে জল বেশি পাওয়া যায় না। তবু এরই মধ্যে অনেকটা জল ধরে বাইরের ঘরের বাথটবটা আধাআধি ভরে রেখেছে কাঞ্চন। তার মধ্যে নিয়ে দাবাকে কাঞ্চনের কাকা নামিয়ে দিলেন। দাবার এখন উচ্চতা ছয়-সাত ইঞ্চি, আর বাথটবের জলের গভীরতা প্রায় এক ফুট। কাঞ্চন ভয় পেয়ে গেল। চেঁচাতে লাগল। "কাকা, ডুবে যাবে, ডুবে যাবে!" কাঞ্চনের চেঁচানি শুনেই হোক অথবা জল দেখে ভয়েই হোক, দাবাও কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠল। কাঞ্চনের কাকা কিন্তু কিছু না ভেবে নির্বিকারভাবে দাবাকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। দাবা একটু ডুবে গিয়েই ভেসে উঠল, তারপর জলের উপর মাথা উঁচু করে সারা টবময় ঘুরে-ঘুরে সামনের দুটো খুদে পা দিয়ে জল কেটে কেটে সাঁতরাতে লাগল এবং তার মুখ দেখে বোঝা গেল সে জলের ব্যাপারটা খুব অপছন্দ করছে না।

দাবার সাঁতার কাটা দেখে হতভম্ব কাঞ্চন হাততালি দিয়ে উঠল। সে নিজেও একটা সাঁতারের স্কুলে যাচ্ছে আজ দেড় মাস হল, কিন্তু বিশেষ কিছুই শিখতে পারেনি, আর দাবা প্রথমদিনেই সাঁতার কাটছে!

অবাক কাঞ্চন কিছুক্ষণ গোল-গোল চোখে এই দৃশ্য দেখে তারপর দাবাকে জল থেকে তুলে একটা পুরনো তোয়ালে দিয়ে তাকে মোছাতে মোছাতে কাকাকে জিজ্ঞাসা করলো, "কাকু, ও সাঁতার শিখল কোথায়?"

কাকা বললেন, "কুকুরছানারা আবার সাঁতার শিখবে কী! ওটা ওরা একা-একাই পারে।"

ব্যাপারটা কিন্তু কাঞ্চনের মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। একটি সাদা ঝকঝকে পোর্সেলিনের টবের জলে একটা সাদা কালো কুকুরছানা টুকটুক করে সাঁতার কাটছে। চোখ বুজলে চোখ খুললে কাঞ্চন শুধু এই ছবিটাই দেখতে পাচ্ছে। কত লোককে যে কাঞ্চন তার সাঁতারু কুকুরছানার কথা বলেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা সবাই যে ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে তা নয়। অনেকে শুধু 'তাই নাকি, তাই নাকি' করেছে; সেটা যে নিতান্তই মন ভোলানো কথা, সেটা বুঝতে কাঞ্চনের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তাতে সে একেবারেই দমে যায়নি।

তার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ আছে। কাঞ্চনের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা দেখা দিয়েছে যে, শুধু দাবার মতো প্রতিভাবান কুকুরছানার পক্ষে সম্ভব একা একা সাঁতারের মতো অতি কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা, এবং জীবনে প্রথম দিনই জলে নেমে মাত্র একবার ডুবে সাঁতার কাটা। কাঞ্চন তার নিজের সাঁতারের স্কুলের কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে জানে, সাঁতার ব্যাপারটা অত সোজা নয়, ছেলের হাতের মোয়া নয়। আর একটা কুকুরছানাকে ঐভাবে টবের মধ্যে ফেলে দিলে ডুবেই মরে যাবে, এ-বিষয়ে কাঞ্চনের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কাঞ্চন অনেক ভাবল, অনেক রকম ভাবল। আস্তে আস্তে তার বুদ্ধি খুলতে লাগল। সে ঠিক করল সে একটা কুকুরছানাদের সাঁতারের ইস্কুল করবে। ঐ বাইরের ঘরের বাথটবে তাদের সাঁতার শেখানো হবে, দাবা হবে এই সাঁতার-বিদ্যালয়ের ট্রেনার আর কাঞ্চন হবে সেক্রেটারি।

এই কলকাতা শহরে কত কুকুরছানা থাকে লোকের কাছে, পুকুরের কাছে, গঙ্গার কাছে। সাঁতার শেখা তাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। আর তা ছাড়া বর্ষার সময় কলকাতার প্রায় সব গলিই তো আজকাল নদী হয়ে ওঠে। সুতরাং কুকুরছানাদের জলে ডোবা থেকে বাঁচতে গেলে সাঁতার শিখতেই হবে। সবচেয়ে বড় কথা, জলে নেমে সাঁতরানো শিখলে কুকুরছানারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকবে—গায়ে ঘা হবে না, পোকা-মাকড় হবে না।

কাঞ্চনের এই অকল্পনীয় প্রস্তাবে, মানে কুকুরছানাদের সাঁতারের স্কুল করার পরিকল্পনায় কাঞ্চন সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেল তার কাকার কাছ থেকে। কাঞ্চনের বাবা মুচকি হাসলেন, কিছু মন্তব্য করলেন না। শুধু কাঞ্চনের মা আধা প্রতিবাদ জানালেন, "অত জল ঘাঁটলে কাঞ্চনের জ্বর হয়ে যাবে।"

তিনদিনের মধ্যে কাঞ্চনের কাকা তাঁর অফিসের কাছ থেকে একটা চমৎকার সাইনবোর্ড তৈরি করিয়ে নিয়ে এলেন। সাইনবোর্ডটা যে খুব বড় তা নয়, কিন্তু সুন্দর কালো বার্নিশ করা কাঠের ফ্রেম দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে সবুজ জমিতে উজ্জ্বল সাদা হরফে বেশ বড় বড় করে গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় লেখা ঃ—

PUPPY SWIMMING SCHOOL

কুকুরছানাদের সাঁতার শিক্ষালয়
এখানে কুকুরছানাদের বিনামূল্যে
টবের জলে সুশিক্ষিত সাঁতারু
কুকুরছানা দ্বারা নিয়মিত সাঁতার
শেখানো হইয়া থাকে।

অনুসন্ধান করুন।

পরের দিন সকালবেলা অফিস যাওয়ার আগে কাঞ্চনের কাকা বাড়ির সামনেব লোহাব গেটটায় সাইনবোর্ডটা টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন। রাস্তা দিয়ে যারা যায়, তারাই এই আশ্চর্য সাইনবোর্ড দেখে থমকে দাঁড়ায়, একটু অবাকও হয়। দুপুরে টিফিনের সময়ে অফিসবাবুদের রীতিমতো ভিড় জমে গেল কাঞ্চনদের বাড়ির সামনে। কাঞ্চন তাই দেখে উত্তেজিত হয়ে মাকে ডেকে আনল, "মা, দ্যাখো কত লোক আমাদের সাইনবোর্ড পড়ে যাচ্ছে। কাল নিশ্চয় ওরা ওদের কুকুরছানা নিয়ে আসবে আমাদের এখানে স্নান করানোর জন্যে।" কাঞ্চনের মা কিছু বললেন না, শুধু একটু হাসলেন।

তারপর আরও সাতদিন চলে গেছে। মজার খবর চাপা থাকে না। লোকমুখে কুকুরছানার সাঁতার শেখার স্কুলের গল্প নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা বড় খবরের কাগজে এ-বিষয়ে চমৎকার সংবাদ বেরিয়েছে, তাঁদের রিপোর্টার কাঞ্চনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন; দাবার ছবিও ছাপা হয়েছে অন্য একটি পত্রিকার শিশুদের পাতায়। ফলে অনতিবিলম্বে দাবা হয়তো সিমলিপালের খৈরির মতো কিংবা আলিপুর চিড়িয়াখানার হাতি বিজলীর মতো বিখ্যাত হয়ে পড়বে। প্রতিদিন

সারাদুপুরে লোক উপচে পড়ছে বাড়ির দরজায়। কাঞ্চনের মা আর বড় বাড়িতে একা থাকার ভয়ে কম্পিত নন। বরং সদর দরজার ভিড় সামলাতেই তাঁর সারাদুপুর কেটে যায়।

কাঞ্চনের কিন্তু মনে আনন্দ নেই। এখন পর্যন্ত একজন লোকও তার কুকুরছানা কাঞ্চনদের সাঁতার শিক্ষালয়ে স্নান করাতে নিয়ে আসেনি। দাবার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নেচে-কুঁদে, লাফিয়ে, লেজ নেড়ে, জলের টবে সাঁতার কেটে সাঁই-সাঁই করে বড় হয়ে যাচ্ছে। সদর দরজায় সাইনবোর্ডটার সামনে লোকের ভিড় বেশি হলে সে ঘেউঘেউ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। লম্বাও হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, এরই মধ্যে সে নয় ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে।

কিন্তু দাবা তো মানুষ নয়। কাঞ্চন মানুষ, সে এত তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে না। তার বড় হতে অনেক সময় লাগবে। সে এখন দেখছে, দিনের বেলার লোকজন সরে গেলে সন্ধ্যার দিকে এ পাড়ার কয়েকটা রাস্তার কুকুর তাদের সদর দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো তারা গেটের মধ্যে দিয়ে তাকায়, কখনো কখনো তারা সাইনবোর্ডটার দিকেও তাকায়। কাঞ্চন জানে, এই পরের তাকানোটাই সত্যি। মানুষেরা যাই করুক, এই কুকুরেরা, যখন তাদের ছানাগুলি জন্মাবে, একটু বড় হলেই তাদের নিয়ে আসবে কাঞ্চনের কাছে সাঁতার শেখানোর জন্যে। 'পাপি সুইমিং স্কুল'-এর বাথটব একদিন ভরে যাবে কুকুরছানায়, আর তাদের মায়েরা অপেক্ষা করবে কাঞ্চনদের বাড়ির উঠোনে। কুকুরের মায়েরা কেউ যদি সাইনবোর্ডের ভাষা না বুঝতে পারে, তাই কাঞ্চন খুব যত্ন করে একটা বড় ছবি এঁকে সাইনবোর্ডের নীচে টাঙিয়ে দিলো। ছবিটা আর কিছুই নয়, একটা বাথটবের জলের মধ্যে অনেকগুলো কুকুরছানা প্রাণের আনন্দে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে।

স্কাইস্ক্র্যাপার

সাড়ে পাঁচটায় অফিস ছুটি হয়েছে। এখন পৌনে সাতটা। ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে হাঁটতে হাঁটতে কখনো বা একটু থেমে বা দাঁড়িয়ে, দশ পয়সার ভাজা ছোলা এবং গোটা কয়েক ফুচকা খেয়ে এই সোয়া ঘণ্টায় দীনেশ পার্ক স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে।

প্রতিদিনই এইরকম হয়। দীনেশ অর্থাৎ দীনেশ চক্রবর্তী, মেহতা ম্যাকনিন কোম্পানীর অন্যতম ডেসপ্যাচ ক্লার্ক বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকলে কোনোদিনই অফিস ছুটির সঙ্গে সঙ্গে আর দশজনের মতো বাসে চড়ে বাড়ি ফেরার প্রাণান্ত চেষ্টা করে না। খুব খিদে লাগলে বা উদ্বৃত্ত পয়সা থাকলে অবস্থানুযায়ী ছোলা-বাদাম বা ভুট্টা চিবোতে চিবোতে ধীরেসুস্থে বাড়ির দিকে ফেরে। বাড়ি যে খুব কাছে ঠিক তা নয়, বালিগঞ্জ স্টেশন পেরিয়ে কসবার এক পুরানো গলির দোতলা বাড়ির তিনতলার চিলেকোঠা ঘরে দীনেশ থাকে। থাকা মানে রাত কাটানো। খাওয়া-দাওয়া বাইরেই করতে হয়। রান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই। রাত্রে ফেরার পথে সাধারণত স্টেশনের মুখ থেকে কয়েকটা রুটি-তরকারি নিয়ে নেয়। রাত্রে তাই খেয়ে শুয়ে পড়ে। দিনে অফিসের ক্যান্টিনে খায়, ছুটির দিনে পাইস হোটেলে।

খাওয়া-থাকার এইসব অনেক অসুবিধার জন্য দীনেশ চক্রবর্তী খুব দুঃখিত নয় বা কষ্ট বোধ করে না, বরং তিনতলার খোলা ছাদের এক চিলতে ঘরে একা একটু নিরিবিলি যে সময়টুকু সে

কাটায়, তাই তার ভালো লাগে। কিন্তু দীনেশ সত্যিকারের কষ্ট পায় কলকাতার ভিড়ে ভর্তি ট্রামে বাসে দমবন্ধ হয়ে যাতায়াত করতে। অফিস ছাড়া পারতপক্ষে সে কোথাও যায় না। অফিস আসার পথে ঘর থেকে খুব সকাল সকাল বেরিয়ে বালিগঞ্জ ডিপো থেকে ট্রামে বা বাসে, যেটায় সুবিধা হয়, বসে আসার চেষ্টা করে। আর ফেরার পথে প্রতিদিনই যে পুরো রাস্তাটা পায়ে হেঁটে ফেরে ঠিক তা নয়। কোনো কোনো দিন ক্লান্ত বোধ করলে বা ইচ্ছে হলে একটু ফাঁকাগোছের একটা বাস-ট্রাম কিছু পেলে তাতে চড়ে বসে। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একবার চেষ্টা করে। আজকাল কিছু সাটল বাস হয়েছে, উল্টো দিক থেকে উঠে ধর্মতলা ঘুরে ফেরা যায়, পার্ক স্ট্রীট থেকে ধবতে পারলে অনেক সময় বসবার জায়গাও পাওয়া যায়।

এবার পূজোর আগে ফুটপাথ থেকে পৌনে চার টাকা দিয়ে একজোড়া চটি কিনেছিলো দীনেশ। এই সব চটি বিশেষ টিকতে চায় না। সেই চটিটায় বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নিচে একটা পেরেক একটু উঠেছে, মধ্যে মধ্যে অল্প খোঁচা লাগছিলো। আজ দীনেশ ভাবলো যদি ঘুরতি বাস একটা পাওয়া যায়, দেখি চেষ্টা করে।

মিনিট বিশ পঁচিশ কেটে গেলো পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে। আজকাল কলকাতার এই অঞ্চলের রাস্তায় দালাল এবং বেশ্যার বড় উৎপাত। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কেমন অস্বস্তিকর। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লেই কেমন ক্লান্তি এসে যায়, তখন আর হাঁটতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় কোনোভাবে একটা বাসে যদি একটু বসার জায়গা পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ পরে একটা সাটল বাস এলো। দীনেশ এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন লাফিয়ে উঠতেই শুনতে পেলো ভেতর থেকে কণ্ডাক্টর বলছে, 'ব্রেক-ডাউন। এ বাস ধর্মতলার পর আর যাবে না।' দু'একজন বচসা শুরু করে দিলো, কিন্তু দীনেশ আরেক লাফে নেমে পরেব বাসেব জন্য আবার দাঁড়ালো। দীনেশের খুবই সৌভাগ্য যে, দ্বিতীয় একটি সাটল বাস মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে গেলো। নতুন রঙ করা নীল দোতলা বাস। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ-দিকেব সিটে জানলার পাশে বসলো দীনেশ।

আশ্বিনের শেষ। গঙ্গার দিক থেকে অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। হাইকোর্টেব দূর চূড়ায় এ বছরের শীতের প্রথম নীল কুয়াশার রহস্যময়তা। ময়দানের আবছা আলোর মধ্যে কোনো কোনো দ্রুতগামী গাড়ির হেড লাইট ক্ষণিক বিভ্রম রচনা করছে। এসপ্ল্যানেড ঘুরে বাসটা আবাব দক্ষিণমুখী হলো। ভালো লাগছিলো দীনেশ চক্রবর্তীর। কখনো-সখনো এই রকম একটু-আধটু ভালো লাগে বলে এখনো কলকাতায় থাকা যায়, মনে মনে দীনেশ ভাবলো।

কিন্তু ছোট একটা ভুল হয়েছিলো। তাড়াতাড়িতে বাসে উঠে সে একটা লেডিস সিটে বসে পড়েছিলো। যখন উঠলো, হয়তো জানলার পাশে হতো না কিন্তু অন্য একটা বসার জায়গা পেয়ে যেতো সে। এসপ্ল্যানেডে বাসটা ঘুরতেই হুড়মুড় করে বহু লোক একজন মহিলা দোতলায় উঠে এলেন, পাশের সিটের ভদ্রলোক মহিলাকে দেখে উঠে দাঁড়াতেই দীনেশের খেয়াল হলো যে সে মহিলাসনে বসে আছে। তবু একটু আশ্বস্ত হলো এই দেখে যে মহিলা মাত্র একজন। যতক্ষণ না আরেকজন ওঠেন সিটটা ছাড়তে হচ্ছে না।

পাশের ভদ্রলোক উঠতেই দীনেশ একটু গুটিসুটি হয়ে বসে আরেকটু জানলার কাছে ঘেঁষে মহিলার জন্য জায়গা করে দিলো। কিন্তু এতে সুবিধা হলো না। মহিলাটির পেছনেহ পুরুষসঙ্গী ছিলেন, তাঁকে লক্ষ্য করেনি দীনেশ। সেই ভদ্রলোক, নিখুঁত কামানো চুল-দাড়ি, ধবধবে

সাদা টেরিলিন কিংবা ঐজাতীয় কোনো কাপড়ের সার্ট, দীনেশের কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, 'দাদা, এই দাদা, লেডিস সিট।'

ভদ্রলোকেব অভদ্রতায দীনেশ অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ বোধ করলো, ভদ্রমহিলা অনায়াসেই ছেড়ে দেওয়া জায়গাটায় বসতে পারতেন। দীনেশ একটা কিছু ছোট প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়েছিলো কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই ভদ্রমহিলার চোখে চোখ পড়লো তার। খুব বেশি বয়স নয়, তিরিশ-টিরিশ হবে, সাজ-পোষাকে আধুনিকা, কপালে বাংলা দাড়ির মতো ক্ষীণ সরল কালো টিপ। ঝগড়া কবতে যাচ্ছিলো দীনেশ, কিন্তু বাসের সিট ছাড়াব মত ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে, যার মধ্যে একটি মহিলা জড়িত, দীনেশেব আপাতত কোনো কলহ করবার ইচ্ছা ও রুচি হলো না। অনিচ্ছুক দীনেশ সিট দিয়ে, সিটের পেছনদিকটা হাত দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে বইলো।

অন্য দিনেব তুলনায আজ একটু বেশি ক্লান্ত বোধ করছিলো দীনেশ।

হাত দেড়েক উঁচু থেকে চখা-চখীদেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলো দীনেশ। খুব গল্প করছে ওরা, তা সবই ওদের বন্ধু-বান্ধবীদেব নিয়ে। খুব উঁচুদরেব কথাবার্তা কিছু হচ্ছে না। মোট কথা, বাসেব এত ভিড়, মানুষেব কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নিজেদের সঙ্গী-সাথী, সহকর্মীর ছোট বড় কুৎসা কবছে। চখাই বেশি কলকল কবছে, থেকে থেকে চখী দু-একটা বসাল মন্তব্য করে আরও উস্কিে. দিচ্ছে।

খুব বিবক্ত ও ঘৃণা বোধ কবছিলো দীনেশ। একটু দূরে সবে গিয়ে দাঁড়াতে পাবলে ভালো হতো। কিন্তু এখন দোতলাব প্রায আধা-আধি এবং সিঁড়ি জুড়ে খুব ভিড়। একটুও নড়াচড়ার উপায় নেই।

দীনেশ ঠোঁট কামড়িয়ে স্থিব হয়ে দাঁড়িয়ে বইলো। একটু পরে হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপাব খেয়াল কবলো সে। এখনো অনর্গল বক্‌বক্ কবছে চখা-চখী। কিন্তু তাদের একটি শব্দও তার কানে যাচ্ছে না। ঠোঁট দুটো শুধু নড়তে দেখছে দীনেশ, যেন তারা অনেক দূরে অথবা কাঁচের জানালাব আড়ালে রয়েছে। চখা-চখীকে এখন আব খুব দেখতে পাচ্ছে না। কেমন যেন অনেক উঁচু, অনেক দূব থেকে দেখতে পাচ্ছে সে তাদেব। অত উঁচু েকে চখা-চখী দুটো‍ক অতি ছোটো, সামান্য ও খুবই অসহায় বোধ হলো দীনেশের।

একটু পবেই দীনেশ বোধ কবলো তাব মাথাটা বাসেব ছাদে ঠেকে যাচ্ছে। দীনেশ খুব লম্বা নয়, বাসের ছাদ কখনোই তাব মাথায় ঠেকে না। এখন দোতলা বাসেব ছাদ আরো নিচু কবেছে নাকি? কিন্তু এতক্ষণ তো মাথায় ঠেকেনি!

খুবই অস্বস্তি বোধ কবছিলো দীনেশ। কি একটা স্টপে বাস দাঁড়াতেই অনেক লোক ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়লো। দীনেশও নেমে গেলো। ট্রাঙ্গুলার পার্ক স্টপ, এখান থেকে মাইল দেড়েক হাঁটতে হবে। তা হোক। তবু ভালো বাসের ছাদে ঘাড় গুঁজে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে হাঁটাই ভালো।

আশেপাশের স্টেশনারি ও কাপড়ের দোকানগুলো ‍্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ আটটা বেজে গেছে। সামনের বাড়ির দোতলার ঘরে একটা দেয়ালঘড়ি রয়েছে, একটু ঝুঁকে দীনেশ দেখলো সাড়ে আটটা হয়েছে। একটু পবেই খুব খটকা লাগলো দীনেশের। দোতলার ঘরের ভিতরে ঘড়ির ডায়াল সে ফুটপাথ থেকে কি করে দেখতে পেলো!

কেমন একটু ভয়-ভয় করতে লাগলো দীনেশের। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলো

বাড়ির দিকে। গড়িয়াহাট মোড় পেরিয়ে বাজারের সামনেটায় একটা বিরাট আবর্জনার পাহাড় প্রায় সর্বদাই জমে থাকে, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আজ অনায়াসে আর্বজনার স্তূপ টপকিয়ে চলে গেলো। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো দীনেশ। প্রায় আট দশ ফুট চওড়া স্তূপটা কি করে সে টপকে এলো, আশ্চর্য কাণ্ড।

বালিগঞ্জ স্টেশনের মুখটায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর থেকেই একটা হৈ-হল্লা লেগে থাকে।

কিন্তু এসব কিছুই কানে গেলো না দীনেশের। হাওয়ার মত অনায়াসে এদের অনেক উপর দিয়ে টপকিয়ে চলে গেলো। লেভেলক্রশিংয়ের বেড়াটা আটকানো ছিলো, অন্যদিন একটু ঘুরে চিতল মাছের মত কাত হয়ে দুটো লোহার থামের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে বেরোতে হয়, আজ সেরকম কিছুই করতে হলো না তার। সোজাসুজি বেড়া টপকিয়ে, একেক লাফে একেক জোড়া রেল লাইন উতরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তার বাড়ির কাছে এসে গেলো দীনেশ।

বাড়ির কাছে এসে মনে পড়লো খাবার কেনা হয়নি। স্টেশনের গেট থেকে দু-একটা রুটি কিনে আনা উচিত ছিলো। কিন্তু যাক গে, দীনেশ ঠিক করলো, আজ আর রাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নেই, মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে, ঘরে গিয়ে এখনই শুয়ে পড়বে।

বাড়িতে ঢুকবার মুখে দরজাটার সামনে নীচের তলার বাচ্চাগুলো নোংরা করে রাখে। বাসন মেজে উঠোনটা পিছলে হয়ে থাকে। অনেকদিন রাতে উঠোনে পড়ে গেছে দীনেশ। ইচ্ছে হয়েছে, ধাক্কা দিয়ে নিচতলার লোকগুলোকে ঘুম থেকে তুলে ওদের কানগুলো মলে দেয়। আজ কিন্তু কোনো অসুবিধাই হলো না দীনেশের। এক লাফে দোতলায়, তার পরে তিনতলায় তাব ঘরের সামনে ছাদে চলে এলো সে।

ঘরে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেলো। কিছুতেই ঢুকতে পারছে না। এত নিচু দরজা দিয়ে কি করে ঢুকবে সে? কোনরকমে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকলো দীনেশ। ঢুকেই তক্তাপোষে শুয়ে পড়লো আলো না জ্বালিয়েই। শরীরের অর্ধেক কোমবের নিচ থেকে প্রায় সবটা তক্তপোষ থেকে বেরিয়ে গেছে; খুব অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু এ অবস্থায় কি আর করা সম্ভব?

কোনোরকমে হাঁটু দুমড়িয়ে পড়ে রইলো দীনেশ। একটু পরে সে বুঝতে পারলো, কেমন ক্রমশঃ আরো লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে মাথাটা গিয়ে একদিকের দেয়ালে ঠেকলো, পা দুটো অন্য দিকের দেয়ালে।

ঘরের ভিতরে শুয়ে থাকা আর সম্ভব নয়। কোনোভাবে বুক দিয়ে ভর করে দীনেশ বাইরের ছাদে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

দাঁড়াবার পর আর কোনো অসুবিধা নেই। ক্রমশঃ লম্বায় বেড়ে যেতে লাগলো দীনেশ। কসবার তিনতলার ছাদ থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলো গড়িয়াহাটার মোড়। অত গলি-বাড়ির ভিড়ের মধ্যেও কালীঘাট মন্দিবের চূড়াটা দেখে সে চিনতে পারলো। অনেক দূরে পুরানো মনুমেন্ট, সব নতুন স্কাইস্ক্র্যাপারের ভিড়ে অন্ধকারে কেমন নিঃসঙ্গ, একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দীনেশের খুব মায়া বোধ হলো মনুমেন্টের জন্যে।

চারদিক সব কিছু চোখে পড়ছে। ঘুরে ঘুরে তাকিয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো দীনেশ। কলকাতার আকাশ এখন উঁচুউঁচু স্কাইস্ক্র্যাপারে প্রায় ছেয়ে এসেছে।

খুব কাছেই একটা স্কাইস্ক্র্যাপার। বোধহয় ওটা পুরানো বালিগঞ্জ হবে। কোনো কোনো ঘরে আলো জ্বলছে, কোনোটা আবার অন্ধকার। চৌদ্দতলা কি পনেরো তলার একটা ঘরে এতক্ষণ

উজ্জ্বল আলো জ্বলছিলো। আলো নিবিয়ে কারা বেরিয়ে পড়লো। পেছনদিকের একটা অন্ধকার ফ্ল্যাটের ঘোরানো বারান্দায় কে যেন সন্তর্পণে হাঁটছে। চোর-টোর হতে পারে। হোক গে।

মাঝামাঝি তলার একটা ফ্ল্যাটে কাঁচের জানলা বন্ধ, কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। দুটো ছায়া পড়েছে জানলার কাঁচে। স্পষ্টতই একটি পুরুষের ছায়া, অপরটি রমণীর। ছায়াদুটি ধীরে ধীরে খুব ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ছায়া দুটির পরিণতি লক্ষ্য করতে লাগলো দীনেশ। আর কোনো দিকেই এখন তার নজর নেই। পুরুষের ছায়াটা মেয়েটার ছায়াটাকে এখন আরো কাছে টানছে, দু'জনের হাতটাতগুলো এমন সব জায়গায় পড়ছে, দীনেশ কল্পনা করে চনমনিয়ে উঠলো। তার কৌতূহল তীব্র ও ঘন হলো।

স্কাইস্ক্র্যাপার বাড়িটার উপরে ঝুঁকে পড়লো দীনেশ। ঘরের ভিতরে কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে, সুযোগ যখন পাওয়া গেছে দেখতেই হবে। বন্ধ জানালার উপরে একটা বড় ভেন্টিলেটার রয়েছে, তারই ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো দীনেশ। বন্ধ ঘরের মধ্যে তখন ঝড় শুরু হওয়ার আগের মুহূর্ত। দীনেশ কিছু দেখবার আগেই খুট করে সুইচটা নিবিয়ে দিলো রমণীটি এবং অন্ধকারে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

সুইচ শুধু ঘরের মধ্যেই নিবলো তা নয়। দীনেশের মনে হলো তার শরীরেব মধ্যেও একটা ভীষণ বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেলো। স্কাইস্ক্র্যাপারের জানলা থেকে সে ছিটকিয়ে এসে পড়লো কসবার চিলেকোঠার ছাদে।

মাথায় হাত দিয়ে চোখ বুজে বসে রইলো দীনেশ। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হলো, খুব খিদে লেগেছে। তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নেমে পড়লো। স্টেশনের গেটের দোকান থেকে রুটি তরকারি কিনে আনতে হবে।

উঠোনটা ভীষণ পিছল, তার উপরে বাচ্চাগুলো নোংরা করে রেখেছে। সন্তর্পণে পেরোতে পেরোতে দীনেশের ইচ্ছে করলো নীচতলার লোকদের লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে কান মলে দেয়।

দুজন জয়ন্ত

আজ একটু আগে দুজন জয়ন্ত একসঙ্গে আত্মহত্যা কবেছে।

সব আত্মহত্যার কারণ জানা যায় না। অনেকে কিছু লিখেও যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে দুজন একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে এবং এর পশ্চাৎটা আমরা কিছুটা জানি আর কিছুটা কল্পনা তো করতেই হবে।

বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে ব্যাপারটা। তার ভাবী স্ত্রী ও প্রেমিকা শ্যামলীর একটা কথা শুনে জয়ন্ত প্রথম চিন্তিত হয়। শ্যামলী বলেছিলো আসা যাওয়ার পথে সে অনেক সময়ই জয়ন্তকে কার্জন পার্কে শুয়ে থাকতে দেখে।

ব্যাপারটাকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি কিন্তু কয়েকদিন আগে যখন জ্যাঠামশাই বললেন, 'দুপুরে অফিস না গিয়ে কার্জন পার্কে শুয়ে থাকো কেন? কবিতা লিখবে নাকি, নাকি ব্যর্থ প্রেম?'

জ্যাঠামশাইয়ের এই প্রশ্নে জয়ন্ত যেন একটু ঘাবড়িয়ে গেল।

'তবে বিবাগী হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে নাকি?' জ্যাঠামশাইয়ের দ্বিতীয় প্রশ্নেরও কোনো কূলকিনারা ধরতে পারলো না। অন্য কেউ বন্ধু-বান্ধব হলে ভাবতো ঠাট্টা করতে পারতো, 'কি ইয়ার্কি হচ্ছে, কিন্তু আরেকবার আমতা আমতা করে আজ্ঞে বলতে হলো।

এবার জ্যাঠামশাই প্রাঞ্জল হলেন, 'গত সপ্তাহে একটা গোলমালে পরপর তিন দিন পেনসানের জন্য ডালহৌসিতে যেতে হলো।'

'আমার অফিসেও গিয়েছিলেন নাকি?' জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করে।

'তোমার অফিসে আর যাবো কেন, তিনদিনই ট্রাম থেকে দেখলুম তুমি কার্জন পার্কে ঘাসের মধ্যে একটা গাছের নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে রয়েছো, কবিতা-টবিতা লেখা শুরু করলে নাকি?' জ্যাঠামশাইয়ের এই গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর জয়ন্তের পক্ষে যোগানো সম্ভব নয়। তার মনেই পড়ল না গত দুই তিন বছরে দুপুরবেলায় কার্জন পার্কে শুয়ে থাকা দূরে থাক, পার্কের মধ্যে দিয়ে ওই রকম সময়ে হেঁটেছে কিনা। না, অসম্ভব। তবু খুব একটা প্রতিবাদ করতে পারলো না, শ্যামলীও এই একই ধরনের অভিযোগ করেছিলো। তার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে, হুবহু তারই মতো দেখতে এই শহরে আর কোথাও আরো কেউ একজন রয়েছে?

যেই থাক, জয়ন্তের মনের মধ্যে ভীষণ একটা খটকা দেখা দিলো। আর জ্যাঠামশাই যে কয়দিনের কথা বললেন, ওই সময়ে প্রায় প্রতিদিনই দুপুরবেলা অফিসে বসে ফাইলে বিরক্তিকর নোট লিখতে লিখতে যখনই খুব ক্লান্ত মনে হতো, ভাবতো এই সময়টায় বেশী দূরে কোথাও নয়, এই কার্জন পার্কে শুয়ে শুয়ে সময় কাটাতে পারলে কি ভালো হতো।

তা হলে? জয়ন্ত বোকার মতো ভাবতে লাগলো, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি, কার্জন পার্কে গিয়ে শুয়ে থেকে ভাবছি অফিস করছি? মনে মনে অসম্ভব বিচলিত বোধ করতে লাগলো সে।

পরদিন অফিসে পৌঁছে হাজিরা খাতাটা ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখলো। না, এই তো জ্যাঠামশাই যে দিনগুলির কথা বললেন, সে তো অফিসে এসেছিলো! তা হলে অফিসে এসে কাজ না করে পালিয়ে কার্জন পার্কে গিয়ে শুয়েছিলো। জয়ন্ত নিজেকে যতটা জানে তাতে সেটাও তার পক্ষে অসম্ভব।

তবে জয়ন্তের নিজের মনে সেই একটা খুব বড় খটকম রয়েছে। জ্যাঠামশাই যে কদিন তাকে পার্কে দেখেছেন বলে বললেন, সেই সময়ে সত্যিই সে মনে মনে পার্ক, গাছের ছায়া, অবেলার রোদ, গা এলিয়ে ঘাসের মধ্যে শুয়ে থাকা, এই সব আলস্যের কথা ভেবেছে।

শ্যামলী আর জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন সকালে বাজারে যাওয়ার পথে পাড়ার বন্ধু বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। সে সাতসকালে উঠে গঙ্গার ধারে যায় বেড়াতে। আজ সকালে জয়ন্তেরও ইচ্ছে হয়েছিল একটু গঙ্গার ধারে যেতে, কিন্তু বাজার করতে হবে বলে যেতে পারে নি।

কিন্তু এখন বলাই তাকে দেখে বললো, 'কি রে, আজকাল ভোরবেলা উঠে গঙ্গার ধারে আসিস্!

'মানে?' জয়ন্ত ভুরু কোঁচকালো।

'তোকে দেখলুম ফোর্টের উলটো দিকে একাই ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্!'

সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে না পেরেও জয়ন্ত যেন কিছুটা বুঝতে পারলো, কিংবা শুধুই

অনুমান। তাই বলাইয়ের সঙ্গে কথা আর বাড়ালো না, মুখে বললো, ' এই এমনি ভালো লাগছিলো না, ঘুরে এলুম সকালবেলায়।'

দুই-একটা টুকটাক জিনিস কিনে বাজার থেকে বাড়ি ফিরলো। বলাইকে মুখে যাই বলুক, জয়ন্ত এবার মনে মনে স্থির করে ফেললো, এ ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে হবে।

...কিন্তু কিসের বোঝাপড়া? কার সঙ্গে বোঝাপড়া? এই দ্বিতীয় জয়ন্ত, সে কে? কোথায় থাকে? সে কি অন্য কেউ, নাকি আমি, আমি নিজে, আমি জয়ন্ত সান্যাল, আমার ইচ্ছা, আমার বাসনা, আমার ভালবাসা—যে দুপুরবেলায় পার্কে গিয়ে শুয়ে থাকে, সকালে গঙ্গার মেঘের শোভা দেখতে যায়।

জয়ন্ত একবার ভাবলো, সে কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে, তাকে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলবে। কিন্তু তাঁকে, সেই ডাক্তার ভদ্রলোককে কি আসল ব্যাপারটা বোঝানো যাবে, কাউকেই কি কখনো বোঝানো যাবে? ডাক্তার হয়তো ধরে নেবেন, এসব তার পাগলামি, এ ভাবনা তার বিকৃত মস্তিষ্কের চিন্তা! কি করে সে বোঝাতে পারবে?

কিন্তু এভাবে যদি বেশীদিন চলে, তবে তো পাগল হয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় জয়ন্ত কখন কোথায় কি করে বসবে কিছুই ঠিক নেই, তার পরিণাম ভোগ করতে হবে তাকে? জয়ন্ত একবার স্থির করলো, না, সে এখন থেকে আর কিছু ভাবতে যাবে না, শুধু যা প্রত্যক্ষ, যেখানে যে অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যেই মনকে বন্দী রাখবে। তার ইচ্ছাকে খুশিমত এদিক-ওদিক করে বেড়াতে দেবে না।

এই রকম স্থির করার পনেরো মিনিটের মধ্যে জয়ন্ত আবিষ্কার করলো এটা তার পক্ষে অসম্ভব, নিজের মনকে আয়ত্তে রাখা তার দ্বারা হবে না। সারা দিন-রাত্রির তার সমস্ত ইচ্ছা, সব বাসনাই কি দ্বিতীয় জয়ন্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? দু-একটা খুব সংগোপন বাসনার কথা তার মনে এলো, সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো, কান লাল হয়ে উঠলো। যদি তাই ঘটে থাকে, এই ঘর থেকে আর এক পা বেরুনোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। লজ্জায় সে মুখ তুলে কারোর সঙ্গেই কথা বলতে পারবে না।

আজ রবিবার, ভোরবেলা বৃষ্টি হচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকদূরে এক খালপাড়ে বৃষ্টি ভেজা, গুমটি ঘরের কথা ভাবছিলো জয়ন্ত। হঠাৎ মনে হলো, যাই না শহরতলীর বৃষ্টিতে ট্রেনে একটু ঘুরে আসি! শেয়ালদা এসে প্রথম ট্রেনটাতেই উঠে বসলো।

সে নিশ্চিত, এই ট্রেনটাই একটু আগে, এই ঘণ্টা-দেড়েক আগে সকালবেলায় মাঠের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ছুটছে, দূরে গ্রাম, গাছপালা। সে একটা কামরা আবিষ্কার করে ফেললো। বেশ কাঁচা রঙের গন্ধ বেরোচ্ছে, রঙ শুকোবার আগেই কামরাটা ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে-ওদিকে, দেওয়ালে, জানলায় লোকে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে ইস্টার্ন রেলের সংক্ষিপ্তাকার ইংরেজী অক্ষরে ই. আর চুপসে. থেবড়ে গিয়েছে।

এই কামরাটার একটা বেঞ্চে এক কোণ ঘেঁষে জয়ন্ত ব লো। একটু পরেই ট্রেনটা ছাড়লো, তারপরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। চারদিকে আকাশ এই দুপুরবেলাতেই অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছুটলো, দূরে ঝাপসা বৃষ্টির মধ্যে অস্পষ্ট বাড়ি-ঘর, গাছাপালা।

জয়ন্ত একবার গাড়ির ভিতরে অর্ধ-ঘুমন্ত সহযাত্রীদের দিকে তাকালো, তারপর বাইরের

দিকে। বৃষ্টি যেন আরো জাঁকিয়ে এলো। একটু দূরে একটা বাঁকের মুখে একটা ছোট রেল-ব্রিজ, ট্রেনটা এখন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। আধ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিলো।

জয়ন্ত ভাবলো, ওই রেল-ব্রিজের পাশে ছোট গুমটি-ঘরটার বাঁয়ে যে ঝাঁকড়া গাছটা এই রকম দারুণ বৃষ্টিতে তার নীচে, দাঁড়িয়ে ভিজতে বেশ লাগে, আশ্চর্য শীত-শীত ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় শরীর কেমন শিরশির করে ওঠে; এই সব ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাতে লাগলো। গুমটি-ঘর, ওই রেল ব্রিজ এসে গেলো। গুমটি-ঘরের পাশে রেল-ব্রিজ ঘেঁষে সেই ঘন পাতা ঝাঁকড়াগাছ—জয়ন্ত দেখতে পেলো তার নীচে দাঁড়িয়ে একজন ভিজছে।

জয়ন্ত উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালো। তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তারই মত একজন, তারই মত পাঞ্জাবি-ধুতি পরা, পায়ের কালো কাবুলি চটিটা পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে।

গাছটা প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছিলো, আর দেরি করা যায় না এই মুহূর্তে, এখনই একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁকড়াগাছটার নীচে পিছন ফিরে দাঁড়ানো লোকটার উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জয়ন্ত। রেল-ব্রিজের একটা পিলারে ধাক্কা খেয়ে নীচে খালের মধ্যে ছিটকে পড়ে গেলো দুজনে একসঙ্গে।

পাশের একটা কামরা থেকে কে যেন চেন টেনে দিলো। ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে ব্রিজের ওপরে থরথর করে লম্বা রেলগাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে গেলো।

টমটমপুরের গল্প

টমটমপুর নামে কোনো জায়গা কোথাও নেই। টমটমপুর নামে কোনো জায়গা কোথাও ছিলো না। আসলে অন্য একটা জায়গার কথা কিছুদিন হলো বারবার লিখছি, এবার তাই নামটা একটু বদলিয়ে দিলাম।

তবে এই নাম বদলের অন্য একটা কারণও আছে। যানবাহন বলতে নৌকো ছাড়া টমটম ঘোড়ার গাড়িই ছিলো আমাদের অল্পবয়সের সেই শহরের একমাত্র সম্বল।

হয়তো কারো মনে পড়তে পারে ডুলি বা পালকিও ছিলো, কিন্তু তার ব্যবহার ছিলো সীমিত, সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। অবশ্য যাতায়াত প্রধানত ছিলো জলপথেই, স্থলপথ প্রায় ছিলো না বললেই চলে। রেলগাড়ি আমরা ছোটবেলায় চোখেই দেখিনি। যাঁরা বাইরে থেকে বেড়াতে বা কাজে আমাদের ওখানে যেতেন, পুজোর সময় বা বিয়ে-অন্নপ্রাশনে আত্মীয়স্বজন যাঁরা দূর থেকে আসতেন, অনেক সময়েই জিজ্ঞাসা করতেন, কোনো দিন ট্রেনে চড়েছি কিনা। আসলে রেলগাড়িতে চড়া ছিলো আমাদের স্বপ্নের ব্যাপার। যাঁরা রেলগাড়িতে চড়ে এসেছেন, তাঁদের অবাক হয়ে দেখতাম।

টমটমপুরের চারপাশে ছিলো কয়েকটা ছোটবড় ন্যালাখ্যাপা নদী আর তাদের বয়স্য কিছু খালবিল জলা। রাস্তা বলতে টমটমপুর শহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির খোয়া-বাঁধানো কয়েকশো গজ এবড়ো-খেবড়ো পথ। আর শহরের দুই দিকে উত্তর আর পূবে দুটো পুরনো নবাবী সড়ক, তখন বলা হতো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেরই দায়িত্ব ছিলো সেগুলো দেখাশোনা করার। সেসব রাস্তার মধ্যে-মধ্যেই নড়বড়ে কাঠের সাঁকো, তার ওপর দিয়ে যখন

টমটম গাড়ি ছুটে যেতো, ভয় হতো ভেঙে না পড়ে। তবে ভাঙতো না, যখন বাস যেতো তখনো ভাঙতো না।

এ ছাড়া ছিলো—সাহেবরা যাকে বলতো ফেয়ার ওয়েফার রোড, বর্ষায় জলকাদায় ডুবে থাকে—সে শুকোতে শুকোতে অঘ্রাণ-পৌষ হয়ে যেতো। তারপর পুরো শীতকাল বসন্ত আর গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত যতদিন না বৃষ্টি নামে, নদীনালায় জল আসে, সেই রাস্তা ব্যবহার করা হতো। সে রাস্তায় চলতো দু'চাকার সাইকেল, ক্যাঁচকোঁচ গরুর গাড়ি—পাট আর ফসল বোঝাই হয়ে, ঘোড়ার গাড়ি আর পায়দল মানুষ।

শুধু টমটম নয় ঘোড়াব গাড়ি আবো রকমফের ছিলো। টমটম হলো দু'চাকার এক ঘোড়ার গাড়ি। দুজন বসতে পারে, মাথার ওপরে ছাদ আছে, জানালা আছে দুপাশে. রোদবৃষ্টি লাগে না, আলো হাওয়া খেলে। অবশ্য হাত-পা একটু জবুথবু করে বসতে হয়, পা ছডানো যায় না। কোচম্যান বসতো গাড়ির সামনে পাদানির ওপর পা রেখে।

টমটম গাড়িই বেশি, তবে চার চাকার দু'ঘোড়ার গাড়ি ছিলো, তার নাম পালকি গাড়ি। তাতে দুজন-দুজন মুখোমুখি চারজন, প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা জানালা, বসাও মোটামুটি আরামের। কোচম্যানের জায়গা ছিলো ছাদে। একটু বড় হয়ে ছাদে কোচম্যানের পাশে দু'-একবার বসে গিয়েছি। মফঃস্বলের হু-হু হাওয়ায় খোলা ছাদে সে খুব আরামজনক স্মৃতি।

তখনো সাইকেল রিকশা আসেনি। টমটমপুরের মতো ছোট মফঃস্বল শহরে রিকশা তখনো কেউ চোখেই দেখেনি, দেখে থাকলে কলকাতায় বা ঢাকায় বা জেলাসদবে দেখেছে। টমটমপুরের ত্রিসীমানায় সাইকেল রিকশার অস্তিত্ব ছিলো না।

শহরের মধ্যে বা শহবের আশেপাশে টুকটাক যাতায়াতে. বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে ঘোড়ার গাড়িই ছিলো একমাত্র ভরসা। সিনেমায়, দোকানে. এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় কুটুমবাড়িতে যেতে হবে. খবর দাও ঘোড়ার গাড়িকে।

আমাদেব বাডির পশ্চিমদিকের বাড়িটা ছিলো গাড়িওয়ালা বাড়ি। ঐ নামেই সারা পাড়ায় তাব পবিচয়, কারণ ও-বাড়িতে দুটো ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি আছে, একটা পালকি আর একটা টমটম। ঘোড়া দুটো. কোচম্যান একজন। কোচম্যানের নাম রাধুদা।

ঘোড়ার গাড়ির কোনো আলাদা আস্তানা ছিলো না। প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই কমবেশি একটা-দুটো করে গাড়িওয়ালা বাড়ি ছিলো। লোকে প্রয়োজনমতো খবর দিত, যথাসময়ে গাড়ি এসে যেতো। কিছু কিছু গাড়ি অবশ্য অপেক্ষা করতো বাসস্ট্যাণ্ডে আর শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে স্টিমারঘাটে। স্টিমার যাতায়াতের সময়।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উত্তরমুখী রাস্তাটা ধরে দিনে গোটাতিনেক বাস যাতায়াত করতো জেলাসদরে। সেই বাসস্ট্যাণ্ডে যাত্রীর আশায় যেদিন ভাড়া জুটতো না, রাধুদাও টমটম গাড়িটা নিয়ে দাঁড়াতো।

আমাদের চোখে রাধুদা ছিলো গণ্যমান্য লোক। ঘোড়ার গাড়ি যে চালায় সে গাড়োয়ান নয়, গাড়োয়ান হলো গরুর গাড়ির চালক, ঘোড়ার গাড়ির চালক হলো কোচম্যান, অচেনা সওয়ারিরা তাকে কোচম্যান-সাহেব বলে।

আবার কোচম্যানদের মধ্যে রাধুদাই ছিলো সবচেয়ে স্বতন্ত্র, অভিজাত। খাটো ধুতির ওপরে ছিটের পাঞ্জাবি পরা রাধুদা মাথায় পাগড়ি না দিয়ে কখনো গাড়ি চালাতো না, কখনো খালি পায়ে থাকতো না, শক্ত চামড়ার কালো শুঁড়-তোলা নাগরা জুতো, খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় হাঁটলে খটখট

করে শব্দ হতো। তবে শব্দটা একটু হেলেদুলে বেতালায় হতো, কারণ যখন হাঁটতো দুটো পা সমানভাবে চলতো না, একটু নেশার ঘোর তার দু'চোখে এবং শরীরে প্রায় সর্বদাই লেগে থাকতো।

টমটমপুর ছিলো নেশাখোরদের স্বর্গরাজ্য। তবে নিতান্ত গাঁজা-মদ নয়, নেশার বস্তুটা ছিলো সনাতন সিদ্ধি, যাকে ওখানকার লোকেরা বলতো ভাঙ্। শিবঠাকুর, মানে মহাদেবের প্রিয় জিনিস।

কোথা থেকে অত সিদ্ধির গাছ এসেছিলো কে জানে, পুরো টমটমপুর শহরটা ছেয়ে গিয়েছিলো সিদ্ধির ঝোপে। রাস্তার ধারে, ফাঁকা মাঠে, গৃহস্থের উঠোনে, খালপাড়ে সব জায়গায় বিজবিজ করতো সিদ্ধির জঙ্গল। যে সব জায়গায় আগে জন্মাতো দণ্ডকলস, শেয়ালকাঁটা বা জংলি কচুর ঝোপ, সেই সব খালি জমি ছেয়ে গিয়েছিলো ভাঙ্গাছে। রীতিমত ঘন ঝোপে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলো রাস্তাঘাট, টমটমপুর পুরসভার পক্ষে ভাঙের জঙ্গল কেটে রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা একটা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ঠিক সেই রকমই লোকের বাড়ির ভিতরের উঠোন, বাইরের উঠোন, ঘর-দালানের পেছনে এবং চারপাশে ঘন বিন্যস্ত ভাঙের আগাছা। ভাঙ্গাছের ঝোপের মধ্যে সাপ লুকিয়ে থাকতো, বাসা বাঁধতো বনবেড়াল আর খ্যাঁকশেয়াল।

আজকাল টমটমপুরে আর বিশেষ যাওয়া হয় না, শেষ যেবার গিয়েছিলাম, দেখলাম সেই সব ভাঙের ঝোপ এখন কোথাও আর নেই। কোথা থেকে কিভাবে এসেছিলো, কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কে জানে।

ভাঙ্পাতা হলো মাদকদ্রব্য। তা দিয়ে সিদ্ধির সরবত হয়, আরো নানাভাবে নেশার কাজে ব্যবহার হয়। কবিরাজি ওষুধ বানাতে ভাঙ্ লাগে, বিশেষ করে যৌবনশক্তি বাড়ানোর জন্যে কবিরাজেরা যে মোদক ব্যর্থকাম রোগীদের দেন সেই মোদক, কোথাও কোথাও যার বাণিজ্যিক নাম মদনানন্দ মোদক, তৈরি হয় ভাঙ্ থেকে। দ্রুত ফলপ্রসূ সেই বটিকা।

তবে যতদূর মনে হয়, আবগারি বিভাগের খুব একটা মাথাব্যথা ছিলো না সিদ্ধি বা ভাঙ্ নিয়ে আর টমটমপুরে কটাই বা লোক ছিলো আবগারি দপ্তরে, দিশি মদ আর গাঁজার দোকানের খোঁজখবর নেওয়ার বেশি তাদের করার আর খুব কিছু ছিলো না।

কিন্তু তবু একটা অলিখিত নিয়মে যারা ভাঙের পাতা নেশার জন্যে ব্যবহার করতো, তারা ব্যাপারটা একটু গোপনেই করতো। ভোররাতের দিকে কিংবা ঘোর সন্ধ্যার দিকে। রাতে আলো জ্বেলে পাতা কাটলে লোকে সন্দেহ করবে, তাছাড়া সাপখোপের ভয় তো ছিলোই, তাই দিনশেষে বা দিনের শুরুতে লোকচলাচল যখন কম, তখন পাতা কেটে বাড়ির ভিতরে উঠোনে অথবা ভিতরের দিকে কোনো টিনের ঘরের চালে, চালের যে দিকটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না সেখানে সেই পাতাগুলো শুকোতে দিতো।

সে বছর আমার মেজমাসিমার বিয়ে।

বিয়ে হবে টমটমপুর থেকে মাইল দশেক দূরে, আমাদের মামার বাড়ির গ্রামে। সে গ্রামের কথাও অনেক লিখেছি। এ গল্পে তার নাম দেওয়া যাক ছায়াতলী।

বিয়েটা হয়েছিলো মাঘের শেষে অথবা ফাল্গুনের প্রথমে। খুব শীত ছিলো সে সময়ে। আমাদের ওদিকে প্রায় চৈত্র পর্যন্ত জমাট ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের উচিত ছিলো এবং কথাও ছিলো, বিয়ের অন্তত এক সপ্তাহ আগে যাওয়ার। এমনি

তো কোনোই অসুবিধে ছিলো না, এ্যানুয়াল পরীক্ষার পর এই সময়টায় ইস্কুলের পড়াশুনো ঠিকমতো আরম্ভ হয় না। কিন্তু তখন আমাদের টমটমপুরের বাড়িতে পুরো সংসারের ভার আমার মাব ওপরে। ঠাকুমা মারা গেছেন অল্প কিছুদিন আগে। কাকিমা জেঠিমারাও সব টমটমপুরেব বাইরে। আমরা চলে গেলেও বাড়ি তো আর খালি থাকবে না। বাবার কোর্ট থাকবে, বাবা পরে যাবেন আগে ফিরবেন। মুহুরিবাবুরা থাকবেন, কাজের লোকেরা থাকবে, বেড়াল, কুকুর, গরু, এমন কি একটা হেঁড়ে-গলা ময়না পাখিও ছিলো বারান্দায়।

তবু একটা বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো, আমাদের এক দূরসম্পর্কের বিধবা পিসিমা থাকতেন পাশের পাড়াতেই। তাঁর একটু নাকি হাতটান ছিলো, এটা-ওটা ঘটিবাটির ওপর কিছু-কিছু লোভ ছিলো। তবুও সেসব ধর্তব্যের মধ্যে না ফেলে, বিশেষ প্রয়োজনবোধে তাঁর ওপরে সংসারের ভার ছেড়ে মা বোনের বিয়েতে বাপের বাড়িতে যাবেন এটাই ঠিক ছিলো। এবং সপ্তাহখানেক আগে যাওয়াই ঠিক ছিলো।

কিন্তু তা হলো না। সে বছর নদীতে জল খুব কম ছিলো। স্টিমার ছায়াতলী পর্যন্ত যেতে পাবতো না। টমটমপুরের কাছে দু'মাইল দূরে স্টিমারঘাট পর্যন্ত এসে ফিরে যেতো। ফলে মেজমাসিমার বিয়েতে আত্মীয়স্বজন যাঁরা ঢাকা-কলকাতা বা অন্য জায়গা থেকে আসছিলেন, তাঁরা টমটমপুর হয়েই যাচ্ছিলেন এবং আমাদের বাসায় উঠছিলেন।

বিয়ের আগের দিন আত্মীয়েরা আসছিলেন, ফলে মায়ের পক্ষে টমটমপুর ছেড়ে যাওয়া কঠিন ছিলো। এদিকে বাবাও আদালতে কি একটা জটিল মামলায় আটকে গিয়েছিলেন, পুরনো মক্কেলের কেস ঠিক ফেলে যাওয়া যায় না।

এইভাবে গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো বিয়ের দিন দুপুরে বাবা-মা সুদ্ধু আমরা ভাইয়েরা রওনা হবো ছায়াতলীতে। সকালের দিকে বাবাকে একবার কোর্টে যেতে হবে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবেন।

বোনের বিয়েতে যেতে দেরি হচ্ছে বলে এ-কয়দিন মার মুখ ভার ছিলো। বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা বাবা যখন কোর্ট থেকে ফিরে পরের দিনের প্রোগ্রাম জানালেন, মা বললেন, 'রাধুকে দেখলাম এইমাত্র পালকিগাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো। আজকে কি আর ফিরবে? কাল কখন ফিরবে, ফিরে আবার নেশাভাঙ্ করে পড়ে থাকবে, আমরা যাবো কি করে?'

এমন সময় দাদা ফিরলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত, যতক্ষণ চোখে বল দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত খেলে তারপব বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সিনেমাহলের সামনে দিয়ে ঘুরে দাদার আসতে একটু সন্ধ্যাই হয়ে যায়।

বাড়িব ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে মার কথা শুনে দাদা বললো, 'রাধুদা তো কোথাও যায়নি। ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের কাছে দেখলাম পালকি গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনেই একটা মাঠের একপাশে রাস্তার ধারে ব্রাহ্মসমাজের মন্দির। রবিবার ছাড়া অন্যদিন সেটা সাধারণত তালাবন্ধ থাকে, তারপরে আরেকটা মাঠ, একটা আমবাগান, আমবাগানের ওপারেই খাল। তাই জায়গাটা একটু নির্জন।

দাদার কথা শুনে বাবা বললেন, 'রাধু বোধহয় আবার ভাঙ্ কেটেছে, একদিন জেলে যাবে। তা যাক, তখন দেখা যাবে, এখন তোরা দুজনে গিয়ে রাধুকে ডেকে নিয়ে আয় তো।'

জায়গাটা ফাঁকা-ফাঁকা, আমার একটু ভয়-ভয় করছিলো। এ-সময়ে এদিককার রাস্তা দিয়ে

লোকজনের খুব একটা যাতায়াত নেই। এটা আসলে শহরপ্রান্তের হাটের রাস্তা, হাটবারে এখান দিয়ে সন্ধ্যার পরেও লোকজন যাতায়াত করে। অন্যদিন ফাঁকা থাকে।

আজ কোনো লোকজন নেই রাস্তায়। আশেপাশে তেমন বাড়িঘরও নেই। আমবাগানের পাশে কয়েকটা গরু নিয়ে একটা কুঁড়েঘর বেঁধে এক মধ্যযৌবনা গোয়ালিনী থাকে, সে বিধবা। তার নামে নানা জনে নানা কথা বলে, দুধ ছাড়া সে নাকি আরো কিছু বেচে।

ব্রাহ্মমন্দিরের কাছে গিয়ে দেখি আবছায়া অন্ধকারে দালানের দেয়াল ঘেঁষে রাধুদার পালকি গাড়িটা দাঁড় করানো। পালকি গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ঘাসের বোঝার মতো একটা জিনিস নিশ্চয়ই ভাঙ্‌গাছের কাটা পাতার আঁটি, রাধুদা এগিয়ে দিচ্ছে আর ওদিকে ছাদের ওপর থেকে একজন সেই আঁটি ধরে নিয়ে ছাদে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দাদা আমাকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে দাঁড়াতে বললো। রাধুদা আমাদের দেখতে পায়নি। আমরা গাড়িটার পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। চোখে অন্ধকার সয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম ছাদে সিলুয়েটে যাকে দেখা যাচ্ছে সে মহিলা। দাদা আমাকে ফিসফিস করে বললো, 'হরিমতী পিসী।' তার মানে আমবাগানের গোয়ালিনী।

একটু পরে ছাদে ভাঙ্‌পাতা বিছোনো শেষ হলো। হরিমতী পিসী ছাদের আলসে ঘেঁষে পা নামিয়ে দিলো, গাড়ির ছাদের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে রাধুদা কোলে তুলে নামালেন। নামাতে একটু বেশি সময়ই লাগলো, একবার হরিমতী পিসীর চাপা গলাও শোনা গেলো, 'গাড়োয়ানের রস কত!' তারপর গাড়ির ওপর থেকে একলাফে নিচে নেমে ছুটে আমবাগানের দিকে চলে গেলো।

দাদা চাপাগলায় আমাকে বললো, 'বোধহয় আমাদের দেখতে পেয়েছে', তারপর চেঁচিয়ে ডাকলো, 'রাধুদা!'

হঠাৎ দাদার ডাক শুনে রাধুদা ঘুরে দাঁড়িয়ে পাদানি বেয়ে নিচে নেমে এলো, তারপর আমাদের দুজনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমরা দুজনে এখানে কি করছো?'

দাদা বলালো, 'তোমাকে ডাকতে এসেছি। কাল দুপুরে ছায়াতলীতে যেতে হবে, আমাদের মাসীর বিয়ে।'

শুনে রাধুদা বললো, 'সে তো আমি জানি। খুব ভালো কথা। কিন্তু দুপুর-দুপুর যেতে হবে। তা হলে রাস্তায় আমি টানা আড়াই ঘণ্টা রোদ পাবো, এখন গিয়ে আবার কিছু ভাঙ্‌ঝোপ কেটে রাখি, কাল গাড়ির ছাদে শুকিয়ে নেবো।' তারপর কি যেন চিন্তা করে রাধুদা বললো, 'তোমাদের বাবাকে ভাঙ্‌পাতা শুকোনোর কথা কিছু বলতে যেও না।'

পরদিন বাবা একটার মধ্যে কোর্ট থেকে চলে এলেন। বেলা বারোটার মধ্যে রাধুদা তার পালকি গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে।

সকাল থেকে বোধহয় কয়েক ঘটি ভাঙ্ খেয়েছে সরবত করে, রাধুদার চোখ দুটো টকটকে লাল। বাইরের উঠোনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিয়েছিলো, সে দুটোও আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরপাড়ে ভাঙ্‌ঝোপের ধার থেকে ঘাস খুঁটে খাচ্ছিলো, সে দুটোর চোখগুলোও খুব লাল।

বাবা আসার পর ঘোড়া দুটো আবার গাড়িতে জুতে দেওয়া হলো। তাড়াতাড়ি করার জন্যে রাধুদা তাগিদ দিতে লাগলো। গাড়ির পিছনে ট্রাঙ্ক-বিছানা দড়ি দিয়ে বেঁধে, তারপর বাবা-মা,

আমরা তিনভাই সবাই মিলে গাড়িতে উঠতে প্রায় দুটো বেজে গেলো।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে বাবা বললেন, 'মালপত্রগুলো ছাদে না উঠিয়ে পিছনে বসানো হলো কেন?'

রাধুদা বললো, 'ছাদে ঘোড়ার খড় বিচালি রয়েছে, মালপত্র পেছনে ভালোই থাকবে।'

গাড়িতে ওঠার পর ছাদের ওপর থেকে টাটকা কাটা ভাঙ্‌পাতার শিসের গন্ধ পেয়ে বাবা ভ্রূ কোঁচকালেন, মাকে বললেন, 'ঘোড়ার খাবার না আরো কিছু, রাধু ভাঙ্‌ নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?'

কথাটার জবাব দিলো দাদা, 'গাড়ির ছাদে রোদে তাড়াতাড়ি শুকোবে বলে রাধুদা ভাঙ্‌পাতা তুলেছে।'

শুনে বাবা বললেন, 'যদি আবগারির দারোগা ধরে, তবে রাধুর সঙ্গে আমা'কেও ধরবে। শ্বশুরবাড়িতে শালির বিয়েতে যাওয়া মাথায় উঠবে।'

ততক্ষণে টমটমপুর শহর এবং তার পাশের মরা নদী ডিঙিয়ে আমরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠেছি, আবগারির দারোগার অফিসের সামনে দিয়েই এসেছি কিন্তু কোনো গোলমাল হয়নি।

রাস্তার দুপাশে হালকা সবুজ থেকে ঘন সবুজ নানা রঙের ক্ষেত। মাঝে মধ্যে সরষের হলুদ মাঠ। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সরষেফুলের গন্ধের সঙ্গে প্রায় পেকে ওঠা রবিশস্যের মিশ্র ঘ্রাণ। ছোট দিনের বেলা এর মধ্যেই গড়িয়ে পড়েছে, তবু ঝলমলে রোদে কাছে দূরের গ্রাম, বাঁশবন, মন্দির বা মসজিদের চূড়া—ঘোড়ার গাড়ির জানলা দিয়ে ছবির মত দেখাচ্ছে। আবেশে ও আমেজে আমাদেব সকলের চোখ বুজে এলো।

এমন সময় বাবার ভীষণ জরুরি কথা মনে পড়লো।

চিরকাল দেখেছি, অসম্ভব জরুরি কথাগুলো বাবার একদম অসময়ে মনে পড়ে।

ছায়াতলীতে কোনো ব্যান্ডপার্টি নেই। কাছাকাছি কোনো গ্রামেও নেই। মেজমাসির বিয়ের বাজনা অর্থাৎ ব্যান্ডপার্টির দায়িত্ব ছিলো বাবার ওপরে। ছায়াতলী থেকে লোক ও হাতচিঠি পাঠিয়ে আমার মাতামহ গত চৌদ্দদিনে বেশ বারকয়েক বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বাবা অবশ্য তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করেছিলেন। টমটমপুর শহরে একাধিক ব্যান্ডপার্টি, তার মধ্যে জয়নাল সুবেদারের বাজনার দলই সবচেয়ে জমজমাট। তাঁকেই তারিখ দিয়ে বায়না দিয়ে রেখেছিলেন। জয়নালচাচা টমটমপুরের এক উজ্জ্বল রত্ন। প্রথম মহাযুদ্ধেব সময় সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন, সেখানে প্যারেডের সময়ে বিউগ্‌ল বাজাতেন। যুদ্ধ থেকে কেউ ফিরবে, তার ওপরে সমুদ্র আর মরুভূমি পার হয়ে—এটা কেউ আশা করেনি।

জয়নালচাচা ফিরে আসায় শহরসুদ্ধ লোক খুশি হয়েছিলো। সৈন্যদলে তিনি সুবেদার হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন, তবে শহরের লোকেদের মুখে মুখে তাঁর উপাধি হয়েছিলো সুবেদার, সবাই বলতো জয়নাল সুবেদার। শহরসুবাদে আমরা বলতাম জয়নালচাচা, বাবা বলতেন জয়নালভাই।

জয়নালচাচা আমাদের পাশের পাড়াতেই থাকতেন। ছায়াতলী থেকে চিঠি নিয়ে লোক আসার সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথামত দাদা তাঁকে ডেকে নিয়ে এসেছিলো।

জয়নালচাচা সব শুনে বাবাকে বলেছিলেন, 'তোমার শালির সাদিতে আমার লোকেরা

বাজনা বাজাবে, এ তো খুব আনন্দের কথা। তোমার সাদিতেও আমার লোকেরাই বাজনা বাজিয়েছিলো, আমি নিজেও বরযাত্রী গিয়েছিলাম।'

পারিশ্রমিকের কথা উঠতে জয়নালচাচা বললেন, 'তোমার শালির সাদির বাজনা আমার লোকদের বিনি পয়সাতেই বাজানো উচিত। তোমার শ্বশুরমশায় যেন রাহাখরচ বাবদ পঞ্চাশ টাকা দেন।'

বাবা বললেন, 'শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে বাজনার টাকা আমি নেবো না। টাকাটা আমিই দেবো। তবে পঞ্চাশ নয়, পঁচিশ।'

অনেক দাম-দর, টানাহ্যাঁচড়া করে অবশেষে বোধহয় বত্রিশ টাকায় রফা হয়েছিলো, তার মধ্যে তখনই সাত টাকা আগাম বায়না নিয়ে জয়নালচাচা চলে গেলেন।

তারপর পথেঘাটে বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকবার জয়নালচাচার দেখা হয়েছে, বাবা প্রত্যেকবারই তাঁকে দিনতারিখ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, জয়নালচাচা তাঁর মেহেদি রাঙানো দাড়ি চুমরিয়ে বলেছেন, 'কথার খেলাপ জয়নাল সুবেদার করে না।'

ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি নয়। কথার খেলাপ করা, চুক্তি না মানা শেষ বয়সে এগুলো জয়নালচাচার স্বভাবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বাজারের মন্দিরের কেৌপুরুতের কাছ থেকে জেনে নিতেন হিন্দু বিয়ের, পৈতের আর অন্নপ্রাশনের তারিখ। তারপর সময় ও চাহিদা অনুযায়ী রেট বাড়াতেন, চেনাশোনা লোকের কাছ থেকে বায়না নেওয়া থাকলে শেষাশেষি এড়িয়ে চলতেন। শেষ পর্যন্ত সেইসব উৎসবে আর ব্যান্ডপার্টি বাজতো না, এদিক-ওদিক থেকে সানাইওয়ালা, ঢাকিঢুলি, কাঁসি-বাজিয়ে যোগাড় করে কোনোক্রমে বাজনা বাজতো। ব্যান্ডপার্টিব বাজনাকে বলা হতো বিলিতি বাজনা। সব বিলিতি বাজনাদাবদের ব্যাগপাইপ ছিলো না, জয়নালচাচার ছিলো, তাই তাঁর এত কদর ও চাহিদা। বিলিতি বাজনার সঙ্গে অবশ্য সানাইও থাকতো। তবে নিতান্ত সাদামাটা ঢাক, ঢোল, বাঁশির সঙ্গে যে গ্রাম্য সানাই এবং কবতাল— তাকে বলা হতো বাংলা বাজনা।

সে যা হোক, আমাদের পালকি গাড়ি তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে ছায়াতলীর দিকে এগোচ্ছে। সহসা বাবার খেয়াল হলো, গত দু'তিনদিন জয়নালচাচার সঙ্গে মোটেই দেখা হয়নি, তা ছাড়াও সবচেয়ে যেটা বড় কথা, আজ সকালে অন্তত একবার ব্যান্ডপার্টি ছায়াতলী রওনা হয়েছে কিনা খোঁজ করা উচিত ছিলো, সেটাও করা হয়নি।

ব্যান্ডপার্টির দলের সঙ্গে আজকাল অবশ্য জয়নালচাচা নিজে যান না, তাঁর যোগ্য সাগরেদ জুটেছে ছিদাম সূত্রধর। সূত্রধরের বংশের ছেলে সে, কিন্তু অতি অল্পবয়সে যাত্রাদলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে অনেক কিছু শিখে এসেছে। গানবাজনায় সে তুখোড়। জয়নালচাচা তাকেই সহকারী নিযুক্ত করেছেন।

সুদাম ছোকরার নবীন যৌবন। তার একটু চরিত্রদোষ ছিলো। হাতে পয়সা থাকলে একটু আধটু খারাপ পাড়ায় যাতায়াত করতো।

টমটমপুর এলাকায় নদীর বাঁকে বাঁকে, গঞ্জে গঞ্জে বাজারের পাশে রূপসীদের মেলা, সোহাগীদের হাট। সব হাটে ছিদামের একটা করে বাঁধা ঘর ছিলো, একজন করে প্রিয় সখী।

বাবার মনে পড়লো শুধু জয়নালচাচা নয়, ছিদামকেও তিনি কয়েকদিন টমটমপুরে দেখেননি, কোথায় গিয়ে কিসের রসে মজে আছে কে জানে।

ব্যান্ডপার্টির কথা স্মরণ হতে বাবা মাকে তাঁর দুর্ভাবনার কথা জানালেন। মা তো শুনে আঁতকে উঠলেন। বাবা তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গাড়ির জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে রাধুদাকে বললেন, 'গাড়ি থামাও, রাধু, তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাও।'

রাধুদা তখন 'চনমনে বালিকাটি চলে আসে হাঁটিহাঁটি' বলে তার একটা প্রিয় গান মনের সুখে গলা খুলে গাইতে গাইতে গাড়ি ছোটাচ্ছিলো। একটু সময় লাগলো তাঁর কানে বাবার আবেদন পৌঁছতে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি থামলো। রাধুদা কোচম্যানের আসন থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হয়েছে?'

ইতিমধ্যে উল্টোদিক থেকে যেসব লোকজন সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে আসছিলো, তাদের জনে জনে বাবা আর মা জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা ছায়াতলীর ওদিক থেকে আসছে কিনা আর তাই যদি হয়, ছায়াতলীর জগৎবাবুর বাড়িতে ব্যান্ডপার্টির বাজনা শুনেছেন বা দেখেছেন কিনা।

জগৎবাবু আমার মাতামহের দাদার নাম, তাঁর নামেই বাড়ির পরিচয়।

কিন্তু চট করে এ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেলো না। কেউ কেউ প্রশ্নটা ধরতেই পারলো না। আবার যে বুঝলো, সে ছায়াতলী থেকে আসছে না। আবার যে ছায়াতলীর দিক থেকেই আ..., ... ব্যান্ডপার্টি ব্যাপারটা কী, জানে না।

অবশেষে বাবার সমস্যার সমাধান করলো রাধুদা। গাড়ি থেকে নেমে মা-বাবার কথা শুনে রাধুদা বললো, ছিদামকে তার দলবলসহ গতকাল সকালেই সে তার গাড়িতে এবং অন্য দুটো গাড়িতে তুলে সহবতপুরের গঞ্জে সখীপাড়ায় নামিয়ে দিয়ে গেছে। রাধুদা জানে যে, কালকের রাতটা তারা ওখানে থেকে আজ সকালেই ছায়াতলীতে যাবে।

সহবতপুর আর ছায়াতলী একই নদীর বাঁকে পাশাপাশি দুটো গ্রাম। ছায়াতলী গৃহস্থপল্লী সাধারণ গ্রাম, আর সহবতপুর হলো গঞ্জ, বাজারে গ্রাম। সেখানে বানিয়া আছে, বিদেশী আছে, মদের দোকান আছে, সেখানে পাটের দালাল আর রূপোপজীবিনীদের বসবাস। সেখানকার নটাদের খুব নামডাক। বড় বড় পানসি নৌকোয় উঠে তারা নদীর বুকে প্র... দ ঢেলে দেয়। এদিক ওদিকে ভেসে যায়।

ছায়াতলী প্রবেশের পথে আমরা ঘোড়ার গাড়ি থেকে ব্যান্ডপার্টির বাজনা শুনতে পেলাম। বাবা-মা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু মামার বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, সেখানে কোনো ব্যান্ডপার্টি বাজছে না। বিলিতি বাজনা অনেক দূরে কোথাও বাজছে।

সতর্কভাবে বাবা একটু খোঁজ নিতেই জানতে পারলেন, ছিদামের ব্যান্ডপার্টি কাল সত্যিই সহবতপুরের নটীপাড়ায় গিয়ে উঠেছে। তারপর বহুবার লোকজন পাঠানো হয়েছে তাদের ডেকে আনতে, কিন্তু তারা সেখানে মজে গেছে। কাল রাত থেকে প্রায় অনবরত বাজনা বাজছে তো বাজছেই। গঞ্জের বাজারে নটীপাড়ার মুখে দাঁড়িয়ে তারা ক্রমাগত প্যাঁপোঁ করে যাচ্ছে। অতিরিক্ত নেশায় এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে এর মধ্যেই তারা কাবু হয়ে ...সে পড়েছে। সন্ধ্যাবেলায় বিয়ের সময় যদি তারা এসেও যায়, আর বাজনা বাজাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

গাড়ির ছাদে বসে সারা পথ প্রচুর কাঁচা ভাঙ্পাতা চিবিয়েছে রাধুদা, কিন্তু এখনো তার জ্ঞান টনটনে। সমস্যা অনুধাবন করতে তার মাত্র কয়েক মিনিট লাগলো। তারপরে বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বাবার সঙ্গে কী পরামর্শ করলো। অনেক ইতস্তত করে বাবা শেষে নিমরাজি হলেন।

যেখানে বিয়ের রান্নার মশলা বাটা হচ্ছিলো দালানের পিছনে বাদামতলায়, রাধুদার গাড়ির ছাদের ওপর থেকে ভাঙ্‌পাতাগুলো নামিয়ে সেখানে নিয়ে বাটানো হলো। ভাঁড়ার ঘর থেকে চার হাঁড়ি দই বার করা হলো। তারপর ভাঙ্‌পাতা বাটা সিদ্ধি আর দইয়ের সঙ্গে জল দিয়ে একটা বড় মাটির জালায় ভালোভাবে মিশিয়ে সেই জালা ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে তুলে রাধুদা রওনা হয়ে গেলো।

রাধুদা ফিরলো প্রায় এক ঘণ্টা পরে। সহবতপুর থেকে এতক্ষণ যে বিলিতি বাজনার আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসছিলো, সেটা কিছুক্ষণ হলো বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই ধরে নিয়েছে ব্যান্ডপার্টি আর আসবে না, বাদকেরা সবাই অজ্ঞান হয়ে গেছে।

শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত, গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বিয়ের ছাদনাতলার এপাশে একটা জামরুলগাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, সেই ফুলের রেণু আর গন্ধ বাতাসে ছড়ানো। বিরাট একটা চাঁদ জামরুলের নিচু ডাল থেকে উঁচু ডালে উঠতেই অনেক দূরে একটা কোকিল ডেকে উঠলো।

হঠাৎ শোনা গেলো, সামনের রাস্তা দিয়ে ব্যান্ডপার্টির আওয়াজ আসছে। আমার মাতামহ এতক্ষণ খুবই গম্ভীর হয়ে ছিলেন, এবার ব্যান্ডপার্টির এগিয়ে আসার আওয়াজে তাঁকে একটু প্রসন্ন মনে হলো। তিনি কন্যা সম্প্রদান করতে বসেছিলেন, বাবা গিয়ে তাঁর কানে কানে বললেন, 'মনে হচ্ছে সিদ্ধির সরবতে কাজ হয়েছে।'

সত্যিই কাজ হয়েছে।

চাঁদের আলোয় এক অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখা গেলো। সামনে একদল লোক ড্রাম, বিউগ্‌ল, সানাই, ক্ল্যারিওনেট, ব্যাগপাইপ বাজাতে বাজাতে আসছে। তারা কেউই জয়নালচাচা বা ছিদামের লোক নয়। তারা যে বাজনাদার নয়, সে তাদের বাজনা শুনেই বোঝা যাচ্ছিলো, সে বাজনার মাথামুণ্ডু নেই, কোনো সুর নেই, বেসুর নেই, মা-বাবা নেই, যে যেরকম পারে বাজিয়ে যাচ্ছে।

তবে ছিদাম আছে। সে-ই সম্ভবত এদের সংগ্রহ করেছে। সে গাড়ির ছাদে রাধুদার ডানপাশে বসে গাড়ি চালাচ্ছে, তার হাতে ঘোড়ার চাবুক আর রাধুদার বাঁ পাশে কণ্ঠলগ্ন হয়ে পড়ে আছে এক রূপসী। কিন্তু সে একা নয়, গাড়ির ছাদে, গাড়ির ভিতরে, গাড়ির পিছনের পাটাতনে চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে সহবতপুর গঞ্জের রূপসীরা।

বাড়ির কাছে আসতেই তারা সবাই ঝুপঝুপ করে গাড়ি থেকে নামলো। ছাদনাতলার একটু তফাতে সেই জামরুলগাছের নিচে আবছায়া জ্যোৎস্নায় তারা বাজনদারদের ঘিরে নাচতে শুরু করে দিলো। তাদের সঙ্গে রাধুদা, ছিদাম এবং পরে একে একে আরো অনেকে জুটে গেলো নাচের আসরে।

টমটমপুর পরগণায় ভদ্র, গৃহস্থবাড়ির বিয়েতে সেই প্রথম এবং শেষ বাঈনাচ।

বিশু

তার অল্প কিছুদিন আগে আমাদের পৈতে হয়েছে। আমি আর দাদা দু'জনে একসঙ্গে দ্বিজত্ব অর্জন করেছিলাম।

পঞ্জিকাতে উপনয়নের দিন সহজলভ্য নয়। তা ছাড়া তার পরের বছর বোধ হয় ছিলো মল

বছর না কী যেন বলে। সুতরাং নানা কথা বিবেচনা করে আমার আর দাদার পৈতে একই সঙ্গে দেওয়া হয়েছিলো।

আমাদের দু'জনের পৈতেয় বেশ ধুমধাম হয়েছিলো। অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিলো বাড়িতে, তারা অনেকেই বেশ কিছুদিন ছিলো। তা ছাড়া পাড়াপ্রতিবেশী, শহরের গণ্যমান্য লোক, বাবা আর ঠাকুর্দার ওকালতি-সেরেস্তার সম্ভ্রান্ত মক্কেলেরা অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিলেন। প্রচুর কাঁচা টাকা, আতপ চাল আর কাঁচকলা পেয়েছিলাম আমি আর দাদা।

তাছাড়া সময়টা ছিলো জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, ভরাগ্রীষ্ম। সেই জন্যে আম, জাম, জামরুল, এমন কি খাজা কাঁঠাল পর্যন্ত নিমন্ত্রিতেরা দান করেছিলেন আমাদের উপনয়নের ভিক্ষার ঝুলিতে। কাঁঠাল অবশ্য ঝুলিতে নেওয়া সম্ভব ছিলো না, নিজেদের উঠোনের গাছপাকা কাঁঠাল এনেছিলো গরিব মক্কেল ও আমাদের গ্রামের বাড়ির রায়তেরা বা প্রজারা। ওই ভারী ফল তারা দশ মাইল রাস্তা বহন করে এনে আমাদের কাঠের খড়ম শোভিত পাদপদ্মে অর্ঘ নিবেদন করেছিলো।

কিছু কিছু কাঁসার থালাবাটি, ধুতিচাদর, দুটো ফাউন্টেন পেন—যা তখন বেশ দুর্লভ ছিলো, এমনকি ছাতা পর্যন্ত উপহার পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের পৈতের আসল উপহারটা পেয়েছিলাম পৈতে হয়ে যাওয়ার প্রায় দু' মাস পরে। তখন আমাদের ন্যাড়া মাথায় চুল গজিয়ে গেছে, রাস্তায় লোকজন ন্যাড়ামাথা দেখে আর জানতে চায় না কী হয়েছে।

আমাব ঠাকুরদাব মামার বাড়ি ছিলো আমাদের শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে নদীর অন্য পাড়ে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে। ঠাকুরদার এক অতি বৃদ্ধা মামিমা তখনও বেঁচে ছিলেন। আমরা তাঁকে ছোট বয়সে অল্পস্বল্প দেখেছি, আমরা তাঁকে বলতাম কর্তামামিমা। আমাদের পৈতের সময় তাঁর বয়স নব্বই পেরিয়ে গেছে। তাঁর পক্ষে পৈতেয় আসা সম্ভব হয়নি।

পৈতেহয়ে যাওয়ার মাস দুয়েকেব মাথায় ঠাকুবদার মামাবাড়ি থেকে সে বাড়ির নায়েবমশায়ের চিঠি নিয়ে একটা লোক এলো। নায়েবমশায় লিখেছেন বুড়িমা আর আর দাদা, এই দুই নতুন ব্রাহ্মণকে গরু দান করবেন, আমরা কবে যাবো জানিয়ে দিলেই নৌকো পাঠিয়ে দেবে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ঠাকুরদার মামিমা গ্রামের বাড়িতে একাই থাকতেন। তাঁর একমাত্র ছেলে অনেকদিন আগে মাবা গিয়েছিলো। দুই নাতিই কলকাতায়। মেয়েদের বহুদিন বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটখাট একটা তালুকদারি গোছের সম্পত্তির দেখাশোনা করতেন ওই নায়েবমশায়। নাতিরা কিংবা অনা আত্মীয়েরা কালেভদ্রে পুজোপার্বণে দেশের বাড়িতে আসতো। তবে পাড়াপ্রতিবেশী, জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ছিলো, তারাই তাঁর খোঁজখবর করতো। তেমন কোনো জরুরি ব্যাপার বা অসুখবিসুখ হলে শহরে আমার ঠাকুরদার কাছে খবর পাঠাতো।

নায়েবমশায়ের চিঠি নিয়ে লোক আসার পর আমাদের বাড়িতে অনেক আলোচনা। বৃদ্ধা মাতুলানী তাঁর পৌত্রদের গরু দান করতে চেয়েছেন, সুতরাং এ ব্যাপারে আমার ঠাকুরদার পক্ষে আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আপত্তির কারণ অন্যত্র।

প্রথম ও প্রধান অসুবিধে এই যে, আমাদের শহুরে বাড়িতে গরু রাখার কোনো বন্দোবস্ত নেই। গোয়ালঘর নেই। তা ছাড়া একটা গরুর দেখাশোনার হাঙ্গামাও আছে। আরো একটা আলাদা লোক রাখতে হতে পারে সেই জন্যে।

এদিকে তখন ঘোর বর্ষা। আমাদের এলাকার সব নদীনালা জলে টইটম্বুর। কিন্তু অনেক

ভেবেচিন্তে অবশেষে ঠিক করা হলো যে, গরুর দান গ্রহণ না করা আমাদের অন্যায় হবে। হয়তো বা এ ক্ষেত্রে পাপও হবে, ব্রাহ্মণ হয়ে গোদান নিতে অসম্মত হলে।

কিন্তু আর দেরি করাও সম্ভব নয়। বৃদ্ধা যদি এর মধ্যে হঠাৎ মারা যান, যেতেই পারেন, তা হলে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না, গোদান না করে পরলোকে গিয়ে তিনি হয়তো যথেষ্ট শান্তি পাবেন না।

তাই নায়েবমশাইকে খবর পাঠানো হলো, নৌকা পাঠাতে হবে না। আমাদের শহরের নদীর ঘাট থেকেই একটা নৌকো ভাড়া করে ঠাকুরদা আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে যাবেন, যেদিন যাবেন, সেদিনই সেই ভাড়াটে নৌকোয় ফিরে আসবেন।

পাঁজি দেখে গোদানের শুভদিন বার করা হলো। একজন লোকও ঠিক করা হলো, তার নাম কোনো অজ্ঞাত কারণে গোবর। গোবরও আমাদের সঙ্গে যাবে নৌকোতে, সে গরুটাকে নিয়ে আসবে, প্রয়োজন হলে অন্য একটা আলাদা ছইখোলা নৌকোয়। এটাও ঠিক হলো যে, গরুর দেখাশোনা এ বাড়িতে গোবরই করবে। উঠোনের এক প্রান্তে একটা পুরনো ঢেঁকিঘর ছিলো, সেটা বহুকাল অকেজো, বন্ধ। কিন্তু কোনো কাজে লাগতো না, তা মোটেই নয়। সে ঘরের পুরনো টিনের চালে তরতরিয়ে উঠে যেত লাউ গাছ, বিলিতি মিষ্টি কুমড়োর লতা, কিংবা অন্য কোনো সময়ে বিরাট চালকুমড়োর বিস্তার, তাকিয়া বালিশের মতো এককেটা চালকুমড়ো, শরৎ হেমন্তের শিশিরে সারারাত ভিজত সেগুলো, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমরা জানালা দিয়ে দেখতাম হেলানো চালে সারারাত ভেজা চালকুমড়োর তাকিয়া বালিশ, যেন সেটা মাথায় দিয়ে কেউ বহুক্ষণ কেঁদেছে কিংবা ভাবা যায় ঘেমেছে।

গোবর প্রসঙ্গে ঢেঁকিঘরের চালের এই বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ লঘু করার আগে এটুকু ইতিহাস বলা বাঞ্ছনীয়।

আসলে হয়েছিলো কি, গোবর ছিলো আমাদের পাড়ার সবচেয়ে বোকা মানুষ। লোকের বাড়িতে ফুটফাট ফাই-ফরমাশ খেটে বেড়াতো। ভালো করে একটু খেতে দিলেই ভালো, মানে পেট ভরে খেতে পেলেই সে খুশি। শুধু খাওয়া-থাকা নয়, সেই সঙ্গে মাসে দেড় টাকা মাইনে বরাদ্দ হলো গোবরের। গোবর কাজে বহাল হওয়ার পরে আমাদের ছোটপিসিমা বললেন, 'গরুর আগেই গোবর এসে গেলো!' আর আমাদের দু ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোরা যে এত শখ করে গরু আনতে যাবি, সাবধানে থাকিস, তোদের বুড়ি জুতোটুতো না মারে!'

দাদা ও-কথায় বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'হঠাৎ জুতো মারবে কেন পিসি?'

ছোটপিসিমা বললেন, 'জুতো মেরেই তো লোকে গরু দান করে।'

বক্তব্যটার মধ্যে বোধ হয় একটু গোলমাল ছিলো, দাদা প্রতিবাদ করে বললো, 'জুতো মেরে গরু দান নয়। কথাটা হলো গরু মেরে জুতো দান।' ছোটপিসিমা এত সহজে ছাড়ার পাত্রী নন, কথাটা নিয়ে দু'জনের যথেষ্টই বাদবিসম্বাদ হলো।

তখনো কিন্তু আমরা জানি না, আমি আর দাদা দু'জনে দুটো গরু পাবো, না একটা গরু পাবো। গরুটা কত বড় কিংবা গাই-গরু না ষাঁড়। ধরে নেওয়া হয়েছিলো, একটা গাই-গরুই হয়তো আমাদের দু'জনকে কর্তামামিমা দেবেন। কারণ ষাঁড় আমাদের কোনো কাজে আসবে না।

যা হোক, নির্দিষ্ট শুভদিনে খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সামনের পুকুরে দুটো

ডুব দিয়ে স্নান সেরে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে আমরা দু ভাই ঠাকুরদার সঙ্গে টাউনের কাছারিঘাটে গিয়ে একটা নৌকো ভাড়া করে কর্তামামিমার গ্রামের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে গোবর, তার হাতে সদ্য বাজার থেকে কিনে আনা একটা পাটের দড়ি, গরুটাকে বেঁধে আনতে হবে তো!

কাছারিঘাট থেকে ছোট শাখানদী ধরে উজানে মাইল দুয়েক গেলে বড় নদী। সেই বড় নদী সরাসরি পার হয়ে আরেকটু গেলে খালের মধ্য দিয়ে ছায়াঢাকা পাখিডাকা গাছগাছালির নিচে দু-তিনটে ছোট বড় গ্রাম, একটা হাটখোলা, একটা শ্মশানঘাট আর ভাঙা মসজিদ। সেই মসজিদের পরিত্যক্ত চাতালে আমাদের নৌকো বাঁধা হল।

শূন্য চাতালের পাশ দিয়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক তেঁতুলগাছের নিচে বর্ষাকালেব জলকাদাভরা রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে মিনিট দশেক গেলে ঠাকুরদার মামার বাড়ি। বেশ বড় গ্রাম, একটা জুনিয়ার মাদ্রাসা আছে, একটা মাইনর স্কুল, ইউনিয়ন বোর্ড, ডাকঘর, একটা টিনের নাটমন্দির।

নাটমন্দিরটা আমার ঠাকুবদার মামার বাড়ির উঠোনে, ঠাকুরদার প্রমাতামহ স্বর্গত লালগোপাল সান্যাল, আমাদের জেলার প্রথম আবগারি দারোগা, তিনি অবসরগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নাটমন্দিরের পিছনেই ঠাকুরদার মাতুলালয়। পুরনো আমলের একতলা কোঠাবাড়ি, সামনে টানা বারান্দা। এই বাড়িতেই ঠাকুরদা জন্মেছিলেন, তাই দুর্বলতা আছে বাড়িটার ওপরে। ঠাকুরদার জন্মানোর পরে প্রায় বছর দেড়েক ঠাকুরদার মা বাপের বাড়িতে ছিলেন। সামনের ওই টানা বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়ে ঠাকুরদা দাঁড়াতে শিখেছিলেন।

নদীর ঘাটেই আমাদের জন্যে লোকজন অপেক্ষা করেছিলো। আমরা নামতেই একজন ছুটে গিয়েছিলো কর্তামামিমাকে পৌঁছনোসংবাদ দিতে, বাকিরা আমাদের সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে এলো, তার মধ্যে নায়েবমশাইও আছেন।

আমরা নাটমন্দিরের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে শাঁখ বাজতে লাগলো। হাতে একটা পাকা বাঁশের দুহাতি লাঠি, নতুন সাদা থান পরে নাটমন্দির পেরিয়ে এসে রাস্তার মুখে থুরথুরে বুড়ি কর্তামামিমা দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুরদা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই আমরা দু ভাইও প্রণাম করলাম। তাঁর পাশে এক জ্ঞাতি পৌত্রী তামার থালায় ধান, দূর্বা, পঞ্চশস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। বৃদ্ধা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু তার মধ্যেই তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, গোদানের লগ্ন নাকি এখনই উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। ঘড়ি নেই, কিছু নেই, কী করে লগ্নের সময়, ক্ষণ বিবেচনা করা হচ্ছে, ঈশ্বর জানেন!

কিছুক্ষণ পরে আমরা আসল ঘটনার মুখোমুখি হলাম। ধবধবে সাদা রঙের একটি অতি নবীনা গাইবাছুর, মাসখানেক আগে জন্মেছে বোধহয়, এখনো মায়ের দুধ ছাড়েনি, তার গলায় দড়ি পরানো হয়েছে, গোবরের দড়ি নয়, সেটা কোনো কাজে লাগলো না, এটা তো বাড়ির দড়ি। সামান্য শিশু বাছুরের পক্ষে দড়িটা একটু বেশি ভারী, দড়ির ভারে বাছুরটা নুয়ে পড়েছে, সেই দড়ির এক প্রান্ত বাছুরের গলায় বাঁধা, অন্য প্রান্ত আমার দাদার হাতে ধরিয়ে নামাবলী গায়ে এক পুরুতঠাকুর কর্তামামিমাকে দিয়ে অনেক মন্ত্র পড়ালেন, তারপর শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে, বাছুরের কপালে সিঁদুর পরিয়ে গোদান সম্পন্ন হলো।

পাড়াগাঁয়ে আকর্ষণের অভাব, বিশেষত সেকালে, তাই গোদান অনুষ্ঠানে বেশ ভিড় হয়েছিলো। মহিলাই বেশি, যথেষ্ট শিশু এবং দু'চারজন গ্রামবৃদ্ধ। তাঁদের কাউকে কাউকে ঠাকুরদা

প্রণাম করলেন, তাঁদের কেউ কেউ ঠাকুরদাকে প্রণাম করলো, আমরা সকলকেই প্রণাম করলাম।

সবাই বলতে লাগল খুব পয়মন্ত বাছুর এটা। এবং স্বদ্বংশ। নারায়ণপুরের চরের মহিম ঘোষের ষাঁড় হল এর বাবা। বাছুরের যে বাবাও থাকে সেই আমি প্রথম জানলাম।

সে যা হোক, বাছুরটি শুভ বৃহস্পতিবারে জন্মেছে, সেদিন আবার ছিলো উল্টোরথ, সব দিক থেকেই সুলক্ষণা। ইতিমধ্যেই ওর নাম দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মী।

সেদিন দুপুরের পরে যজ্ঞের খাওয়া খেয়ে আমরা ফিরলাম। পাটপাতার বড়া দিয়ে শুরু, সরপুঁটির টক দিয়ে শেষ, মধ্যে তিন রকম ডাল, পটলকুচি দিয়ে মটরের ডাল, নারকেল দিয়ে বুটের মানে ছোলার ডাল, আর রুইমাছের মাথা দিয়ে মুগ, ইলিশমাছের মাথা দিয়ে চালকুমড়ো, কাঁটা আর ল্যাজা দিয়ে কচুশাক, আর মাছ ছিল ঃ পাবদা, ইলিশ, রুই, ঝাল, ঝোল, সরষে বাটা। সেটা আমাদের খাওয়ার বয়স নয়, তবু সেই খাওয়াটা মনে আছে। তারপরে ক্ষীর আর কাঁচাগোল্লা, তার স্বাদ আলদা, গন্ধ আলাদা।

লক্ষ্মীকে আমরা কর্তামামিমার জিম্মায় রেখে এলাম। এখনো মায়ের দুধ ছাড়েনি, ওকে নিয়ে যাওয়ার কথা ওঠে না। ঠিক হলো, শীতের সময় নৌকো লাগবে না, তখন গোবর এসে লক্ষ্মীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। এই গ্রাম থেকে সোজা হাঁটা রাস্তা আছে আমাদের শহর পর্যন্ত। বছরে ছয় সাত মাস যখন বর্ষা থাকে না—সে রাস্তা ব্যবহার করা যায়। তবে দু'বার ফেরি পার হতে হয়, একবার বড় নদীতে, আরেকবার টাউনের কাছাবিঘাটে।

কিন্তু লক্ষ্মীর শেষ পর্যন্ত আমাদের শহরের বাড়িতে আসা হয়ে ওঠেনি। লক্ষ্মীর খাওয়ার জন্যে গামলা কেনা হলো, ঢেঁকিঘর সারাই করে, ঝাড়পোঁছ করে গোয়ালঘর বানানো হলো। সে ঘরে লক্ষ্মীর অভাবে গোবর শুতে লাগলো। সবই ঠিক ছিলো, মাঘ মাসে গিয়ে লক্ষ্মীকে গোবর নিয়ে আসবে।

কিন্তু এরই মধ্যে কালীপুজোর দীপান্বিতার দিন ঠাকুরদা মারা গেলেন। অশৌচের বছর বলে মাঘ মাসে বা তার পরে গোবরকে আর পাঠানো হলো না কর্তামামিমার কাছে থেকে লক্ষ্মীকে নিয়ে আসতে।

পরের বছর পুজোর আগে খবর এলো কর্তামামিমার শরীর খুব খারাপ, যায়-যায় অবস্থা। কর্তামামিমার নাতিদের আমার বাবা টেলিগ্রাম করলেন কলকাতায়, তাঁরা এসে তাঁদের ঠাকুমাকে কলকাতায় নিয়ে গেলো। কয়েকমাস পরে কর্তামামিমা কলকাতায় মারা গেলেন। সেই প্রথম আমরা গঙ্গা লেখা কালো বর্ডার দেওয়া ছাপানো শ্রাদ্ধের চিঠি দেখলাম।

লক্ষ্মীর কিন্তু আর আমাদের বাড়িতে আসা হয়নি। লক্ষ্মীর কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। সব কিছুই কেমন একটু আলাদা আলাদা। মিলিটারি ট্রাক যাচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে। লোকজন, গ্রামবসতি কেমন ছাড়া-ছাড়া, ফাঁকা-ফাঁকা ভাব। গ্রামে দুর্ভিক্ষ, গরিব মানুষেরা ঘর ছেড়ে শহরের দিকে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই। এমন কি গোবরের মাইনে দেড় টাকা থেকে তিন টাকা হয়েছে। সেই টাকায় সে বিয়ে করেছে, সে আর তার কালো মোটা বউ, বউয়ের নাম সোনামণি, ঢেঁকিঘরে থাকে। গোবরকে যে গরু রাখার জন্যে আনা হয়েছিলো তাও কারো খেয়াল নেই, ভুলেই গেছে।

হঠাৎ অনেকদিন পরে আদালতের কি একটা কাজে স্বর্গতা কর্তামামিমার নায়েবমশায় একদিন বাবার কাছে এলেন। তাঁর কিন্তু লক্ষ্মীর কথা মনে আছে। রাতের বেলা রান্নাঘরের বারান্দায় আমাদের সঙ্গে বসে খেতে খেতে তিনি আমাকে আর দাদাকে বললেন, 'কর্তামা তোমাদের দু ভাইকে যে বাছুরটা দিয়েছিলেন সেটা এখন খুব বড় হয়েছে, এবার তার বাছুর হবে। খুব ভালো গাই হয়েছে।' তারপর বাবার দিকে মুখ করে বললেন, 'বাছুর হলে কিছুদিন পরে বাছুর সুদ্ধ পাঠিয়ে দেবো। খাঁটি দুধ পাবেন।'

আমার খুব ইচ্ছে ছিল যাতে গরুটা আমরা পাই, আমাদের বাসায় আসে, কিন্তু বাবা আপত্তি করলেন, বললেন, "দরকার নেই, এখানে অসুবিধে আছে। আর গোয়ালঘরে তো গোবর থাকছে, গরুটা থাকবে কোথায়?'

'তখন নায়েবমশায় বললেন, 'তা হলে গরুটা বিয়োনোর পর বেচে টাকা পাঠিয়ে দিই। কর্তামা খোকাদের দিয়েছিলেন, টাকা দিয়ে ওরা ওদের ইচ্ছেমত জিনিসপত্র কিনে নেবে।'

বাবা এতেও আপত্তি করলেন, সংক্ষিপ্তভাবে বললেন,'না। গরু বেচতে হবে না। গরু বেচার টাকা পাঠাতে যাবেন না।'

ব্যাপারটা আপাতত মিটে গেলো। কিন্তু আদালতের কাজে নায়েবমশায় ঘন ঘন আসতে লাগলেন এবং মাঝে-মাঝেই তাঁর কাছে লক্ষ্মীর খবরাখবর পাওয়া যেত।

লক্ষ্মীর বাছুর হয়েছে। গাইবাছুর, সে বাছুরও বৃহস্পতিবার বা বিশ্যুদবারে জন্মেছে, তাই তার নাম রাখা হয়েছে বিশু। বিশু কালো রঙের, তবে তার কপালে চমৎকার একটা সাদা চাঁদ আছে।

এর পরের সংবাদ খুব খারাপ। নদীর ওপারের গ্রামগুলোতে গো-মড়ক লেগেছে। সেই মড়কে লক্ষ্মী মারা গেছে, বিশুরও মুমূর্ষু অবস্থা—প্রায় যায়-যায় আর কি।

নায়েবমশায়ের মুখে খবর শুনে বাবা গোবরকে পাঠিয়ে নৌকো করে বিশুকে আনিয়ে শহরের পশু হাসপাতালে ভর্তি করালেন।

আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই দল বেঁধে পশু হাসপাতালে বিশুকে দেখতে গেলাম।

বিশু তখন ধুঁকছে। তার তখন চার-পাঁচ মাস বয়স হবে। বয়সের তুলনায় বেশ বড়সড় মনে হলো তাকে। হাসপাতালের উঠোনের টিনের ছাউনি দেওয়া বাঁধানো চাতালে অবসন্ন হয়ে সে চোখ বুজে বসে আছে।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বললেন,'এখনো যখন মারা যায়নি, আমার মনে হয় ও এ যাত্রা বেঁচে যাবে। ওষুধ ঠিকমত ধরেছে, এখন ওর যত্ন দরকার। আপনারা ওকে বাসায় নিয়ে যান।'

বিশুকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসাই সাব্যস্ত হলো। কিন্তু থাকবে কোথায়?

তার মায়ের জন্যে যে গোয়ালঘর ঠিক করা হয়েছিলো, সেটায় তো গোবর আর সোনামণি থাকে। আর দুর্বল, অসুস্থ বাছুরকে খোলা জায়গায় রাখা যাবে না, তা হলে রাতে শেয়ালে খুবলে মেরে ফেলবে।

দালানের ভিতরের বারান্দার শেষপ্রান্তে একটু অংশ টিন দিয়ে ঘিরে, ছেঁচা বাঁশের দরজা দিয়ে বিশুর থাকার জায়গা করা হলো। জায়গাটা তৈরি করে ঠিকঠাক করতে যে দু-চারদিন লাগলো, সে কয়দিন বিশুকে কাছারিঘরে রাখা হতো রাতে, দিনে বার করে সামনের উঠোনে নিয়ে আসা হতো।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিশু সুন্দর সুস্থ হয়ে উঠলো। আমরা বিশুর ভালোবাসায় পড়ে গেলাম।

সকালে সকলের আগে যে-ই ঘুম থেকে উঠতো, তার প্রথম কাজ ছিলো বিশুর ঘরের হুড়কোটা খুলে দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে বিশু বেরিয়ে পড়তো। কোনোদিন দরজা খুলতে দেরি হলে, সে তার ঘরের মধ্যে থেকে হামবা-হামবা করে চেঁচাতো, সকালবেলায় ঘুম ভাঙানোর জন্যে মোটামুটি একটা অ্যালার্ম ক্লকের কাজ করতো সে।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বিশু একবার রান্নাঘরের জানালার নিচে উঁকি দিয়ে দেখতো আগের দিনের রান্নার তরকারির খোসাটোসা ফেলা আছে কিনা। তা হলে তাই দিয়েই তার প্রাতরাশ হয়ে যেত। তা না পেলে সামনের পুকুরপাড়ে চলে যেত, সেখানে প্রচুর ঘাস, বিশু ঘুরে ঘুরে খেত।

আমাদের শহরের নদীর ঘাটের পাশে কয়েকটা বড় অশ্বত্থ গাছ ছিলো। সেই অশ্বত্থতলার স্থানীয় নাম ছিল গোহাটা, কারণ সপ্তাহে একদিন সেখানে গরু-ছাগলের হাট বসতো। সেই হাটে গিয়ে আমরা একটা গরুর গলার কাঁসার ঘণ্টা নিয়ে এলাম। সেই ঘণ্টাটা বিশুর গলায় বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো। বিশু যেখানে যেত, আমরা টুং-টাং করে বিশুর গলায় ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেতাম।

আমরা খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনেরা, সে একসঙ্গে সংখ্যায় অনেক। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে তারপর জলখাবার খেয়ে বাইরের বারান্দায় দুটো তক্তাপোশে ভাগ হয়ে বসে পড়াশুনো করতাম বিশুও সকালের জলখাবার শেষ করে বারান্দার পাশে এসে দাঁড়াতো। টুং-টাং শব্দে আমরা আমাদের খাতা-শেলেট-বই থেকে মুখ তুলে দেখতাম বিশু নিবিষ্ট চিত্তে, ঘন কালো চোখ দিয়ে আমাদের লেখাপড়া দেখছে। তার চাঁদকপালে ভোরবেলার মায়াবী আলো-ছায়ার খেলা, আমার মনের ভিতরের দেওয়ালে এখনো সেই দৃশ্য ফটোগ্রাফ হয়ে বাঁধানো আছে।

সুস্থ হয়ে একটু শক্তসমর্থ হতেই আমরা তার পিঠে চড়া আরম্ভ করি। আমাদের পিঠে চড়াতে তার মোটেই আপত্তি ছিলো না, বরং মনে হয়ে এতে সে খুশিই হতো। সে স্বেচ্ছায় আমাদের পিঠে চড়াতো, দালানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'বিশু' 'বিশু' করে ডাকলেই সে বারান্দার ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়াতো। আমরা অনায়াসে তার পিঠে উঠে যেতাম। অনেক সময় একসঙ্গে দু-তিনজন উঠতাম। আমাদের পিঠে তুলে বিশু সামনের উঠোনটায় ঘুরে বেড়াতো।

বিশুকে আমরা একটা আশ্চর্য খেলা শিখিয়েছিলাম। দাদা তাকে সামনের দু'পা ধরে উঁচু করে হাঁটাতো, পরে ছেড়ে দিলে সে একা-একাই দু'পা সামনে তুলে পিছনের দু'পা দিয়ে কয়েক কদম হেঁটে যেতে পারতো। ভারি হাস্যকর ছিলো বিশুর সেই হাঁটার ভঙ্গি, কিন্তু শেষের দিকে একটু তুড়ি দিলেই বিশু দু' পায়ে দু' কদম অন্তত হাঁটতো। যে কোনো সার্কাসের মালিক তাকে দেখলে নিশ্চয় লুফে নিতো।

ফুটবল আর ক্রিকেট—মানে আমাদের ওখানকার ব্যাটবল। এই দু'রকম খেলারই ভক্ত ছিলো বিশু। শীতের দিনে যখন সারাদিন আমরা ব্যাটবল খেলতাম, খেলার মাঠে আমাদের পিছনে পিছনে বিশু যেত, সারাক্ষণ মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতো, আমরা সন্দেহ করতাম বাউন্ডারি, ক্যাচ-আউট এই সমস্ত ব্যাপারও বিশু ধরতে পারতো।

গরমের দিনের বিকেলে ফুটবল উঠোনে নামিয়ে পাম্প করা শুরু হলেই বিশু ব্যাপারটা বুঝে

নিতো, সে চনমনে হয়ে উঠতো। আমাদের আগে আগে আদালত কাছারির পিছনের মাঠে চলে যেত, যেন তারই টিম, সেই ক্যাপ্টেন, ম্যানেজার কিংবা কোচ, আমরা দল বেঁধে তার পিছে বল নিয়ে চলতাম।

ফুটবল ম্যাচ হত ঐ আদালত কাছারির পিছনের মাঠে। এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়ার, কখনো খালের এপারের সঙ্গে ওপারের ছেলেদের, কখনো পুকুরের দক্ষিণ তীরের বাসিন্দাদের সঙ্গে উত্তর তীরের বাসিন্দাদের। আমরা ছিলাম আদালত পাড়ার, একবার থানাপাড়ার সঙ্গে খেলায় খুব গোলমাল, মারামারি। মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে বিশু কী বুঝলো কে জানে, তখন সে তীক্ষ্ণশৃঙ্গিণী নধরকায়া সোমত্ত যুবতী, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো মাঠের মধ্যে শিং উঁচিয়ে, মুহূর্তের মধ্যে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো, আমাদের বিপক্ষের সবাই প্রাণভয়ে নিজেদের পাড়ার দিকে ছুটতে লাগলো, বিশু অনেক দূর ছুটে তাদের তাড়া করে চৌরাস্তা পর্যন্ত গিয়ে তারপর ছেড়ে দিলো।

পরে বলছি, বিশুর এই ব্যাপারটা থানাপাড়া কিন্তু সহজভাবে নেয়নি। প্রত্যেক দিন দুপুরবেলা বাড়ির সবাই যখন ইস্কুল, কাছারি, অফিসে, বিশু তার মাটির গামলা থেকে সেদিনের ভাতের ফ্যানটুকু খেয়ে সঙ্গে কিছুটা আগের রাতের বাসি ভাত ডাল বা নিরামিষ তরকারি—তাই দিয়ে লাঞ্চসেরে পরিক্রমায় বেরোতো।

সব জায়গায় ঘুরতো সে। ফেরিঘাটে, জেলখানার সামনের রাস্তায়, থানার মাঠে, আড়াই-আনি বাজারে, ছেলেদের স্কুলে, মেয়েদের কলেজে, সিনেমা হলের পিছনে—সব জায়গায় সে চরে বেড়াতো। যেমন ধর্মের ষাঁড় থাকে, সে ছিলো ধর্মের গাইগরু। শহরসুদ্ধ লোক তাকে চিনতো, অনেক সময় আমাদের বাসায় লোকে বিশুকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতো, 'সেকি ? এ গরুটা আপনাদের নাকি ?'

লোকেরা বলেছে, হাটের দিন অশ্বত্থতলার গোহাটায় গিয়ে বিশু নাকি গরু ছাগলের বেচা-বেচা মনোযোগ দিয়ে দেখে।

বিশুর কখনো কোনো দড়ি বা খোঁটা ছিলো না। দুর্বল, অসুস্থ বাছুর হয়ে সে এসেছিলো আমাদের বাড়িতে। তাকে বাঁধার কথা সে সময়ে কিংবা তার পরে কেউ কখনো ভাবেনি।

তার আচার আচরণও ছিলো অন্য রকমের, হঠাৎ হঠাৎ বিনা কারণে শূন্যে একটা লাফ দিয়ে লেজ খাড়া করে তুলে বিদ্যুৎ-গতিতে সোজা ছুটে যেত, তখন তার সামনে কেউ থাকলে মুশকিল, খুনজখম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। দু-চারবার যে তেমন ঘটনা ঘটেনি তা নয়, আমাদের বেশ বিব্রত হতে হয়েছে। গুনাগার দিতে হয়েছে সেজন্যে।

বিশু আরেকটা গোলমাল করতো। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় সে কালীবাড়িতে যেত, সারাদিনের ফুল বেলপাতা কালীবাড়ির ডোবার ধারে ফেলা হতো, সেখানে গিয়ে সব গোগ্রাসে খেয়ে নিয়ে চর্বিতচর্বণ করতে করতে মন্দিরের সামনে চলে আসতো। যতক্ষণ কাঁসর ঘণ্টা, আরতি চলতো ঠিক আছে, কিন্তু সবশেষে সমবেত ভক্তিমতীরা যখন উলুধ্বনি দিতো, শাঁখ বাজাতো, বিশুও হাম্বা-হাম্বা করে উঠতো।

এ রকম ধর্মপ্রাণা গাভী একালের কোনো তদন্তশীল সাংবাদিকের সুনজরে পড়লে অবশ্যই অমর হয়ে যেত। এক সুপ্রাচীন বৃদ্ধ সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময়ে কখনো কখনো কালীবাড়িতে আসতেন। তিনি বিশুকে প্রণাম করবেন বলে ভাবতেন, কিন্তু ঠিক কোন পায়ে প্রণাম করা

উচিত সেটা না জানা থাকায়, বিশু হামবা-হামবা করার পরই তাকে হাতজোড় করে নমস্কার করতেন।

বিশু অবশ্য এ সব কিছুর পরোয়া করতো না। এর পরেই সে বাড়ি ফিরে আসতো। রান্নাঘরে তখন পিতলের কেরোসিন-কুপি জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখতো কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে কিনা। তার পরে উঠোন দিয়ে এসে বাড়ির মধ্যের বারান্দার পাশে আসতো। সেখানে সন্ধ্যাবেলায় শীতলপাটি বিছানো হত, অতিথি অভ্যাগত এলে বাড়ির মেয়েরা সেখানে বসে গল্পগুজব করতো। বিশু একবার দেখতো পাড়াপড়শী, আত্মীয়কুটুম কেউ বেড়াতে এসেছে কিনা, তারপরে কাছারিঘরে মক্কেল-টক্কেল কি রকম এসেছে, দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে সেটা দেখে নিত।

এরপর শুরু হত তার গোপন অনুসন্ধান। বাড়ির আনাচে-কানাচে এপাশে ওপাশে নিঃশব্দে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াতো। অন্ধকারে কালো গরু প্রায় সম্পূর্ণ মিলে যেত, শুধু আমরা চেষ্টা করলে দেখতে পেতাম তার কপালের সাদা চাঁদ জলের মধ্যে পদ্মপাতার মত অন্ধকারে ভাসছে।

বিশু কিন্তু অনেক কিছু দেখতে পেত। দালান ছাড়া উঠোনের চারপাশে আমাদের বাড়িতে যে ঘরগুলো ছিলো, সে সবই টিনের চালা। রান্নাঘর, কাছারিঘরও তাই। আমাদের রান্নার ঠাকুর রাতে আফিম খেত, সে সন্ধ্যাবেলা রান্না সাঙ্গ হয়ে গেলে গোবরকে বাজারে আফিম আনতে পাঠিয়ে সেই ফাঁকে গোবরের বউ সোনামণির ঘরে ঢুকে যেত। বিশু ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিলো। একদিন গোবর আফিম নিয়ে ফিরেছে, ঠাকুরকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না, সে সরল প্রকৃতির বোকাসোকা মানুষ, ভাবতেই পারছে না তারই ঘরে ঠাকুর ঢুকেছে, এ ধরনের পাপকর্ম সে কল্পনাই করতে পারে না।

ঠাকুরকে বিশুই ধরে ফেললো। গোবর ফিরে এসে যখন ঠাকুরকে খুঁজছে, তখন সে সোনামণির ঘরের আগল আটকিয়ে হামবা-হামবা করে চেঁচাচ্ছে। কী হয়েছে দেখতে গিয়ে গোবর যা আবিষ্কার করে, সেটা তার পক্ষে সম্মানজনক নয়।

আমাদের ওদিকে রান্নার ঠাকুর সহজে পাওয়া যায় না বলে এই ঘটনার পরেও ঠাকুরকে তাড়ানো হয়নি। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সোনামনিকে বিশুর গোবর প্রায় একপোয়া খেয়ে বিশুদ্ধ হতে হয়েছিলো। ব্যাকরণে দুর্বল আমি, এই সময়ে ভাবতাম বিশুদ্ধ শব্দের উৎপত্তি বিশু থেকে।

সে যা হোক, সেই থানাপাড়ার খেলার ঘটনার পর বিশু একটা বিপদে পড়লো। একদিন সন্ধ্যাবেলা শহরে চরতে বেড়িয়ে বিশু আর ফিরলো না।

সন্ধ্যাবেলা আমরা বিশেষ খেয়াল করিনি, কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন দেখা গেল বিশুর ঘর ফাঁকা, বাড়িময় রটে গেলো বিশু বাড়ি ফেরেনি। সবাই আশঙ্কা করলো বিশুকে গোহাটায় নিয়ে কেউ বেচে দেয়নি তো! কিন্তু আগের দিন তো হাটবার ছিলো না।

খোঁজ। খোঁজ। অনেক বেলায় খবর পাওয়া গেলো, থানার সামনের বকুলতলা থেকে থানাপাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে বিশুকে ধরে কাল খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

খোঁয়াড়ে গরু ছাগল জমা দেওয়ার একটা লাভজনক দিক আছে। খোঁয়াড়ের মালিক প্রতিটি জীবজন্তু খোঁয়াড়ে জমা দেওয়ার জন্য কিছু পয়সা দেয় লোভ দেখাতে, আরো জীবজন্তু যাতে জমা পড়ে। কারণ যত জন্তু খোঁয়াড়ে ঢুকবে, খোঁয়াড়ের মালিকের আয় তত বাড়বে। গরু, মোষ,

ছাগল, ইত্যাদি দিন প্রতি আলাদা আলাদা রেট। পশুর মালিককে পশু ছাড়িয়ে আনতে বেশ জরিমানা দিতে হয়।

খবর পাওয়ামাত্র দাদা গোবরের সঙ্গে গিয়ে বিশুকে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে আনলো। কিন্তু খোঁয়াড়ের যা জরিমানা, তার থেকে দু'টাকা বেশি দিতে হলো।

খোঁয়াড়ের মালিক বলেছে, খোঁয়াড়ে থাকাকালীন ঐ একদিনের মধ্যে বিশুর ডাক ওঠে। তখন কামোত্তেজিতা সেই গাভীকে খোঁয়াড়ের মধ্যে আটকিয়ে রাখা অসম্ভব-হয়ে পড়ায় সে তার নিজের ষাঁড় নিযুক্ত করে। সেই ষাঁড়ের মজুরি দু'টাকা। সে যে মিথ্যে বলেনি, যথাসময়ে সন্তান প্রসব করে বিশু প্রমাণ করবে। আর যদি তা না হয়, তবে সে টাকা ফেরত দেবে।

মাস কয়েকের মধ্যে বোঝা গেলো বিশু সন্তানসম্ভবা। সেই সময়ে একদিন নায়েবমশায় আসতে বাবা তাকে বলে দিলেন, 'বিশুর বাচ্চা হবে। আপনি ওকে এখান থেকে এখন গ্রামে নিয়ে যান। গরুর বাচ্চা হওয়ার সময় কোনো জটিলতা হলে সাহায্য করতে পারে এমন অভিজ্ঞ লোক আমাদের এখানে নেই। আর এ অবস্থায় বেশি হুটোপাটি না করে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শান্তভাবেই থাকা ভালো।'

গোবর নায়েবমশায়ের সঙ্গে গিয়ে বিশুকে পৌঁছে দিয়ে এলো। সেটা বোধহয় শীতের আরম্ভ, রাস্তাঘাট শুকনো। বিশুর গলায় দড়ি বেঁধে গোবর নিয়ে গেলো। যাওয়ার আগে তাকে তার প্রিয় ভাতসুদ্ধ ফ্যান এক গামলা খাওয়ানো হলো। তার সাদা কপালে লাল সিঁদুরের টিপ দেওয়া হলো।

আমরা নদীর ঘাটের রাস্তা পর্যন্ত বিশুকে এগিয়ে দিলাম। অনেক দূর পর্যন্ত তার গলার ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ শোনা গেলো, দু'-একবার সে পিছন ফিরে আমাদের দিকে তাকালো, তবে বিনা আপত্তিতেই গেলো।

কয়েকদিন পরে একজন লোক এলো নায়েবমশায়ের কাছ থেকে, বিশু আমাদের বাড়িতে ফিরে এসেছে কিনা জানতে, সে নাকি ওখানে যাওয়ার পরদিন থেকেই নিরুদ্দেশ। কোথাও খোঁজ করে পাওয়া যায়নি। তবে একজন বলেছে, ঐ রকম একটা চাঁদকপালি গরুকে শহরের রাস্তা ধরে একা একা যেতে দেখা গেছে।

বিশু বোধ হয় ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলো আমাদের বাড়িতে। কিন্তু সে এলো না, দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে গেলো। বিশুর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। নায়েবমশায় লোক লাগিয়ে আশেপাশের গ্রামে-ঘরে অনুসন্ধান করালেন, কিন্তু বিশুর কোনো খবর পাওয়া গেলো না।

ক্রমশ আমরাও ভুলতে বসেছিলাম। শুধু রাস্তাঘাটে কেউ কেউ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করতো, 'তোমাদের সেই গরুটার কী হলো?'

আমরা বলতাম, 'হারিয়ে গেছে।'

পরের বছর রথের মেলায় যাচ্ছি নৌকো করে আমরা বাড়ির সবাই, সেদিন আবার গোহাটারও দিন। বিকেলে রথের মেলা বলে সকাল সকাল গোহাট ভেঙে গেছে, আমরা যখন ছোট নদীর বাঁকে বড় নদীর মুখে এসে পড়েছি, দেখি আমাদের পাশ দিয়ে খুব দ্রুত যাচ্ছে গরুর পাইকারদের ছইখোলা বড় নৌকা, সেটা ভর্তি গরু ছাগল।

হঠাৎ দাদা প্রথম দেখলো, 'ঐ তো আমাদের বিশু না?' অনেক গরুর মধ্যে একটা চাঁদকপালী

কালো গরু, রোগা, এই ক'মাসে পাঁজরের হাড় বেরিয়ে গেছে। তার কোলের কাছে একটা সাদা ধবধবে বাছুর, সেই ছোটবেলার লক্ষ্মীর মত।

আমি আর দাদা চিৎকার করে ডাকলাম, 'বিশু, বিশু।' পাশের নৌকোটা তখন অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে, সেটা হাওয়ার মুখে যাবে, বড় একটা বাঁশের মাস্তুল বেয়ে উঠে একটা লোক পাল খাটাচ্ছে।

আমাদের গলার স্বর শুনে হঠাৎ আনমনা ভাব ভেঙে বিশু কান খাড়া করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, অনেক পেছনে আমাদের নৌকোটা তার চোখে পড়লো না। তবুও হঠাৎ সে সেই পরিচিত 'হাম্বা-হাম্বা' করে ডেকে উঠলো।

ততক্ষণে পাইকারদের নৌকোর পালে বাতাস লেগেছে। বড় নদী দিয়ে জোরে ছুটে যাচ্ছে। আমরা যাবো অন্য পাশে, যেখানে রথের মেলা। তবু আমরা আমাদের নৌকোর মাঝিদের বললাম, 'ঐ নৌকোটাকে তাড়াতাড়ি চালিয়ে গিয়ে ধরতে হবে। ওটায় আমাদের গরু-বাছুর রয়েছে।'

আমাদের নৌকোর মাঝি কিছুতেই রাজি হলো না, বললো, 'ওটা যমুনার চরের পাইকারদের নৌকো, মাঝনদীতে ওদের ধারে-কাছে ঘেঁষলে লগি দিয়ে পিটিয়ে লাশ জলে ফেলে দেবে।'

ততক্ষণে পাইকারদের নৌকো অনেক দূরে চলে গেছে। অত গরু-বাছুরের মধ্যে বিশুকে আর ভালমত আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আমরা বিশুর গলার সেই কাঁসার ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ শুনতে পেলাম। নদীর বাতাসে ভেসে আসছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে সেই ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেলো না।

এখনো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি। এখনো একটু আনমনা হলেই সেই ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ শুনতে পাই।

পাটনার দাদুর বাক্স

পুরনো একটা বার্লির কৌটো। কৌটোর মুখটা শক্ত হয়ে আটকিয়ে আছে। কৌটোটার সারা গায়ে জং ধরেছে। অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বছরের পুরনো হবে।

কৌটোর গায়ে ইংরেজিতে নীল অক্ষরে সাদা টিনের জমির ওপরে বার্লির নাম লেখা, নিচে বার্লি কোম্পানির মালিকের লম্বা সই ও তার ওপরে তাঁরই ছোট ফটো। এক সময় এই বার্লিটা খুব বিখ্যাত ছিল। ঘরে ঘরে ব্যবহার হত।

সে ছিল বার্লির যুগ। কতরকমের বার্লি যে পাওয়া যেত বাজারে। ছোট শিশুদের তখন দুধ বাদ দিলে বার্লি ছাড়া আর কোনো খাবার ছিল না। তা ছাড়া সর্বত্র ছিল ভয়াবহ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার রোগীদের ভাত খাওয়া বারণ ছিল। এমন কি জ্বর ছেড়ে গেলেও অনেকে বহুদিন খেত বার্লি। সেটাই ছিল শিশুর একমাত্র খাদ্য, রোগীর একমত্র পথ্য। ছোটবেলায় আমরা কত যে বার্লি খেয়েছি। গরম জলে অল্প নুন-লেবু বা দুধ চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া সেই পানীয় খেতে

খেতে আমাদের অরুচিকর ধরে গিয়েছিল। তবু এতদিন পরে এখন পুরনো বার্লির কৌটোটা দেখে লেবু-বার্লির জলের সেই পুরনো স্বাদের স্মৃতিটা যেন অরুচির মনে হল না। বরং অনেক পুরনো কথা স্মরণে এসে মনটা কেমন আনচান করে উঠল।

বার্লির কৌটোটা পেলাম পাটনার দাদুর বাক্সের মধ্যে। বাক্সটা বহু বছর আমাদের বাথরুমে ওপরে বক্সরুমের মধ্যে পড়েছিল। শীতের লেপ-কম্বল বছর বছর শীত ফুরিয়ে গেলে ওই বক্সরুমে রাখা হয়। এবার হঠাৎ কী মনে হল, লেপ-কম্বলগুলো তোলার আগে ভাবলাম, বক্সরুমটা অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি, এবার একটু গোছাই।

অনেক ভাঙাচোরা ভুলে-যাওয়া জিনিস বেরোল বক্সরুমটার অন্ধকার থেকে। তাতাইয়ের ছোটবেলার ট্রাই-সাইকেল, মিনতির পুরনো হারমনিয়াম। বিজন একবার লখার মাঠের ছেলেদের কাছ থেকে একটা লোহার তরোয়াল কিনেছিল, আমি দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়ে ওই বক্সরুমে লুকিয়ে রেখেছিলাম। টুকটাক এইরকম কত দিনের কত জিনিস।

এরই মধ্যে পাটনার দাদুর বাক্সটাও ছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম বাক্সটার কথা, পাটনার দাদুর কথা।

বাক্সটায় একটা ছোট সস্তার তালা লাগানো। নিচে নামিয়ে একটা হাতুড়ি দিয়ে জোরে আঘাত করতেই পুরনো তালাটা খুলে গেল। বাক্সের ডালাটা তুলে দেখলাম নানা ধরনের ছোটখাটো টুকটাক জিনিসপত্র, কোনোটাই তেমন দামী কিছু নয়। কিংবা এমন হতে পারে, এগুলো আমার চোখে এখন মোটেই দামী মনে হচ্ছে না. কিন্তু পাটনার দাদুর কাছে এগুলোর আলাদা মূল্য ছিল।

আমার ছোটবেলা থেকে পাটনার দাদুকে আমাদের বাসায় দেখে আসছি। বাইরে কাছারিঘরে একটা তক্তাপোশে শুতেন। দিনের বেলায় মাথার কাছে মশারি-বিছানা গোটানো থাকত। তখন লোকজন কাছারিঘরে এলে ওই তক্তাপোশটায় বসত। তক্তাপোশটার মাথার দিকে বিছানার পাশে পাটনার দাদুর এই বাক্সটাও থাকত।

পাটনার দাদু আমাদের খুব নিজেব আত্মীয় ছিলেন তা নয়। তিনি ছিলেন আমার এক কাকিমার মামা। পাটনায় সরকারী চাকবি কবতেন যৌবনে। পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটাযার করে নিজের গ্রামে বসবাস করতে ফিরে যান। বিয়ে করেননি, কিন্তু ভাই-ভাইপোদের সঙ্গে এক সংসারে বেশিদিন পোষায়নি। আমাদের গ্রাম আর ওঁদের গ্রাম একটা ছোট নদীর এপার-ওপার। একদিন সকালবেলা এক পয়সায় খেয়া পার হয়ে বাক্সটা নিয়ে ভাইদের ওপর গজগজ করতে করতে আমাদের বাসায় এসে যে উঠলেন, আর কোথাও গেলেন না। তাঁর নিজের সরকারি পেনসনের সামান্য কিছু আয় ছিল, তাতে তাঁর টুকটাক খরচ চলে যেত। দু'বেলা আমাদের বাসায় খেতেন আর কাছারিঘরে শুতেন।

বিনিময়ে পাটনার দাদু আমাদের লেখাপড়া একটু দেখতেন, বাজারে যেতেন। আমাদের মেলাটেলায় নিয়ে যেতেন। কেউ বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল কবলে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে তদ্বির-তদারক করতেন পাটনার দাদুই। আমাদের অল্প কিছু ক্ষেতজমি ছিল, বাড়িতে কয়েকটা আম-কাঁঠাল-লিচু এইসব ফলের গাছ ছিল, কালক্রমে এ সমস্ত দেখাশোনার ভার পাটনার দাদুর ওপরেই বর্তেছিল।

পাটনায় আগে কাজ করতেন, তাই আমরা বলতাম পাটনার দাদু। সম্বোধনটা চালু হয়েছিল আমার ঠাকুমা তাঁকে পাটনার বেয়াই বলতেন সেই সূত্রে।

পাটনার দাদু আমাদের বাড়ির সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন। তিনি যে নিজের লোক নন, এটা টের পাইনি ছোটবেলায়। যে কাকিমার সম্পর্কে তিনি আমাদের বাসায় এসেছিলেন, সেই কাকিমাও খুব অল্পবয়সে মারা গেলেন, পাটনার দাদু আসার দু'এক বছরের মধ্যেই। পাটনার দাদু কিন্তু আমাদের বাসায় রয়ে গেলেন।

একদিন দেশ ভাগ হল। আমাদের বড় সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সবাই যে যার মত যে যেখানে পারল ছড়িয়ে পড়ল। দেশের বাড়িতে আমাদের নিজের বলতে আর কেউ রইল না। শুধু ওই পাটনার দাদু ছাড়া। তিনি একা আমাদের ছন্নছাড়া ভিটে আগলে পড়ে রইলেন।

তারপর কত কাণ্ড হল। দাঙ্গার পর দাঙ্গা, বন্যার পর বন্যা। কখনো দুর্ভিক্ষ, কখনো মিলিটারি রাজত্ব। গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেল। কী করে যে পাটনার দাদু টিকে রইলেন কে জানে। তবে শেষ পর্যন্ত পাটনার দাদুকেও আসতে হল। সেটা সেই বাংলাদেশ যুদ্ধের বছর। সবে গোলমাল শুরু হয়েছে, আমরা সারাক্ষণ রেডিওতে কান পেতে রয়েছি। একদিন রাত সাড়ে দশটার সংবাদ শুনে সবে শুয়েছি, হঠাৎ দেখি দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে আর আমার ছোটবেলার নাম 'খোকন-খোকন' করে ডাকছে।

দরজা খুলে দেখি বুড়োমতন কিছু চেনা-চেনা আদলের কে একজন বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে। পাটনার দাদুর বয়স তখন আশি পার হয়ে গিয়েছে, তবু শক্ত চেহারা। এক মুহূর্ত পরেই চিনতে পারলাম।

সেই একই বাক্স। যে বাক্স নিয়ে পঁচিশ বছর আগে তিনি আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। এখনকার এ বাড়ি সে বাড়ির মত নয়, পণ্ডিতিয়ার ছোট বাসা, তবু পাটনার দাদুকে জায়গা দিতে অসুবিধে হল না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত পাটনার দাদু বেঁচে রইলেন না। সেই বছরই মারা গেলেন। বাক্সটা পড়ে রইল বাইরের ঘরে। বেঁচে থাকতে একেকদিন বাক্সটা খুলে ওই বার্লির কৌটোটা খুলে আমাদের শুঁকতে বলতেন।

পাটনার দাদু যখন পালিয়ে আসেন, তখন ভরা বসন্ত। আমের মুকুল সদ্য গুটি হচ্ছে। আমাদের উঠোনের সবগুলো আমগাছে যত মুকুল হয়েছিল সে বছর, তার থেকে কিছু ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওই বার্লির কৌটোয় ভরে এনেছিলেন। আমের বোলগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঘ্রাণ ছিল। একেক সময় বাক্স খুলে কৌটোটা বার করে ওই শুকনো মুকুলের ঘ্রাণ নিতেন, আমাদেরও ডাকতেন আমাদের শৈশব-সৌরভের অংশ নিতে।

আজ এতদিন পরে পাটনার দাদুর বাক্স খুলে বার্লির কৌটোটা দেখে এত কথা মনে পড়ল। কৌটোর মুখটা খোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না, জং লেগে শক্ত হয়ে আটকিয়ে গেছে।

হাতুড়ি মেরে খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কি ভেবে থেমে গেলাম। এতদিন পরে সেই আমের মুকুলের সৌরভ ওই কৌটোর মধ্যে যদি না থাকে।

চারু পিসিমা আমাদের চাঁদ ধরার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। সুন্দর মন্ত্রটা ছিল, এখনো আবছা আবছা মনে আছে, পুরোটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। শুধু প্রথম লাইনটা মনে আসছে, দু'বার বলতে হত প্রথম লাইনটা।

চাঁদ-চন্দ্র-চন্দ্রমা,
চাঁদ-চন্দ্র-চন্দ্রমা।

বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এই মন্ত্র পড়ে ঠিক দু'দণ্ডের জন্যে আকাশের যে কোনো জায়গায় চাঁদকে স্থির ধরে রাখা যেত। এক দণ্ড মানে চব্বিশ মিনিট, দু'দণ্ড হল এক ঘন্টার কিছু কম, পৌনে এক ঘণ্টার মতো।

সন্ধ্যাবেলা পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে একটা কালো পাথরের থালায় জল নিয়ে আমরা আমাদের দালানের পূবদিকের খোলা বারান্দায় এসে বসতাম। সামনে ছিল পর পর তিনটি কাঁঠাল গাছ আর সজনে গাছ। তিথি ও সময়মত নানারকমের চাঁদ উঠে আসত ডালপালা, পাতার আড়ালে। আমরা পাথরের থালাটা বারান্দার এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসাতাম, যেখানে ঐ কালো পাথরের জলে একটা ঝকমকে ছায়া পড়ত চাঁদের। তখন ঐ জলের ছায়ার মধ্যে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে তিনবার চাঁদ-চন্দ্র-চন্দ্রমার মন্ত্রটা খুব নিষ্ঠা নিয়ে বলতে হত। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদটা আটকিয়ে যেত গাছের ডালপালার মধ্যে। একেবারে নট-নড়ন-চড়ন নট-ফট্, পাকা দু দণ্ডের জন্যে চাঁদ বেচারা বন্দী হয়ে যেত আমাদের কাছে। তারপর দু-দণ্ড শেষ হয়ে যেতে সন্ধ্যারাত পেরিয়ে যাওয়ার পর চাঁদ উঠে আসত গাছপালার ওপরে। আমরা তখন রান্নাঘরের মেজেতে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে কাঁসার বাটিতে দুধকলা দিয়ে ভাত খেতে খেতে দেখতাম, চাঁদ ডিঙিয়ে যাচ্ছে আমাদের পুরনো বাড়ির ছাদের কার্নিশ, বুড়ো নারকেল গাছের লম্বা মাথা।

চাঁদ ধরা ব্যাপারটা খুবই শৌখীন ছিল, তখনকার আমাদের ভাষায় যাকে বলে হাউস করে মানে শখ করে আমরা চাঁদ ধরতাম।

চাঁদ-ধরার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি ছিল তারা বাঁধা। আমাদের সেই মধ্য বাংলার নদী আর জলার দেশে কী যে বৃষ্টি হত! বর্ষা শেষ হয়ে যেত তাও বৃষ্টি থামত না, কার্তিক মাসে কিংবা পৌষ মাসে বৃষ্টি এলে সে আর সহজে বিরাম হত না।

তখন আমরা তারা বাঁধতাম। সেটাও আমাদের চারু পিসিমাই শিখিয়ে ছিলেন।

এতকাল বাদে চারুপিসিমার নামটাই শুধু মনে আছে। চেহারাটা ভালো করে মনে পড়ছে না। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কদমছাঁট চুল, আর সাদা থান একটু একটু করে মনে আসছে, কিন্তু মুখটা মনে পড়ছে না।

চারুপিসিমা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। সে বাড়ির আর কারো কথা খেয়াল হচ্ছে না। একটা হুলো বেড়াল, একটা ভোলাকুকুর, কয়েকটা পায়রা আর কাজের লোক, এ সব ছাড়া সে বাড়িতে কাউকে বিশেষ দেখিনি।

সন্ধ্যাবেলা চারুপিসিমা এসে আমাদের বাড়িতে পূবের বারান্দায় বসতেন। মা-কাকিমার সঙ্গে গল্প করতেন। আমাদের চাঁদ ধরা, তারা বাঁধা শেখাতেন। আরও অনেক কিছু শিখেছিলাম

তাঁর কাছে। আমি যে পুরুষমানুষ হয়েও আলপনা দিতে শিখেছিলাম, আমকাসুন্দি বা পুতুলের জামা বানাতে পারতাম, সেও চারুপিসিমার জন্যেই।

আপাতত তারা বাঁধার কথাটা বলি। আমাদের সেই বৃষ্টির দেশে একটা কথা ছিল 'হেসে যায়, কেঁদে আসে'। বর্ষার সারাদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে, শেষ বেলায় পশ্চিমের দিকে মেঘটা একটু কেটে গেল, একটু হাসিমুখ দেখিয়ে সূর্য ডুবে গেল। দু'-একটা তারাও উঠল আকাশে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তা নয়। আজ হাসতে হাসতে সূর্য ডুবল, কাল কাঁদতে কাঁদতে সকালবেলা ফিরবে অঝোর বৃষ্টিতে।

এই 'হেসে যায় কেঁদে আসা'র একমাত্র প্রতিকার ছিল তারা বাঁধা। পিঁড়িতে ঘট বসিয়ে সেই ঘটে জল আর নারকেলপাতার কাঠি দিয়ে মন্ত্র পড়ে তারা বাঁধতে হত। কোনো অনাচার না হলে অব্যর্থ সেই মন্ত্র, পরদিন সকালে আর বৃষ্টি হত না। সূয হাসতে হাসতে ফিরে আসত ভোরের আকাশে।

চাঁদ ধরা, তারা বাঁধা এ সব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এ বয়েসে এ সব আর কার মনে থাকে?

আমাদের বাড়ির পাশের জমিতে একটা অনেক উঁচু বাড়ি উঠছে। চারতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। আরো উঠছে! গতকাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেখি ঘর জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে। জানলায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখলাম চারতলার মাথায় চাঁদ, আর একটু পরেই নিচে নেমে যাবে। জ্যোৎস্না আর এ ঘরে আসবে না। কয়েকদিন পরে যখন বাড়িটা আরো উঁচু হবে, আমাদের ঘরে আর জ্যোৎস্নার আলো একেবারেই আসবে না।

আমি আর কী করতে পারি! এ শহরে আমাকে কে আর জ্যোৎস্নার ইজারা দেবে? মন খারাপ করে বিছানায় শুতে আসছিলাম, হঠাৎ ছোটবেলার সেই চাঁদ ধরার কথা মনে পড়ল। আজ বিনা চেষ্টাতেই চারুপিসিমার মন্ত্রটা মনে পড়ল।

চাঁদ-চন্দ্র-চন্দ্রমা
আজ কিন্তু নাই ক্ষমা।
বন্দী থাকো দুই দণ্ড
আজ তোমার এই দণ্ড।।

চাঁদটার দিকে তাকিয়ে পরপর তিনবার মন্ত্রটা পড়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। আজ শেষবারের মত চাঁদটাকে দু দণ্ডের জন্যে জানলায় ধরে রাখলাম। এই শেষ।

কালুকাক

'কালু' নামটা শুধু যে মানুষেরই হয় তা নয়। অনেক সময় গৃহস্থবাড়ির কালো রঙের পোষা কুকুরকে কালু নামে ডাকা হয়; যেমন লাল রঙের কুকুরকে সম্বোধন করা হয় লালি বা লালু বলে।

আমাদের বাড়ির কালু কিন্তু কুকুর বা মানুষ ছিল না। আমাদের কালু ছিল একটা জন্মান্ধ কাক।

কালু জন্মেছিল আমাদের ভাঁড়ার ঘরের পিছনে এক আদ্যিকালের বিশাল মহানিম গাছের

ডালের বাসায়। সেই গাঢ় সবুজ পাতার মহানিম গাছের ডালে ডালে ছিল সাত রাজ্যের কাক আর শালিকের বাসা। চৈত্র-বৈশাখে কাকের ডিম ফেটে বাচ্চা বেরুতো। বাসার ভেতর থেকে চিঁচিঁ করে বাচ্চাগুলো রোমহীন গলা বাড়িয়ে নিজেদের মা-বাবার কাছ থেকে খাবার চাইত। রাক্ষুসে খিদে ছিল তাদের। কাকের ছানাদের মা-বাবারা খাবার সংগ্রহ করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

সে যা হোক, কাকেদের সমাজ-ব্যবস্থা খুব নিষ্ঠুর। কোনো অসদাচারী, পঙ্গু বা দুর্বল সঙ্গীর প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র মমতা নেই। তারা ঠুকরিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। মেরে ফেলতেও দেখা গেছে।

আমাদের কালুর মা-বাবা এবং প্রতিবেশী অন্যান্য কাকেরা প্রথমদিকে বোধহয় ধরতে পারেনি যে কালু জন্মান্ধ, একেবারেই চোখে দেখতে পায় না। কালু যখন একটু বড় হয়েছে, তখন একদিন আমার বড় ঠাকুমা খুব ভোরবেলা ভাঁড়ার ঘরের পাশের জবা গাছ থেকে পুজোর জন্যে ফুল তুলতে গিয়ে দেখেন, উঠোনে একটা বাচ্চা কাককে একদল কাক খুব নিষ্ঠুরভাবে ঠোকরাচ্ছে। বড় ঠাকুমা একটা পাটকাঠি দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাকগুলোকে তাড়ালেন। সেগুলো আশেপাশের ঘরের চালে আর গাছের ডালে বসে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

বাচ্চা কাকটা কিন্তু রীতিমত আহত হয়েছিল। প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল, চোখে দেখতে না পাওয়ার জন্যে উড়তে পারছিল না। আমার বড় ঠাকুমা নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। খুব বেশি মায়া ছিল তাঁর শরীরে। তিনি কাকের বাচ্চাটাকে তুলে নিলেন হাতে, নিয়ে আমাদের দালানের পিছনের বারান্দার এক কোণে যেখানে পুরনো ভাঙা আসবাবপত্র গাদা করে রাখা হত, তারই মধ্যে একটা তুলো-ছেঁড়া গদিওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

কাকের মত একটা অস্পৃশ্য প্রাণীকে ছোঁয়ার জন্যে সেদিন বড় ঠাকুমাকে সেই সাতসকালে পুকুরে গিয়ে একশো আটটা ডুব দিতে হয়েছিল। পুজোর ফুল সব ফেলে দিয়ে পাশের বাড়ি থেকে অন্য ফুল নিয়ে আসতে হয়েছিল। তা হোক। কাকের বাচ্চাটা কিন্তু বেঁচে গেল। সে সারাদিন ঠুকঠুক করে দালানের বারান্দায় সিঁড়িতে হেঁটে বেড়াত। চোখে দেখতে পায় না বলে উড়তে সাহস পেত না। সন্ধ্যা হওয়াটা কী করে টের পেত, বোধ হয় অন্য কাকেদের চেঁচামেচি শুনে, সে তখন গুটিগুটি এসে তার চেয়ারের ছেঁড়া গদির ওপরে আশ্রয় নিত। বাড়ির বেড়ালেরা কেন যেন তাকে কেউ মারার চেষ্টা করেনি। আর যে কাকেরা তাকে ঠুকরিয়ে ছিল, সে বারান্দায় আশ্রয় নেওয়ার পরে তাকে নিয়ে তারাও আর মাথা ঘামায়নি।

বড় ঠাকুমা কাকের বাচ্চাটার নাম রাখলেন কালু। ধীরে ধীরে কালু আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গেল। আহ্লাদী নামের গরু, ভোলা নামের কুকুর, আর রুপো নামের একটা সাদা বেড়ালের সঙ্গে কালুকাকও আমাদের সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে সে চোখে না দেখেই বড় ঠাকুমাকে চিনে ফেলল। বড় ঠাকুমা বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলে সে কী করে যেন বুঝতে পারত; তাড়াতাড়ি ছুটে বড় ঠাকুমার পাশে পাশে হাঁটত। খিদে লাগলে বড় ঠাকুমার ঘরের জানালার নিচে গিয়ে 'কঃ, কঃ, কঃ' করে ডাকত। বারান্দার এক কোণায় সিঁড়ির নিচে কালুকে খাবার দেওয়া হত। কুকুর, বিড়াল বা গরুর যত খাবার হয়, তার মধ্যে খড় আর ঘাস বাদ দিয়ে সবরকম খাবার কালু খেত।

রাতে বাড়ির উঠোনে কোনো লোক ঢুকলে সবচেয়ে আগে কালু টের পেত। সে 'কঃ কঃ' করে ডেকে সবাইকে সজাগ করে দিত। আরো কয়েকটা সঙ্কেত আওয়াজ ছিল। দুপুরে

যখন বাড়ির বাজার আসত সে চেঁচিয়ে জানান দিত, ডাকপিয়ন এলেও ঐ রকম চেঁচাত।

বড় ঠাকুমার পরেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় কালুর। তখন আমার বছর দশ-এগারো বয়স। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই কালু কিভাবে যেন বুঝত, রীতিমত দৌড়ে আমার কাছে আসত। আমি যখন রান্নাঘরে খেতে বসতাম, সে এসে রান্নাঘরের সামনে উঠোনে দাঁড়াত। যখনই বাইরে থেকে বাড়ি ফিরতাম, কালু তার কর্কশ কণ্ঠ যথাসাধ্য মোলায়েম করে আমাকে অভ্যর্থনা জানাত।

ভালোই ছিল কালু আমাদের সঙ্গে, আমাদের সংসারে।

একদিন এক ফকির এল আমাদের বাড়িতে। ফকিরদের বাড়ির মধ্যে অবাধ যাতায়াত। সে কালুকে দেখে এবং কালু জন্মান্ধ শুনে তারপর তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে বলল যে, এটা হল ভূশণ্ডির কাক, ত্রিকালজ্ঞ পাখি। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই এর জানা।

ফকিরের কথা পাঁচকান হয়ে চাউর হয়ে গেল চারদিকে। তারপর থেকে ভিড় আর ভিড় আমাদের বাড়িতে। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসতে লাগল কালুকে দেখতে। এর অল্প পরেই একদিন অনেক রাতে কালুর চেঁচামেচি শোনা গেল। তারপরে বড় ঠাকুমার চিৎকার শোনা গেল, 'চোর চোর'। একটা লোক বারান্দা থেকে কালুকে চুরি করে নিয়ে গেল।

হৈ হৈ কাণ্ড। রৈ রৈ ব্যাপার। আমাদের পুরো বাড়ি, সর্বসাকুল্যে তেত্রিশজন সবাই জেগে উঠল। পরদিন থানায় এজেহার করতে গেল আমার দাদা আর ছোট কাকা। কিন্তু দারোগাবাবু কাক-চুরির ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না।

এ গল্পের আর সামান্য একটু শেষ অংশ আছে। এই ঘটনার বছর তিনেক পরে সন্তোষের রথের মেলায় গিয়ে দেখি, বাঁশের খাঁচায় একটা অন্ধ কাক নিয়ে এক জ্যোতিষী, তার কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, কাঁধে নামাবলী, সে লোকের ভাগ্য গণনা করছে। কাকটাকে দেখে কেমন চেনা-চেনা মনে হল। ভিড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'কালু! কালু'!

প্রথমে কাকটার কোনো ভাবান্তর হল না। কিন্তু দুবার ডাকবার পরে সে আড়মোড়া ভেঙে খাঁচার ভেতরে পাখা ঝেড়ে উঠে বসল। গলা উঁচু করে কী যেন, কাকে যেন খুঁজল, তারপর যতটুকু সম্ভব গলা নরম করে ডেকে উঠল, 'ক-ক-ক'। এখন বড় ঠাকুমা মারা গেছেন। দেশও ভাগ হয়ে গেছে। আমরা কে কোথায় যাব, তারও ঠিক নেই। আমাদের সংসারে ভাঙন শুরু হয়েছে। আমি আর কালুর ব্যাপার নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না। ধীরে ধীরে মেলার ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। মেলার অত হট্টগোলের মধ্যে কালুর 'ক-ক-ক' ডাক আমার পিছে ঘুরতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি মেলা থেকে বেরিয়ে এলাম।

জ্যাকব

সে প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। কিন্তু আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমরা কেন জ্যাকবকে পুষতাম।

জ্যাকব ছিল আমাদের পোষা ঘোড়া। কিন্তু সে আমাদের কোনওদিন কোনও কাজে লাগেনি। আমরা কেউ কোনওদিন তার পিঠে চড়ে কোথাও যাইনি। কোনও মালপত্রও তাকে দিয়ে কোনওদিন বহন করানো হয়নি। তবে একটা কুকুর গৃহস্থবাড়ির যে কাজে লাগে, জ্যাকব সে রকম কাজে লেগেছে। জ্যাকব যতকাল ছিল, বাড়িতে কোনওদিন চোর আসেনি। পাড়া-প্রতিবেশী, বাইরের লোকজন যারা জ্যাকবকে জানত, সবাই তাকে ভয় পেত। ভিখিরিরা রীতিমত সমীহ করত তাকে। এমনকি মহরমের সময় নিকারিপাড়ার যে তাজিয়া এসে আমাদের বাইরের উঠোনে ঢাল-সড়কি নিয়ে 'হায় হাসান হাস হোসেন' বলে বুক চাপড়িয়ে লড়াই দেখিয়ে টাকা নিয়ে যেত, তারা পর্যন্ত আসবার ঘণ্টা দু'এক আগে লোক মারফত আমার ঠাকুর্দাকে খবর পাঠাত, যাতে বুড়ো কর্তা তারা আসার আগে জ্যাকবকে বেঁধে রাখে।

জ্যাকবকে বেঁধে রাখা অবশ্য তত সহজ ছিল না। শুধু আমার ঠাকুর্দাকে আর আজিমাকে জ্যাকব একটু ভয় পেত, আর কাউকে সে মানুষের মধ্যে গণ্য করত না।

ঠাকুর্দাকে যে জ্যাকব শুধু ভয় পেত তা নয়। সে তাঁকেই মালিক বা প্রভু বলে ভাবত। ঠাকুর্দার প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অপরিসীম। প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সে একবার ভিতরের বারান্দার পাশ থেকে ঘাড় উঁচু করে ঠাকুর্দার শোয়ার ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখত ঠাকুর্দা ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা। আর প্রত্যেক ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর্দার ঘরের কাছে একবার চিঁহি চিঁহি হ্রেষাধ্বনি করে সে চরতে বেরোত।

আর আজিমার সঙ্গে জ্যাকবের সম্পর্ক ছিল নিতান্ত স্নেহের। আজিমা আমার বাবার দূর সম্পর্কের জ্যাঠাইমা, বালবিধবা। আমার বাবাও তাঁকে যেমন দেখেছেন, আমরাও তাঁকে তেমনই দেখেছি। সাদা থান, কদমছাঁট চুল, টকটকে গায়ের রঙ। কোনওদিন তিনি যুবতী ছিলেন না, কোনওদিন তিনি বুড়িয়েও যাননি।

আজিমা যখনই রান্নাঘরের বারান্দায় তরকারি কুটতে বসতেন, জ্যাকব এসে উঠোনে দাঁড়াত। তরকারি কুটতে কুটতে আলুর খোসা, বেগুনের বোঁটা, কপির ডাঁটা যা কিছু তিনি ছুঁড়ে দিতেন জ্যাকব নির্বিচারে তাই খেয়ে নিত। একবার আজিমার ছুঁড়ে দেওয়া মানকচুর মাথা অন্যমনস্কভাবে চিবিয়ে জ্যাকবের মুখ তিন-চারদিন ফুলে থাকে। তবুও সে উঠোনে এসে নিঃশব্দে আজিমার তরকারি কোটার সময় দাঁড়িয়ে থাকত। আজিমা নিজে থেকেও কখনও কখনও ডাকতেন জ্যাকবকে। হয়তো আধ কড়াই ডাল বেঁচে গেছে, কিংবা হাঁড়িতে রয়েছে অনেকটা বাড়তি ভাত। কুকুরকে যেভাবে ডাকে, আজিমা সেইভাবেই 'আয় আয় চু-চু' করে জ্যাকবকে ডাকতেন। বাড়ির বৌ তো, তাই গলা উঁচু করে ডাকতে পারতেন না, একমাথা ঘোমটা দিয়ে বাইরের উঠানের দরজার কাছে গিয়ে নিচু গলায় ডাকতেন। কাছাকাছি কোথাও থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকব চার পায়ে ছুটে আসত।

চার পায়ে কথাটা অবশ্য ঠিক হল না। জ্যাকব একটু খোঁড়া ছিল, কোনও একটা পায়ে। কিন্তু ঠিক কোন্ পায়ে, সেটা আমরা কখনই ধরতে পারিনি। জ্যাকব নিজেও জানত কিনা সন্দেহ।

কখনও দেখতাম, জ্যাকব সামনের ডান-পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, আবার কখনও হয়তো পিছনের বাঁ-পায়ে। হয়তো কাজ এড়ানোর জন্যে জ্যাকবের এটা এক ধরনের চালাকি ছিল। আবার এমনও হতে পারে, ওটা ছিল তার চলার স্টাইল। এমনিতেই আমাদের বাড়ির সবাই একটু বাঁদিকে খুঁড়িয়ে চলে। জ্যাকব হয়তো আমাদের দেখে দেখেই হাঁটার কায়দাটা রপ্ত করেছিল।

এসব অনেককাল আগেকার অল্পবয়সের কথা। জ্যাকবের সব স্মৃতি এখন আর তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু দুটো ছবি এখনও পরিষ্কার চোখে ভাসছে। একটা ছবি হল, আজিমার ডাক শুনে কাছারিঘরের পিছনের কচুর ঝোপ ভেঙে খোঁড়া পায়ে জ্যাকব ছুটে আসছে। আর দ্বিতীয়টাও আজিমাকে নিয়েই। কিন্তু সে দৃশ্যে আজিমা নেই। আজিমা তখন মারা গেছেন। কিন্তু জ্যাকবের সে বোধ নেই। আজিমার মৃত্যুর অনেকদিন পরে পর্যন্ত জ্যাকব সকালবেলায় আজিমার তরকারি কোটার সেই নির্দিষ্ট সময়ে রান্নাঘরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াতো।

আজিমা হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে বারান্দায় মাদুরে বসে পাড়া-প্রতিবেশী বৌ-ঝিদের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক গল্প করতে করতে বুকের ব্যথায় কাতর হয়ে যান। এবং অল্প পরেই মারা যান। সেদিন সন্ধ্যাতেই নদীর ঘাটে শ্মশানে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। বাড়ির লোকজন প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই শবযাত্রী হয়েছিল। সেই শববাহকের দলের সঙ্গেজ্যাকবও খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়েছিল। বাড়িতে আজিমাকে যখন উঠোনে নামানো হয়, একটু দূর থেকে মাথা উঁচু করে জ্যাকব সবকিছু ক্রিয়াকর্ম লক্ষ করতে থাকে। তারপর যখন শবযাত্রা রওনা হয়, জ্যাকব তাদের অনুসরণ করে শ্মশান পর্যন্ত আসে। সেখানে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আজিমাকে চিতায় ওঠানো হল, মুখাগ্নি করা হল, অন্ধকার শ্মশানে নদীর চাতালে দাঁড়িয়ে জ্যাকব সব দেখেছে। তারপর শেষরাতে চিতায় জল ছিটিয়ে সবাই যখন হরিধ্বনি করে ফিরে এসেছে জ্যাকবও তাদের সঙ্গে ফিরেছে, এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জ্যাকবের মৃত্যুবোধ ছিল না। সে বুঝতেই পারেনি কী হয়েছে। তা না হলে সে কি আর পরেরদিনই সকালে, রান্নাঘরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ায়, আজিমা তরকারি নিয়ে কুটতে বসেছেন এই আশায়।

দুই

জ্যাকব প্রথমে ছিল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ঘোড়া। ঠিক ম্যাকেঞ্জি সাহেবের নয়। সে ছিল মিসেস ম্যাকেঞ্জি অর্থাৎ ম্যাকেঞ্জি-মেমের ঘোড়া। আমরা দেখিনি, কিন্তু বড়রা দেখেছে জ্যাকবের পিঠে চড়ে ম্যাকেঞ্জি-মেম নদীর ধারের রাস্তায় টগবগ করে ছুটছেন। শুধু মেমসাহেবই নয়, জ্যাকবও নাকি তখন এমন খোঁড়া ছিল না, রীতিমত টগবগে ছিল।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব ছিলেন সাহেব কোম্পানির পাটের এজেন্ট। আমাদের এলাকা ছিল পাটের জন্যে ভুবনবিখ্যাত। কলকাতা আর হাওড়ার হুগলি নদীর দুপাশের পাটকলগুলির পক্ষে কেনাবেচা করার জন্যে বহু সাহেব আমাদের অঞ্চলে যেতেন ও থাকতেন। পাটগুদামের পাশের জমিতে রীতিমত টেকসই বাংলোবাড়ি বানিয়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেব অবশ্য পাকাপাকি ভাবেই বসবাস করতেন আমাদের শহরে।

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাংলোর হাতায় একটা মরসুমী ফুলের বাগান ছিল। শীতে সে বাগান ছেয়ে যেত জিনিয়া, ডালিয়া আর গাঁদা ফুলে। গাঁদাফুল ছিল তিন রকম। কুঁড়ি গাঁদা, সেগুলো

ছোটো আকারের, কুঁড়ির মতো—মনে হতো, এখও সম্পূর্ণ ফোটেনি। আর রক্তগাঁদা ছিল মাঝারি মাপের, তার পাপড়ি ছিল কালচে লাল রঙের। বড়, হলুদ রঙের বাগান আলো-করা গাঁদাফুল যেগুলো, সেগুলোকে বলা হত ভোলাগাঁদা।

কোন এক পাটের ব্যাপারির সঙ্গে টাকা লেনদেনের একটা বাজে মামলায় জড়িয়ে পড়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের কোম্পানি। কোম্পানির তরফে ম্যাকেঞ্জি সাহেব আমার ঠাকুর্দাকে উকিল রাখেন। সেই মামলার সূত্রেই এবং পরে আরও নানা কারণে ম্যাকেঞ্জি পবিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। খুব ছোট বয়সের কথা হলেও এখনও অল্পস্বল্প মনে আছে, সরস্বতী পুজোর সময় ঝুড়িভর্তি ডালিয়া, জিনিয়া আর গাঁদাফুল আমরা নিয়ে এসেছি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগান থেকে।

ম্যাকেঞ্জি-মেমকেও অল্প অল্প মনে আছে। বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে তিনি এসেছেন। মা-ঠাকুমাদের পক্ষে ভাঙা ও কাঁচা ইংরেজিতে আমার এক পিসি মেমসাহেবের সঙ্গে কথোপকথন চালাতেন, ঐ ইয়েস-নো-ভেরি গুড জাতীয় কথাবার্তা। তবে ম্যাকেঞ্জি-মেম চলে যাওয়ামাত্র সারা বাড়িতে গোবরজল ছেটানো হত। আর ম্যাকেঞ্জি-মেমকে চা দেওয়া হত যে-পেয়ালায় সে-পেয়ালা, রান্নাঘরে কেন, বাড়ির মধ্যেই ঢুকতে পেত না। সে-পেয়ালা থাকত কাছারি-ঘরে বইয়ের আলমারির মাথায়।

যুদ্ধ লাগল। তার কিছুদিনের মধ্যেই সাহেবরা চঞ্চল হয়ে উঠল। একদিন সারা জেলায় যেখানে যত সাদা চামড়ার সাহেব ছিল, তাদের মিটিং হল জেলাসদরে সাহেবি ক্লাবে। তারপর সাহেবদেব ঘব ভাঙতে শুরু করল। প্রথম রওনা হলেন মেমসাহেবরা, ছোট ছেলেপিলে নিয়ে দেশের দিকে। আবাব কেউ নার্স হয়ে বা অন্য কোনও কাজে যুদ্ধে গেলেন।

আগে গেলেন ম্যাকেঞ্জি-মেম। তাবপব একদিন ম্যাকেঞ্জি সাহেবকেও তল্পিতল্পা গুটিয়ে যুদ্ধে যেতে হল। তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রইল তাঁর বাংলো, আর অযত্নে নষ্ট হয়ে গেল ফুলের বাগান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বছব শীতের সময় একা একাই কিছু ফুল ফুটতো সে বাগানে। অনেকদিন পর্যন্ত আমবা দেখেছি।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব যুদ্ধে যাওযাব সময় অনেক জিনিসপত্র লোকজনদের বিলিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে জ্যাকবকে দিয়ে গেলেন আমার ঠাকুর্দার হাতে। যাওয়ার দিন সকালবেলা জ্যাকবকে লাগাম লাগিয়ে আমাদের বাড়িতে হাঁটিয়ে নিয়ে এল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সহিস। এসে জ্যাকবকে কাছারিঘরের বারান্দায় খুঁটিতে বেঁধে সহিস ঠাকুর্দাকে বলল, 'ম্যাকেঞ্জি সাহেব ভেজ দিয়া।'

ম্যাকেঞ্জি সাহেব বোধহয় ঠাকুর্দাকে এই উপহারের কথা আগেই বলেছিলেন, ঠাকুর্দা সহিসকে বললেন, 'ঠিক আছে, রেখে যাও।' ঠাকুর্দা কাছারিঘরে মক্কেলদের নথিপত্র দেখছিলেন, একবার উঠে এসে জ্যাকবকে দেখে গেলেন।

কিন্তু সারা বাড়িতে তখন ভীষণ উত্তেজনা। আমাদেব বাড়িতে কখনও কখনও গ্রামাঞ্চল থেকে কোনও কোনও মক্কেল ঘোড়ায় চড়ে আসত। চৈত্র মাসে ভাগচাষীরা ঘোড়ার পিঠে করে ফসলের ভাগ দিতে আসত। কিন্তু এ আমাদের একেবারে নিজেদের ঘোড়া।

একটু পরে ঠাকুর্দা আর বাবা আদালতে যাওয়ার আগেই ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিদায় নিতে এলেন। তিনি বললেন যে, 'এ খুব ভাল ঘোড়া। ভদ্র, শিক্ষিত। এর নাম জ্যাকব। কখনও কখনও

খোঁড়ায় বটে, কিন্তু যখন খোঁড়ায় না, তখন খুব ছোটে। আমার মেমসাহেবের খুব প্রিয় ঘোড়া ছিল এটা। খুব বুদ্ধি এ ঘোড়ার।'

ম্যাকেঞ্জি সাহেব জ্যাকবকে রেখে চলে গেলেন। এর পরে তাঁর আর কোনও খোঁজ আমরা পাইনি। কিন্তু জ্যাকব আমাদের বাড়িতে রয়ে গেল। প্রথম প্রথম কিছুদিন নদীর ধারে তার পুরনো মনিবের বন্ধ বাড়িতে গিয়ে জ্যাকব সময়ে অসময়ে একটা পাক দিয়ে আসত। শেষে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল ও বাড়িতে আর কেউ নেই, তখন আর যেত না। তবে বহুদিন পর্যন্ত নদীর ধারে গিয়ে, সাহেবদের বাংলো বাড়িটা যেখানে ছিল, একেক সময়ে থমকে তাকিয়ে দেখতো জ্যাকব, আর কি যেন ভাবত।

জ্যাকব যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে এল, বাড়ির প্রায় প্রত্যেকেই যেমন খুবই উত্তেজিত হয়েছিল চতুষ্পদ বাহনের আগমনে, তেমনিই আমিও বেশ উৎফুল্ল হয়েছিলাম ঘোড়ায় চড়তে পাব এই আশায়। মক্কেলদের ঘোড়ার পিঠে চুরি করে চড়ে ঘোড়ায় চড়াব স্বাদ আগেই পেয়েছিলাম। এবার নিজেদেরই ঘোড়া হওয়ায় ভাল করে ঘোড়-সওয়ার হওয়ার শখ হল।

আমার সে শখ কিন্তু পূর্ণ হয়নি। আমাদের বাড়ির ধর্মকর্ম, ইহকাল-পরকাল সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন পটলমামা। তিনি সম্পর্কে বাবার মামা ছিলেন, নাকি মার মামা ছিলেন, নাকি কাকিমা-জেঠিমাদের কারও মামা ছিলেন, এতদিন পরে তা আর বলতে পারব না। এমনও হতে পারে যে, তিনি ঠাকুর্দা বা ঠাকুমার মামা ছিলে। ঠাকুর্দা আর আজিমা তাঁকে নাম ধরে ডাকতেন। ঠাকুমা তাঁকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। কোনও এক বা একাধিক অজ্ঞাত কারণে ঠাকুমা তাঁর সঙ্গে একদম কথা বলতেন না। এতদিন পরে এসব কথা লিখতে গিয়ে এই পরিণত বয়েসে এখন মনে হচ্ছে, পটলমামা সম্ভবত ঠাকুমারই দূর-সম্পর্কের কোনও অপোগণ্ড ভাই ছিলেন। সে যা হোক, এছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত মানুষ আছে, বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, রাস্তার লোক, বাজারের লোক, সবাই তাঁকে পটলমামা বলত।

তা বলুক, পটলমামা এসব নিয়ে মাঁথা ঘামাতেন না। তিনি এ সমস্তের বহু উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি বহুবিধ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে, যার মধ্যে অনেকগুলিই ছিল তাঁর মনগড়া, আমাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর কথা যে সবাই সবসময় মান্য কবত, তা অবশ্য নয়। কিন্তু তাঁর একটা সুবিধে ছিল এই যে, তিনি পাঁজি দেখতে জানতেন, কখন গ্রহণ ছাড়বে, কখন লক্ষ্মীপুজো আরম্ভ করতে হবে, এসব বিধান তিনিই দিতেন। লাউ কিংবা মোচা খাওয়া সম্বন্ধেও তাঁর কঠোর সংস্কার ছিল।

পটলমামা জ্যাকবের বাড়িতে আসা ভালভাবে নেননি। আমাদের বাড়ি ছিল দক্ষিণমুখী, প্রথমেই বললেন, 'দক্ষিণমুখী বাড়িতে ঘোড়া পুষতে নেই। ঠাকুরপুরের ছোট তরফ এই করেই নির্বংশ হয়েছিল।' আজিমার ধমক খেয়ে পটলমামা অবশ্য পরে স্বীকার করেন যে, ঠাকুরপুরের ছোট তরফের বাড়ি দক্ষিণমুখী ছিল না, সেটা ছিল পূর্বমুখী। আর ঠিক ঘোড়ার জন্যে নয়, তারা নির্বংশ হয়েছিল শনিবারের বারবেলায় বেড়াল মারার জন্যে।

ঘোড়া পোষা সম্পর্কে পটলমামার নিষেধ খাটলো না বটে, কিন্তু তিনি একটা মারাত্মক কথা বললেন। তিনি বললেন যে, ম্যাকেঞ্জি-মেমের গোপনীয়, দূষিত অসুখ ছিল। সেই পাপিষ্ঠা, ম্লেচ্ছা রমণী এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়াটাকেও দূষিত করেছে। এর পিঠে যে চড়বে, তারও ঐ সব

খারাপ অসুখ হবে। প্রথমে অধমাঙ্গে, পরে উত্তমাঙ্গে সারা গায়ে দগদগে ঘা হয়ে এ ঘোড়ার সওয়ার মারা পড়বে।

এই ভয়াবহ ঘোষণার ফল ফলেছিল। তার একটা কারণ ছিল এই যে, লক্ষ করে দেখা গিয়েছিল জ্যাকবের পিঠে একটু ঘায়ের মত কী যেন আছে। ফলে কেউই আর জ্যাকবের পিঠে উঠতে সাহস করেনি। শুধু দু-একজন সেই আমরা যারা লুকিয়ে চুরিয়ে এক-আধবার প্রথমদিকে জ্যাকবের পিঠে উঠেছি, সারাজীবন দুশ্চিন্তায় কাটালাম এই বুঝি শরীর দিয়ে চাকা চাকা দূষিত ঘা বেরোল। তাহলে কি আর কাউকে, এমন কি ডাক্তারকে বোঝানো সম্ভবপর হত যে, ছোটবেলায় ঘোড়ার পিঠে ওঠায় আজ গায়ে এই ঘা বেরিয়েছে!

জ্যাকব কিন্তু রয়ে গেল আমাদের বাড়িতে। শীত শেষ হতেই তার পিঠ বাদামি লোমে ছেয়ে গেল, ঘায়ের চিহ্নও আর রইল না। পরে আমরা দেখেছিলাম, প্রত্যেকবারই শীতের শুরুতে অনেক লোম ঝরে গিয়ে একটা ঘিয়ে-ভাজা-ভাব আসে জ্যাকবের। শীত কেটে গেলেই সেটা চলে যায়।

জ্যাকব আমাদের বাড়িতে এসেছিল অঘ্রাণের মাঝামাঝি। সে বছর পুরো শীতকালটা সে রান্নাঘরের পাশে যজ্ঞডুমুর গাছের তলাটা তার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। শুধু একদিন রাতে খুব বৃষ্টি আসায় সে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে আসে। রান্নাঘরে দাসী শুতো। পরেরদিন খুব ভোরবেলায় দাসী উঠোন ঝাঁট দিতে রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে দেখে জ্যাকব দাঁড়িয়ে। তার সে কী আর্ত চিৎকার! পুরো বাড়ির লোক শেষরাত্রির সুখতন্দ্রা ফেলে সে-চিৎকার শুনে ঘর খুলে বেরিয়ে পড়েছিল। কাছারিঘরে দু-একজন মক্কেল প্রয়োজনে রাত্রিবাস করত। সেদিন রাহাজানির মামলায় দুজন সদ্য জামিনপ্রাপ্ত আসামীও ছিল। তারা দাসীর সেই আর্তনাদ শুনে খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং আশঙ্কা করে যে, হঠাৎ যদি থানা-পুলিশ হয়, আবার তারা বিপদে পড়বে।

দাসীর চেঁচামেচি শুনে মৃদুমন্দ চালে জ্যাকব রান্নাঘরের বারান্দা থেকে নেমে গিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, রান্নাঘরের বারান্দায় তার ওঠা এদের পছন্দ নয়। এর পরে জ্যাকব আর রান্নাঘরের বারান্দায় ওঠেনি, ঝড়বৃষ্টি হলে কাছারিঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠত। বাকি অন্য সময় সে নিজের মনে বাড়ির মধ্যে এবং বাড়ির বাইরে নানা জায়গায় আপনমনে ঘুরে বেড়াত। শুধু সন্ধ্যার আগে আগে বাড়ি ফিরে এসে যজ্ঞডুমুর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোত, তারপর ভোর হওয়া মাত্র নিজেই বেরিয়ে পড়ত, বাড়ির সামনের মাঠে বা রাস্তার ধারে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতো।

যজ্ঞডুমুর গাছের তলাটা খুব প্রিয় ছিল জ্যাকবের। ওখান থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরে নজর রাখত। বাড়ির মধ্যে কুকুর, বিড়াল কাউকে সহ্য করতে পারত না জ্যাকব। এমন কি ভিখিরি, বাউল, মুসকিল আসান দেখলেও তাড়া করে যেত। গাছতলায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার পর থেকে চোখ বুজে কান খাড়া করে ঘুমুত সে। রাতের খাওয়া হয়ে গেলে এঁটোকাঁটা খেতে দু-একটা আটপোষা কুকুর ছুটে আসত, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে যেত জ্যাকব। আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরে একপাল জংলি রাজহাঁস কবে কোথা থেকে এসেছিল কে জানে। সারাদিন পাড়ার মধ্যে চড়ে বেড়াত আর সূর্যাস্তের আগেই মধ্যপুকুরে গিয়ে পিঠে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোত। বনবেড়াল আর শেয়ালের থাবা থেকে বাঁচবার জন্যে ওরা এটা করত, কারণ এসব

জন্তু জলে সাঁতরিয়ে গিয়ে পুকুরের মাঝখানে ওদের আক্রমণ করতে পারে না। এই হাঁসগুলো রাতের বেলায় শত্রুদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল, কিন্তু দিনের বেলায় পাড়ার মধ্যে ওদের যেখানে দেখত নৃশংসভাবে জ্যাকব তাড়া করে যেত। আমাদের বাড়িতে একদা হাঁসদের খুব সমাদর ছিল, আজিমা ওদের প্রত্যেকের নামকরণ করেছিলেন এবং প্রত্যেককে আলাদা করে চিনতেন, একেকদিন বলতেন, 'সবাই এল, রাণী আর বাণী আজ এল না কেন?' যে কোনও কারণেই হোক, খুব সম্ভব আজিমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত— পাড়ার ভিতরে রাজহাঁসদের সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহারই করুক, আমাদের বাড়িতে ঢুকলে জ্যাকব তাদের তাড়া করে যেত না, শুধু কটমট করে তাকাত।

আজিমা প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা এক বাটি লাল চালের ভাতের ফ্যান দিয়ে 'চই চই' করে ডেকে হাঁসদের খাওয়াতেন। 'চই চই' করামাত্র জ্যাকবও ছুটে আসত, খুব রাগের সঙ্গে সে দেখত রাজহাঁসদের পানভোজন। আজিমা জ্যাকবকে বলতেন, 'ওরা গেলে তুই খাবি।' জ্যাকব বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকত।

তিন

জ্যাকবের জন্যে আমাদের তেমন কোনও খরচ ছিল না। কোনওদিন তার জন্যে কোনও আস্তাবল তৈরি করে দেওয়া হয়নি। তার জন্যে আলাদা কোনো খাবারের বন্দোবস্তও করা হয়নি।

জ্যাকব নিজের মনে চরে বেড়াত। বাড়ির মধ্যে, পাড়ার মধ্যে অনেক সময় বেশ দূরে নদীর ধারে বা ইস্কুলের মাঠেও ঘাস খেতে যেত। একবার ইস্কুলের বোর্ডিংয়ের সামনের ফুলের বাগানে জ্যাকব ঢুকে পড়ে। বোধহয় গেটটা খোলা ছিল, সেই সুযোগে জ্যাকব ভেতরে যায়। বোর্ডিংযেব ছেলেরা তাকে খোঁয়াড়ে দেয়।

সেদিন সন্ধ্যা পার হয়ে গেলেও জ্যাকব যখন বাড়ি ফিরল না, আজিমা ঠাকুর্দাকে জানালেন যে, জ্যাকব আসেনি। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি চলে আসে, আজ কি হল? একটু পবে বাজার থেকে ফেরার পথে নতুন মুহুরিবাবু খবর আনলেন যে, জ্যাকবকে ইস্কুলেব ছেলেরা ধরে খোঁয়াড়ে দিয়েছে। তখনই খোঁয়াড়ে গিয়ে ছয় আনা পয়সা দিয়ে জ্যাকবকে ছাড়িয়ে আনা হল।

জ্যাকবের জন্যে একবার এই ছয় আনা খরচ হয়েছিল। আরেকবার কোথায় যে তার-কাঁটায় না ভাঙা টিনের বেড়ায় সারা শরীর কেটে, রক্তারক্তি করে জ্যাকব বাড়ি এসেছিল। সেবার দু'টাকা ভিজিট দিয়ে সরকারী পশু হাসপাতাল থেকে ডাক্তার ডেকে এনে জ্যাকবের চিকিৎসা করা হয়।

খুব রোদ্দুর হলে জ্যাকব আমাদের দালানের উত্তর দিকের ছায়ায় আমগাছের নিচে গিয়ে থাকত। কিন্তু এখান থেকে পুরো বাড়িটা নজর রাখা যেত না। তাই অন্য কোনও অসুবিধা না থাকলে সে যজ্ঞডুমুরতলাই পছন্দ করত, নেহাত ঝড়বৃষ্টি হলে কাছারিঘরের বারান্দায় আশ্রয় নিত।

জ্যাকব কি করে যেন মক্কেলদের দেখলে বুঝতে পারত। সে তাদের কিছু বলত না। ডাকপিওন এবং খবরের কাগজওয়ালাকেও সে চিনে ফেলেছিল। এর বাইরে বাড়ির লোক ছাড়া

অন্য কাউকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখলে সে তাড়া করে যেত। তার বিশেষ রাগ ছিল গোয়ালা, কলু এই জাতীয় লোকদের ওপরে, যারা মাথায় কিংবা কাঁধে বা বাঁকে করে কিছু নিয়ে আসত। নাক ফুলিয়ে, গরম নিঃশ্বাসের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে জ্যাকব তাড়া করে যেত। তার সেই হিংস্র মূর্তি যে দেখত, তারই বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত।

জ্যাকব অনেক সময় আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে যেত। আমরা ক্লাসে থাকতাম, জ্যাকব মাঠে ঘুরে বেড়াত বা রাস্তার ধারের ঘাস খেত। তবে খোঁয়াড়ে বন্দী হওয়ার ঘটনার পর আর সে ইস্কুলের দিকে যায়নি।

কোনও কোনও দিন বেশি মক্কেলের ভিড় থাকলে সেই মক্কেলদের ভিড়ের পিছনে বাবা ও ঠাকুর্দার সঙ্গে জ্যাকবও আদালতে যেত। আদালতের লম্বা বারান্দায় জ্যাকব উঠে খটখট করে হাঁটত। পেয়াদা-পেশকাররা তাকে অনেক সময় বারান্দা থেকে জোর করে নামিয়ে দিত আদালতের কাজে ব্যাঘাত হবে বলে।

বাড়ির মধ্যে এবং বাড়ির কাছাকাছি জ্যাকবের যে অখণ্ড প্রতাপ ছিল, বাইরে কিন্তু তা ছিল না, এসব ক্ষেত্রে সে যথাসাধ্য নরম হয়েই থাকত।

জ্যাকবের সব কথা বলা যাবে না, শুধু জ্যাকবের একটা খারাপ দোষের কথা না লিখলে এ উপাখ্যান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জ্যাকবের চরিত্রদোষ ছিল। তার কাঁধের ঘা যে কোনও প্রাকৃতিক কারণেই হোক, তার একটু ছুঁকছুঁক বাতিক ছিল।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। কোনও মাদি ঘোড়ার প্রতি কোনও দুর্বলতা তার কখনও দেখা যায়নি। কোনও ঘোড়ার প্রতিই তার কোনও কৌতূহল ছিল না। কিন্তু মহিলাদের প্রতি তার ছিল অপরিসীম আগ্রহ। পাড়ার পুকুরে মেয়েদের স্নানের ঘাটের পাশে একটা মানকচুর ঝোপ ছিল। মশা আর মাছির অত্যাচার সহ্য করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোলুপ নয়নে স্নানরতা রমণীদের পর্যবেক্ষণ করত। তার সেই কামাতুর দৃষ্টি বহু রমণীই লক্ষ করেছিলেন, তাঁরা স্নানের ঘাট থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে বাড়ির পথে যেতে ঘোড়াটাকে কটাক্ষ করে যেতেন, 'কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে দেখছে! বদমাইশ ঘোড়া।'

এ রকম গালাগাল শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নামিয়ে মাথা সরিয়ে নিত জ্যাকব। অনেক সময় গভীর রাতেও নাকি নিশাচর হয়ে লোকের বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে জ্যাকব মাথা গলাতো। এ ধরনের নালিশও কয়েকবার আমাদের কাছে এসেছে।

সবেচেয়ে মারাত্মক হল, সেবার যখন কালীবাড়িতে হরি সংকীর্তন হল। এক সুন্দরী মাঝবয়সী বোষ্টমী মধুর গলায় কীর্তন গেয়ে আমাদের শহর মাত করে দিয়েছিল। বড় বড় ডাক্তার-উকিল অনেকেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। জ্যাকবও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনেক মানুষের ভিড়ে কালীবাড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে জ্যাকবও মুগ্ধ হয়ে বৈষ্ণবীর গান শুনত।

অবশেষে সঙ্কীর্তন পালা শেষ হওয়ার পরের দিন যখন বোষ্টমী ডুলিতে উঠে স্বগ্রামের দিকে রওনা হল, সেই ডুলির পিছুপিছু খোঁড়াপায়ে জ্যাকবকেও যেতে দেখা গেল।

আমরা খবর পেলাম ঘণ্টাখানেক পরে। বাড়ির বয়স্ক পুরুষমানুষেরা বাবা-ঠাকুর্দা, মুহুরিবাবুরা তখন আদালতে চলে গেছে। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। আমি আর আমার দাদা দুজনে দুটো

সাইকেল নিয়ে ছুটলাম বোষ্টমীর বাড়ির পথে। প্রায় আধঘণ্টা পরে জ্যাকবকে ধরতে পারলাম। আমাদের দেখে সে কেমন হকচকিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে ফিরে এল।

চার

ভালো-মন্দয়, সুখে-দুঃখে জ্যাকব আমাদের বাড়িতে অনেকদিন রয়ে গেল।

এর মধ্যে কিসে যে কী হয়ে গেল, কেউ কিছু ভাল করে বুঝবার আগেই জায়গাটা পাকিস্তান হয়ে গেল! চৌদ্দপুরুষের ভিটেয় আমরা পরগাছা হয়ে গেলাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, মন্বন্তরও আর নেই। চারদিক বেশ সুস্থির হয়ে এসেছে। এর মধ্যে শুরু হল হানাহানি, মারামারি, গোলমাল! আগুনের আঁচ আমাদের সেই ছোট শহরেও গিয়ে লাগল।

তখন ঠাকুর্দা মারা গেছেন। আজিমাও অনেকদিন বেঁচে নেই। বাবাই সংসারের কর্তা। গোলমালের মধ্যে বাবা দিনসাতেক নানা জায়গায় ঘুরে একদিন ফিরে এলেন। এসে বললেন, 'সব দেখেশুনে এলাম। ওদিকেই প্র্যাকটিস করব। বাড়ি ঠিক করে এসেছি। খুব ছোটো। কি আর করা যাবে? এখানে থাকা যাবে না।'

ঠিক হল, প্রথমে দাদা আর পটলমামা যাবে। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে আমরা পরে যাব। এর মধ্যে যা কিছু সম্ভব বিক্রিবাট্টা করে বাবা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নেবেন।

এসব অবশ্য হয়নি। কিছুই বিক্রিবাট্টা করা হয়নি। দেশও আমরা পুরোপুরি ছেড়েআসিনি।

কিন্তু সে অন্য গল্প। এখন জ্যাকবের গল্পটা শেষ করি।

পাকিস্তান হওয়া মাত্র পাসপোর্ট-ভিসা চালু হল না বটে, কিন্তু সীমান্তে চৌকি বসলো। সীমান্তের দুই পারে দুই দেশের চৌকি, সেখানে কাস্টমস আর পুলিশের ছাউনি।

আমাদের বাড়ি থেকে সীমান্ত খুব দূরে নয়। বাবা একদিন পটলমামাকে নিয়ে ওপারে নতুন ঠিক-করা-বাড়ি দেখিয়ে আনলেন। ফেরার পথে সীমান্তচৌকির পুলিশ-ছাউনিতে আনসারবাহিনীব একজন চেনা লোক বাবাকে বলল, 'উকিল সাহেব, খুব বেশি এপার-ওপার করছেন!' বাবা এ কথায় কিছু মনে করলেন না, কিন্তু লোকটা আগে যখন আমাদের শহরে একটা গুড়ের গোলায় কাজ করত তখন বাবাকে 'উকিলবাবু' বলত, এখন কেন 'উকিলসাহেব' বলল, এতে বাবার মনে খুব খটকা লাগল।

সেই দুর্দিনের যুগে মানুষের মনে এরকম কত খটকা লেগেছিল। তার কিছু কিছু এখনও ভাঙেনি। সে কথা থাক, বাড়িতে ফিরে এসে ঠিক হল, পটলমামা আর দাদা দুজনে দুটো সাইকেলে চড়ে ইন্ডিয়ায় যাবে। দুটো সাইকেল ওপারে আমাদের নিজের দেশে পৌঁছে যাবে, এটা কম কথা নয়। এই সময় পটলমামা বললেন, 'জ্যাকবকেও নিয়ে যাই। ঘোড়াটা সারাজীবন কোনও কাজ করল না। ওর পিঠে চড়িয়ে কয়েকটা বাক্স-বিছানা ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাব।'

পটলমামা প্রথম থেকেই জ্যাকবকে পছন্দ করতেন না, এবার ওঁর এই পরামর্শ শুনে বাবা চটে গেলেন, বললেন, 'জ্যাকব এই বুড়ো বয়েসে মাল বইতে যাবে কোন দুঃখে? তবে তোমাদের সঙ্গে জ্যাকবও যাক, পথে তোমাদের দিকে নজর রাখবে। আর ইন্ডিয়াতে গিয়েও নতুন বাসাটা পাহারা দিয়ে রক্ষা করতে পারবে।'

একদিন সুপ্রভাতে দুটো সাইকেলে দাদা আর পটলমামা, সেই সঙ্গে পাশে জ্যাকব, এই ত্রয়ী ইন্ডিয়ায় রওনা হল। অনেকদিন পরে সেই লাগামটা—যেটা পরে জ্যাকব আমাদের বাড়িতে

প্রথম এসেছিল, সেটা খুঁজে বার করে জ্যাকবকে পরানো হল। রওনা হওয়ার আগে সকলের সঙ্গে জ্যাকবও কালীবাড়িতে প্রণাম করতে গেল।

প্রথমে পটলমামা সাইকেলে, তার পিছনে দাদা, তার ডানহাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরা, বাঁহাতে জ্যাকবের লাগাম। কিন্তু লাগাম দরকার হল না। জ্যাকব কী বুঝেছিল কে জানে, রওনা হওয়া মাত্র সে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মা বললেন, 'জ্যাকব বোধহয় যেতে চাইছে না। ওর লাগামটা খুলে দাও।'

লাগাম খুলে দেওয়ার পর দেখা গেল জ্যাকবের যেতে কোনও আপত্তি নেই, তার যা কিছু আপত্তি সেই লাগামে। একটু পরে দাদা আর পটলমামা আবার যেই রওনা হল, জ্যাকবও সেই সাইকেল দুটির সঙ্গে ছুটতে লাগল।

কিন্তু জ্যাকব ইন্ডিয়ায় পৌঁছতে পারেনি। সেই যে আনসার বাবাকে বলেছিল 'উকিলসাহেব', সে দাদা আর পটলমামার সাইকেল দুটো আটকে দিল আর জ্যাকবকে দেখে বলল, 'এই পাট কোম্পানির ঘোড়াটা আপনারা চুরি করে ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন? এটা নেওয়া যাবে না।'

পটলমামা এত সামান্য কারণে দমবার লোক নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের ওপারে ইন্ডিয়ার সরকারী রিফিউজি ক্যাম্পে চলে গেলেন, সেখানে মাত্র দু'টাকা ব্যয়ে একটা রিফিউজি সার্টিফিকেট সংগ্রহ *করলেন* জ্যাকবের নামে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। আনসার সাহেব জ্যাকবের রিফিউজি সার্টিফিকেট দেখে রেগে কুচি কুচি করে সেই সার্টিফিকেটের কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন।

কী আর করা যাবে, কিছুই করার ছিল না তখন। দাদা আর পটলমামা সাইকেল দুটো খুইয়ে ওপারে চলে গেল, জ্যাকব ওখানেই রয়ে গেল। দাদা নাকি একবার বলেছিল, 'জ্যাকবকে বাড়িতে গিয়ে রেখে আসি।' পটলমামা বলেছিলেন, 'সে আরও হাঙ্গামা হবে। আর জ্যাকব নিজে নিজেই পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে। ওকে কে আটকাবে?'

কেউ আটকায়নি হয়তো, কিন্তু জ্যাকব আর বাড়ি ফেরেনি। আন্তর্জাতিক সীমান্ত চৌকির তার-কাঁটা বেড়ার পাশে সে আপনমনে ঘুরে বেড়াত, আমরা এরপরে বহুবার যাতায়াতের পথে তাকে দেখেছি। জ্যকবও আমাদের দেখতে পেয়েছে, দেখে এগিয়ে এসেছে কিন্তু আর বাড়ি ফিরে যায়নি, শুধু আমাদের আসা-যাওয়ার পথের দিকে উদাস, অতল কালো চোখে তাকিয়ে থাকত।

বহুদিন ও-পথে আমাদের আর যাতায়াত নেই। জ্যাকব নিশ্চয়ই এতদিন আর বেঁচেও নেই। তবু ওখান দিয়ে আর কখনও যদি যাই, নিশ্চয়ই জ্যাকবের খোঁজ করব।

সাইকেল

সাইকেলটা ছিলো মফিজউদ্দিন তালুকদারের। সবাই তাঁকে মফিজ সাহেব বলতো। আমরা বলতাম মফিজকাকা।

মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, ফুলশার্ট হাতা গোটানো। মুখে একগাল চাপ দাড়ি, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। বোধহয় বেশি ব্লাডপ্রেশার ছিলো মফিজ সাহেবের।

ভদ্রলোক পাড়াগাঁয়ে মামলাবাজ জোতদার ছিলেন। আমার বাবার এবং তার আগে আমার ঠাকুর্দার বাঁধা মক্কেল। নানা রকম ছোট বড় দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা ছিলো তাঁর। মামলার কাজে মাসে অন্তত দু'-একটা দিন তাঁকে আমাদের বাড়িতে আসতে হতো।

আসতেন সাইকেলে চড়ে খুব সকাল সকাল। কাছারিঘরের সামনে সাইকেল থেকে নেমে দু'-তিনবার জোরে জোরে সাইকেলের ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিতেন। বোঝা যেতো, মফিজ সাহেব এসে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর দাদা উত্তেজিত হয়ে যেতাম। সেদিন সকালবেলায় লেখাপড়া টংয়ে উঠতো।

উত্তেজনার কারণ আর কিছুই নয়, ঐ মফিজ সাহেবের সাইকেল। মামলাবাজ হলে কি হয়, অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন মফিজকাকা। আমাদের অল্প বয়সে দেখা সামান্য কিছু লোকের মধ্যে তিনি হলেন একজন, যিনি সাইকেলে তালা দিতেন না এবং আমরা চড়লে কোনো রকম আপত্তি করতেন না। শুধু বলতেন, 'একটু সাবধানে চড়ো, দেখো, চোট না পাও।'

অন্যদের আপত্তির অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিলো। আমার এবং দাদার অত্যাচারে সাইকেলধারী কোনো মক্কেল বা বাইরের লোক আমাদের বাড়িতে সাইকেল নিয়ে আসতে সাহস করতো না। প্রায় সবাই তাদের সাইকেল অন্য কোনো বাড়িতে বা বাজারের কোনো দোকানে রেখে আসতো। যে দু'-একজন বাসায় সাইকেল নিয়ে আসতো, তারাও আমাদের ভয়ে সাইকেলে শক্ত তালা দিয়ে রাখতো।

একটু আধটু সাইকেল যদি কোনো বাচ্চা ছেলে চড়ে, তাতে খুব বেশি আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু আমার এবং আমার দাদার সাইকেল ব্যবহার ছিলো খুব নির্দয়, বলা যায় সাইকেল হাতে পেলে আমরা সেটার উপর রীতিমত অত্যাচার করতাম।

অত্যাচারের ধরনগুলি ছিলো নানা রকম। আমাদের বুড়ো কুকুর ভোলাকে সিটে বসিয়ে পিছনের কেরিয়ারে বসে আমি তাকে ধরে থাকতাম, আর দাদা রডের উপরে বসে সাইকেল চালাতেন। কখনো কখনো আমরা দ্রুতগতিতে রাস্তা থেকে বাড়ির সামনের পুকুরের ঢালু পাড় বেয়ে জলের মধ্যে নেমে যেতাম। সাইকেল এবং আমাদের স্নান একসঙ্গে সারা হতো। আবার কখনো আমাদের ভাঙা দালানের বারান্দা দিয়ে পাক মেরে সিঁড়ি বেয়ে সার্কাসী কায়দায় আমরা উঠোনে নামতে যেতাম। এই প্রক্রিয়ায় শুধু যে সাইকেল ভাঙতো তা নয়, আমাদের নিজেদেব দাঁতও ভেঙেছে, মাথাও ফেটেছে।

শুধু সাইকেল নয়, তখনো মফঃস্বল অঞ্চলে কিছু কিছু ঘোড়ায় চড়া চালু ছিলো। যদি আমাদের বাড়িতে কেউ ঘোড়ায় চড়ে আসতো, তা হলে তো আমাদের পোয়াবারো। এর একটা প্রধান কারণ ছিলো, ঘোড়ায় তালা দেওয়া যেতো না। তবে ঘোড়ার মালিক সাবধানতাবশত ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়াটাকে কাছারিঘরের বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লাগামটা খুলে নিজের কাছে রেখে দিতেন। তাতে আমাদের ফূর্তি কিছু কম হতো না। বলগাহীন ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ কিছু কম নয়।

ঘোড়ার মালিক চোখের আড়াল হতেই আমরা ঘোড়াটিকে দড়ি খুলে আমাদের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতাম। কেন জানি না, আমাদের উপর সমস্ত ঘোড়ার ছিলো জাতক্রোধ। ঘোড়ায় চড়তে গেলে ঘোড়ার চাঁটি সবাই কখনো না কখনো খায়, খেতে পারে। কিন্তু ঘোড়ারা আমাদের নির্যাতনে অস্থির হয়ে আমাকে আর দাদাকে দুজনকেই একাধিকবার কামড়েছে। একবার একটা

কালো ঘোড়া আমার ঘাড় প্রায় পাঁচ মিনিট কামড়ে ধরে রেখেছিলো, পরে দাদা ঘোড়ার দু নাকের মধ্যে দুটো পেনসিল ঢুকিয়ে আমাকে সেই মারাত্মক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে। আমার কাঁধের উপরে শার্টের কলারের নিচে এখনো তিনটে ঘোড়ার দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। সেটা আমার বলগাহীন অশ্বারোহী জীবনের স্মৃতিচিহ্ন।

সাইকেলের কথায় আসি।

আমাদের পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতে একটি কি দুটি করে সাইকেল ছিলো। কিন্তু আমাদের ভাইদের লেখাপড়া গোল্লায় যাবে এই অজুহাতে এবং নিজেদের সাইকেল হলে আমরা অবশ্যই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চিরকালের মত বিকলাঙ্গ হয়ে যাবো এই রকম চিন্তা করে, আমাদের বাড়িতে কোনো সাইকেল কেনা হয়নি।

সে সময় আজকালের মত লোকের ঘরে ঘরে টেলিফোন, টেলিভিশন বা রেফ্রিজারেটর ছিলো না। খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, বাসনপত্র এবং গয়নাগাটি ছাড়া প্রথম যা গৃহস্থের সংসারে প্রবেশ করে সেটা হলো সাইকেল। সংসারে সাইকেলের এই প্রবেশ অবশ্য আমাদের ছোটবেলার আরো অনেক আগেকার, তার সূচনা হয়েছিলো এই শতাব্দীর গোড়াতেই। কাদের বাড়িতে এলাকার মধ্যে প্রথম সাইকেল এসেছিলো তা নিয়ে মফঃস্বলে অনেক পরিবারেরই গর্বের ব্যাপার ছিলো। একই গ্রামে একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা পরিবার দাবি করতো যে, তাদের পরিবারেই সর্বপ্রথম সাইকেল আসে। অনেক প্রাচীন ব্যক্তিকে এ নিয়ে সাক্ষী মানা হতো।

তবে আমি আর আমার দাদা যখন সাইকেল-পাগল, তখন সাইকেল আর স্ট্যাটাস সিম্বল নয়, তার স্থান নিয়েছে রেডিয়ো।

সে যা হোক, বাড়িতে সাইকেল না থাকার জন্যেই হোক বা আমাদের চরিত্রদোষেই হোক, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দাদার সাইকেল-পিপাসা বাড়তে লাগলো। বাড়িতে কেউ সাইকেলে এসে সামান্য অন্যমনস্ক হলেই আমরা তার সাইকেল নিয়ে উধাও হতাম। ক্রমশ খুব নতুন লোক ছাড়া প্রায় সকলেই এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে।

তখন যুদ্ধের বাজার, মোটর গাড়ির মত সাইকেলেরও লাইসেন্স হয়েছে। তাতে নম্বর লাগাতে হচ্ছে। এক অসতর্ক মক্কেলের এই রকম একটা নম্বরী সাইকেল লুকিয়ে নিয়ে দাদা এবং পাড়ার আরো তিনজন একদিন আমাকে সাইকেল চড়া শেখাতে যায়।

সাইকেল চড়া শেখানো খুব সোজা। আমাদের পাড়ার পাশে খালের উপরে কাঠের সাঁকো। সেই সাঁকোর পরে যেখানে রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেখানে আমি সিটের সামনের রডের উপর হ্যাণ্ডেল ধরে বসলাম, পিছনে দাদা বা কেউ ধরে থাকলো। কয়েক মুহূর্তের স্থিতাবস্থার পর আচমকা সাইকেলটা সামনের দিকে ধাক্কা দিলেই কিছুটা মাধ্যাকর্ষণের টানে কিছুটা ধাক্কার বেগে আমি বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম, কোনো রকম পেডাল-টেডাল করার দরকার নেই।

প্রথম দিকে ধুপধাপ পড়ে যাচ্ছি, পা কাটছে কপাল ফাটছে, রক্ত, টিংচার আয়োডিন, ভয়াবহ সে শিক্ষা। মারাত্মক হলো একটু পরে, পুলের মুখে রওনা হওয়ার আগেই নিচে একটা নৌকোর ওপরে পড়ে গেলাম ডিগবাজি খেয়ে সাইকেলসুদ্ধ। ভাগ্যিস সেটা ছিলো খড়ের নৌকো, তাই প্রাণে বেঁচে গেলাম, কিন্তু সাইকেলটা কেমন মোষের শিংয়ের মতো বাঁকা হয়ে গেল। তার

চেয়েও বড় কথা, সেই নম্বরী লাইসেন্সটা—যেটা সাইকেলের সঙ্গে লাগানো ছিলো, খড়ের গাদায় না খালের জলের মধ্যে সেটা কোথায় যে হারিয়ে গেলো, প্রবল অনুসন্ধান করেও সেটা উদ্ধার করা গেলো না। ভাঙা সাইকেলটি মাথায় নিয়ে বাসায় এলে ফল যা দাঁড়ালো সেটা মর্মান্তিক। সাইকেলের যিনি মালিক, তিনি তাঁর সাইকেলের অষ্টাবক্র ভগ্নদশা দেখে যতটা দুঃখিত হলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি বিহ্বল হয়ে পড়লেন সাইকেলের নম্বরী লাইসেন্সটা হারিয়ে যাওয়ায়। সেটা ছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের থমথমে যুগ আর তাঁর ছিলো প্রচণ্ড রাজভয়। এই নম্বরহীন সাইকেলের মালিকানার জন্যে তাঁর কী পরিণতি হতে পারে তা ভেবে তাঁর মুখমণ্ডল ক্রমশ ফ্যাকাশে থেকে ফ্যাকাশেতর হতে লাগলো। কত কী বিপদ হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। বাবা এবং মুহুরিবাবুরা যত তাকে বলেন যে, ভয়ের কিছু নেই, এটা সামান্য ব্যাপার আর তা ছাড়া কোতোয়ালি থানার বড় জমাদারকে আমরা মাসে দশ টাকা পান-খরচ বাবদ মাসোহারা দিই—তিনি তত অস্থির হয়ে পড়েন, 'আমার কি হবে, ছেলেপুলে বৌবাচ্চা নিয়ে উকিলবাবুর ছেলেদের জন্যে আমি মারা পড়লাম' বলে তিনি কপালে করাঘাত করতে লাগলেন।

অবশেষে অনেক আলোচনা করে সাব্যস্ত হলো যে, আমাদের রান্নাঘরের পিছনে মানকচু গাছের ঝোপের মধ্যে একটা বড় গর্ত করে সাইকেলটাকে আপাতত লুকিয়ে ফেলা হবে। পরে কোনকালে যদি যুদ্ধটুদ্ধ মিটে যায়, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, তখন সাইকেলটাকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সাইকেলটাকে কবর দেয়া হলো। দাদা সেখানে একটা কঞ্চি পুঁতে দিলো যাতে সুদিন এলে উদ্ধার করার সময় কোনো অসুবিধা না হয় খুঁজে পেতে। এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করাতে চাই যে, পাড়ার লোকেরা যখন সবাই জানতো আমাদের বাড়িতে কোনো সাইকেল নেই, তখন আসলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে ভূগর্ভে একটি দ্বিচক্রযান রয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পাতাল রেলের চল্লিশ বছর আগে দূর মফঃস্বলে আমরা একটি সাইকেল মাটির নিচে পুঁতে এই উপমহাদেশের সর্বপ্রথম সূচনা করি ভূগর্ভযানের। একে বলা চলে মেট্রো সাইকেল।

বাবা সাইকেলওয়ালাকে ষাট টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন, ফলে সাইকেলটার মালিকানা আমাদেরই এসে গিয়েছিলো। আমরা দু'ভাই সুদিনের অপেক্ষায় ছিলাম, কবে সাইকেলটা মাটি খুঁড়ে তোলা হবে। আর এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাবদ আমরা বুঝে গিয়েছিলাম ঐ প্রোথিত সাইকেলটাই আমাদের ভরসা, বাবা আর দ্বিতীয় কোনো সাইকেল কিনে দেবেন না।

প্রথম দিনের সাইকেল চড়া শিক্ষায় আমার যে কঠিন অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, তাতে কিন্তু আমি মোটেই নিরুদ্যম বা পিছপা হইনি।

উঞ্ছবৃত্তি করে বা লুকিয়ে চুরিয়ে এর ওর সাইকেল নিয়ে সেই খালপাড়ে গিয়ে দাদার কাছে সাইকেল চড়া শিখতে লাগলাম। একসঙ্গে কোনো সাইকেল বেশি সময়ের জন্যে পাই না, পর পর দুদিনও পাই না, ফলে শিখতে বেশ একটু সময়ই লাগলো। একাধিক সাইকেল জখম হওয়ার পরে সাইকেলের মালিকদের চীৎকার গালিগালাজে আমার আর দাদার খ্যাতি এত প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, ক্রমশ সাইকেলওয়ালারা আমাদের সম্পর্কে সতর্ক এবং কঠিন হয়ে পড়েন। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, ভাড়া করে সাইকেল চড়া শিখবো তার পর্যন্ত উপায় নেই, কোনো সাইকেল ভাড়ার দোকানদার আমাদের সাইকেল ভাড়া দিতো না।

এই সময়েই মফিজউদ্দীন তালুকদার সাহেবের উদারতায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। আমাদের কাছারিঘরের সামনে একটি মহীরুহ-প্রতিম জাম্বো সাইজের জবাগাছের সঙ্গে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখতেন মফিজ সাহেব, কোনো রকম তালাটালা না দিয়ে।

তিনি নিজে থেকেই যেদিন আমাদের সেধে সাইকেলটা চড়তে দিলেন, আমাদের ঘটনাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো। কোনো মানুষ যে এত মহৎ, এত ভালো হতে পারে, সে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

মফিজ সাহেব যখন আসতেন, সাইকেলটা আমাদের জিম্মায় রেখে বাবার সঙ্গে আদালতে যেতেন, পরে বিকেলে আদালতের কাজ সাঙ্গ করে আমাদের বাড়ি এসে আমাদের কাছ থেকে তাঁর সাইকেলটা উদ্ধার করে গ্রামের দিকে রওনা হতেন।

আমরা মফিজ সাহেবের উদারতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁর গাড়িটির উপর খুব বেশি অত্যাচার করতাম না। মফিজ সাহেব নিজেও আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, সাবধানে সাইকেলটা ব্যবহার করতে। পুরনো সাইকেল, আমরা পড়ে গিয়ে যদি কোনো চোটটোট পাই, সে জন্যে তিনি একটু উদ্বেগ প্রকাশ করতেন।

আমি ভালোভাবে সাইকেল চড়া শিখি ঐ মফিজ সাহেবের সাইকেলেই। খালধাবের পুলপারে সে বছর শীতে সাইকেল চডা শেখার ধুম পড়ে গিয়েছিলো। সেই প্রথম আমাদের ওখানে মেয়েরা সাইকেল চড়া শেখা আরম্ভ করলো। এবং অন্যান্য ব্যাপারের মতই মেয়েরা সাইকেল চালানো শেখা ছেলেদেব চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি আযত্ত কবলো। অবশ্য তখনো আমরা লেডিস সাইকেল দেখিনি, ছেলেদের আব মেয়েদের সাইকেলে কোনো পার্থক্য ছিলো না।

পুলপারের পাশেই রাস্তার ধারে একটা কুঁড়েঘর বেঁধে এক বুড়ি বাস করতো। সে রাস্তার পাশের দেয়ালে গোবরের ঘুঁটে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। খালধারেব সাইকেল-চড়া শিক্ষার্থীদের গাড়িতে চাপা পড়া তাব নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিলো। সে যতবাব সাইকেল চাপা পড়েছে, তার বেকর্ড রাখা হলে বিলিতি রেকর্ডবুকে নিশ্চয় ছাপা হতো।

এ বিষয়ে আমার কৃতিত্ব ছিলো সবচেয়ে বেশি। আমি বোধহয় অন্তত পঁচিশবার চাপা দিয়েছিলাম বুড়িকে। একদিন ঘটেছিলো মারাত্মক ব্যাপার। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি পর পর দুবার ঐ হতভাগ্য বৃদ্ধাকে চাপা দিলাম। প্রথমবারে সে কিছু বলেনি, যথারীতি মাটি থেকে উঠে গায়ের ধুলো ঝেড়ে গজ গজ করতে করতে আবার ঘুঁটে লাগাতে লাগলো। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় দফায় যখন সে চাপা পড়লো, সে মাটিতে গডাতে গড়াতে আমার দিকে তাকিয়ে চিনতে পেরে ডুকরে কেঁদে উঠলো, 'ওগো, একই ছোঁড়া আমাকে একদণ্ডের মধ্যে দুবার চাপা দিলো গো!'

মফিজ সাহেবের সাইকেলের সদ্ব্যবহার করার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম শুধু তাঁর ঔদার্যবশত নয়, এর মধ্যে একটা সাংঘাতিক কার্যকারণও ঘটে গিয়েছিলো।

একদিন মফিজ সাহেব সাইকেলটা আমাদের কাছে রেখে বাবার সঙ্গে আদালতে গেলেন, (সেদিন কী একটা ফৌজদারি মারদাঙ্গা মামলার রায় বেরোনোর কথা, তিনিই ছিলেন মূল আসামী, এতদিন জামিনে খালাস ছিলেন), সন্ধ্যাবেলা আর আমাদের বাড়িতে সাইকেল নিতে এলেন না।

বাবা আদালত থেকে শুকনো মুখে এসে বললেন, 'খুব খারাপ ব্যাপার হয়ে গেলো।

তালুকদার সাহেবের দু'বছর জেল হয়ে গেলো। হাকিমের কাছে জামিন চাইলাম, আপীল করবো বলে। তাও দিলো না। মফিজ সাহেবকে আদালত থেকে সোজা জেলে পাঠিয়ে দিলো।'

রাতে খাওয়ার সময় রান্নাঘরের বারান্দায় পিঁড়িতে বসে খেতে খেতে বুড়ো মুহুরিবাবু আমাদের বললেন, 'মফিজ সাহেব সাইকেলটা তোমাদের যত্ন করে রাখতে বলেছেন। জজ কোর্টে আপীল হয়ে জামিন পেয়ে গেলেই উনি জেল থেকে বেরিয়ে এসে সাইকেলটা নেবেন। সাইকেলটা ভালোভাবে রেখো।'

মফিজ সাহেবের জেল হওয়ার সংবাদ পেয়ে সেদিন সারা সন্ধ্যা আমি আর দাদা হাত তুলে নেচেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আজ পর্যন্ত জীবনে আর কোনো দিন আর কোনো ঘটনায় এত আনন্দ পাইনি।

বাবা যা আশা করেছিলেন তা কিন্তু হলো না, মফিজ সাহেবকে জেল থেকে খালাস করা গেলো না। আগের মামলাটার আপীল করবার আগেই আরেকটা ফৌজদারি মামলায় তাঁর আবার সাজা হলো। আসলে যে হাকিমের ঘরে আগেরবার তাঁর সাজা হয়েছিলো, পরের মামলাটাও সেখানেই হয়। সেই হাকিমসাহেব এবারও তাঁকে দু'বছরের সাজা দিলেন।

মফিজ সাহেবের আর জেল থেকে বেরুনো হলো না। একদিন বিকেলবেলা দাদা জেলখানার সামনের রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলো, দেখতে পায় যে মফিজ সাহেব জেলের ফটকের গরাদ ধরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন, তাঁর চেহারা একদম ভেঙে গেছে।

দাদা সাহস করে জেলের দরজার কাছে গিয়ে মফিজ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে। দাদাকে দেখে খুব খুশি হন তিনি, বাবার কথা বলেন, 'উকিলবাবু খুব চেষ্টা করলেন, আমারই ভাগ্য খারাপ।' তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'উকিলবাবুকে বলবে, যা দরকার সবই যেন করেন, আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। বেশি দিন থাকলে আমি বাঁচবো না।'

সাইকেলের কথা সেদিন মফিজ সাহেব কিছু বলেননি। দুদিন পরে বুদ্ধি করে আমি আর দাদা জেলখানায় তাঁকে তাঁর সাইকেলটা দেখাতে নিয়ে গেলাম। তিনি কিন্তু সাইকেল নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালেন না, কেবল জেল থেকে কবে খালাস হবেন, তাই নিয়ে কাতরোক্তি করলেন। তখন তাঁর মন ছটফট করছে বাইরে বেরোনোর জন্যে। তাঁর ঘন কালো চাপদাড়ি হঠাৎ তাড়াতাড়ি পাকতে শুরু করেছে, চুলও সাদা হয়ে যাচ্ছে, মুখ ভেঙে গেছে। দেখে আমাদের কেমন মায়া হলো মফিজকাকার জন্যে।

কারাবাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই তাঁর জীবনের মেয়াদ শেষ হলো। একদিন বিকেলবেলা আদালত থেকে ফিরে আমাদের বুড়ো মুহুরিবাবু বললেন, 'আজ সকালে হার্টফেল করে মফিজ সাহেব মারা গেছেন।'

পরদিন সকালে বাবা একটা লোক ঠিক করে মফিজকাকার গ্রামের বাড়িতে সাইকেলটা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল · এর সবটাই সাইকেলের শোকে নয়, কিছুটা ঐ গ্রাম্য, সরল, দাঙ্গাবাজ, উদার লোকটির জন্যে। এখনো আমাদের পুরনো শহরে যখন যাই, জেলখানার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে চল্লিশ বছর আগের মফিজকাকার কথা মনে পড়ে। আমার দাদা বহুদিন বিগত হয়েছে, আজ চল্লিশ বছর মফিজকাকাকে আমি মনে রেখেছি ; মফিজকাকা অমর রহে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো একদিন। বাড়ির সবাই ভুলে গিয়েছিলো, আমি আর দাদা কিন্তু ভুলিনি। এখন আর ভয়ের কিছু নেই, তাছাড়া সাইকেলের লাইসেন্সের ব্যাপারটাও উঠে গেছে।

পঁয়তাল্লিশ সালের শীতের গোড়ায় অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে একদিন কঞ্চির নিশানা মিলিয়ে আমরা দুভাই কোদাল দিয়ে মানকচুর ঝোপের মাটি খুঁড়ে সেই দোমড়ানো সাইকেলের কঙ্কাল উদ্ধার করলাম।

মানকচু গাছের নিষ্ঠুর শোষণে তখন আর সেই সাইকেলের কিছুই প্রায় নেই, তুলতেই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়লো। চেন, চাকা, স্পোক, প্যাডেল, হ্যাণ্ডেল সব টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। মরচে ও জং ধরে ভাঙা অবস্থায় সেটাকে সম্পূর্ণ করে একটা সাইকেল হিসেবে কল্পনা করাও কঠিন।

শুধু সেই সাইকেলের সিটটা—সেটা যে কিসের চামড়া দিয়ে তৈরি ছিলো কে জানে, সেটা তখনো অটুট রয়েছে। শুধু অটুট নয়, কচুবনের রসে-জলে সেটা আরো টনটনে আরো শক্ত হয়েছে। আর কি রকম একটা কষায় গন্ধ বের হচ্ছে সিটটা থেকে, ঠিক জলে ভেজা চামড়ার পচা গন্ধ নয়, কেমন যেন একটা আমিষ মাদকতাময় গন্ধ।

আমি আর দাদা মুহ্যমান হয়ে সেই দ্বিচক্রযানের ভগ্নস্তূপের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ আমাদের পোষা কুকুরটা, যার নাম ভোলা, তখন সে আরো বুড়ো, তার চোখে ছানি পড়েছে, ভালো করে দেখতে পায় না, সে কোথা থেকে শুঁকতে শুঁকতে এসে হঠাৎ তড়িৎগতিতে সিটটাকে মুখে নিয়ে দৌড় লাগালো। এবং সেটাই তার পক্ষে বড় ভুল হলো। সে উঠোন পেরোনোর আগেই ওপাশে কয়েকটা বারোয়ারি কুকুর ছিলো রাস্তার দিকে, তারাও এই গন্ধ পেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমরা কিছু বোঝার আগেই এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটলো। কিন্তু বৃদ্ধ ভোলার পক্ষে সমবেত আক্রমণ থেকে সিটটা বাঁচানো অসম্ভব ছিলো। আমি আর দাদা দুটো মোটা বাঁশ নিয়ে কুকুরদের তেড়ে গেলাম। কিন্তু তখন তারা চামড়ার নির্যাসের অনৈসর্গিক গন্ধে উন্মাদপ্রায়। কিছুই করা গেলো না। শুধু বাঁশ দিয়ে কুকুর পিটিয়ে হাতের কিঞ্চিৎ সুখ হলো।

সেদিনের সারমেয় সংগ্রাম প্রায় দু'ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিলো। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, হতাশ সারমেয়বৃন্দ একে একে সাইকেলের সিট ও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করার পর আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, সেই সিটটি উঠোনের একপাশে অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে, তাতে কেউ দন্তস্ফুট করতে পারেনি।

এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। যে কুকুরেরা এই জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলো, তাদের প্রত্যেককেই আমরা তাদের চোখ-ফোটার বয়স থেকে চিনি। এর মধ্যে একজন, তার নাম আমরা দিয়েছিলাম কালান্তক, সে ছয় মাস বয়সে আমার ঠাকুমার পুজোর ঘরে ঢুকে একটা বড় সাইজের পুরীর শঙ্খ পাউডারের মত গুঁড়ো করে খেয়েছিলো। আরেকজনের নাম দেয়া হয়েছিলো বীরবাহু, সে একটা পাঁঠাকাটা খড়্গের কাঠের হাতলটা স্থানীয় কালীবাড়ির ভাঁড়ারঘরে জানালা দিয়ে ঢুকে দেয়ালে ভর করে দুপায়ে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে শেষ করে দিয়েছিলো। শেষে সেই খাঁড়াটি মাথায় পড়ে, তার মাথায় আড়াআড়ি ভাবে সেই ক্ষতচিহ্ন তার আজীবন স্পষ্ট ছিলো।

সিটটা অক্ষত অবস্থায় আমরা ফেরত পেলাম। দাদা সেটা যত্নে তুলে রাখলো। তখন

সাইকেলের নেশা আমাদের কেটে গেছে, আমরা একটা নতুন খেলা আবিষ্কার করলাম, তার নাম দেওয়া হলো, দাঁত ফোটাও।

প্রত্যেকদিন বিকালে আমি আর দাদা সেই সুগন্ধ সিটটা বাতাসে কয়েকবার আন্দোলিত করে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'আয় আয় তুতু-চুচু' করে ডাকতাম। সঙ্গে সঙ্গে পাড়া বেপাড়ার কালান্তক-বীরবাহু সমেত অনেক কুকুর ছুটে আসতো, আমরা ছুঁড়ে দিতাম সামনের মাঠে ঐ মৃত্যুঞ্জয় সাইকেলের সিট। তারপর ঘণ্টাখানেক জীবনপণ লড়াই, পরাস্ত কুকুরেরা একে একে বিদায় নিতো, আমাদের বাইরের মাঠের একপাশে দন্তচিহ্নহীন পড়ে থাকতো সেই অলৌকিক চামড়ার সিট।

এমনভাবে বহুদিন গিয়েছিলো। উনিশশো পঞ্চাশ সালের সাম্প্রদায়িক গোলমালের পরে আমাকে আর দাদাকে বাবা পাঠিয়ে দিলেন কলকাতা, কালীঘাটের বাড়িতে। তখন, এমন কি এখনো, আমাদের তেমন কোনো বোধ জন্মায়নি সম্প্রদায় ব্যাপারটা নিয়ে, শুধু কলকাতা আসার আনন্দে চলে এলাম।

বিশেষ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসিনি। আমার সঙ্গে একটা বোঁচকা, দাদার সঙ্গে একটা। বোঁচকার মধ্যে সামান্য দু'-চারটে জামাকাপড়, কয়েক টুকরো আমসত্ত্ব, এক শিশি ঘি, অল্প ডালের বড়ি, কয়েকটা খইয়ের মোয়া—মা-পিসিমা-দিদিমা যে যেমন দিয়ে দিয়েছে, আমাদের কলকাতার জীবনসংগ্রামের পাথেয় হিসেবে।

আমাদের বাড়ি থেকে নদী পার হয়ে সিরাজগঞ্জ, সেখান থেকে সরাসরি রেলগাড়ি কলকাতার শিয়ালদায়। কিন্তু পথের মধ্যে দুটি বাধা দর্শনা আর বানপুর, পাকিস্তান আর ভারতের কাস্টমস চেকিং।

দর্শনায় যখন শুল্কসাহেবেরা তল্লাসি করলেন, আমার মনে কোনো সংশয় নেই, ঘি, ডালের বড়ি এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। আমি পার পেয়ে গেলাম। কিন্তু দাদার বোঁচকার নিচ থেকে বেরোল সেই গন্ধমাদন সাইকেলের সিট। দাদা যে কেন সেটা আনলো, কি জানি!

দাদা কাস্টমসের লোকদের বলেছিলো, কিছু নেই। সিটটা বেরোনোর পর দাদা কিছুটা চোরের মত সঙ্কুচিত, কিছুটা নববধূর মতো সলজ্জ হাসি হেসে বললো, 'এটা কিছু না।'

কাস্টমসের লোকেরা কিন্তু ব্যাপারটা সহজভাবে নিলো না। সাইকেলের সিটটা তারা একে একে হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। যে গন্ধটা ঐ পচনরোধক শক্ত হয়ে দুমড়িয়ে যাওয়া চামড়ার আসনটা থেকে বেরিয়ে আসছিলো, সেটাও খুব মনোরম নয়। আমি আর দাদা, সেই সঙ্গে তারাও কেউ কেউ, নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য হলাম।

কেন আমরা এই মহামূল্যবান অজ্ঞাতপরিচয় বস্তুটি পাকিস্তান থেকে ভারতে চালান করছিলাম, দাদা এর কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। আমরা ক্ষীণকণ্ঠে দু'-একবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, এটা একটা পুরানো সাইকেলের সিট, বহুদিনের স্মৃতি— তাই নিয়ে যাচ্ছি। তারা সেটা বিশ্বাস করল না।

সে ট্রেনে আর আমাদের কলকাতায় আসা হলো না, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা টানা জেরা চললো দুজনের। অবশেষে পরের দিন তারা ক্লান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে দিলো। কিন্তু সেই সাইকেলের সিটটা কি বুঝে রেখে দিলো।

এর বছর-দুয়েক পরে ঐ দর্শনা স্টেশন দিয়ে বাড়ি ফিরছি। প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখি পাশের

কাস্টমসের ঘরে দারোগা সাহেবদের টেবিলে আমাদের সেই সাইকেলের সিটটি উল্টে রাখা আছে, সেটা একটা চমৎকার বড়সড় ছাইদানের কাজ করছে।

এর পরে উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত যতবার দর্শনার পথে বাড়ি গেছি, কৌতূহলবশত প্ল্যাটফর্ম থেকে দারোগা সাহেবদের ঘরে তাকিয়ে দেখেছি সাইকেলের সিটটা অক্ষত, অটুট অবস্থায় উলটো হয়ে ছাইদানের দায়িত্ব পালন করছে। তবে সেটা তখনো গন্ধময় কিনা সেটা অনুসন্ধান করিনি।

আজকাল বাড়ি যাওয়া কম। দর্শনার পথে বাড়ি যাওয়া তো হয়ই না, সরাসরি রেলগাড়ি বন্ধ। জানি না আমাদের সেই সাইকেলের সিটটা দারোগাবাবুদের টেবিলে এখনো বিদ্যমান কিনা!

গর্জন তেল

কোথাও কোনো সুদূর দেশে, কোনো গহন অরণ্যের গভীরে কিংবা পর্বতের কন্দরে রয়েছে সেই এক অচেনা মহীরুহ, যার কাঠে রাজপ্রাসাদ তৈরি হয়। যার বল্কল দিয়ে গড়া হয় সমুদ্রের জাহাজের খোল, যার বড় বড় গোলপাতা দিয়ে বানানো হয় সাহেবদের ছবির মত ডাকবাংলোর ছাউনি।

আমাদের ছোট বয়সে দুটি আশ্চর্য গাছের কথা আমরা জানতাম। নন্দন কাননের পারিজাত তরুর চেয়ে সেই দুটি রূপকথার গাছ কম আকর্ষক ছিল না।

প্রথম গাছটি মহীরুহ, বিরাট—বিশাল। তার মোটা গুঁড়ি, বিপুল কাণ্ড, অজস্র ডালপালা। দ্বিতীয় গাছটি বৃক্ষ নয়, গুল্ম। জবা কি গন্ধরাজ ফুলের গাছের মত। সে গাছের দু ডালে দু রকম ফল হয়, ছোট এলাচ আর বড় এলাচ। তার ফুল হল লবঙ্গ, তার খোসা হল দারচিনি আর ঝরে পড়া শুকনো পাতাটা হল তেজপাতা। একদিন ছিল, কিন্তু এখন আর এই গাছ দুটো পৃথিবীতে কোথাও নেই। আমাদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ দুটো কোথায় হারিয়ে গেছে। সে যা হোক, ঐ প্রথম গাছটির কথা আরেকটু বলি। ঐ গাছটির কোটর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কাঁচা সোনার মত ঝকঝকে এক তরল পদার্থ, তার নাম গর্জন তেল। তাই মাখানো হয় প্রতিমার গায়ে, সাধারণ লোকে বলে ঘাম-তেল। মাখানো মাত্র প্রতিমা ঝলমলিয়ে ওঠে, যেমন আজকাল চোখে পড়ে ল্যামিনেট-দেওয়া বইয়ের মলাট।

আমাদের অল্প বয়সের জীবন কেটেছিল নদীর ধারের এক গঞ্জ শহরে। সেই শহরের আর তার আশেপাশের সারা বছরের যা কিছু চাহিদা, যেসব জিনিস ওখানে মিলত না, সেগুলো বড় বড় মানোয়ারি নৌকোয় বর্ষাকালে আসত নদীর ঘাটে। বহু দূর থেকে আসত সব নৌকো—কলকাতা-ঢাকা-চট্টগ্রাম। বালাম চাল আর নারকেল আসত বরিশাল থেকে, মালদহ থেকে বড় বড় ফজলি আম, বুড়িগঙ্গার তীর থেকে আসত কানাইবাঁশি কলা। বহু দূর উত্তর প্রদেশ থেকে শিলনোড়া, মশলাপাতি নিয়ে পশ্চিমা নৌকো আসত। কোনো কোনো জিনিস নৌকো থেকেই সরাসরি বিক্রি করা হত, আবার অন্যান্য নানা জিনিস সব নদীর ঘাটে নামিয়ে গরুর গাড়িতে বা কুলির মাথায় চলে যেত বাজারের দোকানে ও গুদামে।

একবার এক পশ্চিমা নৌকোয় এল অতিকায় কয়েকটা কাঠের পিপে। আমরা প্রায় প্রতিদিন বিকেলেই নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। কত রকম নৌকো, মানুষজন, জিনিসপত্র আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতাম। দেখতাম যে, কাঠের পিপেগুলো বেশ কিছুদিন ধরে নদীর ধারে পড়ে রয়েছে। বর্ষা শেষ হল। নদীর জল কমে যাওয়ার আগেই বিদেশী নৌকোগুলো বড় বড় পাল খাটিয়ে ফিরে যেতে লাগল। যে নৌকো কাঠের পিপেগুলো এনেছিল, সেটাও একদিন চলে গেল। কাঠের পিপেগুলো রয়ে গেল নদীর চড়ায়। কেউ সেগুলো নিতে এল না।

পরে শুনলাম, ঐ পিপেগুলোর মধ্যে আছে গর্জন তেল। চরের ব্যাপারিরা কী দরকারে আনিয়েছে। এখন প্রয়োজন পড়ছে না, শীতের সময় গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে। ঘাটের চৌকিদারকে তারা বখশিশ দিয়েছে এগুলো ততদিন দেখে রাখার জন্যে। আর তাছাড়া এ জিনিস বিশেষ কারো কাজে লাগবে না। চুরি-চামারি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ব্যাপারিদের এই ধারণা কিন্তু সঠিক ছিল না। আমি আর দাদা একদিন নদীর ওপার থেকে ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছি। খেয়ায় করে এপারে ঘাটে নেমেছি, তখন চারদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। এদিক-ওদিকে দুটো-চারটে নৌকোয় কিংবা দোকানে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন জ্বলছে।

সময়টা ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। পুজো প্রায় এসে গেছে। আমাদের পাড়ার দুর্গাবাড়িতে প্রতিমা বানানোর কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। নদীর ধারে ধারে শুকনো ডালের ঝোপে সাদা ফুলের গোছা বেরোনো শুরু হয়েছে, বাতাসে শিউলি ফুলের আলাভোলা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। রাত হয়ে গেছে, বাড়িতে নিশ্চয় চেঁচামেচি শুরু হয়েছে, আমরা হন হন করে হেঁটে আসছিলাম। হঠাৎ ঘাটের ধারে যেখানে গর্জন তেলের পিপেগুলো রয়েছে, সেখানে দেখি একটা পিপের আড়ালে দুর্গাবাড়ির প্রতিমা বানানোর কুমোর, তার হাতে একটা মাটির কলসী। আমরা এগিয়ে যেতে সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। দেখলাম একটা লোহার তার পিপের কাঠের ফাঁকে ঢুকিয়ে সে তেল বার করে কলসীতে ভরছে।

আমরা দুজনেই ব্যাপারটা দেখলাম কিন্তু তাকে কিছু বললাম না। কেনই বা বলব? আমাদের কী? যাদের তেল তারা বুঝবে। কিন্তু আমাদের দেখে কুমোর তেল চুরি করা বন্ধ করে মাটির কলসী হাতে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

এর কয়েকদিন পরে মহালয়ার দিন সকালবেলা দুর্গাবাড়িতে গেছি মার্বেল খেলতে। দেখি সেই কুমোর, তার হাতে সেই কলসী, কলসী থেকে গর্জন তেল বের করে প্রতিমার গায়ে লাগাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে ম্যাটম্যাটে দুর্গাপ্রতিমা ঝলমলিয়ে উঠল, অসুরের গায়ে কালো রঙে জেল্লা ফুটতে লাগল, সিংহের চোখমুখ ঝকঝক করতে লাগল।

আমার আর দাদার সেদিন মার্বেল খেলা হল না, আমরা সারা সকাল, দুপুরবেলা খাওয়ার সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না বাড়ি থেকে লোক খুঁজতে এল, মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই গর্জন তেল মাখানো দেখলাম। গর্জন তেল মেখে দুর্গা-অসুর-সিংহ-মোষ, দুর্গার হাতের সাপ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ, এমন কি গণেশের ইঁদুর পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা দাদার মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা কাউকে কিছু না বলে

দাদা একা একা একটা নারকেলের মালা আর এক টুকরো লোহার তার নিয়ে কোথায় গেল। ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে।

ব্যাপারটা আমি ধরতে পেরেছিলাম। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, নারকেলের মালায় করে কিছুটা গর্জন তেল খাটের পায়ার পাশে রাখা রয়েছে একটা ইঁটের গায়ে হেলান দিয়ে। দাদা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠত। উঠে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল, মালাটা ঠিক আছে কিনা। তারপর হাত মুখ ধুয়ে জল খাবার খেয়ে বাইরের বারান্দায় সিঁড়ির পাশে বসল, তারপর ধীরেসুস্থে হাতে-পায়ে, বুকে-পিঠে-মুখে সেই তেল মাখতে লাগল, যেভাবে শীতের দিনে লোকে গায়ে সরষের তেল মাখে।

বলা বাহুল্য, এর পরিণাম ভালো হয়নি। দাদার মুখ আর শরীরটা একটু চকচকে দেখাচ্ছিল কিন্তু ঐ তেল দাদার গায়ে আঠার মতো চটচটে হয়ে লেগে গেল, চোখে গিয়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল। সেদিন প্রচুর গরমজল আর সাবান-সোডা লেগেছিল দাদাকে পরিষ্কার করতে। আমার ঠাকুমা প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় দাদাকে স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

এর পর অনেক কাল কেটে গেছে। আমার দাদাও কিছুদিন আগে মারা গেছেন। দাদার মৃত্যুর সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম না। দাদার একটা ফটো এসেছে আজকের ডাকে, মৃত্যুর পরে খাটে শুয়ে আছে।

হঠাৎ ছবির মধ্যে দাদার মুখটার দিকে তাকিয়ে অনেকদিন আগের এইসব কথা মনে পড়ল। মনে হল, দাদার মুখভরা যেন গর্জন তেল মাখানো রয়েছে, ঝকমক করছে মুখটা।

মাথাফাটা মহাদেব

আমাদের গৃহদেবতা ছিলেন শিব, দেবাদিদেব মহাদেব। অবশ্য ছিলেন শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক হল না, ছিলেন কেন, তিনি এখনো আছেন। বরং স্বীকার করা উচিত, আমাদের ছেলেবয়সে তিনি কিঞ্চিৎ সুপ্ত অবস্থায় ছিলেন, তাঁর মহিমার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়নি, কিন্তু এখন তিনি রীতিমত জাগ্রত, তাঁর মহিমা মানুষেরা টের পেয়েছে। এখন তাঁর মন্দিরের চারপাশে চড়ক বা গাজনের সময়েই শুধু নয়, সারা বছর ধরেই রমরমা।

সত্যি মিথ্যে জানি না।

ইতিহাস আমার বিষয় নয়। সব তথ্য যাচাই করে নেবার সুযোগ সুবিধা আমার নেই। ছোট বয়সে যেমন শুনেছি, অন্তত এতকাল পরে যেমন মনে পড়ছে, তাই লিখছি।

আর সত্যি না হলেই বা কী আসে যায়? শেষ পর্যন্ত এটা তো একটা গল্প!

আমাদের গৃহদেবতা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন আঠারোশ সাতান্ন-আটান্নর শীতকালে। সিপাহী যুদ্ধের বছর সেটা। তিনি এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর সৈন্যশিবির থেকে। অনেকে হয়তো জানে না যে, ব্যারাকপুরে যে সময় সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়, সেই সময়ে বহরমপুরে সৈন্য-ছাউনিতেও ভয়ঙ্কর গোলমাল হয়েছিল, সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে ছোট ছোট দলে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এদের বলা হতো বাগী সিপাহী। এই রকম একটি ছোট দল এক শীতের অপরাহ্নে বহরমপুর থেকে প্রায় একশো ক্রোশ দূরে জলা বাংলার গহনে ধলেশ্বরী পূর্ববর্তী আমাদের গ্রামে উপস্থিত হয়। তাঁরা তখন পলায়নে বিপর্যস্ত, পথশ্রমে ক্লান্ত, অভুক্ত।

ঘোড়ার পিঠে খেয়া-নৌকোয় নদী পার হয়ে তারা এতদূর চলে এসেছিল। অশ্বারোহীদের দেখে গ্রামবাসীরা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের বাড়ির পিছনে আমবাগানে তারা এক রাত্রি আশ্রয় নেয়। সেই আমবাগান বহুকাল নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কিন্তু গ্রামের লোকেরা এখনো জায়গাটাকে সিপাই-বাগান বলে।

গ্রামের লোকদেব সঙ্গে সিপাহীদের বিশেষ বাক্য-বিনিময় হয়নি। তাদের উত্তরভারতীয় সংলাপ কারোরই বোধগম্য ছিল না, তবে তাদের আগমনবার্তা অতি সত্বর সদর পরগণা আটিয়ায় পৌঁছে যায় এবং পরের দিনই ফৌজদারসহ সদরপাল কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমাদের গ্রামে আসে। লোকে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, এবার একটা জোর লড়াই হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। ক্লান্ত, হতাশ বাগী সিপাহীরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের গ্রামের তিনশো বছরের নিস্তরঙ্গ জীবনে উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত এটাই ছিল একমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পুরুষ-পরম্পরায় এ কাহিনী কিশোর বয়সে আমরাও শুনেছিলাম।

সে যা হোক, বহরমপুর ছাউনি পরিত্যাগ করার সময় বাগী সিপাহীরা তাদের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে যেসব জিনিসপত্র নিয়ে আসে, তার মধ্যে একটি ছিল নিকষ কালো কষ্টিপাথরের শিবলি।

বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের সৈন্যশিবিরের ব্যারাকে মহাদেব সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা। এখনো তাই, এমন কি পুলিশের থানায় পর্যন্ত শিবমন্দির রয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে মারণবাণী হল, 'হর হর মহাদেও'।

সেই মহাদেবকে ম্লেচ্ছ ইংরেজদের কাছে ফেলে রেখে আসতে চায়নি বিদ্রোহীরা, তাবা তাদের দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। আত্মসমর্পণের সময় তাদের একমাত্র শর্ত ছিল এই, শিবলিঙ্গ তারা কোন ব্রাহ্মণের জিম্মায় রেখে যাবে।

সদরপালের অনুরোধে আমার প্রপিতামহের পিতা তখন সেই শিবলিঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাগল শিব প্রমথেশের এইভাবে অনুপ্রবেশ ঘটল আমাদের বংশে।

আমার প্রপিতামহের বৃদ্ধা পিতামহী তখনো জীবিত। তাঁর নাম ছিল বসন্তবালা। তিনি শত বসন্ত দেখেছিলেন। তিনি বহু সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, একটিও বাঁচেনি। সবাই আঁতুড়ঘরে মারা যায়। অবশেষে তিনি তাঁর এক দূরসম্পর্কের বোনের সদ্য জন্মানো শিশুপুত্রকে একটা তুলসীপাতা দিয়ে কিনে নেন। সেই তুলসীনন্দন রায়ের অযোগ্য বংশধর এই হাস্যকর লেখক, যে আপাতত চেষ্টা কবছে এই তেরো দশকের ঘটনা তেরো মিনিটের সীমানায় শেষ করতে, ইতিহাসকে হাস্যমধুর করতে।

বসন্তবালা তুলসীনন্দনকে ডেকে বলেছিলেন, 'তুলসী, শিব যখন যেচে তোমার ঘরে এসেছেন, তাঁকে ভালোভাবে রাখতে হবে। তাঁর জন্যে মন্দির বানাতে হবে, তাঁর পুজোর জন্যে গঙ্গাজল লাগবে।'

তালুকদারি এবং সেই সঙ্গে তেজারতি কারবার করে সেই সময়ে আমার প্রপিতামহের পিতার হাতে বেশ কিছু কাঁচা পয়সা ছিল।

পূজনীয়া জননীর কথামত তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যে মন্দির বানানোর আয়োজন করলেন।

যতদূর শোনা যায়, আমাদের এলাকায় সেটাই প্রথম ইঁটের দালান।

দালান বানানো তখন সোজা ছিল না। ইঁটের কোনো চাহিদাই ছিল না, ফলে বাজারে ইঁট কিনতে পাওয়া যেতো না। লোক পাঠিয়ে পূর্ণিয়া থেকে ইঁট বানানোর দক্ষ পশ্চিমা কারিগর নিয়ে আসা হল। পঞ্জিকা দেখে মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে ইঁটের পাঁজা কেটে পোড়ানোর বন্দোবস্ত হল। তার আগে প্রায় মাস তিনেক সেই কারিগরেরা বসে বসে খেলো এবং কোন জায়গার মাটি ইঁট তৈরির সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত, তার গবেষণা করতে লাগল।

অবশেষে একটা জায়গা, ঠিক আমাদের সদর ভিটের লাগোয়া, তাদের পছন্দ হল। সেখানেই মাটি কেটে ইঁটভাঁটা তৈরি হল। বছরখানেক ধরে চলল ইঁট বানানোর এলাহি কাণ্ড দূর দূর গ্রাম থেকে, এমন কি লোকে পয়সা খরচ করে খেয়াভাড়া দিয়ে পর্যন্ত ইঁট পোড়ানো দেখতে আসতো।

যতটা ইঁট প্রয়োজন ছিল, তার থেকে পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। ইঁট পোড়ানোর আশি বছর পরেও আমাদের গ্রামের বাড়ির আনাচেকানাচে উদ্বৃত্ত ইঁটের ছড়াছড়ি দেখেছি। একালের ইঁটের মত মোটেই বেঢপ নয়, বেশ লম্বাচওড়া কিন্তু খুব পাতলা, গাঢ় লাল রঙের সেসব বাংলা ইঁট সহজে ভাঙতো না।

শুধু ইঁট নয়, ইঁট তৈরির কাঠের ফ্রেম, শালের না সেগুনের, নাকি অন্য কোন কাঠের— কি জানি, তবে সেগুলো ছিল অবিনশ্বর। আমাদের রান্নাঘরে অল্পবয়সীদের খেতে বসার জন্য পিঁড়ি হিসেবে সেগুলো বহুকাল ব্যবহার করা হয়েছে। স্কুলে পড়ার সময় আমরাও তার ওপরে বসে খেয়েছি।

বাংলাদেশ-যুদ্ধের বছরে পালিয়ে আসার সময় আমাদের বাড়ির লোকেরা মহাবিপদ মাথায় নিয়ে শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নৌকো করে ব্রহ্মপুত্রের পথে ধুবড়িতে আসেন। সেসময় আমি তাদের আনতে যাই। শরণার্থী-শিবিরে পৌঁছে দেখি, অগোছালো, এলোমেলো জিনিসপত্রের আর লোকজনের মধ্যে আমার ঠাকুমা ঐ ইঁট তৈরির একটা পিঁড়িতে হাসিমুখে বসে আছেন। শুনলাম, গ্রামের বাড়ির ঘাট থেকে নৌকোয় ওঠার সময় সবাই যে যা পেরেছে দরকারি, দামী জিনিস নৌকোয় তুলেছে, আমার ঠাকুমা শুধু ঐ পিঁড়িটা তুলেছিলেন।

ঠাকুমার আনা সেই পিঁড়িটা এখন পর্যন্ত আমাদের কলকাতার বাসায় আছে। এই সব কাহিনী লিখতে গেলে, কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে, মনে না পড়লে অথবা স্মৃতিবিভ্রম হলে, এখন এমন আর কেউ নেই, যাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারি। একটা বুদ্ধি করেছি, ঐ ইঁট তৈরির পিঁড়িটা আলমারি থেকে বার করে মেঝের ওপর রেখে তার ওপর বসি, সব কথা ঝরঝর করে মনে পড়ে যায়। আজকাল খুব মোটা হয়ে গেছি, বিশাল একটা ভুঁড়ি হয়েছে আমার, মেঝেতে পিঁড়ির ওপরে বসতে খুব অসুবিধে হয়। কিন্তু কি আর করব, লেখার তাগিদে মাঝেমধ্যে এখনো খুব কষ্ট করে বসতে হয়। পিঁড়িটার ওপরে বসলে সব কথা শুধু মনে পড়ে তাই নয়, মন ভালোও হয়ে যায়।

দালান না হয় হল। কিন্তু মহাদেবের নিত্যপুজোর জন্যে গঙ্গাজল চাই।

সেকালের গ্রামে অকাজের লোকের সংখ্যা ছিল বিস্তর। এমনিতে তাদের কোনো কাজ ছিল না, কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনে তাদের লাগত। গাঁয়ের বৌকে পিত্রালয়ে পৌঁছে দেওয়া, আত্মীয়

কুটুম্বের বাড়িতে তত্ত্বতালাশ নিয়ে যাওয়া, দূরে কাছে চিঠিপত্র খবরাবর পৌঁছে দেওয়া, পোয়াতি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি নিয়ে আসা, এ ছাড়া গাঁজা খেয়ে বরযাত্রায় অংশগ্রহণ, শবদাহ এসব গুরুতর কর্ম তো ছিলই।

এরকম চারজন সৎব্রাহ্মণ যুবককে খুঁজে বার করা হল, যারা নৌকো নিয়ে ধলেশ্বরী, পদ্মা পাড়ি দিয়ে তারপর গঙ্গা বরাবর একেবারে বাবা বিশ্বনাথের মূল সাকিন কাশীধাম গিয়ে কাশীর গঙ্গার জল নৌকোর খোলে করে নিয়ে আসবে। তারপর সেই জল যেখানে ইঁটখোলা হয়েছিল, সেই ইঁটখোলাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো গভীর করে কেটে একটা পুকুর বানিয়ে সেই পুকুরের জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে। এবং সেই বিশুদ্ধ গঙ্গাজলের মিকশ্চার দিয়ে যতকাল পুকুরের জল থাকবে, ততকাল মহাদেবের নিত্যপুজো চলবে।

আমার ছোটবেলায় দেখেছি, আমাদেব চারপাশের বিশ-পঞ্চাশটা গ্রামে আমাদের গঙ্গা-পুষ্করিণীর জলের খুব ডিমাণ্ড। আমাদের সেই গঙ্গাবর্জিত দেশে কত মুমূর্ষু যে সেই পবিত্র গঙ্গোদক মুখে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। যে চারজন নৌকো নিয়ে কাশীধামে গঙ্গাজল আনতে গিয়েছিলেন, তাঁরা জল নিয়ে চারমাসের মধ্যেই ফিরে আসেন। পুণ্যবাবি সংগ্রহকারীরা গ্রামের নদীর ঘাট থেকে কালীপুজোর পরের দিন যাত্রা করেছিলেন, ফিরে আসেন দোলের অনেক আগে।

গ্রামের লোকের এতে সন্দেহ হয়েছিল, এত তাড়াতাড়ি কাশী থেকে গঙ্গাজল নিয়ে কী কবে ফিরে এল?

এই সন্দেহের অন্য একটা বড কারণ ছিল। আমাদের গ্রামেরই সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী মৌলভী তমিজুদ্দিন চৌধুরীর কাজকারবার ছিল গঙ্গা-পদ্মার সীমানায় আজিমগঞ্জ এবং রাজশাহীতে। রাজশাহী আমাদের এলাকা থেকে তখন নৌকোয় তিন-চারদিনের রাস্তা।

চারজন গঙ্গাজল-সংগ্রহকারীর মধ্যে একজনেব কথাই জানা যায়, তিনি ছিলেন রতিকান্ত চক্রবর্তী। প্রাচীন কবিরাজবংশের সন্তান। প্রথম যৌবনে সম্ভবত কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন।

সে বছর শীতের শুরুতে ধানকাটার আগে তমিজ চৌধুরী সাহেব গ্রামে ফিবে আসেন। চাষাবাদের সময় বিশেষ করে ফসল কাটার মরসুমে সেকালে প্রবাসী ব্যবসায়ী, চাকুরে সবাই বাড়ি ফেরার চেষ্টা করতেন। তমিজ সাহেবও যথারীতি সে বছর বাড়ি ফিরেছিলেন।

গ্রামে ফিরে যখন তমিজ সাহেব জানালেন যে, রতিকান্ত এবং আর তিনজন যুবক গঙ্গাজল আনতে কাশী গিয়েছে, তিনি বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কারণ সপ্তাহ দুয়েক আগেই আজিমগঞ্জের বসাকদের বাজারের পথে এই দলটির সঙ্গে হঠাৎ কয়েকবার দেখা হয়ে গেছে তাঁর। তাঁরা তাঁকে কাশী যাওয়ার কথা, গঙ্গাজল আনার কথা কিছুই বলেনি বরং নিরস্ত করতে চেয়েছিলো এবার গ্রামে ফিরতে। বুঝিয়েছিল যে, গ্রামে ওলাওঠা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। এ বছর না যাওয়াই নিরাপদ এবং সেইজন্যই তাঁরা এতদূর চলে এসেছেন।

তমিজ সাহেবের কেমন সন্দেহ হয়েছিল, তিনি প্রবীণ পাকা ব্যবসায়ী। রতিকান্ত এবং তাঁর সহচরদের হাবভাব পোশাকআশাক মোটেই তাঁর মনঃপূত হয়নি। শেষ যেদিন তিনি তাঁদের দেখেন, তখন রতিকান্ত ও তাঁর সহচরদের গলায় গোলাপী রেশমের উড়নি, দু'জনের হাতে ফুলের মালা, একজনের হাতে বাঁয়া-তবলা, এইরকম সব নানাবিধ আনুষঙ্গিক জিনিস নিয়ে

স্পষ্টতই সবাই ফূর্তির সন্ধানে যাচ্ছে। রতিকান্ত এবং দলবল তমিজ সাহেবকে দেখে পাল উড়িয়ে কেটে পড়ে কিন্তু তমিজসাহেবের বুঝতে অসুবিধে হয় না তারা কোথায় যাচ্ছে, বিশেষ করে অদূরেই গঞ্জের বিখ্যাত খারাপ পাড়া, যেখানে মেম থেকে দেহাতী বিলাসিনীদের রমরমা বাজার। তমিজুদ্দিন ছিলেন আমার প্রপিতামহের বিশেষ বন্ধু। তিনি গ্রামে ফিরে এসে রতিকান্তদের গঙ্গাজল আনতে যাওয়ার কথা শোনার পর প্রথমে বন্ধুকে এবং তারপর বন্ধুর মারফৎ তাঁর বাবা তুলসীনন্দন রায়কে সব জানালেন।

তুলসীনন্দন ব্যাপারটা সব শুনলেন। কিন্তু তিনি বেশ বিচক্ষণ লোক ছিলেন, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেলেন। এর পরে যখন রতিকান্ত-পার্টি যথাসময়ের অনেক আগেই গ্রামে ফিরে এল, তখন তাঁর আর সন্দেহ রইল না যে, এরা কিছুতেই গঙ্গাজল আনতে কাশী পর্যন্ত যায়নি। তবে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির ভয়েই এ নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না, মনে মনে ধরে নিলেন যে, কাশী পাঠানোর টাকাই জলে গেল। সেই সঙ্গে এই ভেবে সান্ত্বনা পেলেন যে, আজিমগঞ্জ থেকেও যদি জল নিয়ে আসে, সেও তো গঙ্গাজলই।

কিন্তু পরে যতদূর জানা গেছে, রতিকান্তরা আজিমগঞ্জ থেকেও নৌকোর খোলে জল ভরে আনেননি। টাকা পয়সা যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তখন তাঁরা ফেরার পথে রওনা হলেন। নৌকোর খোলে জল ভরলে বা জল উঠলে, বেশী লোক নৌকোয় থাকলে নৌকো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওঁরা আজিমগঞ্জ থেকে কয়েকজন সুন্দরী সহচরীকে নৌকোয় তুলে এনেছিলেন, ফলে খোলে জল ভরে আনার উপায় ছিল না।

গ্রামে আসার পথে ধলেশ্বরীর বাঁকে নতুনবাজারে রতিকান্ত আজিমগঞ্জ-সুন্দরীদের নামিয়ে দেয়, সেখানে তারা ছ্যাঁচা বাঁশের ঘর বেঁধে বসবাস করতে থাকে। যতদূর জানা যায়, আমাদের অঞ্চলে সেটাই প্রথম খারাপ পাড়া। খারাপ মেয়েমানুষ এদিকে সবসময়েই সব জায়গাতেই ছিল এবং আছে, তবে ধলেশ্বরী-তীরে তাদের নিজস্ব পল্লীটি রতিকান্তই প্রথম স্থাপন করেন।

গল্প অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। তবলা কামিনীরা সব কিছু বড় ঘুরিয়ে দেয়, এমন কি সোয়াশো বছর পরেও।

গঙ্গাজলের কথাটা আগে শেষ করি। নতুনবাজারে মহিলাদের নামিয়ে দিয়ে এবং কয়েকদিন সেখানে থেকে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে, কাছাকাছি ব্যবসায়ী, বণিক, জমিদারনন্দন ইত্যাদির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিয়ে অবশেষে গৃহমুখী হলেন রতিকান্ত এবং সঙ্গী তিনজন। তখন আর হাতে মালকড়ি কিছুই অবশিষ্ট নেই, থাকার কথাও নয়। শর্টকার্ট করে বাড়ি রওনা হলেন তাঁরা।

নতুনবাজার থেকে আমাদের গ্রামে সরাসরি আসার একটা পথ জলার মধ্যে দিয়ে আছে। জায়গাটার নাম হল বাঁশপচা বিল। সেই বাঁশপচা বিলের শেষ সীমানায় দশ গাঁয়ের শ্মশানঘাট, শ্মশানঘাট থেকে খালের পথে তিন ক্রোশ দূরেই আমাদের গ্রাম।

রতিকান্তরা নাকি ঐ বাঁশপচা বিলের শ্মশানঘাটের জল নৌকোর খোলে ভরে নিয়েছিলেন। মনে মনে তাঁদেরও একটা অবশ্য বক্তব্য ছিল, মহাদেব হল শ্মশানের দেবতা, শ্মশানে-মশানে নন্দী-ভৃঙ্গী নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়, কাশীর গঙ্গাজলের থেকে বাঁশপচা বিলের শ্মশানঘাটের জলই তাঁর অনেক বেশি পছন্দ হবে এবং এতে কোনো পাপ বা ক্ষতি হবে না।

অবশ্য কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। অবাক পাশের গাঁয়ের লোকেরা, দূরদূরান্তের ভক্ত

সাধারণ মানুষেরা পুরুষানুক্রমে গঙ্গাজল জ্ঞানে আমাদের সেই পুকুরের জল গ্রহণ করেছে।

রতিকান্ত চক্রবর্তীরও কোনো ক্ষতি হয়নি। পরবর্তী জীবনে তিনি পারিবারিক কবিরাজি ব্যবসায়ে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করেন। ঈর্ষণীয় হাতযশ ছিল তাঁর।

তবে পঞ্চাশ বছর পরের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা উচিত। তাঁর এক দৌহিত্রী, আমার বড় জ্যাঠাইমা এই গল্পটা বলেছিলেন। রতিকান্ত চক্রবর্তীর মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁর শিয়রে গীতাপাঠ করা হচ্ছে, কানে নারায়ণমন্ত্র জপানো হচ্ছে, সেই সময়ে তাঁর মুখে গঙ্গাজল, মানে ঐ গঙ্গাপুষ্করিণীর জল দেওয়ার বহু চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, মুখে গঙ্গাজল দেওয়ায় যথাসাধ্য বাধা দিয়েছেন, এই মুমূর্ষু অবস্থার মধ্যেই নাতনীর হাত থেকে তামার কোষা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

অবশ্য এসব অনেক কাল পরের কথা। আঠারশো ষাট সালের ভেজাল গঙ্গাজলের কথা উনিশশো দশে রতিকান্তের মৃত্যুকালে কেই বা মনে রেখেছিল, মনে রাখার জন্যে কতজনই বা বেঁচে ছিল!

আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি, তখন মন্দিরের বয়েস আশি বছব পার হয়ে গেছে; গঙ্গাপুষ্করিণীর পবিত্রতা নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্ন নেই।

এই দীর্ঘ আশি বছর, মহারানী ভিক্টোরিয়া থেকে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, বড়সড় গোলগাল খাঁটি তামার ডবল পয়সা থেকে ছোট, চৌকো হালকা ব্রোনজের আধ-আনি, অনেক টানাপোড়েন, উত্থানপতনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে সময় পাড়ি দিয়েছেন আমাদের শিবঠাকুর।

প্রথম যেবার টেলিগ্রাফের তার টানা হয় আমাদের গ্রামে, তারের একটা খুঁটি পড়েছিল শিবমন্দিরের বাঁহাতি চাতালে, ডাকবিভাগ কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিল তার দরুণ, আমাব প্রপিতামহ তাতে রাজি হননি, খুঁটি তুলে ফেলতেও তিনি বলেননি, তাব বদলে ডাক-তাব দপ্তরের বড়সাহেব প্রতি বছর, বহুকাল ধরে, সে আমরাও দেখেছি—টেলিগ্রাম পাঠাতেন চড়কের আগের দিন নীল ষষ্ঠীর দুপুরে, যার বয়ান ছিল (ঠিকানা সমেত) :

LORD SHIVA

RAY BARI

PURBA PARA

Message begins : MERRY CHARAKA. MANY HAPPY RETURNS OF THE DAY.

সাদাবাংলায় যার মানে হল,

মহামান্য শিবঠাকুর

রায়বাড়ি

পূর্বপাড়া

চড়কের আনন্দের দিন বার বার ফিরে আসুক।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই টেলিগ্রামটার জন্যে নীচ জাতি মূর্খ-দরিদ্র-অসহায় শিবভক্তেরা অধীর অপেক্ষা করত নীল ষষ্ঠীর সারাদিন। আমি বাবুদের বাড়ির ছেলে, দুরুদুরু বক্ষে বারান্দায় বসে ভাবতাম, ভয় পেতাম, এবার নিশ্চয় টেলিগ্রামটা আসবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি টেলিগ্রামটা এসে যেতো। আর সঙ্গে সঙ্গে খোল, করতাল, ঢাক, শঙ্খ সব একসঙ্গে বেজে উঠত। আর কাঁধে, পিঠে ও পাছায় তিন-তিন ছটা বঁড়শি গেঁথে কামারপাড়ার জগন্নাথ, আমরা বলতাম জগামামা, আমার দিদিমাকে মা ডাকতো সে, শূন্যে উঠে যেতো।

কয়েকটা ছোটখাটো দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা, দুটো বিশ্বযুদ্ধ, দুটো বঙ্গভঙ্গ, একটা মহামন্বন্তর এবং প্রায় নিয়মিত বন্যার ঘোলা জলের ধাক্কা খেয়েও পূর্ণিয়ার রাজমিস্তিরিদের তৈরি সেই ইঁট সুরকির দালান ভালোই টিকে রইল। এখনো ধোয়ামোছা, সামান্য মেরামতি আর চুনকাম করলে পোড়ো বাড়ির শূন্য ভিটেয় সেই প্রাচীন মন্দির বেশ সাব্যস্ত দেখায়।

মহাদেবের খুব খাঁই নেই, মন্দির-লাগোয়া গঙ্গাপুষ্করিণীর পারে একটা বেলগাছ লাগানো হয়েছিল সেই কোন কালে, তারই চারায় চারায় চারপাশটা জঙ্গল হয়ে উঠেছিল অনেকদিন আগেই। তাছাড়া মন্দিরের চারপাশে তুলসী আর ধুতরোর ঝোপ বহুকাল ধরেই রয়েছে।

একটা ধুতরোর ফল কি ছোট কাঁচা বেল, দুটো দূর্বাঘাস আর তুলসীপাতা, সেই সঙ্গে সামান্য বেলপাতা আর গঙ্গাপুষ্করিণীর জল—ওতেই শিবঠাকুর খুশি থাকেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই আমরা গ্রামের বাড়ি ছেড়েছিলাম। তারপর দেশভাগ হওয়ার পর দেশছাড়াও হয়েছি বহুকাল। কাছাকাছি শহরে একটা আস্তানা ছিল, সেটা কোনোক্রমে এখনো আছে। কালেভদ্রে সেখানে যাই।

আমাদের শিবঠাকুর ছিলেন নিতান্তই গ্রাম-দেবতা। লোকে ভয়-ভক্তি করত, আপদে-বিপদে মানত করত। চড়কের সময় শিবমন্দিরের সামনের আগাছা পরিষ্কার করে নদীর ধারে যাওয়ার রাস্তা ধরে মাঝারি মাপের মেলা বসত।

নতুন বিয়ের পর বরকনেকে মহাদেব প্রণাম করিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। পরীক্ষার দিন সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে ছেলেমেয়েরা শিবমন্দিরের দরজায় কপাল ঠেকিয়ে, সিঁড়িতে প্রণাম করে চলে যেতো। গ্রামে বসন্ত-কলেরা লাগলে সারা মুলুকের খ্যাতনামা গেঁজেলরা একত্র হয়ে ধুনি জ্বালিয়ে সারারাত বোম-বোম শব্দ করে শ্রীশ্রী ত্রিলোকনাথের পুজো করত। কালেভদ্রে এক-আধজন সন্ন্যাসী বা দরবেশ এসে বেলতলায় আখড়া জমাতো, গাঁজার গন্ধে ছেয়ে যেতো পূর্বপাড়া।

এইরকম ভাবে মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। সারা বছর আমরা কোনো খোঁজ রাখতাম না, শুধু চড়কের সময় বাবা কিংবা জ্যাঠামশায় মন্দিরের অবৈতনিক পুরোহিতকে কিছু থোক টাকা পাঠাতেন—সেটাই ছিল তাঁর বাৎসরিক অনুদান। বাকি সারা বছরের চালকলা, পয়সা তিনি যেটুকু পারতেন সংগ্রহ করতেন ভক্তদের কাছ থেকে, ঐ যাঁরা পুজোটুজো দিতে আসতেন।

উনিশশো পঞ্চাশ কি একান্ন সালে, সেই বড় দাঙ্গার পর আসাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এলেন কামালসাহেব নামে এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান ব্যবসায়ী। তখন আমাদের ওখানে হিন্দুরা জমিজমা বেচে চলে আসছিল। ভদ্রলোক প্রচুর পরিমাণে জোতজমি কিনে, নদীর ধারে একটা চমৎকার আসাম প্যাটার্নের বাংলোবাড়ি বানিয়ে বসবাস শুরু করলেন।

কামালসাহেব ছিলেন প্রচণ্ড ফুটবল প্রেমিক। আমাদের গঙ্গাপুষ্করিণীর পিছনদিকে বিঘে দশেক উঁচু ফাঁকা জমি ছিল কাদের যেন, আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি, সেখানে তামাক চাষ হত। শীতের দিনে গ্রামের বাড়িতে গেলে সেই তামাক ক্ষেতের পাশে ভোরবেলায় একটা ক্ষীণ

মাদক গন্ধ নাকে আসত, সেই গন্ধটা এখনো আলতো ভাবে মনে করতে পারি। অরেকটা গন্ধ ছিল তামাকের পাতা ছিঁড়ে হাতে ঘষলে একটা কষায় ঘ্রাণ পেতাম, তাতেও মাদকতা কম ছিল না।

কামালসাহেব সেই দশ বিঘে তামাকের ক্ষেতটা কিনে নিয়ে, সমান করে ঘাস লাগিয়ে একটা চমৎকার ফুটবল গ্রাউণ্ড বানিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর পরলোকগত পিতৃদেবের নামে একটা বাৎসরিক শিল্ড ম্যাচের বন্দোবস্ত করেন, 'ওসমান আলি মেমোরিয়াল শিল্ড'।

কয়েক বছরের মধ্যেই সেই টুর্নামেন্ট অতি জনপ্রিয় ও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মাণিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, এমন কি দু'-এক বছর ঢাকা থেকেও সেখানে সব নামকরা টিম খেলতে আসে।

তখন আর আমি ওখানে থাকি না। সুতরাং কিসে কী হয়েছিল পরিষ্কার করে বলতে পারব না, তবে সাতান্ন আটান্ন সাল নাগাদ বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, আমাদের মহাদেবের খুব নাম হয়েছে, তাঁকে সবাই ফুটবলের শিব বলছে। ফুটবল খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের তিনি চোখের মণি। মাণিকগঞ্জের ইলেভেন বুলেটস টিমের ম্যানেজার নিজের পয়সা খরচ করে শিবমন্দির সংস্কার করে দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত এইভাবে। হারু বিশ্বাস নামে একটি ছেলে কোন্ এক দূরের গঞ্জের টিমের গোলকিপার। খেলার মাঠে যাওয়ার পথে শিবমন্দির দেখে সে, সেখানে একটা প্রণাম করে যায়। সেদিন তাদের খেলা ছিল ঢাকার এক দুর্ধর্ষ মারকুটে টিমের সঙ্গে। খেলা আরম্ভ হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে হারু বিশ্বাসের দলের দুজন বাঘা খেলোয়াড় গুরুতর আহত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করে, তখন বদলি প্লেয়ার নেওয়া যেতো না, তাদের ন'জন প্লেয়ার নিয়েই সর্বক্ষণ খেলতে হয়।

কিন্তু সেদিনের খেলায় হারু বিশ্বাসের দল হারেনি। সেদিন বাঘের মতন খেলেছিল হারু, বিপক্ষের এগারো জনের বিরুদ্ধে সে একাই একশো হয়ে লড়েছিল। গোলপোস্টের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মত সেই খেলা। যারা সে খেলা দেখেছিল, তাদের মনে হয়েছিল হারুর ওপর কিছু যেন একটা ভর করেছে, হারু দুলঙ্ঘ্য, দুর্ভেদ্য, দুর্বার হয়ে উঠেছিল।

এই সঙ্গে আরো একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল সেদিন বিকেলে। হারুর সঙ্গী যে দু'জন প্লেয়ার আহত হয়েছিল তাদের, মধ্যে একজন গঙ্গাপুষ্করিণীর জলে খেলার শেষে স্নান করে। স্নান করে জল থেকে ওঠার পরই নাকি সে হঠাৎ বোধ করে যে, তার সমস্ত ব্যথা মিলিয়ে গেছে, কোনো যন্ত্রণা নেই, এমনকি একটু আগে যে অতটা আঘাত লেগেছিল, সেটা কোথায় লেগেছিল বুঝতে পারছে না।

সেদিন খেলা ড্র হয়েছিল, মফঃস্বলের সাবেকি নিয়ম অনুযায়ী পরের দিন সকালে আবার খেলা। সেই খেলায় সেরে ওঠা ছেলেটি নিজেই দু'গোল দিয়ে ঢাকার টিমকে পর্যুদস্ত করে দিল।

বলা বাহুল্য, ওর সঙ্গী অন্য যে ছেলেটি আহত হয়েছিল, সে পরের দিন আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সে-মরসুমে আর একটি খেলাও খেলতে পারেনি।

এই কাকতালীয় হ য ব র ল ঘটনায় কে কী করে অলৌকিকত্ব খুঁজে বার করেছিল, সে খবর জানা নেই, তবে দু'-একটি খুচরো খবর সেবার শুনেছিলাম।

প্রথম খবর হল, ঐ দ্বিতীয় ছেলেটি যে প্রায় পঙ্গু হয়ে সে বছর আর খেলতে পারেনি সে পরের বছর খেলার মরসুমের আগে শিবমন্দিরে প্রণাম করে এবং গঙ্গাপুষ্করিণীতে ডুব দিয়ে খেলোয়াড়ত্ব ফিরে পায়, তার পঙ্গুত্বের অবসান হয়।

দ্বিতীয় হল, কোনো এক ঝানু টিমের ম্যানেজার এসব শুনে বুজরুকি বলে ব্যঙ্গ করে। সেই দল প্রথম খেলাতেই চার-শূন্য গোলে হেরে 'ওসমান আলি মেমোরিয়াল শিল্ড' থেকে বিদায় গ্রহণ করে। আগের বছর তারা ফাইনালে উঠেছিল।

এই রকম টুকরো-টাকরা, বাস্তব-অবাস্তব, সত্যি-মিথ্যে হাজার খুচরো ঘটনা পল্লবিত হয়ে দু'তিন বছরের মধ্যে আমাদের শিবঠাকুরকে ফুটবলের জাগ্রত দেবতারূপে বিখ্যাত করে। অনেক দূর দূর থেকে খেলোয়াড়রা দলবলসহ এসে মহাদেবের মাথায় ফুটবল ঠেকিয়ে যেত।

চামড়ার ফুটবল, কিসের না কিসের চামড়া, মহাদেবের পবিত্র শিরে স্পর্শ করানো উচিত কিনা, এ নিয়ে সংস্কার-ভীরু গ্রামবাসী কারো কারো মনে যেমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তেমনি চিন্তা দেখা দিয়েছিল অহিন্দুর মন্দির প্রবেশ নিয়ে। কিন্তু স্বভাবত ধর্মাধর্মহীন সমতল পূর্ববঙ্গে এ সব আপত্তি ও চিন্তা মোটেই টেঁকেনি। তবে কোনো কোনো বুদ্ধিমান দল টিমে অন্তত একজন করে হিন্দু প্লেয়ার রাখতো ফুটবল মহাদেবকে পুজো দিয়ে আসার জন্যে, কোনো কোনো টিমে ব্রাহ্মণ খেলোয়াড় ছিল বাঁধা।

সেই ভরা পাকিস্তানী জমানায় ফুটবলের দৌলতে মন্দিরের চাতাল বাঁধানো হয়েছিল, গঙ্গাপুষ্করিণীর ভেঙে যাওয়া, ধসে পড়া ঘাট নতুন করে গড়া হয়েছিল। চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক পুজোয় শুরু হত ফুটবল মহাদেবের আরাধনা আর গড়াতো শীতের শুরু পর্যন্ত যতদিন ফুটবল খেলা চলে।

মধ্যে কয়েক বছরের খবর জানি না। এর মধ্যে বাংলাদেশ যুদ্ধ এসে গেছে, স্বাধীনতার লড়াই। সেই স্বাধীনতার লড়াইতে আমাদের মহাদেব এক অলৌকিক কাণ্ড করলেন।

হানাদার সৈন্যরা একদিন আমাদের গ্রামে ঢুকেছিল। গ্রাম তখন শুনসান, প্রায় সবাই পালিয়েছে। সৈন্যরা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে শিবমন্দিরে ঢুকল কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখতে। সেখানে ঐ বিশাল কালো শিবলিঙ্গ দেখে তাদের মাথায় ভূত চড়ে গেল।

সেই সৈন্যরা আর কী করে জানবে যে এ যা-তা জিনিস নয়, খাঁটি জাগ্রত দেবতা! তা ছাড়া এসেছে বিদ্রোহের সৈনাছাউনি থেকে, তাদেরই কারো কারো পূর্বপুরুষ হয়তো সেই ছাউনি থেকে একই সঙ্গে সেই আঠারোশ সাতান্নয় বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল।

এত কথা নিরেট হানাদারদের ভাববার কথা নয়। কোনো কিছু চিন্তা না করে এদের মধ্যে একজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে শিবঠাকুরের নিকষ কালো মাথায় সজোরে আঘাত করল।

ফলাফল হল ভয়াবহ। শিবঠাকুরের শিরে সামান্য একটু চিড় পড়ল বটে, কিন্তু সেই রাইফেলের নল থেকে পরপর দু'টি গুলি বেরিয়ে, যে আঘাত করেছিল তাকে আর তার মেজরকে, যে পিছনেই দাঁড়িয়েছিল, ধরাশায়ী করে ফেলল। অন্যেরা এই বিপজ্জনক ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে মন্দির ত্যাগ করে দ্রুত পলায়ন করল। মহাদেবের এই বীরত্বের কাহিনী দূরদূরান্তে, এমন কি এপারের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনা একাত্তর সালের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় ঘটেছিল। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সেই দশাসই লাশদুটো পড়ে ছিল মহাদেবের চরণতলে।

পরে যথারীতি লাশদুটি গোর দিয়ে শিবমন্দির গঙ্গাপুষ্করিণীর জলে ধুয়ে পবিত্র করা হয়। দেখা যায় মহাদেবের মাথায় একটা চেরা দাগ, সেটা বেশ স্পষ্ট। তাছাড়া বাকি শরীর মোটামুটি অক্ষত।

সেই মহাদেবের পুজো এখনো চলছে। কালাবসানে তাঁর ফুটবল গরিমা অবলুপ্ত হয়েছে। লোকে তাঁকে এখন মাথাফাটা মহাদেব বলে ডাকে। তবে তাঁর নাম এখন গঙ্গাপুষ্করিণীর জন্যে। গঙ্গাপুষ্করিণীর খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত হয়েছে। নিকট ও দূরের গ্রামে গ্রামে সেই পুকুরের জল লোকেরা ব্যথাবেদনার উপশমের জন্যে নিয়ে যায়, মন্ত্রের মত ফল হয়। রতিকান্ত চক্রবর্তীর বাঁশপচা বিলের জলের মহিমা এখনো প্রবহমান।

সারা বছর লোকের ভিড় লেগে থাকে। সবচেয়ে বেশি জমজমাট মাথাফাটা মহাদেবের চড়কের মেলা। ওসমান আলি মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টের মাঠে সাতদিন ধরে মেলা বসে। শিল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ করতে এজন্যে প্রত্যেক বছরই দেরি হয়। কিন্তু কী করা যাবে?

যুদ্ধের গল্প

গাঁয়ের বাড়ির পাশে একটা এজমালি মানে ভাগের পুকুরে আমাদের এক আনা দু'-আনা অংশ ছিল। আমরা সারা বছর গাঁয়ে থাকতাম না। পুজো-পার্বণে, ফসল কাটার সময় কেউ-কেউ যেত, বাকি বছরটা কাছেই কয়েক মাইল দূরে শহরে আমাদের বাসাবাড়িতে, ইস্কুল-কাছারি সব সেখানে, আমরা সেখানেই থাকতাম।

গাঁয়ে বসবাস করা হত না বলে দেখাশোনার অভাবে এজমালি পুকুরের আমাদের অংশটা জ্যাঠামশায় ইজারা দিয়েছিলেন পাট কোম্পানির দারোয়ান সুরজলালকে।

দ্বারভাঙ্গা নিবাসী সুরজলালের পিতামহ অনেকদিন আগে কী করে মধ্যবাংলার ঐ গহন প্রদেশে এসে পৌঁছেছিল নিতান্ত জীবিকার টানে। তারপর তারা ওখানেই শিকড় গেড়ে বসে যায়। এক রকম দেহাতি টানে পূর্ববঙ্গীয় বাংলায় কথা বলত সুরজলালেরা। আচারে-আচরণে প্রায় বাঙালিই হয়ে গিয়েছিল, শুধু মাছ খাওয়া ছাড়া।

সুরজলালের মা-ঠাকুমাকে আমরা গাঁয়ের বাড়িতে দেখেছি। সুরজলালের মা কিংবা ঠাকুমা, আমরা মাছ খাই বলে কখনও আমাদের বাড়িতে খেত না। জলতেষ্টা পেলেও গেলাসে জল খেত না। মাছের ছোঁয়া আছে বলে হাতের আঁজলা ভরে জল খেত। সুরজলাল ছিল ব্যতিক্রম। বাধ্য হয়েই ব্যতিক্রম। বিপত্নীক সুরজলাল প্রৌঢ় বয়েসে মাছ খাওয়া আরম্ভ করেছিল। মাঝিবাড়ির এক সোমত্ত বিধবা বৌ পাট কোম্পানির অফিসঘর ঝাঁট দিত, বাবুদের খাওয়ার জল তুলে দিত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঁদারা থেকে। কালক্রমে সে সুরজলালের রান্নাবান্না, দেখাশোনা এবং অবশেষে তার সঙ্গেই দারোয়ানের ঘরে বসবাস শুরু করে।

পশ্চিমা পাড়ায় সুরজলালের স্বজাতিরা থাকত এবং মাঝিপাড়ায় এ নিয়ে ঢিঢি পড়ে যায়, কিন্তু গ্রামের সমাজ ধীরে ধীরে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল। তখন এরকম আকছার, এদিক-ওদিক চাপা কথাবার্তা, নিন্দেমন্দ হত, তারপর যথানিয়মে একদিন গুঞ্জন থেমে যেত।

ঐ মাঝি বৌ মণিবালার সাহচর্যে সুরজলাল মাছ খাওয়া ধরে। চরিত্রস্খলন হলেও লোকটি মোটামুটি বিশ্বাসী ছিল। আমাদের গাঁয়ের বাড়ির পুকুরের অংশ ছাড়াও আরও অনেক কিছুর দেখাশোনার ভার সুরজলালের ওপর দেওয়া ছিল। আমরা যদি কখনও গ্রামে যেতাম, কয়েকদিন আগে সুরজলালকে ঘরের চাবি পাঠিয়ে দেওয়া হত। সুরজলাল ঘর খুলে ঝেড়েমুছে আমাদের

যাওয়ার জন্য ঠিকঠাক করে রাখত। উনিশশো পঞ্চাশ সালে কী সব জিনিসপত্তর কেনা-কেটা করতে গিয়ে ঢাকা শহরে সুরজলাল দাঙ্গায় খুন হয়েছিল। তবে সে অন্য এক খারাপ গল্প। আমাদের এই যুদ্ধের গল্প এর আট বছর আগের।

উনিশশো বেয়াল্লিশ সালের শীতকাল বোধহয় সেটা। মন্বন্তরের আগের বছর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে পুরোদমে। জাপানীরা কলকাতা, চাটগাঁয়ে বোমা ফেলে গেছে। চারদিকে সাজ সাজ হই হই রব। সবাই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে। কেউ কেউ বলে, জাপানিরা এই এল বলে, ইংরেজ রাজের দিন শেষ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বোমারু বিমান গণ্ড মফঃস্বলের আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে চলে যায়। লোকে ঘাড় কাত করে দিগন্তে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বিমানগুলোকে ভয়ে ও বিস্ময়ে দেখে যায়।

তখনো বড় ইস্কুলে যাইনি। পাড়ায় পাঠশালার নিচু ক্লাসের ছাত্র আমি, দাদা এক ক্লাস ওপরে। পাঠশালাতেও যুদ্ধের কথা হয়। লোকে কলকাতা থেকে পালিয়ে মফঃস্বলে আসা আরম্ভ করেছে জাপানী বোমার আতঙ্কে। কামরা-ভর্তি ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ নিয়ে শেয়ালদা থেকে ট্রেন এসে পৌঁছাচ্ছে সিরাজগঞ্জে, গোয়ালন্দে। সেখান থেকে নৌকোয়, স্টিমারে, লঞ্চে অথবা সম্ভব হলে ঘোড়ার গাড়ি করে লোকজন চলে যাচ্ছে নিজেদের গাঁয়ের পুরনো ভিটেয়। তখনও ভিটেমাটি মানুষের ছিল, বিপদে দাঁড়ানোর জায়গা ছিল।

পাঠশালায় দৈনিক দু'চারটে নতুন মুখ দেখা যেত। কলকাতা থেকে পলাতক পরিবারের শিশু। তাদের জামাকাপড়, কথাবার্তা, আচরণ সব আলাদা, আমরা রীতিমত সমীহ করতাম তাদের। তারা অত্যন্ত গর্বিতভাবে কলকাতার জাপানী বোমার গল্প আমাদের বলত।

আমাদের পাঠশালার হেডমাস্টার ছিলেন প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত। খুব কড়া ও খটমটে প্রকৃতির মানুষ। একদিন যুদ্ধের গল্প বলেছে বলে আনকোরা নতুন একটা ছেলেকে কান ধরে সারা দুপুর বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলেন। আগে এরকম উনি অনেক করেছেন, এবারে এর পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। সেই পরিণতিতে পৌঁছানোর পূর্বে সুরজলালের সামান্য বৃত্তান্তটি সেরে নিই। কারণ সেখানেই এই ক্ষুদ্র কাহিনীর রহস্য নিহিত রয়েছে।

শীতকালের সকাল। আমাদের দালানের সবচেয়ে দক্ষিণ দিকের ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে আমি আর দাদা তক্তাপোষে শুয়ে আছি। বেলা বেশি হয়নি, তবে বন্ধ জানলার ফাঁকফোঁকর দিয়ে সূর্যের আলোর রেখা ঘরে ঢুকছে আর সেই সঙ্গে একটা আঁশটে গন্ধ। এই আঁশটে গন্ধটা আমাদের চেনা। এর মানে হল, সুরজলাল আর মণিমালা মাছ নিয়ে এসেছে গাঁয়ের বাড়ি থেকে, সঙ্গে অবশ্যই তরিতরকারি বা ফলমূল যা কিছু হয়েছে আমাদের জমিতে, তার ভাগ।

মাছ-তরকারি জিনিসপত্র নিয়ে সূর্য ওঠার আগেই সুরজলাল আর মণিবালা রওনা হয় গাঁথেকে, তার আগে মাছ ধরা শুরু হয়ে থাকে শেষরাতে। তরকারি তুলে রাখা হয় আগের দিন।

রোদ উঠতে উঠতে ওরা দুজনে পৌঁছে যায় শহরে। বাড়িতে এসে কাউকে ডাকে না, ডাকতে হয় না। আমাদের শোয়ার ঘরের সামনের বারান্দায় এসে বসে। যে ভাবেই হোক, সবাই টের পেয়ে যায় ওরা এসেছে। সবাই একবার করে এসে দেখে যায় কী মাছ, কী তরকারি এল। একটু পরে মা এসে সুরজলালকে বলে, 'মাছ-টাছগুলো রান্নাঘরে নামিয়ে দিয়ে এস।' মা মণিবালাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিতো না সে দুশ্চরিত্রা বলে।

সে যা হোক, সেদিন সকালে মাছের আঁশটে গন্ধ পাওয়া মাত্র আমি আর দাদা দুজনে লেপের মোহ কাটিয়ে বারান্দায় গেলাম সুরজলাল কী মাছ এনেছে সেটা দেখতে। প্রচুর বেগুন, ফুলকপি, সাদা একটা বিবাট মিষ্টি কুমড়ো আর বেশ মাঝারি আয়তনের দুটো কাতলা মাছ। দীর্ঘপথ এত ভারি জিনিস বহন করে এনে এই শীতেব সকালেও সুরজলাল এবং মণিবালা তখনও দরদর করে ঘামছে। বারান্দায় বসে হাঁপাচ্ছে।

সুরজলালের সঙ্গে আমার এবং দাদার দুজনেরই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা, আলোচনা হত। তাঁর বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিষয়ে আমার এবং দাদার যথেষ্ট উচ্চ ধারণা ছিল।

নদীতে সাঁতরানোর সময় কুমীব হঠাৎ পা কামড়ে ধরলে কী করতে হবে কিংবা কোনও পানাপুকুবে অনেকগুলো বড় কালো হাঁড়ি ভাসতে দেখলে বুঝে নিতে হবে যে, ঐ হাঁড়িগুলোর মধ্যে মাথা লুকিয়ে ডাকাতেরা রয়েছে, রাত হতেই পাশেব গৃহস্থবাড়িতে ডাকাত দল চড়াও হবে। দ্বারভাঙ্গাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহব (ঢাকা-কলকাতার চেয়েও বড়), তাদের দ্বারভাঙ্গার মহারাজাই যে পৃথিবীব সবচেযে ধনী ব্যক্তি, এসব জ্ঞান ঐ শিশু বযেসেই আমবা সুবজলালেব কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

এবার দেখলাম, সুরজলাল যুদ্ধ নিযে খুব ভাবিত। তাব একটা বড কারণ ছিল তার পাট কোম্পানির দারোয়ানি চাকরি। পাট কোম্পানির সাহেবেরা যুদ্ধেব দামামা বাজতেই সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে লড়াই করতে ফ্রন্টে চলে গেল। খুব বুড়ো বা অথর্ব দু'চারজন বয়ে গেছে ব্যবসা দেখার জন্যে। তারা রেডিয়োতে রাতদিন খবর শোনে আর আলোচনা করে, শুনে শুনে সুরজলালও যুদ্ধের চিন্তায় জড়িয়ে পড়েছে।

কলকাতায় যে বোমায় লাখখানেক লোক মারা গেছে, 'গবমেন্ট' সব গোপন কবেছে, বৈদ্যরা যে বার্মা দখল করে নিয়েছে, বৈদ্যরা চট্টগ্রাম আক্রমণ কবে সমুদ্রেব সঙ্গে মিশিযে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, বৈদাবা যে আব কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা কলকাতা, সিরাজগঞ্জ ময়মনসিংহ, এমন কি আমাদের গ্রাম-গঞ্জ সব আক্রমণ কববে—সুরজলালের মুখে এ সব কথা শুনে সেই সাতসকালে আমাদের বুক ঢিপ-ঢিপ কবতে লাগল। আমাদের গায়ের লোম সমস্ত খাড়া হয়ে উঠল।

কিন্তু 'বৈদ্য' ব্যাপারটা আমরা ঠিক ধরতে পারলাম না। সুরজলালকে বললাম, 'কিন্তু সুরজদা, সবাই যে বলছে জাপানীরা বোমা ফেলছে, জাপানীবা আক্রমণ করছে, তুমি বৈদ্য বলছ কেন? বৈদ্য মানে কী?'

খুব গম্ভীরভাবে তখন সুরজলাল সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'জাপানীরা বৈদ্য।'

এতদিন পরে এখন বুঝি, সুবজলাল আসলে বৈদ্য বলতে 'বৌদ্ধ' বোঝাতে চেয়েছিল। পাটের সাহেবদের আলোচনায় সে জানতে পেরেছিল যে জাপানীরা বৌদ্ধ এবং সেই জ্ঞানটা আমাদের চালান করেছিল।

এই জ্ঞান আমার আর দাদার পক্ষে ভয়াবহ হয়ে উঠল। বৈদ্য কথাটা আমাদের জানা, যদিও পুরো ধারণা নেই, কিন্তু সুরজলাল যে বলল, বৈদ্যরা জাপানী কিংবা জাপানীরা বৈদ্য, এ কথার মানে কী?

একটু পরে ঠাকুরঘরের দাওয়ায় রোদ্দুরে বসে নারকেলনাড়ু দিয়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে দাদা ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কর্তামা, বৈদ্য কারা?'

আমরা ঠাকুমাকে কর্তামা বলতাম। কর্তামা মালা জপ করছিলেন তখন, তবে সব সময়েই কর্তামা চোখ আর কান খোলা রাখতেন। সব কথা শুনতেন, প্রয়োজনে জবাব দিতেন। সব কিছু দেখতেন, প্রয়োজনে মন্তব্য করতেন। দাদা ছিল কর্তামার প্রিয়তম নাতি। দাদার প্রশ্ন শুনে কর্তামা জপ-মালার আবর্তন থামিয়ে বললেন, 'আমরা যেমন বামুন, বৈদ্যরা তেমনি বৈদ্য, সুরজলালরা হিন্দুস্থানী, মণিবালারা মাঝি, রফিকরা মুসলমান। তারপর জপমালা এক রাউণ্ড ঘুরিয়ে আবার বললেন, 'তোতনরা ব্রাহ্ম, নলিনী বৌদিরা কায়েত।'

দাদা এত বিস্তৃত বিবরণ চায়নি, দাদা তাই বলল, 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু কর্তামা বৈদ্য কারা?'

কর্তামা জপমালা থামিয়ে বললে, 'সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত এরা সব বৈদ্য। আমাদের পাশের বাড়ির ঐ নন্তুরা সেনগুপ্ত, থানার ছোট দারোগা কানাই সেনগুপ্ত এরা হল বৈদ্য।'

আমি আর দাদা দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে সব শুনছিলাম। দাদা ঝট্‌ করে প্রশ্ন করল, 'দাশগুপ্ত? আমাদের পাঠশালার হেড স্যার প্রশান্ত দাশগুপ্ত?'

কর্তামা দ্বিধা না করে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রশান্তবাবুও বৈদ্য।' তারপর দ্রুত জপমালা চালাতে চালাতে বললেন, 'কে বৈদ্য, কে বামুন এসব দিয়ে কী হবে? যাও, আর বিরক্ত কর না।'

আমরা চলে এলাম বটে, কিন্তু তখন আমাদের মাথায় ঘুরছে, বৈদ্যরা জাপানী, জাপানীরা বৈদ্য, জাপানীরা বোমা ফেলছে, আক্রমণ করছে, হেডস্যার দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত বৈদ্য, বৈদ্যরা জাপানী।

সেইদিন পাঠশালায় গিয়ে আমরা দূর থেকে হেডস্যারকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্টাডি করলাম। পুরো শত্রুর মত চেহারা, শত্রুর মত হাবভাব, আচার আচরণ। আমি আর দাদা বিস্তর গবেষণা করলাম, মাথা ঘামালাম। তারপর স্থির নিশ্চিন্ত হলাম যে—বার্মা দখলে, চট্টগ্রাম আক্রমণে, কলকাতায় বোমা ফেলায় হেডস্যার প্রশান্ত দাশগুপ্তের হাত আছে।

কলকাতা থেকে আগত নতুন সহপাঠীদের সঙ্গে এ বিষয়ে খুব ফিসফিস করে আলোচনা করলাম। তাদের মধ্যে একজন, যাকে যুদ্ধের গল্প বলার জন্য প্রশান্ত-স্যার কানে ধরে বেঞ্চির ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, সে গম্ভীর হয়ে বলল যে, সে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল প্রশান্তবাবু জাপানীদের স্পাই। খিদিরপুর ডকে যেদিন বোমা পড়ে, সে প্রশান্তবাবুকে কলকাতায় হাতিবাগান বাজারে দেখেছিল।

রেডিয়োতে, খবরের কাগজে স্পাই, গুপ্তচর ও পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে তখন জোর প্রচার চালাচ্ছে মিত্রশক্তির তরফে ভারত সরকার। প্রশান্তবাবু যে জাপানীদের স্পাই, এ কথাটা রটতে ঘণ্টা আটেক লেগেছিল। পাঠশালা থেকে ছাত্রদের বাড়ি ঘুরে বড় রাস্তা, রেস্টুরেন্ট, বটতলা, নদীর ঘাট হয়ে অফিস-আদালত হয়ে খবরটা যথাসময়ে থানায় পৌঁছেছিল।

সেদিনই গভীর রাত্রে ভারত রক্ষা আইনে পুলিস হেডস্যার দাশগুপ্তকে গেপ্তার করে। পরদিন সারা শহর তোলপাড়- - ঐ রকম মিটমিটে প্রশান্ত মাস্টার, তার পেটে পেটে এত, সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, জাপানীদের ঘুঘু স্পাই!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর মন্বন্তরের ডামাডোলে কত ঘটনা চাপা পড়ে গেছে। প্রশান্তবাবু কবে কিভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন, তা আমার মনে নেই। যাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে

পারতাম, তারা হাতের কাছে নেই কিংবা বলা উচিত ইহজগতে নেই।

সুতরাং এ গল্পটা এখানেই ধামাচাপা দিতে হচ্ছে। তবে কোথাও কোনও যুদ্ধ হচ্ছে এরকম খবর চোখে পড়লে কিংবা কোনও গুপ্তচর ধরা পড়েছে শুনলে এখনও আমার প্রশান্ত-স্যারের ঘটনাটা আবছা আবছা মনে পড়ে।

সিঁদুরে মেঘ

এর মধ্যে কিছুদিন আমাকে হুগলিতে চাকরি করতে হল। প্রয়োজনমত হুগলিতে থাকতাম, আবার সুযোগ-সুবিধে হলে কলকাতা থেকেও যাতায়াত করতাম। রেলগাড়িতে হাওড়া থেকে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা, জানলার ধারে একটা সিট পেলে ভালোই লাগত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হুগলি থেকে কলকাতায় ফিরছি, মাঝপথে মানকুণ্ডু আর ভদ্রেশ্বরের মধ্যে একটা জায়গায় রেলগাড়ির কামড়ার জানলা দিয়ে দেখলাম, গাছপালার আড়ালে একটু দূরে কোথায় যেন আগুন লেগেছে। লোকজনের চিৎকার, চেঁচামেচি, এমন কি দমকলের গাড়ির ঘণ্টাও যেন শুনতে পেলাম।

রেলগাড়ি তো আর মাঝপথে দাঁড়াল না, যেমন যাওয়ার, লাইন ধরে চলে গেল। আমি জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আগুনের লেলিহান শিখা গাছপালার মাথার উপরে লাফিয়ে উঠছে। এখন উত্তুরে হাওয়ার সময়, উত্তর থেকে দক্ষিণে আগুনের জিভ বরাবর একটা নীল ধোঁয়া নদীর মত এঁকেবেঁকে আকাশের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। আগুন দেখে মনে পড়ল, ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একবার আগুন লেগেছিল। তখন আমার বয়েস বড়জোর দশ-বারো হবে। মধ্যরাতে হইচই চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে উঠে দেখেছিলাম, আমাদের উঠোন-ভর্তি লোক। তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই জলের বালতি, অনেকেই সামনের পুকুর থেকে বালতিতে জল ভরে ছুটে আসছে। আগুন তখন প্রায় নিবে গেছে, সারা উঠোনে জল কাদা আর ছাই, কোন একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ। সেই পোড়া-পোড়া গন্ধটা আজকেও রেলের জানালায় চকিতে ভেসে এল।

আমার সবচেয়ে ছোট ভাই বাচ্চু, সে এখনও দেশের—মানে বাংলাদেশের বাড়িতেই থাকে। সে ছোটবেলা থেকেই খুব দুর্বল, রোগা।

শহরের বাজারে খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না বলে গ্রাম থেকে আমাদের নায়েবমশাই বাচ্চুর সমেত একটা দুধেলা গরু পাঠিয়েছিলেন, বাচ্চুর দুধ খাওয়ার জন্য। গরুটা প্রায় চার সের দুধ দিত দু' বেলায়, তত দুধ অবশ্য বাচ্চু একা খেত না। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই সে দুধ খেতাম।

আমাদের শহরের বাড়িতে এর আগে কখনও গরু পোষা হয়নি। গরুটা আসার পরে রান্নাঘরের পিছনে জামগাছের তলায় পাটকাঠির বেড়া দিয়ে ছেঁচা বাঁশের চালা বানিয়ে গরুটার জন্যে গোয়ালঘর করা হয়েছিল।

গরুটা এসেছিল বর্ষার আগে। বর্ষাকালে ঘাসের অভাবে এবং জলকাদায় গরুদের একটু কষ্ট হয়, কিন্তু তারা সবচেয়ে কষ্ট পায় বর্ষার পরে। শীতের শুরুতে কার্তিক-অঘ্রাণ থেকেই আমাদের ওখানে ভীষণ মশা আর ডাঁশের উপদ্রব। ডাঁশ হল মশার চেয়ে বড় জাতের কালো

পোকা, গরুর গায়ে বাসা বাঁধে, রক্ত চুষে গর্ত করে ঘা করে ফেলে।

এই সময় গোয়ালঘরে প্রতি সন্ধ্যায় ভিজে খড়ে আগুন দিয়ে ধোঁয়া করে মশা আর ডাঁশ তাড়ানো হয়, একে বলে সাঁজাল দেওয়া। সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানো, শঙ্খ বাজানোর মতই গরুওয়ালা বাড়িতে নিত্যকর্ম ছিল গোয়ালঘরে সাঁজাল দেওয়া।

ওই সাঁজাল থেকেই কি করে গোয়ালঘরে পাটকাঠির বেড়ায় আগুন ধরে যায়। আমাদের পাশের বাড়ির রাসমণি জেঠিমার হাঁপানি অসুখ ছিল। মাঝে মাঝে সারা রাত জেগে থাকতেন, তাঁর শোয়ার ঘর ছিল আমাদের গোয়ালঘরের পিছোপিছি হাত পঁচিশেক দূরে। ভাগ্যিস রাসমণি জেঠিমা আগুন লাগামাত্র দেখতে পেয়েছিলেন এবং চিৎকার করে উঠেছিলেন। তাই আগুন ছড়াতে পারেনি. গরু বাছুর তো রক্ষা পেয়েছিল, আমরাও পেয়েছিলাম। আগুন একবার ছড়িয়ে পড়লে কী হত কে জানে, তবে গোয়ালঘরের দু' দিকের বেড়া আর চালের কিছু অংশ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিল।

সেই আগুন লাগার রাতটা এতদিন পরে কেমন যেন উৎসবের মত মনে হয়। ব্যাপারটা অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে বলে সবাই হালকা কথাবার্তা বলেছে। ব্রজদা, আমাদের মালি, যে গোয়ালঘবে সাঁজাল দিয়েছিল. তাকে সবাই ভবিষ্যতে আরও সাবধান হবার উপদেশ দিচ্ছে' এর মধ্যে কয়েকজন এসে মাকে বলল, 'বৌদি. খুব হুজ্জত গেল, চা খাওয়ান।'

মা বলল, 'দুধ নেই।' সদ্য আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া গরুটাকে দুইয়ে আধ গেলাস দুধ তখনই নিয়ে আসা হল। মা তখন বলল, 'স্টোভ ধরাতে হবে, দেশলাই দেখছি না, একটু আগুন লাগবে।' একজন বলল, 'এইমাত্র এত আগুন ছিল, বৌদি. আপনাদের বাড়িতে আগুনের অভাব!'

এতকাল পবেও অল্প অল্প মনে আছে।

পরদিন সকালবেলা ঠাকুমা বললেন, 'গরুটার দুধ এখন কমে গেছে। গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেই হয়, এখানেই বা থাকবে কোথায়' গোয়ালঘর তো পুড়ে গেল। আবার বাচ্চা হলে নিয়ে আসা যাবে।'

ঠাকুমার কথা সবাই মেনে নিল, কিন্তু অসুবিধা হল অন্য জায়গায়। যে শিশু-বাছুরটি তার মায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল. সে এ বাড়ির হৃদয় অনেকটাই দখল করে নিয়েছে সেই ছয় মাসে, আর তাছাড়া গতকালের আগুনে তার মায়ের কিছু না হলেও তার পিঠের ডান দিকে একটু লোম পুড়ে গেছে, আরও গোটাদুয়েক জায়গায় ছ্যাঁকা-ছ্যাঁকা দাগ। কাল রাতেই তার পিঠে ঠাকুরদা হলুদগুঁড়ো দিয়ে নারকেল তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন। আজ এখন ঠিক হল, তাকে পশু হাসপাতালে পাঠানো হবে আর তার মা গ্রামে ফিরে যাবে।

বাছুরটা ছিল এঁড়ে বাছুর, ষাঁড়, পুরুষ বাছুর। আমাদের দেশে তখন সব ষাঁড়ের নামই ছিল শিবলাল, ষাঁড়-বাছুরের নাম শিবু, কখনো সখনো গায়ের লোম মিশমিশে কালো হলে কালু. লাল হলে লালু। এ বাছুরটা ছিল সাদা, তাকে বাড়ির সবাই শিবু বলেই ডাকত। এবার আগুনে পুড়ে তার পিঠের সাদা লোমের নিচে লালচে চামড়া দেখা যাচ্ছিল, এবার ওর নতুন নাম দিলেন ঠাকুমা—'আখা'।

আমাদের ওখানে আখা মানে উনুন, হয়তো আগুনে পোড়ার জন্যেই আখার এই নতুন নাম হয়েছিল।

পরদিন দুপুরে আখার মা গ্রামে ফিরে যাওয়ার পরে আমি আর দাদা দুজনে গিয়ে আখাকে পশু হাসপাতালে দিয়ে এলাম।

দৈনিক সকাল-বিকালে আমি আর দাদা হাসপাতালে আখাকে গিয়ে দেখে আসতাম। পোড়াটা তেমন মারাত্মক কিছু ছিল না। দিন দশ-বারো বাদেই আখাকে ছেড়ে দিল।

আখা বাড়ি ফিরে এল। এখন আর গোয়ালঘরটা নেই। সারা বাড়িটাই তার চত্বর। টুকটুক ঘুরঘুর ঘুরে বেড়ায়। শুধু দাদা মাঝে মাঝে তাকে একটু অত্যাচার করে। যদি কোনোদিন বিকেলে পশ্চিম আকাশে মেঘ করে ঠিক সূর্য ডোবার আগে, যখন কালো মেঘগুলো লালচে রঙের হয়ে যায়, দাদা আখাকে গলায় দড়ি দিয়ে বাড়ির সামনের পুকুরের পশ্চিম পাড়ের মাঠের মাঝখানে নিয়ে যায়, দ্যাখে আখা ভয় পায় কিনা।

কারণটা আর কিছু নয়, দাদা নাকি কোথায় পড়েছিল, 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়'। কিন্তু আখা লালচে বা সিঁদুরে মেঘ দেখে মোটেই ভয় পেত না। কালো ড্যাবড্যাবে চোখে সে পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকত। এরই মধ্যে এল ভয়ঙ্কর পঞ্চাশ সাল—তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তর নয়, উনিশশো পঞ্চাশের দাঙ্গা। নতুন সীমান্তের এপারে ওপারে, এ জায়গায় ও জায়গায় পুরনো দেশ আগুনে জ্বলতে লাগল। কলকাতা, ঢাকা, বরিশাল, আসাম সব জ্বলতে লাগল।

আমাদের সামান্য শহরেও সে আগুনের আঁচ একটু লেগেছিল। আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরের ওপারে শেষ মাথায় বিপ্রদাস চৌধুরীর বাড়ি। ফাঁকা বাড়ি, অনেকদিন সেখানে কেউ থাকে না।

একদিন শেষরাতে হইচই শুনে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই দৌড়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, বিপ্রদাসবাবুর বাড়ি আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখা গাছপালার মাথার উপরে উঠে গেছে, একটা নীল ধোঁয়ার নদী বয়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

গোয়ালঘর ছিল না বলে আমাদের আখা তখন দালানের বাইরে বারান্দায় ঘুমোত। হঠাৎ ওই আগুন দেখে সে কেমন হকচকিয়ে গেল। দাদা বহুবার সিঁদুরে মেঘ দেখিয়েও যা করতে পারেনি এবার তাই হল। সে সোজা আগুনের উল্টোদিকে লম্বা ছুট দিল। আমি আর দাদা তার পিছনে পিছনে 'আখা-আখা' করে ছুটলাম। কিন্তু আমরা কিছু বুঝবার আগে সে সিনেমাহল, কাছারি, বাসস্ট্যান্ড পার হয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে নেমে ছুটতে লাগল, ছুটতে ছুটতে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল।

জীবনে আর কোনোদিন আখার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি, আখাকে আমরা আর খুঁজে পাইনি। এইমাত্র ট্রেনটা হাওড়ায় এসে থামল।

এতদিন পরে আখার কথা মনে পড়ল। আমার এই মনে পড়াগুলো কেমন যেন। দিনকালও কেমন যেন পড়েছে। আবার সিঁদুরে মেঘের কথা মনে পড়ে।

অমর, অমর

খুব ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা টিয়াপাখি ছিল। আমাদের ভিতরের বারান্দায় হবিষ্যি-ঘরের পাশে একটা পেতলের দাঁড়ে পাখিটা থাকত, তার একটা পায়ে পরানো ছিল চিকন পেতলের শেকল।

টিয়াপাখিটা খুব সাধারণ জাতের ছিল না। ওকে বলা হত আজমপুরী টিয়া, আজমপুরের গড় থেকে ওকে এনে দিয়েছিলেন আমার ঠাকুর্দার এক বন্ধু। উজ্জ্বল সবুজ রঙ, গলার কাছে নীলচে আভা, চোখ দুটো ঝকঝক করছে, তার চারপাশে গোল করে গাঢ় .াজলকালো বলয়। রাজকীয় চেহারা ছিল সেই আজমপুরী পাখির।

শুধু চেহারাই নয়, পাখিটা কথা বলতে পারত। খুব বেশি কথা নয়, স্পষ্ট মানুষের গলায়, অনেকটা আমার ঠাকুমার ভাঙা গলা নকল করে সে হঠাৎ-হঠাৎ চেঁচিয়ে ডেকে উঠত, 'অমর,অমর'। আর কোনও কথাই বিশেষ সে বলত না। শুধু খুব ভোরবেলায় একবার আর সারাদিনে বার-কয়েক ওই অমর, অমর করে ডাকত।

অমর ছিল আ.মার রাঙাকাকার নাম। আমার রাঙাকাকা ছিলেন একটু উল্টোপাল্টা, ন্যালাখ্যাপা ধরনের লোক। ছেলেবেলা থেকেই কী করে তাঁর মনের মধ্যে একটা ধারণা ঢুকে গিয়েছিল যে, তাঁর মাথা খারাপ হওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। মাথা যাতে খারাপ না হয়, মাথা যাতে সব সময়েই ঠাণ্ডা থাকে, সে জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

মাথায় যাতে ভালভাবে হাওয়া লাগে, সেই জন্যে মাসে অন্তত একবার আমার রাঙাকাকা মাথা সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলতেন। তা ছাড়া শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই প্রতিদিন খুব ভোরে সূর্য ওঠার অনেক আগে তিনি আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরে গুনে-গুনে একশো আটটা ডুব দিতেন। অনেক সময় ডুবের হিসেব তিনি ঠিকমতো রাখতে পারতেন না, সেই জন্যে আমাদের ঘুম থেকে তুলে পুকুরঘাটে ডেকে নিয়ে যেতেন ওঁর ডুব গোনার জন্যে।

আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, শীতের সকালে ঠাণ্ডা হাওয়ায় পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম-জড়ানো গলায় রাঙাকাকার ডুব গুনে যাচ্ছি, 'একশো পাঁচ, একশো ছয়, একশো সাত, একশো আট...'।

আমাদের পুরো বাড়ির প্রায় বিশ-বাইশ জন লোকের মধ্যে আমাদের এই রাঙাকাকার জন্যেই যা সামান্য একটু দুর্বলতা ছিল টিয়াপাখিটার। তার দাঁড়ের কাছে কেউ গেলেই সে ধারালো ঠোঁট বাঁকিয়ে, মাথা উঁচু করে 'ক্র্যাক ক্র্যাক' করে ধমকাত। শুধু বাড়ির মধ্যে, বারান্দায় বা উঠোনে রাঙাকাকাকে দেখতে পেলে কিংবা রাঙাকাকার গলা শুনতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠত, 'অমর, অমর।' তখন তার আচরণে কোনওরকম হিংস্র ভাব দেখা যেত না।

শেষরাতে আকাশ ফর্সা হওয়ামাত্র সে-ই 'অমর, অমর' ডেকে রাঙাকাকাকে ঘুম থেকে তুলে দিত। আর তারপরেই রাঙাকাকা পুকুরে ডুব দিতে যেতেন।

টিয়াপাখিটাকে গরমের দিনে প্রায় দৈনিক আর শীতের সময় সপ্তাহে এক-আধবার স্নান করানো হত। বাসায় রাঙাকাকা থাকলে রাঙাকাকাই স্নান করাতেন। কিন্তু রাঙাকাকা না থাকলে

আমার দাদা বা কাজের কোনও লোক এটা করতো, কিন্তু সে খুবই সাবধানে, কারণ পাখিটা সুযোগ পেলেই ধারালো ঠোঁটে ঠুকরে রক্ত বার করে দিত।

সেবার রাঙাকাকা বাসায় নেই। দেশের বাড়িতে গেছেন কী একটা দরকারে, বোধহয় ক্ষেতের ধান আনতে। খুব দূরে নয়, আমাদের শহুরে বাসাবাড়ি থেকে মাইল পনেরো দূরে ছিল আমাদের গ্রামের বাড়ি। সেখান থেকে চৈত্রবৈশাখে ডাল, কলাই, জ্যৈষ্ঠমাসে আম, লিচু, জামরুল, তারপর পৌষমাসে ধান চাল আসত। প্রত্যেকবার রাঙাকাকাই যেতেন এসব আনতে। যাওয়ার আগে আরেকবার মাথা ন্যাড়া করে নিতেন, বলতেন, 'লোকদের কাছ থেকে জিনিসপত্র ঠিকঠাক বুঝে নিতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকা চাই।' আর গ্রামের লোকেরা ওকে অসাক্ষাতে ন্যাড়াপাগলা বলে সম্বোধন করত এবং ইচ্ছেমতো ঠকাত।

সে যা হোক, সেবার রাঙাকাকা দেশের বাড়িতে। এদিকে বাসায় একটা নতুন কাজের লোক এসেছে। তারই ওপর পাখিটাকে স্নান করানোর ভার পড়েছে।

তখন আমি ইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি। সকালে ঘি দিয়ে ফ্যানাভাত খেয়ে ইস্কুলে যাই। বাড়ির কাছেই ইস্কুল, দুপুরে টিফিনের সময় এসে মা-কাকিমা'র সঙ্গে বসে ভাত, ডাল, মাছের ঝোল খেয়ে আবার দুপুরবেলা একছুটে ইস্কুলে ফিরে যাই।

এইরকম একদিন দুপুরবেলা টিফিনের সময় ইস্কুল থেকে বাসায় ভাত খেতে এসে শুনলাম টিয়াপাখিটা পালিয়েছে। নতুন কাজের লোকটা স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিল, সে কিছু না বুঝে পায়ের শেকলটা খুলে টিয়াকে হাতে ধরে মাথায় জল ঢালছিল, মোক্ষম মুহূর্তে পাখিটা তার কনুইতে হঠাৎ এমন একটা ঠোক্কর দেয় যে, সে অসতর্কভাবে হাতের মুঠি আলগা করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে টিয়াপাখিটা উড়ে গিয়ে চারপাশের গাছপালার অনেক উঁচুতে উঠে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে শূন্য দাঁড়টা দেখে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বাড়ির আর সকলেও খুব হা-হুতাশ করতে লাগল। আমার মা মাথা ঘামাতে লাগলেন এই ভেবে যে, এতকাল দাঁড়ে বন্দী ছিল পাখিটা, এখন কি আর ঠিকমতো উড়তে পারবে, কাকে-চিলে ঠুকরে মেরে ফেলবে কিংবা কোনও বাড়ির ছাদে বা টিনের চালে বসলে বেড়াল ধরে খেয়ে ফেলবে।

ঠাকুমা শুধু ভাবতে লাগলেন, অমর ফিরে এসে পাখিটা না দেখলে কী করবে!

দিনকয়েক পরে রাঙাকাকা ফিরলেন গোরুরগাড়িতে করে। শীত-গ্রীষ্মে ঘোড়া বা গোরুরগাড়ি আর বর্ষায় নৌকো, এই ছিল মোটামুটি যানবাহন, তা না হলে শ্রীচরণ ভরসা। রাঙাকাকা অনেক সময় হেঁটেই গ্রামের বাড়িতে যাতায়াত করতেন, তবে এবার গোরুরগাড়ি-ভর্তি কলাই আর ডালের বস্তা, আর সেইসঙ্গে কাঁচা আম নিয়ে রাঙাকাকা এলেন গাড়োয়ানের পাশে বসে।

হবিষ্যি-ঘরের সামনের বারান্দায় তখন শূন্য দাঁড়টা ঝুলছে। চৈত্রমাসের বাতাসে পেতলের শেকলটা দাঁড়ের গায়ে দুলে দুলে আঘাত করছে আর ক্ষীণ টিংটিং শব্দ হচ্ছে।

টিয়াপাখিটা চলে যাওয়া নিয়ে রাঙাকাকা কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে চাননি। শুধু একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'পাখিটা মরে গেছে, না পালিয়ে গেছে?'

দিন যেমন যায়, যেতে লাগল। বারান্দা থেকে খালি দাঁড়টা কেউ সরিয়ে নিল না, সেটা একপাশে ওইরকমই ঝুলে রইল। শুধু সেই শেষরাতে 'অমর, অমর' ডাকটা নেই। রাঙাকাকাও

আজকাল আর শেষরাতে ওঠেন না। সেই একশো আটটা ডুব দেওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক বেলায় কোনোদিন স্নান করেন, কোনওদিন করেন না।

দেখতে দেখতে ভরা গরম পড়ে গেল। রাঙাকাকা আবার গ্রামের বাড়িতে গেলেন আম, কাঁঠাল আনার জন্যে। কিন্তু সেবার আর রাঙাকাকা ফিরলেন না।

রাঙাকাকা যেদিন গ্রামে গেলেন, সেদিন মধ্যরাতে প্রচণ্ড কালবোশেখি, আমাদের গ্রামের বাড়ির উঠোনে একটা অতিকায় কাঠবাদাম গাছ ছিল। সেই গাছটা ঝড়ে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে এসে পড়ল আমাদের বহু পুরনো নড়বড়ে আটচালার টিনের ঘরের ওপর। গ্রামে গেলে রাঙাকাকা ওই ঘরেই থাকতেন। সেই ঘরচাপা পড়ে রাঙাকাকা মারা গেলেন।

পরের দিন সকালে গ্রাম থেকে খবর এল। বাবা আর ছোটকাকা একটা টমটম গাড়ি ভাড়া করে রওনা হলেন। আমি আর আমার এক খুড়তুতো ভাইও সঙ্গে গেলাম। সেই দৃশ্য আমি এখনও ভুলিনি। বিশাল উঠোন জুড়ে বাদামগাছটা ছড়িয়ে পড়ে আছে। অনেক পাখির বাসা ছিল গাছটায়। শালিখ, কাক, দইনাচুনি ইত্যাদি পাখিরা উপড়ে-যাওয়া গাছটাকে ঘিরে কলরব করছে। গাছের মাথার দিকের ডাল গিয়ে পড়েছে দক্ষিণের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায়, সে-রাস্তা আটকে গেছে। গাছের নীচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে টিনের চালাঘর, হাঁড়িকুড়ি, তক্তাপোশ, পাটাতন, আর তারই মধ্যে পরে আছেন রক্তাক্ত, নিস্পন্দ ন্যাড়ামাথা রাঙাকাকা। গ্রামের লোকেরা ভিড় করে চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু কুকুর এদিক-ওদিক ঘুরে চারপাশে কী যেন শুঁকছে।

কোনওরকমে কাজকর্ম চুকিয়ে, গ্রামের সাবেক নদীর ঘাটে রাঙাকাকাকে দাহ করে আমরা সেদিনই বেশ রাতের দিকে শহরের বাসায় ফিরে গেলাম। ঘোড়ার গাড়িটা রাখাই ছিল, সেটাতেই ফিরলাম।

এর পর অনেক দিন কেটে গেছে। রাঙাকাকার অনুপস্থিতি এখন আমাদের সয়ে গেছে। টিয়াপাখিটার কথাও আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। সেবার পুজোর সময় অনেকদিন পরে বাড়ি চুনকাম করা হল। চুনকাম করার সময়ে বারান্দা থেকে পেতলের দাঁড়টা খুলে কোথায় যেন সরিয়ে দেওয়া হল। পাখিটার কোনও চিহ্নই রইল না।

এর বেশ কিছুদিন পরে ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। টিয়াপাখিটা চলে যাওয়ার পরে আমরা তার অনেক খোঁজ করেছিলাম। কেউ বলেছিল, স্টিমারঘাটের কাছে তেঁতুলগাছটায় পাখিটাকে দেখেছে। কেউ বলেছিল, ওরা বাতাসের মধ্যে রাস্তা টের পায়, সেই রাস্তা ধরে পাখিটা আজমপুরের গড়ে তার নিজের দেশে ফিরে গেছে।

সে যা হোক, পাখিটা নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে আমরা আর তার কোনও সঠিক খবর পাইনি। বিশেষ করে রাঙাকাকার মৃত্যুর পরে আমরা তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

তখন শীত এসে গেছে। আমাদের বছরের পরীক্ষা শেষ। সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় আমরা ছোটরা ঘুমিয়ে পড়ি। খুব ভোরবেলায় লেপের মধ্যে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। ছাদের ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে অল্প-অল্প করে আলো আসে। এইরকম এক ভোরবেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমরা শুনতে পেলাম, 'অমর, অমর।' ঠাকুমার গলা নকল করা সেই পালিয়ে-যাওয়া পাখিটার কণ্ঠস্বর, এতদিন পরে কোথা থেকে এসে এই শেষরাতে রাঙাকাকাকে ডাকছে।

কোনওরকমে গায়ে র‍্যাপার জড়িয়ে শীতের ঠাণ্ডায় আমরা উঠোনে দৌড়ে বেরিয়ে আসি,

দেখি ছাদের কার্নিসে বসে রাঙাকাকার ঘরের জানলার দিকে মুখ করে পাখিটা ডাকছে, 'অমর, অমর।' শীতের সকালবেলার বাতাসে পাখির সেই ভাঙা গলার ডাক কেমন হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে। ঘুম থেকে বিছানায় উঠে ঠাকুমা মালা জপ করছিলেন। পাখির এই ডাক তাঁর কানেও গিয়েছিল। তিনি ডুকরে চিৎকার করে, 'অমর, অমর' করে কেঁদে উঠলেন। আমার ঠাকুমা সারাজীবনে অনেক শোক পেয়েছিলেন, কিন্তু কোনওদিন তাঁকে জোরে কাঁদতে দেখিনি, সেই প্রথম দেখেছিলাম।

পাখিটা কিন্তু আমাদের বাড়িতে রইল না। যেমন এসেছিল, তেমনি কোথায় চলে গেল। তবে এর পরেও অনেকদিন বাদে-বাদে হঠাৎ একেকদিন সময়ে অসময়ে আমাদের ছাদে এসে পাখিটা বসেছে; শুধু শুধু আমার ঠাকুমাকে কাঁদাবার জন্যে 'অমর, অমর' করে ডেকে চলে গেছে।

এ-সব ঘটনার পরে বহুকাল চলে গেছে। আমাদের সেই গ্রামের বাড়ি— রাঙাকাকার মৃত্যুর সঙ্গেই তার পাট চুকে গিয়েছিল। আর শহরের যে-বাসাবাড়িতে আমরা থাকতাম, সেখানেও প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর কেউ থাকে না। দালানের সামনের দিকের দুটো ঘরে আর বারান্দায় একটা প্রাইমারি স্কুল বসেছে। আর-একটা ছোট ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস হয়েছে রাঙাকাকার ঘরটায়।

বাড়ির ভেতরে উঠোনের দিকটা আগাছায় জঙ্গলে ভরে গেছে। বাড়িটা এভাবে ফেলে না রেখে বিক্রি করে ফেলা যায় কিনা, দাদার পরামর্শে আমি তারই খোঁজখবর করতে গিয়েছিলাম।

দালানের বাইরের বারান্দায় যেখানে ছেলেবেলায় আমরা খেলা করতাম, সেখানে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা গলা মিলিয়ে নামতা পড়েছে। ফাঁকা পোস্ট অফিসে চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছেন মাস্টারমশায়।

শুনশান, ফাঁকা দুপুর। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। সারা উঠোন জুড়ে ভাঁটফুল গাছের জঙ্গল আর বুনো কচুর আগাছা। একপাশে বহুদিনের পুরনো একটা নিমগাছ এখনও রয়েছে। উঠোন জুড়ে নিমের পাকা ফল পড়ে রয়েছে। হবিষ্যি-ঘরের বারান্দাটার দিকে নজর পড়তে সেই পাখিটা, রাঙাকাকা, ঠাকুমা—সকলের কথা মনে পড়ছে।

বেরিয়ে আসছি ভারী মন নিয়ে, হঠাৎ ছাদের কার্নিস থেকে ভাঙা গলায় স্পষ্ট ডাক, 'অমর, অমর।' আশ্চর্য, সেই পাখিটা এতদিন পরে! এখনও বেঁচে আছে?

ঝকঝকে সবুজ রঙের একটা টিয়াপাখি ছাদে বসে ঘাড় বাঁকিয়ে ডেকে যাচ্ছে, 'অমর, অমর।'

টিয়াপাখি কি এতদিন বাঁচে? এটা কি সেই পাখিটাই? হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। হয়তো সেই পাখিটা তার ছেলেমেয়েদের, তার ছেলেমেয়েরা তার ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে 'অমর, অমর' ডাকটা, আর চিনিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের এই পুরনো বাড়িটা।

আমি তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই পাখিটা নিমগাছের ওপর দিয়ে উড়ে বহু দূরে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

মরা মোষের দাঁত

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। সেই রাস্তার পাশ বরাবর একটা খাল চলে গেছে। নদীর মুখ বুজে যাওয়ার পর থেকে খালে আর বিশেষ জল হতো না। পুজোর পরেই খাল থেকে জল নেমে শুকিয়ে যেতো। সারা শীতকাল সেই শুকনো খালের মধ্যে নেমে আমরা ব্যাট-বল খেলতাম।

একদিন সকালবেলা খেলতে গিয়ে দেখি সাংঘাতিক কাণ্ড। কারা একটা মরা কালো গরু সেই খালের মধ্যে ফেলে গেছে। বিশাল একটা গরু। নিশ্চয়ই আমাদের টাউনের নয়। আমাদের এই টাউনের বাড়ি থেকে কেউ এরকম করার সাহস পাবে না। টাউনের বাড়িতে অনেকেই গরু পোষে না। আর যারা পোষে, তাদের জীবজন্তু মারা গেলে তারা গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে পয়সা দিয়ে ধাঙড় ডেকে শহরের শেষপ্রান্তে কবরখানার পিছনে ভাগাড়ের মধ্যে সেই লাশটা দিয়ে আসে।

খালের মধ্যে মরা গরু দেখে আমরা একটু দূরে ডাকবংলোর মাঠে খেলতে চলে গেলাম। ডাকবাংলোর মাঠে এ দিকে কোনো অসুবিধে নেই, বেশ লম্বা-চওড়া। কিন্তু ডাকবাংলোয় কোনো সাহেবসুবো থাকলে ডাকবাংলোর চৌকিদার আমাদের মাঠেব কাছে ঘেঁষতে দিতো না। আব সেই চৌকিদারেব কাছে সব সরকাবী অফিসারই ছিলো সাহেব।

সে যা হোক, সেদিন ডাকবাংলোর মাঠে আমরা ভরদুপুর পর্যন্ত খেলে বাড়ি ফিরলাম। ফেরার পথে দেখি, কোথা থেকে গোটা পঞ্চাশেক শকুন, সেই সঙ্গে শহরের যত কুকুর সেই খালপাড়ে জড়ো হযেছে। সেই কুকুরদেব ভিড়ে আমাদের বাড়ির পোষা কুকুর ভোলাকেও দেখা যাচ্ছে।

কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে নিজেদের মধ্যে লড়ছে আবার শকুনদের তাড়া কবে যাচ্ছে। কিন্তু শকুনেরা মোটামুটি অকুতোভয়। কুকুরের গর্জন শুনে বা দাঁত খিঁচোনো দেখে তারা একেবারে ভয় পাচ্ছে না।

বাসায় এসে শুনলাম খালের মধ্যে মরা গরুর খবর সবাই জেনে গেছে। আমাদের ঠাকুমা ধরেই নিয়েছেন যে, আমরা ঐ খাল থেকেই খেলে আসছি। তিনি আর পুরনো দাসী রাসমণি এক ঘটি গঙ্গাজল নিয়ে দালানের বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের অপেক্ষায়। আমরা এলেই গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুকুরে স্নান করতে পাঠাবেন। জামাকাপড় সমেত ডুব দিয়ে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে আসতে হবে।

ভরা পৌষমাসে পুকুরের জল ছিলো বরফগলা জলের মতো ঠাণ্ডা। আমরা শীতের দিনে পুকুরের ধারে-কাছে যেতাম না। যদি কোনোদিন বিশেষ প্রয়োজনে স্নান করতে জলে নামতে হতো, তা হলে পুকুরের পাড়ে রোদ্দুরে অনেকক্ষণ ঠায় বসে থেকে মনে সাহস এবং শরীরে তাপ সঞ্চয় করে নিতাম। আর একটা সহজ উপায় ছিলো, ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে গামছাটা জলের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়া। শুকনো গামছাটা অল্প কিছুক্ষণ জল খেয়ে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকতো তখন ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে গামছা উদ্ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আজকের দিনটা একটু মেঘলা-মেঘলা। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম, আজ আর স্নান করবো না। বাড়ি ফিরে চট করে দু'মুঠো খেয়ে নিয়ে আবার খেলতে চলে যাবো।

খেলোয়াড়দের দলে আমাদের বাড়ি থেকে আমার দাদা, এক খুড়তুতো দিদি আর আমি ছিলাম। ঠাকুমার অগ্নিমূর্তি এবং সেই সঙ্গে রাসমণির মুখে আমার অবিরল অনাচারের ধারাভাষ্য শুনে আমরা কেমন জবুথবু হয়ে গেলাম। আমরা যে খালে নামিনি, সে কথা মোটেই বোঝাতে পারিনি।

এমন সময় বাবা ফিরলেন বন্ধুর বাড়ি থেকে রোববার সকালের তাস খেলা সাঙ্গ করে। বাবারও দেরি হয়ে গিয়েছিলো, তাই একটু ভয়ে ভয়ে আসছিলেন। তবে আমাদের দিকে ঠাকুমার দৃষ্টি থাকায় বাবা ভাগ্যক্রমে পার পেয়ে গেলেন।

আমাদের বাইরের বারান্দার সিঁড়ির দু'পাশে দুটো গন্ধরাজ ফুলের গাছ। তার একটাতে এই শীতেও দুটো ফুল ফুটেছে। ঘন সবুজ পাতার মধ্যে সেই সাদা ফুল দুটো উত্তরের হাওয়ায় অল্প অল্প কাঁপছে। সেই দিকে তাকিয়ে রাসমণি গজগজ করছে, 'শীতের দিনে সাদা ফুল ফুটেছে, কি অনাছিষ্টি! বেঁচে থাকলে কত কি যে চোখে দেখতে হবে!'

রাসমণির ধারণা, সাদা ফুল শীতের দিনের নয়, শীতে শুধু রঙিন ফুল। আমাদের বাড়ির মধ্যের বাগানে একটা সাদা গোলাপের গাছ আছে। আজ কয়েকদিন হলো সেটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। অত ফুল কে তুলবে। গাছ থেকে পাপড়ি ঝরে পড়ে গাছের নিচটাও সাদা চাদরের মত ছেয়ে আছে। সে গাছের উপরে কিন্তু রাসমণির কোনো রাগ নেই। তার যত আক্রোশ এই সিঁড়ির পাশের গাছ দুটোর উপরে।

সেই গাছ দুটো কেন রাসমণির এতটা চক্ষুশূল ছিলো, সেটা সে বয়েসে বুঝিনি। সেটা জেনেছিলাম পরে বড় হয়ে। সন্তোষের রাজবাড়ি থেকে গন্ধরাজ ফুলগাছের কলমের ঐ দুটো চারা এনে লাগিয়ে দিয়েছিলেন অবলাকাকা, আমাদের পুরনো মুহুরিবাবু। প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে প্রৌঢ় অবলাবাবু উত্তরযৌবনা রাসমণিকে নাকি কিঞ্চিৎ প্রতারণা করেছিলেন। আমরা খুব অল্প বয়সে রাসমণিকে অবলাকাকার পা টিপতে দেখেছি, কাছারিঘরের দরজা ভেজিয়ে ছুটির দিনের দুপুরবেলা বুকে গরম তেল মালিশ করতে দেখেছি। কিসে কি হয়েছিলো কে জানে, পরে কিন্তু ওদের দু'জনের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিলো না। অবলাকাকা শেষ পর্যন্ত রাসমণির হাতের ছোঁয়া জল পর্যন্ত খেতেন না। ইদারা থেকে নিজের খাওয়ার জল একটা মাটির কলসীতে নিজেই তুলে রাখতেন আর কথায় কথায় বলতেন, 'রাম, রাম! নষ্ট মেয়েছেলের হাতের জল খেয়ে বাপঠাকুর্দাকে নরকে পাঠাবো নাকি!'

অবলা-রাসমণি পর্বের এই অংশ এই গল্পে প্রায় অবান্তর। শুধু ঐতিহাসিক সততার কারণে উল্লেখ করলাম। আবার সেদিনের ঘটনায় ফিরে যাচ্ছি।

ঠাকুমা তখন আমাদের গায়ে গঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন। আমাদের ওখানে গঙ্গাজল ছিলো দুর্লভ। গঙ্গার নিকটতম তীর ছিলো আমাদের বাড়ি থেকে দেড়শো-দুশো মাইল দূরে। কেউ কালেভদ্রে কলকাতায় বা কাশী গেলে বড় চিনেমাটির বয়ামে করে গঙ্গাজল ভরে নিয়ে যেতো। খুব কৃপণের মত ব্যবহার করা হতো সেই জল।

মরা গরুর ব্যাপারটা মনে রেখে আজ কিন্তু ঠাকুমা খুব উদারভাবে জল ছিটোচ্ছিলেন, স্নান

করার আগেই আমরা প্রায় ভিজে উঠেছিলাম। ইতিমধ্যে বাবা এসে পড়ায় আমরা কিছুটা রক্ষা পেলাম।

বাবা এসে প্রথমেই একটা মূল্যবান সংবাদ দিলেন। খালের মধ্যে মৃত পশুটা গরু নয়, একটা মোষ। শহরের বাইরে হাটখোলার অনেক পিছনে তিলিপাড়া, সেই তিলিপাড়ার একটা কলুর বাড়ির সরষের তেলের ঘানির মোষ ছিলো ওটা। বহুদিনের পুরনো মোষ, বেশ বুড়ো হয়েছিলো, তবে মরার বয়েস হয়তো হয়নি। কয়েকদিন হলো অসুখে ভুগছিলো, কাল বিকেলে ঘানি ঘোরাতে গিয়ে বসে পড়ে। আজ খুব ভোরবেলা সেটাকে ঠেলে তুলে আমাদের শহরের পশু হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় মোষটা আবার ঢলে পড়ে যায়। তখন সেটাকে পাশের খালের মধ্যে ফেলে রেখে কলুরা ফিরে যায়। একটু পরেই মোষটা মারা যায়।

বাবা জানালেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রহিম সাহেবের ভাইপোর সঙ্গে তাসের আসরে তাঁর সঙ্গে কথা হযেছে। সে বলেছে, চাচার কাছে খবর পৌঁছে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়েবা এখনই এসে মরা মোষটাকে তুলে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। আর যে কলুর মোষ ছিলো ওটা, সেই কলুকে পাঁচ টাকা জরিমানা কবা হবে।

বাবাব এই বক্তব্য ঠাকুমা ভুরু কুঁচকিয়ে শুনলেন, কিন্তু এর জন্যে—এমন কি মৃত জন্তুটা যে গরু নয় বিশুদ্ধ মোষ, সেই কারণেও কিন্তু আমরা পুকুবে অবগাহন স্নানের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেলাম না। এমন কি পিতৃদেবের প্রতিও কঠোর নির্দেশ দিলেন, 'তুমিও ডুব দিয়ে স্নান কবে এসো।' বাবা দুবার বোঝালেন যে, তাঁর স্নান হয়ে গেছে। সকালে স্নান করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। কিন্তু বাবাও রক্ষা পেলেন না।

অনেকদিন পরে আমরা বাবাব সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে নামলাম। বাড়ির সামনেই পুকুর, প্রায দীঘিব মত লম্বা, চওড়া যদিও তেমন নয়। সেখানে বাঁধানো ঘাটে দাঁড়িয়ে জলে নামার আগে আডমোড়া ভাঙতে ভাঙতে আমরা দেখতে পেলাম আকাশে প্রচুর শকুন উড়ছে এবং বেশ কিছু শকুন চক্রাকারে আমাদের পাড়ার দিকে উডতে উড়তে আসছে।

সেই দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, 'ধাঙডেরা বোধ হয এতক্ষণে মোষটাকে নিয়ে গেলো।' তারপব আপন মনেই বললেন, 'মোষের কি আব কিছু অবশিষ্ট আছে, এতগুলো কুকুর আর শকুন সকাল থেকে খাচ্ছে।'

এই সময় দেখি, আমাদের ভোলা কুকুর অন্য চার পাঁচটা পাড়ার কুকুরের সঙ্গে খালের দিক থেকে বিষণ্ণ বদনে ফিরছে। দাদা বললো, 'ভোলাকেও ধরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে স্নান করাতে হবে।'

দাদা আর আমি ছুটে ভোলাকে ধরতে গেলাম। ভোলা বিপদটা অনুমান করতে পারেনি, তা হলে নিশ্চয়ই পালাতো। আমরা দু'ভাই তার দুই কান ধরে টানতে টানতে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠাকুমার কাছে ভোলার ব্যাপারটা সব বললাম। শুনে তিনি আঁতকিয়ে উঠলেন, বললেন, 'তা হলে এটাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলি কেন? আগে পুকুরে ডুব দিইয়ে নিয়ে আয়, তারপর গঙ্গাজল দেবো।' এই বলে তিনি রাসমণিকে নির্দেশ দিলেন যে, ভোলাকে আমরা যে পথ দিয়ে কানে ধরে টেনে নিয়ে গেছি সেই পথে গোবরজলের ছিটে দিতে।

এসব কাজে রাসমণির পরম উৎসাহ। সে উঠোনের এক পাশে রাখা গোবরজলের হাঁড়িটায়

আরেকটু জল ঢেলে নিয়ে 'ছিঃ, ছিঃ' করতে করতে জলের ছড়া দিতে লাগলো।

একটু আগে অবলাকাকা রান্নাঘরের বারান্দায় এসে খেতে বসেছেন। তেওযারি ঠাকুর তাঁকে ভাত দিচ্ছে। তিনি বারান্দায় কাঠের পিঁড়িতে বসে রাসমণির এই 'ছিঃ ছিঃ' আওয়াজ শুনে এবং গোবরছড়া দেওয়া দেখে ভাবলেন রাসমণি বোধ হয় তাঁকে নোংরা ও অশুচি দেখানোর জন্যে তাঁরই আসার রাস্তায় এইভাবে গোবরজল ছিটিয়ে অপমান করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গেলো। তিনি ভাতের থালা বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে এক লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে রাসমণির হাত থেকে গোবরজলের হাঁড়ি নিয়ে তার মাথায় ঢেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হারামজাদি, নষ্ট মেয়েছেলে! কত বড় আস্পর্ধা!'

সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেলো। আমি আর দাদা তখনো ভোলাকে নিয়ে উঠোন পেরোইনি। রাসমণি ডুকরিয়ে চিৎকাব করে কেঁদে উঠলো। বাড়ির সবাই, এমন কি পুকুবঘাট থেকে কিছু অন্য লোকজন পর্যন্ত দৌড়ে আমাদের বাড়ির মধ্যে ছুটে এলো। আমাদের এই হতভম্ব অবস্থার সুযোগে এক হেঁচকায আমার আর দাদার হাত থেকে কান দুটো ছাডিয়ে গোবরজল মাথায় ঢেলে দেয়া কিম্ভূতদর্শনা রাসমণির দিকে ঘেউ ঘেউ কবে ভোলা তাড়া কবে গেলো।

এই বিপর্যয় আবো ঘনীভূত হওয়ার আগে অবলাকাকার বিষয়টা একটু বলে নিই।

অবলাকাকা আমাদের বাডিতে আছেন ঠাকুরদার ওকালতি জীবনেব মধ্যযুগ থেকে, তাব মানে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর। আমরা তো বটেই, আমাদের কাকা-পিসিবা অনেকেই তাঁকে জন্ম-ইস্তক দেখছে। অল্প বয়েসে বিপত্নীক এবং সেই জন্যেই নিঃসন্তান এই ভদ্রলোককে আমাদের কাকারা অবলাকাকা বলতেন, আমরাও তাই বলি।

অবলাকাকার সামান্য ছুঁক-ছুঁক বাই, ঐ যাকে বলে কিঞ্চিৎ চবিত্রদোষ ছিলো। তবে তাঁব দৃষ্টি কখনোই কাজের লোক, ধোপাবউ বা জেলেনির উর্ধ্বে উঠতো না। সেটাই ছিলো বাঁচোযা।

তবে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ মুহুবি। তাঁর মতো সাক্ষী শেখাতে কেউ পারতো না। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, কোন্‌টা বিশ্বাসযোগ্য, কোন্‌ কথা আদালত গ্রহণ কববে এবং সেটা কিভাবে বলতে হবে, সেটা তিনি অনায়াসে অনুমান করতে পারতেন। বহুদিন সকালবেলা কাছারিঘবেব পাশে কাঁঠাল গাছের নিচে তাঁকে দেখেছি, সাক্ষীদের অশেষ ধৈর্য সহকারে পাখিপড়া করে শেখাচ্ছেন। একেক দিন ঘেমে যেতেন। একবার দেখেছিলাম, এক নির্বোধ সাক্ষীকেজিজ্ঞাসা করছেন, 'বলুন, প্রথম ঘুষিটা দেওয়ার পর আসামী কী করলো?' সাক্ষী মানে বাদী স্বয়ং বললেন, 'আসামী তারপর আমাকে তৃতীয় ঘুষি দিলো?' অবলাকাকা খুব সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তৃতীয় কেন? দ্বিতীয় ঘুষি কি হলো?' বাদী গর্বিত হয়ে বললেন, 'কেন?' দ্বিতীয় ঘুষিটা তাকে আমি দিয়েছিলাম, অল্পের জন্যে নাকে লাগেনি, তা হলে একদম অজ্ঞান হয়ে যেতো।'

এর চেয়েও অনেক জটিল অবস্থা থেকে অবলাকাকা সাক্ষী ঠিকমত পড়িয়ে মামলা উদ্ধাব করতেন, এ ব্যাপারে সমস্ত এলাকায় তাঁর কোনো জুড়ি ছিলো না।

এসব সত্ত্বেও অবলাকাকাকে নিয়ে প্রধান অসুবিধে ছিলো এই যে, মধ্যে মধ্যে তাঁর কোনো না কোনো অছিলায় মাথা খারাপ হয়ে যেতো।

যাঁরা ভাবেন, শীতের দিনে লোকের মাথা ঠাণ্ডা থাকে, তাঁরা কিছু জানেন না। আমরা লক্ষ করে দেখেছি, প্রত্যেকবার শীতকালেই অবলাকাকার মাথা বিশেষ করে খারাপ হতো।

এবারেও তাই হলো।

রাসমণির আর্ত চিৎকার ও কুৎসিত গালাগালে বিন্দুমাত্র দমিত না হয়ে তিনিও আজ তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন, তার আগে অবশ্য গোবরের হাঁড়িটা উঠোনে আছড়িয়ে ভেঙে দিলেন।

এই গোলমালের মধ্যে কখন যে একপাল শকুন এসে আমাদের বাড়িতে বসেছে, সেটা কেউ খেয়াল করেনি। শকুন হলো ভাগাড়ের পাখি, গৃহস্থের বাড়িতে বসলে অমঙ্গল হয়। চিরকাল আকাশে শকুন দেখলে আমরা ঢিল ছুঁড়ে বা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে তাড়িয়ে দিয়েছি, যাতে বাসায় কোনো গাছের উপরে বা ছাদে না বসতে পারে।

আজ কিন্তু সেই অঘটন ঘটেছে। দালানের পিছনদিকে পরপর তিনটে সজনে গাছ। প্রচুর সজনে হয় সেই গাছগুলোতে। এই শীতের শুরুতে সেগুলোতে ফুল এসেছে। সেই গাছ তিনটের ডালে শকুনগুলো বসে ছিলো। এবার রাসমণি আর অবলাকাকার চিৎকার-চেঁচামেচিতে আকাশে উড়েছে।

মাথার উপরে অতগুলো শকুন দেখে রাসমণি হঠাৎ কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। অবলাকাকাও গজগজ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

গোলমাল একটু থেমে যেতে আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম। সেই শীতের অবেলায় রাসমণিকেও আমাদের সঙ্গে ডুব দিয়ে স্নান করে গোবরমুক্ত হতে হয়েছিলো।

কিন্তু শকুনের ব্যাপারে আমার ঠাকুমা পড়লেন খুব ফাঁপরে। অত ভালো তিনটে সজনে গাছ, কিন্তু শকুন যে-গাছে বসে, সে-গাছ বাড়িতে রাখতে নেই, কেটে ফেলতে হয়। আমার মার ছিলো পাকা বুদ্ধি, তিনি ঠাকুমাকে বললেন, 'মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে শকুন বসেছিলো কি বসেনি, কেউ ভালো করে দেখেইনি, তার জন্যে গাছ কাটতে হবে কেন? আর তা ছাড়া শাস্ত্রে পৌষমাসে গাছ কাটা বারণ আছে। এখন গাছ কাটলে মহাপাপ হবে।'

কথাটা ঠাকুমার মনে ধরলো। তিনি বললেন, 'সেটা ঠিক কথা বটে। তা হলে মাঘ মাস পড়লে পয়লা বাদ দিয়ে দোসরা মাঘ গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে।'

এবার গোলমাল লাগলো ছোটকাকার সঙ্গে। কারণে অকারণে গাছ কেটে ফেলার বাতিক ঠাকুমার বহুদিনের। ছোটকাকা আজ রীতিমত লড়াইতে নেমে গেলেন। কোথায় কোন্ পুঁথিতে লেখা আছে কে জানে, ছোটকাকা ঠাকুমাকে বললেন, 'শকুন যদি ফলবান গাছে বসে তা হলে সেটা কাটতে হয়। সজনে ফল নয়, তরকারি। কত তরকারির ক্ষেতে শকুন বসছে। চাষীরা কি সব ক্ষেত থেকে গাছ তুলে ফেলে দেয়! সে সব তরকারিই তো আমরা বাজার থেকে কিনে খাই।'

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ির ভিতরের বারান্দায় সিঁড়ির উপরে শীতের অবেলায় রোদে বসে এই সব উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছিলো। এমন সময় ভিতরের ঘর থেকে ঠাকুরদা বের হয়ে এলেন। ছুটির দিনের দুপুরে ভোজনের পর তিনি তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। ব্যাপারটায় প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক সময় লাগে। তিনি গীতাপাঠ করতে করতে রাসমণি-অবলার চিৎকার শুনেছিলেন, এখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'অবলার কি আবার

পাগলামি দেখা দিলো?' ঠাকুমা, ছোটকাকা এবং আমরা সবাই মিলে কয়েক মিনিটে তাঁকে মরা মোষ, রাসমণি-অবলা থেকে শকুন পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত, যা কিছু আজ সকাল থেকে ঘটেছে, সবই বললাম।

ঠাকুরদা শকুনের ব্যাপারটায় মোটে মাথা ঘামালেন না, শুধু বললেন, 'শকুন কোনো খারাপ পাখি নয়। খুব সাহসী আর বুদ্ধিমান। রামায়ণের জটায়ু পাখিও শকুনেরই জাতভাই।'

জটায়ু পাখিকে শকুন বলা উচিত হলো কিনা, এ বিষয়ে ঠাকুমা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই ঠাকুরদা বললেন, 'ঐ যে মরা মোষের কথা বলছিলে? মরা মোষটা কী হলো?'

ঠাকুরদার এই অদ্ভুত প্রশ্নে সবাই হকচকিয়ে গেলো, শুধু ঠাকুমা সুযোগ বুঝে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'মরা মোষ দিয়ে কী করবে, মাংস খাবে?'

ঠাকুরদা একটুও রাগ না করে বললেন, 'মাংসের কথা কে বলেছে, আমার কি আব মাংস খাওয়ার বয়স আছে? মোষটার দাঁতগুলো কী হলো তাই ভাবছিলাম।'

ঠাকুমা এই কথায় আরো ক্ষেপে গেলেন, বললেন, 'তোমাব তো বাঁধানো দু'পাটি দাঁত আছে; মরা মোষের দাঁত দিয়ে তুমি কী কববে?'

ঠাকুরদা বললেন, 'আমি কী কববো? তবে ঐ দাঁত তামার মাদুলি দিয়ে বাঁধিযে গলায কালো সুতো দিয়ে পরলে যে কোনো পাগলের পাগলামি সাতদিনের মধ্যে ছেড়ে যায়।'

পুকুর থেকে স্নান করে এসে উঠোনে এক পাশে পশ্চিমের বোদ্দুরে বাসমণি এলোচুল শুকোচ্ছিলো। সে এসব কথা খুব মন দিয়ে শুনছিলো এমন মনে হযনি, কিন্তু আসল ঘটনা ঘটলো সেদিন সন্ধ্যায়। সেই ঘটনার গুরুত্ব সেদিন বুঝতে পারিনি। এখন কিছুটা বুঝি।

হু-হু ঠাণ্ডা শীত পড়েছে সেদিন বিকেলে থেকে। আমি আর দাদা প্রায় সাবা দিন খেলে পুকুর থেকে পা ধুয়ে এসে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা কেরোসিনেব লম্ফ হাতে রাসমণি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমরা নিজেদের মধ্যে যাই বলি, সামনাসামনি তাকে রাসমণিদি বলতাম। দাদা বললো, 'রাসমণিদি!'

রাসমণি বললো, 'বাড়ির মধ্যে যেতে হবে না। আমার সঙ্গে চলো।'

আমরা বশংবদ ভৃত্যের মত রাসমণির সঙ্গে চললাম। প্রথমে কালীবাড়ি, তারপবে বাজার। ময়লা থানের আঁচলের গিঁট খুলে রাসমণি এক আনা দিয়ে দু'ঠোঙা চানাচুর কিনে আমাকে আব দাদাকে দিলো। আমরা মুড়মুড় করে চিবোতে চিবোতে রাসমণির সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম।

বাজারের পর শহর শেষ। সেখানে পার্ক, পার্কের পরে কবরখানা। তার পিছনে ভাগাড়। বুঝে অথবা না বুঝে আমরা সেই ভাগাড়ের সামনের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসমণি বললো, 'তোরা এখানে দাঁড়া। আমি আসছি।'

লম্ফ হাতে রাসমণি সেই ভাগাড়ের মধ্যে নেমে গেলো। বেড়াল-কুকুব, গরু-ঘোড়া কতরকম মরা জন্তুর মধ্য দিয়ে রাসমণি হেঁটে গেলো। অনেকক্ষণ পরে এক হাতে একটা ভাঙা দাঁত, আর অন্য হাতে লম্ফ নিয়ে রাসমণি ফিরে এলো।

কয়েকদিন পরে একদিন সকালে যখন পুকুরের ঘাটে মুখ ধুতে যাচ্ছি, দেখি কাছারিঘরের দরজায় হেলান দিয়ে অবলাকাকা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর গলায় একটা কালো সুতো দিয়ে তামার মাদুলি পরিয়ে দিচ্ছে রাসমণি। শীতের সকালের হালকা রোদ এসে তাদের দু'জনকে ভাসিয়ে

দিয়েছে। সেই ফিকে হলুদ আলোয় কী যে মনে হয়েছিলো, আজ এতদিন পরে আর বোঝাতে পারবো না।

একটু পরে দেখলাম, অবলাকাকা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। কাঁঠালতলায় সাক্ষী পড়াচ্ছেন, সাক্ষীকে বলছেন, 'না, তখন সন্ধে হয়নি। বিকেল-বিকেল, বেশ আলো রয়েছে, সেই আলোয় আপনি স্পষ্ট দেখলেন, বাঁশঝাড়ের পাশে আসামী দিগম্বর আপনার স্ত্রীকে জাপটিয়ে ধরেছে।'

কাছারিঘর থেকে সেই দিকে তাকিয়ে ঠাকুরদা বাবাকে বললেন, 'মরা মোষের দাঁতের তাবিজে অবলার দেখছি বেশ উপকার হয়েছে!'

ভিকটোরিয়া ব্রিজ

আমাদের একতলা দালানের ভিতরের বারান্দা থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল ছাদে। ছাদে ঠিক কোনো ঘর ছিল না। শুধু সিঁড়ির মাথায় একটা চিলেকোঠা ছিল। বেশ বড়সড় ছড়ানো-ছিটোনো আর চারদিকে লম্বা জানালা লাগানো একটা কোঠাঘর।

এটা হল আমাদের শহরের বাড়ি। আমাদের গ্রামের বাড়ি এখান থেকে দশ মাইল দূরে।

সেই গ্রামের বাড়ি থেকে অঘ্রাণের শেষে গরুরগাড়ি করে ধান আসতো। শীতে বাঁকে করে সদ্য জ্বাল দেওয়া খেজুর গুড় আসতো মাটির হাঁড়িতে। তার পরে ঘোড়ার পিঠে বস্তায় করে বর্গাদারেরা নিয়ে আসতো রবিশস্য, পায়রা তিল, মটরের ডাল, খেসারির ডাল। কখনো কখনো সরষে বা ঝাঁকা-ভর্তি শুকনো তামাকপাতা।

এ সমস্ত জিনিস গুদামজাত করবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল ঐ চিলেকোঠার ঘর। সে ঘরে শিশুদের নাগালের বাইরে অনেক উঁচুতে লাগানো ছিল লম্বা টানা তাক। সেই তাকে চিনেমাটির জারে আর কাঁচের গোল বলওয়ালা ঢাকনা লাগানো বয়ামে থাকতো সারা বছরের কাসুন্দি, আচার আর আমসত্ত্ব।

আচার-আমসত্ত্বের কথায় মনে পড়লো গ্রাম থেকে বৈশাখের প্রথমে আসতো ঝরে পড়া কাঁচা আম আচারের জন্য, তারপরে ঝাঁকা-ভর্তি পাকা আম।

সব উঠে যেত সিঁড়ি বেয়ে ঐ চিলেকোঠার ঘরে। ভাগে ভাগে সাজানো থাকতো সব জিনিস। ঐ ঘরে সারা বছর বিশেষ কেউ থাকতো না। একপাশে দক্ষিণের জানালার ধারে একটা অতিকায় লম্বা-চওড়া তক্তপোশ ছিল যাতে হাত-পা ছড়িয়ে দু'চারটে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে একজোড়া দম্পতি অনায়াসে শুতে পারতো।

পুজো-পার্বণের সময়ে অথবা বাড়িতে কোন ব্যাপার উপলক্ষে আত্মীয় সমাগম হলে চিলেকোঠা ঘর আর ঐ তক্তপোশ দরকারে লাগতো। তা না হলে প্রায় সারা বছরই চিলেকোঠা ঘর শূন্য পড়ে থাকতো। অবশ্য অনেক বছরেই ভরা বর্ষার সময় যখন আমাদের গ্রামের বাড়িঘর ডুবে যেতো, তখন গ্রাম থেকে আমাদের বড় ঠাকুমা আর বাবার দূর-সম্পর্কের এক জ্ঞাতিভাই, তাকে সবাই বলতো ফুলকাকা, শহরে চলে আসতেন। বড় ঠাকুমার শোয়ার জায়গা হতো চিলেকোঠা

ঘরে, আমি আর বিজনও বড় ঠাকুমার সঙ্গে তখন ঐ ঘরে ঘুমোতাম। ফুলকাকার জায়গা হতো বাইরের কাছারিঘরে।

ফুলকাকা আর বড ঠাকুমা সারা বছর গ্রামে থেকে জমিজমা, ফল-ফসল দেখাশোনা করতেন। বিশেষ কোন জটিলতা দেখা দিলে বাবা কিংবা জ্যাঠামশায় গ্রামে যেতেন সমস্যা সমাধানের জন্যে। আর আমরাও যেতাম বছরে একবার অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে টমটম ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, আর ফিরতাম পৌষ সংক্রান্তির শেষে কলসী-ভর্তি নতুন গুড় আর গামলা-ভর্তি ক্ষীরের বরফি নিয়ে।

পাকা ধানের আব সরষের ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে উত্তরের বাতাসে। শীতের বিকেলের সূর্য গ্রামান্তের বাঁশবনের আড়ালে দ্রুত নেমে যাচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু কাঁচা রাস্তায় দু'পাশের হলুদ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে টমটম গাড়ির ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর ধুলো ওড়াতে ওড়াতে ছুটে চলেছে, অন্ধকার হওয়ার আগেই গ্রামে পৌঁছাতে হবে। এ রাস্তাটার খুব সুনাম নেই, আশেপাশেই নামকরা ডাকাতদের গ্রাম, তবে তারা অনেকেই আমাদের বাপঠাকুর্দার মক্কেল। আমাদের কিছু করবে না। তবুও ভয়ে কাঠ হয়ে আমবা মা কিংবা কাকিমার কোল ঘেঁষে বসে থাকতাম, এক সময়ে ঘুমিয়েও পড়তাম। ঘুম ভাঙতো টমটম গাড়ি গিয়ে যখন গ্রামের বাড়ির উঠোনে শিবমন্দিরের চাতালে থামতো।

লণ্ঠন নিয়ে ছুটে আসতো লোকজন, বড় ঠাকুমা, ফুলকাকা। মুহূর্তের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যেতো। গাড়োয়ানরা টমটমগাড়ির ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিত। এরা আজ রাতে এখানেই থাকবে, বিশ্রাম করবে। কাল সকালে শহরে ফিরবে।

আমরা ভাইয়েরা ঘুম ভেঙে গিয়ে চোখ কচলিয়ে ঘোড়ারগাড়ি থেকে নেমে আসতাম। চারদিকে ঝিমঝিম করছে পাড়াগাঁয়ের ঘন শীত আর নীল কুয়াশা। দূরে কোথায় শেয়াল ডেকে উঠলো। ভোলা নামে একটা পুরনো বশংবদ নেড়ি কুকুর আমাদেব দেখে ঘুরে ঘুবে শুঁকে শুঁকে লেজ নাড়ছিল। এখন সে শেয়ালের ডাক লক্ষ্য করে ঘেউ ঘেউ করতে করতে সেদিকে ছুটে গেল।

অনেক দিনের পুরনো কথা এসব। একেক সময় মনে হয় সমস্তই ভুলে গেছি, অথচ চেষ্টা না করতেই সিনেমার রিলের মত সব দৃশ্য তরতর করে ফিরে আসে। এমনকি বড ঠাকুমার আঁচলে বাঁধা পানপাতা ডিজাইনের রুপোর চাবির রিং কিংবা ফুলকাকার সেই হাঁটু পর্যন্ত ঝুল ফ্লানেলের নীল গলাবন্ধ ফুলশার্ট আর পায়ের ক্যাম্বিসের ফিতেওয়ালা ব্রাউন রঙের জুতো— সব মনে পড়ে যায়।

শীতের হাওয়ায় উত্তর দিকের ডোবার ধারের বাঁশবন থেকে শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে সারা বাড়িতে, উঠোনে, বারান্দায়, কুয়োর জলের মধ্যে, শোয়ার ঘরের বিছানায়। সামনের বাদামতলায় দণ্ডকলসের জঙ্গল। দণ্ডকলসের মধু খেতে আসে সোনালি রঙের ছোট মৌমাছি, তাদের অস্পষ্ট গুনগুনানির শব্দ সারাদিন রোদের মধ্যে ঘোরে। আমাদের সারাদিন কেটে যায় বড় ঠাকুমার আঁচলের নিচে ঘুর ঘুর করে। পৌষের ছোট দিন, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। কুয়াশা, ঠাণ্ডা আর অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। শিবমন্দিরের সন্ধ্যারতি শেষ হতে না হতে আমরা ছোটরা রান্নাঘরের বারান্দায় কাঁঠালকাঠের পিঁড়িতে বসে কাঁসার বাটিতে রাঙাচালের পায়েস

খেতে খেতে ঘুমে ঢলে পড়তাম শুধু এই আশায় যে, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখবো—বড় ঠাকুমার কোল ঘেঁষে শুয়ে আছি।

বড় ঠাকুমা আমার বাবার জ্যাঠামশায়ের স্ত্রী। সেই জ্যাঠামশায় কী একটা দলিল জাল করে ফেরার হয়ে যান বিয়ের কয়েক বছর পরেই। তিনি সদরের শহরে মোক্তারি করতেন, তিনিই প্রথম আইনের ব্যবসা শুরু করেন আমাদের বাড়িতে। ফেরার হওয়ার পরে তাঁর আর কোন সংবাদ কেউ রাখেনি। বড় হয়ে আমরা শুনেছি তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে মগ মেয়ে বিয়ে করে নতুন নামে নতুন সংসার পেতেছিলেন।

সে সব কথা আমাদের বাড়িতে কখনো আলোচনা হতো না। এ বিষয়ে ঠাকুমারও কোন দুঃখ ছিল এমন কখনো মনে হয়নি আমাদের। সে সব বোঝার বয়েসও ছিল না সেটা।

আমাদের শহরের যে বছর পত্তন হয়, সেই বছরেই বড় ঠাকুমা বৌ হয়ে এলেন আমাদের সংসারে। স্বামী যতদিন মোক্তারি করছিলেন, মোটামুটি শহরেই ছিলেন। তারপর গ্রামে চলে আসেন। শহরপত্তনের দিনগুলি—নতুন আদালত, হাকিম, আমলা, খালের ওপরে সাঁকো উঠছে, খোয়া বাঁধানো রাস্তা তৈরি হচ্ছে, প্রথম হাইস্কুল হলো—বড় ঠাকুমা এই সব গল্প বলতেন আমাদের। শীতের অর্ধেক কেটে যেতো সেই সব গল্প শুনে।

দুই

গ্রামের বাড়ি আর শহবের বাসার মধ্যে দু'তরফা যাতায়াত ছিল আমাদের। শীতের সময় পরীক্ষা শেষে আমরা গ্রামের বাড়িতে যেতাম। বর্ষার সময়ে, যে বছরে বন্যা হতো, বড় ঠাকুমা আর ফুলকাকা শহবেব বাডিতে এসে উঠতেন। বন্যা কমামাত্র বড ঠাকুমা গ্রামে ফিরবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়তেন। সবাই বলতো, 'পুজো পর্যন্ত থাকো।' কিন্তু তিনি বলতেন, 'ভাদ্রে ভিটে ছেড়েছি, ভাদ্রেই ফিববো। তা ছাড়া পুজোব মোয়া নাড়ু করে পাঠাতে হবে না! আমি এখন যদি গাঁয়ে ফিরে না যাই, তবে এসব কে করবে?'

আমাদের শহব থেকে কয়েক মাইল দূবে ছিল যমুনা নদী। এ যমুনা শ্রীকৃষ্ণেব যমুনা নয়। পূর্ববঙ্গের নিতান্তই এক মেঠো নদী, ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়েছে। লম্বায় সামান্যই, কিন্তু চওড়া খুব, গভীবতাও যথেষ্ট।

বর্ষায় গোয়ালপাডায়, রংপুবে ব্রহ্মপুত্রের জল যেমন যেমন বাড়তো, কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের যমুনাতেও সেই জলবৃদ্ধি দেখা দিত। এর সঙ্গে কোন কোন বছর মালদা, মুর্শিদাবাদের গঙ্গার জল পদ্মা হয়ে যমুনায় এসে দুই জলে একাকার হয়ে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যেত। সঙ্গে বর্ষার বৃষ্টি যে বছর জোরদার হত, তখন তো আর কথাই নেই, থই থই সমুদ্রের মতো হয়ে যেত ঘোলা জলের কালো নদী।

যমুনা থেকে একটা ছোট নদী বেরিয়ে আমাদের সামান্য শহরটাকে পশ্চিমে উত্তরে একটা পাক দিয়ে কয়েক মাইল ঘুরে আবার যুমনায় গিয়ে পড়েছিল।

শরতের শেষ থেকে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত প্রায় সারা বছর ধুধু শুকনো পড়ে থাকতো এই ছোট নদী, পরিহাস করে কবে কারা যেন তার নাম রেখেছিল লৌহজং। আমরা কখনো শহরের বাইরে গেলে বা অন্য কোথাও লোকেরা যখন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতো, আমাদের পরিচয় জানতে চাইতো—আমাদের ওখানে তখনো অঞ্চলের পরিচয় হতো নদীর নামে—আমরা কিন্তু

যমুনা কিংবা আর একটু ওপাশের নদী ধলেশ্বরীর কথা বলতাম না, গর্বিতভাবে বলতাম আমাদের বাড়ি লৌহজং নদীর তীরে।

সে যা হোক, শীতের পরে একদম শুকিয়ে যেত নদী। শরৎকালের ফোটা কাশবনের আঁশ উড়তো নদীর চরে, খ্যাঁকশেয়ালেরা বাসা বাঁধতো নদীর বুকে নলখাগড়ার ঝোপে। প্রায় কোথাও জল নেই, মাঝে মধ্যে পায়ে হাঁটা পথ। এখানে ওখানে ছোটখাট পুকুর ডোবার মত খাঁড়িতে কোথাও কোথাও গর্ত, বর্ষার জল জমে রয়েছে, তার মধ্যে কই, মাগুর, সরপুঁটি, শোলমাছের বাসা; জল কমতে কমতে তারা একেক জায়গায় এসে জমেছে।

আমাদের শহরে লোকসংখ্যার তুলনায় পাগলের পরিমাণ ছিল বেশি। তবে এদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ছিলেন গঙ্গাধর পাগলা, আমরা পাড়াসুবাদে বলতাম গঙ্গাধর কাকা। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই গঙ্গাধর কাকাদের বাসা। আগে ইস্কুল-মাস্টারি করতেন, এখন সব ছেড়েছুড়ে হোলটাইম পাগল। দায়দায়িত্ব খুব বেশি নেই, গ্রামে কিছু জোতজমি আছে, শহরে দু'-একটা পৈতৃক ভাড়াটে বাড়ি, মোটামুটি চলে যায়।

খুব ভোরবেলা উঠে লৌহজঙের খাতে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে যেতেন গঙ্গাধর কাকা। সারাদিন জলে ছিপ ফেলে বসে থাকতেন আর মুখচোখ বিকৃত করে কী সব বিড়বিড় করতেন। কোনদিন তাঁকে কেউ কোন মাছ ধরতে দেখেনি। তিনি অনেক সময় থুথু ছিটোতেন বলে তাঁর কাছে কেউ মাছ ধরতে বসতো না, তাঁকে কেউ ঘাঁটাতেও চাইতো না।

একদিন দুপুরবেলা গঙ্গাধর কাকার মা আমাকে ডেকে একটা কাঁসার বাটিতে মুড়ি আর নারকেল বরফি দিয়ে নদীর ধারে পাঠিয়েছিলেন গঙ্গাধর কাকাকে পৌঁছে দিতে, সকালে না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, তাই এই ব্যবস্থা।

আমাকে গঙ্গাধর কাকা কিছু বলতেন না, আমিও তাঁকে ভয় পেতাম না। মুড়িটা পৌঁছে দিয়ে কাঁসার বাটিটা ফেরত আনবো বলে তাঁর পাশে বসলাম।

মুড়ি খাওয়া আরম্ভ করার আগে গঙ্গাধর কাকা ছিপটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তুই এটা ধর।' আমি ছিপটা হাতে নিয়ে একটু উঁচু করে তুলে দেখি বঁড়শিতে কোন টোপ নেই, আমি গঙ্গাধর কাকার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি নির্বিকার ভাবে বললেন, 'টোপ দিয়ে কি হবে? টোপ লাগবে না।'

আমাকে হতবাক হতে দেখে গঙ্গাধর কাকা বললেন, 'আমার চারও লাগে না, টোপও লাগে না। আমার কোন ঝামেলা নেই।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'চার ছাড়া, টোপ ছাড়া আপনি কী মাছ ধরেন?'

মুড়ি চিবোতে চিবোতে একটা নারকেলের বরফির এক টুকরো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে গঙ্গাধর কাকা উত্তর দিলেন, 'ফ্যাঁচা মাছ।'

আমি বললাম, 'ফ্যাঁচা মাছ? ফাঁচা মাছ আবার কি?'

নির্লিপ্ত গঙ্গাধর কাকা বললেন, 'তা বলতে পারবো না। জীবনে একটাও ধরিনি।'

সেই গঙ্গাধর কাকা একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। পাগলদের নিরুদ্দেশ হওয়ার রীতি আছে। এ নিয়ে শহরে কোন সোরগোল হলো না। অবশ্য তার একটা অন্য কারণও ছিল, ঠিক এই সময়েই আমাদের ছোট শহরের ছোট হাকিমের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ফৌজদারি আদালতের পেশকার সাহেবের সঙ্গে কোথায় পালিয়ে গেলেন। তুমুল হৈচৈ কেচ্ছা চললো

অনেকদিন ধরে। সে গোলমালে স্থানীয় পাগলের নিরুদ্দেশ-বার্তা তেমন গুরুত্ব পেল না।

অবশ্য বছরখানেক পরে খবর এসেছিল, আমাদের গ্রামের বাড়ি যেখানে, তারই কাছে এক স্টিমারঘাটে গঙ্গাধর কাকা আস্তানা বেঁধেছেন। এখন আর তিনি পাগল নন, রীতিমত তান্ত্রিক। দাড়ি রেখেছেন, লম্বা চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁর নাকি ভৈরবীও জুটেছে।

এ খবর পেয়ে চেনাশোনা লোকেরা বলাবলি করলো, চিরকালই গঙ্গাধর একটু দুশ্চরিত্র ছিল, গাঁজা-ভাং খেতো। এতদিন ইচ্ছে করে পাগল সেজে ছিল, এখন তান্ত্রিক সেজেছে।

তিন

গ্রীষ্মে লৌহজং শুকিয়ে থাকতো। গ্রীষ্ম ফুরোতে না ফুরোতে আমাদের ওদিকে বর্ষা এসে যেতো, আষাঢ়ের আগেই। জ্যৈষ্ঠের শেষ থেকে শহরের লোকেরা দল বেঁধে নদীর ধারে যেতো নদীর জল এসেছে কিনা দেখতে। ব্রহ্মপুত্র থেকে জল নামবে যমুনায়, যমুনা থেকে জল ঢুকবে আমাদের শহরের ছোট নদীতে।

নদীতে জল আসাটা ছিল বাৎসরিক কৃত্য। কেন সারা শহরের লোকে এত অধীর কৌতূহল নিয়ে নদীতে জল আসার জন্যে অপেক্ষা করতো, তা বলতে পারবো না।

হঠাৎ একদিন শেষরাতে নদীতে জল ঢোকার শব্দ পাওয়া যেত, মফঃস্বলের ভোরবেলার নিস্তব্ধ বাতাসে ভেসে আসতো খরস্রোতের শব্দ। সারা শহর হঠাৎ জেগে উঠতো সেই আলো-আঁধারির রাত্রিশেষে। লোকেরা দল বেঁধে ছুটতো নদীর ধারে, দেখতো বড় বড় ঘূর্ণিস্রোতে পাক খেতে খেতে নলখাগড়ার জঙ্গল, আশশ্যাওড়ার ঝোপ আর দু'পাশের পাড় ভেঙে যমুনার ঘোলাজল সোঁ সোঁ শব্দ করে ঢুকছে লৌহজঙের খাঁড়িতে।

আমাদের শহরের মধ্য দিয়ে একটা টানা খাল ছিল, লৌহজং থেকে কেটে বার করা হয়েছিল সেটা, একবেলার মধ্যে সেটাও ভরে যেত জলে। এবং কয়েকদিনের মধ্যে খালের দু'ধার ছেয়ে যেতো ঢাকাই নৌকো আর শখের পানসিতে। বেদে-বেদেনীরা আসতো নিশান ওড়ানো নৌকোয়, ঝাঁপি-ভর্তি সাপ আর ঝুড়ি-ভর্তি কাঁচের বেলোয়াড়ি গয়না নিয়ে।

ধুম পড়ে যেতো সারা শহরে। যাতায়াত, কেনাবেচা, নৌকোয় নৌকোয় গানবাজনা—একটা লম্বা মেলা শুরু হয়ে যেত।

শাখানদীর উপনদী, সেই উপনদীর খাল, সেই খালে বহু দূরের ব্রহ্মপুত্র বা পদ্মার জল, সে কিন্তু খরস্রোত। সেই স্রোতে সারা বছরের জমানো শহরের ময়লা, টাগই পানার জঙ্গল, বুনো কচুর ঝোপ সব ভেসে যেতো।

তিনটে পুল ছিল খালের ওপরে। তার মধ্যে দুটো কাঠের আর একটা ইঁটের, মানে পুরনো সুরকি খোয়ায় বাঁধানো সাঁকো। এই সুরকির সাঁকোটা ছিল শহরের শেষ প্রান্তে নদীর সবচেয়ে কাছে। নদী থেকে নৌকোগুলো এই সাঁকোর নিচ দিয়ে ঢুকতো শহরে। এই সাঁকোটার নাম ছিল ভিকটোরিয়া ব্রিজ।

বর্ষার প্রথম দিকে তেমন অসুবিধে হত না। ছোটখাট ডিঙি-নৌকো থেকে শুরু করে প্রমাণ সাইজের পানসি নৌকো, এমন কি পাটবোঝাই মালবাহী নৌকোও পার হয়ে যেতো ভিকটোরিয়া ব্রিজের নিচ দিয়ে।

ধীরে ধীরে খালের জল বাড়তে থাকতো। আর সঙ্গে সঙ্গে খালের বুক থেকে ভিকটোরিয়া

ব্রিজের ছাদের দূরত্ব কমে মধ্যের ফাঁক ছোট হতে থাকতো। জল বাড়ায় প্রথমে আটকে যেত পাট আর খড়বিচালি ভর্তি উঁচু উঁচু বড় নৌকোগুলো। তারপর আটকাতো পানসি নৌকোগুলো।

এ ছিল এক আশ্চর্য ধাঁধা। জল খুব কম থাকলে তো কোন নৌকোই যেতে পারবে না, চড়ায় ঠেকে যাবে। আবার জল খুব বেড়ে গেলেও চলবে না, তখন নৌকোগুলো ব্রিজের তলা দিয়ে পার হতে পারবে না। তবে স্থায়ী মাস্তুল লাগানো নৌকোগুলো কখনোই ব্রিজের নিচ দিয়ে যেতে পারবে না, সেগুলো খালের মধ্যে না ঢুকে নদী দিয়ে ঘুরে যেতো। আর ছোট নৌকোগুলোর কখনোই অসুবিধে হতো না। খালে জল আসার পর থেকেই সেগুলো সচল হতো আর বেশি জল হলেও ব্রিজের নিচ দিয়ে তারা চমৎকার পার হয়ে যেত।

আমাদের শহরের রাস্তাঘাটে জল উঠতো না, কিন্তু আজকালকার ভাষায় যাকে বলে বন্যা, সেটা আমাদের গ্রামে প্রতি বছরই হতো। গ্রামের রাস্তাঘাটে জল ঢুকে ডুবে যেত, মাঠঘাট পুকুর, নালা রাস্তা একাকার হয়ে যেত। তাতে তেমন কোন আপত্তি ছিল না। লোকেরা ডিঙি নৌকোয় করে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াত করতো, বাজারহাট করতো।

তবে বাড়ির মধ্যে জল সব বছর ঢুকতো না। নিচু জলা জায়গার গ্রাম বলে বাড়ির ভিটেগুলো খুব উঁচু করা ছিল, সাধারণ বন্যার জলের নাগালের বাইরে।

কিন্তু কোন কোন বছর বন্যা বেশি হতো, বর্ষার জল আমাদের গ্রামের বাড়ির ভিটে ডিঙিয়ে শিবমন্দিরের চাতাল উতরিয়ে উঠোনে ঢুকে যেতো। খবর আসা মাত্র শহরের খালপাড় থেকে ঢাকাই নৌকো ভাড়া করে আমাদের পুরনো চাকর বাহাদুরদাকে পাঠানো হতো বড় ঠাকুমা আর ফুলকাকাকে শহরের বাড়িতে নিয়ে আসতে। ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টার মাথায় তাঁরা চলে আসতেন।

ভিকটোরিয়া ব্রিজের নিচে খালের জলের নামা-ওঠা ছিল আমাদের বন্যার থার্মোমিটার। বর্ষার প্রথমে নদীতে, তারপরে নদী থেকে খালে যখন প্রথম জল ঢুকতো, তখন থেকেই আমাদের বাড়ির লোকেরা যাতায়াতের পথে ভিকটোরিয়া ব্রিজের নিচে জলের পরিমাণ লক্ষ রাখতো।

একেকদিন স্কুলে যাওয়ার পথে আমরা দেখতাম, আগের দিনের তুলনায় সেদিন ব্রিজের থামের তিনটে ইট বেশি চলে গেছে জলের নিচে। বাংলা ইঁটের গোল থামওয়ালা সাঁকো, ছোট ছোট পুরনো দিনের ইট এখনকার ইঁটের চেয়ে অনেক বেশি লাল ও শক্ত। পোড়ামাটির টালির মত। এ রকম তিনটে ইট ডুবে যাওয়া মানে একদিনে ইঞ্চি চারেক জল বেড়ে যাওয়া।

আমরা বাড়িতে এসে সে খবর দিতাম। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো, তা হলে এবার বাহাদুরদাকে গ্রামে পাঠাতে হবে বড় ঠাকুমাদের নিয়ে আসতে। আর দু'-চারদিনের মধ্যেই হয়তো জল ঢুকে যাবে গ্রামের বাড়িতে, তার আগেই নিয়ে আসা দরকার।

কিন্তু এর পরদিনই বাবা কোর্ট থেকে ফিরে এসে বললেন, 'ভিকটোরিয়া ব্রিজের নিচে জলে টান ধরেছে, একটু নেমেই গেছে মনে হলো। কালপরশু থেকে আবার পানসি নৌকো নিচ দিয়ে যেতে পারবে বোধ হচ্ছে।'

তার মানে এ বছর অন্তত এখন আর বন্যা হচ্ছে না। এরপর কিছুদিন স্বস্তিতে কাটতো বাড়ির লোকজনের। আমরা ছোটরা একটু দুঃখিত হতাম বড়ঠাকুমা আসবে না ভেবে। বড় ঠাকুমার সঙ্গে চিলেকোঠা ঘরে শোবো বলে আমরা সারা বছর অধীর প্রতীক্ষা করতাম।

আমাদের বড় ঠাকুমার বাপের বাড়ি ছিল পাটনার কদমকুঁয়ায়। গরমের দিনে পাটনার বাড়ির খোলা ছাদে ছোটবয়সে রাতের বেলায় ঘুমোতেন বড় ঠাকুমারা। এত দূরে এসেও খোলামেলা না

হলে এতদিন পরেও তাঁর ঘুম হতো না। তিনি এসে চিলেকোঠা ঘরের টানা জানালাগুলো খুলে দিতেন। মশারি টাঙাতে চাইতেন না, মশার জন্যে কখনো কখনো বাধ্য হয়ে টাঙাতে হতো। একেকদিন খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে মশারি ভিজিয়ে দিতো। ভেজা মশারি আর বড় ঠাকুমার শরীরের উত্তাপ--এ দুইয়ের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যেতাম। কোন কোন দিন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যেতো। চিলেকোঠা ঘরের টানা জানালা দিয়ে আকাশকে খুব কাছে মনে হতো। ছাদের রেলিংয়ের ওপাশে হিমসাগর আমগাছের পাতার মধ্যে শ্রাবণ-ভাদ্রের ঘোলাটে চাঁদ কাকতাড়ুয়ার হাঁড়ির মতো বিদঘুটে ঝিম মেরে রয়েছে। বাড়ির পিছনের কচুবনে ঘোঁত ঘোঁত করে বুনো শুয়োরের পাল ধারালো দাঁত দিয়ে কচুব মুখি খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। খুব কাছে বোধহয় দালানের সিঁড়ির নিচেই হঠাৎ কয়েকটা শেয়াল ডেকে উঠলো। তার মধ্যে কয়েকটার খুব কচি গলা, এই গ্রীষ্মেই তারা জন্মেছে, মা-বাবার সঙ্গে হল্লা করতে বেরিয়েছে।

চিলেকোঠার ঘরে ম-ম- করছে আচার কাসুন্দি, আমসত্ত্ব, ডালের বড়ি, পুরনো লেপ তোশক আরো কত কিছুর গন্ধ। জানালার বাইরে থেকে ভেসে আসছে জলে ভেজা মাটির আর কচি কলমিলতার আবছা বুনো ঘ্রাণ। কখনো কখনো পচামাটির একটা কটুগন্ধও জুড়ে যেত সেই সঙ্গে।

বড় ঠাকুমার কোলে মাথা গুঁজে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। সেই কটুগন্ধ, শেয়ালছানার নতুন ডাক শেখা, কচুবনে শুয়োরের দাপাদাপি, আমপাতার আড়ালে ভূতুড়ে চাঁদ—খুব ভাল জিনিস হয়তো নয় এই সব, তবু খেলাচ্ছলে সে সমস্ত কবে হাতছাড়া হয়ে গেছে।

একেকদিন মনে পড়ে। আমাদের পুরনো ভাঙা দালানের চিলেকোঠার কথা মনে পড়ে। একেকদিন বড় ঠাকুমার কথা মনে পড়ে। শেয়ালছানাদের কথা, বুনো শুয়োরের কথা, সদ্য গজিয়ে ওঠা কলমিলতার কথা এখনো একেকদিন মনে পড়ে।

চার

সেবার বন্যা আমাদের পুরো এলাকার লোকদের খুব খেলিয়েছিল। জল হু হু করে বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থমকিয়ে থেমে গেল। তারপরে জল কমতেও লাগল।

ভিকটোরিয়া ব্রিজের নিচ দিয়ে বড় বড় পানসি পাটের নৌকো, এমন কি বজরা নৌকো পর্যন্ত পার হয়ে যেতে লাগলো। খালের দুধারে ভিকটোরিয়া ব্রিজের দুপাশে দুটো লম্বা দোচালা টিনের ঘরে সিনেমা হল। দূর দূর গ্রাম থেকে পাটের চাষীরা সদ্য পাটবেচা টাকায় নৌকো ভাড়া করে ফুর্তি করতে এলো শহরে। দুই ঘোড়ার পালকি-গাড়িতে টাউনের রাস্তায় রাস্তায়, বিশেষ করে খালের ধারে লাল নীল রঙিন ঘুড়ির কাগজে ছাপানো হ্যান্ডবিল ছড়াতে লাগল সিনেমা হলের লোকেরাঃ

'পপুলার সিনেমায় টকি এসেছে।
উমাশশী কাননবালা পাগল করেছে॥'

চমৎকার কেটে গেল শ্রাবণ মাস। বর্ষা বা বন্যার কোন লক্ষণ নেই। ভাদ্রও এক-পা দু'-পা করে এগোতে লাগলো। সবাই ধরে নিল এবারের মত বর্ষা প্রায় শেষ। আমরা ধরে নিলাম বড় ঠাকুমা আসছেন না।

হঠাৎ এর মধ্যে একদিন ভোরবেলা, খুব ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলা। পুরনো ছাদ দিয়ে টপ টপ

করে জল পড়ছে বিছানায়। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি, মেঘে জলে চতুর্দিক অন্ধকার। ভোর হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে না।

সেই যে বৃষ্টি শুরু হল, আর থামে না। আমাদের বুড়ো মুহুরিবাবু বললেন, 'মঙ্গলবারের রাতে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, থামবে পরের মঙ্গলবারের রাতে। এ হল মোংলা বৃষ্টি, এক সপ্তাহের মেয়াদ।'

পরের মঙ্গলবারেও কিন্তু বৃষ্টি থামলো না, একটানা অঝোরে বৃষ্টি নয়, কখনো ধীরে, থেমে, টিপটিপ করে ঢিমেতেতালায়, কখনো ভৈরব হরষে বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই।

এদিকে যমুনায় জল বাড়তে শুরু হল। দারুণ বৃষ্টিতে পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্র ভেসে গেছে, সেই সব জল গড়িয়ে আসছে যমুনায়। যমুনা থেকে লৌহজং, লৌহজং থেকে ভিকটোরিয়া ব্রিজ।

বৃষ্টিতে স্কুলের মাঠে প্রথমেই জল উঠে গিয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের স্কুলের নিচু ঘরেও জল ঢুকলো। আমাদের স্কুল যাওয়া বন্ধ হল। সেই সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোনো।

আদালতের অবস্থাও কাহিল। এত বৃষ্টিতে গ্রাম থেকে মক্কেলরা আসতে পারছে না, সব মামলাতেই তারিখ নিতে হচ্ছে। তা ছাড়া আদালতের সামনের মাঠেও জল জমেছে, তবুও বাবা মুহুরিবাবুদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

একদিন বাবার মুখেই শোনা গেল খালের জল দ্রুত অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে, ভিকটোরিয়া ব্রিজের নিচে জল অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। মনে হচ্ছে, বন্যা হবেই।

যদিও ভাদ্রের মাঝামাঝি, বন্যা হওয়া উচিত নয় এ সময়ে, কিন্তু বন্যা এসে গেল। একেবারে হুড়মুড় করে এসে গেল।

টের পাওয়ামাত্র ভিকটোরিয়া ব্রিজের নিচ থেকে নৌকো ভাড়া করে পরদিন সকালেই অন্যান্য বছরের মত আবার বাহাদুরদাকে পাঠানো হলো গ্রামের বাড়িতে বড় ঠাকুমাদের নিয়ে আসার জন্যে।

চব্বিশ ঘণ্টার মাথায় বাহাদুরদারা ফিরে এলো একা। বড় ঠাকুমা বা ফুলকাকা কেউই আসেননি। তাঁদের না আসার কারণ যা বাহাদুরদা বললো, সে খুবই বিস্ময়জনক।

বাড়ির উঠোনে কিংবা শিবমন্দিরের চাতালে তখনো জল ওঠেনি বটে, গ্রামের রাস্তায় জল ঢুকে গেছে, রীতিমত ডিঙিনৌকো চলছে সেখানে। নদীতে যদি আর দু'-চার ইঞ্চি জল বাড়ে, তবে বাড়ির মধ্যেও নিশ্চয় জল ঢুকবে। কিন্তু বাহাদুরদা জেনে এসেছে নদীর জল আর বাড়া সম্ভব নয়। স্টিমারঘাটে গঙ্গাধর তান্ত্রিকের আস্তানায় আজ কিছুদিন হল এক সিদ্ধবাবা এসেছেন। গ্রামের লোকের তাঁর ওপর ভীষণ ভরসা। অষ্টপ্রহর লোকের ভিড় হচ্ছে সেখানে। স্টিমারঘাটের উঁচু কানাচের একপাশে গঙ্গাধর তান্ত্রিকের ওখানে এখন রমরমা। সারাদিন লোকজন হৈচৈ। সন্ধ্যার পর একটা হ্যাজাক আর একটা ডে-লাইট জ্বালানো হচ্ছে, দিনের আলোর মত ঝলমলে সে জায়গা। বাতাসে গাঁজার গন্ধ থইথই করছে, ধুনি জ্বলছে। তা সেই সিদ্ধবাবা বলেছেন যে, তিনি নদীর তলায় ফুটো করে দেবেন। নদীতে যত জলই হোক, সব সেই ফুটো দিয়ে পাতালে চলে যাবে।

গ্রামের সমস্ত লোকে সিদ্ধবাবার এই কথা বিশ্বাস করে বসে আছে। তার কারণ এই নয় যে, তারা বোকা। তার আসল কারণ হল এই যে, সিদ্ধবাবার বিভিন্ন ক্ষমতার প্রমাণ পেয়ে ইতিমধ্যে সকলের তাক লেগে গেছে।

সিদ্ধবাবার কাছে কুমীরের দাঁতের যে মাদুলি আছে তা একেবারে মোক্ষম, গলায় ঝুলিয়ে রাখলে কোনদিন কুমীরে ধরবে না, এমন কি পাগলা শেয়াল ও বুনো শুয়োরেরাও দূরে থাকবে। চালপড়া, জলপড়া থেকে হাঁপানির কবচ, বাঁজার তেল—সিদ্ধবাবার সবই অব্যর্থ।

সেই সিদ্ধবাবা নদীর তলা ফুটো করে ফেলবেন। সব জল নিচে চলে যাবে। এই কথার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করে বড় ঠাকুমারা গ্রামে রয়ে গেলেন। বাহাদুরদাও সিদ্ধবাবাকে দেখে এসেছে, সর্বাঙ্গে ছাই, হরিণের চামড়ার আসনে বসে 'ব্যোম, ব্যোম' করছেন। সিদ্ধবাবা যে নদী ফুটো করতে পারবেন এ সম্পর্কে বাহাদুরদাও নিশ্চিত।

আমরাও বিশ্বাস করেছিলাম। বাবা কিন্তু কাছারি থেকে ফিরে এসে সব কথা শুনে বাহাদুরকে 'আহাম্মক' বল খুব ধমকালেন। বাহাদুরদা বহুকাল আমাদের বাড়িতে আছে, তারও প্রতিপত্তি কম নয়, সে বললো, 'সিদ্ধবাবা যদি নদী ফুটো করতে না পারে, তা হলে আমি নিজের মাথা মুড়িয়ে নিজেই ঘোল ঢালবো।'

সুখের কথা, বাহাদুরদাকে সেবার মাথা মোড়াতে হয়নি, কারণ সিদ্ধবাবা নদী ফুটো করার আগেই পাশের জেলার পুলিশ এসে কী এক গোলমেলে কারণে তাঁকে এবং সেই সঙ্গে গঙ্গাধর তান্ত্রিককেও ধরে নিয়ে যায়।

এরপর যা ঘটেছিল সে ভয়াবহ। নদী তো ফুটো করা হলো না, তার সঙ্গে সিদ্ধবাবার অভিশাপে তিনদিনের মধ্যে জলে জলাকার হয়ে গেল চতুর্দিক। হু হু করে জল বাড়তে লাগল ধলেশ্বরী, যমুনা আর লৌহজং নদীতে, সেই সঙ্গে ভিকটোরিয়া ব্রিজের নিচের সেই খাল, সে এই প্রথম দু'কূল উপচিয়ে জল তুলে দিলো শহরের মধ্যে। গ্রামের অবস্থা আরো খারাপ। বাহাদুরদা আবার গেলো নৌকো নিয়ে। গরুবাছুর লোকজন সব নিয়ে বড়ঠাকুমারা গ্রামের বাড়ির দালানের খোলাছাদে উঠে গিয়েছিলেন। বাহাদুরদা একটা নৌকো নিয়ে গিয়েছিলেন, তিন নৌকো-ভর্তি হয়ে জিনিসপত্র, জীবজন্তু, মানুষজন এলো। সেই সঙ্গে বড় ঠাকুমা আর ফুলকাকা। আর সেই ভোলা কুকুর। বড় ঠাকুমাকে আর ভোলা কুকুরকে নিয়ে আমি আর বিজন দোতলার চিলেকোঠায় উঠে গেলাম।

ইতিমধ্যে মেঘ কেটে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। ভাদ্রের শেষ, সারাদিন ধরে গনগনে রোদে বাষ্প হতো চারপাশের জল। বাড়ির সামনের পুকুর এসে উঠোনে ঢুকে গিয়েছিল, দুপুরের দিকে রোদের তাপে সেই জল থেকে নীলরঙের সূক্ষ্ম ধোঁয়া বেরোতো, চিলেকোঠার জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে লক্ষ করলে আবছা চোখে পড়তো।

ধীরে ধীরে উঠোন থেকে, তারপর রাস্তা থেকে জল নামতে লাগল। জল নেমে পুকুরের পাড় স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাদা একটু শুকোতে বড় ঠাকুমা গ্রামে ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন, ভাদ্র সংক্রান্তির আগে ফিরতেই হবে।

গরু বাছুর আগেই চলে গেল। ভাদ্র সংক্রান্তির আগের দিন ফুলকাকা আর ভোলা কুকুরকে নিয়ে বড় ঠাকুমাও রওনা হলেন। আমরা খালঘাটে ভিকটোরিয়া ব্রিজের কাছে বড় ঠাকুমাকে নৌকোয় তুলতে গেলাম। ঘাটে পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম। কী আশ্চর্য, ভিকটোরিয়া ব্রিজ কোথাও নেই! বন্যার স্রোতে ইঁট সুরকি শিকড়বাকড় সমেত সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ভিকটোরিয়া ব্রিজ। আমাদের শহরের ছোট খাল নদীর মত চওড়া হয়ে গেছে।

বড় ঠাকুমা কোনোদিন কিছুতে অবাক হন না। আজ কিন্তু বড় ঠাকুমা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'যাঃ, পুরনো পুলটা ভেসে গেল! আমি যেবার নতুন বৌ হয়ে এলাম, সে বছরই ব্রিজটা তৈরি হল। বৌভাতের পর এই পুলের নিচের ঘাট থেকেই নৌকোয় গাঁয়ের বাড়িতে গেলাম।'

সে বছর শীতের শেষে শিবারাত্রির পারানের সকালে দুদিন উপোসের পর শশা কুটতে কুটতে বড় ঠাকুমা অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তাঁর আর জ্ঞান ফিরল না, ঠিক দু'-দিন পরে মারা গেলেন। গ্রামের

বাসায় তাঁর শ্রাদ্ধ হল। মৎস্যমুখী হল শহরের বাড়িতে। সেই আমাদের সংসারের শেষ সম্মিলিত কাজ।

পরের বর্ষায় পাকিস্তান হল। নয়া দিন নয়া সরকার। যেখানে ভিকটোরিয়া ব্রিজ ছিল, তার অনেকটা পশ্চিমে নতুন যুগের লোহা সিমেন্টের সাঁকো তৈরি হল, তার নতুন নাম হল কায়েদে আজম ব্রিজ। সে ব্রিজও পুড়িয়ে দেওয়া হল একাত্তরের যুদ্ধে।

এখন আর কোথাও কিছু নেই। টানা রাস্তা চলে গেছে খাল বুজিয়ে। কবেকার ভিকটোরিয়া ব্রিজ কোথায় ভেসে গেছে। আমরাও প্রায় ভুলে এলাম।

বভ্রুবাহন, কয়েকটি গাধার গল্প

বেশ কয়েক বছর পরে দেশের বাড়িতে এসেছি। পাসপোর্ট, ভিসা, কাস্টমস, প্লেন, বাস কলকাতা থেকে অনেকটা পথ। সেই সাতসকালে কলকাতার বাড়ি থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছেছি।

এখানে মানে এই পুরনো ভাঙা বাড়িতে, যে বাড়িতে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি। এখন যে খাটে শুয়ে আছি, সেই খাটেই জীবনের প্রথম পনেরো বছর ঘুমিয়েছি।

আমাদের ছোটবেলায় রেলে, স্টিমারে, তারপর ঘোড়ারগাড়িতে কলকাতা থেকে এখানে আসতে অন্তত দেড় দিন লাগত। এখন সকাল থেকে সন্ধে, দশ-বারো ঘণ্টাতেই চলে আসা যায়। তবে ক্লান্ত লাগে, তখন রেল-স্টিমাব যাত্রায় অত ক্লান্তি ছিল না। কিংবা বয়েসটা কম ছিল, তাই।

এসে ছোটভাই এবং বাড়ির অন্যদের সঙ্গে একটু কথা বলে, চারটি ডালভাত মাছের ঝোল খেয়ে ভর সন্ধ্যেয় শুয়ে পড়েছি। না শুয়ে গত্যন্তর ছিল না, চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকাব, এখানেও লোডশেডিং, এরা বলে পাওয়ার কাট, (এদের কথাটাই ঠিক)। কোথাও না বেবিয়ে আজ রাতটা বিশ্রাম নেব ঠিক করে মশারির নিচে চলে এসেছি, মশাও খুব, মশাবির বাইরে তাদের তীব্র গর্জন শোনা যাচ্ছে। আমি অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছি।

একটা পরিচিত শব্দে অনেক রাতে ঘুম ভাঙল। রাত তখন অন্তত একটা-দুটো হবে।

খুট-খুট, খুট-খুট—একটা খুরওয়ালা চতুষ্পদ জন্তু ছাদের ওপরে হেঁটে বেড়ালে যে রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই শব্দ।

ঘুমের আচ্ছন্ন ভাব কেটে যেতে খেয়াল হল ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু ছাদের ওপরে খুটখুট শব্দের সঙ্গে এক লহমায় ফিরে এল চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের স্মৃতি। বভ্রুবাহনের কথা মনে পড়ল।

বভ্রুবাহন ছিল আমাদের ছোট শহরের ধোপাপট্টির গিয়াস রাজার গাধা। রজক থেকে রাজা, রাজা উপাধিটা শহরের লোকের দেওয়া, গিয়াস রাজার আসল নাম ছিল গিয়াস মিঞা কিংবা অনুরূপ অন্য কিছু। আমরা অবশ্য বলতাম, গিয়াস খালা মানে গিয়াসমেসো। গিয়াসমেসোর স্ত্রী রাজিয়ামাসি ছিল আমাদের মামার বাড়ির গ্রামের মেয়ে। পাঠশালায় নিচু ক্লাসে আমার ছোট মাসিমার সঙ্গে পড়েছে, সেই সূত্রে মাকে বলত দিদি, আর আমরা তার স্বামীকে বলতাম গিয়াসখালা। রাজিয়ামাসি ছিল একেবারে আমাদের ঘরের লোক।

ছোট নদীর ধারে আমাদের ছোট শহর। কিন্তু খুব কাছেই ধলেশ্বরী আর যমুনা নদীর বাঁক। দু'-এক বছর অন্তরই বন্যা হত চারপাশে, কোনো কোনো বছর বন্যার ঘোলা জলে আমাদের শহরও ডুবে যেত। স্কুলবাড়ি, কাছারি বাজার, বাড়িঘর সব জলে জলে জলাকার। সেটা ছিল আমাদের ছোটদের ফূর্তির সময়। জলের মধ্যে আমরা ঝাঁপিয়ে ছুটতাম। জলের দেশ বলে প্রায় জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব শিশু সাঁতার শিখে ফেলত, ফলে ডুবে মরার ভয় ছিল না।

এ ছাড়া আমরা কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে কিংবা সম্ভব হলে ডিঙি নৌকো সংগ্রহ করে নৌকো বাইচ খেলতাম। মাছ ধরার চেষ্টা করতাম গামছা দিয়ে জাল বানিয়ে কিংবা ছিপ দিয়ে। স্কুলটুল ছুটি থাকত বন্যার জন্যে। তবে বাবা-কাকারা নৌকো করে অফিস-কাছারিতে যেতেন। সঙ্গতিপন্ন মক্কেলরা আমাদের উকিলবাড়ির বাইরের উঠোনে বড় ঢাকাই নৌকোয় করে এসে জামগাছে নৌকো বাঁধতেন।

বন্যার সময় গিয়াসখালার খুব অসুবিধে হত। একটু নিচু জমিতে তার ঘর ছিল। অল্প জলেই সেটা ডুবে যেত। জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া যেত না, গাধাটাকে রাখার জায়গা ছিল না, তখন বাড়ির লোকজন, গাধা-টাধা সুদ্ধ গিয়াসখালা ইস্কুলবাড়ির বাঁধানো বারান্দায় সাময়িক আস্তানা পাতত। কেউ কোনোদিন আপত্তি করেনি।

কিন্তু একবার এমন বন্যা হল যে, ইস্কুল বাড়ির বারান্দাতেও জল উঠল। গিয়াসখালা আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের ঠাকুর্দাকে ধরল, 'বর্ষার এই কয়টা দিন যদি আপনাদের ছাদটায় থাকতে দেন।'

ঠাকুর্দা রাজি হয়ে গেলেন, শুধু বললেন, 'জল কমলেই কিন্তু নেমে যাবে।'

এর পরেই একটা বিপত্তি বাধল। একটু পরে গিয়াসখালা যখন বাজিয়ামাসি, ছেলেমেয়ে, হাঁড়ি-কুঁড়ি, গাধা সব কিছু নিয়ে ছাদে উঠতে এসেছে, আমার কাকা বাধা দিলেন, ঠাকুর্দাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি কি গিয়াসকে বভ্রুবাহনকে নিয়ে ছাদে ওঠার অনুমতি দিয়েছ?'

ঠাকুর্দা কাছারিঘরে মক্কেলদের কাগজপত্র দেখছিলেন, তিনি চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কাকাকে প্রশ্ন করলেন, 'বভ্রুবাহন? বভ্রুবাহন কে?'

ঠাকুর্দা 'বভ্রুবাহন' নামটা জানতেন না, গিয়াসখালাও জানত না, বভ্রুবাহন নিজেও নয়।

আসলে বভ্রুবাহন নামটা কাকারই দেওয়া। কাকা আমাদের বলেছিলেন, 'বভ্রু মানে হল ময়লা কাপড়। ময়লা কাপড় যে বহন করে, সমাস অনুযায়ী সে হল বভ্রুবাহন। তাই গিয়াসের গাধাটার আমরা নাম দিয়েছি বভ্রুবাহন।

আমার সেজপিসি সে বছর সংস্কৃতে লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। সেজপিসি কাকার এই কথায় ঘোরতর আপত্তি করলেন, বললেন, 'সম্পূর্ণ বাজে কথা, বভ্রু মানে ময়লা কাপড় কিছুতেই নয়, আর বাহন মানে বহন করা নয়, বাহন হল যেমন দুর্গার বাহন সিংহ, সরস্বতীর হাঁস। আর গাধা হল শীতলার বাহন। তা ছাড়া এটা একটা মেয়ে গাধা, বভ্রুবাহন না হয়ে ওর নাম হওয়া উচিত বভ্রুবাহিনী।' সে যাই হোক, আমরা পরে জেনেছিলাম যে, কাকা যে গাধার নাম বভ্রুবাহন দিয়েছিল, সে লিঙ্গ বিবেচনা করে বা অর্থ ধরে নয়, এমনি সরলভাবেও নয়। মাসখানেক আগে আদালতের রাস্তায় পিকেটিং করার সময় কাকাকে পুলিশ ধরে এবং বিচারে কাকার এক সপ্তাহ জেল হয়। সেই মামলার বিচারকের নাম নাকি ছিল বি বি চ্যাটার্জি। কাকা খোঁজ নিয়ে বের করেছে বি বি হল বভ্রুবাহন। এবং রাগ মেটাতেই গাধার নাম হল বভ্রুবাহন।

ঠাকুর্দা অবশ্য বভ্রুবাহনের ছাদে থাকায় কোনো আপত্তি করেননি। আর এই জলে নিরীহ গাধাটাই বা যাবে কোথায়?

বরং ছাদে উঠতে বভ্রুবাহন আপত্তি করেছিল। সে কিছুতেই সিঁড়ি বেয়ে উঠবে না। গিয়াসখালাও ছাড়বে না। তিন সিঁড়ি ওঠে, দুই সিঁড়ি নেমে আসে। প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক পরিশ্রম আর ঠেলাঠেলি করে বভ্রুবাহনকে ছাদে তোলা গিয়েছিল।

যথারীতি কয়েক দিন পরে জল নেমে গেল। বভ্রুবাহন-সহ রাজিয়ামাসিরাও গিয়াসখালার সঙ্গে পুরনো ডেরায় ফিরে গেল। কিন্তু কী কারণে যেন আমাদের ছাদটা বভ্রুবাহনের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। ছাদের সিঁড়িটা ছিল দালানের বাইরের দিক দিয়ে, আগেকার দিনের বাড়িতে যেমন হত। বভ্রুবাহন সুযোগ পেলেই কিংবা গিয়াসখালার সঙ্গে বোঁচকা নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেই খট-খট করে ছাদে উঠে যেত। শেষের দিকে এমন হয়ে গিয়েছিল, রাতের দিকে সঙ্গী সাথী জুটিয়ে ধোপাপট্টি ছেড়ে আমাদের ছাদে উঠতে আসত। গাধার খুরের খুটখুট শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। অনেক সময় আমরা অত রাতে ছাদে লাঠি দিয়ে তাড়া করে বভ্রুবাহন এবং তার সঙ্গীদের নামিয়ে দিতাম।

এ সব অনেকদিন আগেকার কথা। সে বছর বন্যায় আমাদের দুজন নতুন বন্ধু হয়েছিল, রাজিয়ামাসি আর বভ্রুবাহন। গাধা যে অত চালাক হয়, সেই প্রথম জেনেছিলাম। আর রাজিয়ামাসি? ইস্কুল থেকে আমি আর দাদা একমাথা উকুন নিয়ে এসেছিলাম, পুরো বর্ষাকালটা তার দুই হাঁটুর মধ্যে আমাদের মাথা চেপে ধরে রাজিয়ামাসি সব উকুন মেরে দিয়েছিল।

আজ এতকাল পরে বাড়ি ফিরে মধ্যরাতে বিছানায় শুয়ে মাথার ওপরে ছাদে চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের খুরের খুটখুট শব্দ শুনে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ল। রাজিয়ামাসির কথা, বভ্রুবাহনের কথা, আরও কত উল্টোপাল্টা কথা। একটা খটকাও লাগল। সে তো কতকালের কথা, সেই বভ্রুবাহন কি এখনো বেঁচে আছে? একটা গাধার পরমায়ু কতদিন? যুদ্ধ, পার্টিশন, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে কত লক্ষকোটি লোক মরে গেল, গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর সামান্য একটা ধোপার ভারবাহী গাধা, সে এখনো খুটখুট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

পরদিন সকালে ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, শহরে ধোপাপট্টি কয়েক বছর হল উঠে গেছে, সেখানে এখন নিউমার্কেট হয়েছে। রাজিয়ামাসি, গিয়াসখালাদের খবরও কেউ রাখে না। নিউমার্কেট তৈরির সময় কে কোথায় ছিটকিয়ে গেছে, সেও অনেক দিন আগের কথা। ছোটভাই খুব ভালো জানে না, তবু বলল, শুধু এই একটা বুড়ো গাধা আছে। দিনে ইস্কুলের মাঠে চরে বেড়ায়, রাতে আমাদের ছাদে এসে ওঠে? দু'-একবার আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি, রাতের অন্ধকারে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে যায়।

সেই দিন রাতে একটা টর্চ নিয়ে ছাদে উঠে গাধাটাকে দেখলাম। বভ্রুবাহনের একটা কান ছেঁড়া ছিল মধ্য দিয়ে। এটার দুটো কানই ঠিক আছে। বুঝতে পারলাম বভ্রুবাহন নয়, বভ্রুবাহন কিংবা তার সঙ্গীসাথীদের কোনো বংশধর হবে। চমৎকার চরে বেড়াচ্ছে আমাদের পুরনো বাড়ির ছাদে।

পরের দিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে ইস্কুলের মাঠে গিয়ে গাধাটাকে দেখলাম, মাঠের একপাশে বিরস মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রীতিমত বুড়ো হয়েছে, আমি সামনে যেতে একটু চমকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকালো, বুঝতে পারলাম ভালো দেখতে পাচ্ছে না, চোখে হয়তো ছানি পড়েছে।

ইস্কুলের মাঠ থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে বড় রাস্তা পড়ে, সেই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাক, দূরপাল্লার বাস যায়। তা ছাড়া একালের অন্য সব শহরের মতই এ শহরেরও রাস্তায়-ঘাটে, অলিগলিতে বিপজ্জনক গতিতে কিলবিল করছে রিক্সা।

মনের মধ্যে আবার আর একটা খটকা লাগলো। এই বুড়ো প্রায়-কানা গাধাটা কী করে এই সব রাস্তা পার হয়ে রাতের বেলায় আমাদের বাড়িতে যায়, ছাদে ওঠে?

ইস্কুলের চৌকিদারের খোঁজ করলাম। অনেককাল আগে আমাদের সময়ে যে চৌকিদার ছিল, সে খুব সম্ভব আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন পড়েছিল। এর নাম তাহেরউদ্দিন।

তাহের যা বলল, তাতে একটু গোলমাল লাগল। সে বলল, গাধাটা দিনরাতই ইস্কুলের মাঠে কিংবা বারান্দায় থাকে, অনেক দিন হল এটা একা-একাই এসে জুটেছে। চোখেও ভালো করে দেখে না, ইস্কুল ছেড়ে কোথাও যায় না, যাওয়ার ক্ষমতাও নেই।

সামান্য ব্যাপার, কিন্তু মনের মধ্যে একটু সমস্যা বেধে গেল। সেদিন রাতেই খাওয়াদাওয়ার পবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে টর্চলাইটটা নিয়ে ইস্কুলের মাঠে গেলাম। গিয়ে প্রথমে গাধাটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না, ভাবলাম বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখতে হবে ছাদে উঠে গিয়েছে কিনা।

কিন্তু তা নয়, কারণ ইস্কুলের মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখি, দেয়ালের একপ্রান্তে এক পুবনো যজ্ঞডুমুর গাছের নিচে চোখ বুজে গাধাটা ঝিমোচ্ছে। টর্চের আলোয় এবার গাধাটাকে ভালো করে দেখলাম, না, এটাবও কান ছেঁড়া নয়, মানে বভ্রুবাহন নয়, তবে খুবই বুড়ো একটা গাধা। কাল রাতে আমাদের বাড়ির ছাদে যেটাকে দেখেছিলাম, সেটা বোধহয় এত বুড়ো ছিল না। তাব মানে এ দুটো আলাদা গাধা।

যা হোক বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

অনেক রাতে ছাদের ওপর আবাব সেই খুটখুট শব্দে ঘুম ভাঙল। কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকার পর ভাবলাম যাই,, একটু ছাদে গিয়ে গাধাটাকে আবেকবার দেখে আসি। টর্চ হাতে বাইবে বেবিযে এলাম।

কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি তিথি হবে, চৈত্র মাসের শেষ। আমাদের এ-অঞ্চলে এ-সময় এখনো রাতেব দিকে একটু হিম-হিম ভাব থাকে। অনেক দিনের পুরনো পাটনাই আমগাছের বোল উঠোনে পড়ে আছে, ঠাণ্ডা বাতাসে মৃদু সৌরভ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদেব দালানের পিছনে বুড়ো বকুল গাছটাতে বোধহয় ফুল হচ্ছে, বকুলেব আর আমের মুকুলেব গন্ধে ভরা বহুকাল আগের ঝিরঝিরে সব স্মৃতি, এরই মধ্যে একটা আধলা চাঁদ ছাদের কার্নিশের পাশ বেয়ে উঠল, দূরে একটা পাখি ডাকল, খুব চেনা পাখি নয়, পাখিটার নাম আগে জানতাম, এখন আর কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ছাদে উঠে গাধাটাকে দেখতে পেলাম। ভালো কবে টর্চ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিশ্চিত হলাম, ইস্কুলের মাঠের গাধা আর এ গাধা এক নয়, এ অনেক তরুণ। এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট, নধরকান্তি। আমার টর্চের আলোয় চমকিয়ে উঠে গাধাটা ছাদের একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও আর বিরক্ত না করে নিচে নেমে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

তবে তখনই মনে মনে ঠিক করলাম, আর মাত্র তিন দিন আছি, এর মধ্যে একদিন খুব ভোরে উঠে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে থাকব, গাধাটা যখন ছাদ থেকে নেমে আসবে, ওটার পিছে পিছে যাবো, দেখব ও কোথা থেকে আসে।

পরের দিন খুব ভোরবেলা, তখন আকাশের রঙ সবে হালকা হয়ে এসেছে, কাছে দূরে দু'-একটা কাক ডাকছে, আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরঘাটে একটা কাদাখোঁচা পাখি উড়ে এসে বসলো, আমি ছাদের সিঁড়ির নিচে চারদিকে দেখছিলাম, এমন সময় ধীরগতিতে গাধাটা নেমে এলো। কোণাকুনিভাবে আমাদের উঠোনটা পার হয়ে পুকুরের ধার দিয়ে হেঁটে সোজা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় পড়ল। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাটা সরাসরি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, গাধাটা নিশ্চিন্ত চিত্তে দক্ষিণমুখী রওনা হল। আমিও একটু পিছন থেকে তার অনুসরণ করলাম।

মাইলখানেক বাদে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। তবে তার পরেও অনেকটা রাস্তা খোয়া-বাঁধানো, সেই খোয়া-বাঁধানো রাস্তার একপাশে অশ্বত্থতলায় ছোট ছোট চালাঘর, একটা নলকূপ, একটা তালা লাগানো সাব পোস্টঅফিস, অন্য পাশে জীর্ণ ঘাট নিয়ে আদ্যিকালের এক দিঘি। সবই আমার চেনা, এই অশ্বত্থতলায় আর দিঘির ধার ধরে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে, মঙ্গলবার আর শুক্রবার। বহুদিনের পুরনো গ্রাম্য হাট। আমাদের শহরের বাজারের শাক-সবজি প্রায় সবই এখান থেকে যায়।

অশ্বত্থতলার একটু আগে রাস্তা থেকে গাধাটা পাশের ধানক্ষেতের আলের ওপর নামলো। মাঠে রবিশস্য কাটা হয়ে গেছে, খোলামেলা ন্যাড়া প্রান্তর। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সূর্য ওঠার সময় প্রায় হয়ে এলো, এই সময়টাই সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লাগে। একটা র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে ভালো করে কান-মাথা ঢেকে গায়ে জড়িয়ে গাধার পিছনে ধানক্ষেতের আলপথ ধরলাম। আমার চিরদিনের চেনা রাস্তা, ভালোই লাগছিল এই অ্যাডভেঞ্চার, ডাউন মেমোরি লেন।

একটা মাঠে কারা খেঁসারি বুনেছে। খেঁসারির শুঁটি সবচেয়ে মিষ্টি, শুধু এই একটা মাঠেই এখনো ফসল কাটা হয়নি। দানায় টইটম্বুর হয়ে উঠেছে খেঁসারি শস্য। আনমনে বাল্লুক বয়েসের মতো দু'-একটা শুঁটি ছিঁড়ে দানা ছাড়িয়ে মুখে ফেললাম, অমৃত। কতকাল এমন কিছু খাইনি। আমার সামনের অর্বাচীন গাধাটাও পরমানন্দে আল ধরে যেতে যেতে রবিশস্যের কিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করছে।

খেঁসারির মাঠ পার হয়ে হাটের পিছনদিকে আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে একটা কামরাঙা গাছের নিচে একটা চালাঘর। সেই চালাঘরের জরাজীর্ণ ঝাঁপে গাধাটা গিয়ে মাথা দিয়ে গুঁতো দিতে লাগলো। ভাগ্যিস গরু কিংবা ছাগলের মতো গাধার শিং থাকে না! যদি থাকত, শুধু সেই ঝাঁপ নয়, পুরো চালাঘরটাই হুড়মুড় করে পড়ে যেত। আবার হয়তো এ রকম হত না, কারণ একটু পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, গাধাটা খুব আলতোভাবে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছিল, যেমনভাবে শহরের কলিংবেল বাজিয়ে বলে, 'দরজা খুলুন'।

একটু পরে কপাটের ঝাঁপ খুলে গেল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা মহিলা, তাঁর হাতে শুকনো বাঁধাকপির ছিন্ন পাতা। গাধাটা প্রায় লাফিয়ে উঠে সেগুলো হাত থেকে মুখে নিয়ে চিবোতে লাগল।

সব কিছু আমার কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। এই বাতিল বাঁধাকপির পাতা, এই গাধা, এই মহিলা।

কিন্তু মহিলা আমার চেয়ে অনেক বেশি সপ্রতিভ। তিনি সেই অনার্য যুগের গ্রাম্য রজক-দুহিতা, ইচ্ছাময়ী-নিস্তারিণী প্রাইমারি স্কুলে আমার ছোট মাসির সঙ্গে প্যারিচরণের 'আই মেট

এ লেম ম্যান' পড়েছিলেন, খঞ্জ লোকের সঙ্গে দেখা হলে কী ব্যবহার করতে হয় তিনি জানেন, বোঝেন।

রাজিয়ামাসি এক মুহূর্তে আমাকে চিনতে পারল। অন্তত পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছে তার, চোখ-কান সবই ঠিক আছে, নীল আকাশের তলে শুভ্র রৌদ্রে সবুজ মাঝের মধ্যে তার দিন কাটছে, তার চোখ এখনো শালিকের মতো সাবলীল, তার কান কবুতরের মতো প্রখর।

কিছুক্ষণ স্থির ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রাজিয়ামসি বলল, 'খোকন? এতদিন পরে?'

আমি চুপ করে রইলাম। রাজিয়ামসি বলল, 'রেণুদি, জামাইবাবু কেউ নাই। বড় খোকন নাই। তুমি ছাড়া কে আছে? আসো না কেন?'

রেণুদি আমার মা, জামাইবাবু আমার বাবা, বড় খোকন মানে আমার দাদা, সব শেষ, তবু রাজিয়ামাসি আমাকে চিনতে পেরেছে।

প্রাথমিক ভাব-উচ্ছ্বাসের পর রাজিয়ামাসির কাছে যেটুকু জানা গেল, গিয়াসখালা বহুদিন বিগত হয়েছে। ছেলেরা ছন্নছাড়া, মেয়েরাও বিয়ে হয়ে এদিক ওদিক চলে গেছে। এখানে এই হাটখোলায় কুঁড়েঘরে রাজিয়ামাসি একাই থাকে, আর ওই গাধাটা। রাজিয়ামাসি হাটখোলা ঝাঁট দেয়, পরিষ্কার রাখে, যেদিন বারে হাট বসে না —লক্ষ রাখে চালা দোকানগুলো যাতে কেউ ভেঙে না নিয়ে যায়। বিনিময়ে হাটবারে দোকানীদের কাছ থেকে আলু, মুলো, চাল যা পারে সংগ্রহ করে। খুব খারাপ নেই সে। এই গাধাটা দিনের বেলায় তার কাছে থাকে, রাতে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যায় ছাদে থাকবে বলে। আমাদের সেই বভ্রুবাহন, তারই বংশধর বর্তমান গাধাটি। বভ্রুবাহন খুব সম্ভব এর দিদিমা বা দিদিমার মা হবে। বভ্রুবাহনের আরেক নাতি ইস্কুলের মাঠে থাকে, নিউমার্কেট পত্তনের সময় সে ওখানে চলে যায়, শহর ছেড়ে আর আসেনি। তবে এ গাধাটা দৈনিক ফিরে আসে।

আমরা কথা বলছিলাম। গাধাটা একটু দূরে চলে গিয়েছিল, রাজিয়ামাসি তাকে 'আনু-আনু' বলে ডাক দিল। ডাক শুনে আনু আনু কাছে এসে দাঁত খিঁচিয়ে হর্ষধ্বনি করল। আমি রাজিয়ামাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার আনু-আনু আমাদের বাড়ির ছাদ চিনলো কি করে?'

রাজিয়ামাসি বলল, 'ছোটবেলায় ধোপাপট্টিতে থাকার সময় একদিন ওকে শেয়ালে ধরেছিল। তখন বড় না হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন রাতে বাচ্চা আনু-আনুকে শেয়ালের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে আমাদের ছাদে রেখে আসা হত। সেই থেকে ওর এই অভ্যেস। ধোপাপট্টি থেকে হাটখোলায় এসেও আনু-আনুর সে-অভ্যাস রয়ে গেছে। জলে ঝড়ে শীতে গরমে সব ঋতুতে সব দিনই সন্ধ্যা লাগতে লাগতে আমাদের ছাদে গিয়ে উঠবে। ওটাই ওর নৈশ বিশ্রাম ও নিদ্রার স্থান।

আগের দিনই ছিল মঙ্গলবার, হাটবার। রাজিয়ামাসির হাতে এখন বড় কাজ, পুরো হাটটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আগের দিন হাটের একটা দোকান থেকে রাজিয়ামাসি দুটো বাতাসা পেয়েছিল। আপত্তি টিকল না, বাসিমুখে সেই বাতাসাদুটো মুখে দিয়ে এক গেলাস জল খেতে হল।

দু'দিন পরেই কলকাতায় ফিরে এলাম। এই দু'দিনও আনু-আনু রাতে আমাদের ছাদে এসেছিল। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে চারপায়ের খুটখুট শব্দ পেয়েছি। যাওয়ার দিন রাজিয়ামাসি

এলো, সঙ্গে আনু-আনু। বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

বাসে ওঠার আগে আনু-আনুর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে আমি বললাম, 'কী বভ্রুবাহন! আমাদের বাড়িটা রাতের বেলায় পাহারা দিতে ভুলো না।'

কয়েকদিন আগে কলকাতায় ফিরে এসেছি। কিন্তু নতুন এক উপসর্গ যোগ হয়েছে। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে একটা খুটঘুট শব্দ শুনতে পাই, একটা পুরনো দিনের গাধা হাঁটছে।

গগনমামা

গগনমামা ছিলেন মার মামাতো ভাই। দিনের আলোয় কখনো তাঁকে দেখিনি। গগনমামা যে কোথা থেকে আসতেন, কোথায় বা যেতেন—সেও আমরা কোনোদিন জানতে পারিনি। একেকদিন অনেক রাতে মাথার চুল ভর্তি ধুলো, হাতে টিনের সুটকেস, মোটা খদ্দরের ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা গগনমামা দুম করে এসে উদয় হতেন, বলতেন, 'লাস্ট বাসে চলে এলাম।' তারপর সাতসকালে কাকডাকা ভোরে উঠে বারান্দা থেকে মাকে বলতেন, 'নোয়াদি, যাই। ফার্স্ট বাসের সময় হয়ে গেছে।'

গগনমামার আসাটা আমাদের বাসায় কেউ বিশেষ পছন্দ করত না। আমার মা তো খুবই বিরক্ত হতেন, বলতেন, 'সময় নেই অসময় নেই, রাতবিরেতে গগনটা আসে। কোনো শোধবোধ নেই। গগনের জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

অবশ্য মার গগনমামাকে নিয়ে বিরক্ত হওয়ার কিছু ছিল না। আমাদের বাড়িতে আসাব আরেকটা সূত্র ছিল গগনমামার। আমার ঠাকুমার বোনের বিয়ে হয়েছিল গগনমামাদের গাঁয়ে, জ্ঞাতিবংশে। সেই সূত্রে গগনামামা ঠাকুমাকে 'মাসিমা' বলতেন। ঠাকুমার একটু স্নেহ ছিল এই ছন্নছাড়া লোকটার ওপর; কখনো দেখেছি লুকিয়ে-চুরিয়ে পাঁচ-দশটা টাকা দিচ্ছেন গগনমামার হাতে, বলতেন, 'কখনো খালি পেটে থাকিবে না।'

আমাদের বাড়িতে রাতের খাওয়া-দাওয়া মিটতে এগারোটা, সাড়ে এগাবোটা হয়ে যেত। লাস্ট বাস থেকে নেমে গগনমামা প্রায় ঐ সময়েই এসে পৌছতেন। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় কাঠের সিঁড়িতে সকলের সঙ্গে খেতে বসতেন গগনমামা। লণ্ঠনের আলোয় কাঁঠালকাঠের পিঁড়িতে বসে কাঁসার থালায় সেই নৈশভোজনের স্বাদ অনেকদিন ভুলে গেছি। গগনমামার কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল, অল্পবয়েসী যারা, যাদের তখনো পৈতে হয়নি, তারা ছাড়া খাওয়ার সময়ে কেউ কথা বলবে না, ব্রাহ্মণের খাওয়ার সময়ে কথা বলতে নেই। আচমন করে, পঞ্চদেবতাকে অন্ন দিয়ে তারপর ভোজন শুরু। পঞ্চদেবতার ব্যাপারটাও দেখছি ভুলে যাইনি, ভাতের থালার পাশে পাঁচটা ভাত দিয়ে জল ছিটিয়ে 'নাগায় স্বাহা, কূর্মায় স্বাহা.....।' এই সব বলতে হত।

সে যাই হোক, খাওয়াদাওয়ার পরে বাইরের বারান্দায় ঠাকুর্দা গগনমামাকে ডাকতেন। ঠাকুর্দা ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন, পাশের তক্তাপোষে গিয়ে গগনমামা বসতেন। ঠাকুর্দা বলতেন, 'গগন, আগের বছর ছ'মাস সময় চেয়েছিলে, তারপরে আরো ছ'মাস হতে চলল। এখন কী বলবে?'

গগনমামা বলতেন, 'সময়টা খুব খারাপ গেল। তবে আর দেরি হবে না, আর ছ' মাস সময় দিন।'

ব্যাপারটা কোনো টাকা পয়সা ধার-দেনার ব্যাপার নয়। তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার! স্বাধীনতার প্রশ্ন, স্বাধীনতা আসতে আর কতদিন দেরি আছে?

গগনমামা সব সময়েই আশা করতেন ছ'মাসের মধ্যে স্বাধীনতা এসে যাবে। কখনো এসে বলতেন, নেতাজী চাটগাঁ পর্যন্ত এসে গেছে, আর বড়জোর দু' মাস, কলকাতায় রাইটার্স বিলডিংয়ে, আমাদের জেলার কালেক্টরির ছাদে, দিল্লির লালকেল্লায় তেরঙা পতাকা উড়বে। গগনমামা রাতে আমাদের সঙ্গে একঘরে শুতেন। আমাদের শেখাতেন, বাইরে যাতে কেউ শুনতে না পায় এইরকম নিচু গলায় বলতেন, 'ডাউন ডাউন ইউনিয়ন জ্যাক, আপ আপ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ।' আবার কখনো বলতেন, 'ডু অর ডাই, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

একবার গগনমামা আমাদের খুব বিপদে ফেলেছিলেন। সেটা ছিল তুমুল যুদ্ধের বছর। মন্বন্তরের গরম নিঃশ্বাস পড়ছে গরিব মানুষের পিঠে। এদিকে রেললাইন ওপড়ানো হচ্ছে, পিকেটিং, ট্রেজারি আক্রমণ। ঘরে বাইরে যুদ্ধ, লোকে মন দিয়ে রেডিয়ো শুনছে, একটা রেডিয়ো শুনতে একশোটা লোক জড়ো হয়। সংবাদ পাঠকের থমথমে কণ্ঠস্বর শান্ত মফঃস্বলের সকাল-সন্ধ্যার বাতাসে আলোড়ন তুলছে।

এই সময় একদিন অনেক রাতে, খাওয়া-দাওয়া তখন সবে শেষ, গগনমামা এলেন। ঠাকুমা এক বাটি মুড়ি আর দুটো তিলের নাড়ু দিলেন গগনমামাকে। তাই খেয়ে গগনমামা আমাদের ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন এবং আমরা কিংবা বাড়ির কোনো লোক ঘুম থেকে ওঠার আগে, নিঃশব্দে চলে গেলেন।

গগনমামা চলে যাওয়ার ঘণ্টা-দুয়েক পরে, তখন সবে রোদ উঠেছে, পুলিশ এল আমাদের বাড়িতে, ফতেপুরের ডাকের টাকা লুঠ হওয়ার মামলার আসামী গগনেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করতে।

গগন চক্রবর্তী তখন পুলিশের নাগালের বাইরে। তাঁকে পাওয়া গেল না। কিন্তু পুলিশ জোর সার্চ করল আমাদের বাড়ি। দেড় বছরেরও বেশি হারিয়ে যাওয়া আমার কোমরের চামড়ার বেল্ট বেরোল কাঠের সিন্দুকের পেছন থেকে, বাবার বহুকাল আগে হারানো 'পার্কার' কলম পাওয়া গেল বইয়ের আলমারির র‍্যাকের পেছনে। অনেকদিন ধরে ঠাকুর্দার গড়গড়ার নল চুরি যাচ্ছিল প্রায় নিয়মিতভাবে, সেগুলো বেরোল সিঁড়িকোঠার অন্ধকার ঘুপচি থেকে। ওখানে একমাত্র যাতায়াত ছিল আমাদের নেড়ি কুকুর ভ্যাবারামের। বোঝা গেল, ভ্যাবারাম কোনো অজ্ঞাত কারণে সুযোগ পেলেই সবার অলক্ষ্যে এই নলগুলি সরাতো।

বহু চেষ্টা করে, ঘরদোর জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে তছনছ করে পুলিশ যখন একটা পাঁঠাকাটার রামদা, দাদার একটা গুলতি আর একখণ্ড বঙ্কিম রচনাবলী যার মধ্যে আনন্দমঠ ছিল—এছাড়া কিছুই পেল না, তখন তারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি করতে লাগল। এদিকে তারা অন্য পাড়া থেকে চারজন ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছিল, আমাদের বাড়ি থেকে সার্চ করে যেসব নিষিদ্ধ জিনিস বেরোবে তার তালিকায় সই করিয়ে সাক্ষী রাখবে। সে ভদ্রলোকেরা বাইরের উঠোনে ঠায় দাঁড়িয়ে। বেলা বাড়ছে, রোদ্দুর চড়া হচ্ছে, তাঁরা দরদর করে ঘামছেন।

অবশেষে পুলিশেরা মোক্ষম জিনিসটি পেল আমাদের পড়ার ঘরে। জিনিসটি আর কিছুই

নয়, একটা ডুমলণ্ঠন। বড় গোল কাঁচের চিমনি লাগানো পিতলের লণ্ঠনটা থাকত আমাদের পড়ার টেবিলে।

লণ্ঠনটা বহুকালের পুরনো। সেই উনিশশো দশ সালে প্রথম মহাযুদ্ধেরও আগে। আমার বাবা যে বছর জন্মান, ঠাকুর্দার দাদা বাবার অন্নপ্রাশনের বাজার করতে গিয়ে ঢাকার মগবাজার থেকে এই লণ্ঠনটা কিনে এনেছিলেন। বাবার নাম জুড়ে দিয়ে বাড়ির সবাই এটাকে জটুর লণ্ঠন বলত। আমাদের ছোটবেলাতেও জোর আলো হত এই বাতিটায়।

লণ্ঠনটার ওপরে পুলিশের নজর পড়ল অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য কারণে। লণ্ঠনটা ছিল জার্মান মডেলের। ম্যাক্সরেগার কোম্পানির। লণ্ঠনের গায়ে একটা সূর্যের ছবি ছিল, তার নিচে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল ম্যাক্স রেগার, মেড ইন জার্মানি—

Max Reger

Made in Germany

এই 'মেড ইন জার্মানি' ব্যাপারটা পুলিশের কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হল। যত তাদের বোঝানো হল এ লণ্ঠন বহুদিন আগের, এমন কি, আগের যুদ্ধেরও আগেকার, এখনকার ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই—তারা কর্ণপাত করল না। লণ্ঠনটা নিয়ে পুলিশ চলে গেল।

থানার মালখানা থেকে লণ্ঠনটা উদ্ধার করার বহু চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ফেরত পাওয়া যায়নি। গগনমামার সঙ্গেও আর জীবনে দেখা হয়নি। তবে এ ঘটনার মাস দুয়েক পরে একটা স্বাক্ষরবিহীন পোস্টকার্ড এসেছিল ঠাকুমার নামে। তাতে লেখা ছিল ঃ

মাসীমা,

লণ্ঠনের জন্যে দুঃখ করিবেন না। ও রকম লণ্ঠন একদিন ভারতের ঘরে ঘরে জ্বলিবে।

কাকতাড়ুয়া

আমাদের মুহুরিবাবু খগেন চক্রবর্তীকে ছোটবড় সবাই খগেনবাবু বলত। খুব রাশভারি লোক ছিলেন তিনি। মোটা লংক্লথের পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি পরা বেঁটেখাটো মানুষটি ছিলেন রীতিমত সমীহ করার মত।

নগেনকাকা ছিলেন খগেনবাবুর ভাই। খগেনবাবুই তাঁকে আমাদের শহরে নিয়ে এসেছিলেন। তখন তো গ্রামে কলেজ ছিল না, কলেজে পড়ার জন্যে নগেনকাকাকে আমাদের বাসায় নিয়ে এসেছিলেন খগেনবাবু। আমার ঠাকুর্দাকে বলেছিলেন, 'এই হল আমার ভাই নগেন, এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে সেকেন্ড ডিভিশনে। কলেজে পড়তে চায়। আপনি যদি অনুমতি করেন, বাইরের কাছারিঘরে থাকবে আর দুবেলা দু'মুঠো খাবে। দরকারমত ফাইফরমাস খাটবে। গরীবের, ছেলে কলেজে পড়ার খুব সাধ।'

এসব ক্ষেত্রে তখনকার দিনে 'না' করার রীতি ছিল না। সঙ্গতি থাকলে অবশ্যই সম্মতি মিলত গৃহকর্তার।

কয়েকদিনের মধ্যেই নীল রঙের টিনের সুটকেস আর ছোট একটা বিছানা নিয়ে নগেনকাকা

আমাদের বাড়িতে চলে এসে কাছারিঘরের এক প্রান্তে একটা ছোট তক্তাপোশে নিজের জায়গা করে নিলেন। আমার মাকে 'বৌদি' আর বাবাকে 'দাদা' বলতেন, সেই সূত্রে আমরাও তাঁকে 'কাকা' বলতাম।

অনেকরকম গুণ ছিল নগেনকাকার। ভালো ঘুড়ি বানাতে পারতেন, তাঁর ঘুড়ির সুতোর মাঞ্জাও ছিল ক্ষুরধার। মাছ ধরার চার বানানোয় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একাঙ্গী, টগর এইসব নামের রহস্যময় মশলা—সেইসঙ্গে সর্ষের খোল, চিনির গাদ মিলিয়ে রচিত হত এক মনোরম মৌতাত। সেই সৌরভে সামান্য মাছ কেন, মানুষের মাথার মধ্যেও ঝিমঝিম করত।

অনেকদিন হয়ে গেছে, প্রায় চল্লিশ বছর। এখনো নগেনকাকার সেই মাছের চারের গন্ধ কোনো কোনো দিন উতলা বাতাসে ভেসে আসে। ছোট বয়সের অনেক কিছু ভুলে গেছি, কিন্তু নগেনকাকারে স্পষ্ট মনে আছে। সে শুধু ঐ মাছের চারের গন্ধের জন্যে নয়, অন্য একটা ঘটনার জন্যে।

নগেনকাকা ছিলেন কাকতাড়ুয়া বানানোয়—যাকে বলে এক্সপার্ট। ওরকম অব্যর্থ কাকতাড়ুয়া আর কেউ বানাতে পারত না। পারবেও না বোধ হয়।

অবশ্য কাকতাড়ুয়া জিনিসটা কী আজকালকার শহরে মানুষেরা হয়ত ভালো করে জানেই না। সুতরাং কাকতাড়ুয়া ব্যাপারটা আগে বুঝিয়ে দিই। শব্দটা হাতের কাছে কোনো অভিধানেই দেখতে পাচ্ছি না, তাই পরিষ্কার করে বলা দরকার।

পাড়াগাঁয়ে মাঠের ফসল কিংবা গাছের ফল—কাক, চড়ুই, বাদুড় বা অন্য সব ঝাঁক বেঁধে চলে আসা পাখিতে খেয়ে যায়। সব সময় মাঠে বা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পাখি তাড়ানো সম্ভব নয়। তাই একটা বাঁশের মোটা কঞ্চির গায়ে পুরনো একটা জামা পরিয়ে মাথায় একটা কালো মাটির হাঁড়িতে চুন দিয়ে চোখমুখ এঁকে একটা কিম্ভূত মূর্তি বানানো হয়, যাতে পাখিরা ভয় পেয়ে দূরে থাকে।

পাখিদের মধ্যে কাক বোধহয় সবচেয়ে চালাক। অন্য পাখিদের বোকা বানানো গেলেও কাক সহজে ঠকতে চায় না। যেমন তেমন হলে হবে না কাকের জন্যে চাই রীতিমত ভয়াবহ কাকতাড়ুয়া যা দেখে শুধু কাক কেন রাত বিরেতে মানুষেরাও চমকে উঠবে।

নগেনকাকা আসার আগে পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে কখনো কাকতাড়ুয়া ব্যবহার হয়নি। শহরের বাড়িতে ফল বা ফসলের ব্যাপার ছিল না। আচার, আমসত্ত্ব, ডালের বড়ি এইসব জিনিস দরকারমতো ছাদে বা উঠোনে শুকোতে দেওয়া হত। কাকেরা সুযোগ পেলেই সে সব জিনিস ঠুকরে দিত। যতটা খেত, তার চেয়ে বেশি নষ্ট করত। সব চেয়ে বড় কথা, কাকের এঁটো করা খাবার ফেলে দিতে হত, ঘরে আনা চলত না। কাকের ঠোঁট থেকে বাঁচানোর জন্যে ছাদে ঝুড়ির নিচে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব রোদে দেওয়া হত। এতে রোদ ভালো করে লাগত না, বড়ি আমসত্ত্ব শুকোতে দেরি হত, অনেকসময় পচেও যেত।

নগেনকাকা আমাদের বাড়িতে কাকতাড়ুয়ার প্রচলন করলেন। একবার গ্রামে গিয়ে একটা চৌকিদারের নীল জামা আর নীল পাগড়ি কিভাবে যেন নিয়ে এলেন। বাঁশের কাঠামোয় সেই নীল পোশাক পরিয়ে ছাদে দাঁড় করানো হল। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে কাকেদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হল। তারা ভয়ার্ত কণ্ঠে কা-কা করে আমাদের বাড়ি ঘিরে পাক দিতে লাগল। সেই চিৎকার আর পাক দেওয়া চলছে তো চলছেই, সে আর থামে না।

আমাদের ছাদের আচার-আমসত্ত্ব নিরাপদ হল বটে, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশী কাকের আন্দোলনে নাজেহাল হয়ে পড়ল। পিছনের বাড়িতে থাকতো এক রিটায়ার্ড দারোগা, তাঁর মাথায় ছিট ছিল। তিনি কী ভেবে থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে নালিশ করে এলেন আমাদের বিরুদ্ধে।

প্রাক্তন দারোগার নালিশ বলেই বোধ হয় পরের দিনই পুলিশ অতি তৎপর হয়ে আমাদের বাসায় এল। ছাদে উঠে চৌকিদারের পোশাকের এই অবমাননা দেখে একটু খোঁজ খবর করে তারা নগেনকাকাকে ধরল।

পরস্পর মুখে শোনা গেল যে, গত বছর আমাদের শহরের পাশের গ্রাম গোমজানির সাহেবালি চৌকিদার যে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল, এই সব নীল পোশাক ছিল সেই সাহেবালির। পুলিশ বলল, নগেনকাকাকে সাহেবালি-খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হবে।

ব্যাপারটা নিয়ে গোলমাল খুব হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে এগুলো চৌকিদারের জামাকাপড় মোটেই নয়। নগেনকাকারই পুরনো জামাকাপড়, স্কুলে পড়ার সময়কার মোটা হাফপ্যান্ট আর হাফশার্ট। পি এম বাকচির নীল কালির ট্যাবলেট খুব ঘন করে গুলে ওগুলো ওরকম চৌকিদারের পোশাকের মত রঙ করা হয়েছে।

কাকেরা ঐ নীল রঙ দেখে নাকি সত্যি চৌকিদার ভেবে অত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে নগেনকাকার দাদা খগেনবাবু থানায় দশটাকার মিষ্টি খাইয়ে ঘটনাটা মিটিয়ে ফেলেন।

সব মিটে গেল। সবই মিটে গেছে। নগেনকাকাদের বহুকাল কোনো খোঁজখবর রাখি না।

কিন্তু এখনো কারো গায়ে গাঢ় নীল রঙের পোশাক দেখলে সেই কবেকার নগেনকাকার কাকতাড়ুয়ার কথা মনে পড়ে।

দুধরাজ

সেদিন বিকেলবেলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উল্টোদিকে ময়দানের খোলা মাঠে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম, একজন সাপুড়ে সাপখেলা দেখাচ্ছে।

ময়দানের এদিককার মাঠটায় হরেকরকম মজা। ভালুকওয়ালা ভালুক নাচাচ্ছে, ডুগডুগি বাজিয়ে বানর বর-বৌয়ের বিয়ে হচ্ছে, আলুকাবলি, পাউভাজি, আইসক্রিম, কুলপি মালাই বরফের একেবারে যাকে বলে রমরমা। সুতরাং দু'-একজন সাপুড়ের আবির্ভাব হবে এই নিত্য-নৈমিত্তিক আনন্দ উৎসবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাছাড়া কলকাতার রাস্তায়, অলিগলিতে, আনাচে-কানাচে বহুকাল ধরেই সাপ-খেলুড়েদের অবাধ গতি, অবাধ যাতায়াত।

হাঁটতে হাঁটতে ব্রিগেড প্যারেডের পিছনে ঝাউগাছের ছায়ার নিচে পুলিশ চৌকির কাছে পৌঁছিয়ে একটা হেলান-দেওয়া কাঠের বেঞ্চিতে বসেছিলাম।

আরো অনেক লোক সেখানে বসেছিল। সাপওয়ালাও কিছু পরে তার ঝাঁপি নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। সাপখেলা দেখার কৌতূহল বা বয়স আমার আর নেই। তবু লোকটা যখন ঝাঁপি খুলে একেবারে আমার সামনের জায়গাটায় একটা একটা করে সাপ বার করে বাঁশি বাজাতে লাগল, তখন আর না দেখে উপায় কি?

সাপুড়ের ঝাঁপির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নির্জীব সাপগুলো। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাইরের খোলা বাতাসে আর সেই সঙ্গে বাঁশির আওয়াজে সাপগুলো সচল হয়ে উঠল। তারা তরতর করে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্ষিপ্র হাতে সেগুলোকে ধরে ধরে ঝাঁপির ভেতর ভরে দিয়ে একটা ফণাতোলা সাপকে বাঁশি বাজিয়ে সাপুড়ে নাচাতে শুরু করল।

এই ফণাতোলা নাচিয়ে সাপটা ছাড়াও আরো একটা সাপ ঝুড়ির বাইরে ছিল। সেটা আকারে বেশ বড়, যথেষ্ট লম্বা, সাদা ফ্যাকাশে ধরনের, তবে এই সাপটা বড় নিস্তেজ, খুব কাবু অবস্থায় ঝিমিয়ে পড়ে আছে।

হঠাৎ এই সাপটাকে দেখে আমার মনে হল, কী যেন একটা চেনা-চেনা ভাব আছে সাপটার মধ্যে। সাপটার মাথায় একটা গোলমতন চাকার ছাপ।

ততক্ষণে সাপ-নাচানো শেষ হয়ে গেছে। সাপুড়ে ঘুরে ঘুরে সকলের কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছে। আমি তাকে একটা টাকা দিয়ে বললাম, 'ঐ যে ঝুড়ির পাশে মড়ার মত পড়ে আছে লম্বা, সাদা সাপটা, ওটা কী সাপ?'

সাপুড়ে বলল, 'বাবু, ও সাংঘাতিক সাপ। আমি ওকে আফিং খাইয়ে ঝিম মারিয়ে রাখি। ও হল জাত-গোখরো। ওর নাম দুধরাজ সাপ।'

দুধরাজ।

দুধরাজ নামটা শুনে সামনে-পিছনের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর একাকার হয়ে গেল। একটু আগেই সাপটাকে দেখে তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। এতকাল পরে, কিন্তু দুধরাজের কথা মনে আছে।

দুধরাজ হল পদ্মগোখরো। দুধরাজ ছিল আমাদের বাস্তুসাপ। সুদিনে-দুর্দিনে পুরুষানুক্রমে দুধরাজ সাপেরা আমাদের ভদ্রাসন পাহারা দিত।

গ্রামের লোকে বলত, দুধরাজ সাপের ভয়ে চোর, ডাকাত আমাদের বাড়ির দিকে এগোত না। কোনওদিন কাউকে কিন্তু দুধরাজ সাপ কাটেনি, মানে কামড়ায়নি।

আমরা দিনের বেলায় কোনওদিন দুধরাজ সাপকে দেখিনি। শুধু রাতের বেলায় বের হত। আমাদের দালানের পিছনে একটা চৌবাচ্চা মতন ছিল, ইঁটের তৈরি। অনেককাল আগে যখন দালান বানানো হয়েছিল আমাদের সেই গ্রামের বাড়িতে, আমাদের ঠাকুর্দার জন্মেরও ঢের আগে, তখন এই চৌবাচ্চা দালান বানানোর ইঁট আর চুন ভেজানোর জন্যে তৈরি হয়েছিল।

দালান শেষ হয়ে গেলে সেই চৌবাচ্চা এমনি পড়ে থাকে, তার মধ্যে দুধরাজ সাপ এসে বাসা বাঁধে। একটা সাপ আর কতদিন বাঁচে! একটা দুধরাজ নয়, একের পর এক দুধরাজ বংশানুক্রমে আমাদের ভিটে পাহারা দিয়েছে। কখনো কখনো রাতের বেলায় বিশেষত জ্যোৎস্না-রাতে দেখা যেত, দালানের পিছন দিক থেকে কোণাকুনিভাবে দুধরাজ উঠোন পেরোচ্ছে। বিদ্যুতের মত তরতর করে একটা সাদা বঙ্কিম রেখা দ্রুত চলে যাচ্ছে।

নাগপঞ্চমীর দিন আর মনসা পুজোর দিন নতুন মাটির সরায় করে কাঁচা দুধ, কাঁঠালিচাঁপা কলা দুধরাজের চৌবাচ্চার কাছে বুনো কচুর ঝোপের ধারে রেখে দিয়ে আসা হত। পরদিন সকালে দেখতাম দুধটা নেই, কিন্তু কলাটা পড়ে থাকত। দুধরাজ সাপ কলা বোধহয় পছন্দ করত না। তবুও আমরা ছোটরা যখন মাটির সরায় দুধ আর কলা দিয়ে আসতাম, দুধরাজকে বলতাম—

'দুধরাজ দুধরাজ
তোমার কপালে আজ
দুধ আর কলা
দুধরাজ দুধরাজ
খাও এই বেলা।'

একবার পূর্ণিমারাতে ঠাকুমা আমাদের ঘুম থেকে তুলে জানালা দিয়ে দেখিয়েছিলেন, আমাদের বাড়ির বাইরের উঠোনের বেলগাছটার গুঁড়িতে তিন হাত সমান মাথা উঁচু করে দুধরাজ হিস্ হিস্ গর্জন করে ফণা দিয়ে ছোবল মারছে, অক্লান্তভাবে ক্রমাগত সে ছোবল দিয়ে যাচ্ছে। সে এক অকল্পনীয় দৃশ্য।

ঠাকুমা বললেন, 'ওর মুখে বিষের থলেটা বড় হয়ে গেছে, তাই ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। কাউকে যাতে যন্ত্রণার অত্যাচারে কামড়িয়ে না দেয়, তাই নিজের বিষ নিজেই ঝেড়ে ফেলছে।'

একবার শুধু দুধরাজ সাপ দিনের বেলায় বেরিয়েছিল। একটা দাঁতাল বুনো শুয়োর বর্ষার সময় কোথা থেকে তাড়া খেয়ে আমাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। বুনো শুয়োর খুব হিংস্র জন্তু, কিন্তু সে বিষাক্ত সাপকে ভয় পায়। হঠাৎ চৌবাচ্চার গর্ত থেকে বেরিয়ে দুধরাজ তাড়া করে যায় শুয়োরটাকে। শুয়োরটা কী বুঝে প্রাণভয়ে আমাদের বাড়ি, আমাদের পাড়া ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে পাটক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বহুকালের অসংলগ্ন সব স্মৃতি। এতদিন পরে ময়দানে নির্জীব সাপটাকে দেখে বহুকাল আগের কথা সব মনে পড়ল।

সব সাপ ঝুড়িতে ভরে নিয়ে সাপুড়ে এখন অন্য জায়গায় খেলা দেখাতে যাচ্ছে। তার বাঁশির শব্দ আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে।

গ্রামের বাড়ি আর শহরের বাসা—এই দুই জায়গায় ছড়ানো-ছিটোনো ছিল আমাদের মস্ত সংসার। সময়ের নিয়মে এবং প্রয়োজনে অবশেষে একদিন গ্রামের বাড়ির পাট চুকিয়ে সবাইকে শহরে চলে আসতে হল।

বাড়ির জিনিসপত্র, ঘর-দোর, গরু-বাছুর সব কিছুরই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। শুধু দুধরাজের কথাই কেউ খেয়াল করেনি। গরুরগাড়িতে হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন তুলে শেষবারের মত সবাই যখন বেরিয়ে আসে, তখন নাকি দেখা গিয়েছিল একটা পদ্মগোখরো সাপ গরুরগাড়িটার পিছে পিছে আসছে। কিছুদূর এসে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে নলখাগড়ার ঝোপ। সে সেই ঝোপটার মধ্যে ঢুকে যায়।

অনেককাল আগে আমাদের গ্রামের বাড়ির দালান তৈরির সময় এই ঝোপ থেকেই হয়তো তার কোনও পূর্বপুরুষ আমাদের ভদ্রাসনে বাস্তুসাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন তার প্রয়োজন শেষ। সে আবার নলখাগড়ার ঝোপে ফিরে গেল।

ভরসন্ধ্যেয় মনটা খারাপ হয়ে গেল দুধরাজ সাপের কথা মনে পড়ে।

টমাটো সস্

অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু কথাটা রীতিমত সত্যি।

আমি প্রথম টমাটো সস দেখি কলকাতা আসার ঢের আগে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে এক নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মফঃস্বল শহরে। সে বহুকাল আগে।

ঠিক শহর নয়, বলা উচিত গণ্ডগ্রাম। স্থানীয় লোকেরা মুখে বলতো 'টাউন'। তখন সবে যুদ্ধের শেষ হয়েছে, ডামাডোলের বাজার। আমাদের শহরে তখনো ইলেকট্রিসিটি আসেনি, রেল লাইন নদীর ওপারে। তিরিশ মাইল দূরে, কয়েকটা টিনের লম্বা চারচালার নিচে একটা সিনেমা হল রয়েছে, সেখানে ছবির প্রত্যেক রিলের শেষে একবার ইন্টারভ্যাল, প্রোজেকটরে রিল বদলিয়ে তারপর পরের কিস্তি। একালের দূরদর্শনের ধারাবাহিক তেরো ভাগের বহু আগে সেখানে অনিবার্য কারণে শুরু হয়েছিল সেই কিস্তিমালা।

সেই ১৯৪৫-৪৬, যুদ্ধ শেষ, দুর্ভিক্ষ শেষ। তখনো পার্টিশানের ধাক্কা এসে লাগেনি আমাদের সেই ভাঙা দালানে আর পুরনো আটচালা ঘরে। সেই দালান আর টিনের ঘর দুটো মহাযুদ্ধ, কয়েকটা ঘূর্ণিবাত্যা আর কিছু বন্যা আর খরা আর দুর্ভিক্ষ কোনো রকমে পার হয়ে তখনো টিকে ছিলো।

সেই সময়ে আমাদের রাঙামামা ফিরলেন বিলেত থেকে। রাঙামামা আমাদের নিজের মামা নন, আমাদের নিজেদের কোন মামা ছিল না কস্মিনকালে, অর্থাৎ আমার মার কোনও ভাই ছিলো না। আমাব বাবা প্রকৃত শালা বলতে কী বোঝায় তা জানতেন না।

রাঙামামা ছিলেন আমার সোনা কাকিমার আপন দাদা, সোনা কাকিমা বলতেন 'ফুলদা'। সেই সোনা আর ফুল দুইয়ে মিলেমিশে কী করে বাঙা হয়েছিলো, সে এক কঠিন সমস্যা, এখন আর সমাধান করা সম্ভব নয়, কিন্তু সেকালে এমন হতো।

পৃথিবী থেকে বাঙাদা আর সোনাদা কিংবা ফুলদা-রা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে, 'হাম দো হামারা দো' সভ্যতার এই মর্মান্তিক সঙ্কটে গল্পের দরজায় দাঁড়িয়ে সোনা, ফুল আর রাঙাদেব কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করে রাখি।

সবচেয়ে যে বড়, সে বড়দা বা বড়কাকা বা বড় মাসিমা। বড়-র পর মেজো, তারপর সেজো, তারপরে বা কোথাও কোথাও প্রয়োজনমত রাঙা, সোনা, নোয়া, ফুল এবং সর্বশেষ ছোড়দি বা ছোটপিসি। এর পরেও যদি কেউ থাকে তাকে নাম ধরে সঙ্গে দাদা বা পিসি যোগ করে সম্বোধন করা ছাড়া গতি নেই।

অবশ্য এসব ঝামেলা থেকে এখন আমরা প্রায় মুক্ত হতে চলেছি। রাঙাদা, সোনাদা বহু দিন গেছে, ছোড়দা-বড়দাও যায়-যায়। এর পরে মামা-কাকা, মাসি-পিসি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে।

এসব অবান্তর কথা থাক। আমরা আমাদের মূল গল্পে ফিরে যাই। রাঙামামার গল্প।

আমি রাঙামামাকে আগে দেখিনি। আমার খুব ছোটবেলায় তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। সেটা সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটু আগে। তাঁকে আমি সেই সময় দেখে থাকলেও, অত অল্প বয়েসের কিছু মনে নেই আমার।

খনিবিদ্যার অর্থাৎ মাইনিংয়ের কী একটা উচ্চমানের অধ্যয়নের জন্যে বাঙামামার বিলেতযাত্রা, তিনি গিয়েছিলেন নিউ ক্যাসেলে।

বাংলা কথায় আছে, তেলা মাথায় তেল দেওয়া, তেমনি ইংরেজিতে বলা হয় নিউ ক্যাসেলে কয়লা নিয়ে যাওয়া। ঐ নিউ ক্যাসেলেই বাঙামামা গিয়েছিলেন।

পরে শুনেছি, রাঙামামা যখন বিলেত যাওয়ার পূর্বাহ্নে আমাদের বাড়িতে দেখা করতে আসেন, তখন তাঁর নিজের জামাইবাবু ফুলকাকা একটা খুব ছোট বাক্সে খুব ভালো করে বাঁশ কাগজ দিয়ে প্যাকিং করে মানে রাঙামামাকে কী একটা জিনিস উপহার দেন। ফুলকাকা তাঁর শালাকে বলেছিলেন, 'নিউ ক্যাসেলে গিয়ে খুলে দেখবে, খুব ভালো লাগবে।'

সেই প্যাকেটের মধ্যে নাকি কয়েক টুকরো কয়লা পোরা ছিল। জানি না, নিউ ক্যাসেল পর্যন্ত সেই কয়লা বহন করে নিয়ে রাঙামামা কতটা কৌতুকান্বিত বোধ করেছিলেন সেই মোক্ষম বিদেশে, কিন্তু এই ঘটনাটা আজ এই প্রায় অর্ধেক শতাব্দী পরেও আমাদের বাড়িতে অনেকেরই মনে আছে। এই নিয়ে সেই আমলের আমরা যারা দু'-চারজন এখনো আছি, দেখা হলে হাসাহাসি হয়।

মাত্র দু' বছরের জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন রাঙামামা। সেখানে গিয়ে যুদ্ধের মধ্যে আটকে পড়েন। যুদ্ধ শেষ হলে ফিরলেন, সে প্রায় সাত বছর পরে।

সে ফেরাও খুব সহজ হয়নি। অনেক অপেক্ষা করে তারপর ঘুরপথে দেশে এসেছিলেন। এডেনে এসে জাহাজ বদলিয়ে এবং আরো মাসখানেক আটকিযে থেকে তিনি যে জাহাজে উঠলেন, সেটা যখন বোম্বে পৌঁছাল, তখন সেখানে ধর্মঘট চলছে কিংবা অন্য কি একটা গোলমাল।

রাঙামামাব বহুবিধ দুর্দশার বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে বলি, অবশেষে তিনি দেশে মানে তাঁর নিজের গ্রামে, এসে পৌঁছালেন যাত্রা শুরু করার প্রায় ছয় সাত মাস পরে।

আমাদের টাউন আর বাঙামামাদের গ্রাম খুব কাছাকাছি ছিলো, মধ্যে মাত্র একটা ছোট নদী। নদীর ওপারের ঘাটে স্নান করতে দেখে আমার ঠাকুমা নিজে পছন্দ করে রাঙামামার বোন সোনাকাকিমাকে নিয়ে এসেছিলেন বাড়ির বউ করে।

সে যা হোক, রাঙামামা যখন গ্রামে ফিরে এলেন তখন তাঁর ঘাড পর্যন্ত ছড়ানো রুক্ষ আ-তেলা চুল, পরিধানে গরম কোট-প্যান্ট, পোড়ামাটির পুতুলের মত গায়ের কালচে রং। বাড়ির লোকেরা কিন্তু এ সমস্ত দেখেও মোটেই বিচলিত বোধ করেনি। তারা সবাই আশঙ্কা করেছিলো, এতদিন পরে রাঙামামা নিশ্চয় মেমসাহেব বউ নিয়ে ফিরবে।

তখনো মেমসাহেব-বউ ব্যাপারটার খুব চল হয়নি দেশে, বিশেষ করে সেই অজ মফঃস্বলে। মেমসাহেব সম্পর্কে এর কিছুদিন আগেই একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে গিয়েছিলো আমাদের টাউনেই।

চক্রবর্তীদের বাড়ির বড় ছেলে, শহরের মধ্যে ডাকনামে তাঁর পরিচয় ছিলো বোঁচা ডাক্তার। তিনি ডাক্তারি পাশ করে বাজারের পাশে একটা ফার্মেসিতে এসে বসেন এবং ভালোই প্র্যাকটিস করছিলেন। এই সময় যুদ্ধ। যুদ্ধে নাম লিখিয়ে তিনি আর্মির ডাক্তার হয়ে চলে যান। তারপর

যুদ্ধ শেষ হলে নামের পাশে অবসরপ্রাপ্ত মেজর উপাধি অর্জন করে আবার শহরে ফিরে এলেন।

কিন্তু তিনি একা এলেন না। সঙ্গে নিয়ে এলেন বিবাহিতা স্ত্রী, এক ইঙ্গ-ভারতীয় মেমসাহেব। যুদ্ধের সময় একই হাসপাতালে মহিলা নাকি নার্স ছিলেন, সেখানেই কাজ করতে করতে আলাপ, পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়।

বাড়ির লোক এসব কথা আগে জানতে পারে নি। সবাই মেমবউ দেখে হতচকিত হয়ে পড়লো। কৌতূহল, উৎকণ্ঠা সব কিছু মিলিয়ে ঐ মফঃস্বলের শহরে সেই মেমকে নিয়ে হাটে-বাজারে, পুকুরঘাটে, বার লাইব্রেরিতে হঠাৎ নানাবিধ গুঞ্জন শুরু হলো।

কিন্তু মেম যখন লালপাড় শাড়ি পরতে আরম্ভ করলো, তারপর অল্প অল্প করে পান-দোকতা খেতে শুরু করলো, অবশেষে একদিন পুকুরের ঘাটে রীতিমত ডুব দিয়ে স্নান করলো, এমন কি বোঁচা ডাক্তারের গরু পর্যন্ত মেম নিজেই দুইতে লাগলো—সকলেই স্বীকার করলো যে, বোঁচা ডাক্তারের স্ত্রীভাগ্য ভালো। মেম সন্ধ্যাবেলা ঘোমটা টেনে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে এরপর যেদিন কালীবাড়িতে প্রণাম করতে গেলো, সেদিন অতি বড় নিন্দুকেরাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু এর পরেই ঘটলো ভয়াবহ মারাত্মক এক ঘটনা এবং সেই সঙ্গে যবনিকাপতন। কী যে সঠিক হয়েছিলো কেউ ভালো করে জানে না, বোঁচা ডাক্তার এবং তাঁর বাড়ির লোকেরাও কখনো কাউকে বলেনি। একদিন শেষরাত্রে বোঁচা ডাক্তারের বাড়ির দিক থেকে প্রচণ্ড হৈ-চৈ, চিৎকার, চেঁচামেচি শোনা গেলো। বামা কণ্ঠে ইংরেজি গালাগাল রাস্কেল, স্টুপিড, বাস্টার্ড, বিচ্, সান অফ এ বিচ... বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে মেম তার ভাষায় অকল্পনীয় অকথ্য শব্দগুলি চেঁচিয়ে বলে আর থুথু ফেলে। ডাক্তার-বাড়ির উঠোনটা থুথুতে ভিজিয়ে হাতে হান্টার কাঁধে সুটকেস, ব্রীচেস জাতীয় প্যান্ট পরা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে মহিলা পতিগৃহ থেকে বেরিয়ে গট গট করে বাজারের রাস্তায় গিয়ে একটা টমটম গাড়ি ভাড়া করে স্টীমারঘাটের দিকে চলে গেলো। পড়ে রইলো তার শাঁখাসিঁদুর, লালপাড় শাড়ি, পান-দোকতা। সে আর ফেরেনি।

পুরো শহরটা থমকে গিয়েছিলো সেদিন। ঐ ছোট শহরের ইতিহাসে অনুরূপ উত্তেজনাময় প্রভাতকাল এর আগে আর কখনো আসেনি!

সুতরাং রাঙামামা বিলেত থেকে যদি মেম বউ নিয়ে আসে, তবে কী হবে এই আশঙ্কা স্বভাবতই ছিলো। সবাই বলাবলি করতো, যুদ্ধে সব সাহেব তো মরে ভূত হয়ে গিয়েছে, মেম সাহেবেরা বর পাবে কোথায়, তারা কি সুপাত্র পেলে ছেড়ে দেবে, ঝুলে পড়বে না!

কিন্তু যে কারণেই হোক মেমসাহেবেরা রাঙামামাকে রেহাই দিয়েছিলো। তাঁর ঘাড়ে ঝুলে পড়েনি। রাঙামামা বিলেত থেকে একাই ফিরেছিলেন। মেম জুটিয়ে আনেননি। ফলে নিঃসঙ্গ রাঙামামা ফিরে আসায় হিতৈষীরা বেশ একটু স্বস্তিই পেলেন।

বিলেত থেকে মেম আনেননি বটে, তবে একটা খারাপ অভ্যেস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাথরুম সংক্রান্ত।

ব্যাপারটা সত্যি গোলমেলে। সাত বছরে রাঙামামার অভ্যেস সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলো। তাঁদের নিজেদের বাড়িতে বাথরুম ইত্যাদির যা বন্দোবস্ত ছিলো তা প্রাগৈতিহাসিক, কোনো রকমে আবরু রক্ষা।

ফিরে এসে এই দিশি ব্যবস্থায় রাঙামামার খুবই অসুবিধে হচ্ছিলো। খবরটা তাঁর দিদি অর্থাৎ

আমাদের সোনাকাকিমার কানে ওঠে দু'-একদিনের মধ্যেই।

আমাদের বাড়িতে আমাদের ঠাকুর্দার ঘরের সঙ্গে লাগানো একটু চলনসই গোছের বাথরুম ছিলো, সেটায় আমাদের প্রবেশাধিকার ছিলো না। শুধু ঠাকুর্দা ব্যবহার করতেন সেটা, আর যদি কখনো কোনো অভিজাত অভ্যাগত থাকতেন, তাঁকে ঐ বাথরুমটা ব্যবহার করতে দেওয়া হতো।

ঐ বাথরুমে অবশ্য জলের কল ছিলো না। শুধু ঐ বাথরুমে কেন, আশেপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোথাও জলের কল ছিলো না। সিমেন্ট বাঁধানো টব ছিলো বাথরুমের একপাশে, ইঁদারা থেকে বালতি বালতি জল তুলে সেটা কাজের লোকেরা ভরে রাখতো।

সোনাকাকিমা ঠাকুর্দাকে বলে তাঁর বিলেত-ফেরত ভাইয়ের জন্যে বাথরুমটার বন্দোবস্ত করলেন।

প্রতিদিন সকালবেলা খেয়া নদী পার হয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে রাঙামামা দেড় মাইল হেঁটে আমাদের গাঁয়ে স্নান-প্রাতঃকৃত্যাদি করতে আসতেন। তখনো কাঁধের ঝোলা ব্যাগ চালু হয়নি, একটা বিলিতি পোর্টফোলিয়ো ব্যাগে তোয়ালে, পাজামা ইত্যাদি ভরে সঙ্গে নিয়ে আসতেন তিনি।

ক্রমে রাস্তাঘাটে, পাড়ায় লোকজন সবাই জেনে গিয়েছিলো রাঙামামার এই প্রাত্যহিক আগমনের কারণ। কোনো কোনো দিন হয়তো অন্য কাজেই রাঙামামা বিকেল বা সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় এসেছেন। কিন্তু আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, ইনি বাথরুমে যাবেন বলে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু হয়ে যেতো, 'এই, কে আছিস! বিশ্বম্ভর এসেছে, তাড়াতাড়ি দ্যাখ, বাথরুমে জল আছে নাকি?'

বিশ্বম্ভর বলা বাহুল্য, রাঙামামার প্রকৃত নাম। কখনো কাজের লোকের সাড়া না পেলে ঠাকুমা রাঙামামাকে চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করতেন, 'বাবা বিশ্বম্ভব, তোমার তাড়াতাড়ি নেই তো?'

ব্যাপারটা ক্রমশ অতিশয় হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রাঙাকাকাকে আমাদের বাড়িব দিকে আসতে দেখলেই রাস্তার লোকেরা হাসাহাসি করতো, বলতো, 'বিলেত-ফেরত কাজে যাচ্ছে।'

শুধু রাস্তার লোক কেন, আমাদের বাড়ির লোকেরা, এমন কি গুরুগম্ভীর মুহুরিবাবুরা পর্যন্ত মুখ টিপে হাসতেন। আমাদের রান্নার ঠাকুর ছিলো তেওয়ারি। সে একদিন বলেছিল, 'শালাবাবুব একদম শরম নাহি আছে।' সেকথা শুনে সোনাকাকিমার সে কি বাগ। তেওয়ারি কিন্তু কাউকে পরোয়া করতো না, বিশেষ করে সোনাকাকিমা জাতীয় নতুন বউদের, যারা মাত্র দু'-দশ বছব এ বাড়িতে এসেছে—তাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনতো না তেওয়ারি ঠাকুর, তার তখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে আমাদের বাসায়।

এসব যা হোক, রাঙামামার এই হাস্যকর পর্যায় খুব বেশিদিন চলেনি। সপ্তাহ তিন-চারেকের মধ্যেই তিনি ধানবাদ না আসনসোলে কোথায় যেন কয়লাখনিতে কাজ নিয়ে চলে গেলেন। তখন কয়লাখনিগুলোর অধিকাংশ ম্যানেজারই সাহেব। সেই ম্যানেজার সাহেবদের বাংলোতে আর যাই হোক, বিলিতি প্রিভিওয়ালা বাথরুম অবশ্যই ছিলো। ফুটবল, খেলার মাঠের মতো বিশাল বিশাল সেই সব বাথরুমের বর্ণনা দিয়ে রাঙামামা চাকরিতে জয়েন করে সোনাকাকিমাকে বিশদ চিঠি দিয়েছিলেন।

বাথরুমের ব্যাপারটা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেকটা গড়িয়ে গেলো।

কিন্তু এ গল্প বাথরুমের নয়। এ গল্প টমাটো সসের। এতক্ষণ শুধুই ভণিতা হলো, এবার আসল বিষয়ে যেতে হচ্ছে।

টমাটো নামক তরকারি কিংবা ফলটি তখনো জলচল হয়নি, অন্তত আমাদের ঐ অঞ্চলে। পুজোপার্বণে টমাটোর চাটনি চলতো না, ঠাকুরদালানে টমাটো ছিলো নিষিদ্ধ। লোকে কাঁচা টমাটো বিশেষ খেতো না, তরকারিতে মাছ্-মাংসে টমাটো দেওয়ার রীতিও প্রচলিত হয়নি।

বাজারে সামান্যই উঠতো টমাটো, চাষও হতো কম। যেটুকু টমাটো বাজারে উঠতো, তার প্রায় সমস্তটাই পাটের সাহেবরা কিনে নিয়ে যেতো। বাকি অল্প কিছু কারা কিনতো কে জানে, আমরা তো কখনো কিনিনি। সত্যি কথা বলতে কি, জিনিসটাকে আমরা টমাটো বলতাম না।, আমরা বলতাম বিলিতি বেগুন। রং এবং আকারের পার্থক্য বাদ দিলে, টমাটো গাছের পাতার এবং ফুলের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে বেগুনের সঙ্গে, তাই হয়তো এই নাম। যেভাবে একদা বিলিতি কুমড়ো কিংবা বিলিতি আমড়ার নামকরণ হয়েছিলো।

এই সামান্য আখ্যানে টমাটো সম্পর্কে এত কথা বলার প্রয়োজনই পড়তো না, যদি না রাঙামামা চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার আগে আমাদের আধ-বোতল টমাটো সস দিয়ে যেতেন।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিলেত থেকে রাঙামামা ফেরার সময় প্রায় কিছুই কারো জন্যে আনতে পারেননি। কোনো রকমে নিজের পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে ফিরেছিলেন। তাঁর নিজের দিদি অর্থাৎ আমাদের সোনাকাকিমাকে একটা মাফলার দিয়েছিলন, আর আমার সাহেবি-ভাবাপন্ন ঠাকুর্দাকে দিয়েছিলেন একজোড়া জারমান সিলভারের কাঁটা-চামচ।

আমাদের সকলেরই ধারণা ছিলো যে, এই দুটো উপহারের জিনিসই পুরনো, আগে ব্যবহার করা। বিশেষ করে জারমান সিলভারের ব্যাপারটায় সবাই ধরে নিয়েছিলো, এ নিশ্চয় যুদ্ধের আগে কেনা। কারণ যুদ্ধের পরে আর জারমান সিলভার আসবে কোথা থেকে? সোনাকাকিমার আশকারাতে এসব নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ গুজগাজ, ফিসফাস হয়েছিলো, কিন্তু সোনাকাকিমা মনে আঘাত পেতে পারে এই ভেবে তাঁর সামনে এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য কেউ করেনি।

যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা রাঙামামা এলেন। তাঁকে দেখেই আমার ঠাকুমা যথারীতি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এই বিশ্বম্ভর এসেছে, তাড়াতাড়ি বাথরুমে জল দে, আলো দে!' জনৈক পরিচারিকা নির্দেশ শুনে সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্ফ নিয়ে বাথরুমে রাখতে গেলো।

একটু বিরক্ত হয়ে রাঙামামা বললেন, 'না, বাথরুমে যাবো না। কাল তো চলে যাচ্ছি নতুন কাজে, তাই একটু দেখা করতে এলাম।'

সোনাকাকিমা পাশের বাড়িতে আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি ভাইয়ের গলা শুনে ছুটে এলেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে রাঙামামা উঠবার সময় তাঁর হাতের ব্যাগ থেকে একটা আধভর্তি বোতলে—যার মধ্যে একটা লাল রঙের ঘন তরল জিনিস রয়েছে, সেই বোতলটা সোনাকাকিমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'এটা জামাইবাবুকে দিস, মাছ ভাজার সঙ্গে খাবে, খুব ভালো জিনিস। আমারটা থেকে অর্ধেক দিয়ে গেলাম।'

আমরা কাছেই এসে বসেছিলাম। রাঙামামা উঠে যাওয়ার আগেই লণ্ঠনের আলোয় আমরা বোতলটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলাম, ভেতরে লঙ্কাবাটার মত ঘন লাল কি একটা জিনিস, আর বোতলটার গায়ে ইংরেজিতে কী সব লেখা, সুপক্ব দ্রাক্ষাগুচ্ছের ছবি আঁকা বোতলের গায়ে লাগানো রয়েছে। দেখলেই কেমন লোভ হয়, বোঝা যায় মহার্ঘ্য সুস্বাদু পানীয়।

আসলে একটা খালি বিলিতি ব্র্যান্ডির বোতলে কৃপণ রাঙামামা নিজের টমাটো সসের বোতল থেকে কিছুটা উপহার দিয়েছিলেন।

টমাটো সস সম্পর্কে আমাদের তখন কোনো রকম ধারণাই ছিলো না। আমরা শিশুরা কেন, বড়রাও ধরতে পারলো না জিনিসটা কী?

সন্ধ্যার পরে বাজারের চায়ের স্টল থেকে আড্ডা দিয়ে সোনাকাকা ফিরলেন, বোতলটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর লেবেলটা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন, বললেন, 'শালা তো খাঁটি বিলিতি জিনিস দিয়ে গেছে। যাই জিনিসটা দাদাকে দেখিয়ে আনি।'

তখনো পর্যন্ত মদ জিনিসটা আমাদের বাড়িতে প্রবেশাধিকার পায়নি। মদ ব্যাপারটা খুব চালু ছিলো না। শহরে সিনেমা হলের সামনে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা চক্রবর্তী বাড়ির বোঁচা ডাক্তারের এক কাকা শূন্য বোতল হাতে লাফালাফি দাপাদাপি করে খুব মাতলামি করতেন। এতদিন পরে মনে হয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মদমত্ততা ছিলো না, ওর মধ্যে অনেকটা অভিনয় ছিলো।

এছাড়া আগের বছর লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে দুজন পাটের সাহেব মাতাল অবস্থায় পাটগুদামের মাঠে মল্লযুদ্ধ করেছিলো। শহরসুদ্ধ লোক পরিষ্কার ঝকঝকে জ্যোৎস্নার আলোয় সে লড়াই উপভোগ করেছে।

আমার বাবাকে বোতলটা নিয়ে সোনাকাকা দেখালেন। আদালত থেকে ফিরে একটু বেড়িয়ে এসে তখন বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। বোতলটা দেখে বাবা খুশিই হলেন, হ্যারিকেনের ফিতেটা একটু উসকিয়ে দিয়ে ভালো করে বোতলটা দেখলেন, তারপর বললেন, 'কলকাতার হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে আমার পাশের ঘরে রংপুরের একটা ছেলে, কী রায়চৌধুরী যেন নাম ছিলো, সে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা সোডা আর বরফ কিনে এনে সেগুলো মিশিয়ে এই সব জিনিস খেতো। আমাকে বেশ কয়েকবার খাওয়ার জন্যে সেধেছে। সাহস পাইনি। এর পরে বোতলটা খুব যত্ন নিয়ে দেখে বললেন, 'তবে রায়চৌধুরী যে জিনিসটা খেতো, সেটা লাল ছিলো না আর এত ঘনও ছিলো না।'

সোনাকাকা বললেন, 'তোমার বন্ধু সস্তার জিনিস খেতো, তাই অত হাল্কা। এটা হলো আসল জিনিস, সলিড অ্যালকোহল। বিশ্বম্ভর সোজা বিলেত থেকে নিয়ে এসেছে, কম কথা নাকি!'

বিশ্বম্ভরের কথা শুনে বাবা একটু উদাস হলেন, বললেন, 'বিশ্বম্ভর এই সব অভ্যেস করেছে? বিলেত গেলে লোকের এই একটা ক্ষতি হয়!'

এমন সময় কাছারিঘর থেকে দুজন মক্কেলকে সঙ্গে করে কিছু নথিপত্র নিয়ে আমাদেব নতুন মুহুরিবাবু বারান্দায় বাবার কাছে এলেন। বাবা সাধারণত সন্ধ্যার পরে কাছারিঘরে বসেন না। দু'-চারজন মক্কেল এলে বা জরুরী কোনো ব্যাপার থাকলে বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েই সেটা করেন।

আমাদের এই নতুন মুহুরিবাবু সেকালের তুলনায় বেশ স্মার্ট। হাইকোর্টে মক্কেলদেব মামলার তদ্বির-তদারক থাকলে তিনিই সেরেস্তার তরফ থেকে কলকাতায় যান। কলকাতায় গিয়ে তিনি এদিক-সেদিক যাতায়াত করেন, মক্কেলের পয়সায় এটা-সেটা চাখেন। এসব খবরও মক্কেলদের মারফতই বাবার কানে আসে। বাবা অবশ্য কিছু বলেন না। এই তো কয়েকমাস আগে চৌরঙ্গীর একটা মদ খাওয়ার দোকান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একটা গোরা মাতাল নতুন মুহুরিবাবু অর্থাৎ রামকমলবাবুকে হঠাৎ পেছন থেকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ফলে রামকমলবাবুর সামনের একটা দাঁত ভেঙে যায়। তা নিয়েও প্রকাশ্যে তাঁকে কেউ কিছু বলেনি, সব কথাই যদিও কানে এসেছে।

আজ কিন্তু রামকমলবাবুর আসবীয় অভিজ্ঞতার সাহায্য চাইলেন বাবা। মক্কেলদের মিটে গেলে তারা চলে গেলো, রামকমলবাবুও কাগজপত্র গুছিয়ে উঠছিলেন, বাবা ইজিচেয়ারের ওপাশে মেঝে থেকে তুলে বোতলটা রামকমলবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'রামকমল, দ্যাখো তো এটা কি জিনিস? কি রকম জিনিস?'

রামকমলবাবু সন্তর্পণে বোতলটা একটু কাত করে এক ফোঁটা তর্জনীতে ছুঁইয়ে সেটা বাঁ হাতের কব্জির উপরে খুব ঘষলেন এবং যেভাবে লোকে বাজারে ঘি কেনার সময় ঘিয়ের খাঁটিত্ব শুঁকে শুঁকে যাচাই করে, তিনি ঠিক সেই রকম ভাবে ঘন ঘন শুঁকতে লাগলেন। তারপর বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে খুব গম্ভীর হয়ে রামকমলবাবু বললেন, 'এ তো একেবারে খাঁটি। খুব দামী। বিলিতি মদ। পাকা আঙুর জমিয়ে তৈরি।'

লোভাতুর দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ বোতলটার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর সেটা বাবার হাতে দিয়ে কেমন একটু দুঃখিতভাবে রামকমলবাবু কাছারিঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর জানা ছিলো যে, মদ ব্যাপারটা আমাদের বাড়িতে চলে না। তিনি বোধহয় আশা করেছিলেন যে, এই দুর্লভ সাহেবভোগ্য পানীয় তাঁরই প্রাপ্য হবে।

বাবা কিন্তু ইতিমধ্যে মনে মনে অন্য মতলব এঁটেছেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা, আমাদের সোনাকাকা এবং ছোটকাকাকে ডেকে পাঠালেন। বিনা ভনিতায় তিনি বললেন, 'বিশ্বম্ভর এত ভালো জিনিসটা দিয়ে গেছে, সেটা নষ্ট করা উচিত হবে না।'

ছোটকাকা কিছুক্ষণ আগেই বাড়ির মধ্যে এসে জিনিসটার কথা জানতে পেরেছেন। তাঁর তখন বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, সব বিষয়েই যথেষ্ট উৎসাহ, রীতিমত আধুনিক। তিনি সোৎসাহে তাল দিলেন, 'সব জিনিসই টেস্ট করে দেখা উচিত, আর একদিন খেলে তো নেশা হবে না!'

সোনাকাকা বাবাকে বললেন, 'বিশ্বম্ভর বলেছে তোমার বউমাকে মাছভাজার সঙ্গে খেতে।'

বাবা বললেন, 'আজ তো বাজার থেকে অনেক চাঁদা মাছ এনেছিলাম। তার কয়েকটা রান্নাঘর থেকে ভাজিয়ে আনতে হবে। বলবি ঝোলো খাবো না, কেউ আপত্তি করলে আমাকে বলবি।'

আপত্তি আর কে করবে? ঠাকুমা আপত্তি করবেন না, একমাত্র আমার মা আপত্তি করতে পারেন, সেই জন্যে বাবা এই কথা বললেন, তারপর ছোটকাকাকে নির্দেশ দিলেন, তুই নদীর ধারে পাটের গুদামের সাহেববাংলোয় গিয়ে বাবুর্চিকে একটা টাকা দিয়ে কিছু বরফ নিয়ে আয়। ওদের বরফের মেসিন আছে। আর ফেরার পথে লুকিয়ে সিনেমা হলের সামনে থেকে কয়েক বোতল সোডা নিয়ে আসবি। কেউ দেখতে পেলে বলবি, হজমের গোলমাল হয়েছে দাদার, ডাক্তার খেতে বলেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন, 'কোনো তাড়াতাড়ি করিস নে।' বাবা সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়বেন, তারপরে আমরা বসবো।'

সেদিন ঠাকুর্দা সাড়ে সাতটার মধ্যে শুয়ে পড়েছিলেন। তার আগে ছোটকাকা বাজার থেকে ফিরে এসেছিলেন, বরফ সংগ্রহ করতে পারেননি। সাহেবদের টী পার্টি আছে, সব বরফ লাগবে, বাবুর্চি দিতে সাহস পায়নি। তবে চার বোতল সোডা এনেছেন।

রাত আটটা নাগাদ বাইরের বারান্দায় লণ্ঠনের ফিতে খুব কমিয়ে শীতলপাটিতে আসর বসলো। সারা বাড়িতে একটা চাপা উত্তেজনা। সেই আমাদের পরিবারে প্রথম মদের আসন। বাবা নিজেই উদ্যোগ করে এনেছেন, তাই কেউ কিছু বলতে পারছে না।

আমরা ভেতরের একটা ঘরে বসে জানলা দিয়ে সব দেখছিলাম। একবার ঠাকুমা এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন, তাঁর সোনার টুকরো তিন ছেলে একত্রে মদ খেতে বসেছে। সবচেয়ে দুঃসাহস সোনাকাকিমার, এর মধ্যে আলগোছে এসে একথালা মাছ ভাজা দিয়ে গেলেন।

ছোটকাকা তিনটে গেলাসে অল্প অল্প করে জমাট রঙিন পানীয় ঢেলে তার সঙ্গে এক বোতল সোডা সমানভাবে মেশালেন। বাবা বোধহয় ক্রমশ একটু ভয় পাচ্ছিলেন, সম্ভবত ভাবছিলেন যে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তিনি বললেন, 'দেখিস আমাকে যেন বেশি দিস না।'

চল্লিশ বছর আগের গহন মফঃস্বলের রাত আটটা। বোধহয় ফাল্গুন মাস সেটা। কাঠচাঁপা ফুল আর সজনে ফুলের মেলানো-মেশানো গন্ধের মদিরতা বাতাসে। দূরে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা দিয়ে দু'-একটা লণ্ঠন দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে। বাড়ির সামনে পুকুরের জলে আর জলের উপরে জোনাকির আলো আর জোনাকির ছায়া একাকার হয়ে গেছে। একটা লোক পুকুরের ওপারে চাতালের ওপরে দাঁড়িয়ে বোঁ বোঁ করে একটা বাঁশের লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মানে বাজার বন্ধ হয়েছে, রাধু পাগলা বাজার থেকে ফিরেছে। আবছা আলোয় তাকে দেখা যাচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে না পড়া পর্যন্ত সে একা একা লাঠি ঘুরিয়ে যাবে, এটা তার দিনের শেষ কাজ।

একটু আগে শেয়াল ডাকছিলো, এখন আর ঘণ্টাতিনেক ডাকবে না। এখন শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক। দূরে ইঁটখোলার এদিকটায় একটা তক্ষক সারা সন্ধ্যা ডাকছিলো, সেটাও আর ডাকছে না।

ঠিক এই মুহূর্তে মাত্র দেড় গেলাসের মাথায় ছোটকাকা মাতাল হয়ে গেলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পুকুরের ওপারে রাধু পাগলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আজ রাধুকে আমি ঠাণ্ডা করবো, ওর অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না।'

বাবা এবং সোনাকাকা বাধা দিলেন, 'রাধু তো প্রত্যেকদিনই এ রকম করে, তোর কী? মাতলামি করিস না। চুপ করে বোস।'

ঠাকুমা অল্প দূরে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে বসে তাঁর ছেলেদের অধঃপতনের দৃশ্য অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করছিলেন। মাতলামি শব্দটা শুনে কিংবা ছোটকাকার এই মারমূর্তি দেখে তিনি ঢুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওরে বিশ্বম্ভর, তুই আমার এত বড় সর্বনাশ করে গেলি! ছাব্বিশ দিন বাথরুম ব্যবহার করার এই তোর প্রতিদান!'

ঠাকুমার এই আর্ত চিৎকারে চারদিকে সোরগোল পড়ে গেলো। লম্ফ, হ্যারিকেন হাতে আশেপাশের বাড়ি থেকে পাড়া-প্রতিবেশী ছুটে এলো। এমন কি পুকুরের ওপার থেকে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে রাধু পাগলাও 'আজ তোর একদিন কি আমার একদিন' বলতে বলতে দৌড়ে এলো।

হৈ-হট্টগোলে ঠাকুর্দা আচমকা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে ভাবলেন যে, বুনো শুয়োর কিংবা পাগল শেয়াল বাড়িতে ঢুকেছে। তিনি বার বার চেঁচাতে লাগলেন, 'ওটার মুখে টর্চ ফোকাস কর, তা হলেই পালিয়ে যাবে।'

সেদিন সেই পারিবারিক কেলেঙ্কারির তুঙ্গ মুহূর্তে দুজন মাত্র ঠাণ্ডা মাথার পরিচয় দিয়েছিলেন। একজন আমার মা, তিনি কেউ কিছু দেখবার বা বুঝবার আগে নিষিদ্ধ বোতলটি বারান্দা থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। আর দ্বিতীয় জন আমার সোনাকাকিমা, তিনি তেওয়ারি ঠাকুরকে চার আনা পয়সা বখশিশ দিয়ে রাঙামামাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

পাড়ার সবাই সন্দেহজনক মুখ করে কিছুক্ষণ পরে চলে গেলো। মা আসল বোতলটা লুকিয়েছিলেন, কিন্তু সোডার বোতল আর গেলাসগুলো তখনো শীতলপাটির ওপরে ছিলো। তা ছাড়া ঠাকুমা যে হঠাৎ বাতের ব্যথায় ওরকম ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, সেকথা কেউ বিশ্বাস করেনি।

সমস্ত লোকজন চলে যাওয়ার পরে রাঙামামা এলেন। সব শুনে তিনি তো স্তম্ভিত। তিনি যত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, তাঁর মনে কোনো রকম কুমতলব ছিলো না, ঠাকুমা ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন, 'বিশ্বম্ভর, শেষ পর্যন্ত এই তোমার মনে ছিলো!'

পরের দিন সকাল সাতটায় স্টিমার, বাড়ি থেকে রাঙামামাকে অন্তত পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় বেরোতে হবে ঘোড়ারগাড়িতে স্টিমারঘাটে পৌছানোর জন্যে। নতুন কাজে যাবেন, জিনিসপত্র কিছু গোছানো হয়নি তখনো। কিন্তু সেদিন রাঙামামা রাত বারোটার আগে আমাদের বাসা থেকে পরিত্রাণ পেলেন না।

টমাটো সস জিনিসটা কী? মদের সঙ্গে তার তফাত কী? এসব দূরূহ প্রশ্নের উত্তর, সেই সঙ্গে টমাটো সসের ব্যবহার কী, এটা যে সোডা দিয়ে খেতে নেই, এটা যে কাসুন্দির মত ভাজা জাতীয় খাবারের সঙ্গে মাখিয়ে খেতে হয়—সব কথা রাঙামামা গুছিয়ে বললেন। তিনি একথাও বললেন যে, ঐ ব্র্যান্ডির খালি বোতলটা টমাটো সস ভাগ করে দেওয়ার জন্যে আজ সকালেই সাহেবদের বাবুর্চির কাছ থেকে নগদ এক আনা দিয়ে কিনেছেন। তিনি নিজে ব্র্যান্ডি-ট্যান্ডি কিছুই খান না, বোতল পাবেন কোথায়! রাঙামামার কথা কে কী বুঝলো, কে জানে? পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মা প্রথমেই বোতলটা উপুড় করে যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো রান্নাঘরের সিঁড়ির পাশে ফেলে দিলেন। ঐ সিঁড়ির পাশে আমরা প্রতিদিন ভাত খেয়ে মুখ ধুয়ে আঁচাতাম।

সেই রান্নাঘরের পাশে আঁচানোর জায়গায় কিছুদিন পরে একটা চনমনে পেঁপেগাছ একা একাই জন্মালো। সেই গাছে কী চমৎকার বড় বড় পেঁপে হলো, সংখ্যায় রাশি রাশি। সেগুলো গাছেই পাকলো, গাছেই পাখিরা ঠুকবিয়ে খেয়ে নিলো, আমাদের ঠাকুমা কোনোদিন বাড়ির কাউকে ঐ মদাপ গাছের একটি পেঁপেও খেতে দেননি। কিছুদিন পরে লোক দিয়ে কাটিয়ে ফেলে দিলেন গাছটা।

বার লাইব্রেরি, গয়া ১৯২৪

শেষবার আমরা যখন বাড়ি বদলালাম, অর্থাৎ আগের বাড়ি ছেড়ে এখনকার বাড়িতে এলাম, সে প্রায় আট বছর আগের কথা।

লোকে যখন একটা বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি যায়, অনেক জিনিস ফেলে আসে; কিছু ভুলে ফেলে আসে, আবার কিছু ইচ্ছে করেও ফেলে আসে। অনেক সময় বড় বাড়ি থেকে ছোট বাড়িতে উঠে যাওয়ার সময় অনেক কিছুই ছেড়ে যেতে হয়।

কিন্তু এযাত্রা আমরা এসেছিলাম আগের থেকে বেশ একটু বড় বাড়িতে, ফলে আগের বাড়ির প্রায় সবকিছুই ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

কিন্তু সেটাই সব নয়। এ বাড়িতে এসে আমরা কতকগুলো জিনিস উপরি পেয়ে গেলাম।

এটা একটা সরকারী বাসাবাড়ি। আমার চাকরির সুবাদে সরকার থেকে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, আমার আগে যিনি ছিলেন, তিনি তখন বদলি হয়ে দিল্লি চলে গেছেন। ফলে অনেক ছোটখাট জিনিসই তিনি নিয়ে যেতে পারেননি।

আরো দু'-চার মাস ব্যবহার হতে পারতো এমন দুটো ঝাঁটা ও একটা বড় পাপোষ, অল্প ভাঙা কিন্তু বেশ কাজ চলে যায় এমন একজোড়া শিল-নোড়া, মরচেধরা পাখিহীন শূন্য একটা লোহার খাঁচা, একটা কুকুরের চেন, দুটো পুরনো বকলস—এই সব জিনিস তো ছিলোই, আর ছিলো কিছু শূন্য বোতল, পুরনো বই ও ম্যাগাজিন।

কিন্তু এ সমস্ত ছাড়াও এ বাড়িতে আমরা আরেকটা জিনিস পেয়েছিলাম। সেটা একটা ফটো, বাইরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো একটা পুরনো ফটোগ্রাফ।

ফটোগ্রাফটি অনেক পুরনো, উনিশশো চব্বিশ সালের। গয়া জেলা আদালতের বার লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও সদস্যদের গ্রুপ ফটো। কালো কোট ও চাপকান পরা একদল নানা বয়েসের উকিল, তাঁদের অনেকেরই বড় বড় গোঁফ, দু'-চারজনের লম্বা দাড়িও আছে। ছবির নিচে ধারাবাহিকভাবে সকলের নাম লেখা। সম্ভবত বার লাইব্রেরির বারান্দার সামনের সিঁড়িতে ছবিটা তোলা হয়েছিলো। সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন উচ্চতায় উকিলবাবুরা গম্ভীরমুখে দণ্ডায়মান রয়েছেন। ছবির ওপরে ইংরেজিতে সন এবং বার লাইব্রেরির নাম লেখা রয়েছে, যেমন থাকে এ ধরনের সব ছবিতে।

বুঝতে পারলাম এই বাড়িতে আমার আগের বাসিন্দা যিনি ছিলেন, তিনি ভুল করে এই ফটোটি ফেলে রেখে চলে গিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে দেয়াল থেকে ছবিটি খুলে নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।

এই ফ্ল্যাটের সেই পূর্ববর্তী বাসিন্দা, মিস্টার তরফদার, চাকরিসূত্রে আমার যথেষ্ট পরিচিত। এই গ্রুপ ফটোগ্রাফের মধ্যে রয়েছেন হয়তো তাঁর কোনো নিকট আত্মীয়, বাবা বা ঠাকুর্দা। তাঁদের মূল্যবান পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন এই ফটোটা।

আমার পুরনো অফিস থেকে মিস্টার তরফদার দিল্লি বদলি হয়েছেন। সেখানে গিয়ে তাঁর দিল্লি অফিসের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁকে ঐ ভুলে ফেলে যাওয়া ফটোটি সম্বন্ধে জানালাম ও লিখে দিলাম ঃ ফটোটা দেয়ালে যেখানে ছিলো সেখানেই থাকছে, ওটায় আমি হাত দিচ্ছি না। তিনি যদি কখনো কলকাতায় আসেন, আমাদের এখান থেকে যেন ওটা নিয়ে যান।

কয়েকদিন পরেই মিস্টার তরফদারের চিঠি এলো, এবং তাঁর চিঠি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তিনি লিখেছেন, ঐ ফটোর কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কিংবা তাঁর পরিবারের কারো কোনো সংস্রব নেই। তাঁদের বংশের কেউ কখনো গয়ায় বাস করেনি, দু'-একবার পিণ্ড দিতে গিয়েছেন, কিন্তু সেই পর্যন্তই।

মিস্টার তরফদারের চিঠি পড়ে আরো জানলাম যে, তিনিও এসে দেয়ালে ঝোলানো অবস্থায় ফটোটি পেয়েছিলেন এবং আমারই মত তাঁর পূর্ববর্তী বাসিন্দাকে যোগাযোগ করে ফটোটি ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি ফটোটি ফেরত দিতে পারেননি, কারণ সেই পূর্বতর বাসিন্দা ফটোটির দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং জানান যে, তিনিও বাড়িতে এসে দেয়ালে ঝোলানো অবস্থায় ফটোটি পেয়েছিলেন।

আমার যদি অনেক সময় থাকতো এবং সরকারী নথি খুলে আমার বর্তমান ফ্লাটের প্রাক্তন

বাসিন্দাদের তালিকা ও নাম-ঠিকানা যোগাড় করে একে একে যোগাযোগ করতে পারতাম, হয়তো প্রকৃত মালিকের কাছে, যিনি প্রথমবার ভুল করে ছবিটি ফেলে রেখে যান, তাঁর জিনিস ফেরত দিতে পারতাম।

কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ। ছবিটি তোলা হয়েছিলো উনিশশো চব্বিশ সালে আর আমাদের এই সরকারী ফ্ল্যাট বাড়িটায় সরকারী কর্মচারীর বসবাস শুরু হয়েছে পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমিই শুধু একটানা আট বছর আছি। অন্যেরা কেউ দু' বছর, বড় জোর আড়াই বছর। কেউ কেউ তার চেয়ে কম সময়েও থেকেছেন।

মোটমাট অন্তত জনা-দশ-বারো সরকারী কর্মচারী আমার আগে এ বাসায় থেকে গেছেন। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে লোকান্তরিত হয়েছেন, একজন সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, আর অন্য একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সরকারী তহবিল তছরুপ করে যথাকালে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

সুতরাং অনেক রকম চিন্তা করে আমি আর এই ফটোর মালিককে খুঁজে বার করার চেষ্টা করিনি। আমার পূর্বের বাসিন্দারা যা করেছিলেন, আমিও ঠিক তাই করেছি। দেয়ালে ঠিক যে জায়গায় ফটোটা ছিলো সেখানেই রেখে দিয়েছি, একটুও নড়চড় করিনি। শুধু চুনকামের সময় খুলে একটু সরিয়ে রাখি, আবার চুনকাম সারা হয়ে গেলে ফটোর ওপরের কাঁচটা ভালো করে মুছে দেয়ালের নির্দিষ্ট স্থানে টাঙিয়ে দিই, সাদা দেয়ালে কালো কোট, চাপকান পরা পুরনো কালের ভারী ভারী মানুষদের চমৎকার মানায়।

আমাদের বাইরের ঘরে কেউ এলেই ছবিটার দিকে তাঁর নজর যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জানতে চান, 'আপনারা কি আগে গয়ায় থাকতেন?' আমি এই প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর দিই না, শুধু একটু মৃদু হাসি।

টাইপ-রাইটার

তখন আমার বন্ধুদের মধ্যে দু'-একজন সবে সিগারেট-টিগারেট খায়, সেও মোটামুটি লুকিয়ে-চুরিয়ে। দাদার বন্ধুরা কিন্তু মদ ধরেছে।

অনেকদিন আগের কথা। কলেজে পড়ার বয়স সেটা। আমি পড়তাম, দাদা কলেজ-টলেজে পড়েনি। লেখাপড়ায় দাদার মোটেই আস্থা ছিল না।

আমরা থাকতাম সেই কালীঘাটের পুরনো বাড়ির দোতলায়—পাশাপাশি দুটো ছোট ঘরে। ঘরের সামনে একটা একচিলতে পূর্বমুখী বারান্দা। সেই বারান্দায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো ছিল একটা ঘণ্টা। ঘণ্টাটা পিতলের বা কাঁসার, ঠাকুমার পুজোর সামগ্রীর মধ্যে ওটা আমরা পেয়েছিলাম। বেশ ভারী, পুজো করার সময় পুরোহিতেরা যে রকম ঘণ্টা হাতে দুলিয়ে বাজান—সেই জাতের ঘণ্টা, তবে অপেক্ষাকৃত বড় সাইজের। আর শব্দটাও একটু গম্ভীর প্রকৃতির। ছোটবেলায় আমরা শুনেছি, দেশের বাড়িতে এ ঘণ্টাটাকে বলা হত কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টা। কবে কোন্‌কালে কে যেন চৈত্র মাসে পশুপতিনাথের মেলায় গিয়ে কিনে এনেছিল। সেসব আমাদের জন্মের ঢের আগের কথা।

তবে একটা কথা বলে রাখি, শুধু এ কাঠমুণ্ডের ঘণ্টাই নয়—এইরকম আমাদের বাড়ির অনেক জিনিসের গায়েই—সেগুলো যেখানে থেকে এসেছে—সে জায়গার নামের ছাপ দেওয়া ছিল। কাশীর কলসী ছিল, ছিল পুরীর লাঠি, হরিদ্বারের থালা। আর শুধু জিনিসপত্রের কথা নয়, জীবজন্তু, গাছপালা—তার পরিচয় ও আমাদের জায়গা দিয়ে। দেওঘরের পেয়ারা বা ধামরাইয়ের কুলগাছ—সেও আমাদের দেশের বাড়িতেই ছিল এবং শুধু তাই নয়, আরো ছিল সরাইলের কুকুর আর ঢাকার বেড়াল।

জীবজন্তু বা গাছপালা দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না, কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পরে জিনিসপত্র কিছু কিছু আমরা কলকাতায় কালীঘাটের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম—তার মধ্যে পুজোর জিনিসপত্র ছিল। বোধ হয় চিন্তাটা ছিল এরকম যে, পাকিস্তানে পুজোআচ্চা চলবে না, তাই পুজোর সামগ্রীই সবচেয়ে আগে আনা হয়েছিল। যার একটি ছিল ঐ কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টা।

কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টাটাকে আমরা দিশি কলিংবেল হিসেবে বারান্দায় টাঙিয়ে ছিলাম। বুদ্ধিটা ছিল দাদারই। ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘণ্টাটাকে ঝুলিয়ে লম্বা পাটের দড়ির অন্য প্রান্ত সদর দরজার চৌকাঠের মাথায় একটা ফুটো করে রাস্তার দিকে বার করা ছিল। ঐ দড়ি ধরে টানলেই দোতলায় ঘণ্টা বেজে উঠত। অনিবার্য কারণে সদর দরজায় দড়িটা যেখানে বার করা ছিল, ঠিক সেখানে দাদা আলকাতরা দিয়ে বড় বড় হরফে কাঠের পাল্লার ওপরে লিখে দিয়েছিল, "দোতলায় ঘণ্টা বাজাইবার জন্য দড়ি একবার টানিবেন। বেশি টানিবেন না। ইহা গৃহস্থের বাড়ি, ফায়ার ব্রিগেড নহে। সাবধান!"

বলা বাহুল্য, এই নির্দেশনামাটি যথেষ্টই প্ররোচনামূলক ছিল। ফলে এটা পড়ে অনেকেই, অনেক ভালো লোক পর্যন্ত, দড়ি ক্রমাগত টেনে যেত, যতক্ষণ পর্যন্ত দোতলার বারান্দায় কারো আবির্ভাব না হত। ফায়ার ব্রিগেডের মতো উচ্চ নাদে না হলেও ঢং ঢং করে বেজে যেত কাঠমাণ্ডুর ঘণ্টা।

সেদিনটা ছিল কালীপুজোর আগের দিন কিংবা আগের আগের দিন। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল পাড়ার কালীপুজোর মণ্ডপ। দুর্গাপুজো হত বড় রাস্তায় ট্রাম লাইনের কাছে, কালীপুজোটা পাড়ার মধ্যেই আমাদের বাড়ির উল্টোদিকের খালি তেকোণা জায়গায় হত। এখনো বোধ হয় তাই হয়।

সে যা হোক, সেদিন মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছে। আমি আর দাদা সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম রাত বারোটা পর্যন্ত কিংবা তারও বেশি। দুর্গাপুজোর সময় দাদা ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। পুজোমণ্ডপে দাদা সরবতের দোকান দিয়েছিল—'রায় স্পেশাল ড্রিঙ্ক'। লেমন জুসের সঙ্গে রোজ সিরাপ মিশিয়ে তিন রকম সরবত—হার্ড ড্রিঙ্কে মিডিয়াম এবং সফট। কাঁচালঙ্কা বেটে রস করে একটা কাঁচের শিশিতে রাখা ছিল। হার্ড, মিডিয়াম এবং সফটা কাঁচালঙ্কা বেটে রস করে একটা কাঁচের শিশিতে রাখা ছিল। হার্ডয়ে ড্রিঙ্কে দশ ফোঁটা, মিডিয়া পাঁচ ফোঁটা আর সফটে মাত্র এক ফোঁটা। হার্ডের দাম চার আনা, মিডিয়া সাড়ে তিন আনা আর সফট তিন আনা। অষ্টমীর দিন এক দুর্ঘটনায় সে সরবত বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। তবে তার আগেই বোঝা গিয়েছিল, জিনিসটা পাবলিক নেবে না। তখন খাঁটি কোকাকোলা চার আনা, লেমনেড, অরেঞ্জ তিন আনা। লোকে কেন দাদার এই গোলমেলে সরবত খেতে যাবে! তা ছাড়া সে বছর পুজোর

সময় কাঁচালঙ্কার দাম দারুণ চড়া, পাঁচসিকে দেড় টাকা সের। তখন এক সের মাংসের দাম আড়াই টাকা, তার মানে দেড় টাকা সেরের লঙ্কা ভয়াবহ ব্যাপার। পাইকারিতে সস্তায় পাওয়া যাবে বলে একসঙ্গে পাঁচ সের কাঁচালঙ্কা সাত টাকায় কিনে দাদা রস করিয়েছিল।

দাম বেশি ছিল বটে, কিন্তু সে যে কী ঝাঁঝ ছিল সেই কাঁচালঙ্কাগুলোর! ছাদে হামানদিস্তা দিয়ে লোক লাগিয়ে ছেঁচানো হয়েছিল সেই লঙ্কা, এর পর যাবতীয় চড়ুই, পায়রা আর কাক এক মাস বর্জন করেছিল আমাদের ছাদ। এমন কি লঙ্কার জ্বালায় পাড়ার বেড়ালগুলো পর্যন্ত আমাদের বাড়িমুখো হয়নি বেশ কয়েক সপ্তাহ।

আমাদের পিছনের বাড়ির এক বৃদ্ধ প্রতিদিন ভোরবেলা ছাদে উঠতেন সূর্যপ্রণাম করার জন্যে। থেঁতো লঙ্কার খোসাগুলো আমাদের ছাদের এক পাশে ডাঁই করে রাখা ছিল। চতুর্থ না পঞ্চমীর শেষরাতে একটু ঘূর্ণিঝড়ের মতো—এখনো কোন কোন বছর যে রকম হয় আর কি—ভোরবেলা মেঘ কেটে গিয়েছে কিন্তু তুমুল হাওয়া বইছে, দাদা হঠাৎ ছাদে উঠে গেল, আমাকে বলে গেল, 'বেদম হাওয়া উঠেছে, এবার লঙ্কার খোসাগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিই, সব কালীঘাট আদিগঙ্গায় গিয়ে পড়বে, বিজনেস সিক্রেট গোপন করে ফেলি।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভয়াবহ আর্ত চিৎকারে পুরনো কালীঘাটের ঘুমন্ত পাড়া চমকিয়ে জেগে ওঠে। সেই কাঁচালঙ্কার জ্বলন্ত খোসার ঝড় বয়ে গিয়েছিল বৃদ্ধ সূর্যপ্রণামকারীর ওপরে। তারপর ডাক্তার, হাসপাতাল। কাঁচালঙ্কার জ্বালায় আমাদের নিজেদেরও বেশ জ্বলতে হয়েছিল। দাদার কথা ছেড়ে দিচ্ছি, দাদার শোধবোধ ছিল না, আমার নিজের মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। একসঙ্গে কয়েকশো পিঁপড়ে কামড়ালে যেমন যন্ত্রণা হওয়া সম্ভব, তাই হয়েছিল।

দাদার শিক্ষা হয়েছিল মহাষ্টমীর দিন। সপ্তমীর দিন সরবত ভাল বিক্রি হয়নি। পুজোর মেজাজ কোন বছরই সপ্তমীতে বিশেষ জমে না। জমাটি পুজো শুরু হয় অষ্টমীর সন্ধ্যা থেকে। শহর, শহরতলি, গ্রাম, গঞ্জ থেকে দলে দলে কাতারে কাতারে লোক এসে উপচিয়ে পড়ে কলকাতার পুজোর প্যান্ডেলে। তখনই বেড়ে যায় খাওয়াদাওয়া, ফুর্তির সওদা, কেনাবেচা।

দাদাও অষ্টমীর সন্ধ্যার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল দুপুরে।

কালীঘাট পাড়ায় চিরাচরিত রীতি অনুসারে মহিলারা অষ্টমীর দিন উপোস করেন। ঠিক নির্জলা উপোস নয়, ফল-সরবত এসব খাওয়া চলে। দুপুরবেলা সন্ধিপুজোর পরে যে মহিলারা অঞ্জলি দিতে এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে দাদা বিনি পয়সায় এক গেলাস করে সরবত উপহার দিলেন, বেশি করে লঙ্কার রস মেশানো স্পেশাল হার্ড ড্রিঙ্ক।

খালি পেটে সেই ঝাল শরবত দু'-এক চুমুক খেয়েই প্রায় সকলের মাথা ঘুরতে লাগল। অনেকে মণ্ডপেই বমি করে ফেলল। অনেকের বাসায় ফিরে গিয়ে পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা হতে লাগল। ডাক্তার এসে বালতি বালতি নুন জল খাইয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করিয়ে পেট খালাস করে তাঁদের রক্ষা করলেন।

পুজো কর্তৃপক্ষ দাদার সরবতের ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন। প্যাণ্ডেলের পাশে দোকান করার জন্যে দাদা পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়েছিল, কর্তৃপক্ষ সে টাকাও বাজেয়াপ্ত করলেন।

ওই কালীপুজোর আগের দিন রাত বারোটা এবং তারপরে পর্যন্ত আমি আর দাদা প্যাণ্ডেলে কর্তৃপক্ষদের ধরাধরি করছিলাম, ওই আগাম পঞ্চাশ টাকা ফেরত পাওয়ার জন্যে। কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন, এক পয়সাও ফেরত দেননি।

অনেক রাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা শুয়েছিলাম। ঘুম আসতে না আসতে সদর দরজায় ধাক্কাধাক্কির শব্দে জেগে উঠলাম। আমাদের বাড়িতে কোন অভিভাবক না থাকায় দাদার বন্ধুবা আজকাল কেউ কেউ মদ খেয়ে গভীর রাতে এসে হল্লা করে, বিরক্ত করে। ঘণ্টা-টণ্টা তারা বাজায় না, দরজা ধাক্কাধাক্কি করা মাতালদের খুব পছন্দ।

একটু পরে ধাক্কাধাক্কির সঙ্গে ঘণ্টাও বাজতে লাগল, বেশ জোরে এবং দ্রুতলয়ে। তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে কচলাতে বারান্দায় এসে দেখি, দরজার কাছে সোয়েটার গায়ে এক ব্যক্তি ধাক্কা দিচ্ছে আর একটু পিছে পাড়ারই একটি বখা ছেলে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে সাহায্য করছে।

দাদাও বারান্দায় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওখান থেকে হেঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে ওখানে?'

দাদার গলার আওয়াজ পেয়ে পাড়ার ছেলেটি সরে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যার গায়ে সোয়েটার, সে বলল, 'মামু, আমি তমিজ। মকদমপুরের তমিজ।'

আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে তমিজকে উপরে নিয়ে এলাম। তমিজ মানে তমিজমামু। আমার মামাবাড়ির দেশের লোক। মামাবাড়িতেই কাজ কবে। আমার মাকে দিদি বলে, গ্রাম সম্পর্কে আমরাও মামু বলি। তবে আমরা বাবুদের বাড়ির ছেলে বলে, আমবা বয়েসে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও তমিজমামু আমাদের নাম ধরে ডাকে না, দাদাকে বলে বড়মামু আর আমাকে বলে মাঝের মামু অর্থাৎ মেজমামু।

হেমন্তের শুরু, বাতাসে একটা হিম-হিম ভাব। কিন্তু সোয়েটার গায়ে দেওয়ার সময় কলকাতায় এখনও হয়নি। বারান্দায় উঠে দেওয়ালের পাসে একটা জলচৌকি ছিল, সেখানে তমিজমামু বসল। এ বাড়ি তমিজমামুর চেনা। মামারবাড়ি থেকে গত কয়েক বছর পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে সে মাঝেমধ্যেই এখনে আসছে।

বারান্দার আলোটা জ্বালিয়ে দিতে দেখলাম, সোয়েটার গায়ে দিয়ে তমিজমামু দরদর করে ঘামছে। শরীর থেকে সোয়েটারটা খুলতে খুলতে ভিতরের পকেট থেকে একটা চিঠি বাব করে দাদার হাতে দিয়ে তমিজমামু ডুকরে কেঁদে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে! শেষরক্ষা করতে পারলাম না!'

আমরা খুব ঘাবড়িয়ে গেলাম। দেশে কেউ মারাটারা গেল নাকি, বুড়ো-বুড়ি বেশ কয়েকটা রয়েছে।

চিঠি পড়ে এবং তমিজমামুকে জেরা করে অবশ্য বোঝা গেল যে, ব্যাপারটা সত্যিই তেমন মারাত্মক কিছু নয়, অন্তত সর্বনাশ হওয়ার মত নয়।

চিঠিটা আমার মাতামহের। দাদাকে এবং আমাকে যুগ্মভাবে লেখা। দীর্ঘ চিঠি, সে বিষয়ে পরে যাচ্ছি, আগে তমিজমামুর ব্যাপারটা বলি।

গ্রাম থেকে একটা পুরনো টাইপ-রাইটার যেটা আমার মাতামহ তাঁর পাটের অফিসের চিঠিপত্র লেখার কাজে ব্যবহার করতেন, আমাদের দু'ভাইকে পাঠিয়েছেন তিনি তমিজের মারফতে। বর্ডারে চেকপোস্ট দিয়ে এই টাইপ-রাইটার নিয়ে আসা যাবে না বলে তমিজমামু বর্ডারের কয়েক স্টেশন আগে ট্রেন থেকে নেমেছে। তারপরে সেখান থেকে ঘোড়ারগাড়িতে সাতক্ষীরা। সাতক্ষীরা থেকে নৌকোয় ভোমরা, বসিরহাট হয়ে কলকাতায়। কলকাতায় মানে

কেষ্টপুরের খালে, এখন যেখানে সল্টলেক তারই পাশে। এরপর কেষ্টপুর থেকে কিছুটা পায়ে হেঁটে, তারপরে রিকশায়, শেষে বাসে।

সবশেষে নিরাপদে টাইপ-রাইটার নিয়ে ধর্মতলার মোড়ে নেমে যখন বাস বদলিয়ে কালীঘাটের বাসে উঠতে যাবে, তখন রাত প্রায় এগারোটা। এসপ্ল্যানেডের চারদিকটা কালীপুজোর মরসুম সত্ত্বেও নিঝুম হয়ে এসেছে। এসপ্ল্যানেডের বাস স্ট্যাণ্ডে যখন হাজরার বাসের জন্য তমিজমামু অপেক্ষা করছে, তিনজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে তাকে ধরে।

টাইপ-রাইটার ফুটপাতে নামানো ছিল। এদের মধ্যে একজন লাথি মেরে জিজ্ঞাসা করে, 'এ জিনিসটা কী?'

যখন তমিজমামু জানায় যে এটা টাইপ-রাইটার, তারা বলে, 'চোরাই মাল, চলো থানায়, যেতে হবে।' তমিজমামু অনেক অনুনয়-বিনয় করে কিন্তু তারা তাকে জোর করে বৌবাজার থানার কাছে নিয়ে যায়, তারপর থানার সামনে থেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, বলে যে, 'এখন ভাগো। তোমার যা বলার আছে কাল সকালে এসে বড়বাবুকে বলবে।'

তমিজমামুর বৃত্তান্ত শুনে আমরা খুব একটা বিচলিত হলাম না। পার্টিশনের পর বর্ডার পার করে জিনিস আনতে গিয়ে কত লোকের কত কিছু খোয়া গিয়েছে, এ তো সামান্য একটা পুরনো টাইপ-রাইটার! তাও ইংরেজি নয়, ফরাসী টাইপ-রাইটার!

ফরাসী টাইপ-রাইটারের ব্যাপারটা বলি। ফরাসী টাইপ-রাইটার ইংরেজি টাইপ-রাইটারের চেয়ে তেমন কিছু আলাদা নয়। যন্ত্রপাতি, অক্ষরাদি সবই-প্রায় একরকম, তবে কিছু কিছু ফরাসী অক্ষরের মাথায় একরকম চিহ্ন আছে, যা ইংরেজি অক্ষরে অনুপস্থিত।

টাইপ-রাইটারটি আমার মাতামহ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর খুল্লতাতের কাছ থেকে। আমাদের সেই খুল্ল প্রমাতামহকে আমরা খুব ছোটবেলায় দেখেছি। তিনি আগুন খেতে পারতেন। ইংরেজিতে যাকে বলে ফায়ার-ইটার, তিনি সেই ফায়ার-ইটার ছিলেন। যৌবনকালে তিনি আস্ত মশালের আলো গিলে খেতে পারতেন, গনগনে জ্বলন্ত মশাল হাঁ করে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন, সমস্ত আগুন নিঃশেষে খেয়ে নেবানো মশাল মুখ থেকে বার করে আনতেন। ও বিষয়ে তাঁর খুবই নামডাক ছিল, দূর-দূরান্তর এমন কি ঢাকা-কলকাতা পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি বিস্তারিত হয়েছিল।

সতেরো-আঠারো বছর বয়েসে এনট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে সেই খুল্ল প্রমাতামহ বাড়ি থেকে পালিয়ে যান গারো পাহাড়ে। সেখানে মান্ধাই নামে এক পাহাড়ী উপজাতির সংস্রবে আসেন, তাদের কাছেই আগুন খাওয়া শেখেন এবং আরো অনেক কিছু।

দুরারোগ্য গোপন রোগের টোটকা চিকিৎসাও জানতেন তিনি। যত রাজ্যের যত দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত্রা এসে ভিড় করত তাঁর কাছে। কোন কোন কুলত্যাগিনীর সঙ্গে তাঁর নিজেরও নাকি গর্হিত সম্পর্ক ছিল। সে অপবাদ কখনও কখনও বাড়ির অন্যদের গায়েও লেগেছে।

এসব অনেককাল আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতে তখন ঢের বাকি। আমি, দাদা, আমরা কেউই তখনও জন্মাইনি। যাকে বলে গিয়ে 'বাবার বিয়ে', আমাদের বাবার বিয়ে পর্যন্ত হয়নি তখনও, মামারবাড়ি তো বহু দূরে।

সেই সময়ে ঢাকা শহরে এক ফরাসী যাদুকর খেলা দেখাতে এসেছিলেন। আমার মাতামহের কাকা নৌকোয় করে ঢাকায় গিয়ে সেই খেলা দেখেছিলেন। খেলার শেষে সেই ফরাসী যাদুকরের

সঙ্গে দেখা করে তিনি তাঁকে নিজের আগুন খাওয়ার খেলা দেখান। অচিরেই দুজনার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

ঢাকা থেকে খেলা দেখিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে বার্মায় যান ফরাসী সাহেব। আমাদের মাতামহের ওই কাকাও তাঁর সঙ্গে যান। বার্মা থেকে ইন্দোচীন হয়ে দেশে চলে যাওয়ার সময় সাহেব তাঁর অনেক জিনিসপত্র—যার মধ্যে ওই টাইপ-রাইটারটিও ছিল—তাঁকে দিয়ে যান।

কালক্রমে টাইপ-রাইটারটি খারাপ হয়ে এসেছিল, তবে ব্যবহারযোগ্য ছিল। মাতামহের চিঠিতে জানা গেল যে, যন্ত্রটির সবই ঠিকঠাক আছে, শুধু ছোট হাতের 'এম' অক্ষরটি খসে পড়ে গেছে আর কতকগুলো অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দেওয়া আছে।

এসব সমস্যা সম্পর্কে মাতামহ তাঁর চিঠিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে এক দীর্ঘ চিঠি, সম্পূর্ণ লিখতে গেলে গল্প মারা যাবে। পুরনো চিঠির তাড়া খুঁজে চিঠিটা বার করে শুধু অনিবার্য অংশটুকু উদ্ধৃত করছি ঃ

ওঁ ভগবান ভরসা।

নিরাপদে দীর্ঘজীবেষু

বাবাজীবনদ্বয়,

...এখন তোমাদের চারদিকে চাকুরির দরখাস্ত পাঠাইবার বয়েস হইয়াছে। হাতে লেখা দরখাস্ত সাহেবরা কোনকালে পাঠ করেন না। টাইপ করিয়া দরখাস্ত পাঠাইবার জন্য তোমাদের এই মেশিন পাঠাইলাম।

এই মেশিনটি খুবই সৌভাগ্যপ্রদ। ইহা ঘরে আসিবার পরই আমাদের পাটের ব্যবসা জমজমাট হইয়াছিল। এখন দেশকালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ভগ্নহৃদয়ে এবং তৎসঙ্গে বহু আশা করিয়া তোমাদের সৌভাগ্য কামনা করিয়া মেশিনটিতে পাঠাইলাম।

মেশিনটি যৎসামান্য খুঁত আছে। ছোট হাতের 'এম' অক্ষরটি নাই এবং কয়েকটি অক্ষরের মাথায় শুভ সঙ্কেত আছে। চাকুরির আবেদনপত্র লিখিবার সময় চেষ্টা করিবে ছোট হাতের 'এম' অক্ষর যেন কোনো শব্দে না থাকে। একটু মনোযোগ দিয়া চেষ্টা করিলেই ইহা করা সম্ভব। যদি একান্তই 'এম' অক্ষর বাদ দেওয়া না যায়, তাহা হইলে টাইপ করার কালে ওই জায়গাগুলি ফাঁকা রাখিবে, টাইপ করা সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেলে কাগজ উলটাইয়া নিয়া শূন্য স্থানগুলিতে ডাবলিউ টাইপ করিয়া দিবে, কাহারও ধরিবার সাধ্য থাকিবে না।

শুভ সঙ্কেতগুলি রাখিয়া দিয়ো, ওইগুলি ফরাসী কেতার। ইংরাজি-পড়া সুশিক্ষিত সাহেবদের কাছে উহার কদর আছে।

ইতি ১২ কার্তিক, বুধবার বাংলা সম্বৎসর ১৩৬২

চির আশীর্বাদক,

তদীয় মাতামহ

বলা বাহুল্য, ওই দীর্ঘ পত্রে আরো বহু সদুপদেশ, ন্যায়বাক্য ও পরামর্শ ছিল। আমাদের পত্র পাঠ করা শেষ হওয়ামাত্র তমিজমামু আবার ডুকরে কেঁদে উঠল, 'এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, বড়বাবুকে আমি কী করে মুখ দেখাবো?'

বড়বাবু মানে আমাদের মাতামহ। দাদা ধমকিয়ে উঠল, 'তুমি থামো তো তমিজমামু।

বড়বাবুকে যা বোঝানোর আমি বোঝাব। তা ছাড়া কাল সকালে তো আমরা বৌবাজার থানায় যাচ্ছি টাইপ-রাইটার নিয়ে আসতে, এখন তুমি ঘুমোওগে।'

এই বলে দাদা ভেতরের ঘরে গিয়ে ছাদের টঙ থেকে পরপর তিনটে লেপ নামাল। এই লেপগুলোই গত বছর শীতে তমিজমামু এনে দিয়েছিল।

কিন্তু আজ অতগুলো লেপ দেখে ঘামন্ত তমিজমামু শিউরে উঠল, দাদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বড়মামু, এতো লেপ কি জন্যে?'

দাদা বলল, 'একটায় তুমি শোবে, একটায় তুমি মাথায় দেবে, আরেকটা গায়ে দেবে।'

তমিজমামু বলল, 'এতো শীত কোথায়?'

দাদা তখন বলল, 'তা হলে এতক্ষণ সোয়েটার গায়ে দিয়ে ছিলে কি করে?'

-

পরদিন সকালে আমরা দু' ভাই আর তমিজমামু অসীম সাহসে ভর করে বৌবাজার থানা অভিমুখে রওনা হলাম। আমাদের দু' ভাইয়ের ইতিপূর্বে কোন থানার মধ্যে প্রবেশ করার কারণ বা সৌভাগ্য ঘটেনি। তমিজমামুর পুলিশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একটু অন্য রকম। প্রথম যৌবনে রক্তের চাঞ্চল্যবশত তমিজমামু কিছুকাল ধলেশ্বরীতে নৌকো ডাকাতি করেছিল, তমিজ মিঞার বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী শুনে আমার মাতামহ বহু কৌশলে ও অর্থব্যয়ে তাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনে আমাদের পাটগুদামের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করেন। পরে পাটগুদাম বন্ধ হয়ে গেলেও তমিজমামু মাতামহের কাছে থেকে যায়।

আজ সকালবেলা থানায় যাওয়ার সময় তমিজমামু কালকে রাতের সোয়েটারটা আবার গায়ে দিয়ে নিল। যদিও কার্তিক মাস, কিন্তু আজ সকালবেলা ঝনঝনে রোদ উঠেছে, বেশ গরম। এর মধ্যে তমিজমামুর গায়ে সোয়েটার দেখে আমরাও ঘামতে লাগলাম। দাদা বলল, 'আমরাও সোয়েটার গায়ে দিয়ে নেব নাকি?'

আমি বললাম, 'সে কি!'

দাদা বলল, 'থানায় মারধর করলে গায়ে সোয়েটার থাকলে চোট কম লাগবে।'

দাদার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তমিজমামু বলল, 'পুলিশের মারপিট সোয়েটার ঠেকাতে পারবে না। আমি সোয়েটার গায়ে দিলাম মনে বল আনার জন্যে। আঁটোসাঁটো পোশাক পরা থাকলে ভয় কম লাগে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে বাসে করে এসপ্ল্যানেডে নেমে আমরা গুটি গুটি হেঁটে দুরুদুরু বক্ষে টাইপ-রাইটার পুনরুদ্ধার করার জন্যে বৌবাজার থানায় প্রবেশ করলাম।

থানা জায়গাটা যত ভীতিজনক ভেবেছিলাম, ঠিক তা নয়। সকালের দিক বলেই বোধ হয় থানার ভিতরটা প্রায় খালি। বড়বাবু দোতলায় না তিনতলায় বসবাস করেন, এখনও নামেননি। সামনের ঘরে টেবিলের ওপরে মাথা রেখে এই সাতসকালে ইউনিফর্ম পরা কে অফিসার ঘুমোচ্ছেন। তাঁর মাথার কাছে একটা হুলো বেড়াল চোখ বুজে গ-র-র করছে।

আমরা ভদ্রলোককে ওঠানোর চেষ্টা করতে গেটের সেপাই বলল, 'এখন তুলবেন না। কাল রাতে নাইট ডিউটি ছিল।'

একটু খোঁজখবর করতে বুঝলাম, কালীপুজো বলে এরকম ডিউটি প্রায় সকলেরই। কথা বলার লোক পাওয়া কঠিন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর থানার মালবাবু এলেন। মালবাবু নামে

যে কোন পদ থাকতে পারে, এ ধারণা আগে ছিল না। তবে মালবাবু লোক ভাল। আমাদের কথা মন দিয়ে শুনলেন। শুনে মাল-রেজিস্টার খুলে দেখে বললেন, 'না, কালকের তারিখে তো কোন টাইপ-রাইটার মেশিন জমা পড়েনি!' তারপর নিজে উঠে গিয়ে মালখানা খুলে দেখে বললেন, 'মালখানায় কোনও টাইপ-রাইটার নেই। কাল কেন, কোনদিনই জমা পড়েনি।'

আমরা হতাশ হয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এসে সামনের ফুটপাতে দাঁড়ালাম। খিদে লেগেছিল, কাছে একটা চায়ের দোকানে বসে চা আর কেক খেতে খেতে দাদা বলল, 'চল চাঁপাতলায়, পিসিমার ওখানে যাই।'

দাদার প্রস্তাবের পিছনে যুক্তি আছে। আমাদের এক দূর-সম্পর্কের পিসির শ্বশুরবাড়ি কাছেই বৌবাজার চাঁপাতলায়। পিসির শাশুড়ি কনকলতা দেবী অতি ডাকসাইটে মহিলা। অনেককাল আগে বৌবাজার কালীবাড়িতে তখনকাব বৌবাজাব থানার বড়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে কালক্রমে সমস্ত বড়বাবুর স্ত্রী এবং সেই সঙ্গে থানাব বড়বাবুসমেত সেপাই-দারোগা সকলের সঙ্গে তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা। কালীবাড়ীতে তাদের হয়ে তিনি মানত দেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁর এই সৌহার্দ্যের বিষয় আত্মীয়স্বজন সকলেরই জানা ছিল এবং এতে আমরা বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করতাম।

আমরা যখন চাঁপাতলায় পিসির শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কনকলতা দেবী পুজোর ঘরে রয়েছেন। আমরা এসেছি শুনে তিনি একটু পরে বেরিয়ে এলেন। কাজের লোকদের বললেন আমাদের জলখাবার দিতে। তারপর আমাদের, বিশেষ করে তমিজমামুর কাছে বিস্তারিত শুনলেন। শোনার পর একটু থেমে গম্ভীর গলায় স্বগতোক্তি করলেন, 'কি সাহস, টাইপ-আইটার কেড়ে নিয়েছে!, ভদ্রমহিলা আদ্যে'র উচ্চারণ করতে পারতেন না, রামকে 'আম' বলতেন, রাইটার 'আইটার' হয়ে গেল।

পুরনো আমলের বনেদি বাড়ি। ভেতরের বারান্দায় বড় কালো টেবিলের ওপরে টেলিফোন রয়েছে। কনকলতা আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। তারপর দাদাকে বললেন, ফোনে বৌবাজার থানা ধরতে। ডিরেকটরি দেখে একটু চেষ্টা করতে বৌবাজার থানা পাওয়া গেল।

এবার কনকলতা দেবীর নির্দেশমত বিচিত্র কথোপকথন শুরু হল। বেলা প্রায় বারোটা হতে চলল, মনে হল, থানায় ইতিমধ্যে অনেক লোক এসে গেছে। দাদা ফোনে জানাল যে, কনকলতা দেবীর বাড়ি থেকে বলছি। তাতে বেশ সাড়া পাওয়া গেল এবং বোঝা গেল যে কনকলতা দেবীর প্রভাব থানার ওপরে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান।

থানার সঙ্গে দাদার কথোপকথন চলল কনকলতা দেবীর নির্দেশে, দাদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে বলছেন?' সাধারণত থানা কিংবা কোন সরকারী অফিস থেকে এজাতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু দাদার মুখ দেখে বোঝা গেল উত্তর এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দাদা সেটা রিলে করে দিল, 'রমেশ চক্রবর্তী'।

সঙ্গে সঙ্গে কনকলতা দেবী বললেন, 'জিজ্ঞেস করো, কোন অমেশ?'

এখানে এই ব্যাপারটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সেই সময়ে বৌবাজার থানায় দুজন রমেশ চক্রবর্তী ছিলেন, দুজনেই এ-এস-আই বা ছোট দারোগা। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, আসামী-ইনফরমার-সেপাই—থানার কাছাকাছি ও আশেপাশের লোকজন একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রচনা করেছিল দুজনের মধ্যে, তারা যে কোন কারণেই হোক একজনকে বলত 'চালাক রমেশ'

অন্যজনকে বলত 'বোকা রমেশ'। এসব খবর আমরা পরে জেনেছিলাম। কিন্তু সেদিন ফোনে দাদা বাধ্য বালকের মতো যখন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন রমেশ?' ও প্রান্ত থেকে স্পষ্ট উত্তর এল, 'আপনি দিদিমাকে বলুন, আমি বোকা রমেশ।'

বলা বাহুল্য, বোকা রমেশ চক্রবর্তীকে সবাই যতো বোকা ভাবত, হয়ত তিনি তা ছিলেন না। তা হলে অন্তত তিনি জানাতে পারতেন না যে তিনিই বোকা রমেশ। সে সব অন্য কথা। আসল কথা হল, এবার কনকলতা দেবী ফোনটা দাদার হাত থেকে তুলে নিলেন এবং যথাসম্ভব অপ্রাকৃত ভাষায় বোকা রমেশ চক্রবর্তীকে জানালেন পুলিশবাহিনীর অপদার্থতা বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত এবং তমিজমামুর টাইপ রাইটারের করুণ কাহিনী।

মহানুভব লোক ছিলেন বোকা রমেশ চক্রবর্তী। তিনি কনকলতা দেবীকে বললেন, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থানায় পাঠিয়ে দিতে। কনকলতা বললেন, 'এখন নয়, ওরা দুপুরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে তিনটে নাগাদ যাবে।'

সেদিন দুপুরে অনেকদিন পরে পিসির হাতের রান্না খেলাম। মুলোশাক ভাজা, লাউচিংড়ি, মিষ্টি কুমড়োর চাপরঘণ্ট, বোয়াল মাছের ঝাল, নতুন আলুকপি দিয়ে রুই মাছের ঝোল আর সবশেষে অনবদ্য মাছের ল্যাজা আর শালুকের টক। মনে হচ্ছিল দেশে ফিরে গেছি। একটু গাঁইগুঁই করে আমাদের পাশে বসে তমিজমামুও খেল। চাঁপাতলা লেনের সেই বাড়িতে কেউ খেয়াল করতে যায়নি আমাদের তমিজমামু ব্রাহ্মণ কিংবা হিন্দু কিনা। দেশের বাড়িতে এ গোলমালটা তখনও ছিল।

সোয়া তিনটে নাগাদ থানায় গেলাম। অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। গেটের সেপাই আমাদের দেখে কী করে কী বুঝল কে জানে, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা রমেশবাবুর কাছে যাবেন?'

দাদা চালাকি করে জিজ্ঞেস করল, 'কোন রমেশবাবু?'

সেপাই গলা নামিয়ে বলল, 'বোকা রমেশবাবু। সামনের বাঁদিকের ঘরে আছেন।' বলে চোখের কোণে এক ঝিলিক হাসল।

সামনের বাঁদিকের ঘরে ঢুকে গেলাম। একটা টেবিলের পিছনে চেয়ার জুড়ে গোলগাল নাদুসনুদুস এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। যদিও পুলিসের পোশাক কিন্তু চেহারায় কেমন ভালো মানুষের ভাব, ইনিই নিশ্চয় বোকা রমেশবাবু। তাঁর পাশে মেজের ওপরে দুটো লোক হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে। লোক দুটোকে দেখেই তমিজমামু চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই তো, এ দুজন! আরো একজন ছিল।'

কোনরকম পরিচয় বিনিময় করার আগেই রমেশবাবু বললেন, 'আপনারা এসে গেছেন, ভালোই হয়েছে। এ দুটোকে ধরে এনেছি। তিন নম্বরটাকে ধরা যায়নি। তবে যাবে কোথায়? তারপর টেবিল থেকে একটা কালো কাঠের রুল তুলে মেঝেয় বসা লোকদুটোর পেটে দুটো খোঁচা দিয়ে বললেন, 'এগুলো পাকা জোচ্চোর। থানার নাম করে লোকের মাল কেড়ে নেয়।'

ওই দুজনের মধ্যে একজন ফিরিঙ্গি, চুলের রঙ লাল, চোখের রঙ কটা, গায়ের রঙ সাদা— তাকে চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করালেন রমেশবাবু। তারপর আমাদের বললেন, 'এর নাম পিটার। মহা শয়তান। এটাই পালের গোদা। এর সঙ্গে যান, টাইপ-রাইটার ফেরত দিয়ে দেবে।' তারপর দ্বিতীয় লোকটাকে একটা লাথি মেরে বললেন, 'যা ভাগ।'

আমরা বেরোতে বেরোতে শুনলাম, পেছন থেকে রমেশবাবু বলছেন, 'কোনো চালাকি

করতে যেয়ো না পিটার, তা হলে একদম ডাকাতির মামলায় জুড়ে দেব।'

আমরা রাস্তায় নেমে পিটারের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। পিটার লোকটি জোচ্চোর কিন্তু সজ্জন, সে আমাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চমৎকার তালতলার বাংলায় বলল, 'স্যার, আপনাদের নিয়ে যেতে লজ্জা করছে। আমরা কিন্তু খুব খারাপ জায়গায় যাচ্ছি।'

আমি আর তমিজমামু মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম। দাদা জিজ্ঞাসা করল, 'খারাপ জায়গা কেন?'

পিটার খুব সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'স্যার-আমার স্বভাবদোষ। কাল রাতে মেশিনটা আমি জলিকে দিয়ে এসেছি।'

দাদা বলল, 'জলি? জলি আবার কে?

পিটার আরও সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'জলি খুব বাজে মেয়ে স্যার। খারাপ পাড়ার মেয়ে। মাঝে মাঝে ওর ওখানে যাই। সব সময় টাকা দিতে পারি না, কাল ওই মেশিনটা দিয়ে এসেছি।'

ততক্ষণে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গির মোড় পার হয়ে বাঁদিক ধরে জানবাজারের কাছে এসে পড়েছি। সত্যিই গোলমেলে জায়গা, কার্তিক মাসের পড়ন্ত বিকেল, একটু-ছায়া ছায়া অন্ধকার ভাব। এরই মধ্যে দালাল আর নষ্ট মেয়েছেলেরা রাস্তায় নেমে পড়েছে।

পরিবেশ বুঝতে আমাদের কোনই অসুবিধে হচ্ছিল না, কালীঘাটে আমাদের বাড়ির পিছনেই খারাপ পল্লী, আর তমিজমামুও পাকা লোক।

একটি পুরনো দোতলাবাড়ির প্যাসেজে কয়েকটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও চীনে মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে, তারা পিটারকে দেখে চিনতে পারল। একজন বলল, 'হ্যালো পিটার?'

পিটার জিজ্ঞাসা করল, 'জলি কাঁহা? হোয়ার ইস জলি?' জানা গেল জলি ঘরে আছে।

এ জায়গা পিটারের বেশ চেনা। সে আমাদের নিয়ে দোতলায় উঠল। সিঁড়ির শেষ মাথায় জলির ঘর। ঘরের সামনে মোটা পর্দা। পিটার আমাদের বলল, 'আসুন।' বলে হন হন করে এগিয়ে গেল, তমিজমামু একবার গলাখাঁকারি দিল, দাদা দরজায় দুবার ঠুকঠাক করল, ভেতর থেকে সুললিত মেমকণ্ঠে জবাব এল, 'সরি, আই অ্যাম বিজি।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে কী দৃশ্য দেখব কি জানি, আমরা থমকে গেলাম। পিটার কিন্তু পর্দা সরিয়ে ঢুকে গেল। ঢুকে আমাদের ডাকল, 'আসুন স্যার, আপনারা আসুন।'

একটু ইতস্তত করে আমরা ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে দেখি একটা ডবলবেডের খাটের পাশে একটা ছোট গোল টেবিল। সেই টেবিলে আমাদের টাইপ-রাইটারটা বসানো। সামনে খাটে বসে একটি মেয়ে সেই মেশিনে কাগজ লাগিয়ে একমনে কি সব টাইপ করে যাচ্ছে।

অল্পবয়সী ফিরিঙ্গি মেয়ে, একুশ বাইশের বেশি হবে না। রঙ তত ফর্সা নয় , কিন্তু বড় বড় দুটি নীল চোখ, মুখে বেশ কমনীয়তা। শরীরে যৌবনের মাদকতা।

পিটার মেয়েটিকে বলল, 'জলি, ভেরি স্যরি। মেশিনটা ফেরত দিতে হবে। এঁরা নিতে এসেছেন।'

টাইপ করা থামিয়ে জলি অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। একটু পরে খাট থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল, তারপর পিটারকে বলল, 'অলরাইট, নিয়ে যেও। আমার পাওনা টাকাগুলো মিটিয়ে দিয়ো।' বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

দাদা হঠাৎ তার পথ আগলিয়ে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

জলি বলল, 'আপনি কী করবেন জেনে? নিজের কাছে যাচ্ছি। আপনারা আপনাদের মেসিন নিয়ে চলে যান।'

দাদা কী ভাবল কে জানে, জলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'টাইপ মেশিনটা তুমি চাও? তুমি টাইপ করতে পারো?' কিছু না বলে জলি থমথমে মুখে দাদার দিকে তাকাল। আমি আর তমিজমামু নিষেধ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই দাদা জলিকে বলল, 'ভালো মেয়ে হও। ভালো পথে থেকে উপার্জন করো। মেশিনটা তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন থেকে সৎভাবে থাকো।'

পিটার হাঁ করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আমাকে বলল, 'স্যার, বোকা রমেশবাবু কী বলবে?'

তমিজমামু হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দাদাকে বলল,'বড়মামু, বড়বাবু কী বলবে?'

আমি হাঁ করে জলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পরের দিন তমিজমামু দেশে ফিরে গেল।

দাদা তার হাতে চিঠি দিয়ে দিল, 'শ্রীচরণকমলেষু, টাইপ-রাইটার পাইয়া খুব খুশি হইয়াছি।' ইত্যাদি।

দাদার কিন্তু এর পরে কাজ বেড়ে গেল। দু'-এক দিন পরে হাজরার মোড়ে একটা সাইনবোর্ডের দোকান থেকে ইংরেজি এবং বাংলায় 'টাইপিং ডান হিয়ার', 'এখানে টাইপ করা হয়' একটা ছোট বোর্ডে লিখিয়ে জলিদের বাড়ির গেটে লাগিয়ে দিয়ে আসে। বাড়িউলি সামান্য আপত্তি করেছিল, তাকে দাদা বোকা রমেশ দারোগার ভয় দেখায়।

এর পরেও দাদা মধ্যে মধ্যে জলির ওখানে যেত। জলি সত্যিই সচ্চরিত্র জীবনযাপন করছে কিনা দেখবার জন্যে।

তবে সে অন্য গল্প।

জানালা

জানালাটা আমাদের সঙ্গে অনেক দিন আছে। ওরিয়েন্টাল স্কুলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয় উনিশ শো উনষাট কিংবা ষাট সালে। সেই সময় পুরনো বাংলা ইঁটের গাঁথা চব্বিশ ইঞ্চি দেওয়ালের সাবেকী দালান ভেঙে নতুন সেন্টেনারি বিলডিং তোলা হয়। পুরনো দালানের মালমশলা, ইট-কাঠ, জানালা-দরজা সব নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

কী বুদ্ধি করে দাদা ঐ নিলাম থেকে জানালাটা কিনে এনেছিলো, শুধু ঐ একটা মাত্র জানালা, আর কিছু নয়।

রীতিমত ভারী জানালাটা। প্রায় আধ মণ কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি ওজনের হবে। নিলামের জায়গা থেকে কিনে দাদা সেটা নিজে বয়ে আনতে পারেনি, একটা রিকশায় করে নিয়ে এসেছে।

কালীঘাটের বাড়ির সামনে ফুটপাথে রিকশা থেকে নেমে দাদা ডাকাডাকি করতে আমি

দোতলা থেকে নিচে নেমে এলাম। তারপর আমি, দাদা আর রিকশাওয়ালা ধরাধরি করে জানালাটাকে রিকশা থেকে নামালাম।

জানালাটা নামানোর পর দাদা আমাকে বললো, ওরিয়েণ্টালের নিলাম থেকে কিনে আনলাম। একশো বছরের পুরনো জিনিস। খাঁটি বার্মা মেহগনি, এসব আর আজকাল পাওয়া যাবে না।'

দাদার কথায় রিকশাওয়ালাও সায় দিলো, 'বহুত আচ্ছা জানেলা।' একশো বছরের ব্যাপারটা কী করে সেও বুঝতে পেরেছে, সে দাদাকে তাল দিয়ে বললো, একশো বছরের জানালা আরো একশো বছর যাবে।

এদের অত্যুৎসাহ দেখে দাদাকে আমি আর বলতে পারলাম না যে, ইস্কুলের বয়স একশো বছর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যে দালানটা ভাঙা হয়েছে, সেটাও সেই বয়েসী হবে এমন কোনো কথা নেই, দালানটা পরেও তৈরী হয়ে থাকতে পারে, প্রথমে হয়তো একটা চালাঘরে ইস্কুল শুরু হয়েছিলো।

কিন্তু এসব তো অন্য কথা, কিছুর মধ্যে কিছু নয়, দাদা হঠাৎ নিলাম থেকে ভারী জানালাটা কিনে নিয়ে এলো কেন, আমি বুঝতে পারছিলাম না।

যে কোনো ইস্কুলের জানালার মতই এই জানালার আরো কিছু স্মৃতিচিহ্ন আছে। পেন্সিল-কাটা ছুরিতে কিংবা ব্লেডে খোদাই করা অনেক নাম—নৃপেন, রাধানারায়ণ, শহীদুল থেকে শুরু করে আধুনিক পরাগ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি। দ্বিতীয় যুদ্ধের কিছু পরে ওরিয়েন্টালে সকালে মর্নিং ক্লাস শুরু হয় মেয়েদের দিয়ে। তবে মেয়েরা ছুরি দিয়ে কাঠ খোদাই করে সচরাচর নিজেদের নাম লেখে না। শুধু এক জায়গায় দেখলাম, শুধু নাম নয়, বেশ আত্মপ্রচার রয়েছে, লেখা আছে 'আমি সরসী'।

আমার বিমূঢ় ভাব দেখে দাদা একটু বোকার মত হেসে বললো, 'সাবেকী জিনিস, সস্তায় পেয়ে গেলাম, মাত্র সাড়ে সতেরো টাকায়।'

কিন্তু শুধু নামাবলী নয়, জানালাটার সঙ্গে আরো কিছু কিছু জ্ঞানের বিষয় আমরা পেয়ে গেলাম। জানালার ডান দিকের পাল্লার নিচের দিকে খুদে খুদে অক্ষরে ত্রিভুজেব তিন কোণ যে দুই সমকোণের সমান তার সচিত্র প্রমাণ রয়েছে। আরেক জায়গায় কাবেরী, গোদাবরী, নর্মদা ওই সব নদীর নাম লেখা রয়েছে, দাদা সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাকে বললো, 'এগুলো দক্ষিণ ভারতের নদীর নাম, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।' যেন জানালাটা না আনলে এসব নদীর নাম আর কখনো জানা যেত না, আমাদের মহা ক্ষতি হত।

এতদিনেও অস্পষ্ট হয়নি, কিন্তু এইসব লেখাগুলো। পেন্সিলে, দুয়েকটা ভালো কালিতে, শুধু এক জায়গায় নীল পেন্সিলে চমৎকার নিটোল অক্ষরে লেখা আছে, 'চৈত্রদিনের ঝরা পাতার পথে'। এও কী কোনো স্কুলের ছাত্রের লেখা?

জানালাটা আমরা ধরাধরি করে দোতলায় তুললাম। ওপরে উঠে জানালাটা নামিয়ে আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শুধু একটা জানালা, এই জানালাটা আমাদের কী কাজে লাগবে?'

দাদা প্রশ্নটা একটু এড়িয়ে গেলো, শুধু বললো, 'কখন কী কাজে লাগে কিছু কি বলা যায়! সদর দরজার পাশে লাগাতে পারি, বাড়ির চেহারা খুলে যাবে।'

আমি বললাম, 'সদব দরজার পাশে এত বড় জানালা লাগানোর জায়গা কোথায়?' দাদা চুপ করে রইলো।

সেই থেকে জানালাটা আমাদের সঙ্গে রয়েছে।

দাদা অনেকদিন নেই। কালীঘাটের বাড়িও নেই। কালীঘাটের বাড়ি ছেড়ে গেলাম তারাতলায় সরকারী আবাসনে। জানালাটা ফেলেই আসছিলাম, শেষ মুহূর্তে আমার ছোট ভাই বিজন সেটাকে ট্রাকে তুলে দিলো।

তারপরে বাসা বদল হলো আরো দু'বার। জানালাটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। পণ্ডিতিয়ায ছোট বাড়িতে এত বড় একটা জানালা নিয়ে অসুবিধেই হয়েছিলো! বেশ কয়েক বছর পড়েছিলো উঠোনের একপাশে রোদে বৃষ্টিতে, তবে জানালার কাজই তো রোদ-বৃষ্টি ঠেকানো, এই ভেবে মাথা ঘামাইনি।

পণ্ডিতিয়ার বাসা ছেড়ে দো-আঁশলা পাড়ার এখনকার এই বাসায় এসেছি, সেও অনেকদিন। জানালাটা এখনো আছে। বিজনের ঘরে একটা জানালাব নিচে হেলান দিয়ে রাখা আছে ওটা।

জানি না, জানালাটা আমাদের কবে কী কাজে লাগবে। ভেবেছিলাম নিজে যদি কখনো বাড়ি বানাই, সেই বাড়ির কোথাও এই জানালাটা লাগিয়ে দেবো। কিন্তু এত বড়, বেখাপ্পা একটা জানালা একালেব বাড়িতে কী ভাবে ব্যবহার করা যাবে, সে বিষয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আমার এক বাস্তুকার বন্ধু বলেছিলেন, 'অসম্ভব!'

সম্ভব অসম্ভব যাই হোক, এখনো আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই। কখনো হবে কিনা, তাও জানি না। কিন্তু একটা জানালা আমার কাছে রয়ে গেছে।

একা একা একেক সময় জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। গ্রামের দিকে একটা বাড়ি করার কথা ভাবি। জানালাটার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কলকাকলি ভেসে আসে। কখনো জানালার ওপারে দেখি, ঝাড়গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে সবুজ শালবন দেখা যাচ্ছে। কখনো একটা মস্তবড় ফ্ল্যাটবাড়ির কথা ভাবি, তার ষোলতলার বাইরের ঘরে জানালাটা লাগানো, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই জন্মদুঃখী শহরটা কেমন ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত দেখায়।

ক্ষীরকাঁঠাল

বাড়ি থেকে অনেকদিন পরে চিঠি এসেছে। বাড়ি মানে অনেক দূর, আবার ঠিক ততটা দূরেও নয়। ভিন্ন দেশের এক ছোট শহর, যেখানে জন্মেছিলাম, বড় হয়েছিলাম।

যে বাড়ি একদিন লোকজনে গমগম করত সকাল থেকে লণ্ঠন-জ্বালা মধ্যরাত পর্যন্ত, সে বাড়িতে একা বাচ্চু থাকে। বাচ্চু আমার ছোট ভাই। সে কখনও কদাচিৎ কালেভদ্রে চিঠি দেয়, বিজয়া দশমীতে, পয়লা বৈশাখে। নেহাতই মামুলি চিঠি, কিন্তু তারই মধ্যে একেক সময় দু'-একটা ছোটখাট খবর থাকে, বিলুদাদু মারা গেছেন, নয়নচাচীর নাতনী মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে, একটা চটকল তৈরি হচ্ছে শহরের শেষ মাথায়।

অন্য কারো কাছে এসব খবরের কোনও দাম নেই, কিন্তু আমাকে উতলা করে তোলে।

একেকটা খবরের টুকরো স্মৃতির পুষ্করিণীতে ঢেউ তোলে, আমার ছোট বয়সের ছোট শহর দোল খায় সেই ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায়।

এবারের পয়লা বৈশাখের চিঠির নিচে ছোট একটা পুনশ্চ, 'গতকাল চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলায় কালবোশেখির ঝড়ে ক্ষীরকাঁঠাল গাছটা পড়ে গেছে।' কোথায় একটা ধাক্কা খেলাম। ক্ষীরকাঁঠাল! কতকাল পরে এই আশ্চর্য শব্দটা শেষবার ফিরে এল। অন্য সময়ের, অন্য পৃথিবীর 'ক্ষীরকাঁঠাল' নামে একটা ফলগাছ, কবে ভুলে গিয়েছিলাম।

আমাদের কাছারিঘরের বাঁদিকটাকে বলা হত সজনেতলা। কিন্তু কেন বলা হত সেটা এখন বোঝা কঠিন।

একটা বুড়ো আদ্যিকালের ডালপালা আর শিকড় ছড়ানো সজনেগাছ। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি বটে, কিন্তু পরে সেটাও একবার কালবেশেখি ঝড়ে পড়ে যায় কাছারিঘরের আটচালার ওপরে। আটচালার তাতে বেশ ক্ষতি হয়। সজনেগাছটা পড়ে যাওয়ার পরেও বেঁচে ছিল। পরের বছর শীতের শেষেও চমৎকার সাদা ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল গাছটা, কিন্তু পুরনো কাছারিঘরটা ক্রমশ গাছের চাপে হেলে পড়ছিল।

আমাদের বাড়িতে এসব নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাত না। তাছাড়া গাছ কাটার নানারকম বারণ, নিষেধ ছিল। মলমাসে, চৈত্রমাসে, ভাদ্রমাসে, সংক্রান্তিতে, অমাবস্যায় গাছ কাটা যাবে না, বংশে কেউ জন্মালে বা মারা গেলে কুঠার স্পর্শ নিষেধ। ফলে গাছের গুঁড়িতে কুড়ুল মারা প্রায় অসম্ভব ছিল।

কিন্তু ঠাকুরদার পুরনো মক্কেলরা কাছারিঘরের ঐরকম বিপজ্জনক দশা দেখে ঠাকুর্দার ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন, 'সজনেগাছটা কেটে না ফেললে কাছারিঘর চাপা পড়ে উকিলবাবু আপনি মারা পড়বেন। আমরাও আপনার সঙ্গে মারা পড়ব।'

পাঁজি দেখে, দিনক্ষণ লগ্ন মিলিয়ে সজনেগাছটা কেটে ফেলা হয়েছিল। 'বৃক্ষ-স্বস্ত্যয়ন' বলে একটা হাতে-লেখা পুঁথি ছিল, আমাদের পুকুরের ওপারে রাজারাম মোক্তারের বাড়িতে।

রাজারাম মোক্তারের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দেলদুয়ার পরগণার গজনবি সাহেবদের কুল-জ্যোতিষী। এরকম আরো অনেক বই ছিল সে বাড়িতে। বাবা একদিন গিয়ে ঠাকুরদার নাম করে এবং অনেক ধরাধরি করে রাজারাম মোক্তারের কাছ থেকে 'বৃক্ষ-স্বস্ত্যয়ন' বইটা এক বেলার জন্য ধার করে নিয়ে এলেন।

সেই হাতে-লেখা পুঁথিতে গাছ কটার ওপরে একটা অতি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ। কী রকম গাছ কখন কাটলে কতদিন নরকবাস হয়, ফলবান বৃক্ষ কেটে ফেলা মহাগুরুহত্যার পাপের চেয়ে বেশি না কম, আমগাছ ঝড়ে বেঁকে গেলে কীভাবে তার শুশ্রূষা করা উচিত—সব কথা সে বইতে লেখা ছিল।

গত শতকের মধ্যভাগের বাংলা ঘেঁষা সংস্কৃতে এইসব নির্দেশ, যা নামেই সংস্কৃত, কিন্তু যে ভালো বাংলা জানে তার কাছে বেশ সহজবোধ্য ছিল সে ভাষা।

সেই বৃক্ষ-স্বস্ত্যয়ন পুঁথিতেই ক্ষীরকাঁঠালের কথা ছিল। তবে সেখানে লেখা ছিল 'ক্ষীরপনস'।

কণ্টকময় ত্বকান্বিত ফলের বিষয়ে একটা আলাদা পরিচ্ছেদ বা কাণ্ড ছিল সেই পুঁথিতে। আসলে ব্যাপারটা হল কাঁটাওয়ালা খোসার ফল, যেমন লিচু, বেতফল, কাঁঠাল। কোনেও এক শাস্ত্রীয় কারণে ধুতরোকেও ফল বলে ধরা হয়েছিল সেই গ্রন্থের ওই পরিচ্ছেদে।

সে যা হোক, 'বৃক্ষ-স্বস্ত্যয়ন' পুঁথিতে চমৎকার পদ্যময় ভাষায় বলা ছিল ঃ শীত অবসানের অনুত্তর উদাসীন এলোমেলো বাতাসে যে সব সাদা , ফিকে সাদা, প্রায় সাদা কুসুমাঞ্জলি নীল আকাশের নিচে নিবেদিত হয়, যেমন বকফুল, বকুল, সজনে বা সন্তোষী চাঁপা, কামিনী বা গন্ধরাজ—তারা যদি মরে যায় বা পড়ে যায়, পরের বর্ষায় সর্বপ্রথমে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে, পুনর্জন্ম দিতে হবে।

এবং সেটা যদি কোনও কারণে না করা যায়, তাহলে ক্ষীরপনস রোপণ করলেই চলবে।

আবার বলি, ক্ষীরপনস মানে ক্ষীরকাঁঠাল।

কাঁঠাল দু জাতের, চালা এবং গোলা, শক্ত এবং নরম। একেকজন একেকরকম ভালোবাসে। সবই সমান মধুর।

বৃক্ষ-স্বস্ত্যয়নে পনসের কোনও প্রকারভেদ করা হয়নি। শুধু বলা ছিল ঃ যদি একান্তই ক্ষীবপনস রোপণ করা হয় শুভ্রকুসুমিত দ্রুমদল বা গুল্মদলের অভাবে, বা অন্য কারণে, তা হলে সবই ঠিক আছে, ব্যাপারটাও তেমন জটিল নয়। যে কোনও একটা কাঁঠাল-চারা লাগিয়ে প্রথম তিন বছর চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ—এই তিন মাস প্রতিদিন সকালে তার গোড়ায় একপোয়া জলের সঙ্গে এক ছটাক দুধ ঢালতে হবে আর প্রত্যেক পূর্ণিমার দিনে জলের বদলে পুরো এক পোয়া দুধ। এই বৃক্ষে যখন পনস হবে সেই পনসের রসের স্বাদ হবে ক্ষীরের মত।

আমরা ছোটবেলায় ঘন দুধে কাঁঠালগোলা মিশিয়ে মুড়ি চিঁড়ে বা খই দিয়ে খেতাম, ভাতের পাতেও 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হিসেবে কখনো খাওয়া হত।

ঘটা করে কাঁঠালচারা সেই সজনেগাছের গুঁড়ির পাশে লাগানো হল সে বছর বর্ষার শেষে। তারপর তাকে সাধারণ কাঁঠালচারা থেকে ক্ষীরপনসে উত্তবণেব জন্যে পুঁথি-নির্দেশিত মতে তিন বছর দুগ্ধসিঞ্চিত করা হল। ততদিনে গাছটার নাম হয়ে গেছে ক্ষীরকাঁঠাল। আমাদের বাড়ির লোকেরা পনস শব্দটা গ্রহণ করেনি। কাঁঠালচারার গোড়ায় দুধ ঢালা হচ্ছে, নিতান্তই মুখে মুখে গাছটার নাম ক্ষীবকাঁঠাল হয়ে গেছে। তিন বছরের মাথায় কাঁঠালগাছটা রীতিমত পল্লবিত ঘন সবুজ পাতার একটা বডসড় গাছের আকার ধারণ করল। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, তারপরেও গাছটা বাড়তে লাগল, ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল। শেষের দিকে যখন বাড়ি যেতাম, তখন সেটা মহীরুহেব আকার ধারণ করেছে। যদিও তখন তার বয়েস তিরিশ-পঁয়তিরিশ, লোকে বলছে ঃ একশো বছরের পুরনো গাছ। আমাদের ছোটবেলার সেই সজনে গাছটাকে সবাই ভুলে গেছে, যেমন আমি সদ্য ভুলে গিয়েছিলাম ক্ষীরকাঁঠাল গাছটাকে।

ক্ষীরকাঁঠাল গাছটার সম্পর্কে আরেকটা কথা আছে। ঐ গাছটায় কোনোওদিন কোনও কাঁঠাল ফলেনি। প্রত্যেক বছর মাঘ-ফাল্গুনে হাজারো মুচি, কাঁঠালের মুকুল আসত গাছটায়, তারপর ছোট ছোট কাঁঠালদানা বেরোত সেই মুচি থেকে। কিন্তু সেগুলো বড় হত না, চৈত্রের রোদে কালো হয়ে মরে যেত। ঠাকুমা বলেছিলেন, 'মধুপুরের পাহাড়ী গড়ের জাতকাঁঠালের চারা, আমাদের মাটিতে রস পেল না।'

কিন্তু কাঁঠালগাছটা এই এতদিনেও কেউ কেটে ফেলেনি। গাছ কাটার সেই সব বিধি-নিষেধ-বারণ, সেই সব কুসংস্কার নাকি বোধণে কবে টলমল হয়ে গেছে, কিন্তু সেই ক্ষীরকাঁঠাল গাছটা ছিল। যেমন থাকে গৃহদেবতা—তেমনই সে ছিল আমাদের গৃহবৃক্ষ। সেই গৃহবৃক্ষের এতদিনে পতন হল। সেই পুরনো কাছারিঘর কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সব কিছুই

তবু ক্ষীরকাঁঠাল গাছটাব কথা যে মুহূর্তে মনে পড়ল, মনে পড়ল সেই বুড়ো সজনেগাছটার কথা, যেটা পড়ে গিয়েও বেঁচে ছিল।

বাচ্চুকে লিখলাম, 'ক্ষীরকাঁঠাল গাছটা পড়ে গেছে, কিন্তু অনেক গাছ পড়ে গিয়েও বেঁচে থাকে। একটু লক্ষ্য রাখবে, কেটে ফেলার আগে আমাকে জানাবে।'

মহাকালের টাইমকিপার

আমাদের বাড়ির সামনে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা। সেই রাস্তা মাইলখানেক দূরে ডিস্ট্রিক বোর্ডের বড়রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। চলে গেছে নদীর ধার ধরে। রাস্তার পূর্বদিকে নদী, তাই ভোরবেলা এখানে এসে দাঁড়ালে সূর্যোদয় দেখা যায়।

আমাদের ছোট শহরে সেকালে প্রাতঃভ্রমণ করার লোক বেশি ছিলো না। অনেকেই অবশ্য ঘুম থেকে খুব সকাল সকাল উঠতেন, প্রায় শেষরাতে, তবে তাঁদের মধ্যে খুব কম-সংখ্যক ব্যক্তিই হাঁটতে বেরোতেন। হাঁটা ছাড়া তাঁদের অন্য কাজ ছিল।

একেকজনের একেকরকম কাজ ছিল সেই সাত-সকালে। কেউ চণ্ডীপাঠ করতেন, বিশ্বসংসার গম গম করে উঠত সেই অর্ধশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে। কাক-শালিকেরাও সমীহ করে চলতো চণ্ডীপাঠকারীকে, যে বাড়িতে চণ্ডীপাঠ হতো, সে বাড়িতে তারা খুব চেঁচামেচি করতো না। ভয়ে ভয়ে অন্য বাড়ির চালে বা গাছে বসে তারা নৈমিত্তিক প্রাতঃকোলাহল করতো।

চণ্ডীপাঠ ছাড়া ছিলো অন্য এক পুণ্যকর্ম, পুজোর ফুল তোলা। ব্যাপারটা বেশ জনপ্রিয় ছিলো, তবে অন্যের বাড়ি থেকে ফুল চুরি করাতেই ছিলো সবিশেষ আগ্রহ। অত্যন্ত প্রবীণ এবং সম্মানিত ব্যক্তিরাও এই চৌর্যবৃত্তির সামিল হতেন। রীতিমত দক্ষতা ছিলো তাঁদের। এক প্রৌঢ় ডাক্তারকে আট ফুট দেয়াল ডিঙিয়ে অন্যের বাগানে নিয়মিত ফুল চুরি করতে যেতে দেখা যেতো।

কিছু ছিলো জলে নামার, সাঁতার কাটার লোক। কেউ কেউ সকালে উঠে কাঠ কাটতেন, বাগান কোপাতেন। কেউ কেউ অতি কৌতূহলী, প্রতিবেশীর বাড়িব খিড়কির দরজার ফাঁকে চোখ দিয়ে অন্দরমহলে অবৈধ কোনো দৃশ্যের, যেমন ভোরবেলা কে কার ঘর থেকে বেরোয়— এই জাতীয় কিছু দেখার আশায় অধীর প্রতীক্ষা করতেন।

তালিকা বিস্তৃত করতে গেলে গল্পের খেই হারিয়ে যাবে। হরিচরণ গোমস্তার কাহিনীটা দেরি করা অনুচিত হবে। হরিচরণ সন্তোষ না মুক্তাগাছা কোথায় এক জমিদারের কাছারির গোমস্তা ছিলেন। প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তাঁর প্রথম কাজ ছিলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পঁচিশ পা হেঁটে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দিকে মুখ করে রাস্তার দুপাশের সমস্ত গৃহস্থবাড়ির কর্তাদের নাম ধরে একে একে গালিগালাজ, শাপ-শাপান্ত করা। বহুকাল আগে একবার তাঁর অনুপস্থিতিতে রাত্রিবেলা তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে, একটা চারচালা ঘর ভস্মীভূত হয়। কেন, কী কারণে, কিছুই জানা যায় না, কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে যখনই তিনি শহরে থাকতেন, ভোরবেলা উঠে সমস্ত প্রতিবেশীর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে তবে দিন আরম্ভ করতেন। সেসব গালাগাল খুব নিরামিষ ছিলো না, অনেক গোপন ও গুহ্য ইঙ্গিত থাকতো তার মধ্যে।

এবপব সাবাদিন কিন্তু হবিচবণ নিতান্ত গোবেচাবা, নিবীহ ও সাবাবণ মানুষ। এমন কি সকালে যাঁদেব মুণ্ডুপাত কবেছেন, তাঁদেব সঙ্গেই দেখা হলে 'কেমন আছেন?' 'খুব গবম পড়েছে' কিংবা 'বড়খোকা এখন কি কবছে' এই বকম সামাজিক সভ্য জিজ্ঞাসায তাঁদেব আপ্যাযিত কবতেন।

আমবা বলতাম হবিচবণ জ্যাঠামশায, সংক্ষেপে হবি জ্যাঠা। আমাদেব বাড়িব পেছনেব বাস্তায কযেকটা বাড়িব পবেই একটা প্রাচীনকালেব বিশাল কাঠবাদাম গাছেব কোলে ছিলো হবিজ্যাঠাব বাড়ি।

হবিজ্যাঠাব ব্রাহ্মমুহূর্তেব অকথ্য গালাগালেব কিছু অংশ আমাদেব ভাগেও ছিলো, কিন্তু কেউই প্রায কিছু মনে কবতো না এসব নিযে। চাবচালা ঘব আগুনে পুড়ে যাওযাব জন্যেই যে এবকম কবতেন হবিজ্যাঠা, তা হযতো নয। ছোটবেলা থেকেই তাঁব নাকি পাগল হওযাব সমস্ত লক্ষণ দেখা দিযেছিলো।

বিখ্যাত পাগলেব বংশ আমাদেব। অল্পবিস্তব উন্মাদ নয এবকম চবিত্র আমাদেব বাড়িতে দুর্লভ ছিলো। ফলে অন্যান্য উন্মাদেব প্রতি কৌতূহল এবং সহানুভূতিব কোনো অভাব ছিলো না আমাদেব।

অতি বাল্য বযসেই হবিজ্যাঠাব মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা গিযেছিলো তাতে অনেকেই ধবে নিযেছিলো যে সোমত্ত বযেসে তিনি একজন তুখোড় পাগল হবেন, হযতো পাগলামিতে আমাদেব শহবেব প্রবাদপ্রতিম ভগা' জগাখ্যাপাকেও ছাড়িযে যাবেন। জগাখ্যাপাকে আমি দেখিনি, আমাব জন্মানোব আগেই তিনি দেহত্যাগ কবেছিলেন। শুনেছি তিনি ছিলেন নৌকো ডুবিযে দেওযাব এক্সপার্ট। সদাসর্বদা নদীব তীবে পাযচাবি কবতেন, কোনো নৌকা খালি পেলে, এমন কি মাল্লাদেব অসতর্কতা থাকলে জগাখ্যাপা সুযোগ গ্রহণ কবতেন। মুহূর্তেব মধ্যে জলে নেমে নৌকো উলটিযে দিযে দৌড়ে পালিযে যেতেন।

বর্ষায হাজাব হাজাব নৌকো লাগতো আমাদেব নদীতে। সেই সমযেই জগাখ্যাপাব মবসুম। কত যে নৌকো তিনি ডুবিযেছিলেন, কত লোকেব কত ক্ষতি হযেছিল, তাব আব লেখাজোকা নেই।

জগাখ্যাপাব সঙ্গে হবিজ্যাঠাব তুলনা কবা সঙ্গত হলো না। হবিজ্যাঠা একটু অন্য জাতেব। ইস্কুলে পড়াব সময তিনি একটা জিনিস নিযে খুব মাথা ঘামাতেন, সবাইকে বলতেন, 'আমি যদি চীনেম্যান হযে জন্মাতাম, খুব বিপদ হতো।' কেউ যদি জিজ্ঞাসা কবতো 'কেন?' হবিজ্যাঠা নাকি বলতেন, 'আমি যে চীনে ভাষা জানি না, আমাব কত অসুবিধে হতো।'

এই বকম নানা উল্টোপাল্টা সমস্যা নিযে মাথা ঘামাতে ঘামাতে হবিজ্যাঠা আপন মনেই কী সব বিড়বিড় কবতেন, কখনো অদৃশ্য বা অনুপস্থিত কাউকে ধমকিযে উঠতেন, আবাব একা একাই ফিক ফিক কবে হাসতেন।

এসব ব্যাপাব বেশি বযেসেও হবিজ্যাঠাব মধ্যে ছিলো। তবে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, জমিদাবেব গোমস্তাগিবিব কাজে তাঁব নাকি কোনো ত্রুটি ছিলো না।

হবিজ্যাঠাব ঊষাকালেব গালিপর্ব খুব স্বল্পস্থাযী ছিলো। সূর্যোদযেব ঘন্টাখানেক আগে উঠে ঘড়ি ধবে ঠিক পনেবো মিনিট গালিগালাজ কবতেন। কালো বেশমেব ফিতে দিযে বাঁধা একটা গোল পকেটঘড়ি ধবা থাকতো তাঁব হাতে, যেভাবে সেকালেব বেফাবিবা মাঠে ফুটবল খেলাতেন।

ঐ ঘড়ি নিযেই এই স্মৃতিকাহিনী। ঘড়িব কথায ক্রমশ আসছি, তাব আগে গালিগালাজেব প্রসঙ্গ টা সেবে নিই।

আজকাল যাকে মেথডিক্যাল বলে, গালিগালাজ পর্বে তেমনই খুব মেথডিক্যাল ছিলেন হবিজ্যাঠা।

প্রথম ধরলেন পূর্বমুখী রাস্তার ডানদিকের শেষ বাড়ি। সে বাড়ির বিধবা পুত্রবধূর নৈতিক চরিত্র বিষয়ে উচ্চগ্রামে কিঞ্চিৎ মন্তব্য ক'রে, তারপর পড়লেন বাঁদিকের, শেষ বাড়ি নিয়ে। সে বাড়ির এক কুটুম আদালতে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে ধরা পড়ে জরিমানা দিয়েছিলো। সে বিষয়ে দ্রুত কিছু মন্তব্য করে ক্রমশ এ-পাশ ও-পাশের বাড়ি ধরে ধরে গালাগাল দিয়ে চললেন। তারপর একই প্রক্রিয়ায় পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তরমুখী রাস্তার সমস্ত বাড়ির উদ্দেশে চিৎকার চেঁচামেচি শেষ করে ঘড়ি দেখে হরিজ্যাঠা দ্রুত মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা ধরে নদীর ধারের ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তার দিকে রওনা দিতেন। তার আগে বাড়ি থেকে একটা হুইস্‌ল আর একটা নোটবই নিয়ে যেতেন। ডান হাতে সেই নোটবই আর বাঁ হাতে ঘড়িটা শক্ত করে ধরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রীতিমত হন হন করে হেঁটে যেতেন হরিজ্যাঠা। পকেটে থাকতো হুইস্‌ল। চেনাশোনা লোক পথে পড়লে তারা হয়তো একটু রঙ্গ করার জন্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতো, 'কি গোমস্তাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন এত সকালে?' হরিজ্যাঠা কোনো উত্তর দিতেন না, আরো জোরে জোরে লম্বা লম্বা কদম ফেলে প্রশ্নকারীকে এড়িয়ে এগিয়ে যেতেন।

আসলে এই প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না। কারণ শহরসুদ্ধ সকলেই জানতো গোমস্তাবাবু কোথায় যাচ্ছেন, কি জন্যে যাচ্ছেন।

মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা যেখানে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় গিয়ে পয়েছে, সেখানে শহরের প্রত্যন্ত সীমানায় খারাপ পল্লী। একটা দিশি মদ আর তাড়ির দোকানের মধ্য দিয়ে একটা কাঁচা গলি নদীর ধার ঘেঁষে চলে গিয়েছে। সেই গলির শেষপ্রান্তে ঠিক নদীর ওপরে একটা উঁচু ঢিবি, আগে জায়গাটা স্টিমারঘাটা ছিলো, এখন পরিত্যক্ত, নদীতে চড়া পড়ে যাওয়ায় স্টিমার আর এতদূর আসতে পারে না, ঘাট অনেক সামনে চলে গেছে।

এই কাঁচাগলির মধ্যেই শহরের পতিতাপল্লী। হরিজ্যাঠা এই গলির মধ্য দিয়ে তড়িৎগতিতে হেঁটে নদীর গা-ঘেঁষা উঁচু ঢিবিটার ওপর গিয়ে উঠতেন।

ঢিবিটা অনেকটা উঁচুতে হওয়ায় তার ওপর থেকে নষ্ট রমণীদের ঘরদোর ইত্যাদি দেখা যেতো। যাঁরা ভাবেন এজাতীয়া রমণীরা নির্লজ্জ বা বেহায়া হয়, তাদের কোনও আব্রু নেই, তাঁরা শুনলে অবাক হবেন, ওই উঁচু ঢিবির উপরে উঠে তাদের প্রাইভেসি নষ্ট করার জন্যে এবং প্রাতঃকৃত্যে বাধা সৃষ্টির জন্যে সেই সকালবেলায় তারা হরিজ্যাঠাকে কীরকম ভাষায় গালাগালি করত।

একটু আগে হরিজ্যাঠা তাঁর প্রতিবেশীদের সম্পর্কে যেসব গালিগালাজ করে এসেছেন, এই রূপোপজীবিনীদের মন্তব্যাদি তার থেকে একশো গুণ চোস্ত এবং জটিল। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করে এবং নানারকম জীবজন্তুর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে তারা হরিজ্যাঠাকে শাপশাপান্ত করতো।

হরিজ্যাঠার মনে অবশ্য কোনো কুচিন্তা ছিলো না। তিনি নদীর চড়ায় যেতেন নিজের কাজে। নিতান্ত অবৈতনিক এবং পার্টটাইম কাজ সেটা, কিন্তু কাজটা জরুরি।

কিন্তু তাঁর এই জরুরি কাজটা শুধু ঐ রমণীদের নয়, তাদের খদ্দেরদেরও যথেষ্ট বেকায়দায় ফেলতো। শহরের অনেক চেনাজানা লোক—যাঁরা চরিত্রদোষে ঐ খারাপ পাড়ায় রাত্রিযাপন করতে আসতেন, তাঁরা ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কায় হরিচরণ গোমস্তা যতক্ষণ পর্যন্ত ঢিবির ওপর থেকে না নেমে আসতেন, ততক্ষণ পল্লীর মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতেন।

হরিজ্যাঠা নেমে আসতেন সূর্যোদয়ের এক মিনিটের মধ্যে। কিন্তু ততক্ষণ রাস্তাঘাটে লোকজন বেরিয়ে গেছে, রোদ উঠে গেছে। আমাদের ওখানে এই সব খারাপ পাড়াকে বলতো নটীপাড়া, তা

সেই নটীপাড়া থেকে ভদ্রজনের বেরোনোর প্রকৃষ্ট সময় নয় সেটা। কিন্তু না বেরিয়েও উপায় নেই। অনেকে ধুতির খুঁটে মাথা ঢেকে হুস্ করে বেরিয়ে পড়তেন, তারপরে একেবারে বড় রাস্তায় উঠে অনেকটা গিয়ে ধুতির ঘোমটা খুলতেন।

অবশ্য হরিজ্যাঠা এসব মোটেই খেয়াল করতেন না। তিনি যে-কাজে যেতেন, সেটা এই মরজগতের কোনো লোভলালসা, কামনাবাসনার বস্তু ছিলো না। তিনি ছিলেন মহাকালের স্বনিযুক্ত টাইমকিপার।

প্রত্যেক দিন সকালবেলা তিনি নিষিদ্ধপল্লীর প্রান্তে ঐ নদীর চড়ায় ঢিবির ওপরে উঠে সূর্যোদয় ঠিক সময়ে হচ্ছে কিনা সেটা মিলিয়ে দেখতেন। বাংলা বছরের প্রথমে তিনি জমিদারি সেরেস্তা আদালত কাছারি এবং সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ি থেকে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, গুপ্তপ্রেস, পি এম বাগচি ইত্যাদি যত রকম পঞ্জিকা পাওয়া যেত সেগুলি দেখে—এমন কি স্থানীয় মসজিদ থেকে মোসলেম পঞ্জিকা নিয়ে সেটাও মিলিয়ে দেখে সারা বছরের সূর্যোদয়ের সময়-তালিকা নোটবইতে তৈরি করতেন। এবং তারপর ঘন কুয়াশা ও মেঘে ঢাকা দিন বাদ দিয়ে প্রত্যেক সকালে নিয়মিত নিষ্ঠা সহকারে সূর্যোদয়ের টাইম মেলাতেন নোটবই ও ঘড়ির সঙ্গে।

ঘড়িটার কথা একটু বিশদভাবে বলি।

হরিচরণ জ্যাঠার নিজের এক জ্যাঠামশায় ছিলো, কালীচরণ না কি করালীচরণ চক্রবর্তী নাম ছিলো তাঁর। তিনি ছিলেন আমাদের শহরের গৌরব। তাঁকে নিয়ে বিরাট অহংকার ছিলো আমাদের।

কালীচরণ চক্রবর্তী ছিলেন ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি লাইনের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গার্ড। এমন সম্মানজনক কাজ বহুকাল শুধু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবদেরই প্রাপ্য ছিলো।

করালীচরণের দাদা, মানে হরিজ্যাঠার অন্য এক জ্যাঠা, ভবানীচরণ পাবনা শহরে কবিরাজি ব্যবসা করতেন। তাঁর খ্যাতি ও পসার বিস্তৃত ছিলো ঈশ্বরদি রাজশাহী পর্যন্ত। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলের এক বড়সাহেব উদুরি রোগে মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। অবশেষে শেষ চেষ্টা হিসেবে ঈশ্বরদির স্টেশনমাস্টার কবিরাজ ভবানীচরণকে নিয়ে যান বড়সাহেবকে দেখাতে। স্রেফ তিনমাস পদ্মাবক্ষে নৌকোয় বাস এবং সেই সঙ্গে প্রত্যহ কিছু পরিমাণ লতাপাতা, শিকড়বাকড়ের রস যথাবিহিত অনুপান সহকারে সেবন—ভবানীচরণের এই চিকিৎসায় বড়সাহেব কিন্তু ভালো হয়ে গেলেন।

পরবর্তীকালে রেলকোম্পানির এবং সেই সূত্রে অন্যান্য মান্যগণ্য সাহেবদের চিকিৎসা করে ভবানীচরণ প্রভূত অর্থোপায় এবং উন্নতি করেন। তাঁর সুপারিশে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত করালীচরণ চক্রবর্তী রেল কোম্পানীতে কাজ পান এবং কালক্রমে যাত্রীগাড়ির গার্ড পদে উন্নীত হন।

এসব পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কথা। আমরা ছোটবেলায় করালীচরণকে যখন দেখেছি তখন তিনি খুব বৃদ্ধ। রিটায়ার করেছেন বেশ অনেকদিন হলো। বড় হয়ে জেনেছি, তাঁর জীবনে একটা খুব দুঃখের দিক ছিলো, তাঁর স্ত্রী তাঁরই এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সহকর্মীর সঙ্গে চলে গিয়েছিলো। সে নিয়ে যথাসময়ে আমাদের ছোট শহর যথেষ্ট উত্তাল হয়ে উঠেছিল নানারকম মুখরোচক এবং কাল্পনিক আলোচনায়। কিন্তু এ ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পাটের

সাহেবেরা আমাদের জেলায় প্রবেশ করেছিলো এবং তাদের সঙ্গে গৃহবধূদের পলায়ন খুব অনিয়মিত ছিলো না। ফলে ব্যাপারটা কিছুকাল পরে—এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়—চাপা পড়ে যায়। শুধু পুরনো লোকেরা কখনো ফিসফাস করে আলোচনা করতো।

রেল কোম্পানির গার্ডসাহেব হিসেবে চাকুরির অঙ্গস্বরূপ করালীচরণ কোম্পানী থেকে একটা গোল পকেটঘড়ি পেয়েছিলেন। যদিও করালীচরণ সেটা ব্যবহার করতেন, সেটা রেল কোম্পানির সম্পত্তি ছিলো। ছুটিছাটায় এবং যখন ডিউটিতে থাকতেন না, তখন করালীচরণ ঘড়িটাকে ঈশ্বরদির রেল অফিসে জমা রাখতেন।

ফলে করালীচরণের ধারণা হয়েছিলো, রিটায়ার করার সময় পকেটঘড়িটা কোম্পানিকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু তা তো হলোই না, উপরন্তু কোম্পানি রিটায়ারমেন্টের সময় তাঁকে আর একটা ঘড়ি উপহার দিলো। সেটা পকেটঘড়ি নয়, সেটা হাতঘড়ি। হাতঘড়ির যুগ তখন চালু হয়েছে, ছোকরা যুবকেরা এমন কি আধুনিকা মহিলারা হাতঘড়ি ব্যবহার শুরু করেছেন।

অবশ্য রিটায়ারমেন্টের পর নিজ থেকেই করালীচরণ পুরনো পকেটঘড়িটা আর রেলের হুইস্‌লটা ফেরত দিতে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরদির রেলওয়ে মালখানার বড়বাবু নরসিংহবাবু বললেন, 'এ সব জিনিস জমা রাখতে পারি, কিন্তু ফেরত নিতে পারি না। কবে কোন স্টক-বুক থেকে কোন্‌টা ইস্যু হয়েছিল, সে সব স্টক-বুক এখানেই আছে না হেডঅফিসে চলে গেছে, বলা অসম্ভব। আজ এক সপ্তাহ হলো আমার চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না। ওসব জিনিস আমি ফেরত নিয়ে জমা করবো কোথায়?'

দ্বিতীয় ঘড়িটা, যেটা রিটায়ারমেন্টের সময় কোম্পানি উপহার দিলো, সেটা ছিল ওয়েস্ট এন্ডের রিস্টওয়াজ। রোলগোল্ডের গোল কেস, সঙ্গে চামড়ার কালো ব্যাণ্ড, একেবারে আসল কাফ লেদার। যেমন স্মার্ট, তেমনই শৌখিন।

কিন্তু পুরনো পকেটঘড়িটা ছিল প্রকৃত বনেদি এবং অভিজাত চেহাবা। শক্ত, গোল, রোমান হরফের ডায়াল, নিথর, উজ্জ্বল, বডি-ক্রোমিয়ামের সুইজারল্যাণ্ডের ওমেগা কোম্পানির ঘড়ি। তার চাবিটা ছিল গোল খাঁজকাটা, ছোট একটা আমলকির মত। ঘড়িটা জবরদস্ত ও ভারী, ওজন অন্তত এক ছটাক থেকে দু' ছটাকের মধ্যে।

এই প্রথম ঘড়িটা, যার সঙ্গে তাঁর যৌবন ও প্রৌঢ় বয়েসের কর্মজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে ঘড়িটা হাতে ধরে সময় মিলিয়ে হুইস্‌ল দিয়ে ফ্ল্যাগ উড়িয়ে তিনি ট্রেন চালাতেন, সেই ঘড়িটা এবং সঙ্গে হুইসিলটা বৃদ্ধ বয়েসে তিনি তার প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র হরিচরণ, মানে আমাদের পাড়া সম্পর্কের হরিজ্যাঠাকে দান করেন।

আমরা ছোটবেলায় ঘড়িটা হরিজ্যাঠার কাছে দেখেছি। তিনি আমাকে বিশেষ পছন্দ করতেন, দু'-একবার ঘড়িটাকে হাতে নিতেও দিয়েছেন। তবে সে সময়ে ঘড়ির কালো রেশমের ফিতেটা নিজের হাতে ধরে রাখতেন আর গর্বভরে বলতেন, 'খাঁটি সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি, আজকালকার খেলো জিনিস নয়। হাতে পরা যাবে না, হাতে ধরে রাখতে হবে। আগে রেলগাড়ি চালাতো, কোম্পানির গাড়ি ঈশ্বরদি থেকে সিরাজগঞ্জ, রাজামহারাজা সাহেবসুবো এই ঘড়ির টাইম দেখে চলতো। আর এখন, এখন সূর্য চলে এর টাইম দেখে।'

হরিজ্যাঠা সূর্য চালনার ব্যাপারটায় মোটামুটি রেলগাড়ির পদ্ধতিই অনুসরণ করতেন। নির্দিষ্ট মুহূর্তে ঢিবির উপরে দাঁড়িয়ে বাঁহাতের তালুতে ঘড়ি, ডানহাতে নোট-খাতা—যাতে সঠিক সময়

লেখা আছে, সেটা নির্ভুলভাবে মিলিয়ে নদীর ওপারে দূরবর্তী গ্রামের দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে জোরে হুইস্‌ল বাজিয়ে দিতেন, টুকটাক করে সূর্য উঠে আসত আকাশে। বছরে কয়েক মাস নদীর চড়া কাশফুলে ছাওয়া থাকত, সেই কাশফুলের ঝোপের মধ্যে হলুদ সূর্য—আমি একবার হরিজ্যাঠার সঙ্গে সূর্য ওঠা দেখতে গিয়েছিলাম, সাদা কাশক্ষেতের মধ্যে ডিমের কুসুমবরণ গাঢ় পীত প্রভাতসূর্য, জীবনে অত বড় এগ-পোচ আর দেখিনি।

একেকদিন সূর্য খুব গোলমাল করতো, হয়তো দু' মিনিট লেট হয়ে গেল। হরিজ্যাঠার বাঁশি বাজার পরে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা এক-দুই করে একশো কুড়ি ঘর ঘুরলো, তারপরে সূর্য উঠলো। সে এক মহা গোলমেলে অবস্থা।

তার চেয়েও গোলমেলে ব্যাপার হত, যদি কখনও হরিজ্যাঠা বাঁশি বাজানোর আগেই সূর্য উঠে যেত।

কী সাংঘাতিক অনাচার, বিশ্বসংসার এভাবে আর কতদিন চলবে—দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে যেতেন হরিজ্যাঠা। সারাদিন গজগজ করতেন। জমিদারি সেরেস্তার কাছারিঘরে সেদিন আর গোমস্তাবাবুর কোনো কাজ হত না, চেনা-অচেনা, প্রজা-কর্মচারী এমন কি রাস্তার লোকদের ধরে মহাকালের এই বিরাট অনিয়মের কথা বলতেন।

এমন কি আমাদের মতো অতি কনিষ্ঠ অভাজনদের সঙ্গেও এ নিয়ে আলোচনা করতেন, বলতেন, 'ভাবতে পারিস, এক মিনিট আধ মিনিট নয়, আজ সূর্য উঠতে পাকা দেড় মিনিট লেট করেছে।'

কেউ যদি কখনো মুখ ফসকিয়ে বলে ফেলতো, 'পঞ্জিকার হিসেবে ভুল থাকতে পারে', কিংবা আরো সাহস করে হয়ত বলে বসল, 'হরিদা, আপনার ঘড়িটা তো অনেককালের হয়ে গেল!' তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেত। পঞ্জিকা ভুল, তা হলে তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর টলে যাবে! দুর্গাপূজা হবে ভাদ্র মাসে, চন্দ্রগ্রহণের দিন সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ হবে অমাবস্যায়।

আর কোম্পানির ঘড়ি, যে ঘড়ি বেলগাড়ি চালায়—সামান্য সূর্যের টাইম রাখতে পারবে না সেই ঘড়ি! রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দিতেন জ্যাঠামশায়।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। চার দশকের বেশি হয়ে গেল।

দেশ স্বাধীন হলো। পার্টিশন হলো। পার্টিশনের বেড়ার অনেক ওপারে পড়লো আমাদের স্বপ্নের শহর। লোকজন ঘরছাড়া, ছন্নছাড়া হয়ে গেল।

আমার মা বাবা দেশে রয়ে গেলেন। হরিজ্যাঠার এপারে আসা হয়নি। কোনো দুঃসংবাদে, অসুখ বা মৃত্যুর খবরে কচিৎ কদাচিৎ বাড়ি যেতাম। হরিজ্যাঠার সঙ্গে দেখা হত। শহরের বাকি লোকদের অধিকাংশকে চিনি না, যে কয়দিন থাকতাম, চুপচাপ বাড়ির বাইরের বারান্দায় একটা তক্তাপোষে বসে কাটিয়ে দিতাম।

হরিজ্যাঠা আসতেন কোনো কোনো সন্ধ্যাবেলা, হাতে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে। লণ্ঠন সিঁড়ির একপাশে রেখে, একটু কমিয়ে দিয়ে সিঁড়ির ওপরে প্রায় নিঃশব্দে বসে থাকতেন। কথাবার্তা বিশেষ বলতেন না। সিঁড়ির পাশে একটা পুরনো গন্ধরাজ ফুলের গাছ, সে গাছে আস্তে আস্তে দু'-একটা ফুল ফুটত। লণ্ঠনের টিমটিম আলোয় হরিজ্যাঠার বারান্দায় ঐ রকম বসে থাকা দেখে অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ত। আজ হরিজ্যাঠার গল্প লিখতে গিয়ে আবার মনে পড়ছে।

সেই সাতচল্লিশ সাল। বর্ষার সন্ধ্যাবেলা ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দার পাশে ঢাকা সিঁড়ির ওপরে লণ্ঠন কমিয়ে হরিজ্যাঠা চুপচাপ বসে রয়েছেন। সেইদিনই দেশ স্বাধীন হল। সকালবেলা জমিদারের কাছারিবাড়িতে হরিজ্যাঠাকে পাকিস্তানি সাদা-সবুজ, চাঁদ-তারা নিশান ওড়াতে হয়েছে।

সারা সন্ধ্যা হরিজ্যাঠা সিঁড়ির ওপরে মৌন হয়ে বসে রইলেন, চারদিকে গম্ভীর, চাপা ভাব। অনেক দূরে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় কারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'আল্লা হো আকবর' করছে। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বাবা চোখ বুঁজে শুয়ে।

বৃষ্টি থামতেই হরিজ্যাঠা লণ্ঠন হাতে উঠলেন, বললেন, 'যাই'। তারপর একটু ঘুরে অন্ধকারে বাবার দিকে মুখ করে বললেন, 'জটু, তা হলে আর 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' গাওয়া চলবে না?' প্রশ্নটা করে উত্তরের অপেক্ষা না করে হেঁটে চলে গেলেন নিজের বাড়ির দিকে।

শুধু 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' বা 'বন্দেমাতরম' নয়, ধীরে ধীরে অনেক কিছুই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হরিজ্যাঠাও আর ভোরবেলায় মোড়ের মাথায় গিয়ে প্রতিবেশীদের উদ্দেশে চিৎকার, গালাগাল করতেন না। আর করবেনই বা কাকে? তাঁর চেনাশোনা সবাই তো দেশছাড়া। নতুন যারা এসেছে, তাদের নাম পর্যন্ত তিনি জানেন না।

ঘড়ি নিয়ে নদীর ধারে সূর্যোদয়ের সময় মেলানো অভ্যাসবশত তবু কিছুদিন ছিল, কিন্তু দুটো কারণে সেটা আর করতে পারেননি। প্রথমত নিষিদ্ধ পল্লীর প্রান্তে যেখানে ঢিবির ওপরে উঠে সূর্যোদয় পর্যবেক্ষণ করতেন, সেখানে পুরো এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছিল আনসার বাহিনীর ক্যাম্প।

অতঃপর আরো মাইলখানেক এগিয়ে নদীর অন্য এক চড়ায় উঠে আরো কিছুদিন মহাকালের টাইম কিপিং করার চেষ্টা করেছিলেন হরিজ্যাঠা। কিন্তু আনসার বাহিনীর লোকেরা তাঁর এই অস্বাভাবিক কাজে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তাঁকে একদিন ধরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে দু'-চারটে গলাধাক্কা দেয় ও তাঁকে হিন্দুস্থানের 'স্পাই' বলে।

শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা হরিজ্যাঠাকে আনসার ক্যাম্প থেকে ছাড়িয়ে আনে। এ ঘটনার পর তিনি অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ও নিস্তেজ হয়ে যান। কিন্তু দেশেই থেকে যান, হয়ত এই বাংলায় তাঁর আসার কোনো জায়গা ছিল না বলে।

ঘড়িটা কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছিলেন। শেষের দিকে ঘড়িটা আর চলত না, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ মহার্ঘ্য বস্তু সাহস করে কোনো দোকানে সারাতে দিতে পারেন নি। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন, মাঝেমধ্যে ঘড়ির ডায়ালের সঙ্গে বিড় বিড় করে কথা বলতেন।

বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় কোনো রকমে প্রাণ হাতে করে হরিজ্যাঠা দেশে থেকে গিয়েছিলেন! একদিন অনেক রাতে রাজাকাররা তাঁর বাড়িতে হামলা ও লুঠ করতে ঢোকে। হরিজ্যাঠা কোনোভাবে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। পালানোর সময় তাঁদের গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলা এবং ইস্টার্ন বেঙ্গল রেল কোম্পানির গোল ঘড়িটা বাড়ির পিছনের পানাপুকুরে ফেলে দিয়ে যান। আশা ছিল যে, যদি কখনো ফিরে আসেন, এই অমূল্য বস্তু দুটো পুকুর থেকে উদ্ধার করবেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্যদের মতো হরিজ্যাঠাও বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন, কিছুদিন থেকেও ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ধকলে, প্রাণভয়ে দৌড়োদৌড়িতে এবং শেষের তিন মাস উদ্বাস্তু

শিবিরে বাস করে তাঁর আয়ুর সীমা কমে গিয়েছিল।

হরিজ্যাঠার মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমি দেশে গিয়েছিলাম, তখন আমার মা-র শরীরও খুব খারাপ। হরিজ্যাঠার সঙ্গে দেখা হল, তিনি মৃত্যুশয্যায়। হরিজ্যাঠা শালগ্রাম শিলা আর ঘড়ির কথা বললেন, কোনো রকমে কষ্ট করে বিছানায় উঠে বসে জানালা দিয়ে আমাকে পানাপুকুরটা দেখালেন, উত্তর-পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে বললেন, 'ঐখানে কলমির ঝোপের মধ্যে জিনিস দুটো ফেলেছিলাম।'

সেটা ভরা শ্রাবণ মাস, পানাপুকুর তখন জলে টইটম্বুর। হরিজ্যাঠা বললেন, 'যদি শীতকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকি, জল শুকোলে মাটি খুঁড়ে ও দুটো জিনিসই আমি বার করব।'

আমি বললাম, 'শালগ্রাম শিলার কথা আলাদা। কিন্তু এতদিন জলের নিচে থেকে ও ঘড়ির আর কী আছে!'

উত্তেজিত হয়ে পড়লেন হরিচরণ জ্যাঠা, বললেন, 'কোম্পানির ঘড়ি। সুইজারল্যান্ডে তৈরি। ওয়াটারপ্রুফ। দু'-চার-দশ বছর জলের নিচে থাকলে ও ঘড়ির কী হবে?'

ঘড়িটা যে শেষেব কযেক বছর বন্ধ ছিল, চলছিল না, সে কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে বললেন, 'দেখবি পানাপুকুব থেকে তুলে আনাব পর সেই আগের মতই টিকটিক টিকটিক করছে।'

আমি আর কিছু না বলে চলে এলাম। সে বছরই পুজোর আগে হরিজ্যাঠা মাবা গেলেন। বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন। দু'-চারজন স্বজাতি পাড়ার লোক শেষ-ক্রিয়াদি করে। বাবার চিঠিতে হরিজ্যাঠাব মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম।

গত বছরেব আগেব বছর বাবাও মাবা গেলেন। সেই শেষবাব দেশে গিয়েছিলাম। শুনলাম, হবিজ্যাঠাব বাড়ি কারা যেন বেদখল করেছে। সেটা আশ্চর্য নয়, বেওয়ারিশ জমি বেদখল হবেই।

কৌতূহলবশত একবার হরিজ্যাঠার বাড়ির সামনে দিয়ে গেলাম। বাড়ির সামনের বিশাল বাদামগাছটা কেটে ফেলা হয়েছে, পুরনো ঘবদোর ভেঙে, পানাপুকুর বুজিয়ে বিশাল দোতলা বাড়ি উঠেছে, বাড়িব গেটে লেখা আছে 'শান্তিমঞ্জিল'।

শান্তিমঞ্জিলের পেছনদিকে আলগোছে তাকালাম। ঐখানে দোতলার ভিতের নিচে চাপা পড়েছে পানাপুকুর। আর সেই পানাপুকুবের মাটির নিচে কোথাও বয়েছে—হয়ত এখনও মাটির সঙ্গে মিশে যায়নি—সূর্যের টাইম মেলানোর সেই রেল কোম্পানির ঘাড়ি।

হঠাৎ মনে হলো, ঘড়িটার টিকটিক যেন শুনতে পাচ্ছি। মাটির নিচ থেকে, বাড়ির ভিতের ভেতর থেকে টিকটিক টিকটিক শব্দ উঠে আসছে। হরিজ্যাঠার গলাও যেন শুনতে পাচ্ছি, 'এক মিনিট নয, আধ মিনিট নয়, পাকা দেড় মিনিট লেট! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবারে রসাতলে যাবে!

দুই মাতালের গল্প

আপনাদের সকলের সঙ্গে বোধ হয় এঁদের দুজনের পরিচয় নেই। গল্প লেখার আগে এঁদের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই, তাতে এই ঝাঁঝালো তরল কাহিনী পান করা সহজ হবে।

প্রথম জন, যিনি এক হাতে গালে দিয়ে আরেক হাত গেলাস ধরে টেবিলের ডানপাশে বসে আছেন, যাঁর চোখে মোটা কাঁচের চশমা, একমাথা এলোমেলো সাদা-কালো চুল, গালে জুলফির নিচে একটা লাল তিল—যিনি এইমাত্র এক চুমুকে পুরো গেলাসটা সাফ করে টেবিলে আধুলি ঠুকে বেয়ারাকে ডাকছেন তিনি হলেন জয়দেব পাল।

আর জয়দেববাবুর মুখোমুখি উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছেন মহিমাময়, এঁর পদবীর প্রয়োজন নেই, মহিমাময়ই যথেষ্ট, এ রকম নামের খুব বেশি লোক নেই। মহিমাময়ের হাতেও গেলাস। মহিমাময় জয়দেবের চেয়ে মোটা এবং তাঁর মাথায় ছোটখাট ঝকমকে একটা টাক। মহিমাময়ের গলার স্বর খুব ভারি এবং সবসময়েই তিনি উচ্চগ্রামে কথা বলেন।

জয়দেব এবং মহিমাময় দুজনেই বাল্যবন্ধু। নেবুতলা করোনেশন বয়েজ হাই ইংলিশ স্কুলে দুজনে ক্লাস থ্রি থেকে একই ক্লাসে পড়েছেন, দুজনেই প্রথম বছরের স্কুল ফাইনাল, তার মানে এই মুহূর্তে দুজনেই কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব পঞ্চাশ। এই ব্যাপারটা, মানে বয়েসের ব্যাপারটা বেশ জটিল। এখন জয়দেবের বয়েস বাহান্ন, মহিমাময়ের তিপ্পান্ন। জয়দেব বলেন, 'যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন।' আর মহিমাময় বলেন, 'জানিস, ব্যাপারটা এতো সোজা নয়। যখন তোর বয়েস ছিলো এক—আমার বয়েস ছিলো দুই, এক সময়ে আমার বয়েস তোর বয়সের ডবল ছিলো, সে কথাটা ভুলবি না। বয়েসের ব্যাপারটা মহিমাময় আর জয়দেববাবুর নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু পরিচয় প্রদানে সামান্য ফাঁক রয়ে গেছে, সেটুকু বলি।

মহিমাময় বিবাদী বাগে একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মাঝাবি মাপের চাকরি করেন। বিবাহিত এবং ইত্যাদি। জয়দেব আগে ছবি আঁকতেন, এখন সিনেমার লাইনে টুকটাক ছোটবড় কাজ করেন, বিবাহিত এবং ইত্যাদি। এই আমার এক দোষ। সুযোগ পেলেই বেশি বলে ফেলি।

পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে অযথা দেরি করে ফেললাম।

এদিকে জয়দেববাবুর আধুলির বাজনা শুনেও বেয়ারা এখন পর্যন্ত এ টেবিলে আসেনি। মহিমাময়ের পানীয়ও ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে আর পানীয় চান না, তিনি চান না জয়দেবও আর পানীয় নিক।

আজকেই ঘটনাটা ঘটেছে।

জয়দেবের শরীরটা আজ কিছুদিন হলো ভালো যাচ্ছে না। সারাদিন শরীর ম্যাজম্যাজ করে, বিকেলের দিকে গা গুলোয়, সকালে মাথা ধরে থাকে, পেটের বাঁ পাশে নিচের দিকে অনেক সময়েই একটা চাপা ব্যথা।

জয়দেব গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখাতে। ডাক্তার অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবশেষে মুখ গম্ভীর করে বলেছেন, 'আপনাকে মদ খাওয়া ছাড়তে হবে।'

সেই কথা শুনে মহিমাময় চেষ্টা করছিলেন জয়দেবকে বোঝাতে যাতে তিনি পান করা ছেড়ে দেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। জয়দেব উদাসীন কণ্ঠে বললেন, 'বাজে বকিস না মহিমা, খবর নিয়েছিস, কোনোদিন ভেবে দেখেছিস পৃথিবীতে যত বুড়ো মাতাল আছে তার চেয়ে অনেক কম আছে বুড়ো ডাক্তার। মদের ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ আমি নেবো না।'

মদ খাওয়া এত সহজে জয়দেব ছেড়ে দেবেন, সামান্য ডাক্তারের ভয়ে, এ আশা অবশ্য মহিমাময় করেননি। তিনি তাঁর প্রাণের বন্ধুকে হাড়ে হাড়ে চেনেন।

জয়দেবের আধুলির বাজনা ইতিমধ্যে অতি উচ্চগ্রামে উঠেছে। এখন তাঁর দু হাতে দুটো

আধুলি, তিনি দ্রুতলয়ে টেবিলের কাঁচের উপরে বাজাচ্ছেন। বোধহয় গ্লাসটা ভেঙে যেতে পারে এই আশঙ্কায় অবশেষে বেয়ারা এলো। তার দুহাতে দুটো পূর্ণ গেলাস, একটা অবশ্যই জয়দেবের অন্যটি মহিমাময়ের।

বিনা আপত্তিতে মহিমাময় আরেক গেলাস পানীয় নিলেন, একটু আগের মানসিক বাধা টিকলো না।

তারপরে আরো এক গেলাস, আরো এক গেলাস; তরল বুদ্বুদময় পানীয়ের দ্রুত স্রোতে ভেসে চললো রাতের প্রহর।

রাত এখন কটা?

প্রায় প্রতিদিনই এ রকম হয়। প্রথমে জয়দেব বেশি পান করে ফেলেন। তখন মহিমাময় একটু ভেবেচিন্তে, একটু টেনে খান। তারপর কিছুটা ওজর-আপত্তি ইত্যাদির পর মহিমাময় ধাতস্থ হন। তখন তিনি দ্রুতগতিতে পান করতে থাকেন, আস্তে আস্তে গেলাসের দৌড়ে তিনি জয়দেবকে ধরে ফেলেন। তারপর দুজনে সমান-সমান, কানায়-কানায়। এই সমতাটা আসে রাত বারোটা নাগাদ। এর আধ ঘণ্টা আগে পানশালার সামনের ঝাঁপ পড়ে গেছে। এদিক-ওদিক দু-একটি টেবিলে জয়দেব মহিমাময়ের মত দুযেকজন ইতস্তত বসে আছেন। অধিকাংশ আলো নেবানো। অবশেষে কিঞ্চিৎ টলতে টলতে দুই ছায়ামূর্তি জয়দেব ও মহিমাময় পিছনের দরজা দিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে উলটো ঘুরে পানশালা থেকে রাস্তায় এসে পড়েন।

রাস্তার খোলা হাওয়ায় দুজনেরই মন বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। 'টা-টা বাই-বাই, গুডনাইট, কাল দেখা হবে।' ইত্যাদি বাক্য বিনিময় করে সাধারণত দুজনে যে যাঁর বাড়ির দিকে রওনা হন।

আজ কিন্তু একটু গোলমাল হলো।

কিছুক্ষণ ধরেই জয়দেব বেশ চুপচাপ ছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে এসে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, একটা ক্ষীণ কাতরোক্তি মুখ দিয়ে বেরোলো।

এই রকম অবস্থায় খুব বিহ্বল হয়ে পড়েন মহিমাময়। চিরকালই তাঁর স্বভাব হলো সমস্যা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। যদি কখনো সমস্যা ঘাড়ে এসে পড়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েন। কোনো চেষ্টা করেন না উদ্ধার পাওয়ার।

আজো তাই করতে যাচ্ছিলেন। মহিমাময় জয়দেবের পাশেই পেটে হাত দিয়ে বসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে কাজে বাধা পড়লো। পেছন থেকে কে একজন জামার কলার ধরে মহিমাময়কে আটকালেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে মহিমাময় দেখেন পুরনো বন্ধু নন্দ। নন্দবাবু জয়দেব আর মহিমাময় দুজনেরই মোটামুটি বন্ধু। একই বারে, একই টেবিলে তাঁরা একত্রে বহুবার মদ্যপান করেছেন। কাছাকাছি অন্য কোনো একটা পানশালায় নন্দবাবু বোধহয় ছিলেন। তিনিও এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। এভাবে এঁদের দুজনকে এ অবস্থায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন এবং মহিমাময়কেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। জয়দেব তখনো পেটে হাত দিয়ে রাস্তায় বসে, সেদিকে তাকিয়ে নন্দবাবু বললেন, 'মাঝেমধ্যেই তো এরকম হচ্ছে দেখছি। ডাক্তার দেখানো হয়েছে?'

মহিমাময় বললেন, 'ডাক্তার তো দেখিয়েছে বলছে। কিন্তু তার কথা তো জয়দেব শুনছে না।'

নন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলেছে ডাক্তার?'

মহিমাময় বললেন, 'ঐ যা বলে—মদ খাওয়া ছেড়ে দিতে বলেছে।'

নন্দবাবু শুনে বললেন, 'মদ খাওয়া ছাড়তে বললেই তো ছাড়া যায় না। মদ খাওয়া ছাড়াতে হয়। এ ব্যাপারে আলাদা ডাক্তার আছে।' মদ খাওয়া ছাড়ানোর ডাক্তারের ব্যাপারটা ঠিক মহিমাময় বুঝতে পারলেন না। কিন্তু ততক্ষণে নন্দবাবু একটা ট্যাক্সি ধরে ফেলেছেন। তিনি মহিমায়কে ঠেলে দিয়ে, জয়দেবকে আলগোছে দাঁড় করিয়ে সামনে এগিয়ে ট্যাক্সির মধ্যে ঠেলে দিলেন।

তিনজনে ওঠার পর ট্যাক্সি ছাড়লো। নন্দবাবু বললেন, 'আগে জয়দেবকে নামাবো। তারপরে আমি, সবশেষে তুমি।' নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও মহিমাময় বুঝলেন ট্যাক্সিভাড়াটা তাঁকেই মেটাতে হবে। তা হোক, নন্দ লোকটা মাতাল হলেও চিরকালই একটু কৃপণ কিন্তু লোক খারাপ নয়।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে নন্দবাবু মদ খাওয়া ছাড়ানোর ডাক্তারবাবুর কথা আবার বললেন। যতটা বোঝা গেলো, ঠিক ডাক্তারবাবু নয়, ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার ভদ্রলোকটি বহুদিন মার্কিন দেশে ছিলেন। সেখান থেকে মাতলামি ছাড়ানোয় সিদ্ধহস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। ডাকসাইটে মার্কিনী মাতালদের তিনি সচ্চরিত্র, সাধুপুরুষে রূপান্তরিত করিয়েছেন। ভদ্রলোকের পুরো নাম এই গল্পে প্রয়োজন নেই, ডাক্তার মল্লিক বললেই চলবে। ডাক্তার মল্লিক মাত্র মাস কয়েক আগে দেশে ফিরে এসে বেহালায় ঠাকুরপুকুরের কাছে কোথায় যেন একটা নৈশ সেবাসদন, নৈশ মানে রাত্রিকালীন নয়, নেশা সংক্রান্ত চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন।

গাঁজা, ভাঁং, আফিম, চরস, কোকেন, হোরোইন, সাদা-সবুজ-লাল যত রকম নেশা আছে সেই সঙ্গে মদের নেশা এমন কি সিগাবেটের নেশা পর্যন্ত এই সেবসদনে নির্মূল করে সারানো হয়।

কিছুই না , মাত্র পনেরো দিন থাকতে হবে ঐ সেবাসদনে। পনেরো দিন নিয়মিত শযন, বিশ্রাম ও আহার। সেই সঙ্গে সামান্য কিছু ওষুধ আর মানসিক চিকিৎসা। আগে এই শেষেব ব্যাপারটা, মানসিক চিকিৎসাই মুখ্য। রোগীর মাথায় তার নেশার বস্তুর বিরুদ্ধে ভয়াবহ চিন্তাধারা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। যে গেঁজেল, তার এর পর থেকে গাঁজার কলকের আগুন দেখলেই বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের কথা মনে হবে। যে মাতাল, এর পর মদের বোতল দেখলেই নোয়ার প্লাবনের কথা স্মরণ হবে—সে ভয়ে কুঁকরিয়ে যাবে, নেশার বস্তু দেখে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। ডাক্তার মল্লিকের চিকিৎসার এমনই মহিমা। নন্দবাবুর বক্তব্য শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরেও যখন ট্যাক্সিটা জয়দেবের বাড়ির কাছে পৌঁছালো না, মহিমাময় বুঝলেন ট্যাক্সিওলা হয় রাস্তা ভুল করেছে না হয় ইচ্ছে করে ঘুরপথে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়টাই স্বাভাবিক। কারণ পার্ক স্ট্রিটের মধ্যরাতের এমন কোন্ ট্যাক্সিওলা আছে যে জয়দেবের বাড়ি চেনে না? তা ছাড়া লোকটা একবারও জিজ্ঞেস করেনি কোথায় যেতে হবে।

মহিমাময় ট্যাক্সিওলাকে বললেন, 'সর্দারজী, (চিরদিন মত্ত অবস্থায় সমস্ত ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মহিমাময় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সর্দারজী বলে সম্বোধন করেন, আজও অবশ্য ভুল হয়নি) জয়দেববাবুকা বাসা আপ নেহি জানতা হ্যায়?'

সর্দারজী বিনীতভাবে বললেন, 'বহুত জানতা হ্যায়।' এর পর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'জয়বাবু বাসায় যাওয়ার আগে তিন-চার পাক হাওয়া খেয়ে নেন। তাতে ওঁর কষ্ট কমে, মনে ফূর্তি আসে। বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হয় না। আজ আড়াই পাক হয়ে গেছে, আর দেড় পাক

দিলেই মনে হচ্ছে ঝামেলা মিটে যাবে।' মহিমাময় প্রমাদ গুনলেন, জয়দেবের চারপাক, তারপর নন্দবাবুর কয়পাক কে জানে, তারপর নিজের বাড়ি যাওয়া— আজ কত টাকা ট্যাক্সি বিল হবে, কি জানি? তবে মহিমময় জানেন নিরানব্বই টাকা পঁচাত্তর পয়সার চেয়ে বেশি বিল ওঠা মিটারে সম্ভব নয়, সেটাই যা রক্ষা।

নন্দবাবু বোধহয় মহিমাময়ের চিন্তাধারা মনে মনে অনুসরণ করছিলেন। হঠাৎ তিনপাকের মাথায় একটা মোড়ে, 'রোকখে, রোকখে, বেঁধে, বেঁধে...' বলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দ্রুত নেমে পড়লেন। তারপর গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে মহিমাময়কে বললেন, 'এখান থেকে আমার বাড়ির দিকে একটা শর্টকাট আছে, আমি যাচ্ছি । কিন্তু নৈশ সেবাসদনের কথাটা ভুলো না।'

না, মহিমাময় নৈশ সেবাসদনের কথা বিস্মৃত হননি। বলা উচিত নিজেকে বিস্মৃত হওয়ার সুযোগ দেননি।

সেই রাতে জয়দেবকে নামিয়ে দিয়ে, তারপর নিজের বাড়িতে ফিরে যখন পুরো একটা একশো টাকার নোট, ট্যাক্সিভাড়া সাতাশি টাকা আর তেরো টাকা সর্দারজীর বখশিশ,' মহিমাময়কে দিতে হলো তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যাপারটার একটা ফয়সালা চাই, অবিলম্বে চাই।

পরেব রবিবার সকালে জয়দেবেব বাড়িতে গিয়ে জয়েদেবের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। দেখা গেলো মিসেস জয়দেব সব খববই রাখেন, বোধহয় নন্দবাবুই ইতিমধ্যে এসে বলে গেছেন।

মিসেস জয়দেব বুদ্ধিমতী মহিলা। তাঁর ধারণা এসব নিতান্ত তুকতাক জাতীয় চিকিৎসা। এত সহজে, মাত্র এক পক্ষ সেবাসদনে বাস কবেই তাঁর স্বামীর এতদিনের জটিল মত্ততার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে—একথা মিসেস জয়দেব কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। মহিমাময় মিসেস জয়দেবকে বোঝালেন যে এসব হলো অমোঘ আমেরিক্যান চিকিৎসা, এমন কি রাশিয়ায় পর্যন্ত এখন এই চিকিৎসায় হাজার হাজার লোক ভদকা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তা ছাড়া নন্দবাবুর এক দূর-সম্পর্কের শালা মাত্র এক সপ্তাহের চিকিৎসাতেই চল্লিশ বছরেব গাঁজার নেশা বন্ধ করে দিযেছে। এখন সে দুবেলা শুধু দু গেলাস দুধ খায়, নেশার জিনিস বলতে নেহাতই সারাদিনে কয়েকটা গুন্ডিপান। অনেক কষ্টে মিসেস জয়দেবকে নিমরাজি করানো গেলো। কিন্তু এবার চিন্তায় পড়লেন মহিমাময়, জয়দেব কি এই চিকিৎসায় রাজি হবে, নাকি শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসবে। কাল ছিলো শনিবার। কাল নাকি অনেক রাতে জয়দেব বাড়ি ফিরেছে, এখন ভেতরের ঘবে ঘুমোচ্ছে। ভয়ে ভয়ে মহিমাময় মিসেস জয়দেবকে বললেন, 'এখন ভালোয় ভালোয় জয়দেবকে রাজি করাতে পারলে হয়।'

মিসেস জয়দেব একটু হাসলেন, বললেন, 'সে নিয়ে আপনাকে ভাবনা করতে হবে না। ও একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে, দিন পনেরো নিরিবিলি শান্তিতে একটু বিশ্রাম পেলে শরীরটা জুড়িয়ে যায়। বরং আমিই আপত্তি করছিলাম।'

মহিমাময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা হলে আর কোনো বাধা নেই। এবার সেবাসদনে গিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলি। ঘুম থেকে উঠলে জয়দেবকে বলবেন যে আমি এসেছিলাম।'

বন্ধুর সুচিকিৎসা ফেলে রাখা উচিত নয়। আর সপ্তাহে রবিবার মাত্র একটাই।

জয়দেবের বাড়ি থেকে মহিমাময় সরাসরি গেলেন মল্লিকের সেবাসদনে। সুন্দর জায়গা। একটা পুরনো বাগানবাড়ি ভালো করে সারিয়ে, চুনকাম করে, শক্ত লোহার গেট লাগিয়ে

সেবাসদন তৈরি হয়েছে। বাইরে বড় বড় হরফে বিশাল সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে।

নৈশ সেবাসদন
এখানে সকল প্রকার প্রাচীন ও দুরারোগ্য
নেশার বিলাতি মতে চিকিৎসা করা হয়॥

সাইনবোর্ডের আয়তন এবং সেবাসদনের বাড়িটি দেখে মহিমাময়ের মনে বেশ সম্ভ্রমের ভাব এলো। তিনি গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে একজন উর্দিপরা দারোয়ান দরজা খুলে দিলো এবং অফিসঘর কোথায় সেটা অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলো।

সুড়কি বাঁধানো সড়ক দিয়ে গাড়িবারান্দায় নিচে একপাশে অফিসঘরে পৌছালেন মহিমাময়। সামনে টানা বারান্দা, তার মাঝবরাবর সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

বারান্দার দুপাশে একেক ঘরের পাশে একেক রকম বস্তুর নাম লেখা—কোথাও লেখা 'গাঁজা', কোথাও 'ভাঙ', কোথাও 'সিদ্ধি', বাংলায় এবং পাশাপাশি ইংরেজি অক্ষরে এগুলির লাতিন নাম লেখা। দোতলায় সিঁড়ির পাশে তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা আছে মদ, পাশে ইংরেজিতে লেখা কোহল সেকসন, সঙ্গে ব্র্যাজেট ওয়াইন, লিকার এট্সেট্রা। অফিসঘরে বেশ কয়েকজন লোক কাজ করছেন, একজন মহিলা টাইপমেশিনে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। অন্য এক মহিলা একটা সাদা টেলিফোনে ফিসফিস করে কার সঙ্গে যেন খুব অন্তরঙ্গ কথা বলছেন।

অফিসের অধীশ্বরের নাম কুঞ্জলাল। তিনিই অফিসের বড়বাবু। মহিমাময়কে খুব আদর করে বসিয়ে কুঞ্জলাল জানতে চাইলেন, 'আপনার সমস্যাটা কি রকম ? কঠিন, তরল না বায়বীয় ?'

কবে সেই বিহ্বল প্রথম যৌবনে কলেজে পদার্থবিদ্যার ক্লাসে এই রকম একটা বিভাজনের কথা শুনেছিলেন মহিমাময়। তিনি স্মৃতি উদ্ধার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কঠিন, তরল এসব মানে কি?'

কুঞ্জলাল বললেন, 'আপনাকে তো রোগী মনে হচ্ছে না?'

মহিমাময় বললেন, 'না, আমি আমার বন্ধুর জন্যে খবর নিতে এসেছি।'

কুঞ্জলাল বললেন, 'তাহলে এবার বলুন, আপনার বন্ধুটি কঠিন, তরল না বায়বীয় ? অবশ্য ডাক্তার মল্লিকের কাছে একসঙ্গে দুটো-তিনটে উপসর্গ হলেও কোনো অসুবিধা হয় না।'

মহিমাময়ের মুখ দেখে কুঞ্জলাল বুঝতে পারলেন তাঁর কিছুই হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। তখন বিশদ করে বললেন, 'আপনি তো নেহাৎ শিশু মশায়। কঠিন হলো আফিম, ট্যাবলেট এই সব। তরল হলো মদ, সিদ্ধি, আর বায়বীয় হলো গাঁজা, চরস।'

কুঞ্জলালের হেঁয়ালি শেষ হলে মহিমাময় যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পারলেন তার থেকে বোঝা গেলো পনেরো দিনের চিকিৎসায় প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হবে। বিফলে মূল্য ফেরত নয়, তবে এখন পর্যন্ত কেউ বিফল হয়ে ফেরেনি।

ইতিমধ্যে গাঁজার ঘর থেকে একটি গাঁজাখোর মেয়ে ছোট এক গাঁজার কলকেতে ধোঁয়া টানতে টানতে বেশ কয়েকটা ফিকে নীল রিং ঠোঁট দিয়ে ছুঁড়ে অফিসঘরের মধ্যে এলো। মহিলাকে দেখেই মহিমাময় চিনতে পারলেন, একটি বিখ্যাত সাবানের জনপ্রিয় মডেল মমতাজ চৌধুরী।

অফিসঘরের হাওয়ায় গাঁজার রিংগুলি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শ্রীমতী মমতাজ অন্তর্হিত হলেন। তাঁর অন্তর্ধানপথের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে চোখ থেকে বাই-ফোকাল চশমাটা নামিয়ে পকেটের রুমাল দিয়ে চোখ এবং চশমা দুই মুছে নিয়ে কুঞ্জলাল বললেন, 'মমতাজ দেবী মাত্র তিনদিন এসেছেন। আগে দৈনিক দেড়শো গাঁজার ধোঁয়ার রিং ছাড়তেন, এই তিনদিনেই রিং-এর সংখ্যা একশো দশে এসে নেমেছে। পনেরো দিনের মাথায় ভ্যানিশ হয়ে যাবে।' এমন সময় একটা গাড়ি এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। যে ভদ্রমহিলা টাইপমেশিনে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি মেশিন থেকে মাথা তুলতে গিয়ে তাঁর চুলের বেণীটা মেশিনের কি-বোর্ডে আটকিয়ে গেলো। যে মহিলা টেলিফোনে এতক্ষণ অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ চালাচ্ছিলেন তিনি দুম করে ফোনটা বিনা নোটিশে ছেড়ে দিলেন।

ডাক্তার মল্লিকঅফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখে পুরনো আমলের বড় বড় গোল কাঁচের নিকেলের ফ্রেমের চশমা, এটাই হাল আমলের মার্কিনী ফ্যাশান। সেই সঙ্গে লাল-গোলাপী গেঞ্জি, তার পিঠে বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা **OH-HO-OH-HO**, শব্দগুলোর চারপাশে সবুজ লতাপাতা। ডাক্তার মল্লিককে দেখে খুব ভক্তি হলো মহিমাময়ের। খুব বিশ্বাস হলো যে ইনি পারবেন জয়দেবের নেশা ছাড়াতে। ডাক্তার মল্লিক প্রবেশ করার পর সকলের সঙ্গে মহিমাময়ও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু সেই টাইপিস্ট মেয়েটি যন্ত্র থেকে বেণী ছাড়াতে না পেরে সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়াতে পারেনি। সে টেবিল ঘেঁষে তিন কোণাচে হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। ডাক্তার মল্লিক এসব ভ্রূক্ষেপ করলেন না, দ্রুত গতিতে 'গুডমর্নিং' বলে পাশের ঘরে নিজের চেম্বারে চলে গেলেন।

মহিমাময়ও বেরিয়ে পড়লেন।

পরের শনিবারেই জয়দেবকে স্থানান্তরিত করা হলো নৈশ সেবাসদনে। অফিসের কাজে মহিমাময়কে কয়েক দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। সেবাসদনে যাওয়ার সময়ে তিনি জয়দেবের সঙ্গে যেতে পারেননি। মিসেস জয়দেব নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে বাড়িতে-অফিসে নানা ঝামেলা। পাড়ার একটা বুড়ো হুলো বেড়াল কি কারণে কয়েকদিন আগে পাগল হয়ে গেছে, যখন তখন যাকে তাকে কামড়াচ্ছে, প্রতিবেশীদের সঙ্গেরাত জেগে পর পর কয়েক রাত সেই বেড়াল ধরার প্রয়াস। এদিকে বাসায় মেয়েটার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা। মহিমাময় কয়েকদিন এত ব্যস্ত রইলেন যে জয়দেবের কথা প্রায় খেয়ালই ছিলো না। আরো নানা ধরনের গোলমাল— গ্যাস সিলিণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে না, তা ছাড়া আগে একটা সিলিণ্ডারে একমাস যেতো, এখন টেনেটুনে পনেরো দিনও যায় না। ওদিকে আগে ইলেকট্রিক বিল উঠতো মাসে বড় জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা, এখন দেড়শো-দুশোয় গিয়ে ঠেকেছে।

এত সব দিক সামলিয়ে সেই সঙ্গে আনাজ, তরকারি, মাছ, দুধ, ধোবা-নাপিত সব মিটিয়ে মদ খাওয়ার পয়সা সংগ্রহ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। মহিমাময় চিন্তা করেন, চিকিৎসা করে জয়দেবের যদি নেশা ছুটে যায় তা হলে আমিও চিকিৎসা করে মদ খাওয়া ছাড়বো।

সুতরাং সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেও শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে নয়, অনেকটা কৌতূহলবশতও জয়দেবকে এক সন্ধ্যায় দেখতে গেলেন মহিমাময়। তখন জয়দেবের সেবাসদনে বাস বারোদিন হয়েছে, আর দিন তিনেক বাকি আছে মুক্তির।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সেবাসদনের দরজায় পৌঁছালেন মহিমাময়।

দরজার বাইরে ড্রেনের একপাশে একটা কালভার্টের উপরে সেবাসদনের বড়বাবু কুঞ্জলাল বসে রয়েছেন। তিনি অতি ঘন ঘন বিষম হেঁচকি তুলছেন। তাঁর আশেপাশে সেবাসদনের আরো দু'চারজন কর্মচারী ইতস্তত বসে বা দাঁড়িয়ে। তারাও ক্রমাগত হেঁচকি তুলছে।

সমস্ত ব্যাপারটা দেখে কেমন খটকা লাগলো মহিমাময়ের। অবস্থাটা খুব জটিল মনে হলো তাঁর।

তিনি গেটের দিকে এগোলেন, দেখলেন সেদিনের সেই উর্দিপরা দারোয়ান গেটের হাতল ধরে কোনো রকমে বহু কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। এ লোকটাও ঘন ঘন হেঁচকি তুলছে। প্রত্যেকবার হেঁচকি তোলার ফাঁকে 'ওরে বাবা, মরে গেলাম, বাবারে' এই সব কাতরোক্তি করছে।

মহিমাময় ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে সেবাসদনের ভিতরে প্রবেশ করলেন। গাড়িবারান্দায় এবং ভেতরের প্যাসেজে মিটমিটে পঁচিশ পাওয়ারের আলো জ্বলছে। সেই মৃদু আলোয় মহিমাময় দেখতে পেলেন গাড়িবারান্দার নিচে এবং উপরে দোতলায় বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে মহিলাও রয়েছে, সেদিনের মমতাজ দেবীও রয়েছেন মনে হলো।

এখানেও সকলের মধ্যে সেই একই বৈশিষ্ট্য, সবাই ভয়াবহ হেঁচকি তুলছে। সমবেত হিক্কা ধ্বনিতে চারদিক গুঞ্জরিত হচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে যথারীতি কেউ কেউ বিকট সব উক্তি করছে। মহিমাময় সবচেয়ে সামনের লোকটিকে জয়দেবের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটির পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং সুট, নিশ্চয় এখানকার রোগী। একটা বিশাল হেঁচকিকে গলধঃকরণ করে লোকটি বললো, 'জয়দেববাবুকে নিতে এসেছেন?'

এই প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে মহিমাময় বললেন, 'নিয়ে যাবো কেন? জয়দেব ভালো হয়ে গেছে? ওর তো এখনো তিন দিন বাকি আছে!'

আর একটি হেঁচকি তুলে লোকটি বললো, 'আরো তিন দিন? সর্বনাশ! সেবাসদন যে উঠে যাবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে মহিমাময় আগের দিনের দেখামত কোহল সেকশনের দিকে পা বাড়ালেন। নিশ্চয়ই ওখানে জয়দেবের দেখা পাওয়া যাবে।

কোহল সেকশনে জয়দেবের দেখা পাওয়া গেলো। ছোট ঘরের মধ্যে একটা খাট। তারই একটির প্রান্তে বালিশে হেলান দিয়ে জয়দেব বসে রয়েছেন। রীতিমত গুম হয়ে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, খাটের অন্য প্রান্তে ডাক্তার মল্লিকও বসে রয়েছেন। বড় বড় গোল চশমার কাঁচের নিচে তাঁর চোখ দুটো খুব বেশি গোল দেখাচ্ছে। তিনিও গুম মেরে থাকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। হেঁচকি এসে বাধা সৃষ্টি করছে।

একমাত্র ব্যতিক্রম জয়দেব। মহিমাময় ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন, জয়দেব কোনো হেঁচকি তুলছেন না।

সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত বেশি গোলমেলে মনে হলো মহিমাময়ের। ঠিক কি ঘটছে, ঘটেছে, কেন ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারছেন না। দরজার কাছে গোটা দুই বেতের চেয়ার রয়েছে, তারই একটা টেনে নিয়ে মহিমাময় জয়দেবের খাটের সামনে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার মল্লিকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো না, পর পর কয়েকটি অতিদ্রুত হেঁচকির ধাক্কায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং 'ও গড, ও গড' বলতে বলতে দ্রুত বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

এখন জয়দেব আর মহিমাময়, দুই পুরনো বন্ধু, এই শহবের দুই প্রাচীন মাতাল পবস্পরের মুখোমুখি।

না, কোনো ডুয়েল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ নয়। জয়দেব মহিমাময়ের দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হাসলেন। মহিমাময়ও হাসলেন। মহিমাময় একবাব মাথা ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকালেন। জয়দেব বুঝতে পেরে বললেন, 'কেউ নেই। সব বাইরে গিয়ে কোথাও হেঁচকি তুলছে।' তারপর উদার কণ্ঠে মহিমাময়কে বললেন, 'একটু মদ খাবি? জিনিসটা চোলাই কিন্তু খাঁটি চোলাই।'

খাটেব নিচ থেকে দুটো কাঁচের গ্লাস আর একটা রবারেব ব্লাডার হামাগুড়ি দিয়ে বার করে আনলেন জয়দেব। বন্ধুর উপহার বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করলেন মহিমাময়। দুজনে প্রাণের আনন্দে পান শুরু করলেন।

মদ খেতে খেতে দুই বহুদিনের প্রাণের বন্ধুব মধ্যে বহু কথা হলো। হেঁচকির প্রসঙ্গও এলো। হেঁচকি ব্যাপারটা সোজা নয়। হেঁচকির জন্যে ওষুধ লাগে।

ডাক্তার মল্লিক মার্কিন দেশ পরিত্যাগ কবাব সময় কয়েক বোতল হেঁচকির ওষুধ নিয়ে এসেছেন। ব্যাপারটা বে-আইনি কিনা, তা নিয়ে এঁদেব দুজনেব কেউই চিন্তিত নন। মহিমাময়কে জয়দেব মদ খেতে খেতে যা বললেন তা চমকপ্রদ। ঘটনার বিববণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

নেশা ছাড়ানোর ব্যাপারটা খুবই সোজা। শুধু ঐ একটু হেঁচকির ওষুধ চাই। হেঁচকি সারানো নয়, হেঁচকি করানোব ওষুধ। জিনিসটা দেখতে সাদা টুথ পাউডাবেব গুঁড়োর মত। ঐ গুঁড়ো সামান্য একটু কোনো কিছুব সঙ্গে মিশ্রিত করে দিলে অবিশ্রান্ত হেঁচকি উঠতে থাকবে। এই ওষুধের আবিষ্কারক নাকি ডাক্তাব মল্লিক স্বয়ং। তবে সব কেমিক্যাল এদেশে মেলে না। ডাক্তার মল্লিকের বিধান হলো, যে যা নেশা কবছে করুক, কোনো আপত্তির কারণ নেই। শুধু ঐ নেশার সামগ্রীর সঙ্গে, সে হুইস্কি বা হেবোইন যা হোক না কেন, তার সঙ্গে এক বিন্দু ঐ সাদা পাউডাব মিশিযে দিতে হবে। আব গাঁজা জাতীয় ধোঁযাটে নেশায় কলকেতে বা সিগারেটে একটু দিয়ে ধোঁয়ায় টেনে নিলেই কাজ হবে।

কাজ হবে মানে পাঁচ মিনিটেব মধ্যে হেঁচকি শুরু হবে। চলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

জয়দেব জানালেন যে এখানে এসেই তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন পানীয়ের এবং খুব কাছেই একটি নির্ভেজাল চোলাইয়ের দোকানের খবর পান। প্রতিদিন দারোয়ানকে দিয়ে তাই দু পাঁইট আনিয়ে নেন। এবং তাতেই তাঁর একার চলে যায়।

প্রথম দিন খাওয়ার পর আর তিনি সেবাসদনের হেঁচকি-করানো পানীয় গ্রহণ করেননি। সারারাত এবং পরের দিন সারা সকাল হেঁচকি উঠেছিলো। তিনি নিশ্চিত যে পনেরো দিন কেন মাত্র এক সপ্তাহ যদি ঐ পাউডার দেয়া নেশা কেউ করে, তা হলে সারা জীবনের মত নেশা করার শখ তার কেটে যাবে।

গত এগারো দিন জয়দেব নিজে সন্ধ্যায় চোলাই খেয়েছেন আর ঐ পাউডার দেয়া পানীয় তাঁর জলের কুঁজোয় সঞ্চিত করে রেখেছেন। আজ সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার মল্লিক সমেত সেবাসদনের সমস্ত কর্মচারী এবং নেশার রোগীদের জয়দেব আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সবাইকে তাঁর জন্মদিন এই কথা বলে। যারাই জয়দেবের পানীয় গ্রহণ করেছে তাদের পরিণতি মহিমাময়

চোখের সামনেই দেখতে পেয়েছেন। ঐ তো পিছনের বারান্দায় থাম ধরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার মল্লিক নিজেই হেঁচকি তুলছেন। শুধু জয়দেব নিজে খাননি, তাই ঠিক আছেন।

মহিমাময়ের কেমন কৌতূহল হলো। মদের নেশাটা ছেড়ে দেবার তাঁর নিজের অনেকদিনের ইচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না। জয়দেবকে তিনি বললেন, 'ঐ পাউডার দেয়া মদ তোর আর আছে?'

জয়দেব বললেন, 'একটু থাকতে পারে কুঁজোর নিচে। তুই খাবি নাকি? খুব হেচকি উঠবে কিন্তু। মদ খাওয়ার সব শখ মিটে যাবে।'

মহিমাময় বললেন, 'আমি শখটা মেটাতেই চাই। এই বাজে নেশাটা ছাড়তে পারলেই বাঁচি। আর যা খরচা বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মদের দাম।'

কুঁজোর তলা থেকে গেলাস দুয়েক পানীয় বেরোলো, পানীয়টা উৎকৃষ্ট ভালো হুইস্কিই হবে। পাউডারের গুঁড়োর তলানি বোধহয় নিচে বেশি পড়েছিলো, তাই একটু ঝাঁঝ বেশি। প্রতিফল পেতে পাঁচ মিনিট কেন দু মিনিটও লাগলো না। গগনচুম্বী সব হিক্কা উঠতে লাগলো মহিমাময়ের, অস্থির বোধ করতে লাগলেন, গা গোলাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন মহিমাময়। সেবাসদন থেকে বেরোনোর মুখে দেখলেন ডাক্তার মল্লিক আব মমতাজ দেবী সিঁড়ির প্রান্তে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে যুগ্ম হিক্কা তুলছেন। সামনের গেটের উপরে দারোয়ান আর কুঞ্জলালবাবু বসে, তাঁদের হেঁচকির আন্দোলনে ভারি গেট কাঁপছে।

মহিমাময়ের অবস্থাও সুবিধের নয়। কোনো রকমে রিক্সায় বড় রাস্তায় পৌঁছে, সোজা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি। তখন হিক্কার গমক আরো বেড়েছে।

বাড়ি ফিরে গেলাসের পর গেলাস সাদা জল খেলেন। মহিমাময়ের স্ত্রী তাঁব মাথায় ব্রহ্মতালুতে জোরে জোরে চাপড় দিলেন। মহিমাময় বীভৎস সব সমস্যার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু হিক্কার গতিও তো বেড়েই চললো।

এমন সময় সামনের টেবিলে সেদিনের ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো মহিমামযের চোখে পড়লো। সবচেয়ে উপরে রয়েছে ইলেকট্রিক বিল। গত মাসে দুশো দশ টাকা হযেছিল। এবাব বিল খুলে দেখলেন উঠেছে সাতশো বারো টাকা চল্লিশ পয়সা। তবে ঐ চল্লিশ পয়সা এ মাসে দিতে হবে না। পরের মাসের হিসেবে যাবে।

সাতশো বারো টাকা বিল পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন মহিমাময়। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেতে বাড়ির সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সব ঘরের আলো-পাখা নিবিয়ে দিলেন। স্ত্রী রান্নাগরে হিটারে মাছের ঝোল রাঁধছিলেন, মেয়ে টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখছিলো—সব সুইচ তিনি অফ করে দিলেন। এবং তার পরেই ঘোর অন্ধকারে হঠাৎ একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করলেন। তিনি টের পেলেন যে তাঁর আর হিক্কা উঠছে না।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের কাছে গিয়ে ইলেকট্রিক বিলটা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। তারপর সন্তর্পণে একটা আলো জ্বালিয়ে দেরাজের নিচের থেকে একটা ছোট রামের বোতল বার করে নির্জলা খেতে লাগলেন। এখন আর হিক্কা উঠলো না।

মহামহিম

জয়দেব পাল এবং মহিমাময় রায়চৌধুরীর কথা বার বার লেখার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া এদের এখন বয়েস হয়েছে, দুজনেই বেশ কিছুদিন হল পঞ্চাশ পার হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কীর্তিকলাপ করার ক্ষমতা এদের এখন খুবই কমে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা এখানে মাঝে মধ্যে এমন কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসেন যার তুলনা শুধু খোজা নাসিরুদ্দিনের গল্পে অথবা আরব্য উপন্যাসে ক্বচিৎ মিলতে পারে।

জয়দেবের কুখ্যাতি বহুপ্রচারিত এবং সর্বজনবিদিত। আমি নিজেই কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেসব উপাখ্যান লিখেছি। কিন্তু মহিমাময় মিটমিটে শয়তান। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, এমন কি বন্ধুবান্ধব সহকর্মীরা তাকে কখনো সন্দেহ করেনি। কে চিরদিন ডুবে ডুবে কিংবা তলে তলে জল খেয়েছে এবং শুধু জল নয়, জলের সঙ্গে প্রায় সমান পরিমাণ হুইস্কি, রাম কিংবা ডবল পরিমাণ বাংলা মদ।

মহিমাময়ের ওজন যে গত তিন বছরে যাট কেজি থেকে আশি কেজিতে পৌঁছেছে, সে ঐ রামটাম অথবা বাংলার কল্যাণে।

পাড়া-প্রতিবেশী, শুভানুধ্যায়ী, আত্মীয়স্বজন মহিমাময়কে ফুলকো লুচির মত ফুলে যেতে দেখে নানা রকম ভয় দেখায়। শুভানুধ্যায়ীরা বলে, 'সাবধান, এ বয়েসে এত মোটা হওয়া উচিত নয়। ব্লাডপ্রেসার বাড়ে, ডায়াবেটিস হয়, হার্টের ওপর চাপ পড়ে। সেরিব্রাল বা করোনারি হতে পারে, পক্ষাঘাত এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।'

এসব শুনে মহিমাময় খুবই ভয় পায়। তবে সে রসিক ব্যক্তি, ঐ করোনারি অ্যাটাক কথাটা শুনে ওর অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে যায়। শিবরাম চক্রবর্তীর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অল্পবিস্তরের কলমে এক শোকাহত ভাগিনেয় তার মামার মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছিল, লিখেছিল যে তার মামা কিছুদিন আগে করোনারিতে মারা গিয়েছে। শিবরাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতুলনীয় কৌতুকী ভঙ্গিতে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'কি আর বলবো ভাই, সকলের মামাই এরকম ভাবেই মারা যায়—করোনারি রোগে অথবা পরনারী রোগে।'

সে যা হোক, ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টা বা রঙ্গ রসিকতার পর্যায়ে আর নেই। কুড়ি কেজি ওজন বেড়ে যাওয়া সামান্য ব্যাপার নয়। মহিমাময় মাঝে মাঝেই নিজের মনে দুশ্চিন্তা করে।

অসুবিধাও নানা রকম দেখা দিয়েছে। সব সময়ে কেমন হাঁসফাঁস লাগে। দমবন্ধ ভাব। একটু হাঁটলেই দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে, ঘাম হয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলে তো কথাই নেই, দু-চার ধাপ উঠেই মহিমাময় হাঁপাতে থাকে।

এ ছাড়া আরও অনেক ধরনের অসুবিধা দেখা দিয়েছে। পুরনো প্যান্ট-শার্টগুলো আর ফিট করে না। দামী, দামী প্যান্ট ছিল মহিমাময়ের। বছর চারেক আগে কাঠমাণ্ডু বেড়াতে গিয়ে বেশ কয়েকটা ভাল বিলিতি কাপড়ের প্যান্ট বানিয়েছিল মহিমাময় আর সেই সঙ্গে দু-জোড়া সাফারি স্যুট।

মহিমাময়ের প্রাণের বন্ধু জয়দেব অবশ্য সাফারি স্যুটের ঘোরতর শত্রু। একদিন জয়দেবের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা একটা বারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল মহিমাময়ের। বেশ কিছুদিন আগের কথা, তখনো মহিমাময় এত গোলাকার ধারণ করেনি। সেই নেপালী সাফারিস্যুটে বিভূষিত হয়ে মহিমাময় বারে পৌঁছনোর পরে তাকে দেখে জয়দেবের কী ক্রোধ, কী রাগারাগি, কী গঞ্জনা!

মহিমাময় বারে ঢুকে যেই জয়দেবের টেবিলে বসতে যাচ্ছেন, জয়দেব তাকে বলল, 'তুই কি কোনও কোম্পানিতে ড্রাইভারের চাকরি নিয়েছিস, নাকি দারোয়ানের?'

মহিমাময় অবাক হয়ে বলল, 'মানে?'

জয়দেব বলল, 'তা না হলে এই দারোয়ানের ইউনিফর্ম কোথায় পেলি?'

কথাটা মহিমাময়ের মনে ধরেছিল। সত্যিই বুঝি সাফারিস্যুটের মধ্যে কোথায় একটা অন্ত্যজ অনভিজাত ব্যাপার আছে, কেমন যেন দারোয়ানি-দারোয়ানি গন্ধ।

সেদিন অবশ্য গোলমালটা সঙ্গে সঙ্গে চুকে গিয়েছিল। এবং গভীর, গভীরতর রাতে প্রচুর, প্রচুরতর মদ্যপানের পর ফুটপাথ বদল হওয়ার আগের মুহূর্তে জামা বদল করেছিল জয়দেব আর মহিমাময়।

মহিমাময়ের বহু আহ্লাদের সাফারিস্যুটের ঊর্ধ্বাংশ এবং জয়দেবের অতিপ্রিয় নীল স্পোর্টস গেঞ্জি, যার বুকে ও পিঠে অকথ্য ইঙ্গিতপূর্ণ একটি ইয়াংকি স্লোগান লেখা আছে, বিনিময় হয়েছিল সেই মধ্যরাতে।

ফলে একটা সাফারিস্যুট সেদিনই খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়টাও আর বিশেষ পরেনি মহিমাময়। পরার সুযোগও ছিল না।

শুধু সাফারিস্যুট কেন, প্রত্যেকটি প্যান্ট-শার্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি পুরনো কিছুই আর মহিমাময় এখন তার শরীরে চড়াতে পারে না। প্যান্টগুলো, বিশেষ মায়াবশত, কোনও রকমে বেল্ট বেঁধে বোতাম না লাগিয়ে পরা যেত কিন্তু এখন তাও সম্ভব নয়। আর শার্ট? পুরনো শার্টগুলোর বুকের বোতাম লাগানো দূরের কথা, তার মধ্যে হাত গলানো পর্যন্ত অসম্ভব এখন।

তাই ধুতি আর ঢোলা পাঞ্জাবি পরা শুরু করেছে মহিমাময়। যতটা মোটা হোক, ধুতি ছোট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। লম্বা হলে হয়তো ঝুলের ধুতি লাগে, কিন্তু পাশে বেড়ে গেলে সে সমস্যা নেই, কোঁচার কাপড় কিছু কম পড়তে পারে, তা পড়ুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আর চওড়া হাতা ঢোলা পাঞ্জাবিও সর্বংসহা। তার ভিতরে দু-চার-দশ কেজি মেদবৃদ্ধি অনায়াসেই চাপা দেয়া যায়।

কিন্তু সে তো সাময়িক ব্যাপার। বাসায় সব সময় তো ঢোলা পাঞ্জাবি পরে থাকা যায় না। বাসায় খালিগায়ে হলে নিজের স্ফীতোদরের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় মহিমাময়ের। স্নান সেরে উঠে দেয়াল-আয়নার সামনে খালিগায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মেদ ও চর্বি প্লাবিত বৃষস্কন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করে মহিমাময় শিউরে ওঠে।

এর কি কোন প্রতিকার নেই? ডাক্তার সমেত যাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়, সে ভোজন কমাতে বলে। মহিমাময়ের নিয়মিত গোপন মদ্যপানের সংবাদ অনেকেই রাখে না। যে দুয়েকজন রাখে, তারা বলে, 'পান-ভোজন কমাও।' কিন্তু ভোজন একটু আধটু কমাতে পারলেও মহিমাময় পান কমাতে পারছে না। পানীয়ের চেয়েও বিপজ্জনক পানীয়ের সঙ্গে চাট। মহিমাময় আগে লুচি খেতো। অন্তত আট-দশটা ছুটির দিনের সকালবেলায় জলখাবার, সেই সঙ্গে আলুর দম বা

পরিমাণগত আলুপেঁয়াজ ভাজা। আর দুটো মিষ্টি। স্থূল ব্যক্তির পক্ষে এসব নাকি বিষ। এরকম নিয়মিত খেলে মাসে এক কেজি ওজন বেড়ে যাবে।

এসব জানার পর থেকে মহিমাময় ছুটির দিনে সকালে জলখাবার খায় স্রেফ তিনখানি রুটি আর একটু ডাল কিংবা বেগুনভাজা।

অন্যান্য খাবার ব্যাপারেও যথেষ্ট ধরাবাঁধার মধ্যে এসেছে সে। সকালের চায়ের চিনির বদলে স্যাকারিন খান। সঙ্গে আগে চারটা বিস্কুট খেত এখন একটা তাও সেটা থেকে এক টুকরো ভেঙে বাড়ির পোষা কুকুরটাকে দেয়। কুকুরটা মহিমাময়ের ছেলের আগে কখনো মহিমাময়কে দেখে জীবনে একবারও লেজ নাড়েনি। এখন বিস্কুটের সামান্য ভাগ পেয়ে অল্প অল্প লেজ নাড়ে।

দুপুরেও মহিমাময় ভাত দুমঠো কম খায়। ভাত খেতে বসার আগে পর পর দুগেলাস জল খেয়ে নেয় যাতে পেটে বেশি জায়গা না থাকে। ভাতের সঙ্গে ঘি, ভাজা-টাজা, ডিম-মাংস এ সব বন্ধ করেছে, ডাল, তরকারি আর ছোটমাছ। দুপুর অফিসে টিফিন নিয়ে যায় সে। আগে চাব-পাঁচখানা রুটি নিত, এখন ঠিক দুটো রুটি, সঙ্গে সামান্য তরকারি। বাড়ির বাইরে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। যদি খেতেই হয়, বড়জোর চিনি ছাড়া চা।

খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে মেদবৃদ্ধি সংক্রান্ত বাজার চলতি বেশ কয়েকটি বই আগাগোড়া মন দিয়ে পাঠ করেছে মহিমাময়। বলতে গেলে এ বিষয়ে সে এখন একজন অতরিটি। ক্যালোরি ব্যয়ের হিসাবের খুঁটিনাটিও এখন তার মুখাগ্রে। সিঁড়ি দিয়ে নামলে কত ক্যালোরি ব্যয় হয়, সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কত, হাঁটলে কত, ছুটলে কত, বসে থাকলে কত, শুয়ে থাকলে কত সব মহিমাময় জেনে গেছেন।

সে জেনে গেছে দৈনিক সকালে একঘণ্টা হাঁটলে এক বোতল বিয়ার বা দু-পেগ রামের ক্ষতিপূরণ হয়। তিন কাপ চায়ে সাড়ে চার চামচে চিনি খাওয়া হয়, সেটা এক গেলাস বাংলা খাওযার সমান।

সব জেনে গেছে মহিমাময়। সকালে বহু সাধের সুখনিদ্রা ফেলে সে মাঠে গিয়ে তরতর করে ছোটে। তারপর সারাদিন সবরকম লোভ দমন করে যথাসাধ্য কম খেয়ে সে দিনযাপন করে। সে রাবড়ি খেতে ভালবাসত। মোগলাই পরটা খেতে ভালবাসত। তেলেভাজা বেগুনি-ফুলুরি খেতে ভালবাসত—মোটা হওয়া কমানোর জন্যে সে সব ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু তাতে লাভ কি? সারাদিন মহিমাময় কত কষ্ট করে লোভ দমন করে থাকে। রাস্তায় তার প্রিয় চিকেনরোল ভাজা হচ্ছে, আলুর চপের গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে, দলে দলে লোক সে সব কিনে খায়, কিন্তু মহিমাময় কখনো এসব লোভ করে না, অন্তত সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

সূর্যাস্তের পরে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ধীরে, মহিমাময়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। সাড়ে সাতটা নাগাদ সে বরফ-সোডা আর সামান্য একটা পানীয় নিয়ে বসে। তখনই সর্বনাশের শুরু হয়। একটু পান করার পরে সে গায়ে পাঞ্জাবি পায়ে চটি গলিয়ে রাস্তায় গিয়ে এক টাকার খোসা ছাড়ানো চিনেবাদাম আর দেড় টাকার চানাচুর নিয়ে আসে। পানীয় কম থাকলে মোড়ের মাথায় দত্তের দোকানে গিয়ে একটা বোতল কেনে। তারপর সারাদিনের ত্যাগ ও পরিশ্রম জলে ভেসে যায়। আধ বোতল পানীয়, সঙ্গে চানাচুর-বাদাম, তারপরে নৈশ আহারে বসে মহিমাময়ের খাওয়ার রোখ চেপে যায়। আরও ভাত, তরকারি চেয়ে চেয়ে খায়, ঝোল থেকে বেছে বেছে

চামচে দিয়ে আলু তুলে নেয়। মহিমাময়ের স্ত্রী মহিমাময়ের মোটা হওয়া নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। সুতরাং কোন দিক থেকে কোন বাধা নেই। সারাদিন যা খেয়েছে, শুধু এক সন্ধ্যায় সে তার চারগুণ খেয়ে ফেলে। চানাচুর-বাদাম, আধবোতল মদ চোখে দেখে বোঝা না গেলেও ডাক্তারি মতে মোটা হওযার ব্যাপারে বিয়েবাড়ির বিরিয়ানি-মাংস-ফিসফ্রাই-দই-মিষ্টি-খেজুরের চাটনির লম্বা ভোজের সমান।

সুতরাং মহিমাময়ের আরও, আরও মোটা হওয়া, ক্রমাগত স্থূল থেকে স্থূলতর হয়ে যাওয়া জগৎসংসারে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শরীরের চর্বি তাড়াতাড়ি পোড়ানোর কি এক বিলিতি ট্যাবলেট বেরিয়েছে বাজারে, খুব দাম, স্থূলাঙ্গিনী বণিকবধূরা দুবেলা মুঠো মুঠো খাচ্ছে। মহিমাময়ের এক বন্ধু তাকে ঐ ট্যাবলেট খেতে বলল। ট্যাবলেট কিনতে গিয়ে মহিমাময় ফিরে এল। এক শিশি একশ আশি টাকা। এর ডবল পরিমাণ পানীয়ের পাঁইটের দাম বড়জোর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা। এ ঔষুধ খেতে গেলে এমনিই রোগা হয়ে যাবে, কারণ তাহলে মদ বা খাবারের পয়সা আর জুটবে না। এ ব্যবস্থা মহিমাময়ের পছন্দ হল না।

আর তাছাড়া মহিমাময় মনে মনে জানে যে ওষুধ-ফষুধে কিছু হবে না। পান-ভোজন না কমালে কোন গতি নেই।

জয়দেবের সঙ্গে একদিন এ নিয়ে আলোচনা করছিল সে। জয়দেবের ওপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে, যতই খাক সে তার গায়ে গত্তি লাগে না। এই চুয়ান্ন বছর বয়েসেও সে বাইশ বছরের ছিপছিপে চেহারা রাখতে পেরেছে। অথচ সে মহিমাময়ের চেয়ে পানভোজন কম তো করেই না, বরং যথেষ্টই বেশি করে।

জয়দেবই পান করতে মহিমাময়কে পরামর্শটা দিল। সে বলল, 'দ্যাখ মহিমা, আমার শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের আগুন আছে। ভালমন্দ যা খাই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। তোর তো আর সে ক্ষমতা নেই। তোকে খাওয়া বন্ধ করতে হবে আর এ জিনিষটাও।' বলে নিজের গেলাসটা আদর করে আলতো করে ছুঁলো।

মহিমাময় করুণ মুখে বলল, 'কিন্তু কি করে বন্ধ করব? অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারলাম না।'

জয়দেবের বেশ নেশা হয়েছিল, এক চোখ টিপে চালাকের মত মুখ করে বলল, 'আমার কাছে বুদ্ধি আছে, খুব ভাল বুদ্ধি।'

মহিমাময়েরও যথেষ্ট নেশা হয়েছিল। আজ শনিবার। পার্ক স্ট্রীটের শেষপ্রান্তের এই বারটায়, প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায়, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক, দাঙ্গা বা গোলমাল যাই হোক জয়দেব আর মহিমাময় দুজনেই চেষ্টা করে আসতে, বহুদিনের অভ্যেস। অবশ্য মহিমাময় কখনো কখনো জয়দেবকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, নানা কারণে, তখন যোগাযোগটা বাদ পড়ে।

সে সব পুরনো কথা। আজ জয়দেবের কথা শুনে মহিমাময় ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল, জয়দেবের কাছে কি বুদ্ধি আছে কে জানে। কুড়ি বছর আগে জয়দেবের পরামর্শে এবং উস্কানিতে মহিমাময় এক পুলিসের জমাদারকে পেছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল, তার বিষময় পরিণাম এখনও তার মনে আছে।

তারও আগে আরেকবার জয়দেব তাকে হোমিওপ্যাথিক গুলি সাইজের কালো মতন বড়ি কাগজে মুড়ে এনে একদিন দেয়, বলে, 'খেয়ে দ্যাখ। বুদ্ধি তাজা হবে।' সরল বিশ্বাসে মহিমাময় সেই বড়ি একবার খেল। তখন জয়দেব বলল, 'আরেকটু খা।'

মহিমাময় আরও একটু খেয়ে বলল, 'কেমন, মরা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত মনে হচ্ছে।'

জয়দেব টেবিল চাপরিয়ে বলেছিল, 'এই তো, বেশ বুঝতে পারছিস। বুদ্ধি খুলছে। ঠিক ধরতে পেরেছিস। মরা ডেঁয়ো পিঁপড়েই এগুলো।

মহিমাময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জয়দেব সব অনুমান করতে পারল, বলল, 'এত ভয় খাচ্ছিস কেন! এবার খুব সোজা বুদ্ধি দেব—জলের মত সোজা।'

মহিমাময় বলল, 'কি বুদ্ধি?'

জয়দেব গম্ভীর মুখে বলল, 'সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে অল্প একটু জলখাবার খেয়ে তারপর দুটো ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বি। ঘুম ভাঙবে সেই রাত কাবার হয়ে। রাতের বেলা পানভোজন আর কিছু দরকার হবে না।'

জয়দেবের উপদেশ তখনকার মত হেসে উড়িয়ে দিলেও, পরের দিন সকালবেলা ঠাণ্ডা মাথায় পার্কে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাপারটা খুব ভাল করে ভেবে দেখল মহিমাময়। মাতালের পরামর্শ বটে কিন্তু ঠিক ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না।

সত্যিই তো, মেদবৃদ্ধির পথে সবচেয়ে গোলমেলে ঐ সন্ধ্যাবেলার কয়েক ঘণ্টা। সারাদিন কষ্ট করে তারপর তখনই ধুম পড়ে খাওয়া-দাওয়ার। খাওয়া আর দাওয়া দুইয়ে মিলে ডুবিয়ে আপ্রভাত ত্যাগ ও পরিশ্রম।

তবে ঘুমের ওষুধ কেনা সোজা কাজ নয়। প্রেসক্রিপশন লাগবে। ডাক্তারখানা অনেকের কাছে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ঘুমের বড়ি বেচে, কিন্তু মহিমাময়ের চেহারা বা হাবভাবে বোধহয় সম্ভাবনাপূর্ণ আত্মহত্যাকারীর আদল আছে। সে দোকানে গিয়ে ঘুমের ওষুধ চাইলেই দোকানকর্মচারীরা গলা নামিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস কি সব আলোচনা করে, তার দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে, তারপর বলে, 'এখন হবে না। স্টক নেই।'

অবশেষে পাড়ার ডাক্তারের কাছে গেল মহিমাময়। আসল কথা না বলে তাঁকে বলল, 'ডাক্তারবাবু, রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না। আমাকে একটু ঘুমের ওষুধ দিন।'

সদাশয় ডাক্তারবাবু মহিমাময়কে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার অপকারিতা এবং অপ্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিলেন, তারপর হজমের ওষুধের একটা প্রেসক্রিপশন দিয়ে বললেন, 'এটা খান। হজম ভাল হলেই ঘুম ভাল হবে। সাবধান, ঘুমের ওষুধ খাবেন না।'

দশটাকা ভিজিটটা জলে গেল। ডাক্তারের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে প্রেসক্রিপশনটা কুচি কুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল মহিমাময়। হজমের ওষুধ না খেয়েই এই স্বাস্থ্য, হজমের ওষুধ খেলে তো শরীরের মেদসমুদ্র আরো উথাল-পাতাল হয়ে উঠবে। এখন তবুও ঘাড়ে মাথা আছে, তখন ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে যাবে।

সেই সপ্তাহের শনিবার সন্ধ্যায় জয়দেবকে তার সমস্যার কথা বলল মহিমাময়। প্রথমে জয়দেবের মোটেই মনে ছিল না, সে প্রশ্ন করল, 'ঘুমের ওষুধ দিয়ে কি করবি?' তারপর উত্তর পাওয়ার আগেই পরামর্শ দিল, 'বেশি করে মদ খাবি, তাহলেই ঘুমের ওষুধ লাগবে না। বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়বি।'

এবার মহিমাময় আগের সপ্তাহের কথাবার্তা মনে করিয়ে দিতে জয়দেবের মনে পড়ল। সে বলল, 'কি বলছিস, ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিল না?' তারপর টেবিল থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাশের ফার্মেসি থেকে দশটা ঘুমের বড়ি এনে মহিমাময়কে দিয়ে বলল, 'যে কোন দোকানে গিয়ে চাইলেই পেতিস, ডাক্তারের কাছে গেলি কেন?'

মহিমাময় জয়দেবকে এ কথা আর বলল না যে ডাক্তারখানায় তাকে ঘুমের ওষুধ দিতে চায়নি। জয়দেব একটু পরে বলল, 'নেশা করে কখনো ঘুমের ওষুধ খাবি না। হঠাৎ বিপদ হতে পারে।'

ওষুধটা বুকপকেটে রাখতে রাখতে মহিমাময় ভাবল, নেশা করে ঘুমের ওষুধ খেতে যাব কেন, নেশা না করার জন্যেই ঘুমের ওষুধ খাব।

পরের দিনই মহিমাময় ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখল। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় যখন কারণবাড়ির জন্যে জিব শুকিয়ে এসেছে মহিমাময় দুটো ঘুমের ট্যাবলেট এক গেলাস জল দিয়ে খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বৌকে বলে গেল, ' আজ থেকে রাতে খাব না, ঘুম থেকে ডেকে তুলো না।'

এবং সত্যিসত্যিই রাত আটটার মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে।

ঘুম ভাঙল সেই রাত তিনটেয়। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, দুচোখে তখন কেমন একটা ভারি-ভারি, ঘুম-ঘুম ভাব, সারা শরীরে জড়তা। কোনোরকমে ঘুম থেকে উঠে বাথরুম হয়ে খাওয়ার ঘরে গেল সে। গিয়ে দেখল সতীসাধ্বী সহধর্মিণী রাতে খেতে ডাকেনি বটে, কিন্তু রাতের খাবার টেবিলে একটা বড় থালা দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

খাবার দেখে মহিমাময় প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, যা কিছু ছিল সব গোগ্রাসে খেয়ে নিল। তারপর দু গেলাস জল ঢক ঢক করে খেল। তবুও কেমন খালি-খালি, একটা অপূর্ণ ভাব, তার মনের মধ্যে কিসের জন্যে কেমন একটা আকুলি-বিকুলি।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর সদ্য অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন অন্ধকার সবচেয়ে গাঢ়। খাওয়ার ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকাল মহিমাময়, দু-এক টুকরো ছেঁড়া মেঘ তারই ফাঁকে ফাঁকে তারাগুলো জ্বল জ্বলে। কিছুক্ষণ আগে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে। এখনো জলের ফোঁটার ক্ষীণ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে জোলো গন্ধ। মোড়ের মাথায় পুরনো শিমূলগাছটায় কি একটা খুব কর্কশ চেঁচাচ্ছে।

ঢং ঢং করে রাস্তা দিয়ে একটা রিকশ চলে গেল। নিশ্চয়ই কোন লেট মাতাল বাড়ি ফিরছে।

মহিমাময়ের মনের মধ্যে কেমন যেন আরও বেড়ে গেল আকুলি-বিকুলি। সে ধীরপায়ে উঠে সন্তর্পণে বৌকে না জাগিয়ে শোয়ার ঘরের আলমারির পিছন থেকে পানীয়ের বোতলটা বের করে আনল, প্রায় আধ বোতল আছে। ফ্রিজ থেকে খাওয়ার জল বের করে খাওয়ার টেবিলে বসল। তারপর একটু ভাবল, মদ খেয়ে ঘুমের ওষুধ খাওয়া নিষেধ, কিন্তু ঘুমের ওষুধ খেয়েও কি মদ খাওয়া নিষেধ!

তারপর আর ভাবল না।

সকালবেলা মহিমাময়ের বৌ ঘুম থেকে উঠে দেখল স্বামী খাওয়ার টেবিলে হাত মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশে শূন্য বোতল, শূন্য গেলাস।

জয়দেবের জীবনযাত্রা

রাত পৌনে দশটার সময় এল জয়দেব। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় হাল্কা জল জমেছে। দুদিন ভরা গুমোটের পর আজ একটু বৃষ্টি হল। তবে আরও বোধহয় হবে, আকাশে মেঘ থমথম করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাতাসও বেশ জোরালো।

এক পশলা বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমেছে, রাতে যদি আরও বৃষ্টি হয় কাল সকালে রাস্তায় অনেক জল থাকবে, দুধ আনা, বাজার করা—কাল সকালের হাঙ্গামাগুলো ভাবতে লাগলেন মহিমাময়।

গুমোট কেটে গিয়ে জোলো বাতাসে একটা আরামের ভাব। সেইসঙ্গে কাল সকালের চিন্তা—জয়দেবের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন মহিমাময়।

দুপুরে অফিসে এসেছিলেন জয়দেব। চোখ লাল, এলোমেলো চুল, হাত পা টলমল, ভর দুপুরেই নেশা করেছেন। এসে দাঁড়ান নি, বিশেষ বিরক্তও করেন নি, শুধু বলেছিলেন, 'কাজের কথা আছে। এখন হবে না, সন্ধ্যাবেলায় বাসায় থাকিস, যাব।'

তা জয়দেব বলুন আর না বলুন, সন্ধ্যাবেলা মহিমাময় এমনিতেই কোথাও যান না। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাসায় চলে আসেন, বাসায়ই থাকেন।

আজও বাসায়ই ছিলেন মহিমাময়। জয়দেব আসবে বলেছে, সাধারণত নেশার মধ্যে কেউ কিছু বললে, যতক্ষণ নেশার ঘোর মাথার মধ্যে থাকে কথাটা তার মাথায় থাকে। সুতরাং জয়দেবেরও থাকতে পারে, এরকম একটা আশংকা সন্ধ্যা থেকেই মহিমাময় করছিলেন। কাজের কথা না কি বলবে জয়দেব, সেটা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তার পুরনো বন্ধু আসবে বলেছে, আসুক।

আলমারির পেছনে কয়েকটা আধ-খাওয়া মদের বোতল আছে। ধুলো ঝেড়ে সেগুলো বার করেছেন মহিমাময়, মদ পচে যায় না বরং যত পুরনো হয় ততই তার স্বাদ বাড়ে, জোর বাড়ে।

আগে মহিমাময় মদ খেতেন প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যাবেলা বাসায় বসে একা একা। এখন আর খুব একটা খান না। সন্ধ্যাবেলা খুব খিদে পায়। অফিস থেকে ফিরে তাই তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে নেন। তারপর আর মদ খেতে ইচ্ছে করে না, আর তাছাড়া ভরপেট খেলেই মহিমাময়ের ঘুম পায়। তিনি শুয়ে পড়েন এবং ঘুমিয়ে পড়েন।

আজ জয়দেব আসবে বলে খুঁজে খুঁজে আলমারির পিছন থেকে তিনটে বোতল বেরিয়েছে। একটার মধ্যে অল্প একটু জিন আছে, সেটা রাতের বেলায় চলবে না। মদ ব্যাপারটা ফুলের ঠিক উলটো। কথাটা কোথায় যেন শুনেছিলেন মহিমাময় সাদা ফুল ফোটে রাতের বেলায় আর দিনের বেলায় রঙীন ফুল। কিন্তু মদের বেলায় দিনে সাদা মদ, জিন, ভদকা ইত্যাদি, আর রাতে রঙীন মদ হুইস্কি, রাম, ব্র্যাণ্ডি। এটাই হলো নিয়ম। এ নিয়ম যে মানতেই হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু মোটামুটি সবরকম মদ্যপই এই নিয়মটা মান্য করে। কেন করে কে জানে?

সে যা হোক, মহিমাময় জিনের বোতলটা আবার আলমারির পিছনে রেখে দিলেন। বাকি

দুটো বোতলের একটায় সামান্য পরিমাণ রাম হয়েছে, প্রায় তলানিই বলা চলে, এক ঢোকের বেশি হবে না। তবে দ্বিতীয় বোতলটায় হুইস্কি বেশ কিছুটা আছে।

টেবিলের নিচে চেয়ারে পায়ের কাছে বোতল দুটো রেখে বাইরের ঘরে বসে জয়দেবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মহিমাময়। জয়দেবের অবশ্য আসার কোন ঠিকঠিকানা নেই, রাত দেড়টা এমন কি ভোর চারটেতেও আসতে পারে। সন্ধ্যা থেকে প্রতীক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন মহিমাময়। সাড়ে আটটা নাগাদ প্রতিদিনের মত খিদেটা যখন জোর পেয়ে বসল তখন তিনি খিদের বদলে তৃষ্ণা নিবারণের দিকে জোর নিলেন। প্রথমে এক ঢোকে রামের তলানিটুকু নিট গিলে ফেললেন। অনেকদিন খান নি, একটা বড় হেঁচকি উঠল, তারপব কিছুটা বাদে ক্রমাগত হেঁচকির পর হেঁচকি, বিলম্বিত লয়ে হেঁচকি শুরু হল।

প্রথমে দু-চার গেলাস জল খেয়ে হেঁচকি কাটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করার পর হুইস্কির বোতলটা খুললেন মহিমাময়। ইচ্ছে ছিল না খেতে, জয়দেব আসবে, তাকে কি শুকনো মুখে বসিয়ে রাখবেন? খাওয়া আরম্ভ করলে মহিমাময় খুব তাড়াতাড়ি খান, এখনই ফুরিয়ে যাবে সামান্য পানীয়টুকু।

তাই ফুরলো, ন'টা পঁচিশ নাগাদ শেষ বিন্দুটুকু গলাধঃকরণ করে যখন হেঁচকিব টানটা সবে ছেড়েছে আর একটা গুমভাব এসেছে মনের মধ্যে সেই সময় জয়দেব এলেন। জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে এল জোর বৃষ্টি। মহিমাময়ের বাড়িটা রাস্তার উপরে, একতলায় তিন কোণাচে বাইরের ঘরটা। নেশা করলে জয়দেব রিক্সায় যাতাযাত করেন। একলাফে বৃষ্টি বাঁচিয়ে জয়দেব রিক্সা থেকে সরাসরি বাইরের ঘরে ঢুকলেন।

নেশা আবম্ভ করার প্রথম দিকে যেটুকু মাথা ঘোরে কিংবা পা টলে জয়দেবের, তারপর তিনি যত খান বেহুঁশ না হওয়া পর্যন্ত স্টেডি থাকেন। সেই স্টেডি ভাবটা এখন জয়দেবেব মধ্যে এসেছে। জয়দেবকে লাফ দিতে দেখে মহিমাময়ের ভয় হয়েছিল ছিটকিয়ে পড়ে-টড়ে গিয়ে জখম না হয়। এ রকম জখম হওয়া জয়দেবের পুরনো অভ্যেস। কিন্তু এখন জয়দেব সত্যিই স্টেডি।

ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনের চেয়ারে বন্ধুর মুখোমুখি বসলেন জয়দেব। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, নেই কিছু?'

মহিমাময় এ প্রশ্নে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, 'তুই এত দেরি করলি! সামান্য একটু ছিল, তোর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে শেষে আমি নিজেই খেয়ে ফেললাম।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'একটু জিন আছে, খাবি?'

জয়দেব ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, 'জিন? জিন আবার ভদ্রলোকে খায় নাকি? তোর পাল্লায় যখন পড়েছি' সন্ধ্যাবেলা বাসায় আসতে বললি অথচ কিছু বন্দোবস্ত রাখিস নি!'

মহিমাময় বলতে যাচ্ছিলেন; আমি তো তোকে আসতে বলিনি। তুইই আসতে চেয়েছিস। তা না বলে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে আলমারির পিছন থেকে জিনের বোতলটা বার করে নিয়ে এলেন।

বোতলটার মধ্যে পানীয়ের পরিমাণ স্বল্প। বড়জোর চারভাগের এক ভাগ হবে। তবে একজনের পক্ষে সেটা কম নয়। একে জিন, তারপরে সিকি বোতল—মহিমাময়ের এ রকম

ব্যবহারে জয়দেব উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এসব চলবে না। পঞ্চাশটা টাকা বার কর, রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে একটা ছোট হুইস্কি আনাই।'

মহিমাময় এরকম অবস্থার জন্য মোটামুটি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে রিক্সাওয়ালা কোথায় যাবে, এত রাতে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, কোথায় পাবে মদ, তাছাড়া পঞ্চাশ টাকাও কম কথা নয়!

মহিমাময় জয়দেবকে বললেন, 'পঞ্চাশটা টাকা যে দেব, তোর রিক্সাওয়ালাকে বিশ্বাস কি?'

মহিমাময়ের অবিশ্বাসী প্রশ্নে জয়দেবের আঁতে ঘা লাগল। জয়দেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দ্যাখ্ মহিমা, তুই বড় নীচ। রিক্সা চালায় বলে, গরীব বলে চুরি করবে? মদের টাকা মেরে দেবে?'

মহিমাময় গম্ভীর হলেন। বললেন, 'এই রিক্সার লোকটাকে চিনিস? নাম জানিস?'

সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, রিক্সাওয়ালার প্রসঙ্গ তাঁর বোধহয় সহ্য হল না। মহিমাময়ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন' যাক খুব সহজে আপদ গেছে।

কিন্তু আপদ এত সহজে যাওয়ার নয়, দু মিনিটের মধ্যে জয়দেব ফিরলেন সঙ্গে রিক্সাওয়ালা। তাকে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। রিক্সাওয়ালাকে মহিমাময়ের টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে জয়দেব বললেন, 'মহিমা, ভালো করে দ্যাখ লোকটাকে। বিবেল থেকে আমার সঙ্গে আছে। এর চেহারার মধ্যে একটা অনেস্টি রয়েছে। তোর মতো চোর-চোর চেহারা নয়। আমি একবার দেখেই লোক চিনতে পারি। পঞ্চাশ, শুধু পঞ্চাশ কেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও এরকম লোককে বিশ্বাস করা যায়।'

হাঁটুর ওপরে তোলা খাটো ময়লা ধুতি, খালি গা, কোমরে ঘন্টি, দেহাতি লোকটিও বোধহয় জয়দেবের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে বেশ নেশা করেছে, সে হাসিহাসি মুখে মহিমাময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মহিমাময় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?'

'সুখের বিষয় লোকটি বাংলা বোঝে, বোধহয় অনেকদিন কলকাতায় আছে, সে বলল,' 'হুজৌর, মেরা নাম ঠকাই, ঠকাই সিং।'

নাম শুনে মহিমাময় আতংকিত বোধ করলেন, লোকটিকে বললেন, 'তুমি বাইরে দাঁড়াও।' লোকটি বেরিয়ে যেতে জয়দেবকে বললেন, 'দ্যাখ, জয়, আমি আর যাই করি এই এত রাতে ঠকাই নামে এরকম একটা লোককে পঞ্চাশ টাকা দিযে বিশ্বাস করতে পারি না।'

এবার জয়দেব ক্ষেপে গেলেন, উত্তেজিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ে চেয়ারের ওপর বাঁ পাটা তুলে দিলেন, তারপর ধীরে ধীরে প্যান্টের ঝুলটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে তুললেন। চাপা প্যান্ট নয়, আধুনিক ফ্যাশানের ঢোলা প্যান্ট, তাই বিশেষ অসুবিধা হল না। প্যান্ট তুলতে দেখা গেল হাঁটুর কিছু নিচে পায়ের সঙ্গে মোটা রবারের গার্ডার দিয়ে একটা একশো টাকার আর একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাঁধা।

একশো টাকার নোট যথাস্থানে রেখে, পঞ্চাশ টাকার নোটটা গার্ডার থেকে খুলে বার করে প্যান্টটা আবার নামিয়ে দিলেন জয়দেব, মুখে গজগজ করতে লাগলেন, 'দিনরাত মাতালদের সঙ্গে ওঠাবসা, ভদ্রলোকের মতো পকেটে টাকা রাখার জো আছে!' গজগজ করতে করতে কটমট করে তাকাতে লাগলেন মহিমাময়ের দিকে।

এদিকে মহিমাময়ের ঠকাই সম্পর্কে আশংকা কিন্তু ঠিক মিলল না। দশ টাকা বখশিশের

প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও ঠকাই এত রাতে এত বৃষ্টিতে মদ আনতে যেতে রাজি হল না। তাছাড়া সে বলল, এসব খারাপ জিনিস কোথায় পাওয়া যায়, সে সব সে কিছু জানে না। আজ এই বড়বাবুর পাল্লায় পড়ে জীবনে প্রথম নেশা করেছে। সে অত্যন্ত সাধু লোক, দৈনিক হনুমান পুজো করে, খৈনি-বিড়ি পর্যন্ত খায় না।

অতঃপর বাধ্য হয়ে জয়দেব নিজেই বেরোতে গেলেন, কিন্তু বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে, বেরনোর সাহস করলেন না। একটু নরম হয়ে মহিমাময়কে বললেন, 'তা হলে দে—জিনটুকু দে, ওটাই খেয়ে নিই।'

মহিমাময় বন্ধুকে একটু বেশি করে এবং নিজে একটু কম করে জিন নিয়ে দুটো গেলাসে জল ঢেলে নিলেন। আস্তে আস্তে জয়দেবের মন খুশি হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি ধরে এসেছে, জিনও শেষ। চুপচাপ দুজনে পান শেষ করেছেন। এবার জয়দেব উঠলেন, বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে, এগারটা বাজে। বৃষ্টিটা থেমেছে, এই ফাঁকে যাই।'

বেরনোর মুখে জয়দেবকে মহিমাময় প্রশ্ন করলেন, 'কি একটা কাজের কথা আছে বলেছিলি?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়দেব বললেন, 'ভাল কথা, মনে করেছিস। আসল কাজটাই ভুলে গিয়েছিলাম। কাল তো আমাদের বিবাহবার্ষিকী। তোরা রাতে আমাদের ওখানে খাবি।'

মহিমাময়ের স্ত্রী ভিতরের ঘরে আনাগোনা করছিলেন। জয়দেবের নিমন্ত্রণ শুনে বাইরের ঘরে এসে বললেন, 'গতবারের মতো হবে না তো?'

গতবারের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। বেশি বর্ণনা না করে সংক্ষেপে বলা যায় গতবার নিমন্ত্রণ করে নিমন্ত্রণকর্তা জয়দেব নিজেই নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা, রাত বারোটা পর্যন্ত জয়দেবের জন্যে অপেক্ষা করে সকলে ফিরে আসে।

মহিমাময়ের স্ত্রীর প্রশ্নে জয়দেব বললেন, 'আরে' না না। লজ্জা দেবেন না। আপনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখন সোজা বাড়ি যাব। কাল আর বাড়ি থেকে বেরবো না।'

মহিমাময় বললেন, 'বাড়ি থেকে বেরবি না? তবে খাওয়াবি যে বাজার করবি না?'

জয়দেব বললেন, 'হবে তো খিচুড়ি-মাংস আর আনারসের চাটনি। মাংস পাড়াতেই পাওয়া যাবে। আর আনারসটা বৌ একসময়ে নিউমার্কেটে গিয়ে নিয়ে আসবে।'

মহিমাময় মৃদু আপত্তি করলেন। 'ঐ মাংস-খিচুরিই যথেষ্ট। আমি এক বোতল হুইস্কি নিয়ে যাব। বৌদিকে নিউ মার্কেটে গিয়ে আনারস কিনতে হবে না। আর এখন আনারসের খুব দাম, বাজারে ভালো করে ওঠেই নি।'

'খুব দাম' কথা দুটো জয়দেবের কানে খট করে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া হলো, তিনি ঘরের মধ্যে দু পা এগিয়ে এসে অভিযোগের ভঙ্গিতে বললেন, 'খুব দাম? আমি মদ খেয়ে পয়সা নষ্ট করি বলে তোরা ভাবিস আমার আনারস কেনারও ক্ষমতা নেই?'

মহিমাময় জয়দেবকে অনন্তকাল ধরে জানেন, তিনি জানেন, এখন জয়দেবের সঙ্গে তর্কে প্রবেশ করা বোকামি। তাই সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, 'না না, আনারসের চাটনি তাহলে করবি। এতে আপত্তির কিছু নেই। ভালোই হবে।'

জবাব শুনে জয়দেব বেরিয়ে গেলেন, ঠকাইয়ের রিক্সায় উঠে হাত তুলে 'গুডনাইট' বলে চলে গেলেন। ধীরে ধীরে রিক্সার টুং টুং শব্দ গলির মোড়ে মিলিয়ে গেল।

আধ-ঘণ্টা-খানেক বাদে সবে খাওয়া দাওয়া সেরে মহিমাময় শুতে যাবেন এমন সময় গলির মোড় থেকে একটা রিক্সার টুং টুং শব্দ এগিয়ে এসে মহিমাময়ের সদর দরজার সামনে থামল। কড়া নাড়তে দরজা খুলে মহিমাময় দেখলেন জয়দেব।

মহিমাময়কে দেখে জয়দেব বললেন, 'প্রায় বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। ঠিক করে বল তো' আনারসের চাটনি করব কি করব না।'

মহিমাময় বললেন, 'সে তো আগেই বলে দিলাম। অসুবিধা যদি না হয়' 'আনারসের চাটনি হলে তো ভালোই।'

জয়দেব আহত হলেন, সুবিধা অসুবিধার কথা আসছে কোথায়? ঠিক করে বল আনারসের চাটনি করব কি করব না।

কথা না বাড়িয়ে মহিমাময় বললেন, আনারসের চাটনি করবি।

জয়দেব আবার সেই ঠকাইয়ের রিক্সায় উঠে চলে গেলেন। এবার দরজা বন্ধ করে মহিমাময় শুতে গেলেন। একতলাতেই পাশের ঘরে শোবার ঘর। রাস্তার ধারে মাথার কাছে জানলা। রাতে সে জানলাটা বন্ধ করে শোন মহিমাময়।

তখন আবছাতন্দ্রা মতো ঘুম এসেছে মহিমাময়ের। পাশে স্ত্রী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, হঠাৎ রিক্সার টুং টুং এবং জানলায় ঠকঠক শুনে মহিমাময় জানলাটা একটু ফাঁক করলেন, আবার জয়দেব এসেছেন' জানলার নিচে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বোধহয় কাছেপিঠে কোথাও একটা চোলাইয়ের আড্ডা পেয়েছে, সেখান থেকেই ঘুরেফিরে আসছে।

জানলার ওপাশে অন্ধকারে মহিমাময়ের আবছা মুখটা দেখে জয়দেব জানতে চাইলেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত কথাটা কি ঠিক হল? আনারসের চাটনি হবে কি হবে না?

ঘুম-চোখে মহিমাময় বললেন, 'আর জ্বালাস নে জয়দেব। আনারসের চাটনি হবে, হবে, হবে।' আবার রিক্সায় উঠে জয়দেব বিদায় নিলেন। কিন্তু পুরোপুরি বিদায় নয়। তিরিশ-চল্লিশ মিনিট পরপর ঐ ঠকাইয়ের রিক্সায় চড়ে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগলেন, সঙ্গে ঐ একই জিজ্ঞাসা, আনারসের চাটনি হবে কি হবে না?

রাত দুটো-আড়াইটা নাগাদ ব্যাপারটার একটা প্যাটার্ন দাঁড়িয়ে গেল। মহিমাময় আর জানলা বন্ধ করছেন না, জয়দেবও আর রিক্সা থেকে নামছেন না। জানলার কাছে এসে ঠকাই ঘণ্টা টুং টুং করছে, রিক্সা না নামিয়ে উঁচু করে ধরে রেখেছে সে, সেখানে হেলান দিয়ে বসে আছেন জয়দেব। টুং টুং শব্দ শুনে দু পাশ থেকে দুই বন্ধুতে প্রশ্নোত্তর হচ্ছে। ক্রমশ প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। জয়দেব প্রশ্ন করছেন, 'আনারস...?' মহিমাময় উত্তর দিচ্ছেন, 'হবে।'

সকাল সাড়ে চারটে নাগাদ সামান্য পটপরিবর্তন হলো। রিক্সার টুং টুং শব্দ শুনে যথারীতি বিছানায় উঠে বসে মহিমাময় অবাক হয়ে দেখলেন, রিক্সার সিটে ঠকাই বসে রয়েছে আর রিক্সাটা চালাচ্ছেন জয়দেব। এখন অবশ্য চালাচ্ছেন না, দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তবে হাতের ঘণ্টিটা খুব টুং টুং করে যাচ্ছেন।

মহিমাময়কে বিছানার ওপরে উঠে বসতে দেখে ঠকাই দাঁত বার করে হাসল, তারপর দেহাতি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'আনারসকা চাটনি হোগা কি নেহি হোগা?'

হতভম্ব মহিমাময় কি জবাব দেবেন বুঝতে পারছিলেন না। এর মধ্যে একটা অন্য রকম

কাণ্ড ঘটল। ক্লান্তির জন্যেই হোক অথবা অনভ্যাসের জন্যেই হোক রিক্সার হাতলটা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন জয়দেব। রিক্সাটা উলটে দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঠকাই। তার বিশেষ কিছু হয় নি। সে তাড়াতাড়ি ধুলো ঝেড়ে নিয়ে রিক্সাটা সোজা করে নিয়ে জয়দেবকে ফেলেই দৌড়ে রওনা হল। জয়দেব পিছু পিছু চেঁচাতে লাগলেন, 'এই ঠকাই । দাঁড়া, দাঁড়া, তোর ভাড়া নিয়ে যা।'

ঠকাই আর দাঁড়ায়! সে তখন রীতিমত ছুট লাগিয়েছে। তার পেছনে ছুট লাগাতে লাগাতে জয়দেব একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে জানলার ওপ্রান্তে বিছানার উপর বসে থাকা বিস্ময়বিমূঢ় মহিমাময়কে বললেন, 'এখনো শেষবারের মত অন্তত বলে দে মহিমা, আনারসের চাটনি হবে কি হবে না?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে ঠকাইয়ের রিক্সার পেছনে প্রাণপণ দৌড় দিলেন জয়দেব।

মহিমাময় বিছানায় বসে বসে ভাবতে লাগলেন, তাহলে আনারসের চাটনি হবে কি হবে না?

একদিন রাত্রে

আজ সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শীতের প্যাঁচালো বৃষ্টি। সেই সঙ্গে যথারীতি উত্তুরে হাওয়া। ঠাণ্ডাও পড়েছে খুব। অনেকদিন কলকাতা শহরে এরকম জমাট ভাব, ভারী ঠাণ্ডা দেখা যায় নি।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেলো, বৃষ্টি থামবার কোনো নামগন্ধ নেই। যদি জোরে দু-চার পশলা হয়ে যেতো তবে সে ছিলো মন্দের ভালো, হয়তো মেঘটা কেটে যেতো। কিন্তু আকাশ ঘন হয়ে শীতের রাতের অন্ধকার নেমে এলো, টিপটিপ করে বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে লোডশেডিং, আজ সারাদিন ধরেই বিদ্যুৎবিভ্রাট হচ্ছে। অথচ কাগজে কোলাঘাট-ব্যান্ডেলের কোনো গোলমালের খবর নেই, কি জানি, হয়তো ঠাণ্ডার জন্যেই বিদ্যুতের বাবুরা কাজে আসেনি, বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লোকের অভাব হয়েছে।

সে যা হোক, এ সব অবান্তর চিন্তা। জয়দেব বলেছিলেন, ঠিক পাঁচটার সময় আসবেন। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। সওদাগরি অফিস মহিমাময়ের, ঐ ঠিক পাঁচটাতেই ছুটি হয়। দশটা-পাঁচটা—ইংরেজ আমলের সেই পুরনো রুটিন এখনো বদল হয় নি।

পাঁচটা থেকে জয়দেবের জন্যে মহিমাময় বসে আছেন। এই বৃষ্টির দুর্দিনে বিকেল-বিকেলই অফিস ফাঁকা হয়ে গিয়েছিলো, এখন ছুটির পরে প্রায় কেউই নেই। শুধু বড়সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে। আর ওখানে বড়সাহেবের কাছে বোধ হয় কোনো ভিজিটর এসেছে। আর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুচারজন দারোয়ান, চাপরাসী রয়েছে। ওরা এ অফিসেরই কেয়ারটেকারের স্টাফ, অফিসেরই একতলায় থাকে।

এ ছাড়া এক প্রান্তে অপেক্ষা করছেন নরহরিবাবু। বিপত্নীক, প্রৌঢ় এবং এই অফিসের বড়বাবু। অফিসের মধ্যে নরহরিবাবুর পোষা নিজস্ব একটা হুলো বেড়াল আছে, সাদা-কালো শরীর, মোটা মাথা, বেড়ালটার নরহরিবাবুর প্রদত্ত নাম কালাহরি। কালাহরিটা এক নম্বরের শয়তান, পাকা চোর। এই পরশুদিনই একটা ফিস কাটলেট টিফিনের সময় প্লেটে টেবিলের উপর রেখে বারান্দায় কলে হাত ধুতে গিয়েছিলেন মহিমাময়, কালাহরি সেটা নিয়ে চম্পট দেয়।

এসব কথা অবশ্য নরহরিবাবুকে বলা চলবে না। কালাহরি অন্ত-প্রাণ তাঁর। বৃষ্টির মধ্যে এই ঠাণ্ডায় হুলোটা কোথায় বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি। প্রতিদিন অফিস থেকে বেরোনোর সময় নরহরিবাবু কালাহরিকে চারটে মিল্ক বিস্কুট খাইয়ে যান। আজ কালাহরি আসছে না বলে তিনি বেরোতে পারছেন না, এখন ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে অধীর প্রতীক্ষা করছেন হুলো বেড়ালটার জন্যে।

জয়দেব হুলো বেড়াল নয়, একটা আস্ত মানুষ। মহিমাময় ঘড়িতে দেখলেন, কাঁটা প্রায় ছটার কাছে পৌঁছেছে। উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের জানলায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, রীতিমত অন্ধকার, লোডশেডিং এখনো চলছে, তার মধ্যে বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ আসছে।

এ অফিসটায় একটা জেনারেটর আছে তাই রক্ষা, অন্ধকারে ঘুপচি মেরে জয়দেবের জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। কিন্তু আর নয়, ছটা বেজে যাওয়ার পরে মহিমাময় আর এক মুহূর্তও জয়দেবের জন্যে অপেক্ষা করবেন না।

দুপুরে আড়াইটা নাগাদ মহিমাময় টিফিন করতে বেরিয়ে এক পাইট বাংলা দু নম্বর খেয়ে এসেছিলেন। সবদিন এটা করেন না, কিন্তু আজ জয়দেব আসবেন, দুজনের সারা সন্ধ্যার প্রোগ্রাম, তাই টেম্পোটা একটু তুলে রাখতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া জয়দেবের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে একটু তৈরি হয়ে থাকতে হয়।

দুপুর আড়াইটার সে নেশা কখন কেটে গেছে। জয়দেব সত্যিই আসছেন না। মিনিট কয়েক আগে কালাহরি এসে নরহরিবাবুর হাত থেকে বিস্কুট খেয়ে নরহরিবাবুকে ভারমুক্ত করে গেছে। এবার টেবিল গুছিয়ে নরহরিবাবুও রওনা হলেন। মহিমাময় ঠিক করলেন তিনিও উঠবেন, আর অপেক্ষা করা যায় না।

যাওয়ার পথে নরহরিবাবু একবার মহিমাময়ের টেবিলের পাশে এলেন। মহিমাময় ভাবলেন, বোধহয় বড়বাবু কোনো দরকারী কাজের কথা বলবেন। কিন্তু বড়বাবু যা বললেন তা শুনে মহিমাময় বিস্মিত হয়ে গেলেন।

জয়দেবকে বিশ্বসংসারে চেনে না এমন লোক নেই। এ অফিসেও মহিমাময়ের বন্ধু হিসেবে তাঁকে সবাই চেনে, নরহরিবাবুও চেনেন। নরহরিবাবু অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আপনার বন্ধু জয়দেববাবু বড়সাহেবের ঘরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

বড়সাহেবকে জয়দেব কি করে চিনলো, কবে কোথায় আলাপ হলো? তা ছাড়া তাঁর কাছে তাঁর অফিসে এসে, তাঁর ঘরে না গিয়ে, তাঁকে কিছু না জানিয়ে বড়সাহেবের ঘরে জয়দেব—মহিমাময় ব্যাপারটা ঠিক হিসেবে মেলাতে পারলেন না। তবে জয়দেবের কটা ব্যাপারই বা মহিমাময় বা অন্য কেউ কোনোদিন মেলাতে বা বুঝতে পেরেছেন!

সে যা হোক, এখন সমস্যা দুটো। জয়দেব ঠিক কি অবস্থায় আছে এবং বড়সাহেবের ঘরে গিয়ে ডেকে বার করে আনা কতটা সঠিক হবে। এই প্রশ্ন দুটো মনে মনে বিবেচনা করতে করতে মহিমাময় বড়সাহেবের ঘরের দিকে এগোলেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে বাধা পেলেন বড়সাহেবের খাস আর্দালির কাছে। আর্দালি জানালো, এখন কামরায় ঢোকা যাবে না। সাহেব দোস্তের সঙ্গে বাত করছেন।

এরই মধ্যে মহিমাময়ের সুশিক্ষিত কানে একটু গেলাসের টুংটাং, খুব পরিচিত একটা শব্দ,

ধরা পড়েছে। সর্বনাশ! জয়দেব এখানে অফিসের মধ্যে খোদ বড়সাহেবের সঙ্গে জমিয়ে মদ খাচ্ছে?

নিঃশব্দে কেটে পড়তে যাচ্ছিলেন মহিমাময় বড়সাহেবের দরজার ওপাশ থেকে, কিন্তু ভারি পর্দার অন্তরাল থেকেও সামান্য ফাঁক দিয়ে মহিমাময়কে দেখে ফেলেছেন বড়সাহেব, তিনি বেল বাজিয়ে আরদালিকে ডাকলেন, 'এই দ্যাখো তো ওখানে কে দাঁড়িয়ে?'

আরদালি এগিয়ে আসার আগেই মহিমাময় পর্দা উঁচু করে বড়সাহেবের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভেতরে আসবো, স্যার?'

বড়সাহেব যথেষ্টই মুডে আছেন, অস্বাভাবিক সৌজন্যে বিগলিত হয়ে সাদর আহ্বান জানালেন, 'আরে আসুন আসুন, মহিমাবাবু, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

মহিমাময় ঠিক এতটা আশা করেননি। তা ছাড়া এই মুহূর্তে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেলো অন্য একটা দৃশ্য দেখে। একটা মদের বোতল এবং দুটো গ্লাস। খুব মহার্ঘ্য বা দুর্লভ পানীয় বলা যাবে না, স্কচ বা শ্যাম্পেন নয়, তবে মোটামুটি উচ্চমানের দিশি প্রিমিয়াম হুইসকি।

মহিমাময়ের নজরে এটাও এড়ালো না যে বোতল প্রায় অর্ধেক ফাঁকা। তাঁকে চেয়ারে বসতে বলে বড়সাহেব ভেতরের টিফিনঘরে গেলেন। মহিমাময় বসার পরে জয়দেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বোতলের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস্?'

নিজের অফিসের বড়কর্তার ঘর, মহিমাময় নিচু গলায় বললেন, 'অর্ধেক ফাঁকা।'

জয়দেব ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, 'তুই ভালো কিছু দেখতে পাস না। অর্ধেক ফাঁকা দেখলি, অর্ধেক ভরা সেটা দেখলি না?'

ইতিমধ্যে বড়সাহেব পিছনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন হাতে একটা কাঁচের গেলাস নিয়ে। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, মহিমাময়কেও পানীয় দেবেন। একটু চিন্তান্বিত হলেন মহিমাময়, অফিসের বড়সাহেবের সঙ্গে বড়সাহেবের ঘরে বসে মদ্যপান কতটা নিরাপদ সে বিষয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন।

কিন্তু ভাবার অবসর দিলেন না বড়সাহেব। নিজেই একটা গেলাসে পানীয় ঢেলে তার সঙ্গে নিজের জলের ফ্লাস্ক থেকে জল মিশিয়ে এগিয়ে দিলেন মহিমাময়কে। তারপর জয়দেবের দিকে তাকিয়ে মহিমাময়কে বললেন, 'আমার বন্ধু জয়দেব পালের সঙ্গে শুনলাম আপনার আলাপ আছে, তা তো থাকবেই, নামকরা লোক, সিনেমা ডিরেক্টর। আমার ছোটবেলার বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি।'

পরিচয়ের শেষ অংশ শুনে মহিমাময় একটু বিস্মিত হলেন। অবশ্য এরকম আগেও হয়েছে। বহু ব্যক্তিরই মনে ধারণা যে স্বনামধন্য সিনেমা ডিরেক্টর জয়দেব পালের সঙ্গে তিনি একই স্কুলে পড়েছেন। শুধু কলকাতায় নয়, পশ্চিমবঙ্গে বিহারে এমন কি বাংলাদেশে এই সব স্কুল। যেভাবেই হোক জয়দেব বেশ কিছু লোককে সব সময়েই বোঝাতে পারেন কিংবা ধারণা দেন যে তিনি তাঁদের সঙ্গে এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়তেন। এই ধারণাটা মহিমাময়ের বড়সাহেবের মধ্যেও ঢুকেছে, বিগত বিদ্যালয়-জীবনের মধুর স্মৃতি স্মরণ করে তিনি এখন কাল্পনিক সহপাঠী সুবিখ্যাত জয়দেব পালের দিকে গর্বিত ও আপ্লুত নয়নে তাকিয়ে আছেন।

বহু অভিজ্ঞতা-সূত্রে মহিমাময় জানেন, যদি এই মুহূর্তে বড়সাহেব তাঁর প্রাক্তন স্কুল বিষয়ে কোনো আলোচনা শুরু করেন, অতীতকালের এক সহকারী শিক্ষকের নিষ্ঠুরতা নিয়ে বা ফাইন্যাল

খেলায় অবিশ্বাস্যভাবে স্কুলের শূন্য-চার গোলে হেরে যাওয়া বিষয়ে, সেই স্মৃতিচারণে অনায়াস দক্ষতায় জয়দেব যোগ দেবেন। এ ঘটনা বহুবার মহিমাময় প্রত্যক্ষ করেছেন।

এতক্ষণে 'চিয়ারস' বলে গেলাস তুলে বড়সাহেব মহিমাময়কে পানে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। বহুক্ষণ শুকনো মুখে বিরক্তিকর প্রতীক্ষার পরে মহিমাময়ের এবার দ্বিধা কেটে গেছে। তিনি এক চুমুকে অর্ধেক গেলাস খেয়ে নিলেন। দুপুরের নেশাটা সবে জুড়িয়ে আসছিলো, অল্প পান করেই মহিমাময় বেশ চনমনে বোধ করলেন।

চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে মহিমাময় জয়দেবের দিকে একবার, আরেকবার বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমিও জয়দেবের ক্লাসফ্রেণ্ড স্যার, একই স্কুলে ক্লাস ওয়ান থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি।'

মহিমাময়ের কথা শুনে বড়সাহেব চমকিত ও চিন্তিত হলেন, মহিমাময়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নেবুতলা?'

মহিমাময় বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। নেবুতলা কবোনেশন বয়েস হাই ইংলিশ স্কুল। আমার লাস্ট স্কুল ফাইন্যাল ব্যাচ।'

বিস্মিত বড়সাহেব বললেন, 'কিন্তু আমি তো জয়দেবের সঙ্গে পূর্ণিয়া জুবিলী স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি। সিক্সটিব হ'যাব সেকেণ্ডারি।'

মহিমাময় বলতে যাচ্ছিলেন যে জয়দেবের চৌদ্দপুরুষে কেউ পূর্ণিয়া যায় নি কিন্তু তার আগেই জয়দেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'সরি, এখনই আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে, বাত্রে দেখা হবে।' বলে তিনি দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলেন। মহিমাময় কি করবেন স্থির করতে না পেরে হাতের গেলাসের বাকি অংশটুকু মুহূর্তের মধ্যে গলাধঃকরণ করে জয়দেবের অনুগামী হলেন। বড়সাহেবের সামনে এই রকম আচরণ সমীচীন কিনা, বেরিয়ে যাওয়ার আগে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত কিনা এসব প্রশ্ন এই মুহূর্তে চাপা পড়ে গেলো।

বাইবে লোডশেডিং এখনো আছে। তবে বৃষ্টিটা ধরেছে। ঠাণ্ডা আরো জোরদার।

মহিমাময় মোড়ের মাথায় পৌঁছেই দেখতে পেলেন, জয়দেব প্রাণপণ 'চেষ্টা করছেন যে কোনো একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাতে। কিন্তু এই দুর্দিনের সন্ধ্যায় কোনো ট্যাক্সি দাঁড়াচ্ছে না। মহিমাময় জয়দেবকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, এই সময় দুম করে বিদ্যুৎ ফিরে এলো। আলো ফিরে আসায় মনটা একটু প্রসন্ন হয়েছে, তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন জয়দেব তাঁকে দেখতে পেয়েছেন এবং হাত তুলে ডাকছেন।

মহিমাময় জয়দেবের কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে জয়দেব এখনো পুরো মাতাল হন নি, তবে তাঁর বেশ নেশা হয়েছে। জয়দেব মহিমাময়কে দেখে বললেন, 'তুই পুরো ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দিচ্ছিলি। জানিস তোর বড়সাহেব আমার একটা বইয়ের প্রডিউসার হতে চলেছে।'

এ তথ্যটা মহিমাময়ের জানা ছিলো না। নিজের অফিসের বড়কর্তা আফসে বসে মদ্যপান কবছেন, তার ওপর সিনেমা প্রযোজনা করতে যাচ্ছেন সম্ভবত অফিসেরই টাকায়—ব্যাপারটা ভালো ঠেকলো না মহিমাময়ের কাছে। কোম্পানিটা এবার লাটে না ওঠে।

কিন্তু আশার বাণী শোনালেন জয়দেব, 'তোর বড়সাহেবের কাছে তোর খুব প্রশংসা করেছি। এবার তুই অফিসার হয়ে যাবি। নির্ঘাৎ প্রমোশন হবে।' খুব যে আশ্বস্ত হলেন মহিমাময় তা নয়, তিনি মনে মনে ভাবলেন, আগে কোম্পানি টিকুক, তারপরে প্রমোশন।

ইতিমধ্যে জয়দেবের অনুরোধ উপেক্ষা করে আরো দু-তিনটি ট্যাক্সি তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেছে। কয়েকদিন আগে লালবাজার থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, ট্যাক্সি যাত্রী নিতে না চাইলে সেই গাড়ির নম্বর পুলিশে জানিয়ে দিতে।

বেশ কয়েকটি ট্যাক্সি পাত্তা না দেয়ার পর উত্তেজিত জয়দেবের সেই পুলিসি বিজ্ঞপ্তির কথা হঠাৎ মনে পড়লো, তিনি হিপপকেট থেকে একটা নোটবুক বার করলেন আর একটা ডট পেন। এইমাত্র মিটার নামানো যে ট্যাক্সিটা তাঁকে পার হয়ে গেছে তিনি সেটার নম্বর টুকতে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিসদৃশ কাণ্ড ঘটলো। যে ট্যাক্সিটি চলে গিয়েছিলো তার ড্রাইভার পিছন ফিরে তাকিয়ে জয়দেবকে গাড়ির নম্বর টুকতে দেখে ঘ্যাচ করে গাড়িটা ব্যাক করে একদম জয়দেবের পাশে দাঁড়িয়ে গেলো, তারপর ট্যাক্সির বাঁ দিকের জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো, 'আপনি এখন সিনেমা করেন, তাই না?'

এই আকস্মিক প্রশ্নে জয়দেব একটু পিছিয়ে এলেন, একটু আমতা আমতা করে অপ্রস্তুতভাবে একবার মহিমাময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জয়দেব পাল, সিনেমা করি। তাই কি হয়েছে?'

ট্যাক্সিওয়ালা উত্তেজিত হয়ে বললো, 'কি হয়নি! আজ আপনার নাম হয়েছে। সিনেমা তুলছেন, হিল্লি-দিল্লি যাচ্ছেন। খবরের কাগজে আপনার নাম বেরোচ্ছে ছবি বেরোচ্ছে। আপনি মোটা হয়েছেন, লম্বা জুলফি রেখেছেন, মোটা গোঁফ রেখেছেন। আপনি এখন পকেট থেকে নোটবুট বার করে ট্যাক্সির নম্বর নিচ্ছেন। পুলিসকে দিয়ে আমাদের জেল ফাঁসি করাবেন। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ !' ঘৃণাভরে বার—বার ধিক্কার দিলো ট্যাক্সি-ড্রাইভার।

জয়দেব তখন একেবারে বেকুব বনে গেছেন, কাঁচুমাচু মুখে ড্রাইভারেব দিকে তাকিয়ে আছেন, কি যে করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না এবং কেনই বা ট্যাক্সিওয়ালা এসব বলছে তাও ধরতে পারছেন না।

ট্যাক্সিওয়ালা কিন্তু তখনো নিরস্ত হয়নি, সমানে ধিক্কার বর্ষণ করে চলেছে, 'ছিঃ ছিঃ জয়দেববাবু, আপনার কোনো লজ্জা নেই! আপনি এত নেমকহারাম! আপনি আজ ট্যাক্সি ড্রাইভারদের পিছনে লাগছেন? কিন্তু এই কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা না থাকলে আজ আপনি কোথায় থাকতেন, কোন ভাগাড়ে? জোড়াবাগান থেকে, খালাসিটোলা থেকে, খিদিরপুর থেকে, ফুটপাথ থেকে, গুণ্ডাদের হাত থেকে, পুলিসের হাত থেকে রাত বারোটা, একটা, দুটো, ট্যাক্সিওয়ালারা আপনাকে কোলে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। আপনি তাদের গাড়ির সিটে, তাদের গায়ের জামায় বমি করে দিয়েছেন। আজ এই তার প্রতিদান!'

এই ভয়াবহ অভিযোগমালার সামনে জয়দেব অসহায় হয়ে পড়লেন, করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক আছে, যাও-যাও। তোমার নম্বর নিচ্ছি না।'

ট্যাক্সিওয়ালার রাগ তখনো যায়নি, 'কিসের জন্যে নম্বর নেবেন, দাদা? বৃষ্টির রাতে একটু শেয়ারে ট্যাক্সি খাটাচ্ছি, মাতাল-বদমাইশের তুলছি না, এটা কি অন্যায় হলো?'

নিস্তব্ধ হয়ে মহিমাময় এতক্ষণ ধরে এই নাটক দেখছিলেন, এবার যথেষ্ট হয়েছে এই ধরে নিয়ে এগিয়ে এসে ট্যাক্সিকে বললেন, 'ঠিক আছে, এবার আপনি যান। শেয়ারে খাটুন।'

মহিমাময়কেও মনে হলো ট্যাক্সিওলা চেনে, সে বললো, 'ও আপনিও আছেন! নিশ্চয়ই কোথাও বসবেন। কাছাকাছি কোথাও হলে বলুন আমি আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আসছি।'

বহুরকম গালাগাল খেয়ে জয়দেব নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, এই ট্যাক্সিতে উঠতে তাঁর ভরসা হচ্ছে না। কিন্তু মহিমাময় বুঝলেন এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। জয়দেবকে ঠেলে তুলে দিলেন ট্যাক্সিতে, তারপর নিজেও উঠলেন, উঠে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললেন, 'পার্ক স্ট্রীট।'

পার্ক স্ট্রীটে একটা পুরনো বারে ওঁদের দুজনেরই একটা চেনা আড্ডা আছে। আজ কিন্তু নিয়মিত আড্ডাধারীদের কেউই আসেনি। এই ঠাণ্ডায় আর বৃষ্টিতে কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়নি মনে হচ্ছে। দুজনে গুটিগুটি বারে ঢুকে এক প্রান্তে এসে একটা টেবিলে বসলেন।

ট্যাক্সির মধ্যে জয়দেব গুম মেরে বসেছিলেন, মহিমাময়ও কোনো কথা বলেননি। এখন বারে ঢুকে দুটো পানীয়ের অর্ডার দিয়ে জয়দেব বললেন, 'এই ট্যাক্সিগুলো যা হয়েছে না।'

মহিমাময় এই দুঃখজনক আলোচনায় গেলেন না। এক প্লেট সসেজ নিয়ে নিঃশব্দে পানীয় খেতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে একটা ভারী ভাব, কেউ কোনো কথা বলছেন না। মহিমাময় একটা সসেজ তুলে জয়দেবকে অফার করলেন, জয়দেব প্রত্যাখ্যান করলেন।

আরো কিছুক্ষণ পরে আরো দু-তিন গেলাস পানীয় প্রায় নিঃশব্দে শেষ হওয়ার পরে মহিমাময় আপনমনে বললেন, 'আবার বোধ হয় বৃষ্টি আসছে। যাই বাড়ি ফিরি।'

জয়দেব এবার হাত তুলে বাধা দিলেন। বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস? আজ রাতে যে তোর বড়সাহেবের বাড়িতে আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ, তোকেও নিয়ে যাবো বলেছি।'

মহিমাময় আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'সন্ধ্যায় অফিসে বড়সাহেবের সঙ্গে মদ খেয়েছি, তারপরে রাতে তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে ডিনার খাবো। এবার নির্ঘাৎ চাকরিটা খোয়াবো।'

জয়দেব শুনে বললেন, 'আরে এত ভয় কিসের? আমার যে বইটায় উনি টাকা দেবেন সেটা নিয়ে আলোচনা আছে। আরো দু-একজন আসবে, তুইও যাবি। নিশ্চয়ই যাবি, আমার জন্যে এটুকু করবি না।'

মহিমাময় বললেন, 'কিন্তু তোর স্কুল নিয়ে যদি আবার কথা ওঠে!'

জয়দেব বললেন, 'ধুর, ওসব এড়িয়ে যাবো। কত লোক যে ভাবে আমি তার সঙ্গে পড়েছি, সবাইকে কি আর সব ব্যাখ্যা দিতে হয়!'

কি জানি কি ভেবে উঠতে গিয়েও মহিমাময় বসে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, বড়সাহেবের ব্যাপারটা একবার শেষ পর্যন্ত দেখা যাক।

সুতরাং বারের এক প্রান্তে জয়দেব এবং মহিমাময়ের সময় ধীরেসুস্থে কাটতে লাগলো। আরো কিছুক্ষণ পরে আরো বেশ কয়েক গেলাস পানীয়ের অবসানে, যখন জয়দেবের মুখটা মহিমাময়ের কাছে এবং মহিমাময়ের মুখটা জয়দেবের কাছে ঝাপসা দেখাতে লাগলো দুজনে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন।

দুজনেরই প্রচুর মদ্যপান হয়েছে। দুজনেরই এখন টইটম্বুর অবস্থা। জয়দেব বললেন, 'দাঁড়া একটু বাথরুম থেকে আসি।' মহিমাময় একটা দেয়াল ধরে বাইরের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু জয়দেব সেই যে গেলেন আর আসেন না। ঝিম মেরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় মহিমাময়ের মনে হলো জয়দেব বহুক্ষণ গেছেন, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার আর কোনো মানে হয় না।

মহিমাময় কিঞ্চিৎ টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, পাশে একটা চেনা পানের দোকান।

বহুদিনের পুরনো অভ্যেস, এখান থেকে এক খিলি জর্দাপান খেয়ে তারপরে বাড়ি ফেরা। পানের দোকানটায় এখন বেশ একটু ভিড়। আশেপাশের বার-রেস্তোরাঁগুলো খালি হচ্ছে। রাত দশটা বেজে গেছে। বৃষ্টিটা নেই, হাওয়া কম। ঠাণ্ডাটাও তেমন নয়। আসলে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই ওরকমটা মনে হচ্ছে মহিমাময়ের।

সে যা হোক, পান কিনতে গিয়ে ভিড়ে বাধা পেয়ে একটু সামনের দিকে একটা বন্ধ ওষুধের দোকানের সিঁড়িতে একটু বসলেন মহিমাময়। তাঁর ঝিমুনি মত এসেছিলো, হঠাৎ একটা রাস্তার কুকুর এসে পাশে শোয়ার চেষ্টা করতেই তাঁর তন্দ্রাটা আচমকা ভাঙলো।

তন্দ্রা কেটে যাওযামাত্র মহিমাময়ের খেয়াল হলো জয়দেবের কথা এবং মনে পড়লো সেই বারের বাথরুমে তিনি ঢুকেছিলেন, বারটা যে পাশেই, মাত্র কয়েক কদম দূরে এটা তাঁর চট করে খেয়াল হলো না। বিশেষ করে গাড়িবারান্দার নিচে এই সিঁড়িতে কুকুরের পাশে বসে পরিচিত জায়গাটা নেশার ঘোরে বেশ অচেনা লাগছিলো তাঁর।

মাতালের আর যতই দোষ থাক, কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে না। মহিমাময়ও মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এইভাবে জয়দেবকে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাতে নেমে সামনের রাস্তায় একটা ট্যাক্সিকে ডাকলেন। এই সময়ে পার্ক স্ট্রীটের রাস্তায় ট্যাক্সির অভাব নেই, দিগ্‌দিগন্তের নেশাতুরদের জন্যে সারি সারি ট্যাক্সি অপেক্ষমান রয়েছে।

ডাকতেই সামনের ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেলো। মহিমাময় সেটায় উঠে বললেন, 'পার্ক স্ট্রীট'।

বলেই সিটে হেলান দিয়ে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। ড্রাইভার একটু অবাক হলেও এরকম সওয়ারি নিয়ে চালানো তার অভ্যেস আছে। সে একটুক্ষণ থেমে থেকে বললো, 'পার্ক স্ট্রীটে কোথায়?' জড়ানো কণ্ঠে চোখ বোজা মহিমাময় একটু আগে ছেড়ে আসা বারের নামোল্লেখ করলেন। বারের নাম শুনে ড্রাইভারও আর দ্বিরুক্তি না করে তিন সেকেণ্ডে ব্যাক করে ট্যাক্সিটাকে ঐ বারের দরজার সম্মুখে নিয়ে এসে বললো, ' এই তো আপনার বার!'

মহিমাময় চোখ খুলে দেখেন সত্যি তাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ি থেকে নেমে বখশিশসুদ্ধ একটা দশ টাকার নোট ড্রাইভারকে দিয়ে বললেন, 'খুব তাড়াতাড়ি চালিয়ো না, অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে একদিন।'

বারের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে মহিমাময় দেখতে পেলেন জয়দেব দাঁড়িয়ে আছেন। জয়দেব মহিমাময়কে দেখে বললেন, 'আমি ভাবলাম তুই বোধ হয় কোথায় চলে গেলি!'

এই সময় জয়দেবের পরিচিত এক ভদ্রলোক কালুবাবু, বারে ঢুকছিলেন, তিনি জয়দেবকে দেখে বললেন, 'কি হলো, এত তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছেন নাকি?'

জয়দেব মহিমাময়কে দেখিয়ে বললেন, 'না, এই আমাদের দুজনের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ডিনার। তাই একটু তাড়াতাড়ি।'

কালুবাবু আটকালেন, 'এক রাউণ্ড, বসে যান।'

মহিমাময় কোনো আপত্তি করার সুযোগ পেলেন না, জয়দেবের সঙ্গে তাঁকেও বসতে হলো। মাতালের শেষ রাউন্ড কিছুতেই শেষ হতে চায় না, ওয়ান ফর দ্যা রোড, ওয়ান ফর দ্যা ডিনার, এই রকম ধারাবাহিক চলতে থাকে। তছাড়া কালুবাবুর নিজস্ব একটা ভয়াবহ সমস্যা আছে, তিনি বারে এসে সদাসন্ত্রস্ত থাকেন। নিজেই দুঃখ করে ভাঙলেন ব্যাপারটা, 'জানেন জয়দেববাবু,

আমার স্ত্রীর জন্যে মুখ দেখাতে পারছি না। প্রত্যেকদিন বারে আসে।'

মহিমাময়ের নেশাটা জমজমাট হয়ে উঠেছে, কিন্তু কথাটা তাঁর কানে গেলো, তিনি বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, তিনি বারে আসেন কেন?'

কালুবাব সদ্য আলাপিত মহিমাময়ের হাত ধরে বললেন, 'আর বলবেন না দাদা, প্রত্যেকদিন বাতে এসে আমাকে জামার কলার ধরে এখান থেকে টেনে বার করে বাড়ি নিয়ে যায়। আজ আপনারা আছেন দাদা, আমাকে একটু রক্ষা করবেন।'

জয়দেব ঝিমোচ্ছিলেন, সন্ধ্যা থেকে পেটে কম তরল পদার্থ পড়েনি! কিন্তু তিনি মাতাল হলেও সেয়ানা মাতাল, কালুবাবুর দজ্জাল স্ত্রীর কথা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো। মহিমাময়ের ব্যাপারটা ভালো জানা নেই, কারণ তিনি সাধারণত রাত করেন না। কিন্তু জয়দেব জানেন কালুবউদি মধ্যরজনীর বারে এক মূর্তিমতী বিভীষিকা। জয়দেব চট করে গেলাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু গলাধঃকরণ করে মহিমাময়কে বললেন, 'এই ওঠ। ডিনারের নেমন্তন্নে দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তারপর মহিমাময়ের হাত ধরে প্রায় হিঁচড়ে বার করে রাস্তায় নেমে এলেন, অসহায় কালুবাবুর ঘাড়ে বিল মেটানোর পুরো দায় ঢেলে দিয়ে।

রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এখন আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়েছে। নিঝুম, শীতল পার্ক স্ট্রীট। তবে ভাগ্য ভালো, এখনো দু-একটা ট্যাক্সি রয়েছে শেষ সওয়ারির আশায়।

মহিমাময়ের স্ত্রী পিত্রালয়ে গেছেন দুদিনের জন্যে। তবু এত রাত হবে তিনি ভাবেননি। এখন বাড়ি ফিরলে সিঁড়ির নিচে থেকে ঘুমন্ত বুড়ি ঝিটাকে ডেকে তুলে দরজা খোলাতে পুরো পাড়া জেগে যাবে। সুতরাং জয়দেবের সঙ্গে থাকাই মহিমাময় শ্রেয় মনে করলেন। তাছাড়া অতিরিক্ত মদ্যপান করে তাঁর মনে একটা সাহস এসেছে, চাকরি তুচ্ছ করে আজ তিনি এখন বড়সাহেবের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

সুতরাং জয়দেব এবং মহিমাময় দুজনে এবার ট্যাক্সিতে রওনা হলেন বড়সাহেবের বাড়ির ডিনারে। বড়সাহেবের বাড়ি সেই সল্ট লেকে। ট্যাক্সিওয়ালা কুড়ি টাকা একস্ট্রা চাইলো। জয়দেব তাতেই রাজি হলেন। পার্ক স্ট্রীটে আলো ছিলো কিন্তু সল্ট লেকে এখন গভীর অন্ধকার। লোডশেডিংয়ে ধুঁকছে উপনগরী।

দেখা গেলো, জয়দেব বাড়িটা চেনেন। কোনো রকমে খুঁজে খুঁজে বাড়িটা বেরোলো। নতুন একতলা বাড়ি, বাইরের ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট একটা শোয়ার ঘরে কোনো অজ্ঞাত কারণে সংসার থেকে একটু আলাদা হয়ে বড়সাহেব থাকেন। জয়দেব ঘরটা জানেন। ঘরের জানলায় গিয়ে টুকটুক করতে অন্ধকারে কম্বল জড়িয়ে এসে বড়সাহেব একপাশের দরজাটা খুলে দিলেন। তিনি আশা করেননি রাত বারোটার পরে এই দুই ব্যক্তি ডিনার খেতে আসবেন। তবু ভদ্রতার খাতিরে তিনি এঁদের দুজনকে ভেতর নিজের শোয়ার ঘরে নিয়ে বসালেন।

বড়সাহেব একটা মোমবাতি ধরানোর জন্যে বালিসের নিচে দেশলাই হাতড়াচ্ছিলেন। জয়দেব বললেন, 'গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে। কোনো ড্রিঙ্ক আছে?'

দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বড়সাহেব বললেন, 'না, বাসায় তো কোনো কোন ড্রিঙ্ক নেই!' ততক্ষণে দেশলাই জ্বালিয়ে সামনের তেপায়া টেবিলের ওপরে একটা মোমবাতি ধরিয়ে ফেলেছেন তিনি।

মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় জয়দেব দেখতে পেলেন, বড়সাহেব মিথ্যে কথা বলেছেন,

তেপায়া টেবিলের নিচে একটা পানীয়ের বোতলে প্রায় গলা পর্যন্ত ভর্তি পানীয় রয়েছে।

হঠাৎ দমকা ফুঁ দিয়ে, কেউ কিছু বুঝবার আগে জয়দেব মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলেন, তারপরে 'তবে রে শালা, মদ নেই' এই বলে তেপায়া টেবিলের নিচ থেকে অন্ধকারে বোতলটা তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে ঢকঢক করে ঢেলে দিলেন।

বড়সাহেব যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার আগেই জয়দেবের আর্ত চিৎকার শোনা গেল, 'সর্বনাশ, ওরে বাবা রে মারা গেলাম, গলা পুড়ে গেলো, বুক জ্বলে গেলো! হাঁচতে হাঁচতে কাশতে কাশতে বমি করতে লাগলেন জয়দেব। ঘটনার আকস্মিকতায় ভীষণ ভয় পেয়ে ঘামতে লাগলেন মহিমাময়, ভাবলেন হয়তো বোতলে অ্যাসিড-ট্যাসিড কিছু ছিলো, জয়দেব তাই খেয়ে ফেলেছেন। এদিকে বড়সাহেব আবার মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেলেছেন, মোমবাতির আলোয় পানীয়ের বোতলটার আর এক পাশে উবু হয়ে জয়দেব গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করেছেন।

বড়সাহেব কপাল চাপড়াতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন 'ছিঃ ছিঃ, আমার শালা খাঁটি জিনিসটা এনে দিয়েছিলো আলিগড় থেকে, কলের ঘানির খাঁটি সরষের তেল, সেটা এইভাবে নষ্ট হলো।'

মহিমাময় কিছু বুঝতে পারছিলেন না। একে ঘোর নেশা হয়েছে, তার উপরে এই বিচিত্র বিপজ্জনক কাণ্ড। ব্যাপারটা বড়সাহেবের খেদোক্তিতে ক্রমশ স্পষ্ট হলো।

বড়সাহেবের শীতকালে গায়ে সরষের তেল মাখার বাতিক আছে। শীতকালে তাঁর চামড়া ফেটে যায় প্রত্যেক বছর। উত্তরপ্রদেশে আলিগড়ে থাকেন তাঁর এক শালা। তিনি শীতের আগে জামাইবাবুকে সরষের তেল দিয়ে গেছেন গায়ে মাখবার জন্যে। সেই তেলটাই ছিলো বিছানার কাছে তেপায়া টেবিলের নিচে ঐ খালি হুইস্কির বোতলে। আর তাই পান করে জয়দেবের এই দুর্দশা।

এই গল্প এর পরে আর টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু পরবর্তী একটি মর্মান্তিক দৃশ্যের কথা না বললে ঘটনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদিও ঘটনাটির সঙ্গে মদ্যপানের কোনো সম্পর্ক নেই।

সেদিন রাত্রে বড়সাহেবের বাইরের ঘরে জয়দেব আর মহিমাময় শুয়েছিলেন। পরদিন সকালবেলা মহিমাময় ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, মেঘ কেটে গেছে, বৃষ্টি নেই, নির্মল আকাশ, সুন্দর ঝকঝকে রোদ উঠেছে। জানালা দিয়ে রোদ এসেছে বড়সাহেবের ঘরে। সেই রোদে একটা লুঙ্গি মালকোচা দিয়ে পরে মহিমাময়ের পরম শ্রদ্ধেয় বড়সাহেব মেঝের বমির উপরে ভাসমান সরষের তেল হাত দিয়ে আলতো করে তুলে গায়ে মাখছেন। মহিমাময়ের এদিকে দৃষ্টি পড়ায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হলেন তিনি, তারপরে বললেন, 'জিনিসটা বড় খাঁটি। নষ্ট করতে মন চাইছে না। আপনিও মাখবেন, নাকি একটু?'

কালমেঘ

বঙ্গাব্দ তেরোশো ছিয়াশি।

রোববার ফাল্গুন মাস শেষ সপ্তাহ, সকাল সাড়ে দশটা।

বাইরের তিন কোণাচে ঘরে পুরনো বেতের চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে মহিমাময় দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

এ বছর দোল পড়েছে মাসের দ্বিতীয় শনিবারে। একটা চমৎকার ছুটি বেঘোরে মারা গেল। শুধু তাই নয়, রোববারের আড্ডাটাও মারা পড়েছে। বন্ধু-বান্ধব, জানাশোনা সবাই গেছে শান্তিনিকেতনে, বসন্ত উৎসবে। কেউ কাল সকালের আগে ফিরছে না। অথচ সুন্দর ফাল্গুন মাস। হালকা ফিকে রসুনের মত একটু একটু ঠাণ্ডার আস্তরণ এখনো দিনের গায়ে জড়ানো আছে। আর সেই সঙ্গে সেই বিখ্যাত দক্ষিণের ফুরফুরে, বাতাস এই তো কলকাতার সবচেয়ে ভাল সময়।

এই সময়ে কেউ কলকাতা ছেড়ে বাইরে যায়! তাও আবার এই বুড়ো বয়সে শান্তিনিকেতনের বসন্ত মেলায়! মনে মনে তিনবার বন্ধুদের ধিক্কার দিলেন মহিমাময়।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জিবটা কেমন যেন খর খর করছে, গলা থেকে তালু পর্যন্ত মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির মধ্য থেকে মহিমাময়ের স্ত্রী ভেতরেব দরজার পরদা তুলে স্বামীকে একা বসে ঘন ঘন পা দোলাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক পেয়ালা চা খাবে নাকি? তাড়াতাড়ি বল, উনুনে জল বসাচ্ছি!'

চায়ের কথাটা শুনে মহিমামযের মাথাটা বেশ গরম হয়ে গেল। বেশি বাক্যবিনিময়ে না গিয়ে তিনি শুধু সংক্ষিপ্ত ও সুগম্ভীর জবাব, দিলেন 'না'।

নিরাসক্তের মত আর একবার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন মহিমাময়। এগারটা বাজতে চলল। বাইরে নতুন এক টাকার কযেনেব মত ঝকঝকে রোদ, দূরে ত্রিকোণ পার্কে না কি কোন বাড়িতে একটা পোষা কোকিল ভোর থেকে ডাকছে তো ডাকছেই। নবীন বসন্তের মনোরম উষ্ণতায় চারদিক মেতে উঠেছে। এইরকম সুন্দর ছুটির দিনে কোন ভদ্রলোক দুপুরবেলায় বাড়িতে বসে চা খায়! কোথাও গাছের ছায়ায় ফুরফুরে বাতাসে বসে বিয়ারের সোনালী তরলতায় চুমুক দিতে দিতে আজ হল নব বসন্তকে অভ্যর্থনা জানানোর দিন।

পাজামার উপরে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে 'ধুত্তোরি' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন মহিমাময়। কিন্তু একা একা আর কতদূর কোথায় যাবেন? আর সবচেয়ে বড় কথা, রাস্তাঘাট এখনও তেমন নিরাপদ হয় নি। আজ কয়েক বছর হল বড়বাজারওয়ালারা উঠে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার বহুতল বাড়িগুলিতে। সেখানে হিন্দুস্থানী আর রাজস্থানীদের 'হোলি হো, হোলি হ্যায়', এখনও পুরোদমে চলেছে। কোথায় কোন্ অলিন্দ কি গবাক্ষ থেকে চপলা তরুণী রাজপথের অসহায় পদাতিকের গায়ে ফাগ কিংবা ইনডেলিবল কুমকুম ছুঁড়ে মারবে তা বলা যায় না।

ইতস্তত গলির মোড়ের দিকে এগোতে এগোতে সহসা মহিমাময় দেখলেন খুব চেনা একটা লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বড় রাস্তা থেকে এগিয়ে আসছে।

আগন্তুকের চুলে-মুখে নানারঙের আবির, গায়ের হাওয়াই শার্ট আর ফুল প্যান্টও বহুবর্ণরঞ্জিত, উজ্জ্বল রঙে এমন ঢাকা পড়ে গেছে অবয়ব ও গঠন যে বেশ কাছে না আসা পর্যন্ত মহিমাময় বুঝতে পারলেন না—তাঁর বন্ধু জয়দেব আসছেন।

জয়দেবকে দেখে মহিমাময় যুগপৎ খুশি ও বিস্মিত হলেন। তাহলে যে শুনেছিলেন জয়দেব শান্তিনিকেতনে গেছে, গিয়েছিল হয়ত, আজই ফিরছে!

কাছে আসতে জয়দেবকে মহিমাময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই শুনলাম শান্তিনিকেতনে গিয়েছিস?'

জয়দেব বললেন, 'কি করে যাব? পরশুদিন রাত থেকে আমি কেজরিওয়ালের বাড়িতে আটকে আছি!'

মহিমাময় কেজরিওয়ালকে চেনেন না, জয়দেবের সমস্ত ঘনিস্ট ব্যক্তির খবর রাখা কারও সাধ্য নয়। সুতরাং মহিমাময় প্রশ্ন করলেন, 'কেজরিওয়াল কে?'

তিনরঙের আবির মাখা ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে জয়দেব বললেন, 'তুই চিনবি না। বড় বাবসা করে, বলপেনের রিফিল বানানোরযন্ত্র তৈরির মেশিনের পাইকারি কারবার করে। তাছাড়া....'

'ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে, আর লাগবে না' কেজরিওয়ালের অন্য ব্যবসা সম্পর্কে উৎসাহ না দেখিয়ে জয়দেবকে মধ্যপথে থামিয়ে দিয়ে মহিমাময় বললেন, 'তা এরকম রং খেললি কোথায়? কেজরিওয়ালের বাড়িতে?'

জয়দেব করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আরে না! ঐ কেজরিওয়ালদের ওখানে কাল দুপুরে গান-বাজনা, খাওয়াদাওয়া হল। অল্পস্বল্প আবির ছিল, কিন্তু আসল গোলমালটা হল রাতে।'

মহিমাময় বললেন, 'রাতে কি হল?'

জয়দেব লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'সে মহা বেকায়দা। সন্ধ্যাবেলা আমি ওদের বাড়িতে বাইরের ঘরে ঘুমোচ্ছি, কেজরিওয়ালার আত্মীয়স্বজন কাদের বাড়িতে যেন গেছে। আমি ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ওদের আউট হাউসে চাকর ড্রাইভারেরা বড় বড় পিতলের লোটায় কি সব খাচ্ছে। আমি চোখ কচলাতে কচলাতে সেখানে গিয়ে বসলাম। চমৎকার ভাঙের সরবত, সবাই খুশি হয়ে আমাকে খাওয়াতে লাগল। তারপরে অল্প অল্প মনে পড়ছে-হৈ—হুল্লোড়, নাচগান, রঙ। একটা মোটামতন টিকি মাথায় লোক আমাকে কাঁধে নিয়ে অনেকক্ষণ বেরিলিকা বাজারমে...' গাইতে গাইতে খুব নাচল। তারপর ভাল মনে পড়ছে না। এই আধ ঘণ্টা আগে ঘুম ভেঙে দেখি দারোয়ানদের ঘরের পাশে একটা দড়ির খাটিয়ায় ডুমুর গাছের নিচে শুয়ে আছি, গায়ে-মাথায়, জামা-কাপড়ে রং মাখা।'

আর বেশি বলার দরকার ছিল না। মহিমাময় ব্যাপারটা অনেকখানিই বুঝলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, 'তা এরকম ভূতের মত বেশে কোথায় যাচ্ছিস?'

জয়দেব বললেন, 'কেন, তোর ওখানে? চল্, একটু বসা যাক!'

মহিমাময় একটু ভেবে বললেন, 'কিন্তু তোর কি ভাঙের নেশা এখনও কেটেছে? চোখ তো জবাফুলের মত লাল দেখছি।'

জয়দেব বললেন, 'আরে ধ্যুৎ, ভাঙে আবার নেশা হয় নাকি! চোখ লাল হয়েছে বেশি ঘুমিয়ে।' তারপর একটু থেমে নিয়ে বললেন, 'বাড়িতে কিছু আছে?'

মহিমাময় বললেন, 'বাড়িতে একটু আধটু তলানি পড়ে আছে। সেসবে হবে না। আর আজ বিয়ার খাওয়ার দিন। আবহাওয়া দেখছিস না, বসন্তকালের দুপুরে বিয়ার ছাড়া খাওয়া যায়?'

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মহিমা, তোর বয়েস কত হল?'

প্রশ্নের গতিক দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়ে মহিমাময় বললেন, 'কেন, এই অঘ্রাণে বেয়াল্লিশ পূর্ণ হল।'

জয়দেব বললেন, 'তা হলে তোর থেকে আমি আড়াই বছরের বড়, আমার বয়েস হল সাড়ে চুয়াল্লিশ।' তারপর একটু থেমে থেকে বেশ বড় রকমের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জয়দেব এগিয়ে এসে মহিমাময়ের কাঁধে হাত রাখলেন, অবশেষে বললেন, 'আমাদের কি আর বয়েস আছে রে বিয়ার খাওয়ার? আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি। বিয়ার খাবে তো বাচ্চা ছেলেরা।'

এরকম আশ্চর্য কথা শুনে মহিমাময় কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, 'বাচ্চা ছেলেরা খাবে মায়ের বুকের দুধ, ফিডিং বোতলের দুধ, নিদেনপক্ষে গরুর দুধ গেলাসে বা কাপে করে। তারা বিয়ার খাবে কেন?'

জয়দেব মধুর হেসে বললেন, 'আরে না না, অত বাচ্চা নয়। অন্নপ্রাশনের কুড়ি বছর পর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গাঁজা, ভাং, চুরুট, দোক্তা, বিয়ার, তাড়ি যা হোক একটা লোক খাক, খেয়ে যাক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু যেই মানে মানে চল্লিশ পার হয়ে গেলি, তখন তোকে মানে মানে ভেবেচিন্তে চলতে হবে। এমন কি সর্ষেবাটা সজনেডাঁটা চিবানোর আগে ভেবে নিতে হবে কটা ডাঁটা চিবনো ঠিক হবে।'

জয়দেবের এরকম বয়সোচিত বক্তৃতা শুনে মহিমাময় অধৈর্য হয়ে পড়লেন, জয়দেবকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্টপ জয়দেব! অলরাইট, বিয়ার নয়, একটু আগে বাড়িতে দেখে এসেছি বৌ চা করছে। চল্ দুজনে গিয়ে দু পেয়ালা চা খাই।' এরপর থেমে গিয়ে মহিমাময় দুটি দন্তপাটি কিড়মিড় করে স্বগতোক্তি করলেন, 'এমন সুন্দর দিনটা জলে গেল!' এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেয়াল হল, 'জলে নয়, বিনা জলে গেল!'

ততক্ষণে জয়দেব মহিমাময়কে স্বগতোক্তি করা থেকে নিবৃত্ত করেছেন, তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এই ভরদুপুরে চা খাবে কোন শালা? আমার সঙ্গে চল, এক বোতল জিন কিনে আনি।'

মহিমাময় এই অবস্থায়ও রফা করার চেষ্টা করলেন, 'জিন খাওয়া যাবে না। বিটারস ফুরিয়ে গেছে।'

জয়দেব এখন রীতিমত উত্তেজিত, বললেন, 'তুই একেবারে সাহেব হয়ে গেছিস মহিমা, বিটারস দিয়ে কি হবে? আর বিটারসের কি দাম জানিস?'

বলা বাহুল্য, এত তর্কাতর্কির মধ্যেও জয়দেব এবং মহিমাময় ইতিমধ্যে বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অজান্তে গড়িয়াহাটের চৌমাথায় মদের দোকানের সামনে এসে গেছেন। এবার জয়দেব নির্দেশ দিলেন, 'মহিমা, তুই এক কাজ কর, সামনের ওষুধের দোকান থেকে তুই এক বোতল কালমেঘ নিয়ে আয়। ততক্ষণে আমি এখান থেকে জিনটা কিনে ফেলছি।'

কিছুই অনুধাবন করতে না পেরে মহিমাময় সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়া ফার্মেসি থেকে সাড়ে সাত টাকা দিয়ে এক শিশি কালমেঘ কিনে আনলেন, ততক্ষণে জয়দেব জিনের বোতল কিনে ফুটপাথে নেমে এসেছেন।

দুজনে মিলে বাড়িমুখো হাঁটতে হাঁটতে মহিমাময় জয়দেবের কাছে জানতে চাইলেন, 'কালমেঘ

দিয়ে কি হবে? তোর কি লিভার খারাপ হয়েছে?' তারপর বেশ ভেবে নিয়ে বললেন, 'লিভার খারাপ হলে মদ খাবি কেন? শুধু শুধু কালমেঘ খেয়ে কি সুরাহা হবে?'

জয়দেব এবার চটে গেলেন, 'লিভার খারাপ হবে কেন আমার? আমার লিভার পাথরের মত শক্ত। কালমেঘ লিভারের জন্যে নয়, ওটা নেওয়া হল জিন খাওয়ার জন্যে।'

মহিমাময় বেশ অবাক হলেন, 'এই তেতোর তেতো কালমেঘ দিয়ে জিন! এর থেকে কুইনিন মিক্সচার খাওয়া ভাল।'

এতক্ষণে ও'রা দুজনে মহিমাময়ের বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছেন। ঘরে ঢুকে মহিমাময় তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে গিয়ে এক বোতল ঠাণ্ডা জল আর দুটো গেলাস নিয়ে এলেন।

এবার ঢালাঢালির পালা জয়দেবের। তিনি জিনের বোতলটা খুলে দু গেলাসে দু আঙুল পরিমাণ নিয়ে তার মধ্যে জল মেশালেন, তারপর সত্যি সত্যি ঐ কালমেঘের শিশিটা খুলে দু গেলাসে দু ফোঁটা ঢেলে দিলেন। তারপর এক গেলাস মহিমাময়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন. 'নে, খেয়ে দ্যাখ, মধুর মত লাগবে।'

'মধুর মত কালমেঘ? তুই কি একেবারে পাগল হয়ে গেলি জয়দেব? কাল রাতে কয় লোটা ভাং খেয়েছিস বল্ তো?' হাতে গেলাস ধরে মহিমাময় জিজ্ঞাসা করলেন।

পরম আয়েস ও তৃপ্তির সঙ্গে একটা লম্বা চুমুকে গেলাসটা প্রায় অর্ধেক ফাঁক করে দিয়ে জয়দেব বললেন, 'দ্যাখ্ মহিমা, কালমেঘ হল দিশি বিটারস। বিলিতি বিটারসের চেয়ে ডবল ভাল। আর বিলিতি বিটারসও তেতো একটা গাছের রস। মদের মধ্যে দু ফোঁটা দিলেই এর স্বাদ বদলিয়ে যায়। আমার বড় জামাইবাবু আমেরিকায় এক ডজন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। যাদের যাদের দিয়েছিল, তারা এখনও চিঠি লেখে, খোঁজ নেয়।'

এবার মহিমাময় সন্তর্পণে তাঁর হাতে ধরা গেলাসটা জিবে ছোঁয়ালেন। সত্যিই তো, সামান্য কালমেঘের যাদুর পরশে ঝাঁজাল ড্রাই জিনে অমৃতের স্বাদ এসেছে।

এ ঘটনা দীর্ঘ চার বছর আগেকার।

তারপর কলকাতার রাজপথে অনেক জনস্রোত বয়ে গেছে। সে জনস্রোতে আজকাল কদাচিৎ মহিমাময়ের সঙ্গে জয়দেবের দেখা হয়। স্রোতের স্বতন্ত্র পথে নিজ নিজ ধান্দায় দুজনে দু ধারায় প্রবাহিত হন।

শহরটা তেমন বড় নয়। তাই তবুও কখনও কখনও এখানে সেখানে দেখা হয়ে যায়। জয়দেবকে দেখে খুশি হন মহিমাময়। মহিমাময়কে দেখে খুশি হন জয়দেব।

জয়দেবকে মহিমাময় আমন্ত্রণ জানান, বলেন, 'আয় জয়দেব, বাসায় যাই। সেই কালমেঘ এখনও শিশিতে অনেকটা রয়েছে। চল, বাসায় গিয়ে একটু জিন খাই।'

জয়দেব আপত্তি করেন, 'ধ্যুৎ, জিন পুরুষমানুষে খায় নাকি, ও তো মেয়েলী পানীয়। আর তোর ঐ কালমেঘ, ওয়াক, থুঃ! কুইনিন জলে গুলে খাবি, নিমপাতা চিবিয়ে খাবি, সজনেডাঁটা উচ্ছে কাঁচা খাবি। অনেক স্বাদ পাবি।'

ক্ষুণ্ণ মনে মহিমাময় বাড়ি চলে আসেন। তিন কোণাচে বাইরের ঘরের পুরনো বেতের চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সামনের দেয়ালে তাকেব উপরে চোখ রাখেন। ওখানে কালমেঘের শিশিটা রয়েছে। এখনও ঐ শিশিটার মধ্যে প্রা দুই-তৃতীয়াংশ কালমেঘ আছে। অন্তত পাঁচ টাকার জিনিস। এই দুর্দিনে জিনিসটা নষ্ট করতে মন চায় না।

কিন্তু শিশিটা কিছুতেই ফুরোচ্ছে না। গেলাসে এক-দুই ফোঁটা, এক বোতলে পনের পেগ, পনের গেলাস। পনের গেলাসে পনের থেকে তিরিশ ফোঁটা।

গত চার বছরে কত গেলাসের পর গেলাস, বোতলের পর বোতল জিন শেষ হয়ে গেল, কিন্তু ঐ কালমেঘের শিশি সদ্য গলা পর্যন্ত নেমেছে।

কালমেঘের জন্যে জিন, নাকি জিনের জন্যে কালমেঘ? একটা কঠিন ধাঁধায় পড়ে যান মহিমাময়। তারপর কাগজ-পেন্সিল টেনে নিয়ে সমান কঠিন একটা অঙ্ক কষতে থাকেন।

সপ্তাহে দু বোতল জিন, একশো ষাট টাকা বছরে আট সাড়ে আট হাজার টাকা। এই চার বছরে সে অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হবে।

এখনো বাকি যা কালমেঘ আছে তাতে আরো হাজার সত্তর টাকার জিন খেয়ে যেতে হবে। আর আট বচ্ছর—মোটামাট এক লাখ টাকার ধাক্কা!

প্রৌঢ় মহিমাময় করুণ চোখে কালমেঘের শিশিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন, একটা ছোট একতলা বাড়ি হয়ে যেত। ভাবতে ভাবতে পাঞ্জাবি গলিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন আরেক বোতল জিন আনতে।

চশমা

এ কাহিনী জয়দেব ও মহিমাময়ের অল্প বয়েসের। তখনো তারা মদ্যপ হিসেবে এত বিখ্যাত হয়নি। সন্ধ্যাবেলা হাজরার মোড়ে আমাদের একটা আড্ডা ছিলো, সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় এদিক ওদিক থেকে মদ খেয়ে এসে ঝামেলা বাধাতো। তখন তাদের নবীন যৌবন। তাদের দুজনেরই মাথায় ঢুকে গিয়েছিলো যে, ছবি আঁকা ছবি এঁকে নাম করা সবচেয়ে সোজা এবং তার আনুষঙ্গিক হিসেবে প্রয়োজন রং, তুলি, ক্যানভাস এবং মদ্যপান।

মহিমা একটু বেশি, জয় একটু কম, কিন্তু দুজনেই অতিমাত্রায় আধুনিক। মহিমার যে-ছবিটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো, সেটি আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। বিরাট ক্যানভাসে হলুদ রঙ মাখানো, নীচে তিনটে কালো দাগ পাশাপাশি! লাহিড়ি অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলো, এগুলি হলো পাপবোধ। জয় তর্ক করেছিলো, তাহলে লাইনগুলো উত্তর-দক্ষিণে না হয়ে পুবে-পশ্চিমে হওয়া উচিত ছিলো। এই তর্ক কোথায় শেষ হতো বলা যায় না, যদিনা মজুমদারসাহেব যথাসময়ে অংশগ্রহণ করতেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা পিকাসোতে পৌঁছে গেলুম। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক মাঝারি জেলায় পিকাসো নামের চার রকম বানান হয়। পিকাসোর পিসেমশায় কলকাতায় ফ্রেঞ্চ ব্যাংকে দেড় বছর কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কলকাতার টিকটিকি দেখলে গা কেমন ঘুলিয়ে উঠতো, বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়। দু-একবার মল্লিকমশায় কিসব প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মল্লিকমশায় দৈনিক আড্ডায় আসতে পারেন না, তাই বোধহয় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তাই চুপ করে রইলেন।

কিন্তু কথায় কথায় মহিমা আর জয় খুব চটে গেলো, চটে গেলো বললে কম বলা হয়, ভয়ংকর ক্ষেপে গেলো বলা উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জয়ের একটা বাজে অভ্যাস আছে, মদ ছাড়াও সন্ধ্যাবেলায় একটু গাঁজা খায়, রাতের দিকে চোখ লাল থাকে, একটু ব্যোম-ব্যোম

ভাব যাকে বলে। মহিমা ঠিক সেরকম নয় তবে সে কদাচিৎ স্নান করে। অনেকে বলে মাসে একদিন, মজুমদার সাহেবের মতে বছরে একদিন, সে-ও সেই দোল-পূর্ণিমার দিন গায়ের রঙ তোলার জন্যে। মোট কথা, দুজনেই একটু তিরিক্ষি মেজাজের। বিশেষত সন্ধ্যার পরে।

ঝগড়াটা লেগেছিল মজুমদার সাহেবেরই সঙ্গে। গঞ্জিকাসেবী বা মদোমাতাল তিনি কাউকে ভয় পেয়ে তর্কে রেহাই দেবেন, এমন পাত্র নন। আমি আর মল্লিকমশায় মৃদু মৃদু হাসছিলাম।

ঘরের মেঝেতে জল যেমন গড়ায়, সেইরকম ঝগড়া গড়াতে লাগলো। কখনো খুব দ্রুতগতিতে, তারপর কোথাও কিছু নেই একটু থমকে, কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ, তারপর দুদিকে কেটে ছড়িয়ে পড়লো। একটা দিক খুব চিকন হয়ে ফুরিয়ে গেলো, মজুমদারসাহেব বনাম জয় হঠাৎ সেখান থেকে একটা ধারা বেরিয়ে আলের মূল ধারার সঙ্গে জুড়ে তর্‌তর করে পাহাড়ী নদীর মতো ঝগড়া চললো জয় আর মহিমার মূল নায়কদের মধ্যে।

আধঘণ্টার মধ্যে জয় সম্বন্ধে আমরা এমন সব তথ্য শুনতে পেলাম মহিমার মুখে, আর মহিমা সম্বন্ধে জয়ের মুখে, যা ভাবাই যায় না। বহু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেলো, দুজনের মধ্যেকার অনেক নিবিড় ষড়যন্ত্র। জয়ের যে 'গৃহপালিত কুকুর' ছবিটার আমি খুব প্রশংসা করি আসলে সেটা নাকি আমাকে নিয়েই আঁকা। (এতদিন পবে মনে পড়ছে, কুকুরটাকে দেখে আমার কেমন মায়া হয়েছিলো, কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হয়েছিলো, কোথায় যেন অনেকবার দেখেছি, এখন কারণটা বোঝা গেলো।)

অন্যদিকে জয়ের মুখে জানা গেলো মহিমার পাপবোধ ছবিটা নাকি মল্লিক মশায়ের চবিত্র নিয়ে আঁকা। হলদে রঙ আর তিনটে কালো দাগের কী অর্থ তা এবার বেরুলো। তিনটে কালো দাগ তিনটি মহিলাকে বোঝাচ্ছে, আর তারা প্রত্যেকেই আমাদের অতি-পরিচিতা। তাদেব সঙ্গে শান্তশিষ্ট, রসিকপ্রকৃতির মল্লিকমশায়ের এমন সরস সম্পর্ক থাকতে পারে আমরা কখনো ভাবতেই পারিনি।

জয় এবং মহিমা ক্রমশঃ গোপনতর তথ্য ফাঁসের দিকে উৎসাহ দেখাতে লাগলো। জয় কেন প্রত্যেক দিন রাত্রি এগারোটায় বসুশ্রী সিনেমার উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকে, তাব মেজোমামা কি এক কুখ্যাত মামলায় ছ' বছর জেল খাটছে, তার ছোট বোন কেন প্রত্যেক সপ্তাহে বিরাটি যায়—সব জানাজানি হয়ে গেলো।

আর মহিমাই বা কি করে প্রাইজ পেয়েছিলো, মহিমার পায়ে যে সৌখিন লেডিস্ চপ্পল রয়েছে, তার মালিকান্ যে কে, সেটাও আমাদের জানতে হলো।

ইতিমধ্যে চৌমাথায় আমাদের চারদিকে ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে। ঝগড়ার সুযোগে একটা ভিখিরী বেশ দু'পয়সা কামানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

ঝগড়া করতে করতেই জয়দেব আর মহিমাময় মিনিট পনেরোর জন্যে হাজরা পার্কের পেছন দিকে চলে গেলো। তখনো হাজরা পার্ক পাতাল রেলের গুদাম হয়নি। রাত আটটার পরে উত্তরের দিকটা একটা মুক্তবায়ু খাবারখানা হয়ে যেতো। চেঁচামেচি করে গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো, একটু গলা ভিজিয়ে তারা আবার ফিরে এলো, ধীরে ধীরে রাত অনেক হয়ে গেলো কিন্তু দুজনের মধ্যে হাজার চেষ্টা করেও ঝগড়া থামানো গেলো না, আমরা তাদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলুম। ততক্ষণে দর্শকদের ভিড় আবার বেশ বেড়ে গেছে। একটা অকর্মাগোছের ট্রাফিক-পুলিশ ভাঙা বাংলায় কয়েকবার 'ক্যায়া হোতা হ্যায়, রাত বারো বাজ গিয়া' ইত্যাদি জানান দিয়ে দিয়ে

অবশেষে উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রাস্তায় লাঠি ঠুকতে লাগলো। আমি আর মল্লিকমশায় রাত বারোটায় ঝগড়া দেখবার জন্যে এত লোক কোথায় থেকে জড়ো হয় এই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

শুধু মজুমদার সাহেব-ই রয়ে গেলেন। কোনোদিন কোন কলহই তিনি অর্ধসমাপ্ত রেখে যাননি, আজো তার কোনো ব্যতিক্রম হলো না। আমরা যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখলাম মজুমদার সাহেব চৌমাথার পাশের রেলিং-এর ওপর বসে নির্বিকার সিগারেট টানছেন, নিচে ভিড়ের মধ্যে মহিমা আর জয়কে দেখা গেলো না কিন্তু তাদের উচ্চ, অশ্রাব্য কণ্ঠস্বর বহুদূর পর্যন্ত আমাদের কর্ণগোচর হতে লাগলো।

পরদিন নরমহাতের কড়া-নাড়ায় ঘুম ভাঙলো সাড়ে পাঁচটায়। একটু বিরক্ত হয়েই দরজা খুলেছিলাম। চার ঘণ্টাও ভালো করে ঘুমাইনি। খুলে দেখি মজুমদার-গৃহিণী, অসম্বৃত অলকদাম, নিশিজাগরণে লোহিতা-লোচনা, প্রায় বাড়ির পোশাকে বাইরে চলে এসেছেন, এই আমার বাড়ি পর্যন্ত। মজুমদার-গৃহিণী নিজের বাড়ি থেকে এগারো মাইল দূরের এক মেয়েকলেজের মর্নিং সেক্‌শনে পড়ান, প্রতিদিন শেষরাত্রিতে গৃহত্যাগ করেন। সুতরাং এই ভোর সাড়ে পাঁচটা যে আমার মধ্যরাত্রি এতটা তিনি বোধহয় পূর্বে অনুমান করতে পারেননি।

সমস্ত বিরক্তি চেপে, আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কি সৌভাগ্য, প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ— আসুন।' ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি মজুমদার সাহেব কাল রাত্রে বাড়ি ফেরেননি।

কিঞ্চিৎ শঙ্কা, কিঞ্চিৎ লজ্জাও বোধহয় মৃদু হাসির সঙ্গে মিশিয়ে একটা মোটামুটি সুসেব্য মিকশ্চার তৈরি করলেন মজুমদার-গৃহিণী, 'আপনার বন্ধু কাল রাত্রে আপনার এখানে ছিলেন না?'

আমি আমতা আমতা করে উত্তর দিতে যাচ্ছি, এমন সময় প্রায় উদ্ভ্রান্তের মতো মজুমদার সাহেব ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই কাল রাত্রের গৃহে অনুপস্থিতির জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে উল্টে গৃহিণীকে ধরলেন, 'তুমি এই সাতসকালে বাড়িতে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছো, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে!' আমার কয়েক মাস আগের এক শীতের রাত্রির কথা মনে পড়লো। মজুমদার সাহেব যেদিন বাড়ির চাবি পকেটে করে আমার ঘরে রাত্রে থেকে গিয়েছিলেন, সেদিন মজুমদার-গৃহিণী কি করেছিলেন?

কিন্তু আজ একটা দাম্পত্য-কলহ প্রায় আমার ঘরের মধ্যেই লেগে গেলো। আমি মধ্যে পড়ে মজুমদার-গৃহিণীকে বিরত করতে চেষ্টা করলুম, 'চাকরটা আবার নিরুদ্দেশ, সকালবেলায় বাড়িতে অতিথি এসেছেন, একটু চা খান, কেটলি স্টোভ সবই তো কোথায় আছে জানেন, দয়া করে একটু করে নিন।'

এইসব মুহূর্তে মজুমদার সাহেবের পত্নীপ্রেম দেখবার মতো, 'আমার স্ত্রী কেন আপনার বাড়িতে চা করবে? ভদ্রতা করতে হয় নিজে চা করে খাওয়ান!'

আমি আজকাল আর এসব কথায় অপমানিত হই না। চুপ করে রইলাম।

মজুমদার-গৃহিণী উঠে পাশের ঘরে চা করতে গেলেন। আমি মজুমদার সাহেবকে গতরাত্রের ঘটনা জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে, তারপরে তিনি মুখ খুললেন, বিস্তৃত বিবরণ দিলেন সমস্ত ঘটনার। মজুমদার সাহেবের কথা শুনতে শুনতে এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখলাম ওঁর শরীরের উপর দিয়ে গতকাল রাত্রে যেন দুর্দান্ত তাণ্ডব বয়ে গেছে। ধুতির কোঁচা শতচ্ছিন্ন, কানের নিচে রক্তবর্ণ আঘাতের চিহ্ন, বাঁহাতের দুটো আঙ্গুলে রক্তমাখা ন্যাকড়ার ফালি জড়ানো।

রাত একটার পর জয় আর মহিমা দুজনেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তখন আর মুখে মুখে নয়,

হাতে হাতে। বিটের জমাদারের মুখ-চেনা ছিলো মজুমদারেব, তাই থানা পুলিশ হয়নি। দুবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে মজুমদার সাহেব আহত হয়েছেন। একবার মহিমা ধাক্কা দিয়ে পার্কের রেলিং-এ ফেলে দেয়, পরের বার রাস্তার এক পাগলা ভিখিরীর গায়ে। সেই পাগলা ভিখিরীটাকে আমরা সবাই চিনি, নিরীহ ঠাণ্ডা মেজাজের। কিন্তু হঠাৎ আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে লাফিয়ে উঠে রাস্তা থেকে একটা ভাঙা বাঁশের টুকরো কুড়িয়ে তিনজনকেই বেধড়ক আক্রমণ করে। এতেই অবশ্য গোলমালের ফয়সালা হয়ে যায়। সেটা রাত তিনটের সময়। তারপর এতরাত্রে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না স্থির করে মজুমদার একা পায়ে হেঁটে আহত ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে দেখেন দুয়ার বন্ধ।

'কই, চা হতে এত দেরী হচ্ছে কেন?' মজুমদার সাহেব চীৎকার করে স্ত্রীকে তাগাদা দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নিচে শোনা গেলো, 'দু কাপ বেশি।' যেন কিছুই হয়নি এইরকম হাসিমুখে কালরাতের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ঘরে ঢুকলেন পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে, যেন গলায় গলায় ভাব জয়দেব আর মহিমাময় এলো। জয়ের পায়ের দিকে ধুতির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অন্তর্হিত, কাঁধে জামার কলার বলতেও প্রায় কিছুই নেই, কলারের নিচে পিঠের দিকে আধাআধিভাবে ছেঁড়া, একটা ফালি তেকোণা নিশানের মত উড়ছে। মহিমের তেমন মারাত্মক নয়, তার হাওয়াই সার্টের একটা হাতাই যা শুধু নেই আর খালি পা। তা ছাড়া দুজনেই ক্রমাগত চোখ পিটপিট করছে, দুজনেই চশমাধারী, কিন্তু আজ কারোর চোখেই চশমা নেই, উভয়েই উদ্ভ্রান্ত-দর্শন।

কাল রাত্রির ঘটনায় দুজনেই যথেষ্ট লজ্জিত। ব্যাপারটা একেবারেই যে ছেলেমানুষি হয়ে গেছে এটা প্রায় আমরা একমত হলুম, মজুমদারসাহেব বাদে। মজুমদারসাহেব ঐ ঘটনার মধ্যে শুভ্রচৈতন্য এবং মহৎ আত্মাভিমান বোধের আদর্শ আবিষ্কার করেছিলেন। সমস্ত বিষয়ে অনুধাবন করতে শ্রীমতী মজুমদারের বোধহয় একটু সময় লাগলো। চা খেতে খেতে প্রথম কয়েক মিনিট তিনি স্থির হয়ে স্বীয় স্বামী এবং জয় ও মহিমা কে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তারপর উদাসদৃষ্টিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন, মুখে কোথায় একটা অনির্দিষ্ট বঙ্কিম হাসি।

'শেষে তোমাদের দুজনেরই চশমা হারালো?' আমি জিজ্ঞেসা করলাম।

জয় বা মহিমা কিছু উত্তর দেয়ার আগে মজুমদারসাহেব বললেন, 'কিন্তু জয়ের চোখে তো শেষ পর্যন্ত চশমা ছিলো, মহিমারটাই তো হাজরা পার্কে হারালো।'

জয় বললো, 'আমার তো ছিলো চোখে যতদূর মনে পড়ে, তবে যা ব্যাপার, ভোরবেলা উঠে দেখছি না, বোধহয় সেইসময় কোথাও পড়ে গেছে। হাতে একটা পয়সা নেই, এখন চশমা তৈরি করি কি দিয়ে?'

'কি আর করা যেতে পারে!', মহিমা উদাসীন ভাবে জানালো, 'ওকাকু নামে সেই জার্মানিসাহেব একটা ছবি নেবে বলেছিলো, তা সে তো দিল্লী থেকে ফিরছে না, ততদিন অন্ধ হয়েই থাকতে হবে।'

'চোখে না দেখতে পেলে কি আপনাদের ছবি আঁকার খুব অসুবিধে হয়?' হঠাৎ মজুমদারগৃহিণী প্রশ্ন করে বসলেন।

মজুমদারসাহেব ফোঁস করে উঠলেন, 'তুমি চুপ কর তো, এর মধ্যে তুমি আবার কথা বলছো কেন?'

একটু পরে জয় উঠলো। তার সঙ্গে মহিমাও উঠলো। মিনিট দশেক পরে ফিরে এলো একা মহিমা, এবার তার চোখে চশমা।

'এ চশমা তুমি কোথায় পেলে?' মজুমদারসাহেব লাফিয়ে উঠলেন।

মহিমা মৃদু হেসে বললো, 'আমার পকেটে ছিলো, সিগারেট বের করতে গিয়ে দেখি রয়ে গেছে।'

'কিন্তু এ চশমা তো তোমার নয়।' মজুমদারসাহেব বললেন।

মহিমা কেমন আমতা আমতা করতে লাগলো, 'কিন্তু এটা তো আমারই বলে মনে হচ্ছে।'

'অসম্ভব।' মজুমদারসাহেবের সাফ্ জবাব, 'তোমার চশমা কালো মোটা লাইব্রেরি ফ্রেমের, আমার সঙ্গে গিয়ে কিনেছিলে। এটা জয়ের।'

'তোমাদের দুজনের কি একই পাওয়ার চশমার? কি করে তোমার চোখে জয়ের চশমা লাগছে?' আমি প্রশ্ন করি।

মহিমা প্রথম প্রশ্ন এড়িয়ে গেলো, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যা বললো তার সারাংশ এইরকম।ঃ যখন চোখে চশমা থাকে তখন তো আর চশমা দেখতে পাই না, আর যখন থাকে না তখন তো চোখেই দেখতে পাই না। নিজের চশমা চেনা অসম্ভব।

এই যুক্তি অনস্বীকার্য, কিন্তু একই চশমা দুজনের হলো কি করে?

মজুমদারসাহেব গৃহিণীকে বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও, আমি আসছি।' তারপর আমাকে বললেন, 'আপনি আসুন মহিমাকে নিয়ে জয়ের ওখানে যাই,—দেখি জয়ের চশমার কি হোল?'

ব্যাপারটা একটু বেশি গোলমেলে, কিন্তু আমাকেও উঠতে হলো। জয়ের ওখানে গিয়ে দেখলুম সে খালিচোখেই পিটপিট করতে করতে ছবি আঁকছে।

'এই চশমাটা কার?' মহিমার চোখ থেকে চশমাটা খুলে জয়ের চোখের সামনে তুলে ধরলেন মজুমদারসাহেব।

'কী করে বলি?' যেন ঈশ্বর বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা হয়েছে এই রকম নির্লিপ্ত ভাবে ছবি আঁকতে আঁকতে জয় উত্তর দিল।

'আশ্চর্য!' মজুমদারসাহেব ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে হাতের চশমাটা জানালা দিয়ে তিনতলার বাইরের আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

'তোমার খালি চোখে কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না, আর এর অন্যের চশমা চোখে দিয়েও কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। যত সব বুজরুকি! এব পরে যদি কারোর চোখে চশমা দেখি চোখ গেলে দেবো!' মজুমদারসাহেব আমাকে সঙ্গে নিয়ে গজ্‌গজ্ করতে করতে বেরিয়ে এলেন।

তারপর থেকে জয়ে আর মহিমা কারো চোখেই চশমা নেই। আর কি এক অজ্ঞাত কারণে দুজনেরই নতুন ছবিগুলি খুব সরল আর বোধ্য হয়ে উঠলো এবং শেষ পর্যন্ত এতই সরল হয়ে গেলো যে তারা ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

সার্জন সাহেবের বাড়িতে

বছর কুড়ি আগে একটা সরকারী চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিলেন দিগন্ত রায়চৌধুরী। কলকাতার আড্ডা ছেড়ে, সংসার গুটিয়ে প্রথম যখন দিগন্তবাবুকে দিল্লি যেতে হল নিতান্তই জীবিকার প্রয়োজনে, তাঁর মনে হয়েছিল খুব বেশি দিন হয়তো কলকাতা ছেড়ে টিঁকতে পারবেন না।

কিন্তু তারপরে যেরকম হয় যথাসময়ে দিল্লির সঙ্গে দিগন্তবাবু নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। এখন সেখানেই পাকাপাকি বসবাস। এমন কি অবসর গ্রহণের পরে দিল্লিতেই থেকে যাবেন বলে দক্ষিণ দিল্লির শেষপ্রান্তে একটা ছোটখাট ফ্ল্যাটও বায়না করেছেন।

আগে তবু কালেভদ্রে দু'চার বছরে এক-আধবার কোনো না কোনো কারণে কলকাতায় আসা হত। একবার ভাইপোর পৈতে, একবার বিশেষ ঘনিষ্ঠবন্ধুর বিয়ে, আরো দুবার অফিসের টুকটাক কাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন দিগন্তবাবু। আত্মীয়স্বজন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, পুরনো অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল।

সে সবও অনেক দিন, অনেক বছর হয়ে গেল। কলকাতার প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ কমে এসেছে। প্রধান আত্মীয়দের এখন অনেকেই কলকাতা এবং জগৎসংসারের মায়া কাটিয়ে পরলোকে প্রস্থান করেছেন। দু,একজন বন্ধুও সে পথ অনুসরণ করেছে। আর বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা জায়গায়, তাদের নিজেদের মধ্যেও কদাচিৎ দেখা হয়। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখন দিগন্তবাবুর মতই প্রবাসী, দু-একজন বিদেশেও স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে।

বছর পাঁচেকের মধ্যে কলকাতায় আসা হয়নি। শেষবার যখন এসেছিলেন সেও খুব অল্প সময়ের জন্য। অফিসের একটা কাজ ছিল, শুক্রবার এসেছিলেন, সে দিনটা অফিসের ব্যাপারে গেল, তারপর দুদিন শনিবার রবিবার ছুটি ছিল, সেই দুটো দিন কলকাতায় কাটিয়ে সোমবার ভোরের বিমানে দিল্লি ফিরেছিলেন দিগন্ত।

ঐ ছুটির দিন দুটোয় বন্ধুবান্ধবকে একটু জমায়েত করে আগের মত হৈ-হুল্লোড় করার ইচ্ছে ছিল তাঁর। দুঃখের কথা সেবার তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করাই সম্ভব হল না। কারো কারো ঠিকানা বদল হয়েছে। যাদের টেলিফোন আছে তাদেরও টেলিফোন নম্বর বদলিয়ে গেছে কিংবা টেলিফোন বাজেনি। বাজলেও ভুল বেজেছে, কেউ ধরেনি কিংবা যে ধরেছে সে অন্য লোক, ফোন তুলে নম্বর শুনে বিজাতীয় ভাষায় ধমকিয়ে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত তবু কয়েকজনের সঙ্গে সংযোগ করা গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যেও কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব। কলকাতায় যে সরকারী অতিথিশালায় দিগন্তবাবু ওঠেন, লোয়ার সার্কুলার রোডের সেই বাড়িতে বন্ধুদের শনিবার সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল সবাই এলে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে তারপর কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায় গিয়ে কিঞ্চিৎ পানভোজন করবেন।

কিন্তু কেউই প্রায় এল না। শুধু মহিমাময় এসেছিল। সেও সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ উঠি উঠি করতে লাগল। একেবারে জমল না ব্যাপারটা। আটটা নাগাদ বন্ধুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিগন্তবাবু একটা সিনেমা দেখতে একাই বেরিয়ে গেলেন।

সিনেমা ভাঙার পর অতিথিশালায় এসে দেখেন বেশ হৈচৈ হচ্ছে। তাঁর অন্য এক পুরনো বন্ধু জয়দেব, তারও সন্ধ্যাবেলা আসার কথা ছিল, তখন আসেনি, এখন সঙ্গে তিনজন সম্পূর্ণ অন্য লোক নিয়ে চারজনেরই সম্পূর্ণ টালমাটাল অবস্থা, অতিথিশালার ঘরে ঘরে ধাক্কা দিয়ে মিস্টার দিগন্ত রায়চৌধুরীকে খুঁজছে।

প্রায় মধ্যরাত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সবাইকে ঘুম ভাঙিয়ে ওরা চারজন স্খলিতচরণে এবং জড়িত কণ্ঠে রীতিমত তত্ত্বতালাসি চালাচ্ছে তাঁর জন্য।

লম্বা টানা বারান্দার দু পাশে সারি দেওয়া ঘর। প্রায় প্রতিটি ঘরেই অতিথি রয়েছে, তাঁদের মধ্যে দরজার ফাঁক দিয়ে সদ্যজাগ্রতা বিস্রস্তবসনা মহিলাও রয়েছেন, তাঁরা আলো জ্বালিয়ে জেগে উঠে বসেছেন। পর্যায়ক্রমে জয়দেব ও তার বন্ধুরা 'দিগন্ত', 'দিগন্তবাবু', 'মিস্টার রায়চৌধুরী', 'রায়চৌধুরী মশায়' ইত্যাদি নানা সম্বোধনে ঘরে ঘরে করাঘাত করে তাঁকে খুঁজছে এবং কোনো ঘরেই পাচ্ছে না—আর সব ঘরেই 'সরি', 'ভেরি সরি', 'খুব দুঃখিত', 'মাফ কিজিয়ে' ইত্যাদি নানা ভাষায় মদ্যপজনোচিত ক্ষমাপ্রার্থনা করছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই দৃশ্য দেখে দিগন্ত প্রথমে ভেবেছিলেন আত্মগোপন করবেন। মাতালেব গোঁ বড়জোর দশ মিনিট থাকে। সুতরাং কিছুক্ষণ উল্টো দিকের ফুটপাতে পায়চারি করলেই বিড়ম্বনার হাত থেকে অনায়াসে রক্ষা পাওয়া যাবে।

দিগন্ত বায়চৌধুরী তাই করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হল এই দেড় দশকে কলকাতা শহর অনেক বদলিয়ে গিয়েছে, অনেক পরিবর্তন হয়েছে এই শহরের তাঁর চেনাজানা লোকেদের মধ্যে। এই তো সন্ধ্যাবেলা মহিমাময় এসেছিল, আগে কি আড্ডাবাজ ছিল, জয়দেবেব এককাঠি ওপবে, এখন কেমন হয়ে গেছে। শুধু জয়দেব, একমাত্র জয়দেব আগের মত আছে। একমাত্র সেই এখনো পুরনো বন্ধুদের খোঁজে মধ্যরাতে তোলপাড় করে। কুড়ি বছর আগের জযদেবেব নানা গল্প দিগন্তের মনে পড়ল। একবার তাঁর জন্ডিস হয়েছিল। পি জি হাসপাতালের দোতলায় একটা ওয়ার্ডে ছিলেন, সেখানে রাত আড়াইটার সময় আজকের মতই সেদিন জয়দেবের সদল অনুপ্রবেশ। আরেকবার জয়দেবের সঙ্গে শান্তিনিকেতন যাওয়ার কথা। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত জয়দেব এল না। তারপব ট্রেন যখন বেশ জোরগতিতে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ অন্ধকার থেকে ভূতের মত এক লাফ দিয়ে জীবন বিপন্ন করে জয়দেব কামরায় উঠল।

অনেক দূরে একটা নতুন হোটেলের কার্নিস থেকে একটা সাবানের রঙিন বিজ্ঞাপন একবার নীল হচ্ছে, একবাব লাল হচ্ছে, একবাব পুরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। যে কোনো শহরে যে কোনো বাতে এরকম হয়ে থাকে। এখন রঙিন আলোর ওই নেবা-জ্বলার দিকে তাকিয়ে অনেক পুবনো কথা মনে পডল দিগন্ত রায়চৌধুরীর। তিনি আর দেরি করলেন না, দ্রুতপদে সিঁড়ি দিযে উঠে মাতাল-ত্রয়ীর বেষ্টনী ভেদ করে জয়দেবকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন।

এ অবশ্য পাঁচ বছরের পুরনো ঘটনা। গত পাঁচ বছরে দিগন্তবাবুর আর কলকাতা আসা হয়নি। এবারো আসার কথা ছিল না। একটা কাজে পাটনা এসেছিলেন। আসার কয়েকদিন আগে বন্ধু মহিমাময় অর্থাৎ মহিমার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলেন দিল্লিতে। পুরনোদের মধ্যে ঐ মহিমাই এখনো সময়ে অসময়ে যোগাযোগ রাখে। মহিমা লিখেছে, জয়দেবের শরীর খারাপ। খুব সম্ভব পেটে আলসার। গুডবাই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছে, সেখানেহ পরীক্ষা- নিরীক্ষা চলছে। এখনো সব জানা যায়নি।

এ চিঠি পেয়ে একটু দ্বিধায় পড়েছিলেন দিগন্তবাবু। তাঁর প্রথম খটকা লেগেছিল এই চিন্তা করে যে, কোনো নার্সিংহোমের নাম গুডবাই নার্সিংহোম হওয়া উচিত কিনা। এবং যদি এরকম নামই হয়, তা হলে সেখানে কারো ভর্তি হওয়া উচিত কিনা। তবে জয়দেবের ব্যাপারই আলাদা।

তাছাড়া দিগন্তবাবুর অনেকদিন পরে মনে পড়ল, তাঁদের পুরনো ভবানীপুরের পাড়ায় বলহরি ডাক্তারের কথা। বলহরি নাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রোগীর কোনো অভাব হত না।

বলহরি ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সর্বদাই লোকের ভিড়ে গমগম করত।

পাটনা থেকে একবেলার জন্যে কলকাতায় এলেন দিগন্তবাবু, একটু জয়দেবের ব্যাপারটা খোঁজ নেবার জন্যে। ঠিক কি হয়েছে, কি চিকিৎসা চলছে।

তবে মহিমার চিঠিতেই দিগন্তবাবু জানতে পেরেছিলেন তাঁদের এক পুরনো বন্ধু, ডাক্তার লোকনাথ দত্ত, যিনি সার্জন হিসাবে আজ কিছুদিন হল বেশ নাম করেছেন, তাঁরই তত্ত্বাবধানে আছে জয়দেব। গুডবাই নার্সিং হোমের সঙ্গেও ডাক্তার লোকনাথ দত্ত জড়িত রয়েছেন। রোগীরা অনেকে এখানেই ভর্তি হয়, এখানেই লোকনাথ তাঁদের অপারেশন করেন।

পাটনা থেকে রাত্রির ট্রেনে উঠে সকালে এসে কলকাতায় পৌঁছেছেন দিগন্ত। বিকেলের প্লেনে দিল্লি ফিরবেন। হাতে সময় খুব কম। তাও আবার ট্রেনটা হাওড়ায় আসতে তিন ঘণ্টা লেট হয়েছে।

কলকাতায় পৌঁছে হাওড়া স্টেশন থেকে প্রথমেই মহিমাকে একটা ফোন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পেলেন না, হয় হাওড়া স্টেশনের ফোনটা খারাপ, না হয় মহিমার ফোন খারাপ। অথবা দুটোই খারাপ।

সে যা হোক, ফোন করা নিয়ে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট না করে একটা ট্যাক্সি নিলেন। ফোন করার চেয়ে হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি ধরা কঠিন নয়। প্রায় আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর বহুকষ্টে এবং মিটারের ওপর পনেরো টাকা বেশি দেবেন কবুল করে শেয়ালদা পাড়ায় একটা পুরনো হোটেলে এসে উঠলেন। রাত্রিবাস করতে হচ্ছে না, হোটেলের দরকার তেমন নেই, তবু স্নান-খাওয়া করার জন্যে আর যদি ফোন-টোন করা যায় সেই উদ্দেশ্যে একদিনের জন্যে ষাট টাকা ভাড়ায় একটা ঘর নিলেন। তারপর স্নানটান সেরে মুখে দুটি ভাত দিয়ে দিগন্ত রাস্তায় বেরোলেন। এর মধ্যে হোটেলের ম্যানেজারের ঘর থেকে আরেকবার মহিমাকে এবং সেই সঙ্গে গুডবাই নার্সিং হোমে ফোন করার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। কাউকে অবশ্য পাননি, তবে এর মধ্যে ক্রশ কানেকশনে একটি চাঞ্চল্যকর কথোপকথন শুনতে পান। ভেজাল তেল খেয়ে সদ্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক রোগীকে অভিজ্ঞ পক্ষাঘাতগ্রস্ত দ্বিতীয় এক রোগী কিভাবে দেয়াল ধরে হাঁটতে হয় নির্দেশ দিচ্ছিলেন, সেটা শুনে দিগন্ত চমৎকৃত হন এবং ভবিষ্যতে যদি সত্যি কখনো পক্ষাঘাত হয় সেই জন্যে এই নির্দেশাবলী তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। বেশ কিছুক্ষণ লেগেছিল শুনতে, ফলে হোটেল ম্যানেজারের কেমন সন্দেহ হয় যে এটা রং নম্বর নয়, দিগন্তবাবু কথা বলছেন না শুধু শুনছেন, রং নম্বর বলে টেলিফোনের খরচা কাটিয়ে দেবেন বলে। ফলে কিঞ্চিৎ অপমানিত হয়ে দিগন্তবাবুকে ফোনের জন্যে দেড় টাকা দিতে হয়। এরপরে তিনি রাগ করে তখনই তাঁর ছোট সুটকেসটা যেটা হোটেলে রেখেছিলেন সেটা হোটেল থেকে নিয়ে রাস্তায় সরাসরি বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তায় নেমে আবার বহুকষ্টে ট্যাক্সি। মহিমার চিঠিতে দুটো ঠিকানা আর ফোন নম্বর দেওয়া আছে, একটা গুডবাই নার্সিংহোমের অন্যটা ডাক্তার লোকনাথ দত্তের। মহিমার ইনল্যাণ্ড লেটারটা খুলে ডাক্তার লোকনাথ দত্তের ঠিকানা আর ফোন নম্বর চোখে পড়তে দিগন্তের মনে হল একবার ডাক্তার দত্তকে ফোনে ধরতে পারলে হত। কিন্তু কোথায় ফোন করতে যাবেন, আর ফোন পাবেন কিনা এই সব ভেবে নিরস্ত হলেন।

একটু খুঁজে বেলেঘাটায় সি আই টি রোডের ধারে গুডবাই নার্সিংহোম পাওয়া গেল।

সাইনবোর্ডটা দেখে একটু বিস্মিত হলেন দিগন্ত, একটু কৌতুকও বোধ করলেন। গুডবাই নার্সিং হোম নয়, গুডবাই ম্যাটারনিটি হোম, ঠিকানা মিলিয়ে দেখলেন ঠিকই আছে। মানে জয়দেব এখানেই ভর্তি হয়েছে। কিন্তু ম্যাটারনিটি হোমে আলসারের কি চিকিৎসা হবে! শুধু জয়দেবের পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব।

অবশ্য ভেতরে গিয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে দিগন্ত জানতে পারলেন যে ম্যাটারনিটি হোম হলেও যখন প্রসূতির সংখ্যা কম থাকে ছোটবড় চিকিৎসা বা অপারেশনের জন্যে অন্য রোগীও নেওয়া হয়।

সে ঠিক আছে, কিন্তু ম্যাটারনিটি হোমে জয়দেবের পাত্তা পাওয়া গেল না। জানা গেল, জয়দেববাবু এখানেই চিকিৎকার জন্যে এসেছেন বটে কিন্তু তিনি প্রতিদিন সকালবেলা বেরিয়ে যান আর ফেরেন অনেক রাতে। এর মধ্যে আবার দুদিন রাতেই আসেননি।

জয়দেবের স্বভাব দিগন্তবাবুর জানা আছে। তিনি এ খবরে মোটেই বিস্মিত হলেন না, বরং এই ভেবে আশ্বস্ত বোধ করলেন যে জয়দেবের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ নয়—তাহলে এত চলফেরা করতে পারত না।

গুডবাইয়ের লোকেদের কাছে দিগন্ত জানার চেষ্টা করলেন, জয়দেবের শারীরিক অবস্থা এখন সত্যি কিরকম। তাঁরা বললেন, সে বলা অসম্ভব। ভাল করে পরীক্ষাই করা যাচ্ছে না, জয়দেবকে ধরাই কঠিন। তবে ডাক্তার এল এন দত্ত দেখেছেন, তিনি সম্ভবত অপারেশন করবেন। তাঁর কাছে জানা যেতে পারে।

দিগন্ত বুঝতে পারলেন এল এন দত্ত মানে লোকনাথ দত্ত, তাঁদের পূর্বপরিচিত বন্ধুস্থানীয় ডাক্তার। এখন সার্জন হিসেবে বেশ নাম হয়েছে। মহিমের চিঠিতে সে কথা আগেই জেনেছেন।

দিগন্তবাবু গুডবাইয়ের রিসেপশনে বললেন, 'আমি জয়দেববাবুর পুরনো বন্ধু, দিল্লি থেকে এসেছি, সার্জন দত্তও হয়তো আমাকে চিনবেন। সার্জন সাহেবের সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই।'

স্থূলকায়া একজন অবসরপ্রাপ্ত নার্স রিসেপশনে বসেন, তিনি জানালেন, 'সার্জন সাহেব তো এ বেলা আসবেন না। বিকেলে একটা হার্নিয়া অপারেশন আছে, পাঁচটা নাগাদ আসবেন।'

গুডবাই থেকে সুটকেস হাতে আবার রাস্তায় নেমে পড়লেন দিগন্তবাবু। বেলা প্রায় একটা বাজে। চারদিকে গনগনে গরম, কাঠফাটা রোদে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। তিনি ঠিক করলেন, এসেছেনই যখন অন্তত একবার ডাক্তার লোকনাথ দত্তের বাড়িতে গিয়ে জয়দেবের ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে যাবেন। যদিও বেলা একটায় কারো বাড়িতে যাওয়া সঙ্গত নয়, কি আর করা যাবে—তা ছাড়া লোকনাথ দত্ত একসময়ের চেনা।

কাছাকাছি কোথাও কোনো ট্যাক্সি নেই। সুটকেস হাতে রোদে হেঁটে ঘামতে ঘামতে দিগন্ত বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালেন। ট্যাক্সি এখানেও নেই। একটা সামান্য খালি মিনিবাস এলে সেটায় উঠলেন। মহিমের চিঠিতে ঠিকানাটা ছিল ডাক্তার দত্তের। এখান থেকে বেশি দূরে না, ভি আই পি রোডে উল্টোডাঙার মোড়ের কাছে ডাক্তার দত্ত থাকেন।

মিনিবাস থেকে নেমে একটু খুঁজতেই বাসাটা পাওয়া গেল। বাইরের দরজায় পুরনো ঢঙের পিতলের নেমপ্লেটে ঝকঝকে অক্ষরে নামটা লেখা রয়েছে—ডক্টর এল এন দত্ত এম বি বি এস। আর নিচে চিঠির নিচের পুনশ্চের মতো কাঠের নেমপ্লেটে এম এস এবং আরো দশটি ইংরেজি

অক্ষর। বোঝা গেল পিতলের নেমপ্লেট বানানোর পরে এই উপাধিগুলো আয়ত্ত হয়েছে।

কিন্তু দিগন্তবাবুর ভাগ্য আজ ভাল নয়।

সার্জন সাহেব বাড়ি নেই। ডক্টরের ঘরে একটি ফুটফুটে মেয়ে, বয়েস নয় দশ বছর হবে, সোফার ওপরে উবু হয়ে বসে আপনমনে একটা বড় ড্রয়িংখাতায় একটা লালরঙের বাঘেব ছবি আঁকছিল। দিগন্তবাবু দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে সে তাড়াতাড়ি বাঘের মুখে কয়েকটা নীল বঙেব গোঁফ এঁকে দিয়ে তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

দিগন্তবাবু প্রশ্ন করলেন, 'সার্জন সাহেব বাড়ি আছেন?'

লাল রিবন বাঁধা চুলের বেণী সমেত পুরো মাথাটা নেড়ে মেয়েটি বলল, 'না' নেই।'

দিগন্তবাবু ভাবলেন একটু বসে গেলে হয়, হয়তো আসতে দেরি হবে না , তাই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি সার্জন দত্তের মেয়ে?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ।' এবং দিগন্তবাবু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, 'আমার নাম নীলাম্বরী দত্ত। বাবা বলে নীলা, মা বলে নীলু।'

মেয়েটিকে বেশ সাব্যস্ত মনে হল দিগন্তবাবুর। তিনি তাকে বললেন, 'দ্যাখো নীলাম্বরী, আমি তোমার বাবার একজন পুবনো বন্ধু। এখন দিল্লিতে থাকি, অনেকদিন দেখাশোনা নেই। একটা ব্যাপারে তোমার বাবার কাছে একটু খোঁজ নিতে এসেছিলাম।'

নীলাম্বরী বলল, 'কিন্তু বাবা তো এখন আসবে না। বাবা গেছে ডাক্তার চক্রবর্তীর নার্সিং হোমে। সেখানে একটা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন আছে।'

এইটুকু মেয়ের মুখে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের মতো জটিল শব্দের উচ্চারণ শুনে একটু চমকিত হলেন দিগন্তবাবু। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কতক্ষণ লাগবে মনে হয়?'

নীলাম্বরী বলল, 'যদি ফেটে, টেটে গিয়ে না থাকে-তা হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ব্লাবাব কাজ সারা হয়ে যাবে।'

এই শুনে দিগন্তবাবু বললেন, 'তা হলে আসতে দেরি হওয়ার কথা নয়।'

নীলাম্বরী বলল, 'পাগল নাকি! বাবার কি একটা অপারেশন? সকালে একটা করেছে তারপর বাড়ি এসে জলখাবার খেয়ে এই অপারেশনটা করতে গেছে। অপাবেশনের পরে ডাক্তার চক্রবর্তীর বাড়িতে দুপুরের ভাত খাবে। তারপর সেখান থেকে যাবে দমদম।'

অন্যমনস্কভাবে দিগন্তবাবু বললেন, 'দমদম!'

নীলাম্বরী বলল, 'দমদম সেবায়তনে একটা আলসারের অপারেশন আছে। রোগী বুড়ো, তার আবার হার্ট ভালো নয়।'

নীলাম্বরীর মুখে এরকম সব কঠিন কথা শুনে এতক্ষণ দিগন্তবাবু বেশ কৌতুকবোধ করছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার পরে?'

নীলাম্বরী বলল, 'তারপরে ঐ গুডবাই নার্সিংহোম, বেলেঘাটায়। সেটায় হয়তো তেমন সময় লাগবে না—হার্নিয়া অপারেশন।'

এসব শুনে দিগন্তবাবু বুঝতে পারলেন এখানে এখন আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। তার চেয়ে মহিমার একটা খোঁজ করলে হয় । তার কাছে যদি কিছু জানা যায়।

সুটকেস নিয়ে রাস্তায় বেরোতে বেরোতে তিনি দেখলেন নীলাম্বরী তার পিছনে পিছনে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। একটু থেমে দাঁড়িযে তিনি নীলম্বরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি

যে এত সব কঠিন অসুখের নাম করলে, যেগুলো তোমার বাবা অপারেশন করছে, সেগুলো কি ব্যাপার তুমি জানো কি?'

নির্বিকার মুখে নীলাম্বরী বলল, 'হ্যাঁ জানি। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস সাধারণ হলে এক হাজার টাকা, আলসার দেড় হাজার টাকা, হার্নিয়া সাড়ে সাতশো টাকা।'

উত্তর শুনে হতভম্ব হয়ে দিগন্তবাবু রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। বাইরে রোদের তাপ আরো চড়া। রাস্তায় ধোঁয়া উঠছে। এই রোদে জয়দেব কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। আর খোঁজ করে লাভ নেই। একটা ট্যাক্সি হাতের কাছে পেয়ে গেলেন, সেটা ধরে সোজা এয়ারপোর্টে।

কবিতা ও ফুটবল

ভণিতা

এ্যানন (Anon) সাহেবের লেখা একটি বহু প্রচলিত ইংরেজী কবিতার অনুবাদ করছিলেন এক অর্ধখ্যাত বাঙালী কবি। তাঁর অনুবাদটি তেমন ভাল হয় নি, উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু আমার এই নিতান্ত সত্যঘটনা অবলম্বনে রচিত সৎ উপাখ্যানে সেই অক্ষম বাংলা অনুবাদটি একটু স্মরণ করতে হচ্ছে।

সম্পূর্ণ অনুবাদটি পুনরুদ্ধার করা রুচিসুখকর হবে না, শুধু আমাদের এই প্রতিবেদনের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তাই উপস্থাপন করছি।

সেই অনুবাদ পদ্যটি এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই। কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তির প্রতি এখনও আমার আস্থা হারায় নি, সুতরাং মনে করা যাক,

যেখানে দুই ল্যাম্পপোস্টের মধ্য দিয়ে
লম্বা পেনাল্টি কিকে
কে যেন শূন্যে পাঠিয়ে দেয়
চাঁদের ফুটবল।
গ্যালারিতে অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন মানুষেরা
চেঁচিয়ে ওঠে,
'গোল, গোল,
গোল।'

ভাগ্যিস এই কবিতাটি এই মোক্ষম মুহূর্তে সদ্য সদ্য মনে পড়ল, তা না হলে কবিতা ও ফুটবল একত্রে মেলানো আমার সাধ্যি ছিল না। গল্পের খাতিরে গল্পটা লিখতেই হচ্ছে, কিন্তু সবকিছুর তো একটা যুক্তি চাই।

বহুকাল আগে এক ভিন্নদেশী যুক্তিবাদী দার্শনিক তাঁর আদর্শ সমাজ থেকে কবিদের নির্বাসন দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই স্বপ্নের সমাজ এখনও বহুদূরের ব্যাপার।

ফলে সমাজে এখনও যথেচ্ছভাবে কবিরা বিচরণ করছেন। হয়ত তাঁদের কারও কারও কাছে ফুটবলের গোলমালটা ভাল নাও লাগতে পারে।

কিন্তু আমার একটা ব্যক্তিগত সুবিধা আছে, আমি কোন কবিকে এখন পর্যন্ত চিনি না। আমার জানাশোনা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমনও একজন নেই যাকে কবি বলা যেতে পারে বা কবি বলে ভাবা যেতে পারে। কোনদিন কোন কবিকে আমি স্বচক্ষে দেখি নি এ কথা বলা যাবে না, কিন্তু তাঁরা কেউ আমাকে জানেন না আর আমিও তাঁদের সঙ্গে পরিচিত নই।

সুতরাং এই অপরিচয়েব সুযোগে একজন কবিকে নিয়ে একটু চপলতা করলাম। আশা করি তিনি এবং অন্য কবিরা কবিজনোচিতগুণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা করবেন।

অবশ্য আমার হয়ত এত সাবধানতার প্রয়োজন নেই। ফুটবল বিষয়ক এরকম একটি স্থূল এবং মোটামুটি ভাবে হাস্যকর রচনা কস্মিনকালে কোন কবি পড়বেন, এরকম ভুল আশা করাই আমার অন্যায়। আমার অন্তরাত্মা বলছে, এই লেখা কোন কবি চোখ বুলিয়েও দেখবেন না, সরাসরি সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাকয়টি দ্রুত উলটিয়ে যাবেন।

তবে একচক্ষু হরিণের মত আমি তো এতক্ষণ অন্যদিকটা মোটেই ভাবি নি। যদি ফুটবলের কোন লোক ফ্যান,—খেলোযাড়, বেফারি বা সাংবাদিক কারও নজরে এ লেখা পড়ে, আমি রেহাই পাব তো?

কবির প্রতিভা

কবিতা ও ফুটবল এই দুই বিপজ্জনক পদার্থ একত্র করা উচিত হল কিনা এবং পরিণামে সেটা কতটা বিস্ফোরক হতে পারে, সেই বিষয়ে এই গল্পের দুর্বল কাহিনীকার তারাপদ বাযেব নিজের মনেও দুশ্চিন্তা রয়েছে। ভণিতায় তা কিছুটা বলেছি।

তবে গল্প যখন লিখতে হবেই, উপায় কি? বিস্ফোরক যদি হয় হল, দ্বিধা না করে দ্রুত মূল কাহিনীতে প্রবেশ করছি।

রঞ্জন চক্রবর্তী একজন উদীয়মান তরুণ কবি। সম্প্রতি কিছুদিন হল তাঁর বেশ নাম হয়েছে। চারদিকে পত্র-পত্রিকায় রঞ্জনবাবুর কবিতা অল্পবিস্তর প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদকেব এবং অনেক পাঠক-পাঠিকার সে সব কবিতা পড়ে বেশ ভাল লাগছে।

ফলে রঞ্জনবাবু ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছেন। সভাসমিতি থেকেও তাঁর ডাক আসছে মাঝে মধ্যেই। কবি হতে গেলে শুধু কবিতা লিখলে বা ছাপিয়েই শেষ হয় না, একালে চল হয়েছে কবিকে দিয়ে সভায় বা কবিসম্মেলনে সে সব কবিতা নিজেকে পাঠ করে শোনাতে হবে শ্রোতাদের। শ্রোতারা কখনও কখনও হাততালি দিয়ে, চেয়ারের হাতল চাপড়িয়ে উৎসাহ দেন, আবার কখনও ঐ একই কবিতা পাঠের মধ্যস্থলে হাততালি দিয়ে বা চেযার চাপড়িয়ে বসিয়ে দেয়।

আজ রঞ্জন চক্রবর্তী উত্তর বারাসাত রাইজিং স্টার ক্লাবের সভায় কবিতা পড়তে এসেছেন। রাইজিং স্টার ক্লাবের এবার রৌপ্য জয়ন্তী উৎসব হচ্ছে। রাইজিং স্টার আসলে একটি ফুটবল ক্লাব, তবে ঐ জয়ন্তী বৎসর বলে এরা এবার বার্ষিক অনুষ্ঠানটি একটু ধুমধাম করে করছে। স্থানীয় কয়েকজন ফুটবল প্লেয়ারের সঙ্গে তারা একজন অভিনেত্রী, দুজন গায়ক এবং পাঁচজন কবিকেও সংবর্ধনা জানাচ্ছে।

ফুটবল প্লেয়ারদের বক্তৃতা, অভিনেত্রীর আবৃত্তি, গায়কদের গান ইত্যাদির শেষে কবিরাও কবিতা পাঠ করলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল এসবের পর। একে একে সকলকে

ক্লাবের তরফ থেকে একটি করে উপহার দেওয়া হল।

রঞ্জন চক্রবর্তীও একটি উপহার পেলেন। রঙিন কাগজে জড়ানো কি একটা জিনিস। সঙ্কোচ-বশত সেটা আর খুলে দেখলেন না।

ফেরার পথে ট্রেনে বসে শেয়ালদার পথে অন্য কবিদের সঙ্গে রঞ্জনবাবুও প্যাকেটের রঙিন মোড়ক ছাড়িয়ে দেখলেন ভিতরে কি উপহার আছে। প্রত্যেক কবিই একটা করে প্যাকেট পেয়েছে। প্রত্যেকেরই প্যাকেটে একটা করে সুদৃশ্য ফুলদানি রয়েছে, সুন্দর রঙিন কাচের জিনিস। কিন্তু রঞ্জনবাবুর মোড়কের ভেতর থেকে যেটা বেরল, সেটা একটু অন্যরকম। জিনিসটা ঠিক কাব্যময় নয়।

একটা কালো আবলুস রঙা কাঠের ওপর তামার তৈরি কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড়ের সাবলীল মূর্তি এবং তাদের পদপ্রান্তে একটি ফুটবল। অর্থাৎ, একটি সচল ফুটবল খেলার দৃশ্য। সাধারণত ছোটখাট ম্যাচে বিজয়ীদের এই ধরনের শীল্ড দেয়া হয়।

অন্য দশজনের মতো বাল্যে ও কৈশোরে রঞ্জনবাবুও ফুটবল খেলেছেন। সে আহামরি কিছু নয়। আজ কবি হিসেবে এসে ফুটবলের শীল্ড পেয়ে তিনি একটু বিব্রত বোধ করলেন। সহযাত্রী কবি চারজনও ঠোঁট টিপে হাসলেন, একজন বক্রোক্তি করলেন, 'খুব ভাল খেলেছ রঞ্জন, একেবারে শীল্ড পেয়ে গেলে।'

রঞ্জন চক্রবর্তী বুঝতে পারলেন, কোথাও একটা কিছু ভুল হয়েছে। কোন খেলোয়াড়ের উপহারটা তাঁর ভাগে এসে পড়েছে আর সেই খেলোয়াড় তাঁর কাঁচের ফুলদানিটা লাভ করেছে।

এই ঘটনা এখানে শেষ হলে এ গল্প লেখার দরকার হত না। আমাদের এই সামান্য কথিকা এর পরেই শুরু হচ্ছে। এরপরের, মানে কবি রঞ্জন চক্রবর্তী ফুটবলের শীল্ড পাওয়ার পরে।

রঞ্জনবাবুর বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। এখন পাকাপাকিভাবে তাঁর কোন জীবিকা নেই। পত্র পত্রিকায় অনিয়মিত কিছু গদ্য লিখে এবং দু-চারটে টিউশনি করে কোন রকমে নিজের ব্যয় নির্বাহ করেন রঞ্জনবাবু। বিয়ে করেন নি এখনও, বিশেষ দায়দায়িত্ব খুব একটা নেই। যাদবপুরের দিকে একটা বাড়ির দেড়তলায় গ্যারেজের উপরের ঘরে নিজের থাকার জায়গা করে নিয়েছেন। সেই ঘরে একটা ছোট র‍্যাকে ভর্তি যত রাজ্যের কবিতার বই, তারই উপরের তাকে তিনি উত্তর বারাসাত থেকে পাওয়া ফুটবলের শীল্ডটি সাজিয়ে রেখেছেন।

এর মধ্যে একদিন একটা ঘটনা ঘটল। দেড়তলার ঘরে জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে এক সন্ধ্যেবেলা রঞ্জনবাবু বাইরের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন, এমন সময় রাস্তা দিয়ে হিপ হিপ হুররে চেঁচাতে চেঁচাতে একটা অল্পবয়েসী ছেলেদের প্রসেশন গেল। সেই মিছিলের সকলের আগে একজন-যুবকের হাতে উঁচু করে ধরা রয়েছে একটা কালো কাঠের শীল্ড, রঞ্জনবাবুর ঘরে যেমন আছে অনেকটা সেই রকম। কোনও পাড়ার টীম খেলায় জিতে শীল্ডটা নিয়ে এই মিছিল বার করেছে।

কিছুদিন আগে একদিন দুপুরবেলা রঞ্জনবাবু তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে রবীন্দ্রসরোবরে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছিলেন এখানে ওখানে রীতিমত উত্তেজনাপ্রদ প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ম্যাচ চলছে। রঞ্জনবাবুর তাঁর নিজের কৈশোরকালের কথা মনে পড়েছিল যখন তিনি নিজেও এরকম ম্যাচ দু-চারটে খেলেছেন।

আজ এই বিজয়োৎসবের মিছিল দেখে সেই সঙ্গে সেদিনের রবীন্দ্রসরোবরের ম্যাচগুলো মনে করে নানারকম ভাবলেন। নানারকমের ভাবনা করার কবিদের অবাধ অধিকার রয়েছে, তবে আমাদের রঞ্জনবাবু কবি হলেও নির্বোধ নন। এদিন সারা সন্ধ্যা রঞ্জনবাবুর মাথায় কবিতার বদলে ফুটবল বিষয়ে নানারকম চিন্তা খেলা করল।

পরদিন দুপুরবেলা তিনি কোন প্রেমিকা ছাড়াই জীবনে প্রথমবার একা একা রবীন্দ্রসরাবরে গেলেন। দূরদূরান্তের পাঠকপাঠিকা যাঁরা রবীন্দ্রসরোবর সম্পর্কে ভাল জানেন না, তাদের জানাই এই রবীন্দ্রসরোবর আগে কলকাতার লেক বলে পরিচিত ছিল। পুরোনো দক্ষিণ কলকাতার শেষপ্রান্তে কয়েকটি জলাশয়, ক্লাব, মাঠ এবং একটি স্টেডিয়াম নিয়ে এই সরোবর।

রঞ্জনবাবু সরোবরে প্রবেশ করতেই একটি ছেলে তাঁর হাতে একটি লিফলেট ধরিয়ে দিল। একটি আপ্তবাক্য আছে, যে যেমন ভাবনা করে তার তেমন সিদ্ধি হয়। রঞ্জনবাবুর ক্ষেত্রেও তাই হল। প্রথম ধাপেই তিনি যা চাইছিলেন তার অনেকটা পেয়ে গেলেন। ছোট ছাপানো কাগজটিতে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টেব ঘোষণা।

শিবকালী মেমোরিয়াল কাপের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে লিফলেটটিতে। পাঁচ ফুট উচ্চতার এবং ষোল বছরের কম বয়েসীদের যে কোন টীম এই ম্যাচে অংশ নিতে পারবে। প্রবেশ ফি দশটাকা মাত্র। উচ্চতা এবং বয়েসের ব্যাপারে শিথিলতর ব্যবস্থা আছে, তবে তার জন্য খেলোয়াড়-প্রতি প্রত্যেক ইঞ্চিতে আট টাকা এবং প্রত্যেক বছরের জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা প্রদেয়।

লিফলেটটি পাঠ করে এবং তারপরে রবীন্দ্রসরোবরের মধ্যে বিভিন্ন মাঠে ঘুরে ঘুরে ফুটবল ম্যাচ দেখে দেখে কবি রঞ্জন চক্রবর্তীর অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি গোলপার্কের দিক থেকে রবীন্দ্রসরোবরে প্রবেশ করে হাঁটতে হাঁটতে খেলা দেখে দেখে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে টালিগঞ্জ ব্রিজের দিক দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

সামনেই রসা রোডে একটা ছোট ছাপাখানা। সেখানে ঢুকে একটি বিজ্ঞপ্তি খসড়া করে ফেললেন ছাপার জন্যে। 'রঞ্জন চক্রবর্তী চ্যালেঞ্জ ফুটবল টুর্নামেন্ট। দক্ষিণ কলকাতায় কিশোরদের ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতার বিপুল আয়োজন। সোয়া পাঁচ ফুটের কম উচ্চতাবিশিষ্ট এবং পনের বছরের কমবয়স্ক কিশোরদের টুর্নামেন্ট। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বয়েস এবং উচ্চতার সীমারেখা শিথিল করা হইবে। প্রবেশ মূল্য পঁচিশ টাকা।'

পরের দিনই বিজ্ঞপ্তিটি ছেপে পাও ' গেল। রঞ্জনবাবু নিজের হাতে লেকের চারধারে দেশপ্রিয় পার্কে, বিবেকানন্দ পার্কে টুর্নামেন্টের ঘোষণাপত্র বিলি করে বেড়ালেন।

রঞ্জন চক্রবর্তী চ্যালেঞ্জ ফুটবল কাপের প্রতি ছেলেদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্যে তিনি প্রথম দুটি ক্লাবকে বিনামূল্যে এবং তারপরে কয়েকটি ক্লাবকে অর্ধমূল্যে প্রতিযোগিতায় নিয়ে নিলেন। সকালবেলা বিবেকানন্দ পার্কের মাঠে খুব ভিড় হয় না, রঞ্জনবাবুর চ্যালেঞ্জ শীল্ডের খেলার সময় করা হল সকাল সাড়ে সাতটা, স্থান বিবেকানন্দ পার্ক।

ক্রমশ রঞ্জন চক্রবর্তী চ্যালেঞ্জ ফুটবল টুর্নামেন্ট দক্ষিণ কলকাতায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। রঞ্জনবাবু অতি বুদ্ধিমান লোক। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে এই ফুটবল প্রতিযোগিতাই নিজের স্থায়ী জীবিকা করে তুললেন।

টুর্নামেন্ট একবার জনপ্রিয় হয়ে গেলে তখন আর প্রতিযোগী ক্লাবের অভাব হয় না। রঞ্জনবাবু এনট্রি ফি কুড়ি টাকায় নামিয়ে দিলেন, তাছাড়া কোন টীম কোন রাউন্ডে হেরে গেলে আবার কুড়ি টাকা দিয়ে টুর্নামেন্টে অন্য নামে খেলতে পারবে। টুর্নামেন্টের ফার্স্ট রাউন্ড, সেকেন্ড রাউন্ড প্রায় আড়াই মাস তিন মাস চলে। এই সময় প্রতিদিন সকালে একটি করে খেলা, প্রায় দেড়শ টীমের কাছ থেকে রঞ্জনবাবুর তিন হাজার টাকা আয় হয়।

এ ছাড়া নানারকম উপরি আয়ের ফিকিব আছে ফুটবল প্রতিযোগিতায়। ঐ উচ্চতা আর বয়েসের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি শুরু করলেন। তার আগে রঞ্জনবাবু একটি রঞ্জন টুর্নামেন্ট কমিটি তৈরি করলেন। তার সম্পাদক তিনি স্বয়ং। দুজন গোবেচারা ফুটবল-প্রেমিক পরিচিত ভদ্রলোককে টুর্নামেন্ট কমিটির মেম্বার করা হল। টাকাপয়সার ভাগ তাঁরা পান না, মাঝে-মধ্যে দু-এক কাপ চা রঞ্জনবাবু তাঁদের খাওয়ান।

বয়েসেব সীমা ঠিক রাখার জন্যে রঞ্জনবাবু ইস্কুলের সার্টিফিকেট ছাড়া কাউকে খেলতে নামতে দেন না। তবে সার্টিফিকেট-মতে কারও বয়েস যদি দু-এক বছর বেশি হয়, একুশ বছর পর্যন্ত, প্রতি বছরে পাঁচ টাকা জরিমানা দিয়ে সে খেলোয়াড়কে নামানো যাবে। আবার উচ্চতার ব্যাপাবে ইঞ্চি প্রতি দশটাকা দিয়ে সাড়ে পাঁচ ফুট পর্যন্ত ছাড়।

একটু লম্বা শ ..্ন্স বেশি প্লেয়ার হলেই রঞ্জনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধি। এছাড়া প্লেযারদেব লেবু এবং চুয়িংগাম হাফটাইমে সরবরাহ করেও টুর্নামেন্ট কমিটি ওরফে রঞ্জনবাবুর মোটামুটি কিছু বাঁধা উপার্জন হতে লাগল। সেই সঙ্গে নিয়ম করা হল, দুই প্রতিযোগী টীম দুই হাফে খেলার বল দেবে। অনেক সময় কোনও কোনও দল বল না আনলে অথবা তাদের বল ফেটে গেলে, লিক হয়ে, গেলে মাত্র বাবো টাকা দিলেই টুর্নামেন্ট কমিটি বল সরবরাহ করে।

ইতিমধ্যে আবও দু-একটি নতুন উপসর্গ দেখা গেল। খেলার মাঠে রেফারির বিচারে সন্তুষ্ট না হয়ে বিভিন্ন টীম প্রতিবাদ জানিয়ে আবেদন করছে। রঞ্জনবাবু প্রটেস্ট ফি করে দিলেন পঁচিশ টাকা। এর পরে দেখা গেল যে অপর পক্ষও প্রটেস্টের বিপক্ষে আবেদন জানাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়পক্ষের কাউন্টাব প্রটেস্ট ফি ধার্য কবা হল পঞ্চাশ টাকা।

এইরকম যখন চলছে তখন একদিন রঞ্জনবাবু দেখলেন যে একটা পকেটমারে রাস্তায় ধরা পড়ে খুব মাব খাচ্ছে। রঞ্জনবাবু হাজার হলেও কবি মানুষ, তাঁর কি রকম মায়া হল, তিনি আর দু-চারজন ভাল লোকের সহযোগিতায় লোকটিকে গণধোলাই থেকে কোনক্রমে উদ্ধার করে, দুটো ধমক দিয়ে ছেড়ে দিলেন। পকেটমারটি যাওয়ার সময় জানালো, 'হুজুর, আমার নাম লাল্লু, আপনি আমাব প্রাণ বাঁচালেন।'

কয়েকদিনের মধ্যে লাল্লুর সঙ্গে রঞ্জনবাবুব আবার দেখা হল। ময়দানে একটা বড় ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন, বেরিয়ে আসার মুখে দেখলেন লাল্লু কয়েকজনের সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে খেলার কথা আলোচনা করছে।

সেইদিন রাতে একটা নতুন চিন্তা এল কবি রঞ্জন চক্রবর্তীব মাথায়। না, কোন নতুন আধুনিক কবিতা নয়। তার চেয়ে অনেক দামী, অনেক জরুরী, রঞ্জন টুর্নামেন্টের আয় বাড়ানোর একটা পাকা বন্দোবস্ত।

লাল্লু ফুটবল খেলাটা নিশ্চয় কিছু বোঝে। আর তাছাড়া সে মার খেতেও ওস্তাদ। সুতরাং তাকে যদি একটা হুইসিল দিয়ে হাফপ্যান্ট পরিয়ে রেফারি করে দেয়া যায় আর সে যদি প্রতি

খেলায় দু-চারটে গোলমেলে সিদ্ধান্ত যথা ভুল পেনাল্টি, গোল হয়ে যাওয়ার পরে অফসাইড, অথবা নির্বিচারে লাল কার্ড দেখায়, তবে ভুক্তভোগী দলের সমর্থকদের হাতে তার প্রহৃত হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য থাকবে। কিন্তু প্রটেস্ট-ফি, কাউন্টার প্রটেস্ট-ফি বাবদ যথেষ্ট আয় হবে।

দু-চারদিনের মধ্যে ময়দানে গিয়ে লাল্লুকে পূর্বস্থানে ধরে ফেললেন রঞ্জনবাবু। সে ফুটবলে পরমোৎসাহী। রঞ্জনবাবু লাল্লুকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

লাল্লু জাতে পকেটমার এবং অতি চতুর। সে কিছুক্ষণের কথাবার্তাতেই রঞ্জনবাবুর অভিসন্ধি ধরে ফেলল। রঞ্জনবাবু তাকে পাকা মাস-মাইনেয় রঞ্জন টুর্নামেন্টের রেফারি হিসেবে নিয়োগ করলেন। লাল্লু মাসে তিনশ টাকা পাবে, সকাল সাড়ে সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত ডিউটি। তাকে রেফারির ড্রেস এবং জুতো, সেইসঙ্গে হুইসিল কিনে দেওয়া হল। লাল কার্ড, হলুদ কার্ড ইত্যাদিও সংগ্রহ করে দেয়া হল।

লাল্লুর প্রধান কাজ হল মার খাওয়া। প্রত্যেক খেলায় তাকে মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত দিতে হবে, এতে মারামারি হয়ে খেলা ভেঙ্গে যায় যাবে। তারপর প্রটেস্ট-ফি আর কাউন্টার প্রটেস্ট-ফি বাবদ নিশ্চয় পঁচাত্তর টাকা আয় হবে।

মার খাওয়া লাল্লুর যথেষ্ট অভ্যাস আছে। আর খেলার মাঠে গোলমাল বাধানোয় সে যাকে বলে এক্সপার্ট।

রঞ্জন টুর্নামেন্টের রমরমা শুরু হয়ে গেল। ফাউল, অফসাইড, এমন কি পেনাল্টি পর্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত দিতে লাগল লাল্লু, হরদম বাঁয়ে ডাইনে প্লেয়ারদের লাল কার্ড, হলুদ কার্ড দেখাতে লাগল সে।

গোলমাল, হইচই, মারপিট, অকহতব্য অবস্থা প্রতিদিন রঞ্জন টুর্নামেন্টের খেলায়, প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে প্রহৃত হতে লাগল লাল্লু। মার খাওয়ায় সে পোক্ত, দু-চার হাজার ঘুষি, লাথিতে তার কিছু হয় না, কিন্তু অভিনয় করে দুটো লাথির মাথাতেই সে কোঁক করে চোখ উলটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। লড়াকু জনতা তার এই অবস্থা দেখে সরে পড়ে।

তারপর প্রটেস্ট, কাউন্টার-প্রটেস্ট। রঞ্জন টুর্নামেন্টের তহবিল স্ফীত হতে লাগল, রঞ্জনবাবুও একলাফে তিনশ টাকা থেকে পাঁচশ টাকা করে দিলেন লাল্লুর মাসিক বেতন।

এক বাঙালী কবির বাণিজ্যপ্রতিভার এই কাহিনীটি এখানে শেষ কবতে পারলেই ভাল হত, তাতে গল্প হয়ত তেমন জমত-না কিন্তু সকলেরই মুখরক্ষা হত।

তদুপরি কাহিনীকারের পক্ষেও বিপদটা হয়ত অনেক কম হত। কিন্তু গল্পকে এখানে শেষ করা সম্ভব নয়। কারণ এর পরে যা ঘটেছে সেটা না লিখলে অন্যায় হবে এবং লাল্লুর প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হবে।

অকবির প্রতিভা

রঞ্জন টুর্নামেন্টের প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে তিন দফা হয়ে গেছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সারা বছর ধরে জমজমাট খেলার আসর। দক্ষিণ কলকাতার ফুটবল প্রেমিক কিশোররা তো বটেই, এমন কি তাঁদের অভিভাবকদের কাছেও রঞ্জন টুর্নামেন্টের খ্যাতি যথেষ্ট প্রচারিত হয়েছে।

কবি রঞ্জন চক্রবর্তী আজকাল আর কবিতা লেখার বিশেষ সময় পান না, প্রয়োজনও বোধ

করেন না। একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট পরিচালনা করা যতটা অর্থকরী এবং উত্তেজনাপ্রদ, কবিতা লেখা তার ধারেকাছে আসে না।

তাছাড়া ফুটবল মারফত তাঁর যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিও হয়েছে। উত্তর টালিগঞ্জ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রঞ্জন চক্রবর্তী সভাপতি হয়ে রৌপ্যপদক বিজয়ীদের গলায় পরিয়ে দিলেন। আবার আন্তঃ বেহালা কাবাডি প্রতিযোগিতায় তিনি প্রধান অতিথি হয়ে দেড় ঘণ্টা কাবাডির ঐতিহ্য নিয়ে সুললিত বক্তৃতা করলেন।

মোট কথা, রঞ্জনবাবু এখন মহানগরীর দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীড়াসংসারে রীতিমত মান্যগণ্য ব্যক্তি। শোনা যাচ্ছে, কি সব সূত্রে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসেসিয়েশন ইত্যাদি সব কেউকেটা প্রতিষ্ঠানেও তিনি ঠাঁই করে নিতে চলেছেন।

আজকাল আর রঞ্জনবাবু যাদবপুরের সেই দেড়তলার ঘরে থাকেন না। কালীঘাটের একটা পুরোনো বাড়ির দুটো একতলার ঘরে এখন তাঁর আবাস, সেই সঙ্গে সেটা রঞ্জন টুর্নামেন্টের হেডকোয়ার্টার্স। প্রত্যেকদিন সকালবেলা ক্রীড়ারসিক এবং নবীন খেলোয়াড়ের ভিড়ে গমগম করে রঞ্জনবাবুর বাইরের ঘর।

রঞ্জনবাবুর জীবনযাত্রার ধারাও রীতিমত পালটিয়ে গিয়েছে। তিনি একটু পুরোনো একটা মোটর বাইক ক্রয় করেছেন। সেটা অবশ্য যাতায়াতের পথে একটু অস্বাভাবিক শব্দ করে, শব্দ শুনে মনে হয় যেন কোন আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গীরণের আগে গর্জন করছে।

কালীঘাট পাড়ার কুকুরদের কোনকালেই মোটর বাইক জিনিসটা পছন্দ নয়। চিরকালই তারা রাস্তায় চলমান মোটর বাইকের পিছনে তাড়া করে আনন্দ পায়। রঞ্জনবাবুর গাড়িতে বীভৎস শব্দের ফলে তাঁর প্রতি কুকুরদের ক্রোধ আরও বেশি। বহু দূর থেকে রঞ্জনবাবুর গাড়ির আওয়াজ পেয়ে কুকুরেরা সম্মিলিতভাবে তেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রতিদিন রাতে রঞ্জনবাবু যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি না ফেরেন, পাড়ার কুকুরেরা বিনিদ্র প্রতীক্ষা করে তাঁকে গর্জনমুখর সংবর্ধনা জানানোর জন্যে।

রঞ্জনবাবুর সঙ্গে বাইকের পিছনের সিটে প্রায় প্রতিদিন এক ব্যক্তি যাতায়াত করে। ব্যক্তিটি বেঁটে, কালো, চুল ছোট করে ছাঁটা, গায়ে চকরাবকরা রঙিন জামা, লাল প্যান্ট।

কুকুরেরা সাধারণতঃ চেষ্টা করে পশ্চাতের এই ব্যক্তিটিকে কামড়ানোর। কিন্তু সে সুকৌশলে পা দুটো এমনভাবে গুটিয়ে রাখে যে কুকুরেরা চলন্ত অবস্থায় তাকে কিছু করতে পারে না। তবে মজার কথা এই যে মোটর বাইক থেমে গেলেই কুকুরেরা একদম চুপ, যে যার মত মুখ ঘুরিয়ে যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গি করে কেটে পড়ে।

সে যা হোক, রঞ্জন চক্রবর্তীর বাইকের পিছনের ঐ ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, স্বনামধন্য লাল্লু।

স্বনামধন্য কথাটা যে এখানে ব্যবহার করলাম সেটা রসিকতা করে নয়। লাল্লুর আজকাল যথেষ্ট নামডাক। এখন আর সে লাল্লু নয়, ক্রীড়ামোদীরা তাকে মিস্টার লাল্লু অথবা লাল্লু সাহেব বলে ডাকে। ফুটবলের আলোচনায় অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তার নাম উচ্চারিত হয়।

ঘটনার যা গতিক তাতে এখন থেকে আমরাও তাকে লাল্লুসাহেব বলে বলব এবং আপনি বলে মর্যাদা দেব।

বিবেকানন্দ পার্কের মাঠে লাল্লুসাহেবের জীবনপণ, অসমসাহসী রেফারিয়ানা অতি অল্পদিনের মধ্যে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাজার মার খেয়েও যে রেফারি দমিত হয় না,

আত্মবিশ্বাস হারায় না, তাকে তো সবাই শ্রদ্ধা করবেই।

লাল্লুসাহেবের খেলা পরিচালনা যারাই দেখেছে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ভুল দু-চারটে সব রেফারিই করে থাকেন, রেফারি তো আর ভগবান নন। অফসাইড, ফাউল, হ্যাণ্ডবল— এগুলো অনেক সময়েই খুব কাছে থেকেও সঠিক বিচার করা যায় না—সেটা বড় কথা নয়।

বড় কথা হল লাল্লুসাহেবের মার খাওয়ার ক্ষমতা। টুঁ শব্দটি উচ্চারণ না করে ছাতা পেটা হওয়া লাথি, খাওয়া, কখনও কখনও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে উঠে আবার হুইসিল বাজিয়ে খেলা আরম্ভ করা—লাল্লুসাহেবের এই সব অসাধারণ যোগ্যতা ধীরে ধীরে চারিদিকে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল।

অবশ্য লাল্লুসাহেবের তরফ থেকে বলা যায় এসব মার তাঁর কাছে তুচ্ছ, লোকে যাকে বলে নস্যি ঠিক তাই। তাঁর প্রাক্তন পকেটমার জীবনে যেসব প্রহার তাঁকে খেতে হয়েছে, যেসব গণধোলাইয়ের তিনি বারম্বার সম্মুখীন হয়েছেন, তার কাছে ফুটবল খেলার মাঠে রেফারি হয়ে মার খাওয়া নিতান্ত ছেলেখেলা।

আজকাল সকালবেলা সাতটায় একবার আর সাড়ে আটটায় একবার এই দু-দফা রঞ্জন টুর্নামেন্টের খেলা হয়। উভয় খেলারই পরিচালনার দায়িত্ব লাল্লুসাহেবের। অবশ্য একটার জায়গায় দৈনিক দুটো খেলা খেলানোর জন্যে রঞ্জনবাবু লাল্লুসাহেবের বেতন বাড়িয়ে এক হাজার টাকা পুরোপুরি করে দিয়েছেন। তাছাড়া রাত্তিরে রঞ্জন টুর্নামেন্টের হেডকোয়ার্টারে অর্থাৎ রঞ্জনবাবুর বর্তমান বাড়ির বাইরের ঘরে একটা সোফা কাম বেডে তিনি শুতেও পান।

অসুবিধা হয়েছে অন্য জায়গায়। লাল্লুসাহেব চার পুরুষের পকেটমার। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সুদূর বিহারের আরা জেলার একটা গোহাটে বহুশতাব্দী অপ্রতিদ্বন্দ্বী গাঁটকাটা ছিলেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে, সিপাহী যুদ্ধের কিছুদিন বাদে লাল্লুসাহেবের প্রপিতামহ দেহাত পরিত্যাগ করে এই কলকাতা শহরে জীবিকার অন্বেষণে আসেন। সেই কবে গ্যাসের আলোর রোমাঞ্চকর যুগে ঘোড়ার টানা ট্রামে তিনি হাতসাফাই আরম্ভ করেছিলেন, তারপর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ধীরে ধীরে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গাঁটকাটা থেকে কাছাকাটা, কাছাকাটা থেকে জোব্বাকাটা, জোব্বাকাটা থেকে পিরানকাটা ইত্যাদি বহু বিচিত্র এবং জটিল স্তর পাড়ি দিয়ে অবশেষে লাল্লুসাহেব এসে পৌঁছেছে সেই পাইয়োনিয়ার পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারে।

এবং সত্যি সত্যি লাল্লুসাহেবের হাতে এই উত্তরাধিকারের মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

কিন্তু রেফারি হিসেবে লাল্লুসাহেব যত বিখ্যাত এবং সুপরিচিত হতে লাগলেন ততই তাঁর পকেটমার ব্যবসায় ভাটা পড়তে লাগল। হয়ত ট্রামে উঠে পাদানির এককালে ভিড়লগ্ন হয়ে তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে সম্ভাব্য শিকারকে পর্যবেক্ষণ করছেন, শেষ মুহূর্ত হয়ত সমাগত, তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে আধলা ব্লেডের ভগ্নাংশ নিপুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ধরে নির্বাচিত পকেটটির দিকে অত্যন্ত সতর্কভাবে এগোচ্ছেন—

সেই মুহূর্তে ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলল, 'গুড মর্নিং, লাল্লুসাহেব। আজ খেলা নেই?'

সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানভঙ্গ হল। এইরকম অবস্থায় আর যাই করা যাক, পকেটমারা বা পকেটকাটা নিশ্চয়ই কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু সদাসর্বদা হাত নিশপিশ করে লাল্লুসাহেবের। রেফারির জীবিকায় যথেষ্ট উত্তেজনা আছে, পয়সাও ভালই দিচ্ছেন রঞ্জন চক্রবর্তী, কিন্তু দিনে দু-একটা পকেট না কাটতে পারলে মনে হয় জীবনটাই বরবাদ।

এই কবিতা লেখা কমে গিয়েছে কিন্তু রঞ্জনবাবু যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং প্রকৃতই কবিপ্রাণ। তিনি লাল্লুসাহেবের মনোবেদনা যে বুঝতে পারেন না তা নয়। কিন্তু তিনি নিজেই লাল্লুসাহেবকে মানা করেছেন রাস্তাঘাটে, ট্রামেবাসে পকেট কাটতে। লোকে যদি ধরে ফেলে, লোকে যদি চিনে ফেলে এই সেই রঞ্জন টুর্নামেন্টের মৃত্যুঞ্জয় রেফারি মিস্টার লাল্লু, তাহলে সমূহ সর্বনাশ, একেবারে ধনে-প্রাণে-মানে বিনাশ হতে হবে।

লাল্লুসাহেব বোকা নন। এ সমস্যা বুঝতে তাঁর মোটেই দেরি হয় নি। পকেটমার জীবনের উত্তেজনা আনন্দ যতই থাকুক, তিনি ধীরে ধীরে নিজের রেফারিজীবন উপভোগ করতে শিখেছেন। লোকেরা গালাগালি করুক, ছাতাপেটা করুক— সব ঠিক আছে, একটু দম খিঁচে শুধু সহ্য করতে হবে কিন্তু একটি সবুজ মাঠে, সহস্র দর্শকের চোখের সামনে বাইশজন চনচনে খেলোয়াড়কে অঙ্গুলিহেলনে শাসনে রাখা, প্রয়োজনে যে কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধের সামনে উন্নতশির হয়ে উপস্থিত হওয়া, এর মধ্যে যে গৌরব যে মর্যাদা আছে লাল্লুসাহেবের ঊর্ধ্বতন গাঁটকাটা চোদ্দপুরুষ তা কোনোদিন অনুভব করেন নি। এমন কি খেলা পরিচালনা করতে গিয়ে প্রহৃত হওয়ার মধ্যেও যে রীতিমত গৌরব ও মর্যাদার ব্যাপার আছে এবং সেটা যে পকেটমার হিসেবে মার খাওয়ার চেয়ে অনেক মহৎ ব্যাপার সেটাও লাল্লুসাহেব ভালই বোঝেন।

তবে লাল্লুসাহেব একটা কায়দা আবিষ্কার করেছেন, রেফারি হয়ে ইচ্ছাকৃত ভুল এবং গোলমেলে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ফলে যখন উত্তেজিত টীমের সমর্থকেরা তাঁর উপর মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তিনি তাঁর সহজাত প্রতিভাবলে আক্রমণকারীদের মধ্যে থেকে শাঁসালো ব্যক্তি নির্দিষ্ট করে ঐ ভিড় ঠেলাঠেলির মধ্যে হাতসাফাই করেন। ঘড়ি, কলম, মানিব্যাগ যেদিন যেমন পারেন অনায়াস দক্ষতায় হস্তগত করে মাঠের উপরে ফেলে দেন, তারপর সেই অপহৃত দ্রব্যের উপরে নিজের শরীর চাপা দিয়ে কোঁ-কোঁ করতে করতে উলটিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তারপর শোয়া অবস্থায় সময়মত অপহৃত দ্রব্যটি তুলে গেঞ্জির নীচে লুকিয়ে ফেলা একজন প্রাক্তন দক্ষ হাতসাফাইকারের পক্ষে এমন আর কঠিন কি?

অন্যদিকে যাদের জিনিস গেল তারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারে না যে রেফারি সাহেবের এই কীর্তি। তারা ধরে নেয়, ধস্তাধস্তি হাতাহাতির সময় তাদের জিনিস কোথাও ছিটকিয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে। যাকে তারা প্রহার করছিল সেই যে তাদের ঘড়ি, কলম বা ম্যানিব্যাগ গণ্ডগোলের সুযোগে হাতিয়ে নিয়েছে এরকম কিছু চিন্তা করার অবকাশ কোথায়।

রেফারির কাজের সঙ্গে পকেটমারার কাজ সংমিশ্রণ করতে পেরে লাল্লুসাহেব মোটামুটি আত্মতৃপ্ত ভাবেই দিন কাটাচ্ছিলেন। রাত্রিও ভালই কাটছিল রঞ্জনবাবুর বাইরের ঘরে।

অবসর এবং ইচ্ছা মত একটু-আধটু সাট্টা খেলা, সন্ধ্যার দিকে খালাসিটোলা বা বারদোয়ারিতে গিয়ে কিঞ্চিৎ বাংলা মদ্যপান অথবা আরও কোন কুস্থান গমন। আবার একেকদিন রাতে রঞ্জনবাবুর সঙ্গে বসে থ্রি-এক্স রাম পান, সঙ্গে হাজরার মোড় থেকে কিনে আনা মাংসের রোল। কোনও কোনও দিন আরও কেউ থাকে, ফুটবল খেলার ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা, রঞ্জন টুর্নামেন্টের সমস্যা ও সাফল্য বিচার গবেষণা।

দিন ভালই যাচ্ছিল লাল্লুসাহেবের। রঞ্জনবাবুর হৃদয়ে তবু কিছু বেদনা ছিল তাঁর অপূর্ণ কবিজীবন নিয়ে, কিন্তু লাল্লুসাহেব ক্রমশ বিগত পকেটকাটা জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠলেন। জুতো, মোজা, হাফপ্যান্ট, রেফারির পোশাক, দামী হুইসিলে ফুঁ দিতে দিতে যখন টগবগ করে লাল্লুসাহেব মাঠে গিয়ে নামেন তখন তাঁর মনেই পড়ে না অনতিদূর অতীত জীবনের কথা।

আজকাল কেবলমাত্র রঞ্জন টুর্নামেন্টের খেলা নয়, কাছে দূরে বারাসাত, আরামবাগ, কাকদ্বীপ থেকে ডাক আসতে শুরু করেছে লাল্লুসাহেবের। প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে এমন অসমসাহসী, স্থিতধী রেফারি আর দেখা যায় না। আর তাছাড়া, সব জায়গায় তো আর রঞ্জন টুর্নামেন্টের মত প্রটেস্ট-ফি এবং কাউন্টার প্রটেস্ট-ফি-এর লোভে গোলমেলে সিদ্ধান্ত দিয়ে মারামারি বাধিয়ে দেয়া দরকার পড়ে না, ফলে রঞ্জন টুর্নামেন্টের বাইরে যদি কোন খেলায় লাল্লুসাহেব যান মার খাওয়ার ভয় কম থাকে।

ধীরে ধীরে লোকমুখ থেকে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় লাল্লুসাহেবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। খেলার কাগজগুলি প্রশংসামুখর হয়ে উঠল লাল্লুসাহেবের সুনিপুণ পরিচালনার একের পর এক বর্ণনায়।

রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে একটা জুনিয়ার ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় গ্যালারি থেকে ছুটে আসা আধলা থানইটের আঘাতে মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পডতে লাগল লাল্লুসাহেবের, তবু অদম্মিত, অকম্পিত লাল্লুসাহেব খেলা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ময়দানের এক খোলা মাঠের দুই কলেজ টীমের খেলায় চূড়ান্ত বোমাবাজির মধ্যে অবিচল লাল্লুসাহেব কলকাতার ফুটবল মাঠের অরাজক পটভূমিকায় নিজ সাহসে ভাস্বর হয়ে উঠলেন।

স্টেটসম্যানের মত সাহেবী খবরের কাগজে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ মিস্টার লাল্লুকে ভ্যালিয়ান্ট স্মল ম্যান (Valiant small man) নামে অভিহিত করে সাহসের প্রতিমূর্তি বলে বর্ণনা করলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় খ্যাতনামা ক্রীড়াসাংবাদিক মতি নন্দী মহোদয় লাল্লুসাহেবকে কলকাতার ময়দানের ঘনান্ধকার গগনে উজ্জ্বল রূপালি চমক বলে স্বাগত জানালেন। আর আজকাল কাগজে বিখ্যাত অশোক দাশগুপ্ত পাকা আড়াই কলম জীবনীও লেখার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু সঙ্গত কারণেই কিছুটা জানার পরে পিছিয়ে গেলেন।

এর মধ্যে একদিন ডাক এল বার্ণপুর স্টেডিয়াম থেকে। তারপরে জামসেদপুর, শিলিগুড়ি। শোনা যাচ্ছে আই এফ এ শীল্ড, ফেডারেশন কাপ, এমন কি এশিয়ান কাপ পর্যন্ত লাল্লুসাহেবের খ্যাতি পৌঁছে গেছে। শিগগিরই তাঁর ডাক আসবে এইসব চমকপ্রদ খেলা পরিচালনা করার জন্যে।

লাল্লুসাহেব এখন মনেপ্রাণে প্রস্তুত যে কোন ধরনের যত দামী , যত উঁচু খেলাই হোক তাব রেফারিত্ব করতে। তিনি কলম্বো, এমন কি কুয়ালালামপুর বা কুয়োয়েতে গিয়ে খেলাতেও রাজি। আমন্ত্রণ আসতে এখন যেটুকু বাকি শুধু তারই অপেক্ষা।

রঞ্জনবাবু হাজার হলেও একদা কবি ছিলেন, তাঁরই মানসপুত্র লাল্লুসাহেবের এই উন্নতিতে তিনি মোটেই ঈর্ষান্বিত নন। বরং নিজেকেও সঙ্গে সঙ্গে গৌরবান্বিত বোধ করেন। দু-একটা কাগজে মিস্টার লাল্লু সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদনে শ্রীযুক্ত রঞ্জন চক্রবর্তীর ছবিও ছাপা হয়েছে নবযুগের অকুতোভয়, লৌহশরীর মহৎ রেফাবির আবিষ্কর্তা হিসেবে।

রঞ্জনবাবুর মাথায় চিন্তা ঢুকেছিল যদি লাল্লুসাহেব সত্যি সত্যি কলকাতার বাইরে চলে যান তাহলে রঞ্জন টুর্নামেন্টের কি গতি হবে?

সে সমস্যা লাল্লুসাহেব স্বয়ং সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁরই এক পুরনো বন্ধু জগুকে নিয়ে এসেছেন তিনি। জগু আরও বেঁটে, আরও কালো, আরও রোগা। দাঁতে দাঁত আটকিয়ে মার খেতে আরও ওস্তাদ। সেও ময়দানের এক বড় ক্লাবের ফুটবল ফ্যান, ফুটবল খেলার অ-আ-ক-খ মোটামুটি জানে। তাছাড়া বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদির তার অভাব নেই। লাল্লুসাহেবের মত সেও যথাস্থানে প্ররোচনামূলক ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে যথেষ্ট গোলমাল বাধিয়ে দিতে পারবে, মার খেয়ে টুঁ-শব্দটি করবে না। তাকে দিয়েও লাল্লুসাহেবের মতই রঞ্জনবাবুর দুবারে দুটো খেলার প্রটেস্ট-ফি, কাউন্টার প্রটেস্ট-ফি বাবদ অনায়াসেই শ-দেড়েক টাকা দৈনিক সকালে আসবে।

জগু প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিল, তার বহু সাধের পুরনো পেশা ছেড়ে চলে আসতে। কিন্তু এক হাজার টাকা মাইনে এবং তৎসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধার কথা শুনে সে রাজি হয়েছে।

উপসংহার

এই কাহিনীর উপসংহাব বড় দুঃখজনক। লিখতে কলম সবছে না। তবু লিখতে তো হবেই।

লাল্লুসাহেবেব কলম্বো বা কুয়ালালামপুর কোথাও যাওযা হয নি। তাঁর প্রাক্তন পকেটমার জীবনে একটি হাতসাফাইয়ের মামলায় তিনি জামিনে খালাস ছিলেন এবং যথারীতি জামিন ফাঁকি দিযে আত্মগোপন কবেছিলেন। কিন্তু অফিসক্লাবের একটি খেলায তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকের কিঞ্চিৎ মতিভ্রম হয়। তাঁর সেই খেলাটি আদতে পরিচালনা করতে যাওয়াই উচিত হয় নি।

খেলাটি ছিল গোয়েন্দা পুলিসের সঙ্গে আবগারি পুলিসের। গোয়েন্দা পুলিস টীমের স্টপাবকে প্রথম থেকেই লাল্লুসাহেবের কেমন চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু খেলা চলাকালীন উত্তেজনায় বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে লাল্লুসাহেব স্টপারটিকে লাল কার্ড দেখালেন। স্টপার ভদ্রলোকেব ও অনেকক্ষণ! ধরে রেফারিকে কেমন চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। হঠাৎ মোক্ষম মুহূর্তে তিনি চিনে ফেললেন। এই তো সেই হাওড়া ধর্মতলা ট্রামের লালু ওস্তাদ, হুইসিল মুখে হাফপ্যাণ্টে জার্সিতে চেনাই যাচ্ছিল না। সর্বনাশ! জামিন পালিয়ে রেফারি হয়েছে! স্টপার ভদ্রলোক গোয়েন্দা দফতরের পকেটমার শাখার ছোট দারোগা। তিনি মাঠ থেকে বেরনোর মুখে লাল্লুসাহেবের জামার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে অপেক্ষারত একটি পুলিসের গাড়িতে তুলে নিলেন।

লাল্লুসাহেব পুরনো দাগী আসামী, পুলিসের খাতায় তাঁর সাড়ে তিনপাতা রেকর্ড। তাছাড়া জামিন টপকেছেন। মাননীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দু'দফায় তাঁর আড়াই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

মধ্য থেকে বেকায়দায় পড়লেন রঞ্জনবাবু। তিনি জগুকে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু লাল্লুসাহেবের করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষালাভ করে জগু আর ক্রীড়া-পরিচালনার লাইনে আসতে চাইল না।

এমতাবস্থায় রঞ্জনবাবুর আর কি-ই বা করণীয় ছিল? তিনি যা যুক্তিসঙ্গত তাই সিদ্ধান্ত নিলেন। লাল্টু যদি পারে আমি কেন পারব না, আমিও তো বিপ্লবী কবি। দু-চার ঘা মার খেলে আমার কি ক্ষতি হবে?

অতঃপর কবি রঞ্জন চক্রবর্তী হাফপ্যান্ট ইত্যাদি পরিধান করে মুখে হুইসিল নিয়ে নিজেই একদিন মাঠে নামলেন। তারপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল, প্রটেস্ট-ফি এবং কাউন্টার প্রটেস্ট-ফিয়ের লোভে খেলা আরম্ভের পনের মিনিটের মাথায় একটি অন্যায় পেনাল্টি দিলেন। যে পক্ষের বিরুদ্ধে এই রায় দিলেন তাদের নামটা খেয়াল রাখলে তিনি এই মারাত্মক ভুল করতেন না।

সেই পক্ষ বা ক্লাবের নাম রক্তরাঙ্গা শিবির।

এর পরের ঘটনা না লেখাই ভাল।

শ্রী যুক্ত রঞ্জন চক্রবর্তীর এই কাহিনী পাঠ করে যদি কোন কোমলহৃদয়া পাঠিকার মনে সামান্য অনুকম্পাও দেখা দেয় তিনি দয়া করে বাঙ্গুর হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ডে দু'শ বত্রিশ নম্বর বেডে তাঁকে দেখতে যাবেন। ভদ্রলোক আজ আড়াই মাস কোমর এবং ঘাড় ভেঙ্গে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

হিতোপদেশ

ক্ষুদ্র একটি ভ্রম নিরসনের জন্য এই শেষ পর্বটিতে হাত দিতে হল।

ভ্রমটি আর কিছুই নয়, এই সামান্য কাহিনীর নাম কবিতা ও ফুটবল না দিয়ে আমার উচিত ছিল কাহিনীটির একটি সর্বজন গ্রাহ্য এবং পরিচ্ছন্ন নাম দেয়া।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় নাম কেমন হত কে জানে? কিন্তু শ্রেয় বানানে বিসর্গ দিতে হবে কিনা ঠিক করতে না পেরে 'কবিতা ও ফুটবল' নামই রাখতে হল।

এন আর আই

ডক্টর উমাকুমার চক্রবর্তী একজন এন-আর-আই, অর্থাৎ নন রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ান, অর্থাৎ অনাবাসী ভারতীয়। এন-আর-আই এই শব্দটির সঙ্গে এখন অনেকেই রীতিমত পরিচিত। অনেক সৌভাগ্যবানের নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুই হয়তো এন-আর-আই। তবু কেউ যাতে নন রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ানকে রেড ইণ্ডিয়ান বা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান জাতীয় কিছু না ভাবেন, তাই প্রথমেই বলে রাখা ভালো এঁরা আমাদের মত, আমাদেরই লোক। শুধু আমরা দেশে আছি, এঁরা বিদেশে আছেন।

এন-আর-আই-এর সংজ্ঞা সংক্রান্ত আইনের ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি সোজা করে বলা চলে যে, মোটামুটি এন-আর-আইরা হলেন সফল প্রবাসী ভারতীয়, এঁরা আর্থিকভাবে অত্যন্ত সচ্ছল, এঁদের অনেকেই বিদ্যায়-কীর্তিতে বিদেশে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন।

ডক্টর উমাকুমার চক্রবর্তীও তাই।

আমরা এই সামান্য কথিকায় প্রথমে তাঁর পূর্ব জীবন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তাকারে স্মরণ করে নিচ্ছি।

উমাকুমারবাবু পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু। তাঁদের পূর্বনিবাস বরিশাল জেলায়। এখন তাঁর বয়েস সাতচল্লিশ। উনিশশো পঞ্চাশ সালে, সেই ভয়াবহ দাঙ্গার বছরে, বরিশাল শহবেরর কয়েক মাইল দূরে তাঁদের গ্রামের বাড়ি পুড়ে ছারখার হয় এবং তাঁর দুই কাকা দাঙ্গাকারীদের হাতে নিহত হন।

উমাকুমারবাবুর বাবা থাকতেন কলকাতায় একটা মেসে, কাজ করতেন সেকালের ক্লাইভ স্ট্রিটের একটা সওদাগরি অফিসে। ঠিক এই সময়েই পরাজিত ক্লাইভ সাহেব ঐ ঘিঞ্জি রাস্তাটা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে ছেড়ে দিয়ে পাশের এক গলিতে আশ্রয় নেন।

সে যা হোক উমাকুমারবাবুরা দাঙ্গার পরে সর্বস্বান্ত হয়ে যখন কলকাতায় এসে পৌছালেন, তাঁর বাবা মেস ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার শেষ সীমান্তে একটি নবগঠিত উদ্বাস্তু কলোনীতে কোনোরকমে একটা টিনের ঘর তৈরি করে নতুন জীবন শুরু কবলেন।

উমাকুমারবাবুর পিতামহের বয়েস তখন প্রায় সত্তর। তবে তিনি বেশ শক্ত-সমর্থ ছিলেন। তিনি গ্রামে মাস্টারি করেননি, তবে নাতি-নাতনিদের খুব যত্ন করে পড়াতেন।

অল্প দিনের মধ্যেই উদ্বাস্তু কলোনির ভিতবে একটি স্কুল গড়ে ওঠে এবং সেখানে উমাকুমারবাবু ভর্তি হন।

বলা বাহুল্য, উমাকুমারবাবু মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিলো তাঁর পিতামহের সুনজর। শুধু ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষাগুলিতে তিনি ভালো করলেন তাই নয়, বিদ্যালয়ের শেষ পবীক্ষায় স্কুল ফাইন্যালে তাঁর বছবে তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করলেন। একটি অখ্যাত উদ্বাস্তু পল্লীব নগণ্য একটি নতুন স্কুলের নাম তাঁর দৌলতে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বেরোলো।

এ-সব তথ্য অবশ্য আমাদের এই গল্পেব পক্ষে মোটেই জরুরী নয়, বিশেষত হাল্কা গল্পে এসব তথ্য না দেয়াই রীতি। কিন্তু এই আখ্যান পাঠান্তে কেউ যেন উমাকুমারবাবুকে হাসির পাত্র মনে কবেন, শুধু সেই জন্যে এতক্ষণ কিছু বাস্তব তথ্য জানানো হলো।

এব পরের ইতিহাস একটু সংক্ষেপে কবেই বলছি। উমাকুমারবাবু সসম্মানে এবং উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সঙ্গে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর অধীত বিষয় ছিলো উদ্ভিদবিদ্যা। উদ্ভিদবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্যে তিনি অবশেষে আমেরিকায় পৌছালেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটি ভারী ডিগ্রি অর্জন করে তিনি ও-দেশেই অধ্যাপনা শুরু করলেন এবং এই পেশায় প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করলেন। উমাকুমারবাবু নিজে একজন শিক্ষকের পৌত্র, তিনি এর আগে কখনোই কল্পনা করতে পারেননি যে শিক্ষকতা করে এত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।

বছরের পর বছর দুহাতে লক্ষ লক্ষ ডলাব উপার্জন কবলেন ডক্টর উমাকুমার চক্রবর্তী। উদ্ভিদবিদ্যার উপান্তে পৌছে তাঁর বিষয় হলো পরিবেশ বিজ্ঞান। এই পরিবেশের ব্যাপারটা আজকের আধুনিক সভ্য পৃথিবী খুব খাচ্ছে, শুধু খাচ্ছে নয়, বলা চলে গোগ্রাসে গিলছে। উত্তর ক্যারোলিনার ফ্যাচাচাও গাছের ফুল ফিকে হলুদ থেকে গাঢ় হলুদ হয়ে যাওয়ায় নিখিল বিশ্বের জীবজগৎ যে গভীর সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়ছে কিংবা নিম্নবাংলার বদ্বীপে সুন্দরবনের

জীবজগৎ যে গভীর সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়ছে কিংবা নিম্নবাংলার বদ্বীপে সুন্দরবনের মোহনায় সুন্দরীগাছের পাতাগুলি যদি শীতের শুরুতে অন্তত একবার ঝরে যায় তাতে কুমীরের ডিম থেকে বাঘের বাচ্চা, এমন কি শেষ পর্যন্ত মানুষের শিশু কতটা লাভবান হবে, এ সব বিষয়ে ডক্টর চক্রবর্তীর সাবলীল বিশ্লেষণে যে কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও সবকিছু প্রাঞ্জল বুঝতে পারে।

খ্যাতি ও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন দেশের নিয়মানুযায়ী ডক্টর চক্রবর্তীর নামটা ছোট হতে লাগলো। প্রথমে অত কষ্টের ডক্টর ডিগ্রি বিসর্জন দিতে হলো, তারপরে গেলো তাঁর কৌমার্য, অর্থাৎ নামের মধ্যপদ, তারপরে আরো ছোট হয়ে তিনি উমা চাকর হয়ে গেলেন। অবশ্য কোনো কোনো ভদ্রজন তাঁকে উমা চাকর না বলে ডক্টর চাকরও বলতে শুরু করলেন।

কিছুই আপত্তি করেননি আমাদের উমাকুমারবাবু। আপত্তির সময় নয় সেটা। সাফল্যের সোপান ধরে দ্রুত উঠতে উঠতে তিনি সম্মান ও অর্থের সঙ্গে এ সমস্তই নিতান্ত নায্য পাওনা বলে ধরে লাগলেন, তিনি মোটেই কিছু মনে করলেন না।

আটাশ বছর বয়েসে বিদেশে গিয়েছিলেন উমাকুমার। প্রথমবার বছর পাঁচেক পরে দেশে ফিরতে পেরেছিলেন তিনি। এর পরের বার ব্যবধান হলো প্রায় আট বছরের। ততদিনে দেশের প্রতি আকর্ষণ কমে গেছে। বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন। ঠাকুর্দা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। উদ্বাস্তু কলোনির সেই বাড়িও বেহাত হয়ে গিয়েছিলো স্বাভাবিক নিয়মেই।

উমাকুমারের ব্যস্ত জীবনে বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। দেশে থাকতে বিয়ে করার সচ্ছলতা আসেনি। বিদেশে সে সুযোগ আসেনি। তবে তাঁর ব্যস্ত সফল জীবনে নারী-সান্নিধ্যের তেমন অভাব ঘটেনি। ছাত্রী, সহকর্মিণী, বান্ধবী, বন্ধুপত্নী অধিকাংশই মেমসাহেব, ভারতীয় বা বাঙালীও কেউ কেউ ছিলো।

অবশেষে যখন ছেচল্লিশ বছর বয়েসে এসে পৌঁছলেন উমাকুমার, তখন তাঁর সব কিছুর উপর বিতৃষ্ণা এসে গেলো। ঠিক করলেন আর নয়, এবার সব ছেড়ে-ছুড়ে দেশে চলে যাবেন। ইতিমধ্যে উমাকুমার পরিবেশ-বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন উচ্চকুলশীল প্রতিষ্ঠানে এবং সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

বছর-খানেক আগে মাস-খানেকের জন্যে ছুটিতে দেশে এসেছিলেন তিনি। তার কিছুটা কাটিয়েছিলেন কলকাতায়, বাকিটা দিল্লিতে। দিল্লিতে তাঁর একদম ভালো লাগেনি। সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচারে সর্বদা একটা তটস্থ ভাব। তিনি থাকতে থাকতেই দুজন সন্ত্রাসবাদী মোটর সাইকেলে চড়ে এক পাড়ার মধ্যে ঢুকে স্টেনগান চালিয়ে নির্বিচারে নিরীহ লোকদের হত্যা করে। নিউইয়র্কে কিংবা লস এঞ্জেলসে বসে এ-সব খবর শুনে উত্তেজিত হওয়া যায়, বিতর্ক করা যায়, কিন্তু একেবারে পাশের পাড়ায় এমন ঘটলে খুবই বিড়ম্বনা এবং আতঙ্কের ব্যাপার।

সেই তুলনায় বহু-নিন্দিত কলকাতা ভালো। কিন্তু তার যানবাহন, রাস্তাঘাট, কুখ্যাত লোডশেডিং আর সেই সঙ্গে ডক্টর উমাকুমার চক্রবর্তীর অনাবাসী অভ্যেসসমূহ বাদ সেধেছিল।

কিন্তু তবুও উমাকুমার নানা দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রবাসে যে নিঃসঙ্গ জীবন তার চেয়ে কলকাতায় কষ্টে থাকা ভালো। সব চেয়ে বড় কথা, জনমদুখিনী মাতৃভূমির প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করার জন্যে, যেমন এ সব ক্ষেত্রে হয়, উমাকুমারবাবুর মনে আদর্শবোধ জাগ্রত হলো। এই সঙ্গে আর একটা কথাও বিশেষ বিবেচ্য ছিলো তাঁর কাছে, সেটা হলো যে, পরিবেশের ব্যাপারে তৃতীয় পৃথিবীর এই অর্ধসভ্য দেশের লোকদের সচেতন করার দায়িত্বও

তাঁর যথেষ্ট রয়েছে। টরেন্টো, ওয়াশিংটন অথবা ব্রাসেলসের সাদা চামড়ার লোকদের পরিবেশ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাঁর নিজের দেশের লোকেদের ব্যাপারটা বোঝানো।

এই যে গাছের পর গাছ কাটা হচ্ছে, বছরের পর বছর খরা হচ্ছে, এই যে কুমীরেরা আর ডিম পাড়চে না, ব্যাঙ আর বানর সাপ হয়ে যাচ্ছে, ধানখেতে পোকামাকড় নেই, এ-সবের কারণ ও ফলাফল, অনিবার্য মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিলেন উমাকুমার। তিনি ঠিক করলেন পাকাপাকিভাবে কলকাতায় এসে বাস করবেন আর গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-শহরে পরিবেশ নিয়ে বক্তৃতা করে এই হতভাগ্য দেশের মানুষদের পরিবেশপরায়ণ করে তুলবেন।

এন-আর-আই জীবনে রীতিমত ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো উমাকুমারের। কিন্তু একটা অসুবিধে হয়েছে এই আঠারো বছর প্রায় এক নাগাড়ে বিদেশে থেকে, নানারকম খারাপ-ভালো অভ্যেস তৈরি হয়েছে তাঁর। এখন গরম একদম সহ্য হয় না, মশা কামড়ালে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, সরষেবাটা সজনেডাঁটা চচ্চড়ি চিবোতে বিরক্ত লাগে। রসগোল্লার রস হাতে লেগে থাকলে হাত চটচট করে।

এ-সব অসুবিধার কথা খুব একটা তোয়াক্কা না করে থিয়েটার রোডের পাশের একটা গলিতে এক বহুতল বাড়িতে একটা ভালো ফ্ল্যাট কিনে ফেললেন উমাকুমার। এয়ার কন্ডিশনার ইনভার্টার ইত্যাদি লাগিয়ে যতটা আরামদায়ক করা যায় বাসস্থান তা করলেন; টাকার অভাব নেই তাঁর। বিদেশ ছেড়ে চলে আসার সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি ছোট বাড়ি আর লাখখানেক ডলারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছাড়া আর যা কিছু ছিলো তার খানিকটা বেচে, কিছুটা দান করে বা উপহার দিয়েই সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকাপয়সা এবং তাঁর নিজস্ব কিছু মার্কিনী গ্যাজেট, ফ্রিজ ইত্যাদি নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন।

শুল্ক বিভাগের সঙ্গে প্রভূত লড়াই করে এবং বহু টাকা ডিউটি দিয়ে এসব দামী সাহেবী জিনিস বহুকষ্টে উদ্ধারও করলেন। এতে লাভক্ষতি যাই হোক, তিনি একসঙ্গে অনাবাসী বিলাস এবং আবাসী আনন্দ অর্জন করতে সমর্থ হলেন।

এ সব তেমন কঠিন কঠিন ব্যাপার নয় শেষ পর্যন্ত। একটু লেগে থাকলে হয়ে যায়। সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হলো সেটা, যে-উদ্দেশ্যে তিনি এদেশে ফিরে এসেছেন। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট, বক্তৃতা করা। নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, পরিবেশ সম্পর্কে বক্তৃতা করা। কিন্তু ডক্টর উমাকুমার খেয়াল করেননি যে তাঁর মাতৃভূমিতে আর যা কিছুর অভাব থাক বক্তার কোনো অভাব নেই।

যে কোনো বিষয়ে যে কোনোস্থানে যে কোনো সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বলে যেতে পারে, এমন ব্যক্তির সংখ্যা এদেশে অগুন্তি। দেখে বোঝার উপায় নেই, সভামঞ্চের একপ্রান্তে নড়বড়ে ফোলডিং চেয়ারে যে-বুড়ো আগাগোড়া ঝিমোচ্ছেন, সভাপতি তাঁর নাম ডাকামাত্র তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে অনায়াসে আড়াই ঘণ্টা বলে যেতে পারেন। আলোচ্য বিষয়ের মূলে না গিয়েও এই রকম মহতী সভায় বক্তৃতা করার সুযোগ পেয়ে এই বৃদ্ধ যে ধন্য হয়েছেন এবং তিনি শ্রোতাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না এবং পূর্ববর্তী বক্তারা যা কিছু বলার সবই বলে দিয়েছেন, এই তিনটি পয়েন্টে তিনি একঘণ্টা করে তিন ঘণ্টা বলতে পারেন, শুধু তাঁর অসুস্থ শরীর বলে আধঘণ্টা কমিয়ে আড়াই ঘণ্টা বলেন।

সে যা হোক, উমাকুমারবাবুর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধীরে ধীরে যোগাযোগ হতে লাগলো। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমিতি আছে যেগুলির শাখা বিভিন্ন জায়গায় ছোটবড় শহরে ছড়িয়ে আছে। এদের সভ্যবৃন্দ সপ্তাহে সপ্তাহে গুরুগম্ভীর সভা করে জ্ঞানীগুণীদের বক্তৃতা শুনতে ভালোবাসেন। ক্রমশ চেনাজানা এর-ওর মাধ্যমে উমাকুমার এই জাতীয় দু-একটি সমিতিতে ভিড়ে গেলেন। দু-এক জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগও জুটে গেলো।

বলা বাহুল্য, উমাকুমারের বক্তৃতার বিষয়গুলি যথেষ্টই আকর্ষণীয়। শ্যামবাজার ট্রামডিপোর মধ্যে বহুদিন আগে একটা কাঠবাদাম গাছ ছিলো, এখন আর নেই। এ বিষয়ে উমাকুমারের মর্মস্পর্শী বক্তৃতা, 'শ্যামবাজারের শেষ বাদামগাছ' যে কোনো শ্রোতার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে বাধ্য।

কলকাতার চিরঅবহেলিত রাস্তার কুকুরদের সম্পর্কে তাঁর মনোজ্ঞ আবেদন, 'নেড়ি কুকুরদেরও দরকার আছে' অথবা অসামান্য কবিত্বময় তাঁর উদ্ভিদ-চিন্তা 'পরের জন্ম যদি থাকে, সেই জন্মে যেন বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে জন্মগ্রহণ করি'—এই রকম সব বিষয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের যথেষ্টই প্রাণের টান আছে, উমাকুমারের এটা ধরতে বিশেষ দেরি হয়নি।

কিন্তু প্রথমদিকে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিলো উমাকুমারের যে আলোচনাটি, তার নামটি একটু দীর্ঘ, কিন্তু বড় ভালো—' 'নিজের ঘরে নিজের জানালা, নিজের জানালায় নিজের টব, নিজের টবে নিজের গাছ, নিজের গাছে নিজের ফুল—' গন্ধরাজ, বেল কিংবা শেফালি, বকুল।'

ব্যাপারটা কিছুদিনের মধ্যেই বেশ জমে উঠলো। লোকজন খবর নিতে লাগলো, 'কে এই ডক্টর উমাকুমার চক্রবর্তী?' কম-বেশি নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো এদিক-ওদিক, এ-শহর ও-শহর থেকে।

অতঃপর বক্তৃতাসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উদ্যোগী হলেন ডক্টর চক্রবর্তী। ব্যাপারটাকে সম্মানজনক পর্যায়ে রাখতে হবে, এবং তার প্রথম ধাপ হলো একজন সুন্দরী, সুশ্রী, শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ব্যক্তিগত সহায়িকা বা পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট নিয়োগ করা।

নিজের চিঠি নিজেই উত্তর দেওয়া, বাইরের কেউ এলে তাঁর সঙ্গে নিজেই দেখা করা বা কথাবার্তা বলা একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। সুতরাং একজন পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট চাই, সবচেয়ে ভালো হয় যদি তাকে বলা হয় প্রাইভেট সেক্রেটারি, তাতে আভিজাত্য আসে এবং সেই সঙ্গে সেই সেক্রেটারি যদি সুন্দরী বিদুষী হয়, তবে তো কথাই নেই।

ডক্টর চক্রবর্তী অনেক ভেবে-চিন্তে একটি খবরের কাগজে রবিবাসরীয় কলমে বিজ্ঞাপন দিলেন :

'অনাবাসী বুদ্ধিজীবীর জন্য সপ্রতিভা, সশিক্ষিতা সুন্দরী মহিলা আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুযায়ী। ফটোসহ আবেদন করুন।'

বিজ্ঞাপনটি খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিয়ে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন উমাকুমার। আজকাল রবিবারের পাতায় বিজ্ঞাপন ছাপা হতে বেশ সময় লাগে। সে হতেই পারে। কিন্তু কোনো এক রবিবার খুব সকালে হট্টগোলে, চিৎকার-চেঁচামেচিতে, বামাকণ্ঠের কলহে ও আর্তনাদে ঘুম থেকে ধড়মড় করে জেগে উঠলেন ডক্টর চক্রবর্তী। তাড়াতাড়ি জানলার পর্দা সরিয়ে তাঁর পাঁচতলার

ফ্ল্যাটের ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে দেখলেন বিশাল ভিড়, সামনের রাস্তায় শুধু মহিলা আর মহিলা।

উমাকুমার বিজ্ঞাপনে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'সপ্রতিভা, সুশিক্ষিতা, সুন্দরী', তিনি বিস্মিত হয়ে প্রচুর পরিমাণ সপ্রতিভা মহিলা দেখতে পেলেন, কিন্তু তাঁরা সুশিক্ষিতা অথবা সুন্দরী কিনা এত উঁচু থেকে ধরতে পারলেন না। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই অনুধাবন করতে পারলেন, হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়, এই মহিলারা তাঁর সেই সরল বিজ্ঞাপন দেখেই এসেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আদিম আত্মরক্ষার প্রেরণায় উমাকুমার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে তার আগে যত দ্রুত সম্ভব প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে পেছনের লিফট দিয়ে নেমে সোজা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আপাতত ঘূর্ণায়মতী কালোপরীর ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠের মধ্যেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানে সামান্য চা-জলখাবার খেয়ে দশটা নাগাদ ফ্ল্যাটের দিকে ফিরে এসে দেখলেন ভিড় একটু হালকা হয়ে এসেছে। তবে তখনো মহিলার সংখ্যা যথেষ্ট। এবং তাঁদের কারো কারো চেহারা দেখে সুন্দরী বা সপ্রতিভা মনে না হলেও যথেষ্টই বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। সুখের কথা, এঁরা কেউই তাঁকে চেনেন না এবং সেই সুযোগে অবস্থাটা একটু বুঝে উঠেই ফ্ল্যাটের মধ্যে না গিয়ে উমাকুমার আবার গা-ঢাকা দিলেন।

দুপুরে হোটেলে খেয়ে, বিকেলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বার কয়েক চক্কর দিয়ে অবশেষে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে খুব সন্তর্পণে বাড়ি ফিরলেন উমাকুমার। অত রাত পর্যন্ত কারো অপেক্ষা করার কথা নয়, তবু খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি।

সে যা হোক, লিফটের কাছে নিজের ডাকবাক্সে দেখলেন গাদা-গাদা দরখাস্ত পড়ে রয়েছে। তার অনেকগুলির সঙ্গেই সার্টিফিকেট এবং ফটো যুক্ত। পাঁচতলায় ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন সেখানেও দরজার ফাঁক দিয়ে বহু সচিত্র এবং স-সার্টিফিকেট আবেদনপত্র গাদা করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মোটামুটি গোনাগুনতি করে মনে হলো, অন্তত দুশো-আড়াইশো দরখাস্ত নিশ্চয়ই হবে। এর মধ্যে যেগুলির সঙ্গে ছবি আছে সেগুলি আলাদা করে বাছাই করলেন উমাকুমার। তার সংখ্যাও প্রায় ষাটটা হবে।

সেদিন বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন কুমার উমাকুমার। অনেক রকম দেখেশুনে বিবেচনা করে অবশেষে ভোর চারটে নাগাদ মোটমাট সাতজনকে বাছাই করলেন তিনি, যাদের লেখাপড়া ভালো, দেখতে ভালো, তাছাড়া ছবি দেখে স্মার্ট মনে হয়, বাংলায় যাকে বলে সপ্রতিভা। তবে এর পর এই সাতজনের নাম-ঠিকানা, কাছে থাকে না দূরে থাকে, জাতধর্ম কী ইত্যাদি বিবেচনা করতে গিয়ে শুধু মাত্র একটা দরখাস্তেই আবদ্ধ হয়ে গেলেন উমাকুমার। কারণ আর কিছুই নয়, দরখাস্তকারিণীর তাঁরই নামে নাম, শ্রীমতী উমা চক্রবর্তী।

তখন প্রভাত-সূর্যের রঙিন রশ্মিমালা পাঁচতলার পূর্বমুখী ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে ডক্টর উমাকুমার চক্রবর্তীর পড়ার টেবিলে এসে পড়েছে। তারপর ভোরের সোনালি আলোয় শ্রীমতী উমা চক্রবর্তীর ছবিটা ভালো করে দেখতে লাগলেন। লোকে যাকে কনে-দেখানো-আলো বলে এটা ঠিক সে রকম আলো নয়, কিন্তু অনেকটা তার কাছাকাছি। শুধু কাছাকাছি নয় বরং বলা চলে আরো মনোরম।

শ্রীমতী উমার চেহারা ভালো, লেখাপড়া ভালো। শ্রীমতী উমাকেই উমাকুমারের পছন্দ হলো। তবে নিজের মনে 'পছন্দ' শব্দটা নিয়ে উমাকুমার কিঞ্চিৎ বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করলেন। লোকে পাত্রী পছন্দ করে, প্রাইভেট সেক্রেটারি সম্পর্কে এ-শব্দটা খাটে না, এ-বিষয়ে কী একটা শব্দ আছে, উমাকুমারের কিছুতেই মনে এলো না।

সে যা হোক, শেষ পর্যন্ত স্বনামধারিণীকেই নিয়োগপত্র পাঠালেন তিনি। যথাসময়ে মেয়েটি এলো এবং তাকে দেখে, ফটো দেখে যতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন ততটাই চমকিত হলেন তিনি।

ছবির সঙ্গে কিছুই মিলছে না। সেই ডাগর-ডোগর আঁখি, পাতলা ঠোঁট, উড়ু-উড়ু চুল কিছুই মিলছে না। প্রথম দর্শনেই একথা উমাকে জানালেন উমাকুমার, আরো বললেন, 'এটা জোচ্চুরি, রীতিমত জোচ্চুরি।'

ফটোর চেহারার মতো দেখতে না হলেও উনপঁচিশ, কালো চোখের ঝকঝকে মণি, মোটা ঠোঁট, শ্যামলা রঙের এই মেয়েটিও তুচ্ছ নয়। সে চোখ নাচিয়ে বললো, 'জোচ্চুরি আবার কি, আমি তো ইয়ার্কি করেছি, আপনি বুঝতে পারেননি?'

উমাকুমার বিব্রত বোধ করলেন, বললেন, 'কিসের ইয়ার্কি? কী বুঝতে পারবো?'

উমা বললো, 'ও ছবিটা কার? ভালো করে দেখুন?' সন্ত্রস্তভাবে ভালো করে দেখেও উমাকুমার কিছু বুঝতে পারলেন না। তখন মেয়েটিও খুব ঘাবড়িয়ে গেলো, বললো, 'সত্যি আপনি এই ছবি আগে দেখেননি!'

যখন উমাকুমার অকপটে স্বীকার করলেন সত্যিই তিনি এই ছবিরানীকে চেনেন না, উমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে, তারপর বললো, স্যার, পায়ের ধুলো দিন।'

দীর্ঘদিন মার্কিন দেশে বসবাস করে পায়ের ধুলোর ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন উমাকুমার, ফলে আজ এই ফাজিল মেয়েটির অনুরোধ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না।

আসলে এই মেয়েটি নিজের ফটো না পাঠিয়ে সিনেমার কাগজ থেকে এক নায়িকার পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি কেটে নিজের দরখাস্তের সঙ্গে লাগিয়ে পাঠিয়েছিল। সে নিতান্তই খেলাচ্ছলে দরখাস্তটি পাঠায়, ধরেই নিয়েছিলো চাকরি হবে না, তা না হোক, এই অনাবাসীর সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করতে দোষ কী? দোষ নেই কিছু, কিন্তু এই অনাবাসী যে সিনেমা তারকার হৃদয়স্পন্দনকারী ফটো দেখেও ঠাট্টাটা ধরতে পারবেন না, তার কারণ তিনি দীর্ঘ দশ বছর কোনো দিশি ছবি দেখেননি। এটা শ্রীমতী উমা বুঝে উঠতে পারেনি। তার মুখে বিস্তৃত ব্যাখ্যা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন উমাকুমার।

এবার মেয়েটি উঠলো, উঠে হাসিমুখে বললো, 'সরি! সত্যিই আমি দুঃখিত। আমি যাচ্ছি। আপনার অসুবিধে করার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।'

মেয়েটির চলে যাওয়া দেখে, কী ভেবে উমাকুমার বললেন, 'কোথায় যাচ্ছো? তোমাকে তো আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি?'

উমা হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'অ্যাপায়েণ্টমেণ্ট! আমার চাকরি এখনো আছে?'

উমাকুমার বললেন, অবশ্যই আছে।

কাজে বহাল হয়ে গেলো উমা। উমাকুমারের টেলিফোন ধরে, চিঠির উত্তর টাইপ করে, বক্তৃতার বয়ান লেখে। প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকে দু পেয়ালা চা বানিয়ে নিজে এক পেয়ালা খায়,

এক পেয়ালা উমাকুমারকে দেয়। উমাকুমার যখন কোথাও বক্তৃতা করতে যান, সেও তাঁর সঙ্গে যায়। উমাকুমার গাড়ি চালায়, সে পাশের সিটে বসে থাকে। উমাকুমার যখন বক্তৃতা করেন, উমা সামনে বসে নোট রাখে।

এরই মধ্যে একদিন একটা গণ্ডগোল হলো। কলকাতার কাছাকাছি একটা অভিজাত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান থেকে একটা বক্তৃতার আমন্ত্রণ এলো উমাকুমারের কাছে, বিষয়—, 'আজকাল বাঁশগাছ আর তত লম্বা হচ্ছে না কেন?' বিষয়টি মোটেই নতুন নয়, বরং বেশ পুরনো। কিন্তু বিষয়টি উমাকুমারের খুব প্রিয়। আমেরিকায় ওকবৃক্ষের ক্রমহ্রাস্বত্ব-প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য গত বছরেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। তা ছাড়া ঠিক এই একই বিষয়ে তিনি এখন একজন প্রায় স্পেশালিস্ট, ইতিমধ্যে অন্তত আরো দশ জায়গায় বাঁশগাছের এই অধোগতি বিষয়ে তিনি বক্তৃতা করে এসেছেন। এ বিষয়ে এ দেশেও তাঁর খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে অন্যখানে। এবারেব নিমন্ত্রণ একটা অন্য ধরনের গণ্ডগোল। বক্তৃতানুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা একটি মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁরা চিঠিতে ডক্টর উমাকুমার চক্রবর্তীকে শ্রীমতী উমা চক্রবর্তী বলে সম্বোধন করেছেন। কী রকম যেন খটকা লাগলো ডক্টরের, তিনি উমাকে বললেন, 'শ্রীমতী বলে লিখেছেন, মনে হচ্ছে এটা তোমাকেই বক্তৃতা করতে ডেকেছে। আমাকে নয়।'

উমা বললো, 'তা হতে পারে না। আমাকে কেন বক্তৃতা করতে ডাকবে? ওরা আপনাকেই ডেকেছে। ভুল করে আপনাকে মহিলা ভেবেছে।' তারপর একটা থেমে থেকে বললো, 'তবে আপনার এই বাঁশগাছের বক্তৃতাটা এতবার শুনেছি আর নোট নিয়েছি যে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আপনি যদি বলেন আমিও গিয়ে বক্তৃতাটা করে আসতে পারি।'

সামান্য ভাবলেন উমাকুমার, তারপর ঠিক করলেন, ঠিক আছে, একটু মজা করাই যাক না, আর মেয়েটা কেমন বলে সেটাও দেখা যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে উমাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। উমা গটগট করে নেমে মঞ্চেও উঠে একঘণ্টা ঝড়ের মতো বলে গেলো পরিবেশ দূষণের ফলে কী করে বাঁশগাছ ছোট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, এতে কী ক্ষতি হচ্ছে পৃথিবীর, মানবসমাজের, জীবজগতের এবং এর প্রতিকারই বা কী?

শ্রোতারা, শুধু শ্রোতারাই বা কেন, ডক্টর উমাকুমার চক্রবর্তীও মন্ত্রীমুগ্ধের মত শুনলেন সেই বক্তৃতা। এরপর যখন সভাকক্ষ থেকে পণ্ডিত শ্রোতারা একে একে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন শ্রীমতী বক্তাকে, উমাকুমার একটু চিন্তিত হলেন, এসব কঠিন প্রশ্নের উত্তব কি করে দেবে মেয়েটা?

· কিন্তু উমাকে তখনো তাঁব সঠিক পরিমাপ করা হয়নি। প্রশ্নগুলো শোনামাত্র উমা মঞ্চ থেকে নামতে নামতে বললো, 'এ সব অতি সাধারণ প্রশ্নের আমি আর কী উত্তর দেবো? আমার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করুন সেই সব বলতে পারবে, বলে সে ইঙ্গিত উমাকুমারকে দেখিয়ে দিলো। আইনস্টাইনকে জড়িয়ে এ ধরনের একটা গল্প উমাকমার আগে কোথায় যেন পড়েছিলেন, এখন উমার কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন।

এ গল্প আর বেশি টেনে নিয়ে লাভ নেই। যাঁরা যা বোঝার, সবাই বুঝতে পেরেছেন। শুধু শুধু কালি কাগজ অপচয় করে কী হবে?

শুধু একটা কথা, এ-দেশের হাওয়া, ভেজাল সরষের তেল, রোদ, মশা ডক্টর উমাকুমারের আর সহ্য হচ্ছে না। তিনি আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর সুযোগ্য সহকারিণী শ্রীমতী উমা চক্রবর্তীও যাচ্ছেন।

গুপ্তপ্রসঙ্গ

(প্রমীলা কাণ্ড)

রাত সাড়ে দশটার সময় সদ্য খাওয়া শেষ হয়েছে, এর পরে খবরের কাগজগুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে শুতে যাবো, এমন সময় ফোন এলো।

এই সময়টা ফোন-টোন খুব বিরক্তিকর। আমার নিতান্ত নিজস্ব এই কিছুক্ষণ খবরের কাগজের জন্যে নির্দিষ্ট এবং উৎসর্গীকৃত।

সারাদিন খবরের কাগজ পড়ার অবকাশ আমার হয় না। সকালে উঠে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে পার্কে গিয়ে ভেজা ঘাসের উপরে খালিপায়ে এক ঘণ্টা হাঁটি। তারপর চা, দাড়ি কামানো, স্নান ইত্যাদি, অবশেষে ব্রেকফাস্ট। ততক্ষণে অফিসের প্রিজনভ্যান এসে যায়, ছুটে গিয়ে বন্দী হই। বন্দীদশা থেকে মুক্ত হতে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা-আটটা। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি।

বাড়ি ফিরেও বিশেষ বিশ্রাম হয় না। আমার একমাত্র মামাতো ভাই ন্যাড়া গত বছর মন্ত্রী হয়েছে। আমার সূত্রে অনেকেই তার কাছে তদ্বির-তদারক করে। সন্ধ্যার এই সময়টা সেই সব লোকজন আসে। যদিও ক্লান্ত থাকি, কিন্তু ভালোই লাগে। মন্ত্রী মামাতো ভাইয়ের ক্ষমতাব কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশ উপভোগ করতে করতে নিজেকেও বেশ ক্ষমতাবান মনে হয়। তাও তো নাড়ু এখনো পুরোপুরি মন্ত্রী নয়, নেহাত উপমন্ত্রী।

কাউকে কাউকে বেশ ধমকিয়ে দিই, বলি, 'নতুন রেশন কার্ড করার জন্যে বলা যাবে না, ওসব ছোটো ব্যাপার পাড়ার কাউন্সিলরকে বলো, মন্ত্রীকে বলা যাবে না।'

আবার কাউকে বলি, 'মন্ত্রীকে কি জামিনের কথা বলা যায়? জজ কোর্টে জামিন না পাও হাইকোর্টে যাও। মন্ত্রী এর মধ্যে মাথা গলাতে পারবে না।'

কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায়, আবার কারো কারো দরখাস্ত রেখে দিই। প্রত্যেক রোববার সকালে মামার বাড়ি যাই, মামাতো ভাই কদাচিৎ থাকে। আমি মামীমার হাতে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে আসি। আমার মামীমা খুব বুদ্ধিমতী, চব্বিশ বছর বয়েসে ছয় বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। কত আপদ-বিপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় করে ছেলেকে মানুষ করেছেন, শুধু মানুষ নয়, মন্ত্রী করেছেন।

সে যা হোক, সে অন্য গল্প। মন্ত্রীর গল্প বলার সময় বা জায়গা এটা নয়। আর তত সাহসও আমার নেই।

বরং স্রেফ নিজের কথা বলি। সেটাই নিরাপদ। সুতরাং যা বলছিলাম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি-অফিস-বাড়ি। তারপর সন্ধ্যাবেলার তদ্বির-তদারক শেষ হওয়ার পরে হাত মুখ

ধুয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিই। তারপর ডাক্তারের পরামর্শ মতো আধ ঘণ্টা, এবার আর খালিপায়ে নয়, চটিপায়ে রাস্তায় হাঁটি। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিছানায় শুতে আসি সকালবেলার খবরের কাগজ হাতে নিয়ে। তখন সেগুলো আর খবরের কাগজ নেই, ইতিহাস হয়ে গেছে। কিছু কিছু লোকমুখে অফিসে বা বাসায় সকাল থেকে শুনেছি, তেমন অতীব চমকপ্রদ সংবাদ হলে অফিসের বারোয়ারি কাগজে একবার দূর থেকে হেড লাইনে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়েছি।

কিন্তু হেড লাইনের চেয়েও আমাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে খুচরো খবর, আইন-আদালতের কলম এবং নানা ধরনের বিজ্ঞাপন।

রাতে নির্ভার শরীর ও মনে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে খবরের কাগজগুলো পড়ি। তিনটে কাগজ রাখি আমি, তিনটেই বাংলা কাগজ, দিশি কাগজের ইংরেজি খবরে তেমন জুৎ পাই না, তার জন্যে টাইম, নিউজ উইক সপ্তাহান্তে যথেষ্ট।

খবরের কাগজ পড়ার সময় আমাকে কেউ বিরক্ত করে আমি সেটা চাই না। একদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত, আমি চিরকুমার, বিয়ে-টিয়ে করিনি। রাতের বেলা বিছানায় আমাকে বিরক্ত করাব তেমন কেউ নেই।

কিন্তু সত্যিই আজ বিরক্ত হলাম। সবে প্রথম কাগজটার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনের এক যুবতীর (উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উচ্চতা সোয়া পাঁচ ফুট, পরনে নীল তাঁতের শাড়ি) বর্ণনা পড়ে ফটোর চেহারার সঙ্গে যেটুকু সম্ভব মিলিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় ফোনটা এলো।

বেশ কয়েকবার ক্রিং ক্রিং করে বেজে ফোনটা থেমে গেলো। দিনের বেলায় ফোনটা ভাইয়ের ঘরে থাকে, রাতে আমি আমার ঘরে নিয়ে আসি ওটা। সেটা নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্যে, যাতে কাজের লোকজন কেউ ফোনটা ধরে আমাকে না ডাকতে পারে।

অন্যান্য দিন সাধারণত শোয়ার সময় ফোনেব রিসিভারটা মেজেয় নামিয়ে রাখি কিন্তু আজ ভুল হয়ে গিয়েছিল, সেই সুযোগে ফোনটা বাজছে। কার কি তদ্বির পড়েছে এত রাতে, এসব ফোন আমি চট করে ধরি না। এরকম ক্ষেত্রে আমি ফোনটাকে গুণে গুণে কুড়িবার বাজতে দিই, তারপর রিসিভারটা তুলে কট্ করে কেটে দিই।

এই রকম পরপর তিনবার ট্রায়াল দিই। তাবপরেও যদি ধৈর্য ধরে কেউ চতুর্থবার ফোন করে তাহলে ধরেই বলি, 'রং নাম্বার'।

কিন্তু আমার গলার স্বর খুব মিহি, দূরভাষী তারের মধ্যে সে আরো মিহি হয়ে যায়, ফলে প্রায় প্রত্যেকেই ধরতে পারে, বলে, খোকাদা ঘুমুচ্ছিলে নাকি?'

আজো সে রকম হতে পারতো। কিন্তু আজকের ফোন যে করেছে সে কুড়িবার ক্রিং ক্রিং করার জন্যে অপেক্ষা না করে আবার ফোন করলো। আবারো দু'তিনবার বাজার পর ছেড়ে দিলো।

কেমন খটকা লাগছিলো। তৃতীয়বারে ফোনটা বাজতেই খপ করে ধরলাম। আমার ফোন ধরার কায়দাটা একটু অন্যরকম। বাইশ বছর বয়েস পর্যন্ত এমন এলাকায় ছিলাম যেখানে রেল স্টেশন, থানা আর দু'তিনটে মাড়োয়ারি গদি ছাড়া কোথাও ফোন ছিল না। আমি দূর থেকে ফোন দেখেছি। আমাকে কেউ কখনো ফোন করেনি, আমিও কাউকে করিনি।

কলকাতায় এসে আরো কিছুর সঙ্গে ফোন ব্যবহার করা শিখলাম। সদাগরি অফিসের কাজের দৌলতে নিজের বাড়িতেও একটা ফোন এলো। কিন্তু ফোনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক

এখনো গড়ে ওঠেনি। জিনিসটাকে আমি দূরে দূরে রাখতেই চাই। নিজে বিশেষ ফোন করি না বা ধরি না, কিন্তু যদি কখনো বাধ্য হয়ে ধরতে হয় তবে অতর্কিতে, খপ করে, শক্ত পাঞ্জায় ধরি, যেন বিষধর সাপের গলা ধরেছি, অসতর্ক হলেই সর্বনাশ।

অবশেষে আজো তাই করলাম, এবং সাপটা ধবা পড়লো দু'বার 'হ্যালো হ্যালো'র পর, সাপটা কথা বললো, 'খোকাদা, আমি প্রসঙ্গ বলছি।' বলা বাহুল্য প্রসঙ্গ কারো আসল নাম নয়, প্রসঙ্গ প্রসঙ্গমাত্র। টেলিফোনে 'আমি প্রসঙ্গ বলছি' যে বললো তার পিতৃদত্ত নাম প্রমীলাকান্ত দাশগুপ্ত। সে ছবি আঁকে।

হায় ছবি তুমি শুধু ছবি

পমীলাকান্ত ওরফে পসঙ্গ আমাব খুবই অনুগত। সে আর ন্যাড়া মানে আমার মামাতো ভাই একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তো, দুজনে একই সঙ্গে পরপর দু'বার হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল করে। পরে ন্যাড়া সাপ্লাইয়ের ব্যবসা শুরু করে, কি সাপ্লাই তা অবশ্য কখনো বলেনি। আর প্রসঙ্গ আমার পরামর্শে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়। সেখানেও সে আঁকাজোকা শেষ করে পাশ হয়ে বেরোতে পারেনি। তার আগেই সে আর্ট কলেজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ঐ মহাবিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে জটিল অভিজ্ঞতা এখন তাকে জীবনে একটা দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে দিয়েছে।

তাকে নাম বদলের পরামর্শও আমি দিই, বলি যে, ' প্রমীলাকান্ত দাশগুপ্ত নামে এ বাজারে ছবি এঁকে সুবিধে করা কঠিন, নাম তোমাকে পালটাতে হবে।' সে আমাকে বলেছিল, 'খোকাদা, তুমি যদি খোকা নামে বুড়ো হতে পারলে, তাহলে প্রমীলাকান্ত নামে আমার কি অসুবিধে হবে?'

দু'চারবার চাপ দেবার পর প্রমীলাকান্ত অবশ্য আমার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলো। তার নতুন নামকরণও আমারও করা, প্রমীলার প্র রইলো, সেই প্র দিয়ে হলো প্রসঙ্গ, মধ্যপদ কান্ত সম্পূর্ণ বাদ আর দাশগুপ্তের দাশ ছেঁটে দিয়ে শুধু গুপ্ত রইলো। অর্থাৎ প্রমীলাকান্ত দাশগুপ্ত হলো প্রসঙ্গ গুপ্ত।

বেশ কাব্যময় নাম। নামটার মধ্যে একটু আর্টিস্ট-আর্টিস্ট ভাব, একটা রহস্যময়তা আছে। আর নামটা বেশ লাকিও বটে, প্রথম একজিবিশনেই উতরিয়ে গেল প্রসঙ্গ গুপ্ত। কাগজে কাগজে অনেকটা লেখালেখিও হলো। বাংলা দৈনিকের প্রৌঢ় কলারসিক মন্তব্য করলেন, 'প্রসঙ্গ অবান্তর নয়।' ইংরেজি কাগজে প্রসঙ্গ গুপ্তকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে লিখলো, 'পি জি ইস্, ডিফারেণ্ট'। একটু ধরাধরি করতে হয়েছিল, কিন্তু সেটা বিফলে যায়নি।

তার প্রথম প্রদর্শনীতেই একটা অচেনা লোক একটা ছবি সস্তায় কেনার চেষ্টা করলো। যদিও সে কিনলো না কিন্তু দামদর করতে করতে পঁচিশ টাকা থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। ষাট টাকাতে দিলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ছবির গায়ে দাম লেখা ছিল বাইশশো পঞ্চাশ টাকা। এরপরে ষাট টাকায় দেওয়া খুব সম্মানজনক নয়।

সম্মানজনক হোক আর নাই হোক, শিল্পীর অপরিচিত ব্যক্তি ছবি কিনতে চাইছে—এরকম সাধারণত দেখা যায় না। এই ধরনের প্রদর্শনীতে যারা ছবিটবি কেনে তারা সবাই শিল্পীর আশেপাশের চেনাশোনা লোক।

তবে এসব কথা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। আমি জীবনে কোনোদিন কোনো

ছবি কিনিনি। ছবি বুঝিও না, সেটা প্রসঙ্গ জানে। এবং সম্ভবত সেই জন্যেই আমাকে একটু সম্মানটম্মান করে।

প্রসঙ্গ যে খুব ফালতু নয় সেটা আমি এবং অনেকে টের পায় তারাপদবাবুর একটা লেখা পড়ে। তারাপদবাবু তাঁর কাণ্ডজ্ঞানে এক শিল্পীর কথা লিখেছিলেন, প্রদর্শনীতে যাঁর একটা ছবি দেখে জনৈক দর্শক উক্তি করেছিল,'অপূর্ব ছবি। দেখলেই জিবে জল আসে।' প্রসঙ্গ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল সেই দর্শককে, 'এটা হলো সূর্যাস্তের ছবি। দেখে আপনার মনে আনন্দ হতে পারে। চোখে আরাম হতে পারে, কিন্তু জিবে জল আসে কি করে?'

জবাবে নির্বিকার দর্শক বলেছিলেন, 'আমি ভেবেছিলাম ডবল ডিমের ওমলেটের ছবি। সূর্যাস্তের ছবি বুঝতে পারিনি। মাপ করবেন।'

তারাপদবাবুর রসিকতা আমার একদম ধাতে সয় না, কিন্তু তিনি যে প্রসঙ্গের এই ব্যাপারটা নিয়েও রসিকতা করবেন এবং সেটা পড়ে পাবলিক হাসবে তা ভাবতে পারিনি।

গতবার সিঙ্গাপুরে এক কনফারেন্সে আমার যাওয়ার কথা ছিল। সব ঠিকঠাক, কিন্তু কিসে কি হলো, আমার বড় সাহেব সেই কনফারেন্সে চলে গেলেন, আমার নিমন্ত্রণ আর এলো না, অথচ বিষয়টা আমারই ছিল।

সে যা হোক, চাকরি করতে গেলে এমন অনেক হয়। বড় সাহেব আমি যাতে মনে দুঃখ না পাই, সিঙ্গাপুর থেকে ফেরবার সময় আমার জন্যে এক বোতল লাল জনিওয়াকার আর একটা গেঞ্জি নিয়ে এসেছিলেন।

বোতলটা পেয়ে খুশি হয়েছিলাম কিন্তু গেঞ্জিটার বুকে আর পিঠে বড় বড় বেগুনি অক্ষরে লেখা ছিল, 'কিক্ মি এগেইন, প্লিজ' মানে 'আমাকে আবার লাথি মারুন'।

বড় সাহেবের ইঙ্গিতটা আমি বুঝেছিলাম, কিন্তু মৃদু আপত্তি জানালাম, 'না স্যার।' এ গেঞ্জিটা আমি গায়ে দিতে পারবো না। লোকেরা হাসবে।' বড় সাহেব বলেছিলেন, 'কি যা-তা বলছেন আপনি? জানেন না হাস্যকর হওয়াই এখন আধুনিকতা?'

বড় সাহেবের কথাটা আমার মনে ধরেছিল। সুতরাং যখন তারাপদবাবুর কল্যাণে প্রসঙ্গ হাস্যকর হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম এবার আর তাকে ঠেকানো যাবে না।

কে কাকে ঠেকাতে চায়? চাইলেও কেউ কাউকে কি ঠেকাতে পারে? যখন সে উঠতে থাকে, উঠতেই থাকে। হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়, কেউ কেউ তাকে ঠেকাতে চেয়েছিল। প্রসঙ্গ আমার নিজের লোক। তাছাড়া তার সঙ্গে আমার স্বার্থের কোনো সংঘাত নেই, তাকে যে ঠেকানো যায়নি তাতে আমি খুশি।

অবশ্য আজকাল প্রসঙ্গের সঙ্গে আমার খুব কম দেখাসাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আমি মোটামুটি টের পাই যে সে ছবির আকাশে জেট বিমানের মত তরতর করে উড়ছে।

কথাবার্তা

(পাঠক পাঠিকা মনে রাখবেন সত্যনারায়ণ = আমি এবং প্রমীলাকান্ত = প্রসঙ্গ।)

প্রমীলাকান্ত ঃ খোকাদা, আমি প্রসঙ্গ বলছি।

সত্যনারায়ণ ঃ কে, প্রমীলা? তুমি এত রাতে বিরক্ত করছো? তুমি জানো না আমি এখন খবরের কাগজ পড়ি,

প্রমীলাকান্ত ঃ তা জানি। খুব ভালোভাবেই জানি। কিন্তু একটা খবর কাগজে ছাপা হয়নি অথচ আপনার জানা দরকার সেই জন্যেই ফোন করছি।

সত্যনারায়ণ ঃ (কিঞ্চিৎ বিবক্ত হয়ে) বলো কি খবর?

প্রমীলাকান্ত ঃ খবরটা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন।

সত্যনাবায়ণ ঃ তাড়াতাড়ি বলো। দেরি করে চমকাতে আমার মোটে ভালো লাগে না।

প্রমীলাকান্ত ঃ আমি কলম্বো যাচ্ছি । ন্যাড়া পাঠাচ্ছে।

সত্যনারায়ণ ঃ এই দুর্দিনে কলম্বো? তুমি কি ভারতীয় শান্তিসেনায় যোগ দিয়েছো?

প্রমীলাকান্ত ঃ আরে তা নয়, আমি আমার বারোটা ছবি নিয়ে কলম্বোয় ভারত-উৎসবে যাচ্ছি।

সত্যনারায়ণ ঃ এই দুর্দিনে ভারত-উৎসব! সাংঘাতিক কথা বলছো। তোমার কি কোনো বোধ নেই? ন্যাড়ার কথায় ওদিকে যেয়ো না, মারা পড়বে। শোনো, আমাদের কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ অফিস ছিল কলম্বোয়, তাব তামিল ম্যানেজারকে আজ আড়াই মাস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো গুমখুন হয়েছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

প্রমীলাকান্ত ঃ দোহাই খোকাদা, এই মাঝরাত্তিরে ভয় দেখাবেন না। সব ঠিকঠাক, এখন ভয় খেলে চলবে না। ভয় দেখাবেন না।

সত্যনারায়ণ ঃ তুমিও মাঝরাত্তিরে আমার খবরের কাগজ পড়ায় বাধা দিয়ো না।

(এই সময় টেলিফোনের মধ্যে একটা তৃতীয় কণ্ঠস্বর মহিলার গলা শোনা গেল, 'থ্রি মিনিটস ওভার, থ্রি মিনিটস।')

সত্যনারায়ণ ঃ (একটু চমকিয়ে উঠে) সর্বনাশ, এটা ট্রাঙ্কল নাকি! এটা তো লোকাল কল মনে হচ্ছে না! প্রমীলাকান্ত তুমি কোথা থেকে কথা বলছো?

প্রমীলাকান্ত ঃ কলকাতায় আমার ফ্ল্যাট থেকেই কথা বলছি।

সত্যনারায়ণ ঃ তা হলে 'থ্রি মিনিটস ওভার—থ্রি মিনিটস' এসব কি হচ্ছে?

প্রমীলাকান্ত ঃ আমি নিজে তো ফোন পাইনি। বাড়িওয়ালির কাছ থেকে টাই লাইন নিয়েছি। তাঁর সঙ্গে চুক্তি একনাগাড়ে তিন মিনিটের বেশি কথা বলবো না। তাই তিনি তিন মিনিট হয়ে গেলেই ঐরকম আওয়াজ দেন।

সত্যনারায়ণ ঃ কিন্তু মহিলার গলার স্বর কেমন চেনা-চেনা মনে হলো। উনি কি টেলিফোন ডিপার্টমেন্টে ট্রাঙ্ক সেকশানে আগে কাজ করতেন? (এই সময় টেলিফোনের মধ্যে আবার তৃতীয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শাট্ আপ!')

প্রমীলাকান্ত ঃ খোকাদা আপনি ডোবালেন। বাড়িওয়ালি টাইলাইনে সব কান পেতে শুনছে। (পুনরায় টেলিফোনের মধ্যে তৃতীয় কণ্ঠস্বর, না, আমি শুনছি না। মিথ্যুক কোথাকার।')

সত্যনারায়ণ ঃ উনি তো শুনছেন না বলছেন, শুধু শুধু ভদ্রমহিলার নামে দোষ দিচ্ছো।

(আবার টেলিফোনের মধ্যে করুণ তৃতীয় কণ্ঠস্বর, 'দেখুন তো!')

প্রমীলাকান্ত ঃ খোকাদা, বাড়িওয়ালির সাইড নেবেন না। ওর গ্যারেজের ঘরে ছবিগুলো রেখেছিলাম। হঠাৎ তালা দিয়ে দিয়েছে। এখন ছবিগুলো কি করে বার করি, কি করে ভারত-উৎসবে নিয়ে যাই! অনেকটা সেই জন্যেই আপনাকে ফোন করছি।

তৃতীয় কণ্ঠস্বর ঃ আগে দেড় বছরের গ্যারেজ ভাড়া মেটাও। তার সঙ্গে দেড় কুইন্টাল দুধের দাম দিতে হবে।

প্রমীলাকান্ত ঃ ভারত উৎসব থেকে ফিরেই আপনার গ্যারেজ ভাড়া দিয়ে দেব। কিন্তু দুধের দামটা কেন বুঝতে পারছি না।

তৃতীয় কণ্ঠস্বর ঃ বুঝতে পারছো না? গ্যারেজের ঘরে আমার মেনি বেড়াল চারটে বাচ্চা দিয়েছিল। সে তোমার ছবিগুলো দেখে ভয় পেয়ে বাচ্চা ফেলে পালিয়ে যায়। সেই চারটে বাচ্চাকে তাদের তিন মাস বয়েস পর্যন্ত বড় না হওয়া পর্যন্ত একেকটাকে দৈনিক সিকি লিটার করে মাদার ডেয়ারির দুধ খাওয়াতে হয়েছে। হিসেব করলে অনেক হয়, তুমি দেড় কুইন্টালের দামটাই দাও। তাছাড়া এখন মাদার ডেয়ারির দুধের দাম অনেক বেড়ে গেছে, তুমি না হয় পুরোনো দামটাই দাও।

প্রমীলাকান্ত ঃ সব মিথ্যে কথা। আপনি ডাঁহা কৃপণ। আপনার মেনি বেড়াল খেতে না পেয়ে পালিয়েছে, আমার ছবি দেখে ভয় পাবে কেন?

তৃতীয় কণ্ঠস্বর ঃ মিথ্যে কথা কেন হতে যাবে? সেবার তুমি যখন খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছিলে, এক-রাজ্যের কাক এসে পরপর তিনদিন ধরে চিৎকার চেঁচামেচি করেনি?

প্রমীলাকান্ত ঃ তার কারণ ছিল, ওটা আমি কাকতাড়ুয়ার ছবি আঁকছিলাম।

তৃতীয় কণ্ঠস্বর ঃ কিন্তু তখন তুমি আমাকে বলেছিলে আমার পোরট্রেট্ আঁকছো, সেই জন্যে আমি তোমাকে আমার গ্যারেজের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

প্রমীলাকান্ত ঃ কি করবো বলুন! আমি তো আপনার ছবিই আঁকতে চেয়েছিলুম। কিন্তু একে আপনার চেহারাটা কেমন যেন, তার পরে সেই আমার প্রথম পোরট্রেট, তালেগোলে কাকতাড়ুয়া হয়ে গেল!! সে যা হয়েছে ক্ষমা করে দিন! দয়া করে আমার ছবিগুলো ছেড়ে দিন।

সত্যনারায়ণ ঃ (হাই তুলতে তুলতে) ও বাড়িওয়ালি দিদি, ছবিগুলো ছেড়ে দিন না। বুঝছেন না কত বড় ব্যাপার। কলম্বোয় ভারত-উৎসবে যাচ্ছে—ভারত-শ্রীলঙ্কা মৈত্রীর পথে বাধা দেবেন না।

তৃতীয় কণ্ঠস্বর ঃ তা বাধা দেব না কিন্তু যা বলেছি, আমার গ্যারেজ ভাড়া আর দুধের দাম মিটিয়ে দিতে হবে।

সত্যনারায়ণ ঃ (বিরক্ত কণ্ঠে) ভাড়া আর দুধের দাম সবসুদ্ধ কত টাকা হবে?

তৃতীয় কণ্ঠস্বর ঃ গ্যারেজ ভাড়া তিনশো টাকা করে মাসে, দেড় বছরে চার হাজার আটশো টাকা আর সেই সঙ্গে দেড় কুইন্টাল দুধের দাম চার টাকা দরে ছ'শো টাকা।—পাঁচ হাজার চারশো টাকা হচ্ছে মোটমাট, আমি পাঁচ হাজার পেলেই ছেড়ে দেব।

সত্যনারায়ণ ঃ প্রমীলাকান্ত, তোমার কাছে কত টাকা আছে?

প্রমীলাকান্ত ঃ বহুকষ্টে হাজার দেড়েক টাকা জমিয়েছিলাম।—কিন্তু ন্যাড়া বলল, আর্টিস্ট হয়ে বিদেশ সফরে যেতে হলে ভেক চাই। তাই দু'জোড়া লাল সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবি বানালাম, একজোড়া জরির নাগরা কিনলাম। তারপরে ফটো তোলা, পাসপোর্ট করা, তাতেও খরচা হলো! এখন হাতে আর একাশি টাকা ষাট পয়সা মাত্র আছে। নাড়ু বলেছে সরকারী টাকা পাওয়া যাবে, কিন্তু সে কবে পাবো কে জানে।

সত্যনারায়ণ : তাহলে ও পাঁচ হাজার টাকা আমিই তোমাকে ধার দেব। ফিরে এসে শোধ দিয়ো। কাল হবে না, পরশু এসে টাকাটা নিয়ে যেও।

তৃতীয় কণ্ঠস্বর : বাঁচালেন।

প্রমীলাকান্ত : এবার দুজনে ফোনটা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বাঁচাও তো।

যাত্রাভঙ্গ

এই বাক্যালাপের দু'দিন পরে অফিসে গিয়ে প্রথমে ব্যাঙ্ক থেকে প্রসঙ্গের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা তুললাম। সন্ধ্যাবেলা বাসায় সে এসে টাকাটা নিয়ে যাবে, এইরকম ধরে নিয়েছিলাম।

কিন্তু সে এলো না। যদি কোনো ফোন করে সেই জন্যে ফোনটা রিসিভার থেকে না নামিয়ে রেখে দিলাম যাতে এলে ধরতে পারি।

কিন্তু কোনো ফোনও এলো না। রাতে নির্বিঘ্নে খবরের কাগজ পড়া শেষ করে ঘুমোলাম। খবরের কাগজে দেখলাম মন্ত্রিসভায় রদবদলের সম্ভাবনা কিন্তু বিস্তারিত কিছু লেখেনি। ন্যাড়া ছোটখাট উপমন্ত্রী, নিশ্চয়ই এই রদবদলের মধ্যে সে আসবে না। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হলো, হয়তো প্রসঙ্গ ন্যাড়া ব্যাপারেই কোথাও আটকে গিয়েছে। পুরনো বন্ধু হিসেবে অনেক সময় ন্যাড়ার হয়ে সে অনেক দৌড়াদৌড়ি করে।

রাতে কোনো ফোন-টোন আসেনি। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো ফোনের আওয়াজে। মামীমা ফোন করছেন, খুব উত্তেজিত ও খুশি, 'খোকা শুনেছিস, একটু আগে খবর পেলাম ন্যাড়া প্রমোশন পেয়েছে।

হায়ার সেকেণ্ডারি দু'বার ফেল করার পরে ন্যাড়া লেখাপড়া ছেড়েছে সে আজ প্রায় কুড়ি বছর। কোনো চাকরিবাকরিও করে না, রীতিমত মন্ত্রী, তার আবার প্রমোশন কি! আর এই শেষরাতে কিসের প্রমোশন?

মামীমা নিজেই বুঝিয়ে বললেন, ন্যাড়া কাল রাতে প্রতিমন্ত্রী হয়েছে। আগে তো উপমন্ত্রী ছিল, এখন ক্ষমতা বাড়লো। বড় বাংলো পাওয়া যাবে। খুব বড় প্রমোশন হলো।

আপন মামাতো ভাইয়ের এই উন্নতিতে খুশি হয়ে মামীমাকে বললাম, 'খুব সুখবর। আমি সন্ধ্যাবেলা আসছি।'

ফোন নামিয়ে রাখতে না রাখতে প্রসঙ্গ এলো। তার মুখে চোখে তেমন আনন্দের ছটা দেখতে পেলাম না, বরং কেমন একটা হতাশ ভাব। বুঝলাম ন্যাড়ার খবরটা সে পায়নি, তাকে চাঙ্গা করার জন্যে প্রমোশনের খবরটা তাকে বললাম।

প্রসঙ্গ বললো, 'এ তো বাসি খবর। কাল বিকেল থেকেই জানি। আজ সকালে সব খবরের কাগজেই বেরিয়েছে। ন্যাড়ার তো প্রমোশন হলো কিন্তু *ঠেকে* গেলাম আমি।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি *ঠেকে* গেলে?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'আমার ভারত-উৎসবটা মারা পড়লো।'

প্রসঙ্গের কথা প্রথমে ধরতে না পারলেও পরে বুঝলাম যে ন্যাড়া ছিল 'ঐতিহ্য ও উৎসব' দপ্তরের উপমন্ত্রী, এখন সে হলো 'জাহাজ নির্মাণ' দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। সুতরাং কলম্বোয় আগের, মন্ত্রীর বন্ধুর ছবি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। আমলারা আগে থেকেই আঁচ পেয়েছিল ব্যাপারটা কাল বিকেলেই প্রসঙ্গের নাম কেটে দিয়ে নতুন বিহারী উপমন্ত্রীর শ্যালিকার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে।

সে মহিলা অবশ্য ছবি আঁকেন না, তাঁর নাচের ইস্কুল আছে পাটনায়।

প্রসঙ্গ বললো, 'বড় আশা করে ছিলাম, খোকাদা। ন্যাড়া তো আর দু'দিন পরেও প্রমোশন পেতে পারতো।'

আমি একদিকে আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে পাঁচ হাজার টাকাটা আমাকে ধার দিতে হলো না। তবু প্রসঙ্গকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম, 'দ্যাখো নাড়ু এখনো হয়তো কিছু করতে পারবে।'

প্রসঙ্গ শুকনো মুখে বললো, 'জাহাজ নির্মাণ দপ্তরে ন্যাড়া আমার জন্যে কি করতে পারবে, আমি তো আর জাহাজ বানাতে পারবো না!' বলে প্রসঙ্গ ভগ্নহৃদয়ে চলে গেল। আমি তাকে বিশেষ ভরসা দিতে পারলাম না।

কিন্তু আমি আর প্রসঙ্গ দুজনেই ন্যাড়াকে মাপতে ভুল করেছিলাম। পরের দিন সকালে আবার প্রসঙ্গ এলো হাঁপাতে হাঁপাতে, 'খোকাদা, খবরের কাগজ দেখেছেন?'

আমি তখন পার্কে খালিপায়ে হাঁটছিলাম ভেজা ঘাসের ওপরে, সেখানেই প্রসঙ্গ এসে আমাকে ধরলো। আমি তাকে বললাম, 'তুমি তো জানো, আমি সকালে খবরের কাগজ দেখি না।'

প্রসঙ্গ বললো, 'আজ একটু দেখুন।'

দেখলাম চারের পাতায় সপ্তম কলমে একটা ছোট খবর ঃ—

ভারতীয় জাহাজে ছবি

...জাহাজ নির্মাণ দপ্তরের নতুন প্রতিমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ভারতীয় যাত্রী জাহাজগুলিকে আরো সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করা হবে। প্রত্যেকটি জাহাজের ডেকে একটি করে উচ্চমানের ছবি টাঙানো হবে।

প্রসঙ্গত জানা গেল বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত প্রসঙ্গ গুপ্ত প্রথম বারোটি জাহাজের জন্যে তাঁর বারোটি বিখ্যাত ছবি সরকারকে দিতে সম্মত হয়েছেন।

জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন যে, এর জন্যে উপযুক্ত মূল্য শিল্পীকে সরকার দেবেন।

খবরটা পড়া শেষ হবার পর প্রসঙ্গের মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখভরা হাসি, সে বললো, ন্যাড়া কি করলো দেখলেন! এখন সেই পাঁচ হাজার টাকাটা দিন তো, বাড়িওয়ালির কাছ থেকে ছবিগুলো ছাড়াতে হবে।' তারপর একটু থেমে বললো, 'আচ্ছা একেকটা ছবির জন্যে সরকার যদি দশ হাজার টাকা করে দেয়, তাহলে তার থেকে বেশি চাওয়া কি উচিত হবে?'

আমার অনেকদিন আগের প্রসঙ্গের প্রথম প্রদর্শনীর সেই ক্রেতাটির কথা মনে পড়লো যে ষাট টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। লোকটা এখন এখানে থাকলে অজ্ঞান হয়ে যেত।

দাঁত

[এক]

তাঁর নিজের ভিতরে যে এত বড় একটা গুণ লুকিয়ে ছিল সারাজীবনে শশধরবাবু টের পাননি, টের পেলেন তাঁর কর্মজীবনের শেষদিনে।

ষাট বছর বয়েস পূর্ণ হতে সওদাগরি একটা অফিসের বড়বাবুর পদ থেকে অবসর নিলেন শশধরবাবু। এই উপলক্ষে একটা ছোটখাট বিদায় সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল, সেখানে যথারীতি তাঁর সহকর্মীরা এবং উপরওয়ালা কেউ কেউ শশধরবাবুর সুখী ও শান্তিপূর্ণ অবসরজীবন কামনা করে এবং তাঁর উজ্জ্বল কর্মময় জীবনের প্রশংসা করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

সভার শেষে শশধরবাবুর পালা, বিদায়সভায় তাঁকেও অবশ্য কিছু বলতে হবে, এটাই রীতি।

একটু দূরেই বড়োসাহেব, মেজোসাহেব বসে রয়েছেন। এতকাল তাঁদের দেখলে শশধরবাবুর গলা শুকিয়ে যেতো, মুখের মধ্যে জিব কেমন জড়িয়ে যেতো, সাহেবদের প্রশ্নের উত্তরে কোনো রকমে 'হুঁ হাঁ' করে দায় সারতেন। চাকরি শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যই হোক অথবা যে কোনো কারণেই হোক, আজ কিন্তু কোনো রকম বিচলিত বোধ করলেন না শশধরবাবু।

বরং বলা উচিত জীবনে তাঁর এই প্রথম বক্তৃতা তিনি এমনভাবে দিলেন, সবাই চমকিত ও বিস্মিত বোধ করলো। শশধরবাবু নিজেও খুব কম অবাক হলেন না।

উঠে দাঁড়িয়ে, বিদায় উপলক্ষে তাঁর গলায় যে মোটা রজনীগন্ধার মালাটা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটি পরিচ্ছন্নভাবে খুলে টেবিলের উপর রেখে চমৎকার বলতে আরম্ভ করলেন শশধরবাবুঃ 'প্রিয় সভাপতি, জীবনে এই প্রথম কোনো সভায় আমার কথা বলার সুযোগ হলো, চিরকাল শুধু শুনেছি'...এইভাবে আরম্ভ করে সাবলীলভাবে বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে চললেন, এমন কি কালস্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কবে ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথে পড়েছিলেন, সেটা যে তাঁর মনে আছে সেটা পর্যন্ত তিনি জানতেন না, সেইসব মর্মস্পর্শী কাব্যময় পংক্তি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে গেল।

কবে পঁচিশ বছর আগে একটা সিলিং পাখা খুলে তাঁর টেবিলের উপর পড়ে গিয়েছিল। একবার গুলি চলেছিল পুলিশের, দুপুরবেলা অফিসে বসে কিছুই জানতে পারেননি, সন্ধ্যায় রাস্তায় বেরিয়ে কারফিউ, আর বাড়ি ফিরতে পারেন না, অবশেষে অফিসে ফিরে এসে আরো কয়েকজনের সঙ্গে টেবিলের উপর শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলেন। গল্পের মতো ঝরঝরে ভাষায় সব বলে গেলেন শশধরবাবু।

আরেকবারের কথা বললেন শশধরবাবু, সেও দশ বছর আগের কথা। অফিস পালিয়ে টেস্ট ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন ইডেন গার্ডেনে। মাঠে ঢোকার মুখে গেটের কাছে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা। কি রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, ভয় পেয়েছিলেন সেদিন—সেই সময় বড়বাবুর পদে তাঁর প্রমোশনের ফাইলটা আবার বড়সাহেবেরই কাছে।

প্রায় তিরিশ চল্লিশ মিনিট ধরে প্রাঞ্জলভাবে বহু সুখ-দুঃখের কথা বললেন শশধরবাবু।

বড়সাহেব রাশভারি লোক, উঠতে যাচ্ছিলেন, শশধরবাবু বলা আরম্ভ করতেই কিন্তু তিনি পর্যন্ত স্মিতহাস্যে চেয়ারে বসে শশধরবাবুর বক্তৃতা শুনতে লাগলেন।

শশধরবাবু শেষ করার পরে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে হাততালি দিল।

চাকরি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সকলেরই একটা বিষাদভাব মনে আসে। ভালো বক্তৃতা করতে পারার আবেগে ও আনন্দে শশধরবাবুর মনের মধ্যে কিন্তু বিষাদভাবটা রইলো না। বরং অবসর জীবনে সময় কাটানোর মতো একটা নতুন দিকের সন্ধান পেয়ে গেলেন।

শশধরবাবু টালিগঞ্জে পৈতৃক বাড়িতে যাবেন। সেখানে মুখরা স্ত্রী এবং বাকনিপুণা একমাত্র পুত্রবধূর উঠতে বসতে কথার মারপ্যাঁচে তাঁর জীবন ওষ্ঠাগত। তাছাড়া দুই বালক নাতি রয়েছে, তাদের অত্যাচারও তাঁর উপরে কিছু কম নয়।

সওদাগরি অফিসে বড়বাবুর কাজ করে শশধরবাবুর বুদ্ধি যথেষ্টই পাকা। বক্তৃতার দিকটা আবিষ্কার করার পরে তিনি মনে মনে একটা ছক কষে ফেললেন। তারপর ছক অনুযায়ী চলতে লাগলেন।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, সভা-সমাবেশের বিজ্ঞপ্তিগুলো একবার সকালবেলায় খবরের কাগজ পেয়েই খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে। সূর্যোদয়ের ক্ষণ থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কত রকমের অনুষ্ঠানে যে সারা দিনরাত ভরে থাকে এই শহরের অলিগলি, সেটা দু-চারদিনের মধ্যেই অনুধাবন করলেন শশধরবাবু।

যেমন ধরা যাক আজ সাতাশে জানুয়ারী, রবিবার। প্রথমে দেখতে হবে বাড়ির কাছাকাছি কি কি প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। বাড়ির সবচেয়ে কাছে কেওড়াতলা শ্মশান এবং সুখের বিষয় সেখানে প্রায়ই কিছু না কিছু থাকে। মহাপুরুষদের এবং ততো-মহা-নয় এমন পুরুষদেরও মৃত্যুতিথি অনেক সময়েই ঘটা করে পালিত হয় শ্মশানে। সবচেয়ে সুবিধে হলো অনুষ্ঠানটা হয় প্রায়ই সকালের দিকে, ফলে বিকালের দিকে আবার অন্য অনুষ্ঠানে যাওয়া যায়।

কেওড়াতলা শ্মশানের ব্যাপারটা কয়েকদিনের মধ্যেই রপ্ত করে ফেললেন শশধরবাবু। স্বর্গত মহাপুরুষের কয়েকজন নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন, কয়েকজন অতি ধান্দাবাজ এবং কম সংখ্যক অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক, একটি সাদা ফুলের মালা, পাঁচ টাকার সুগন্ধি ধূপ, একাধিক দেশাত্মবোধক গান তদুপরি কিছু বক্তৃতা—পুরো ব্যাপারটা সরলীকরণ এভাবে করা যেতে পারে।

ঐ বক্তৃতার জায়গাটায় ঢুকে গেলেন শশধরবাবু। প্রায় সব অনুষ্ঠানেই সভাপতির বাঁধাধরা গৎ আছে, 'আর কেউ যদি কিছু বলতে চান ' অসঙ্কোচে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যান শশধরবাবু। তারপর ঝড়ের মতো বক্তৃতা। বাগদেবী তখন শশধরবাবুর জিহ্বায় আরোহণ করেন, কিছু জানুন না জানুন, বিগত মহাপুরুষটি সম্পর্কে শশধরবাবু গড়গড় করে 'যে আত্মত্যাগ, যে সমাজ সচেতনতা....' ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ করে 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ' দিয়ে শেষ করে দেন বক্তৃতা। অবস্থা বুঝে পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত বক্তৃতা করেন তিনি। প্রায় সব সময়েই নতুন শ্রোতা পাওয়া যায় শ্মশানের সভাগুলিতে। সাধারণত এক মহাপুরুষের মৃত্যুবার্ষিকীতে যাঁরা আসেন অন্য, প্রাতঃস্মরণীয়ের স্মরণ সভায় তাঁদের দেখা যায় না।

সকালের দিকে এ ধরনের একটা সভা জুটে গেলে বক্তৃতার পরে অনেকদিনই অনুষ্ঠানের

কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাছাকাছি কোনো দোকানে বসে চা-সিঙ্গাড়া জলখাবার হয়ে যায়। দু-একবার যে এর পরে ভোজনের নিমন্ত্রণ পাননি তাও নয়।

সকালের বক্তৃতাটা থাকলেও খবরের কাগজ খুঁটিয়ে দেখে কাছাকাছি কোথাও এক বৈকালিক সভাও সংগ্রহ করে ফেলেন শশধরবাবু।

এক রকম অনুমানেই বাছতে হয়, সেজন্যে দু-একবার একটু অসুবিধাও হয়। পণপ্রথা নিবারণী সমিতির এক সভায় গিয়েছিলেন সাদার্ন এভিনিউয়ে এক বহুতল অট্টালিকার মনোরম ফ্ল্যাটে। কিন্তু সেটা পুরো মাড়োয়ারি ভদ্রলোকদের সভা, হিন্দিতে বক্তৃতা হচ্ছে। শশধরবাবুর আবার হিন্দি একদম আসে না। ফ্ল্যাট নম্বর ভুল হয়েছে এ রকম মুখভাব করে কেটে পড়লেন।

অবশ্য অনেক সময় মনোমত অনুষ্ঠানও জুটে যায়। একদিন সন্ধ্যার মিলনপল্লী নবযুবক সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী উৎসবে গিয়ে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হলো শশধরবাবুর। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সভায় যান তিনি, সঙ্গে কালো ফ্রেমের রাসভারি চশমা, মাথায় সাদাপাকা চুলে তাঁকে বেশ সম্ভ্রান্তই দেখায়। নবযুবক সঙ্ঘের প্রধান অতিথি আসেনি। যদিও তাঁকে সেখানে কেউই চেনে না তবু একজন কর্মকর্তা এসে বললো, 'আপনার নামটা-নামটা যদি বলেন!' 'শ্রীশশধর চক্রবর্তী।' তিনি নাম জানানোর মিনিটখানেক পরে শশধরবাবু শুনলেন মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, 'প্রধান অতিথির অনুপস্থিতিতে আমাদের বিশিষ্ট অতিথি শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্তী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন।'

শশধরবাবুকে পঁচিশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে নবযুবক সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী উৎসবেরর উদ্বোধন করতে হলো, বললেন চমৎকার, 'এই পঁচিশটি শিখা যেদিন পঞ্চাশে পৌঁছাবে, যেদিন এই রজত স্বর্ণে পরিণত হবে, সেদিন এই পৃথিবীতে আমি হয়তো থাকবো না কিন্তু নবযুবক সঙ্ঘের স্বপ্ন বেঁচে থাকবে।' কম্পিত কণ্ঠে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক প্রায় আধ ঘণ্টার বক্তৃতা শেষ করলেন প্রচুর করতালির মধ্যে।

ক্রমশ কতরকম যে অনুষ্ঠানে গেলেন শশধরবাবু। রাজবন্দীদের পুনর্মিলন উৎসব থেকে নিখিল বঙ্গ মাংস ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক সম্মেলন, বজরঙ্গবলী ব্যায়ামাগারের পুরস্কার বিতরণী উৎসব থেকে জগমোহিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—সভায় যাওয়া নেশার মত হয়ে উঠলো শশধরবাবুর।

কর্মজীবনে বাড়িতে তবু সকাল সন্ধ্যা থাকতে হতো তাঁকে। এখন আর তাও থাকেন না। সংসারে তাঁর খুব কাজ বা প্রয়োজন নেই, তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না তিনি নিজেও বেঁচে যান ঝামেলা, ঝগড়া, খিটিমিটির মধ্যে থাকতে হয় না। শাশুড়ি-বধূর কলহে যখন তাঁর বাড়ির ত্রিসীমানায় কাকপক্ষীটি পর্যন্ত বসতে সাহস করছে না তখন তিনি চেতলা বাজারের নতুন তরকারির স্টল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন ঃ মানুষের জীবনে সবুজ তরকারি কতটা প্রয়োজনীয়, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়িটাড়ি কামিয়ে, স্নান করে ফিটফাট হয়ে ধুতি—পাঞ্জাবি পরে চা আর রুটি-তরকারি খেয়ে শশধরবাবু রুদ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়েন, পথে যেতে যেতে সেদিনের বক্তৃতার বিষয়টা একবার ভেবে নেন। তারপর সকালের অনুষ্ঠান শেষ হলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম। অনেকদিন, বিশেষ করে শীতকালে, দুপুরের দিকেও সভাসমিতি

পাওয়া যায়, সেদিন আর বিশ্রামের অবকাশ থাকে না। আবার কোনো দিন গৃহযুদ্ধের মধ্যে বিশ্রাম করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, সেদিন হাঁটার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। আস্তে আস্তে বিকেলের সভায় গিয়ে পৌছান। হঠাৎ যদি কখনো এমন হয়, কাছাকাছি বা কিছু দূরেও কোনো পছন্দমত অনুষ্ঠান না পান, সেদিন সন্ধ্যাটা কেমন ফাঁকাফাঁকা লাগে, মাটি হয়ে যায়।

বক্তৃতা জিনিসটা সোজা কাজ নয়। ভালো বক্তা সহজে পাওয়া যায় না। এদিক ওদিক নানা জায়গায় নানা রকম বক্তৃতা করে ক্রমশ শশধরবাবুর নাম ছড়িয়ে পড়লো। তাঁকে আর নিজে থেকে যেতে হয় না, আজকাল কিছুদিন হলো বক্তৃতার জন্যে রীতিমত ডাক আসা শুরু করেছে তাঁর। শুধু কাছে পিঠেনয়, গড়িয়া দমদমে তারপরে একদিন কাকদ্বীপে একদিন উলুবেড়িয়ায় তিনি বক্তৃতা করে এলেন। যে কোনো সভায় সানন্দে যেতে শশধরবাবু প্রস্তুত, তাঁকে নিয়ে গেলেই হলো, তবে বুঝতে পারলে রাজনৈতিক সভা বর্জন করেন, সেটা একটু বিপজ্জনক মনে করেন তিনি।

এইভাবে মোটামুটি চলছিল। কিন্তু অন্য একটা বাধা এসে পড়লো। মাড়ির কয়েকটা দাঁত আগেই পড়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সামনের দুটো নড়বড়ে দাঁত এক সপ্তাহের মধ্যে পড়ে গেল।

ফোঁকলা দাঁতে বক্তৃতা করা শুধু কঠিন নয় হাস্যকরও বটে। বাধ্য হয়ে ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হল শশধরবাবুকে। দাঁতের ডাক্তার ভালো করে দেখে বললেন, 'সব দাঁতেরই প্রায় শেষ অবস্থা। সবকটাই তুলে ফেলে দু'পাটি দাঁতই যদি বাঁধিয়ে ফেলেন, পরে হাঙ্গামা কম হবে।'

অগত্যা তাই করতে হল। সব দাঁত তোলা, তারপর বাঁধানো—সব মিলিয়ে প্রায় দশ-পনেরো দিন নষ্ট হল। এই সময়টুকু সভাসমিতি কিছুই করা হলো না।

সে যা হোক, দাঁত বাঁধানোর পর নব উদ্যমে বক্তৃতার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শশধরবাবু। নতুন দাঁত নিয়ে প্রথম দু'এক সপ্তাহ একটু অস্বস্তি হয়েছিল, তবে কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল, বরং বলা উচিত নতুন দাঁতে শশধরবাবুর বক্তৃতার তোড় বেড়ে গেল।

এখন শ্রীশশধর চক্রবর্তীকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে হুট করে ডাক দিলেই চলে না। রীতিমত কয়েক সপ্তাহ আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। শশধরবাবুকে পাওয়া যাবে না জেনে অনেক সময় অনেক অনুষ্ঠানের তারিখ আগে-পিছিয়ে দিতে হয়। ইতিমধ্যে শহরতলির একটি সারস্বত সমাজ শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্তীকে বাগ্মীভারতী উপাধি দিয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে শশধরবাবুর ডাক আসা আরম্ভ হয়েছে। তাঁর নিজের পাড়ায় প্রতিপত্তি বেড়েছে, এমন কি নিজ বাড়িতে পর্যন্ত সম্মান বেড়ে গেছে।

[দুই]

কলকাতা থেকে মাইল ষাটেক দূরে একটি মাঝারি শহরে একটি সিনেমা হলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হল-মালিকের গাড়িতে চেপে এক অপরাহ্নে এসে পৌছালেন শশধরবাবু। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান, সেখানে শশধরবাবু ছাড়াও জনৈকা বিগতযৌবনা তবে-এখনো-তত-লোলচর্মা-নন চিত্রতারকা এবং আরো কেউ কেউ চিত্রজগতের কেষ্টা-বিষ্টুও থাকছেন। সন্ধ্যায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর নৈশভোজ, তারপর রাতেই গাড়িতে করে কলকাতা ফেরা। এ বয়েসে এসব উত্তেজনা যথেষ্টই উপভোগ করছেন শশধরবাবু। শহর ও শহরতলির ভিড় পেরিয়ে ফাঁকা রাস্তায় পড়ে গাড়িতে আসতে আসতে বিকেলের হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। গাড়ি

যখন নবনির্মিত সিনেমা হলটির কাছে এসে পৌঁছালো, তখন লোকজনের কোলাহলে তাঁর ঘুম ভাঙলো।

ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ শশধরবাবুর খেয়াল হলো, কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে কোথায়। গাড়ি থেকে নেমে সিনেমা হলের মালিকের সঙ্গে হলের করিডোরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দেয়ালে লাগানো নতুন ঝকঝকে আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে শশধরবাবু গোলমালটা ধরতে পারলেন। তাঁর মুখটা কেমন ফাটা বেলুনের মত চোপসানো, চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে। সর্বনাশ। বাঁধানো দাঁতজোড়া ফেলে এসেছেন, এখন বক্তৃতা দেবেন কি করে, আর নৈশভোজ বোধহয় শুধু ডাল কিংবা সুপ খেয়েই কাটাতে হবে।

অনুষ্ঠানের এখনো বেশ কিছু সময় বাকি আছে। হলের করিডোরের বাঁপাশে। হল-মালিকের সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ। সেখানে সাদরে নিয়ে শশধরবাবুকে সোফায় বসালেন হলের মালিক নগেন পাল মহাশয়।

নগেন পালকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন শশধরবাবু, খুব কাঠখোট্টা নয়, সিনেমা হলের মালিক হিসেবে বেশ একটু নরম গোছের চেহারা। বিপদের কথাটা আগেই বলে রাখা ভালো এই ভেবে শশধরবাবু দন্তহীন ফোকলা মাড়িতে যতটা বিনয় আনা সম্ভব সেটুকু এনে জিব দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'একটা বড় ভুল হয়ে গেছে মশায়। আজ আমার বক্তৃতা করা হবে না।'

নগেনবাবু অবাক, কলকাতা থেকে এত রাস্তা এসে এখন বলে কি লোকটা। নগেনবাবুর একটু খটকাও লাগলো, এই অস্পষ্ট জিব-জড়ানো-কথা-বলা লোকটা বিখ্যাত বক্তা শশধর চক্রবর্তী, কোনো ভুল হল না তো?

ব্যবসায়ী মানুষ নগেনবাবু, নিজের কৌতূহল এবং খটকা চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, কি হলো?'

শশধরবাবু সরাসরি জানালেন, 'আমার বাঁধানো দাঁতজোড়া ভুলে ফেলে এসেছি। এখন বক্তৃতা করবো কি করে, আর আপনার নৈশভোজই বা খাবো কি করে?'

নগেনবাবু এই কথা শোনামাত্র বললেন, 'দাঁতজোড়া ফেলে এসেছেন? তাতে কি হয়েছে, এটা কোনো সমস্যাই নয়। দশ মিনিট বসুন, আমি আসছি।' এই বলে দ্রুত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে একটি বেয়ারাকে নির্দেশ দিলেন, 'এই অফিসঘরে মিস্টার চক্রবর্তীকে চা-জলখাবার দে, আমি এখনই আসছি।'

ঠিক দশ মিনিট নয়, পনেরো-ষোলো মিনিটের মাথায় ফিরে এলেন নগেন পাল। হাতে একটি ছোট থলে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা তোয়ালে বার করে তার উপরে উপুড় করে ঢাললেন থলেটা। অন্তত পনেরো-বিশজোড়া বাঁধানো দাঁত। অর্থাৎ তিরিশ-চল্লিশটা পাটি

শশধরবাবু স্তম্ভিত। এরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে তিনি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি। এতো দাঁতের পাটি পেলো কোথায়, নগেন পালের কি দাঁতেরও ব্যবসা আছে? তিনি হতবাক হয়ে ভাবতে ভাবতেই নগেন পাল এক এক জোড়া দাঁতের পাটি বেছে নিয়ে এগিয়ে দিলেন, 'দেখুন তো ফিট করে কিনা?'

না, এ জোড়া একটু ছোট মনে হচ্ছে, ঠিক মাড়ির উপরে বসছে না। শশধরবাবুর দ্বিধা দেখে নগেন পাল আরেক জোড়া এগিয়ে দিলেন। একটু ইতস্তত করে দ্বিতীয় জোড়াও

শশধরবাবু পরখ করলেন, না এটা আবার একটু বড়, টাকরায় ঠেকে যাচ্ছে।

বার বার তিনবার। কি আশ্চর্য, তৃতীয়বারের মাথায় দাঁতের পাটিজোড়া একেবারে কাপে-কাপে ফিট করে গেলো শশধরবাবুর। এমন কি তাঁর নিজের যে দাঁতজোড়া ভুল করে বাড়িতে ফেলে এসেছেন তার থেকেও স্বচ্ছন্দ যে এ জোড়া।

দুই মাড়িতে দুই জোড়া দাঁত লাগিয়ে আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেলেন শশধর চক্রবর্তী।

এর পরে আড়াই ঘণ্টা ঝড়ের মত কেটে গেল। নতুন দাঁত মাড়িতে বসিয়ে দুর্দান্ত বক্তৃতা করলেন শ্রীযুক্ত শশধর বাগ্মীভারতী। 'সিনেমা যে জীবনের সঙ্গে কতটা জড়িয়ে গেছে, একালের শিশুরা যে মা-মা বলে না কেঁদে সিনেমা-সিনেমা বলে কাঁদে, একটি নতুন সিনেমা হল নবকালের নব বিশ্ববিদ্যালয়'—ভালো দাঁতের সুবিধা পেয়ে শশধরবাবু প্রাণখুলে বক্তৃতা করলেন। যে সব ভাবী দর্শকেরা শুধুমাত্র চিত্রতারকার আকর্ষণে এসেছিলো, তারা পর্যন্ত শশধরবাবুর বক্তৃতা শুনে থ মেরে গেল।

চিত্রতারকা ইত্যাদিরাও অল্পবিস্তর বললেন বিস্তর সিটির মধ্যে। সভা শেষ, এরপর নৈশভোজ।

চমৎকার খাওয়ালেন নগেন পাল। ঘি-আলুভাজা, পাকা রুই, গলদা চিংড়ি, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, বেলডাঙ্গার মনোহরা-- খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলেন শশধরবাবু। নতুন দাঁতজোড়া সর্বতোভাবে সাহায্য করলো তাঁর ভোজনে। বছর কুড়ি আগে প্রথমবার যখন দাঁত নড়েছিল তাঁর, তারপব আর কোনদিনও এত আরাম করে খাননি শশধরবাবু।

নৈশভোজন শেষ হল। এবার ফেরার পালা। শশধরবাবু বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধোয়ার সময় জলেব কলে দাঁতের পাটি জাড়া খুলে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছেন। ব্যবহৃত দাঁত ফেরত দেওয়া উচিত বা শোভন হবে কিনা এইসব ভাবতে ভাবতে নগেনবাবুর কাছে এসে বললেন, 'এই যে আপনার দাঁতজোড়া।'

নগেনবাবু বিনীতভাবে বললেন, ' ও আমার কোনো কাজে লাগবে না। আপনার যখন ফিট করে গেছে আপনি রেখে দিন।'

বিনামূল্যে একজোড়া ভালো দাঁত পেয়ে গেলেন, শশধরবাবু খুশিই হলেন। তবু একটু সঙ্গে াচেব সঙ্গে মাড়ির খাপে দাঁতের পাটি লাগাতে লাগাতে প্রশ্ন করলেন নগেনবাবুকে, 'আচ্ছা, এতো দাঁতের পাটি আপনার কাছে, আপনার কি দাঁতেরও ব্যবসা আছে?'

নগেন পাল হাত কচলিয়ে বললেন, 'আরে না না, দাঁতের ব্যবসা নয়। আমার আছে নার্সিংহোম। দেখেননি শহরে ঢুকতে কোল্ড স্টোরেজের পাশেই 'নগেন্দ্র সেবা কেন্দ্র'! ওটাও আমারই।'

শশধরবাবুর সংশয় গেল না, 'নার্সিংহোমে, মানে ঐ নগেন্দ্র সেবা কেন্দ্রে এতো দাঁত দিয়ে আপনি কি করেন? ওটা দাঁতের রোগীর নার্সিংহোম, দাঁতের হাসপাতালের মত কিছু?

নগেনবাবু বিশদভাবে হাসলেন, 'তা নয়। ওটা এমনিই সাধারণ নার্সিংহোম। তবে আজকাল অনেক বুড়োহাবড়া রোগীকে বাড়িতে রেখে ছেলেবউ, আত্মীয়স্বজন সেবাযত্ন করতে চায় না। অসুখ বিসুখ হলেই হাসপাতালে নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দেয়।' একটু থেমে নগেনবাবু বিভ্রান্ত শশধরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা সেই বুড়ো রোগীরা যখন মারা যায়, তাদের চশমা, দাঁত সবই তো আমার ওখানে পড়ে থাকে। ওসব জিনিস আত্মীয়স্বজন কদাচিৎ ফেরত নিতে আসে। আমি বিষয়ী লোক, সব গুছিয়ে রেখে দিই, কখন কার কাজে লাগে। এই তো আপনার কাজে লাগলো।

আপনার দাঁতজোড়া, যতদূর মনে হচ্ছে, বরদাপ্রসন্নবাবুর, আমাদের এলাকার শেষ রায়বাহাদুর, লাস্ট ডিসেম্বরের ঠাণ্ডায় আমার ওখানেই টেঁসে গেলেন।'

রায়বাহাদুরি দাঁত মাড়িতে চাপিয়ে হতভম্ব শশধর চক্রবর্তী ফ্যাল ফ্যাল করে নগেন পালের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

[তিন]

বাগ্মীভারতী শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্তী বক্তৃতা করা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করাও ছেড়েছেন, নিজের আসল দাঁতজোড়া, সেই সঙ্গে উপহার পাওয়া রায়বাহাদুরি দাঁত—দুটি সেটই কালীঘাটের গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছেন।

এক ফোকলা দাঁত বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুটি দামাল শিশুর সঙ্গে বারান্দায় খেলছে, এ দৃশ্য এখন শশধরবাবুর বাড়িতে কেউ বক্তার সন্ধানে গেলেই দেখতে পাবেন। তবে তিনি আর কোথাও যান না, বক্তৃতার অনুরোধ নিয়ে কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভাগিয়ে দেন।

একশো টাকার ভাঙানি

ভবানীপুরে তাঁর বাড়ির একতলার বাইরের ঘরে বসে আছেন সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী মশায়। সিদ্ধেশ্বরবাবু ছাপোষা লোক, বেশ বৈষয়িক এবং হিসেবী। বিশেষ করে এখন তাঁকে খুবই হিসেব করে চলতে হচ্ছে, কারণ এই সম্প্রাত তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

ভবানীপুরের এই বাড়িটি পৈতৃক। দোতলা বাড়ি, একতলায় বসবার বা বাইরের ঘর। আশ্বিন মাস শেষ হতে চলেছে। এখন ভরা সন্ধ্যা। বাইরে একটু একটু ঠাণ্ডা ভাব। বিকেলে এক পশলা অদিনের বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘরের জানলা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সিদ্ধেশ্বর পুরনো একটা বেতের চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে নানারকম হিসেব করছেন। ঘরে একটা পঁচিশ পাওয়ারের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। হিসেব করতে করতে সিদ্ধেশ্বরবাবু মনে মনে বহু কথাও ভাবছেন।

একই ছেলে তাঁর, হিতেশ্বর। বাইশ বছর বয়েস হয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল নয়, দু'বার মাধ্যমিক দিয়েছে। কিন্তু চালাকচতুর, অতিরিক্ত চালাকই বলা যায়। তাছাড়া ছেলের বন্ধু-বান্ধবও মোটেই সুবিধের নয়। হিতেশ্বরের বন্ধুরা কেউই ভাল করে লেখাপড়া করেনি, তাছাড়া তারা নানারকম বদমায়েসি করে, জুয়ো খেলে, গাঁজা মদ চরস হিরোইন টিরোইন কী সব খায়। এসব ব্যাপারে একটা জিনিস সিদ্ধেশ্বরবাবুর খুব খটকা লাগে। তাঁদের আমলে বখা ছেলেরা হিরোইনের পিছে ঘুরতো, হিরোইনের ফটো মাথার নিচে রেখে রাতে ঘুমোতো, কিন্তু একালের ব্যাপার অতি সাংঘাতিক—একালের এরা সাক্ষাৎ হিরোইন খেয়ে নিচ্ছে।

নিজের মনে মনে এই ছেঁদো রসিকতায় সিদ্ধেশ্বরবাবুর বেশ হাসি পায়। হঠাৎ হাসতে গিয়ে তাঁর খেয়াল হয়, একটু পরে হাসি গোয়ালিনী আসবে, গত মাসের দুধের দাম ষাট টাকা পাওনা আছে, সেটা নিতে।

সিদ্ধেশ্বরবাবু আলগোছে নিজের ফতুয়ার পকেটে হাত দিলেন। পুরনো চামড়ার মানিব্যাগটা খুলে দেখলেন একটা একশো টাকার নোট রয়েছে আর গোটা তিরিশেক খুচরো টাকা। হাসি নাম

হলেও গোয়ালিনীটা খুব গোলমেলে। একশো টাকার নোট দিলে চল্লিশ টাকা ফেরৎ কিছুতেই দেবে না। খুচরোটা নিয়ে আসছি বলে চলে যাবে। তারপর আর খোঁজ মিলবে না। শেষে সামনের মাসের হিসেবের সঙ্গে খাইয়ে দেবে।

ঠিক এই সময়ে বাইরের দরজা দিয়ে হিতেশ্বর বাড়িতে ঢুকলো। সারাদিন কোথায় টো-টো করে বেড়িয়েছে কে জানে, এখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলো। হিতেশ্বরকে তাঁর বাবা খুব যে একটা বিশ্বাস করেন তা নয়, কিন্তু সামান্য একশো টাকা এখনই ভাঙিয়ে আনবে এতে আর অবিশ্বাসের কি থাকতে পারে, এই ভেবে সিদ্ধেশ্বরবাবু হিতেশ্বরকে একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'মোড়ের মুদিখানার দোকান থেকে নোটটা ভাঙিয়ে নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি আসবি।'

একশো টাকার নোটটা নিয়ে রাস্তায় বেরোতেই হিতেশ্বরের সঙ্গে ব্রজেনের দেখা। ব্রজেন আর হিতেশ্বর বহুদিনের পুরনো বন্ধু। এক পাড়ায় কাছাকাছি বাড়ি, তাছাড়া দু'জনে একই স্কুলে ক্লাস ওয়ানে একই বছরে ভর্তি হয়েছিল। সেই ওয়ান থেকে আজ পর্যন্ত ব্রজেন ওরফে বেজা আর হিতেশ্বর ওরফে হিতুর লেখাপড়ার ব্যাপারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। রেসের ঘোড়া যেমন ঘাড়ে ঘাড়ে অর্থাৎ নেক-টু-নেক ছোটে তেমনই এদের দু'জনের ইস্কুলে দৌড়। একবছর বেজা প্রমোশন পেলো হিতু পেলো না, সে পিছিয়ে গেলো। পরের বছর হিতু পাশ, বেজা ফেল, হিতু বেজাকে ধরে ফেললো। এইভাবে একবার ও ওঠে আর একবার ও থাকে, কোনো কোনো ভাল বছরে দু'জনেই ওঠে, আবার দুর্বৎসরে দু'জনেই আটকে যায়। অবশেষে এখন দু'জনেই একসঙ্গে মাধ্যমিক দিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই বেজার সঙ্গে হিতুর দেখা। আজ সারদিন হিতু গাঁজাপার্কে পাতাল রেলের গুদামের পিছনে তিনতাসের জুয়ো খেলছে। এত বেশি হেরেছে যে শেষ পর্যন্ত হাতের ঘড়িটা চল্লিশ টাকায় বন্ধক দিয়ে রক্ষা পেয়েছে। বেজাও সঙ্গে ছিল, কিন্তু দুটোর সময় গোটা পঁচিশেক টাকা জিতে বেজা কেটে পড়ে। অবশ্য তার মোটেই উপায় ছিল না, বেজার দুপুরে সিনেমা টিকিট ব্ল্যাকের পার্টটাইম ব্যবসা আছে। আজকাল নাইট শোতে টিকিট মোটেই ব্ল্যাক হয় না, তাই সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বেজা বাড়ি ফেরৎ এসেছে।

হিতুকে দেখে বেজা দাঁড়ালো, হিতুর হাতে একশো টাকার নোট। আজ বেজার খুব খারাপ দিন গেছে। জুয়োয় জিতলে কী হবে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করতে গিয়ে সে আজ রামভরোসা জমাদারের পাল্লায় পড়েছিল। অন্যসব সেপাই জমাদারের টিকিট ব্ল্যাকের ঘুষের রেট হ'ল দশ টাকা, বড় জোর পনের টাকা। কিন্তু রামভরোসা চৌধুরির স্টাইল আলাদা, জমাদারজী দৈনিক একজনের বেশি কাউকে ধরেন না, কিন্তু যাকে ধরেন তাকে একেবারে গজভুক্ত কপিত্থবৎ মানে হাতির খাওয়া কয়েতবেলের মত খোসা গুঁড়ো করে ছেড়ে দেন।

আজ বেজার ভাগ্যে রামভরোসা এসে গিয়েছিলো। বাঁ হাতের তর্জনীতে পলাবসানো রুপোর আংটি থেকে পকেটের টাকা, হাতঘড়ি এমন কি বঙ্গলক্ষ্মী লটারির দু'টো টিকিট কিনেছিলো আজ— কালকেই খেলা, সেটা পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে রামভরোসা, তারপর সজোরে একটা থাপ্পর মেরে বিদায় দিয়েছে।

দুপরবেলা জুয়োয় জিতে বেজা হাসিমুখে উঠে গিয়েছিলো। হিতু দেখলো এখন তার মুখে যেন আলকাতরা মাখানো। সে বেজাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে রে বেজা?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বেজা বললো, 'রামভরোসা।' সবাই রামভরোসাকে চেনে, সুতরাং হিতুকে বুঝিয়ে বলতে হলো না।

হিতু ধীরে ধীরে মোড়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল, বেজাও সঙ্গে গেল। বেজা হিতুকে জিজ্ঞাসা করলো, 'একশো টাকার নোটটা কোথায় পেলি?'

হিতু বললো, 'বাবা ভাঙাতে দিয়েছে।'

বেজা বললো, ' ও আর ভাঙিয়ে কী হবে। তার চেয়ে চল সোজা হাওড়ায় গিয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়ে কিছু করার চেষ্টা করি।'

কথাটা হিতুর অপছন্দ নয়, একদিকে হিসেবি বাবার কড়াকড়ি, তাছাড়া ডিসেম্বরের গোড়াতেই এই বুড়ো বয়েসে আবার মাধ্যমিকের টেস্ট, তারপরে মার্চে সেই ভয়াবহ পরীক্ষা। একটু ইতস্তত করে হিতু বললো, 'কোথায় যাবি?'

বেজা বললো, 'আসানসোল, ধানবাদ এসব দিকে যাই। কয়লাখনির মুলুক। ওয়াগন ভাঙা, কয়লা চুরি, চোলাই-বিক্রি কতরকম ব্যবসা ওখানে।'

হিতু রাজি হয়ে গেলো। গলি থেকে বেরিয়ে দু'জনে সোজা হাওড়া স্টেশন, সেখান থেকে সরাসরি ধানবাদ। ধানবাদে পৌঁছে দু একদিনের মধ্যে বেজা খুব জ্বরে পড়লো। ওয়াগন ভাঙা, কয়লা চুরি এসব মাথায় উঠলো। বেজাকে নিয়ে হিতু বিপাকে পড়ে গেলো। বাজারের মাথায় এক মস্ত হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের দোকান। অল্প পয়সায় হবে জেনে হিতু সেখানে বেজাকে নিয়ে গেলো।

বেজার জ্বর সহজে ছাড়ে না। হিতুরও আর্থিক সঙ্গতি শেষ। সে এদিক ওদিক খুচখাচ কাজ করে কোনোরকমে চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ হোমিও ডাক্তারের সঙ্গে সামান্য মুখ-পরিচয় হয়েছিল হিতুর। বেজার চিকিৎসার খরচ সে চালাতে পারছিলো না, একদিন ডাক্তারকে ধরে বললো, 'স্যার, একটা কিছু কাজ দিন।'

ডাক্তার তাকে বললেন, 'তুমি আমার এখানে ফাইফরমাস খাটো। দু'চার টাকা যখন যা পারি দেবো।'

হিতু লেগে গেলো। এদিকে দুচারদিনের মধ্যে অসুখ একটু ভাল হতেই বেজা কলকাতায় ফিরলো। হিতু বেজাকে বার বার বলে দিল, 'আমাদের বাসায় আমার কথা কিছু বলবি না। বাবা আমাকে ধরতে পারলে আস্ত রাখবে না।'

হিতু কয়লাশহরে ডাক্তারবাবুর কাছে রয়ে গেলো। দিন যায়। ক্রমশ সে ডাক্তারখানার বাইরের ফাইফরমাস খাটা থেকে ফার্মেসির অন্দরে প্রবেশ করলো। সে লেখাপড়ায় খারাপ হলেও নির্বোধ নয়। আস্তে আস্তে সে কম্পাউণ্ডারবাবু না এলে কম্পাউণ্ডারের কাজ চালাতে শিখলো। তারপর যেমন হয়, একদিন বুড়ো কম্পাউণ্ডারবাবু অবসর নিতে সে পাকাপাকি কম্পাউণ্ডার হয়ে গেলো।

এখানেই শেষ নয়, কিছু টাকা জমিয়ে বছর দুয়েকের মাথায় নিজেই একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা খুলে ফেললো। সে নিজেই ডাক্তার, ডক্টর এইচ চক্রবর্তী। অল্পদিনের মধ্যে রমরমা পশার জমে উঠলো। আগের ডাক্তারবাবুর পশার এখন পড়তির দিকে, সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁকে হারিয়ে দিলো। এইবার থামতে হচ্ছে। আর নয়।

হিতু নামক এক বাড়িপালানো যুবকের জীবনের সাফল্য বর্ণনার জন্য এ গল্প আমি লিখতে বসিনি। এ গল্প হিতুর বাবাকে নিয়ে।

সংক্ষেপে শেষ ঘটনাটা বলি।

বাড়ি থেকে একশো টাকার নোট ভাঙাতে গিয়ে পালানোর পাঁচ বছর পরে প্রাক্তন হিতু বর্তমান ডাঃ চক্রবর্তী একদিন ভবানীপুরের বাড়িতে দেখা করতে এলো। তার পরনে ক্রিম রঙের সাফারি সুট, হাতে আন্তর্জাতিক মানের ঘড়ি। সঙ্গে সালঙ্কারা বধূ। সে নিজস্ব মারুতি ডিলাক্সে চেপে নিজের বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছালো এক সন্ধ্যায়।

বাইরের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। হিতু আস্তে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকলো, পিছনে বৌ। ঘরের মধ্যে একটা পঁচিশ পাওয়ারের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। সেই পুরনো দৃশ্য। তার বাবা সিদ্ধেশ্বরবাবু একটা প্রাচীন বেতের চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছেন। স্পষ্টতই মনে মনে কোনো হিসেবে করছেন। হিতুকে ঘরে ঢুকতে দেখে, পাঁচ বছর পরে হিতু ফিরছে, তা সত্ত্বেও কোনো ভাবান্তর হলো না সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তীর। তাঁর পিতৃহৃদয়ে কোনোরকম উচ্ছ্বাস দেখা গেলো না, একবার মুখ তুলে ছেলেকে দেখে বললেন, 'একশোটা'! টাকা ভাঙাতে গিয়ে এত দেরি করলি!' 'দে, ভাঙানিটা তাড়াতাড়ি দে!'

সান্যাল স্লিমিং

চোরবাজার থানার বড় দারোগা শ্রীযুক্ত দিগম্বর সান্যালমশায় একজন অতি সজ্জন ব্যক্তি। ছাত্রজীবনে তাঁর ইচ্ছা ছিলো ভালো করে লেখাপড়া শিখে অধ্যাপক হবেন। কিন্তু কলেজে পড়তে পড়তেই তাঁর বাবা নটবর সান্যালমশায়, যিনি রাণাঘাট আদালতে পেসকার ছিলেন, তিনি হঠাৎ সেই রমরমা চাকরি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পরে খবর পাওয়া যায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।

প্রথমে জানা যায় যে নটবরবাবু তারাপীঠে আছেন। তারাপীঠ মন্দিরের পিছনে যে বিখ্যাত শ্মশান আছে, সেখানেই তিনি এক সিদ্ধবাবার সাকরেদ হয়েছেন।

খবর পেয়ে দিগম্বরবাবু তাঁর মাকে নিয়ে সেই তারাপীঠের শ্মশানে গেলেন সেখানে তখন নটবরবাবু নেই, তিনি সারাগায়ে ছাইভস্ম মেখে তখন সাকরেদি ছেড়ে পুরো সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, তিনি নাকি হিমালয়ের দিকে চলে গেছেন।

এরপর আর নটবরবাবুর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। তবে কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কুম্ভমেলার যে আলোকচিত্র ছাপা হয়েছিলো, তার মধ্যে জটাজুট এবং ত্রিশূলধারী এক কৌপীন সম্বল সন্ন্যাসীর মুখশ্রীর সঙ্গে রাণাঘাট কোর্টের প্রাক্তন পেসকার নটবরবাবুর বড় বেশি মিল। কিন্তু ততদিনে দিগম্বরবাবুর মা আর বেঁচে নেই এবং দিগম্বরবাবু অন্যান্য বিষয়ে এত ব্যস্ত যে এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় ছিলো না।

তা না থাকুক। নটবরবাবু আমাদের এ গল্পে আসছেন না। এলে খারাপ হতো না, কিন্তু আমার সাহস নেই। বাংলা সাহিত্যে অনেক বাঘাবাঘা লেখক গল্পের মধ্যে সন্ন্যাসীকে ঢুকিয়ে রীতিমত নাস্তানাবুদ হয়েছেন।

কারণ এ গল্প ঠিক দিগম্বরবাবুকে নিয়ে নয়, নটবরবাবুকে নিয়েও নয়,—এ গল্প এক মোটা

বিষয় নিয়ে যার সঙ্গে দিগম্বর সান্যাল বিশেষ করে তস্য পিতা নটবর সান্যালের কোনো সম্পর্ক নেই।

ভূমিকা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসল বিষয়ে পৌঁছানোর আগে আরো একটু বলার প্রয়োজন আছে। স্বস্তির কথা এই যে আসল বিষয় মোটেই সূক্ষ্ম নয়, সুতরাং ভূমিকা আরেকটু যেতে পারে।

ব্যাপারটা সোজাসুজি যেমন হয়, ঠিক তাই। দিগম্বর সান্যালমশাই পিতৃদেব নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে বুঝতে পারলেন লেখাপড়া চালিয়ে, ভালোমত পড়াশুনা করে, অধ্যাপনা করতে গেলে যে ধরনের আর্থিক সঙ্গতি দরকার সেটা তাঁদের সংসারে আর নেই। দিগম্বরবাবুর মাতুল কলকাতায় পুলিশের সদর অফিসে বড়বাবুর চাকরি করতেন। তাঁর বেশ নামডাক ছিলো। অবশ্য নামডাক না বলে উপাধিডাক বলাই উচিত। কারণ সবাই তাঁকে চক্রবর্তীবাবু বলে ডাকতো। তাঁর আসল নামটা কেউই জানতো না।

তাতে আমাদের কিছু আসে যাচ্ছে না। চক্রবর্তীবাবু তাঁর ভগিনীপতির আকস্মিক পলায়নের পর ভাগিনেয় দিগম্বরবাবুকে অধিকতর লেখাপড়া থেকে নিবৃত্ত করলেন। কারণ পুরো সংসারের দায়িত্ব পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁরই উপর এসেছে; সুতরাং দিগম্বরবাবুকে কাজে ঢুকতে হবে।

কাজ মানে একটাই, চক্রবর্তীবাবু তাঁর বড় সাহেবকে ধরাধরি করে দিগম্বরকে ছোট দারোগার কাজে ঢোকালেন।

পুলিশের চাকরিতে দিগম্বর সান্যালের নতুন জীবন শুরু হলো। ছোট দারোগার কাজ বড় কঠিন। শুধু ছোটো আর ছোটো। এখানে চুরি, ওখানে রাহাজানি, সেখানে বদমায়েসি—সব জায়গায় ছোটাই হলো ছোট দারোগার কাজ।

তা খুব ছোটাছুটি করলেন দিগম্বর সান্যাল। তিনি আর দশজন সরকারী কর্মচারীর মত নন। আর পুলিশের কাজে ঢুকলে যে দু-চারটে দোষ স্বভাবের মধ্যে অজান্তেই প্রবেশ করে যায়, সেগুলোকে তিনি প্রাণপণে বাধা দিয়ে অত্যন্ত সততার সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখলেন।

অবশেষে একদিন বছর পনেরো চাকরির পর বড় দারোগা হলেন। বড় দারোগা হওয়ার পর দু-চার থানা ঘুরে অবশেষে আজ কয়েকমাস হলো তিনি এই কুখ্যাত চোরবাজার থানায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। দিগম্বরবাবুই এখানকার বড় দারোগা, মানে সর্বেসর্বা।

চোরবাজার থানায় যোগদান করে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পুরো এলাকাটাকে প্রায় ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন।

দিগম্বরবাবুর ঠাণ্ডা করার পদ্ধতি একটু অন্যরকম। তাঁর মধ্যে একটা সাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক ভাব আছে। তিনি সদাসর্বদা সাত্ত্বিক প্রচেষ্টাতেই চোর-বদমাস-গুণ্ডাদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেন।

অতি ভোরবেলায় প্রায় ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি 'জয় কালী' 'জয় কালী' বলতে বলতে ঘুম থেকে ওঠেন। থানার দোতলার কোয়ার্টারে তিনি একা থাকেন। পুলিশের চাকরির অসুবিধের কথা ভেবে বিয়ে করার সাহস পান নি। মা বেশ কিছুদিন হলো মারা গিয়েছেন। যে দু-চারজন নিজের লোক আছে, তারা রাণাঘাটের পুরনো বাড়িতেই রয়েছে।

তাঁর 'জয় কালী' 'জয় কালী' শুনলেই নিচতলার থানার ঘর থেকে ডিউটিতে একজন সেপাই

উপরে উঠে আসে। তিনি ততক্ষণে এক গেলাস চিরেতার জল খেয়ে স্নান-প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নেন।

এবার সেপাইটি এসে কাল লকআপে যে সব মহান ব্যক্তিরা পদধূলি দিয়েছেন, তাঁদের নাম ও কৃতিত্ব বর্ণনা করেন। সব মনোযোগ দিয়ে শুনে বিশেষভাবে বিবেচনার পর তিনি একজনকে বেছে নেন। তাকে সেপাই ওপরে নিয়ে আসে।

কাজটা কঠিন, সন্দেহ নেই। লকআপের ভিতরে ঢুকে বাছাই করা ঘুমন্ত আসামীটিকে আলাদা করে তুলে দোতলায় নিয়ে আসা সোজা কাজ নয়। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি পুরনো পাপী হয় আর দিগম্বর দারোগার আধ্যাত্মিক উন্নয়ন বিষয়ে তার যদি কোনো প্রাক্তন অভিজ্ঞতা থাকে, তবে অনেক সময় রুল দিয়ে গুঁতিয়ে কিংবা কয়েকজনে মিলে টেনেহিঁচড়ে তাকে দোতলায় আনতে হয়।

দিগম্বরবাবুর শোধনপদ্ধতি অতি সরল এবং সনাতন। প্রথমে এক গেলাস চিরতার জল। রাত দুটো পর্যন্ত যে লোকটা মদ খেয়ে হল্লা করে থানায় চালান হয়েছে, এই ভোর চারটের সময় তার পক্ষে এক গেলাস মহাতেতো চিরতার জল অতি মারাত্মক। এক চুমুকে খেয়ে নিতে হয়। মাথার তালু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কনকন করে ওঠে।

এর বিপরীতও আছে। হয়তো কেউ বিকেলে কোন কুকর্ম করে লকআপে ঢুকেছে, বারো-চোদ্দ ঘণ্টা পেটে কিছু নেই। খালি পেটে এক গেলাস চিরতার জল পড়া মাত্র সমস্ত পেটের ভেতরটা যকৃত, পিলে, নাড়িভুঁড়ি সব মোচড়াতে থাকে।

এর পরে গঙ্গাস্নান। না, গঙ্গা পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। সিঁড়ির একপাশে গঙ্গাজলের কলের সঙ্গে মোটা একটা হোসপাইপ লাগানো আছে। জামা-কাপড় পরিহিত অবস্থায় আসামীটিকে সেই হোসপাইপে সুস্নাত করা হয়। গ্রীষ্মের কিছুদিন ছাড়া শেষরাতে সব সময়েই কিছু ঠাণ্ডা, আর এটা সবচেয়ে মারাত্মক শীতকাল।

তা শীত-গ্রীষ্ম যাই হোক, মিনিট পনেরো হোস পাইপের প্রবল ধারাজলে লোকটিকে চোবানো হয়।

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভেজা জামাকাপড়ে এবার লোকটাকে নিয়ে যাওয়া হয় তিনতলার ছাদে, সেখানে একটি তুলসীমঞ্চ আছে। সেই তুলসীমঞ্চের সামনে পাশাপাশি দুটি আসন বিছানো রয়েছে।

ছাদের খোলা হাওয়ায় সিক্তবস্ত্রে আসামীটিকে একটি আসনে বসতে হয়। পাশের আসনটি স্বয়ং দিগম্বর সান্যালের।

প্রথমে আধঘণ্টা প্রাণায়াম। জোড়াসনে বসে গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি জুড়ে এক নাক চেপে আরেক নাকে, তারপরে সেই নাক চেপে আগের নাকে বিশুদ্ধ বাতাস টেনে নেয়া।

ব্যাপার সোজা নয়। বলা উচিত ভয়াবহ। বহু কুখ্যাত ছিনতাইকারী, প্রতিষ্ঠিত পকেটমার, নগরবিদিত মদ্যপ সান্যাল দারোগার এই প্রাণায়ামে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু প্রাণায়ামে ব্যাপারটা শুরু। এর পর আরো দু ঘণ্টা সাধনা। তার মধ্যে পদ্মাসন আছে, বজ্রাসন আছে, এক হাজার আটবার স্তোত্রজপ করা আছে।

স্তোত্রটি শ্রীযুক্ত দিগম্বর সান্যালের স্বরচিত। তিনি নিজেও প্রতিদিন সকালে আসামীর

পাশের আসনে বসে স্তোত্রটি পাঠ করেন। সান্যাল দারোগার স্তোত্রটি খুবই সোজা ভাষায় সরাসরি লেখা, মা কালীকে বলা হয়েছে,

কালী কালী মহাকালী

ডাকি তোকে খালিখালি

এ হলো সান্যালমশায়ের মতে, মা মহাকালীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এক হাজার আটবার এই শ্লোকটি জপ করতে করতে অনেক বলশালী গুণ্ডাও গোঁ গোঁ করতে করতে কাটা কলাগাছের মত ভূপতিত হয়েছে।

এর পরে যথাসময়ে অবশ্যই আসামীকে আদালতে চালান দেয়া হয়। সেখানে বিচারে যার যা সাজা হয় হোক, কিন্তু দিগম্বরবাবুর শোধনপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যে একবার গিয়েছে সে পরবর্তীকালে আর যাই করুক, চোরবাজার থানার এলাকার মধ্যে সহজে প্রবেশ করে না।

কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম ঘটলো। সেই ব্যতিক্রমের ঘটনাটা নিয়েই এই গল্প।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও শেষরাতে উঠে দিগম্বরবাবু 'জয় কালী, জয় কালী' করেছেন এবং সেটা শুনে নিচের থানার ঘর থেকে সেপাই উঠে আসার কথা।

কিন্তু এদিন তা সহজে ঘটলো না। প্রায় দশ পনেরো বার 'জয় কালী জয় কালী' করার পরে থানা থেকে সবচেয়ে সাহসী সেপাই সরযূপ্রসাদ দ্বিধাজড়িত পদে এবং কম্পমান হৃদয়ে দোতলায় উঠে এলো। সে এসে দারোগা সাহেবকে একটা লম্বা স্যালুট করে জানালো যে আজ নিচের লকআপ শূন্য। একজন আসামীও কাল বিকেল থেকে সারারাত ধরা যায়নি, যে তাকে শোধনের জন্যে দারোগা সাহেবের কাছে পেশ করা যাবে।

সরযূপ্রসাদের বক্তব্য শুনে দিগম্বরবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'এত বড়ো একটা থানায় তোমরা পনেরো-বিশজন লোক সারাদিন সারারাত কি ভেরেণ্ডা ভাজছো? একটা বদমাশও ধরা পড়েনি কাল আর আজকের মধ্যে?'

দিগম্বরবাবুর হাঁকডাক শুনে ছোট দারোগ নিখিলচন্দ্র দোতলায় উঠে এলেন। এসে দিগম্বরবাবুকে বুঝিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনার শোধন-প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ এলাকা পাজিমুক্ত হয়েছে। তাই চোর গুণ্ডা পাওয়া যাচ্ছে না। এতে আপনার রাগ না করে আনন্দিত হওয়াই উচিত।'

সব শুনে চিরতার জল খেয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে সারতে দিগম্বর সান্যালমশায় ভালো করে তলিয়ে ভেবে দেখলেন যে সত্যিই লকআপে যে আজ আসামীর অভাব হচ্ছে, সেটা তাঁরই শোধন প্রক্রিয়ার ফল। আজ কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমশই বদমাশ কম ধরা পড়ছিলো, লকআপে কম লোক আসছিলো। তবে আজকেই প্রথম লকআপ সম্পূর্ণ শূন্য।

কিন্তু এই কয়েকমাসে দিগম্বরবাবুর অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে, শেষরাতে তাঁর অধ্যাত্মসাধনা এবং কালীজপের একজন সঙ্গী না হলে চলবে না। তিনি নিখিলবাবুকেই ও ব্যাপারে নির্বাচিত করলেন, মুখে আদেশ দিলেন, 'নিখিল, তুমি এক গেলাস চিরতার জল খেয়ে গঙ্গাজলের হোসপাইপে ভালো করে স্নান সেরে নাও। তারপর আমার সঙ্গে প্রাণায়াম আর জপে বসবে। আজ যখন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি ছোট দারোগা, তুমিই আমার অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গী হও। তাছাড়া তুমি তো ঘুষ-টুষ, মদটদ খাও শুনি, তোমার শোধন হওয়া দরকার।'

ছোট দারোগা নিখিলবাবু শ্লেষ্মার ধাতের লোক, চিরকাল তাঁর সর্দিকাশির ভয়। এই বর্ষার

ভোরবেলা, হু-হু করে জোলো হাওয়া বইছে, এর মধ্যে ঠাণ্ডাজলে স্নান করে দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা খোলা ছাদে প্রাণায়াম, আসন এবং এক হাজার আটবার ঐ বিদঘুটে জপ করা তাঁর মত লোকের কর্ম নয়।

চতুর নিখিলবাবু 'আসছি' বলে নিচে নেমে সরাসরি থানার বাইরে পালিয়ে গিয়ে এক জমাদারকে দিয়ে বড় দারোগাকে লিখে পাঠালেন, 'স্যার, ওপাশের বস্তিতে কি একটা বড় গোলমাল হচ্ছে, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। আজ অধ্যাত্মসাধনায় আপনার সঙ্গী হতে পারছি না, পরে একদিন চেষ্টা করবো। ইতি সেবক নিখিল।'

রামদীন নামক যে প্রাচীন জমাদারটি দোতলায় এই চিরকুটটি নিয়ে সরল চিত্তে বড় দারোগার কাছে এসেছিলো, তাকেই সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়িয়ে ধরলেন দিগম্বরবাবু। রামদীনের বহুদিনের অভ্যেস সাতসকালে উঠে থানার ভিতরে বাঁধানো টিউবওয়েলের পাশে বসে লোটা লাটা জল ঢেলে 'জয় সিয়ারাম, জয় সিয়ারাম' বলে স্নান করা।

আজো রামদীনের এর মধ্যেই স্নান সারা হয়ে গেছে। সুতরাং দিগম্বরবাবুর সুবিধেই হলো। সোজা রামদীনকে নিয়ে তেতলার ছাদে তুলসীমঞ্চের পাশে সাধনা করতে বসে গেলেন। আর রামদীনকে বললেন, 'এতে তোমার সুবিধেই হবে। তুমি যে অত লোটাভর্তি ভাঙ্ খাও আর গুণ্ডাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করো, তোমার শোধন হওয়া ভালো।'

বিশাল বপু এবং বিশালতর উদর নিয়ে রামদীনের পক্ষে শোয়া-বসাই কঠিন, আজ বড় দারোগার আদেশে সে যখন প্রাণায়াম করার জন্যে জোড়াসনে বসতে গেলো একদম উলটিয়ে মুখথুবড়ে তুলসীমঞ্চের উপরে পড়ে গেলো। তার বিরাট শরীরের পতনের ধাক্কায় পুরো থানাবাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠলো।

সবাই কি হয়েছে দেখতে ছুটে তিনতলার ছাদে চলে এলো এবং ধরাধরি করে রামদীনকে সোজা করে দাঁড় করালো। রামদীনের পতন হয়েছিলো, কিন্তু মূর্চ্ছা হয় নি। বড় দারোগা তাকে ছাড়লেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাকে আধ ঘণ্টা প্রাণায়াম, তারপর এক হাজার আটবার মহাকালী মন্ত্র জপ করানো।

একবেলায় রামদীনের ভুঁড়ি চুপসিয়ে গেলো। ওজনও বোধহয় বেশ কয়েক কেজি কমলো।

এরপর থেকে লকআপে লোক না থাকলেই থানারই কোনো সেপাই বা জমাদার ধরে বড়বাবু শোধন করতে লাগলেন।

চোরবাজার থানার বিখ্যাত স্থূলোদর সেপাই জমাদাররা বড় দারোগার শোধন প্রক্রিয়ায় ক্রমশ চুপসে যেতে লাগলো। তাদের মেদ-চর্বি অন্তর্হিত হলো, ভুঁড়ি চুপসিয়ে গেলো। ওজনও বোধহয় বেশ কয়েক কেজি কমলো।

এই পরিবর্তন জনসাধারণের দৃষ্টি এড়ালো না। প্রথমে আশেপাশের লোকজন, তারপরে পুরো থানা এলাকায়, এমন কি থানার এলাকার বাইরেও দিগম্বর সান্যালের এই আধ্যাত্মিক শোধন প্রক্রিয়ার কথা ছড়িয়ে পড়লো।

আজকাল চারদিকে রোগা হওয়ার ফ্যাশন চালু হয়েছে। মোটা লোকেরা স্লিম হওয়ার জন্যে নানা উলটোপালটা স্লিমিং সেন্টারে যোগদান করে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছে। তবু সব সময়ে রোগা হতে পারছে না। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, কঠিন ব্যায়াম করে রোগা হতে হতে হঠাৎ সামান্য অসতর্ক বা অসাবধান হয়ে আবার মোটা হয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশ এই ধরণের লোকেদের কানে পৌঁছলো দিগম্বর সান্যালের শোধন প্রক্রিয়ার তাজ্জব কাহিনী। ধূর্ত মোটারা রাতের দিকে চোরবাজার থানার সামনে অহেতুক গোলমাল বাঁধিয়ে লকআপে ঢুকে পড়তে লাগলো। তারপর পরদিন সকালে আধ্যাত্মিক শোধনের দ্বারা শরীর হালকা করে, নিখরচায় চর্বি ঝরিয়ে ফেলল।

দিগম্বর সান্যাল হাজার হলেও পুলিশের লোক। যখন একই ব্যক্তিরা বার বার লকআপ থেকে শোধনের জন্যে তাঁর কাছে আসতে লাগলো, তিনি খোঁজখবর লাগালেন।

খোঁজখবর যা পাওয়া গেলো, তারপরে আর পুলিশের চাকরি করার কোনো মানে হয় না।

তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। চৌরঙ্গিতে একটা বড় ঘর ভাড়া নিয়ে সান্যাল স্লিমিং নাম দিয়ে মেদ ঝরানোর ব্যবসা শুরু করেছেন। সান্যাল শোধন প্রক্রিয়ায় একমাসে ভুঁড়ি দশ ইঞ্চি এবং ওজন দশ কেজি কমবেই, এ ব্যাপারে গ্যারাণ্টি দেয়া হচ্ছে। মাসে মাত্র দেড় হাজার টাকা, এ টাকা দিলেই যে কোনো স্থূলোদর-স্থূলোদরা সুপুরুষ-সুপুরুষী হতে পারে।

শেষ খবর, দিগম্বর সান্যালের ব্যবসা রমরমা চলছে। তবে সান্যাল স্লিমিংয়ের মোটা টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে চেম্বারের সোফা বদলাতে। প্রতি সপ্তাহে সোফা বদলাতে হচ্ছে, অতিরিক্ত মোটা লোকের ভার সোফাগুলি বহন করতে পারছে না। কিন্তু দিগম্বরবাবু উপায় বার করেছেন। থানার অফিসঘরে যে রকম সেগুন কাঠের হেলান দেয়া বেঞ্চিতে সেপাই এবং জমাদাররা সারাদিন বসে ঝিমোয়, সেই রকম এক সেট সেগুন কাঠের বেঞ্চির স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়েছেন বৌবাজারের এক ফার্নিচারের দোকানে।

আশা করা যাচ্ছে সান্যাল স্লিমিংয়ের অতঃপর আর কোনো অসুবিধাই থাকবে না। আর সেগুন কাঠের বেঞ্চিও যদি মাসে মাসে ভাঙে, ভালোই তো, খদ্দের লক্ষ্মীর দেহভার যত বেশি হবে ততই মঙ্গল।

হাতে খড়ি

পুরনো গড়িয়াহাট বাজারের ভিতরে যেখানে আলুর আড়ত ছিলো তারই একেবারে পিছনদিকে ছিল শ্যামাদাসীর ঠেক। ঠেক মানে একটা বে-আইনি চুল্লুর দোকান। এ দোকানের কোনো দরজা-কপাট ছিল না।

সারা দিনরাতই খোলা। সারা দিনরাতই জমজমাট। গড়িয়াহাট মোড়ের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে চারপাশে দিনরাতে যত মাতাল দেখা যেত তার আধাআধি এই ঠেক থেকে বেরুতো।

গল্পের মধ্যে যাওয়ার আগে শ্যামাদাসী ও তার চুল্লুর একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

এ প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। শ্যামাদাসীর বয়েস তখন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। শক্ত পাকাটে চেহারা। গায়ের রং কালো কুচকুচে, সাদা ঝকঝকে দাঁত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক গ্রাম থেকে সবজি বেচতে এসে সে কি করে চুল্লুর ঠেকওয়ালি হয়েছিল তার ইতিহাস উদ্ধার করা আর মহেঞ্জোদারোর শিলালিপি পাঠ করা প্রায় একই রকম কঠিন।

গাছকোমর করে কালো ফিতে-পাড় সাদা শাড়ি পরতো শ্যামাদাসী, সম্ভবত সে ছিলো

বালবিধবা। দুর্দান্ত পরাক্রম ছিল তার, তার আদেশে চোরে-পুলিশে এক গেলাসে চুল্লু খেত।

চুল্লু নামে যে কুটির-শিল্পজাত বঙ্গীয় পানীয় নানা জায়গায় বিক্রি হয় সেটা এককে ঠেকে এককে রকম। কোথাও সেটা নেহাৎ দিশি চোলাই, সাইকেলের টিউবে বা ফুটবলের ব্লাডারে কোনো ঘাঁটি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

কিন্তু শ্যামাদাসীর ঠেকের চুল্লুর জাত ছিল আলাদা। তার যেমন তেজ, তেমনি ঝাঁঝ। বাইরে থেকে আসতো না, শ্যামাদাসীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তার ঠেকে সরাসরি তৈরি হত সেটা। মাতালদের মুখে মুখে তার নামকরণ হয়েছিল শ্যামা চুল্লু। দু গেলাস খাওয়ার পরে জিব জড়িয়ে যেত, আলজিব থির থির করে কাঁপত, মাতালেরা আর শ্যামা চুল্লু বলতে পারত না, বলত 'ছেমাউল্লু'।

শ্যামাচুল্লু প্রস্তুত প্রণালী ছিল যথেষ্ট সহজ। এক বালতি কর্পোরেশনের জল, এক টিন মেথিলেটেড স্পিরিট আর কয়েক কেজি কলিচুন। সঙ্গে সম্ভবত নিশাদল বা ঐজাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য। প্রতি গেলাসের দাম ছিল আট আনা। সাধারণ গেলাস নয়, আজকাল আর সে রকম পেল্লায় সাইজের মহাভারতীয় কাচের গেলাস দেখতে পাওয়া যায় না। মোটা কাচের ভারি ওজনের রীতিমত তিনপোয়া আয়তনের সেই গেলাস শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কেরাই এক হাতে ধরতে পারতো। শিশু বালক বা দুর্বল নারী-পুরুষের পক্ষে সে গেলাস দু-হাতে না ধরে উপায় নেই।

এই রকম একটা গেলাসে একটু কেমিক্যাল, একভাগ জল, একভাগ স্পিরিট আর একভাগ চুন—সব একসঙ্গে মেলালে প্রথমে ধোঁয়া বেরোবে, ফিকে নীল রঙের ঝাঁঝালো ধোঁয়া। তারপরে প্রচুর বুদ্বুদ এবং সেই সঙ্গে ফেনা আর ফেনা।

বেকুবের ঢালা বিয়ারের ফেনা যেমন কখনো কখনো গেলাস উপচিয়ে পড়ে, এ ফেনাও সেই রকম উপচিয়ে পড়ত, তবে কখনো কখনো নয়, সর্বদাই।

নীল ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়ার পরে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তেড়ে তেড়ে উঠে আসত বুদ্বুদ আর ফেনা। গেলাস উপচিয়ে শ্যামাদাসীর কাঠের পাটাতনের ওপরে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে পড়ত সেই গলিত বিষাক্ত তরল। সেই পাটাতনের সর্বত্র চাকা চাকা পোড়া দাগে ভরে গিয়েছিল।

প্রতি গেলাস চুল্লু আলাদাভাবে তৈরি করা হত। তারপরে লোহার জালের ছাঁকনি দিয়ে অন্য একটা গেলাসে ছাঁকা হত। তখন কাদা, ফেনা এসব বাদ গিয়ে প্রায় অর্ধেক গেলাস হত সেই পানীয়। যার দাম ছিল আট আনা। ভুলে গেলে চলবে না তখন এক প্যাকেট চারমিনার সিগারেটের দাম ছিল পুরনো সাত পয়সা, একসঙ্গে বড় দোকান থেকে পাঁচ প্যাকেট নিলে আট আনা।

সন্ধ্যার দিকে যখন চুল্লুর গ্রাহকদের খুব ভিড় বেড়ে যেত, ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যেত, তখন আর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেবার অবসর হ'ত না। তখন গেলাসে গেলাসে সেই জ্বলন্ত পানীয় তুলে দেয়া হ'ত গ্রাহকদের হাতে, গ্রাহকদের নিজ দায়িত্বে গেলাসের উপরিভাগের ফেনার অংশ এবং নিচে থিথিয়ে পড়া চুনটুকু ফেলে অত্যন্ত কৌশলে মধ্যভাগের পানীয়টুকু গলাধঃকরণ করতে হ'ত।

তিরিশ বছর। ঠিক তিন দশক আগের গল্প এটা।

বড়দিন।

২৫ ডিসেম্বর।

দুই বন্ধু জয়দেব আর মহিমাময় পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী ইত্যাদি নানা অঞ্চলে ঘুরেফিরে রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে পৌঁছালো।

দুই বন্ধুরই তখন অল্প বয়েস, বিশের কোঠার নিচের দিকে। যার যেটুকু লেখাপড়ার ব্যাপার ছিল, বেশ কিছুদিন হ'ল সে সব চুকিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন চলছে দুঃসহ বেকারত্বের জীবন।

কিন্তু ঠিক নির্ভেজাল বেকারত্ব নয়।

মহিমাময় ভবানীপুরে গাঁজা পার্কের খুব কাছেই একটা আফিং, ভাং এবং গাঁজার দোকানে প্রতিদিন রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত আবগারির খাতা লেখে।

খুব কঠিন কাজ।

তখন গাঁজা ছিল দু রকমের—গাঁজা আর চরস। সেই সঙ্গে আরো বিক্রি হ'ত ভাং এবং আফিং।

চার রকম মাদকের চারটে রেজিস্টার ছিল। প্রত্যেক খাতায় দৈনিকের কি স্টক, কতটা বিক্রি, দিনের শেষে কত পরিমাণ কি জিনিস রইল। খুব ঝামেলার হিসেব, সামান্য একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে আবগারির দারোগা এসে ধরবে। আর সেই রোগা, শুটকো আবগারি সাবইন্সপেক্টরের সে কি ছিল হম্বিতম্বি। তোলা-ভরি-পুরিয়ার হিসেবে লাল পেন্সিল দিয়ে সই দেয়ার আগে নগদ দশ টাকা নিত আর 'কোমরে দড়ি বেঁধে ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাব' এই ধরনের খারাপ শাসানি দিতে থাকত।

সেসবে ভয় পেত না মহিমাময়। আসল অসুবিধে ছিল মাইনে নিয়ে। মহিমাময়ের আগে যে লোকটা খাতা লিখত সে ছিল এক রিটায়ার্ড কেরানী। তার টাকা পয়সার দিকে খুব লোভ ছিল না। আসলে সে ছিল এক বদ্ধ গেঁজেল।

গাঁজার দোকানদার সেই রিটায়ার্ড কেরানীকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দু-ছিলিম গাঁজা সরবরাহ করত, আর সেই সঙ্গে পাশের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে এক পোয়া গরম দুধ। গেঁজেলদের দুগ্ধ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এত দুধ খেয়েও কিন্তু সেই আগের ভদ্রলোক শেষরক্ষা করতে পারেন নি। একদিন সন্ধ্যায় গাঁজার কলকেতে মুখ দিয়ে একটা চোঁ চোঁ টান দিতেই চোখ উলটিয়ে পড়ে যান, তারপর আর জ্ঞান ফেরেনি। দিনকয়েক পরে দেহত্যাগ করেন।

মহিমাময় তখন দু'বেলা ভাত খেত যতীন দাস পার্কের কাছে ভবসিন্ধু পাইস হোটেলে। সেখানে ঐ গাঁজার দোকানের এক কর্মচারীও খেতে আসত। তার সঙ্গে সামান্য মুখ-পরিচয় ছিল মহিমাময়ের।

কি যেন নাম ছিল সেই লোকটার, রসিকলাল, বোধহয় রসিকলালই হবে। সেই রসিকলালই খাতা লেখার প্রস্তাবটা দেয় মহিমাময়কে। দৈনিক সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টাখানেক মাত্র কাজ, আগের লোককে বিনিময়ে মাগনা গাঁজা আর দুধ দেয়া হ'ত।

রসিকলাল পরামর্শ দিল সন্ধ্যাবেলা কয়েক ছিলিম গাঁজা আর একটু দুধ খেলে রাতের মিলের খরচা বেঁচে যাবে, কোনো খাবার-খেতে হবে না। হোটেলে শুধু দিনে একবেলা খেলেই হবে, তাতে মাসে অন্তত পনের-ষোল টাকা বাঁচবে, সেটাই বা কম কি!

একাধিক কারণে এই প্রস্তাবে আপত্তি ছিল মহিমাময়ের। গাঁজার দোকানে আবগারির খাতা লেখা, এত ছোট কাজ সে করে কি করে, পিরোজপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির ছেলে সে। তার ধমনীতে বইছে নীল রক্ত। পিরোজপুরের বিখ্যাত মোক্তার ভুবনময় রায়চৌধুরীর সে পৌত্র।

আজ পার্টিশন হয়েছে বলে তাকে পাইস হোটেলে খেতে হচ্ছে। তাই বলে গাঁজার হিসেব লেখা!

ভাগ্য বিপর্যয়ে মানুষ কত কি করে। না হয় গাঁজার খাতাই লিখতে হবে কিন্তু তার জন্যে গাঁজাও খেতে হবে! তাছাড়া মহিমাময়ের কাছে গাঁজার চেয়েও মারাত্মক হল দুধ। ছোটবেলায় জোর করে বাটি বাটি দুধ তাকে খাওয়ানো হয়েছে। আর সেই পিরোজপুরের ঘন ক্ষীরের মত দুধ, লালচে আভা তাতে। মিষ্টি স্বাদে ভরা সেই দুধ দিনের পর দিন খেয়ে খেয়ে আর খেয়ে মহিমাময়ের দুধ সম্পর্কে প্রচণ্ড অনীহা।

কিন্তু একটা কিছু করাও তো দরকার।

উত্তরাধিকারসূত্রে ভবানীপুরের একটা প্রাচীন তিনমহলা অট্টালিকার শেষ মহলের অর্ধেক অংশ সে পেয়েছে। তার মানে নিচে দেড়খানা আর ওপরে একখানা ঘর। নিচের সেই দেড়খানা ঘরে বারো টাকা ভাড়ার এক ঘর আদ্যিকালের ভাড়াটে। দোতলার ঘরটায় মাথা গোঁজার কাজ চলছে, কিন্তু ঐ একমাত্র বারো টাকা মাসিক আয়ে চালানো অসম্ভব।

অগত্যা বাধ্য হয়েই মহিমাময় গাঁজার দোকানে খাতা লেখার কাজ নিল। তবে গাঁজা দুধ নয়, নগদ টাকার বিনিময়ে। মাসে পনের টাকা।

মহিমাময়ের তবু বাবো আর পনের এই দুই মিলে মাসে সাতাশ টাকা বাঁধা আয়। তার মাসে দবকার অন্তত সত্তর-বাহাত্তর টাকা। হোটেল, চা-জলখাবার, খবরের কাগজ, ইলেকট্রিক বিল, যৎসামান্যই হাতখরচ, সব মিলে এর থেকে কমে কিছুতেই হতে চায় না।

থাকার মধ্যে আছে কিছু পুরনো কাঁসা পিতলের বাসন আর টুকরো-টাকরা কিছু সোনার গয়না। মহিমাময়ের ঠাকুমা বেখে গেছে মহিমাময়ের বৌয়ের জন্যে।

কোথায় বৌ? কিসের কি? নিজের খাওয়া-পরার সংস্থান নেই, এর মধ্যে বৌ আসবে কোথা থেকে?

সুতবাং সেই অবাস্তব সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে, অনাগত বধূর বাসনকোসন, গয়নাগাঁটি প্রয়োজন অনুসাবে বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে মহিমাময়ের আপাতত চলে যাচ্ছিলো।

সে তুলনায় জযদেবের অবস্থা কিন্তু ভযাবহ। সে থাকে খায় মামার বাড়িতে। কিছু জামাকাপড়ের, ধোপানাপিতের হাতখরচের পযসা তো চাই।

শুধু এসব নয়। দামী দামী নেশা আরম্ভ কবেছে জয়দেব। চোলাই, বাংলা, চুল্লু। হাতে পয়সা থাকলে বিলিতি থ্রি এক্স বা ড্রাই জিন। আর ওপরে উঠতে পারলে সাদা ঘোড়া, কালো কুকুর বা মাস্টারমশায মার্কা আসল বিলাইতি, সোনালি পানীয়।

জয়দেবের অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো বাদবিচার নেই। যখন যা হাতের কাছে পেলো তাই সই।

এই হাতের কাছে পাওযার ব্যাপারটা শুধু পানীয় সংগ্রহ করাব ক্ষেত্রে নয, পানীয়ের দাম সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

টুকটাক এদিক ওদিক মামার বাড়ির জিনিসপত্র যখন যেটুকু সম্ভব জয়দেব সরিয়ে ফেলে এবং বেচে দেয়। পুরনো জিনিস বেচার ব্যাপারে তার ম না দক্ষ লোক জগৎ-সংসারে কোনো কালে পাওয়া যাবে না।

পুরনো পাপোশ কোথায় ভাল দামে বিক্রি হয়, রোঁয়া-ওঠা চল্লিশ বছরের ব্যবহৃত পারস্য গালিচা কারা কেনে, বাতিল হয়ে যাওয়া জং-ধরা ডি সি পাখার বাজার কোথায় রমরমা এসব জয়দেবের নখদর্পণে।

এমন কি চিৎপুরের একটা গলিতে পুরনো লেপ, কম্বল, সতরঞ্চি পর্যন্ত যে বিক্রি করা যায়, বৌবাজারের পিছনে একটা বিক্রিওলা পুরনো পাথরের থালাবাটি কেনে আর নিমু গোস্বামীর লেনে এক ভট্টাচার্য বুড়ো পুরনো পাঁজি একেকটা চার আনা দামে কেনে এসব ধীরে ধীরে জয়দেব জানতে পেরেছে।

এতদিন পর্যন্ত ভালোই চলছিলো কিন্তু যখন মামাবাড়ির এ্যালসেশিয়ান কুকুরের তিনটে বাচ্চা জয়দেব হাতিবাগান বাজারে গিয়ে এক রোববার দশ টাকা করে তিনটেকে তিরিশ টাকায় বেচে দিলো, তারপর তার পক্ষে আর মামার বাড়িতে থাকা সম্ভব হলো না। মামা-মামিরা বা মামাতো ভাইবোনেরা হয়তো এ নিয়ে তেমন কিছু বলতো না কিন্তু যে মাদী কুকুরটা এই বাচ্চা তিনটের মা সে ছিলো যেমন হিংস্র তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে কি করে বুঝতে পেরেছিলো জয়দেবই তার ছানাগুলিকে সরিয়েছে। বাচ্চাগুলিকে হাতিবাগানে বেচে দিন দুয়েক এদিক ওদিক ফূর্তি করে জয়দেব পরের মঙ্গলবার অনেক রাতে যখন মামাবাড়িতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলো বিউটি নাম্নী সেই সারমেয় জননী মামাবাড়ির দরজা থেকে আধ মাইল রাস্তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো।

ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং প্রভূত মত্ত অবস্থায় এর পরে সারাজীবন ধরে জয়দেব প্রচুর দৌড়েছে। সেই দীর্ঘ দৌড়যাত্রার হাতেখড়ি হয়েছিলো শ্রীমতী বিউটির কাছে।

খাঁটি জার্মান ব্যাভারিয়ান শেফার্ড বংশের গাঢ় নীল রক্ত ছিলো শ্রীমতী বিউটির ধমনীতে। সে চট করে কাউকে আক্রমণ করে না, শুধু তাড়া করে যায়। যখন কাছে পায় দাঁত দেখায়, নখ দেখায় কিন্তু ছিঁড়ে ফেলে না, হয়তো একটু আধটু ছোঁয়।

ছুটতে ছুটতে সেদিন জয়দেব তিন-চারবার ধরাশায়ী হয়েছিলো, প্রচুর খিদে এবং সুপ্রচুর তৃষ্ণার সেই অভাব তার স্বাভাবিক তুরঙ্গম গতি বার বার ব্যাহত করছিলো। কিন্তু শ্রীমতী বিউটি একবারে তাকে বাগে পেয়ে ছিঁড়ে টুকরো করেনি। শুধু উদ্যত নখর, খরশান দন্তরাজি, লেলিহান জিহ্বা ইত্যাদি যথাসাধ্য প্রদর্শন করে জয়দেবের ওঠা এবং পুনরায় দৌড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে।

এবং তারপর আবার জয়দেবের দৌড়।

এবং তারপর আবার জয়দেবের আড়াই হাত পিছনে শাণিত জিহ্বা, কম্বুকণ্ঠী, খরনখী শ্রীমতী বাভারিয়া সুন্দরীর ক্রমাগত আস্ফালন।

যে কোন মানুষ এর পরে হয় আত্মসমর্পণ করতো অথবা হার্টফেল হয়ে মরে যেতো।

কিন্তু আত্মসমর্পণ বা সনাতন হার্টফেল করার জন্যে জয়দেব জন্মায়নি।

আধ মাইলের মাথায় নিমতলার মড়াখোঁচা কয়েকটি নেড়ি কুকুরকে শেষবার ধরাশায়ী হয়ে ওঠার মুহূর্তে সে লেলিয়ে দিলো বিউটির দিকে।

শ্রীমতী বিউটি পথ-লড়াই বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, চোঁ চোঁ পালানো ছাড়া তার আর কিছু করার ছিলো না।

ফলে এযাত্রা জয়দেব রক্ষা পেলো। কিন্তু বিউটির ভয়ে মামাবাড়ির বারোয়ারি আশ্রয় তাকে ছাড়তে হলো। এমন কি দু-একটা পুরনো জামাকাপড়, একজোড়া প্রায় নতুন চটি, গামছা, টুথব্রাশ এই সব দৈনন্দিন ব্যবহারের টুকিটাকি জিনিষ মামাবাড়িতে সব কিছুই পড়ে রইলো, সে আর

সাহস পেলো না সেগুলো উদ্ধার করে আনতে যেতে।

কিন্তু কোথাও তো মাথা গুঁজতে হবে, রাতে শুতে হবে। তাছাড়া একটা কারণে জয়দেবের একটু ফাঁকা জায়গা লাগে। সে ছবি আঁকে। অল্প অল্প নাম করছে। শিল্পী জয়দেব পালের নাম তত বিখ্যাত না হলেও তখন বেশ ছড়াতে শুরু করেছে।

মনে রাখতে হবে পাকা তিরিশ বছর আগের ঘটনা এটা।

তখনো ভবঘুরে আর ধান্দাবাজেরা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলোর স্বত্ব দখল করে নেয় নি।

বলা যায় যে জয়দেবই এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। একেকদিন রাতে, অনেক রাতে মদ খেয়ে, অনেক মদ খেয়ে শেয়ালদা স্টেশনে ঢুকে পড়ে জয়দেব। কোনো অসুবিধা হয় না, কেউ আপত্তি করে না।

এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এ ছাড়াও সে হাওড়া স্টেশনে, লেক গার্ডেন বাস টার্মিনাসের ডিপোতে, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে, এমন কি একদিন রাজভবনে আর একদিন হাইকোর্টে সে মত্ত অবস্থায় অবলীলাক্রমে গভীর রাতে ঢুকেছে। কখনো কোনো অসুবিধে হয় নি।

শুধু হাইকোর্টে সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে যে ঘরে ঢুকে সে ঘুমিয়েছিলো সেটা ছিলো এক বদরাগী জজ সাহেবের এজলাশ। তাতে কিছু আসে যায় না, রাতের বেলা তো আর জজসাহেবের এজলাশ তখন বসে না।

কিন্তু পরের দিন সকালে জয়দেবের ঘুম থেকে উঠতে দেবি হয়ে যায়, অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে সে যখন জজবাহাদুরের খাস কামরার বাথরুমে প্রাতঃকৃত্য করছিলো তখন বেলা সাড়ে দশটা। জজবাহাদুব এসে গেছেন, তিনি এজলাশে ওঠার আগে নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসবশত বাথরুমের আয়নায় একটু চিরুনি চালিয়ে আ-কপাল বিস্তৃত টাকের সামান্য অঙ্গসজ্জা করতে গিয়ে দেখলেন ভেতর থেকে বন্ধ।

এর পরের ঘটনা মুদ্রিত অক্ষরে বিস্তৃত করা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়বে। বরং মত্ত জয়দেবের চিড়িয়াখানায় রাত সাড়ে তিনটেয় প্রবেশ করার গল্পটা অনেক নিরাপদ।

খিদিরপুর খালের চারপাশে আরব্য রজনীর পৃথিবী, সেখানে খারাপ-ভালো, সস্তা-দামী এমন কোনো সাকী ও সুরা জগৎসংসারে নেই যা পাওয়া যায় না।

সুখের কথা জয়দেবের সাকীঘটিত দুর্বলতা কস্মিনকালেও ছিলো না, সেই নবযৌবনেও না। তবে এবং সেই জন্যেই বোধহয় পরের দ্রব্যটি অর্থাৎ সুরার প্রতি তার টান ছিলো অদম্য এবং মাত্রাতিরিক্ত।

সে যা হোক, সেই সময়ে চিড়িয়াখানার উত্তরদিকের গেটের সামনেই মানে খিদিরপুরের খালধারে শতাব্দী প্রাচীন গরু-মোষের আন্তর্জাতিক হাট। আন্তর্জাতিক এই অর্থে যে যদিও তখনো বাংলাদেশ হয় নি, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের চোরাচালানি গরুবাছুর, ভায়া দ্বারভাঙ্গা নেপালের মোষ, ভায়া কালিম্পং তিব্বতের চমরি ছাগল ইত্যাদি মাংসল জন্তু সেই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী উট এবং মূলতানী রামছাগল পর্যন্ত—এই সমস্ত জন্তুর মেলা বসতো সপ্তাহে একদিন।

হাটটা বসতো সপ্তাহের মাঝামাঝি। সজ্ঞানে কখনো জয়দেব মনে করতে পারতো না

মঙ্গলবার নাকি বুধবার, একেক সময় ভাবতো নিশ্চয়ই শুক্রবার হবে, বেস্পতিবার বা সোমবার হতেই আপত্তি কি।

কিন্তু এসব চিন্তা ও প্রশ্ন সাদা চোখে। পেটে দু চার পাত্র পড়ার পরে জয়দেব অন্য মানুষ, যাকে বলে ত্রিকালজ্ঞ। তখন আর বার-তারিখ, তিথি-নক্ষত্র এগুলোর জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না জয়দেবের, সে রক্তের স্পন্দনে টের পায় আজ অমুক জায়গায় দরজা খোলা, অমুক জায়গায় লেটনাইট পার্টি।

এই গোহাটার যে হাটবাবু অর্থাৎ সরকারী খাজনা আদায়কারী ছিলো, তার সঙ্গে জয়দেবের আলাপ হয়েছিলো ওয়েলেসলি স্ট্রিটের কুখ্যাত দিশি পানশালা খালাসিটোলায়। লোকটির নাম ছিলো খুব কাব্যময়—হৃদয় বৈরাগী।

পানশালায় আলাপ, আলাপ থেকে গভীর বন্ধুত্ব। প্রায় প্রতি হাটবারে রাত দশটার পরে হাটের ভিতরে চিড়িয়াখানার দেয়াল ঘেঁষে আসর বসাতো বৈরাগী। হৈ হৈ কাণ্ড। রাজস্থানী উটওয়ালা, দিনাজপুরী গরুর পাইকার, বিহারের ছাগল সম্রাট, জৌনপুরের বলদ শ্রেষ্ঠী কেনাবেচা শেষ করে বৈরাগীর আসরে সামিল হতো। সেই সঙ্গে এদিক ওদিক, এ প্রান্ত ওপ্রান্ত থেকে জয়দেবের মতো আরো দু-চারজন রসিক বন্ধুবান্ধব।

এক বর্ষার শেষরাতে, রাত প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, পানীয় নিঃশেষিত, আড্ডাধারীরা সবাই ক্লান্ত ও স্তিমিত, এমন সময় রাজস্থানী উটওয়ালা বললো যে সে তার একটা পোষা উট বছরখানেক আগে কলকাতার, চিড়িয়াখানায় উপহার দিয়েছে-সেটা এখন কেমন আছে, তার খুবই দেখতে ইচ্ছে করছে।

এই ইচ্ছের গভীর ব্যঞ্জনা জয়দেব ছাড়া কেউ বুঝতে পারে নি। জয়দেব উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তাহলে সিংজী চল যাই, দেখে আসি।'

যেমন কথা তেমন কাজ। অন্য মাতালেরা কেউ কিছু বোঝার আগে প্রথমে জয়দেব তারপরে সিংজী নিঃশব্দে দেয়াল ডিঙিয়ে চিড়িয়াখানার ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এর পর কি হয়েছিলো বলা খুব কঠিন। কেউ বলে ওরা দুজনে জলহস্তীর ডেবায় গিয়ে পড়েছিলো, অন্যেরা হিসেব করে বলেছে তা নয়, ভালুকের খাঁচার ওপরে।

জয়দেব পরে বলেছিলো, দেয়াল টপকে ভালুকের খাঁচার উপরে পড়া সম্ভব নয় তবে সামনে পড়েছিলো।

কিন্তু আসল কথা হল তারা দুজনে পড়েছিল চিড়িয়াখানার এক অস্থায়ী অনতিপ্রৌঢ়া জমাদারনির দেয়াল-ঘেঁষা ঝুপড়ির বাঁশের চাল ভেঙে তার বিছানার ওপরে।

তারপরে চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈচৈ। যা কিছু হওয়া সম্ভব। চিড়িয়াখানার ভেতরে রাত্রিতে যে দু'চারজন লোক থাকে এদিক ওদিক নানা কোয়ার্টারে, তারা ভাবলো বাঘ কিংবা সিংহ খাঁচা খুলে বেরিয়েছে। কেউ বললো একটা হাতি খেপে গিয়ে শিকল ছিঁড়ে ছুটছে।

জয়দেবের এই রকম সব বহুমুখী অভিজ্ঞতার কাছে মহিমাময় নিতান্ত শিশু।

আজ এই বড়দিনের উৎসবের রাতে জয়দেব প্রায় জোর করেই মহিমাময়কে নিয়ে বেরিয়েছে পানীয়ের পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে। এর আগে মহিমাময় একটু-আধটু পানীয় সৌখীনভাবে কখনো কখনো চেখে দেখেছে। সেও সুপরিবেশে দামী

পানীয়। কিন্তু সেসব খেতেও তার মোটেই ভালো লাগেনি। কেমন তেতো-তেতো, ঝাঁঝওয়ালা স্বাদ।

আজো একটু আগেই সাহেবপাড়ায় পার্ক স্ট্রিটে জয়দেবের সঙ্গে একটা বারে গিয়েছিলো মহিমাময়। বড়দিনের বাজারে সেখানে ভীষণ ভিড়, হৈ-হুল্লোড় ঠেলাঠেলি। বহু কষ্টে ধাক্কাধাক্কি করে জয়দেব কাউন্টার থেকে দু গেলাস হুইস্কি সোডা সংগ্রহ করেছিলো, একটু দূরে কিঞ্চিৎ ফাঁকায় মহিমাময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো।

আসার পথে এক স্থূলকায়া মেমসাহেবের গুঁতো খেয়ে গেলাসসুদ্ধ জয়দেব উলটিয়ে গেলো। মেমসাহেবের মহার্ঘ্য গাউন প্লাবিত হয়ে গেলো দুই গেলাস মদে।

কোথায় দু গেলাস বৃথা গেলো বলে শোক করবে, সে জায়গায় উলটে মেমসাহেব জয়দেবের কলার চেপে ধরলো বদমায়েশি করে গাউন নষ্ট করে দেয়ার জন্যে। জয়দেব যত বোঝাতে চেষ্টা করে যে ক্ষতিটা তারই বেশি হয়েছে, এই দুর্দিনের বাজারে বহুকষ্টে আহরিত দু পাত্র দুর্মূল্য পানীয় লোকসান করে বদমায়েশি করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে তার নেই, ততই মেমসাহেব 'শাট আপ' 'শাটআপ' বলে চেঁচাতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে জয়দেবকে 'স্কাউন্ড্রেল' এবং 'রাস্কেল' বলে সম্বোধন করতে থাকে।

এ অবস্থায় কি করবে বুঝতে না পেরে দূরে দাঁড়িয়ে মহিমাময় ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলো, এমন সময় বারের ম্যানেজার এসে জয়দেবকে উদ্ধার করলেন। জয়দেব এখানকার পুরনো এবং বাঁধা খদ্দের, তার হেনস্তা দেখে তিনি বাধ্য হয়ে এগিয়ে এসেছেন।

অবশ্য ম্যানেজার সাহেব যা কবলেন তা কহতব্য নয়। মোটা মেমসাহেবের ঘাড় ধরে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে গেলেন, যেতে যেতে বললেন 'ফ্যাট গার্ল গো হোম, দিস ইস নট ইয়োর নাইট (Fat girl go home, this is not your night.) সরাসরি অর্থ হলো, 'মোটা মেয়ে বাড়ি যাও, এ বাত তোমার রাত নয়।'

মেমসাহেব কি বুঝে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার সাহেবের গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে গাইতে লাগলেন, 'কে সারা সারা।'

জয়দেব কি ভাবলো কি ভাবলো না কে জানে, কিন্তু মহিমাময়ের এ ধরণের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তার মনে হলো দ্রুতপায়ে এখান থেকে সরে পড়াই ভালো। এবং এ কথা মনে হওয়া মাত্র সে বার থেকে ফুটপাথে গিয়ে নামলো।

ফুটপাথে তখন বড়দিনের সন্ধ্যা জমজমাট। রাত প্রায় আটটা বাজে। বারের ভেতরের থেকে ফুটপাথের ভিড় আরো বেশি। ভিড়টা চৌরঙ্গীর দিক থেকে, সুতরাং মহিমাময় পার্ক স্ট্রিট ধরে পূবমুখী পার্কসার্কাসের দিকে হাঁটা শুরু করলো।

বেশিক্ষণ যেতে হলো না। এই ভিড় আর হৈ-হুল্লোড়ের গণ্ডগোলে জয়দেব একটু পরেই তাকে এসে ধরলো, 'কিরে, পালাচ্ছিস কোথায়?'

মহিমাময় বলেন, 'না পালিয়ে উপায় কি? ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়বো নাকি?'

জয়দেব জিব দিয়ে একটু চুক চুক করে বললো, 'ভিড় তো ভালোই, শুধু এই বড়দিনের রাতে দু গেলাস হুইস্কি অদানে অব্রাহ্মণে গেলো, তারপর মেমসাহেবের গালাগাল খেলাম। আর স্যাহেবপাড়ায় নয়, চল বাঙালী পাড়ায় নিরিবিলিতে ফুর্তি করা যাক।

মহিমাময় জানতে চাইলে, 'বাঙালী পাড়ায় আবার কোথায়?'

জয়দেব বললো, 'গড়িয়াহাটায় শ্যামাদাসীর ওখানে, চমৎকার জায়গা।'

এর আগে শ্যামাদাসীর নাম শোনেনি মহিমাময়, সে চমকিয়ে উঠলো, ' না না, ওসব খারাপ জায়গায় যাবো না।'

জয়দেব হাত তুলে আশ্বস্ত করলো, 'আরে না, কোনো খারাপ ব্যাপার নেই। মোটেই খারাপ জায়গা নয়। শ্যামাদাসীর খুব ডিসিপ্লিন। তাছাড়া দামে সস্তা এবং খাঁটি মাল। চোখের সামনে তৈরি করে দেয়।'

'খাঁটি মাল' শুনে খুব ভয় পেয়েছিলো মহিমাময়, তবে 'সামনে তৈরি করে দেয়' শুনে বুঝতে পারলো জয়দেব সুরা সম্পর্কে বলছে, সাকী সম্পর্কে নয়।

এতক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে লোয়ার সার্কুলার রোডের ট্রাম রাস্তায় এসে গেছে। এখানেও বড়দিনের জটলা, অধিকাংশ দিশি ফিরিঙ্গি আর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

সামনের ফুটপাথ থেকে দুটো রঙীন কাগজের টুপি কিনে জয়দেব নিজে একটা মাথায় দিলো আর একটা মহিমাময়কে দিলো। মহিমাময় অবশ্য সেটা মাথায় দিলো না, রাস্তা দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে যাচ্ছিলো তার মাথায় পরিয়ে দিলো। জয়দেব সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে তাড়াতাড়ি মহিমাময়ের হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তার ওপারে ট্রাম স্টপে এলো।

উত্তর দিক থেকে একটা গড়িয়াহাটার ট্রাম আসছিলো, প্রায় ফাঁকা। দুজনে মিলে সেটায় উঠলো। তারপরে গড়িয়াহাটায় নেমে সোজা আলুর আড়তের পিছনে শ্যামাদাসীর ঠেক।

প্রিয় পাঠক মহোদয়, অনুগ্রহ করে একবার তিরিশ বছর পিছন ফিরে তাকান।

ঐখানে আলুর আড়তের ফাঁক দিয়ে দেখুন। কলঙ্কিত তক্তাপোষের ওপরে জয়দেব এবং মহিমাময় বসে আছে। আশেপাশে আরও দুচারজন। আগামী তিরিশ বছরের বর্ণোজ্জ্বল মাতাল জীবনে আজ মহিমাময়ের হাতেখড়ি। সামনে বড় কাঁচের গেলাসে টগবগ করে ফুটছে কড়া পানীয়, উচ্ছল ফেনা গেলাস থেকে চারপাশে গড়িয়ে পড়ছে, ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হচ্ছে।

একটু পরে গেলাসের উচ্ছ্বাস থেমে গেলো। নতুন খদ্দের দেখে শ্যামাদাসী নিজের হাতে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে মহিমাময়ের হাতে একটা গেলাস এগিয়ে দিলো। কম্পিত হাতে গেলাসটা ধরে একটু ঠোঁটে ছোঁয়ালো মহিমাময় স্বাদ নেওয়ার জন্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো যে শুকনো লঙ্কা সরষের সঙ্গে বেটে এ্যাসিডে মেশালে যে স্বাদ হবে সে এর চেয়ে অনেক নরম ও সুস্বাদু।

কিন্তু মুহূর্তের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক হাতে নাক টিপে, চোখ বুজে এক নিঃশ্বাসে মহিমাময় সেই তরল গরল গলাধঃকরণ করলো। বন্ধুর এই কীর্তি দেখে জয়দেব হাততালি দিয়ে উঠলো। শ্যামাদাসীও অবাক হয়ে মহিমাময়ের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার পোড়খাওয়া আসববৃত্তির দীর্ঘজীবনে এর আগে আর কাউকে দেখেনি, জীবনের প্রথম পানীয় বিশেষ করে এই এস্পেশাল চুল্লু এমন চোঁ-চোঁ করে এক টানে মেরে দিতে।

মহিমাময়ের নাক আর কান দিয়ে তখন গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছে, গলায় আগুন জ্বলছে, পায়ের গোড়ালি থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঝিমঝিম করছে, সে হঠাৎ দেখতে পেলো শ্যামাদাসী তাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে, এবং একটু পরেই দেখলো শ্যামাদাসীকে হটিয়ে দিয়ে তার প্রাণের বন্ধু জয়দেব গড় হয়ে তার পায়ের ধূলি নিচ্ছে।

অন্য এক মাতালের গল্প

প্রত্যেক শুক্রবার কিশোর তারকেশ্বরে যায়।

না, কোনও ধর্মকর্ম করতে সে যায় না। ভোলাবাবার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, যত কাজই থাক তারকেশ্বরে গেলে অন্তত একবার সে মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ছুঁইয়ে আসে। কিন্তু সে শুক্রবার-শুক্রবার তারকেশ্বরে যায় ব্যবসার খাতিরে। তারকেশ্বরের কাছেই ময়নাপাড়ায় তার কোল্ড স্টোরেজ, পাশাপাশি দুটো। একটা বাবা তারকেশ্বরের নামে— 'দি নিউ ভোলাবাবা কোল্ড স্টোরেজ'।

প্রথমে অবশ্য এটার 'ভোলাবাবা কোল্ড স্টোরেজ' নামই দিয়েছিল কিশোর, কিন্তু পরে জানতে পারে যে আশেপাশে আরও তিনটি ভোলাবাবা কোল্ড স্টোরেজ', 'ভোলেবাবা কোল্ড স্টোরেজ' এবং 'ভোলেবাবা কোল্ড স্টোরেজ' রয়েছে। তখন সে বাধ্য হয়ে নাম পালটিয়ে 'দি নিউ ভোলাবাবা কোল্ড স্টোরেজ' নামকরণ করে।

দ্বিতীয়টির নাম নিয়ে কিশোরের অবশ্য কোনও অসুবিধেই হয়নি।

অসুবিধে হওয়ার কথাও নয়। কিশোরের প্রাণাধিকা পত্নী শ্যামা শতকরা একশভাগ লক্ষ্মী। শ্যামার সঙ্গে পরিণয়ের পর থেকেই কিশোরের রমরমা।

তার একটা কারণ অবশ্য শ্যামার কৈশোর এবং যৌবন ইতিহাস খুব প্রাঞ্জল ছিল না, কিন্তু শ্যামার বাবার টাকা ছিল। কিশোর এসব কিছু না ভেবেচিন্তে শুধু শ্যামার রূপসুধা পান করে এবং শ্যামার পিতৃদেবের দশ লক্ষ টাকার নিরভিমান পণ গ্রহণ করে শ্যামার পাণিগ্রহণ করেছিল।

তারপর থেকে পরম আনন্দে কেটেছে তার দিন।

শুধু দিন নয়, কিশোরের রাতও পরম আনন্দে কেটেছে। রঙিন দেশলাই কাঠির মত একেক সন্ধ্যায় কখনও সবুজ, কখনও লাল— একেক সায়াহ্নে গাঢ় নীল অথবা ঝকঝকে সাদা আলোর রোশনাই। শ্যামা তাকে অনেক দিয়েছে।

সুতরাং দ্বিতীয় কোল্ড স্টোরেজটির নামকরণ যখন কিশোর করল 'শ্যামা কোল্ড স্টোরেজ' তার মন ও হৃদয় আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

শুধু একটা অসুবিধে হয়েছিল, স্বয়ং শ্যামা সজোর প্রতিবাদ জানিয়েছিল, 'আমার বন্ধুরা আমাকে বলত গরম হাওয়া, আর তুমি আমাকে কোল্ড স্টোরেজ করে দিলে?'

কিশোর সরল প্রকৃতির মানুষ। এতশত কথার কায়দা বোঝে না। দুটো আলুর কোল্ড স্টোরেজে মাসে পাঁচ-পাঁচ দশ হাজার টাকা. সন্ধ্যাবেলা আধ থেকে এক বোতল রঙিন রাম, তারপরে গৃহে শয়নে-স্বপনে শ্যামাসুন্দরী—এই তার জীবনের পরমার্থ।

আজ শুক্রবার। তারকেশ্বর যাচ্ছিল কিশোর। আজকাল লোকজনদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না, তাই সপ্তাহের শেষ দিকটা নিজেই তারকেশ্বরে এসে হিসেবনিকেশ করে, টাকা আদায় করে দেনাপাওনা মেটায়।

কোল্ড স্টোরেজের লাগোয়া তার একটা সুন্দর বাংলোমতন ঘর আছে, সেখানে রাত্রিযাপন

করে। কলকাতা থেকে আসার সময় দু-চার বোতল রাম সঙ্গে নিয়ে আসে। ব্যবসা চালাতে গেলে স্থানীয় মাস্তানদের, থানার বাবুদেব একটু খুশি রাখতে হয়।

শনি-রবিবার কোল্ড স্টোরেজের আলুভাজা আর রাম। বিশ্রাম-ফুর্তিও হয় আবার পাবলিক রিলেশনও হয়।

কিন্তু আজ কিশোরের তারকেশ্বর যাওয়া হল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় গণধর্ষণের প্রতিবাদে কোন্নগরের 'সুহৃদ বান্ধব সঙ্ঘের' সদস্যরা বোমা, লাঠি নিয়ে রেললাইনের ওপরে বসে পড়েছে। শ্রীরামপুর থেকে এস ডি ও সাহেব পুলিস সাহেব এসে অনেক বুঝিয়েছেন, তাঁরা কথা দিয়েছেন য়ে ভবিষ্যতে যাতে এরকম আর কখনও না হয় তা তাঁরা দেখবেন এবং নিশ্চয়ই এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু সুদৃদ বান্ধব সঙ্ঘের সদস্যরা অদম্য। বিকেল চারটে পাঁচ মিনিট থেকে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা, তারা ঠিক চারটে বাজতে পাঁচ মিনিটে 'সুহৃদ বান্ধব সঙ্ঘ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে রেললাইন পরিত্যাগ করল।

এর পরেও তারকেশ্বরে যে যাওয়া যেত না তা নয়। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই রেল চলাচল প্রায় স্বাভাবিক হল। কিন্তু বহুক্ষণ বেলকামরার গুমোটে আটকে থেকে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। সে রেলগাড়ি থেকে লাইন বরাবর কিছুটা হেঁটে তারপর একটা রিকশ নিয়ে জি টি রোডে এসে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ধরল।

কিশোরের নিজের একটা নতুন লাল মারুতি ভ্যান আর পুরনো ফিয়াট আছে। কিন্তু গাড়িটাড়ি নিয়ে সে কলকাতার বাইরে বেরোতে চায় না, তার অনেক ঝামেলা । জি টি বোডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যাম, মোড়ে মোড়ে চাঁদার খাতা।

আজকের ট্রেন ঝঞ্ঝাটটা একটু অস্বাভাবিক, এমন সাধারণত হয় না। যা হোক, প্রাইভেট ট্যাক্সিতে উঠে সে প্রথমে তারকেশ্বরেই যাওয়ার কথা বলল, কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা বলল যে এ গাড়ি কলকাতার, সে কলকাতায় ফিরছে, তারকেশ্বর যেতে পারবে না। একটু দোনামনা করে অবশেষে বাধ্য হয়েই কিশোর কলকাতা ফিরে যাওয়া সিদ্ধান্ত করল।

সন্ধ্যাবেলার জি টি রোডের ভিড়ে ভর্তির রাস্তায় ধুঁকতে ধুঁকতে মন্থরগতিতে ট্যাক্সি কলকাতার দিকে রওনা হল।

কিশোরের হাতে একটা শান্তিনিকেতনী চামড়ার ব্যাগে সপ্তাহ শেষের খোবাক দু-বোতল রাম, একটা তোয়ালে আর একটা টুথব্রাশ রয়েছে।

হাওড়া শহরের মুখে জি টি রোডের একটা বাঁক যেখানে দীর্ঘ উকারের (ৄ) জটিলতা নিয়েছে, অথচ বান মাছের লেজের মত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে, সেখানে ট্যাক্সিটা রীতিমত আটকে গেল গাড়ির জটলায়। কিশোব চারদিক পর্যবেক্ষণ করে বুঝল ঘণ্টাখানেকের আগে এ জট খোলার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে হাতের ব্যাগে দু-বোতল পানীয় রয়েছে।

লোডশেডিং চলছে। সন্ধ্যা বেশ জমাট হয়ে এসেছে । ধুলো, ধোঁয়া, গরম, অন্ধকার। কিশোর ধীরে ধীর ব্যাগ খুলে একটা বোতলের ছিপি খুলে অল্প অল্প করে গলায় ঢালতে লাগল। একবার ড্রাইভার পিছন ফিরে তাকাতে দ্বিতীয় বোতলটা তার হাতে ধরিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে গরম, গাড়িতে ঘামতে ঘামতে বসে থাকা, ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করা- কোনও বোধই আর

রইল না। ড্রাইভারের অবস্থাও তদ্রূপ। দুজনে ধীরে ধীরে চুক চুক রাম খেয়ে চলল।

এরপর রাত তখন প্রায় একটা। কখন যে ট্রাফিকের জট খুলেছে, ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে কলকাতার ভিতর চলে এসেছে, কিছুই হুঁশ হয়নি কিশোরের।

এখন একটু জ্ঞান হতে সে উঠে বসল। গাড়ির পিছনের সিটে সে, আর সামনের সিটে ড্রাইভার। ড্রাইভার এখনও বেহুঁশ।

জানলার বাইরে মেঘলা আকাশে ভাঙা চাঁদ উঠেছে। জায়গাটা বোধহয় লেকের কাছাকাছি কোথাও হবে। একটু চোখ কচলিয়ে নিয়ে দরজা খুলে গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো কিশোর। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। আশেপাশে একটু তাকিয়ে কিশোর ধরতে পারল, জায়াগাটা শরৎ বসু রোড আর সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে লেকের মুখোমুখি।

গাড়িতে ওঠার পরে কিশোর ড্রাইভারকে বলেছিল শরৎ বসু রোডে তার বাড়ি। ড্রাইভার যে এত মদ খাওয়ার পরেও কোনও দুর্ঘটনা না করে এতদূরে আসতে পেরেছে সেটা ভাগ্যের কথা। তবে শরৎ বসু রোডের ঐ মাথায় পদ্মপুকুরের পাশে একটা দোতলা বাড়িতে থাকে কিশোব, সে জায়গাটা এখান থেকে খুব কাছে নয়।

সামনের সিটে ড্রাইভারকে দুবার ধাক্কা দিয়ে তোলার চেষ্টা করল কিশোর। লোকটা দুবার হুঁ হুঁ করে, তারপর সিটেব উপর উপুড়হয়ে শুয়ে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হল। চাঁদের আলোয় কিশোর দেখতে পেল ওর পায়ের কাছে রামের বোতলটা পড়ে রয়েছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ পানীয় এখনও বর্তমান। কিশোরের নিজের বোতলটাও পিছনের সিটে রয়েছে কিন্তু সেটা খালি, তাতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

ড্রাইভারের পায়ের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে বোতলটা তুলে নিল কিশোর। ড্রাইভার বোধহয় কিছু টের পেয়েছিল, ঐ আচ্ছন্ন অবস্থাতেই মৃদু বাধাদানের চেষ্টা করল। কিশোর তার হাত ছাড়িয়ে বোতলটা বগলে নিয়ে টালমাটাল চরণে বাড়ির দিকে রওনা হল।

এখান থেকে নাক-বরাবর মাইল দুয়েক রাস্তা যেতে হবে। এটুকু রাস্তা মাতালের পক্ষে কিছুই নয়, বিশেষ করে হাতের বোতলে এখনও যখন একটু পানীয় আছে। একটাই ভয়, হঠাৎ পা জড়িয়ে পড়ে না যায়। কিন্তু গাড়িতে ঘুমিয়ে নেশাটা এখন একটু ধাতস্থ হয়েছে। সুতরাং বোতল থেকে অল্প অল্প পানীয় গলায় ঢালতে ঢালতে বাড়ির পথে ভালই এগোল কিশোর।

এক সময়ে কিশোরের খেয়াল হল যে তার হাতের বোতল শূন্য হয়ে গেছে এবং সে নিজের বাড়ির সামনে এসে গেছে।

কিশোরের কাছে বাড়ির সদর দরজার একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। এই মাতাল অবস্থাতেই সেটুকু খেয়াল আছে তার। পকেট হাতড়িয়ে চাবিটা বার করল কিশোর, ভাগ্যিস গাড়ির মধ্যে পড়ে যায়নি, শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা তো গাড়িতেই রয়ে গেল।

কিশোরের মাথাটা ঝিমঝিম করছে। পরের বারের মদটা না খেলেই ভাল হত। তার হাত পা টলছে, কিছুতেই চাবি দিয়ে বাড়ির দরজাটা খুলতে পারছিল না কিশোর। বার বার চাবির মুখটা পিছলে পিছলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা পুলিসের কালো গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে নেমে এল লম্বাচওড়া হৃষ্টপুষ্ট গুম্ফমান এক হিন্দুস্থানী জমাদার। জমাদারজীর গায়ে লংক্লথের ঢোলাহাতা পাঞ্জাবির সঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা পায়ে কালো পামশু।

জমাদার সাহেব নেমেই প্রথমে কিশোরের হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিলেন এবং সেটা শূন্য দেখে একটু রেগে সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপরে ঘাড়ের পেছন থেকে কিশোরের জামার কলারটা ধরে হুমকি দিলেন, 'এই মাতাল, এত রাতে হচ্ছেটা কি ? চল্, থানায় চল্।'

পুলিস বুঝতে পেরে কিশোর একটু থমকিয়ে গেল, তারপর হেঁচকি তুলে বলল, 'জমাদারসাহেব, বাড়িতে ঢুকব, তাই দরজাটা চাবি দিয়ে খুলছি...' বলে হাতের চাবিটা তুলে দেখালো।

জমাদারসাহেব অবাক হলেন, 'বাড়ি? দরজা? কেয়া বোলতা তুম?'

কিশোর করজোড়ে বলল, 'হুজুর, এই আমার বাড়ির সদর দরজা আর দোতলায় ঐ যে দেখছেন আলো জ্বলছে, ওটা আমার শোয়ার ঘর।'

একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে কিশোরের কলার ধরে শক্ত হাতের মুঠোয় একটা জোরে ঝাঁকানি দিলেন জমাদার সাহেব।

ঝাঁকুনি খেয়ে কিশোরের মাথা থেকে কিছুটা অ্যালকোহল নেমে গেল। সে দেখতে পেল যে সে এতক্ষণ ধরে বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টটায় চাবি লাগানোর চেষ্টা করছিল এবং পোস্টের ওপরের বালবটাকে ভাবছিল তার দোতলার শোয়ার ঘরের আলো, যেটা জানলা দিয়ে রাস্তা থেকে দেখা যায়।

একটু সম্বিৎ ফিরে এসেছে কিশোরের। কিন্তু এখন জমাদারসাহেব তাকে ঘাড়ে ধরে পুলিসভ্যানের দিকে ঠেলা শুরু করেছে। সে কাকুতিমিনতি করতে লাগলো, 'জমাদার সাহেব, ছেড়ে দিন। এই দেখুন, সত্যি এই সামনের দোতলা বাড়িটা আমার।

কিশোরের কথা শুনে জমাদারসাহেবের মনে হল, হয়ত লোকটা মিথ্যে কথা বলছে না। তাছাড়া এত রাতে থানায় মাতাল নিয়ে যাওয়া সেও এক হাঙ্গামা। সুতরাং দেখা যাক সত্যিই এই সামনের বাড়িটা এই মাতালটার কিনা। তাহলে এটাকে ছেড়ে দিয়ে থানায় গিয়ে ঘুমনো যায়, রাতও অনেক হয়েছে।

জমাদারসাহেবের বজ্রমুষ্টি কিঞ্চিৎ শিথিল হতে কিশোর নিজের সদর দরজার দিকে এগোল। কর্তব্যপরায়ণ জমাদার সাহেব কিন্তু পিছু ছাড়লেন না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পিতলের যুগ্ম নেমপ্লেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল কিশোব, তারপর নিজের বুকে হাত রেখে বলল, 'ঐ যে প্রথম লাইনে লেখা দেখছেন মিঃ কে কে পাল, ঐ কে কে পাল কিশোরকুমার পাল হলাম আমি। আর নিচের লাইনে মিসেস এস পাল মানে মিসেস শ্যামা পাল হলেন আমার পত্নী।'

আত্মপরিচয় শেষ করে দরজায় চাবি লাগিয়ে ঘোরালো কিশোব, দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির নিচের বাতিটা সুইচ টিপে জ্বালালো কিশোর। জমাদারসাহেব ইতস্তত করছিলেন, কিশোর তাঁকে অনুরোধ করল, 'আসুন, ভেতরে আসুন স্যার।'

জমাদারসাহেব ভেতরে আসতে সামনের দেওয়ালে একটা বড় ফটো দেখিয়ে কিশোর বলল, 'এটা হলো আমার শ্বশুরমশায়ের ছবি, মিস্টার পরেশচন্দ্র দাশ, আয়রন মার্চেন্ট, লোহাপট্টিতে নিজের গদি আছে।'

আর সরজমিন করার ইচ্ছা নেই জমাদারসাহেবের কিন্তু কিশোর তাঁকে জোরজার করে

দোতলায় তুলল। দোতলায় উঠে ছোট বারান্দা পেরিয়ে শোবার ঘর।

এবার একটা ছোট নাটক হল।

কিশোরের বউ শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র বিয়ের আগে যেমন ছিল, বিয়ের পরেও তাই রয়েছে। মোটেই বদলায়নি। কিন্তু সে তার চরিত্রদোষের কথা ঘুণাক্ষরেও কিশোরকে টের পেতে দেয় না। তবু অত্যন্ত সেয়ানা হওয়া সত্ত্বেও আজ সে একেবারেই আঁচ করতে পারেনি যে, তার স্বামী যার সোমবার সকালে ফেরার কথা সে শুক্রবার রাত কাবার হওয়ার আগেই ফিরে আসবে।

শোয়ার ঘরে আলো জ্বলছিল, বড় ডাবল বেডের খাটে শ্যামা শুয়েছিল। সহসা ঘরের মধ্যে কিশোব ও জমাদারসাহেবের প্রবেশ। শ্যামা এবং শ্যামার সঙ্গী দুজনেই পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঘুমে অচেতন, কেউ কিছু টের পেল না।

শয়নঘরের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে জমাদারসাহেব বেরিয়ে আসছিলেন, তাঁকে হাতে ধরে দাঁড় করালো কিশোর, তারপরে বিছানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে দেখুন, বালিশের ওপব খোলা চুল, নীল শাড়ি পড়া ঐ হল শ্যামাসুন্দরী আমার ওয়াইফ, আর ওর পাশে ওর গলা জড়িয়ে শুয়ে ঐ হলাম আমি, কিশোরকুমার পাল', এই বলে কিশোর নিজেকে নির্দেশ করল।

অবস্থা কিছু বুঝতে না পেরে কিশোরেব হাত ছাড়িয়ে জমাদারসাহেব 'তোবা তোবা' করতে করতে এক দৌড়ে সিঁড় দিয়ে নেমে রাস্তায় কালো গাড়িতে উঠে বসলেন। হুশ করে ধোঁয়া ছেড়ে ভ্যানটা চলে গেল।

জমাদারসাহেবকে আবও কিছু বোঝানোব জন্যে তাঁব পিছু পিছু কিশোর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসেছিল। কিন্তু জমাদারসাহেব রণে ভঙ্গ দেওয়ায় সে বিফলমনোবথ হয়ে সিঁড়ির নিচের আলো নিবিয়ে সদর দবজা বন্ধ করে দোতলায উঠে গেল। তাবপর গুটিসুটি হয়ে শ্যামাসুন্দরীর পাশে গিয়ে শুয়ে পডল।

সিঁডিতে পায়ের শব্দ আব ঘবের মধ্যে কথাবার্তা শুনে একটু আগেই শ্যামাসুন্দরীর ঘুম ভেঙেছিল। এমন বিপদে সে আর কখনও পড়েনি। সিঁড়ি দিয়ে কিশোর যখন নেমে গেল সে ভেবেছিল এখনকাব মত কিশোর বিদায় হল, পরে যদি আজকের ব্যাপারে কোনও কথা তোলে ঝেড়ে অস্বীকার করবে। বলবে, 'মাতাল অবস্থায় কি না কি দেখেছো, তার ঠিক নেই।'

কিন্তু এখন কিশোর এসে পাশে শুয়ে পড়ায় শ্যামাসুন্দবী বিচলিত বোধ করতে লাগলো। তবু ভাল যে এ পাশে শুয়েছে, ও পাশের লোকটার ওপরে গিয়ে পড়েনি!

কিশোরের মাথার মধ্যে কি সব এলোমেলো চিন্তা ঘুরছিল। একটু আগে সে কি একটা দেখেছে যেটা মোটেই ঠিক নয়। সে শ্যামাকে একটা ধাক্কা দিল, শ্যামা জবাব দিল, 'উঁ!'

কিশোর শ্যামাকে বলল, 'ওগো আমাদের বিছানায় তোমার পাশে আর কেউ কি শুয়ে আছে?

এ প্রশ্ন শুনে শ্যামা ধমকিয়ে উঠল, 'কি-যা তা বলছো! মদ টেনে টেনে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

ধমক খেয়ে একটু চুপসিয়ে গেল কিশোর। কিন্তু তবুও তার মনের মধ্যে সন্দেহের কাঁটা খোঁচা দিতে লাগল। সে বালিশ থেকে একটু মাথা উঁচু করে নিচে পায়ের দিকে তাকিয়ে ভাল

করে গুনলো, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ওগো, বিছানায় যদি আর কেউ না থাকবে তবে নিচের দিকে ছ'টা পা দেখা যাচ্ছে কি করে?'

এ কথায় চতুরা শ্যামাসুন্দরী কপাল চাপড়িয়ে কেঁদে উঠল, 'ছিঃ ছিঃ, আমার নামে এই অপবাদ। আমি দুশ্চরিত্রা? আমি মিথ্যাবাদী?'

বোকা বনে গিয়ে শ্যামাসুন্দরীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কিশোর স্বীকার করল যে সে অনেক মদ খেয়েছে সন্ধ্যা থেকে, প্রায় দেড় বোতল। সুতরাং তার ভুল হতেই পারে। মাতালে তো সব জিনিসই বেশি বেশি দেখে। হয়ত চারটে পা-কেই সে ছ'টা পা দেখেছে, নেশার ঘোরে গুনতে ভুল করেছে।

শ্যামাসুন্দরী এখন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'তুমি কি করে আমাকে দুশ্চরিত্রা ভাবলে। এ সব মদ খেয়ে নেশার ঘোরে অনুমানের কথা নয়, তুমি একবার খাট থেকে নেমে আমাদের পা-গুলো গুনে এসো, তারপরে আমাকে বলো।'

কিশোরের তখন মাথা টলছে তবু স্ত্রীর আদেশে খাট থেকে নেমে পায়ের কাছে গিয়ে খুব সতর্ক হয়ে হয়ে বেশ কয়েকবার পায়ের সংখ্যা গুনলো। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকবারই পায়ের সংখ্যা দাঁড়ালো চার। এক, দুই, তিন, চার— এইভাবে বারকয়েক গুনবার পরে কিশোর বলল, 'ওগো, আমাকে মাপ করে দাও। সত্যিই নেশার ঘোরে আমি পা গুনতে ভুল করেছিলাম। ঠিক দুজনার চারটে পা-ই রয়েছে বিছানায়।'

তারপর খাটের নিচে বসে অনুতপ্ত কিশোর সামনের পা-দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। সে পা-দুটো যে কার কে জানে!

— সমাপ্ত —

এই লেখকের অন্যান্য বই

কাণ্ডজ্ঞান
জ্ঞানগম্যি
দুই মাতালের গল্প ও অন্যান্য
বিদ্যাবুদ্ধি
বুদ্ধিশুদ্ধি
বস ও রমণী
চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি
জলভাত
পটললাল ও মিস জুলেখা